বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা

১৭০৭ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী নিয়ে যে নাটকগুলি
রচিত হয়েছে তাঁর ঐতিহাসিকতা বিচার।

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, এম-এ, পি-এইচ-ডি
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর
নাটক বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক

বঙ্গীয় নাট্য সংসদ প্রকাশনী

প্রকাশক :
অমরমাধব গুপ্ত
বঙ্গীয় নাট্য সংসদ প্রকাশনী
৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৮৮/১৪ই এপ্রিল, ১৯৮১

মুদ্রক :
অশোককুমার ঘোষ
জি, জি, প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৩১/৪এ, এ, পি, সি রোড, কলিকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :
দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

কথা ও কাহিনী
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

পূজনীয় পিতৃদেব
কাশিমবাজারের পরলোকগত
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর
পুণ্যস্মৃতিতে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম।

শ্রীমতী রত্না নন্দী
৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর

পূর্ণাঙ্গ নাটক : ছায়াবিহীন
সমান্তরাল
ছারপোকা
পতঙ্গ
বিচিত্র রাগিনী
পিপাসা ছাড়িয়ে
জনক
গণ্ডার

একাঙ্ক সঙ্কলন : সকাল সন্ধ্যার নাটক
চাঁদের হাট
সপ্তডিঙ্গা
একাঙ্ক পঞ্চদশী

পূর্ণাঙ্গ নাটক সঙ্কলন : উদাস আত্মনেপদী ছারপোকা
বসন্ত-সোহিনী পেণ্টুভটাস অলিঙ্গসুন্দর
সামুদ্রিক চতুষ্পদী

ইতিহাস : বন্দর কাশিমবাজার

বাংলা ঐতিহাসিক নাটক রচনার জগতে নৈরাশ্য অনেকদিনের পুরাতন কথা। ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত ঐতিহাসিক নাটক বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন নিয়েছে। আমার এই ষোড়শতম বাংলা পুস্তকের মাধ্যমে এই সব ঐতিহাসিক নাটকের দিকে সকলের দৃষ্টি ফেরাবার প্রচেষ্টা হয়েছে। বাংলা নাটকে পৌরাণিক কাল যেমন প্রকাশিত হয়েছে, ঐতিহাসিক ও আধুনিক কালের ঘটনা বা গল্পও তেমনি বলা হয়েছে। নাট্যকারগণ পৌরাণিক কালকে যেমন ভাবে ব্যবহার করেছেন, ঐতিহাসিক কালকেও প্রায় সেই রকমভাবেই ব্যবহার করেছেন। ব্যাপারটা কি রকম চলছে তাই বিচার করে দেখার প্রয়োজন হল। বিচারের জন্য যে সময়ের ঘটনা বাছা হয়েছে তার পরিব্যাপ্তি সম্রাট ঔরংজীব বাদশাহর মৃত্যুর পর থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭০৭ থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময় নিয়ে যে সব নাটক লেখা হয়েছে সেগুলির ঐতিহাসিকতা বিচার এই বই-এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

সবশুদ্ধ দশটি প্রবন্ধে এই দেড়শো বছরের কথা বলা হয়েছে। দুইভাগে বইটী বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের ছয়টী প্রবন্ধ পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনায় সীমাবদ্ধ অর্থাৎ প্রথম ভাগের ব্যাপ্তি মাত্র ৫০ বছরের ভারত ইতিহাসে। এই ভাগের প্রবন্ধগুলি হল যথাক্রমে জাহান্দার শাহ, নাদির শাহ, বাজীরাও, তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ, সীতারাম এবং আলিবর্দী খাঁ ও সিরাজদৌল্লা। দ্বিতীয় খণ্ডের পরিধি একশত বছর। এই ভাগের প্রবন্ধগুলির নাম মীরকাশিম, মহারাজা নন্দকুমার, রাণী ভবানী ও অযোধ্যার বেগম এবং মারাঠা, শিখ ও মহিশূর তারপর সিপাহী বিদ্রোহ।

আমার পরলোকগত বন্ধু ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে একদিন এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করায় তিনি আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়টি গবেষণার জন্য আমার নাম নথিভুক্ত করেন। নিয়ম অনুসারে প্রথমে ইংরেজীতে বিষয়টি লিখতে হয় তারই বাংলা, গবেষণার শিরোনামা হয়। তদনুযায়ী আমার গবেষণার বিষয় হল: 'বাংলা নাটকের ঐতিহাসিকতা বিচার, ১৭০৭-১৮৫৮ সম্পর্কিত।' সময় ছিল ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ। দুঃখের বিষয় অধ্যাপক ভট্টাচার্য অকালে পরলোক গমন করলেন। আমার গবেষণা তখন একান্তই স্বনির্ভর হয়ে পড়ল। আমার সৌভাগ্যক্রমে অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার ঘোষ নির্দেশকের শূন্য পদটি অলংকৃত করে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন। তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে নানা উপদেশ আমার রচনায় সহায়ক হয়েছে। একাধিকবার ডঃ ঘোষের সল্ট লেকের বাড়ীতে

বসে প্রবন্ধগুলি আলোচনার সুযোগ পেয়েছি। বর্তমানে আমার গবেষণার সাফল্যে তাঁর অবদান কম নয়। তিনি সর্বদাই প্রকৃত বন্ধুর মত আলোচনা করে আমার নানা ত্রুটি সংশোধন করেছেন। আমার গবেষণার সাফল্যের জন্য তাঁকে এবং অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি যে আমার মাতৃভাষায় গবেষণা করে ফললাভ করলাম এটা আমার পক্ষে কম শ্লাঘার বস্তু নয়। ভবিষ্যতে অন্য ভাষার মাধ্যমে যখন গবেষণা করব এই প্রথম সার্থকতা আমার পথ প্রদর্শক হবে এবং আমার বিশ্বাস ও কর্ম-ক্ষমতাকে দৃঢ়তা দেবে। চিন্তায় স্থিরতা এবং জ্ঞানে প্রসারতা আনবে। বিদগ্ধজনসান্নিধ্যকে বরণীয় করবে, এক নূতন জগতে আমার বিচরণ সম্প্রসারিত হবে।

আমার বইএ বারে বারে একটা কথা পাওয়া যাবে সেটা হল যে মাত্র দুইশত বছর আগেকার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের কি প্রচণ্ড অনীহা। জাতির ইতিহাস জানার কি অনাগ্রহ এবং রূপকথাকে বিশ্বাস করবার কি প্রচণ্ড আকর্ষণ। আমার বই শেষ করার সময়ও আমি লিখেছি যে কল্পনায় কল্পনার প্রসার হয় এবং সত্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকেনা। এই ১৯৮১-র নাট্য জগৎ আমার কথার যাথার্থ প্রমাণ করছে। বলগাহীন কল্পনাস্রোত ঐতিহাসিক ঘটনাকে ক্লেদাক্ত করছে। হয়তো কোনদিন কেউ এ বিষয়ে অবহিত হবেন এবং জাতীয় ইতিহাসের অবমাননাকে নিন্দনীয় ঘোষণা করবেন। যতদিন তা না হবে ইতিহাস বিস্মৃতি আমাদের জাতীয় চরিত্র হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করি।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করবার সুযোগ আমার গবেষণায় প্রসারতা এনেছে। সেজন্য যে সব সংস্থার নাম লেখা হবে তাদের কর্মকর্তা ও কর্মীদের অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই। নিম্নলিখিত সংস্থাগুলিতে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ আরকাইভস্, ন্যাশানাল লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, কলিকাতা হাইকোর্টের পুরাতন নথিবিভাগ যেখানে প্রাচীন সুপ্রীম কোর্টের কাগজপত্র রক্ষিত আছে, কাশিমবাজার রাজপরিবারের মহাফেজখানা, নূতন দিল্লীর ন্যাশানাল আর-কাইভস্, লণ্ডনে বৃটিশ মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী এবং ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও রেকর্ডস্।

বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে করতে এই কথাই বারবার মনে হয়েছে যে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা কি গভীর। ইংরেজ রাজত্বের ছত্রছায়ায় যে মনোভাব আমাদের তৈরী, আজ ইংরেজ বিদায়ের ৩৪ বছর পরও তাই আমাদের জীবন ধারণের যষ্টি, কেবল পুরাতন হবার জন্য কীটদষ্ট, ভগ্ন এবং মলিন। তবু সেটি ছেড়ে দেবার মনোভাব দেখা যায় না, কারণ আমাদের আত্মপরিচয় সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। আজকের যা কিছু আমাদের নিত্য প্রয়োজনের সবই যে ইংরেজদের দান একথা যতদিন না আমরা স্বীকার করব, যতদিন ভুলের স্বর্গে বাস করে বিশ্বাস করতে চাইব চিরকালই বুঝি এই রকম ছিল, এই কলকাতা সহর, এই স্কুল কলেজ, ইংরেজী, সংস্কৃত, ফারসী ও বাঙলা শিক্ষা, এই খেলাধূলা, এই বিংশ শতাব্দীয় মনোবৃত্তি এ সবই বুঝি আমাদের সৃষ্টি, ততদিন আত্মপরিচয় হবে না। কোন এক মুর্খ রাজনৈতিক সাহেবদের মূর্তি সরিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিল বুঝি এই কলকাতা সহরটায় তাদের প্রভাব নাই। এই হাস্যকর প্রচেষ্টা পথে পথে বিফলিত। প্যাণ্ট আর সার্ট আজ আমাদের জাতীয় পরিধান। কলেজের ছেলেদের জন্য কিছুদিনের মধ্যে ধুতি পরতে শেখার ক্লাস খুলতে হতে পারে। তবে? ঐসব সংস্কৃতি হজম করেই এই বিরাট ভারতসভ্যতা। তাহলে সবার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে বাঙ্গালীর লজ্জা পাবার কারণ কোথায়? তারজন্য সাহেবদের চমৎকার মূর্তিগুলি কেন সরাতে হবে আর তার জায়গায় জাতীয় নেতার ভীষণ আর কুম্ভীরাকার মূর্তি বসালেই কি মোক্ষ আসবে?

যদি নিজেদের স্বার্থপরতাকে রাজনীতি আখ্যা দেওয়া হয় তাহলে সেটা স্বার্থনীতি হয় মাত্র। আমাদের গত দুইশত বছরের ইতিহাসে দেখা যাবে যে প্রায় সকলেই রাজনীতিতে অজ্ঞ ও স্বার্থনীতিতে পটু। যার ফলে রাজ-নীতির কাছে তাঁরা বারে বারে পরাজিত। দেশের ও দশের চিন্তা না করে যাঁরাই নিজেদের কথা ভেবেছেন তাঁরাই পতিত হয়েছেন। সন্দেহ হয় এই কড়া ঐতিহ্য আজও পুরোদস্তুর জীবিত ও কর্মক্ষম।

দীর্ঘদিনের এই গবেষণার কাজে যাঁদের উৎসাহ পেয়েছি তাঁরা হলেন অধ্যাপক ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ অরুণ কুমার দাশগুপ্ত, অধ্যাপক নিশীথ রঞ্জন রায় এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, আমার শিক্ষক, অধ্যাপক ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য। এঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অধুনালুপ্ত 'ইতিহাস' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় নানা প্রবন্ধে আমার মতামত

প্রকাশের সুযোগ পেয়েছি। ত্রৈমাসিক 'ঐতিহাসিক' পত্রিকায় কয়েকটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। চতুরঙ্গ পত্রিকায় মোহনলাল সম্পর্কীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

অনেক ছাপার ভুল নানা কারণে থেকে গেছে। তার মধ্যে কিছু খুবই গুরুতর। তাই একটি শুদ্ধিপত্র ৬২৪ পাতায় যোগ করা হয়েছে। প্রয়োজনে সেটি ব্যবহার করবার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি। বইটি ছেপে প্রকাশ করতে নানা সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় শুদ্ধিপত্র রচনায়, শ্রীগৌরচন্দ্র ঘোষ প্রেস সংক্রান্ত কাজকর্মে এবং শ্রীমতী মিঠু মণ্ডল প্রেসের জন্য প্রবন্ধগুলি কপি করায় এবং পরে নির্দেশিকা রচনায়। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ভারত ফটোটাইপের অজিতবাবু সেই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমার প্রত্যেক বই-এর প্রচ্ছদ ছেপেছেন। এবারেরটা নিয়ে তিনখানা বই-এর প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করলেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতি। শুভ প্রথম বৈশাখ, ১৩৮৮। ১৪ই এপ্রিল, ১৯৮১ ॥

কাশিমবাজার রাজবাটি
৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলকাতা-৯ ॥

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম খণ্ড

প্রস্তাবনা

এই বইটিতে বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ নিবেদিত হয়েছে। ঐতিহাসিক নাটকে যতটুকু ইতিহাস থাকে তা নিয়ে প্রায়ই নানা আলোচনা হয়ে থাকে। নিবেদিত প্রবন্ধগুলি মারফৎ সেই বিষয়ে আলোক-পাতের চেষ্টা হয়েছে এবং আলোচিত নাটকগুলির ঐতিহাসিকতা বিচার করা হয়েছে। নাট্যকারগণ ইচ্ছাকৃতভাবে যেখানে ইতিহাস থেকে সরে গিয়েছেন সেখানে তাদের সেই কর্মের কারণ বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই সমালোচনায় তাই ইতিহাস অনুসৃতি প্রধান গবেষণার বিষয় এবং স্বেচ্ছাকৃত অনৈতিহাসিকত্বের কারণ অনুসন্ধান তথা নাট্যকারের ওপর সমসাময়িক কালের প্রভাব প্রকাশ করা তার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি।

এই নাটক সমালোচনায় দেড়শত বছরের এক কালের সীমা টানা হয়েছে। অর্থাৎ সম্রাট ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত ভারতবর্ষের ঘটনাবলী এই আলোচনার বিষয়। এই সময় নিয়ে যে নাটকগুলি লেখা হয়েছে কেবলমাত্র সেই নাটকগুলিই আলোচিত হয়েছে। কালের হিসাব ধরে বলতে হবে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় ঘটনাবলী যে নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় কেবল সেগুলিই আলোচিত হয়েছে। সময়ের এই গণ্ডীর বহির্ভূত কোন নাটকের আলোচনা করা হয় নি।

আলোচনার সুবিধার জন্য এই সময়ের গণ্ডীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ১৭০৭ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনা নিয়ে লেখা নাটকগুলি আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর থেকে পলাশির যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত নাটকগুলি প্রথম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী এক শত বছর অর্থাৎ পলাশির যুদ্ধের পর থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত ঘটনাবলী যে নাটকগুলির বিষয়বস্তু সেগুলি দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। তাই প্রথমভাগের প্রবন্ধগুলির নাম জাহান্দার শাহ, নাদির শাহ, বাজীরাও,

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ, সীতারাম এবং আলিবর্দী খাঁ ও সিরাজ-উদ্-দৌলা। দ্বিতীয় ভাগের প্রবন্ধগুলির নাম মীরকাশিম, নন্দকুমার, রাণী ভবানী ও অযোধ্যার বেগম এবং মারাঠা, শিখ, মহিশূর তারপর সিপাহী বিদ্রোহ।

কালানুক্রমিকভাবে দিল্লীর ঘটনার নাটক দিয়ে আলোচনা সুরু হয়েছে এবং বাংলার ঘটনাকেন্দ্রিক নাটকে প্রথম খণ্ড সমাপ্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলা থেকে ক্রমে আবার দিল্লী অভিমুখে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। প্রত্যেক প্রবন্ধে কোন্ কোন্ নাটক আলোচনা করা হয়েছে স্পষ্টভাবে জানান হয়েছে।

জাহান্দার শাহ

জাহান্দার শাহ দিল্লীর মসনদের প্রথম অকর্মণ্য বাদশাহ। পরবর্ত্তীযুগে বাদশাহী যে কথার কথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং বাদশাহ যে ওমরাহগণের হাতে খেলার পুতুলে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, তার উৎসমুখ জাহান্দার শাহ। তার মতো অক্ষম, বিলাসী এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টিহীন শাসক খুবই কম দেখা গেছে। বাবরশাহী বংশের তথা মোগল সাম্রাজ্যের পতনে তাই জাহান্দার শাহের দশমাস পঁচিশ দিনের রাজত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাদশাহীর অধঃপতনের প্রথম ধাপেই জাহান্দার শাহর অবস্থিতি।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ ঔরঙ্গজীব আলমগীরের মৃত্যু হলে কে বাদশার তখতে বসবেন তাই নিয়ে ঔরঙ্গজীবের জীবিত তিনপুত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধে।[১]

জজৌএর রণক্ষেত্রে বাহাদুর শাহ তার ভাইদের হারিয়ে ছিলেন। একে একে আজম শাহ তার বহুপুত্র সমেত এবং কামবক্স যুদ্ধে নিহত হলেন। "'বাহাদুর শাহ শাহআলম' নাম নিয়ে তিনি দিল্লীর বাদশাহ হয়ে বসলেন ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে। ঐতিহাসিক দুঃখ করে বলেছেন যে বাহাদুর শাহর রাজত্ব প্রাপ্তিতেই মোগল সাম্রাজ্যে পতনের সূচনা। কারণ জজৌ রণক্ষেত্রে নিহত আজম শাহর মধ্যে যে দৃঢ় চরিত্র দেখা গেছে তাতে তারই শ্রেয়তর বাদশা হবার সম্ভাবনা ছিল। তার পুত্রগণের মধ্যেও পিতার এই সদগুণের প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল। বাহাদুর শাহের চরিত্রের বিলাসপ্রিয়তা তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মৈজুদ্দিন জাহান্দার শাহের মধ্যে অতি প্রকটভাবে দেখা গেল। এই বিলাসের প্রবাহ দিল্লীর মসনদের ভেতর দিয়ে বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে বাদশাহীকে তামাসায় রূপান্তরিত করল। অন্যদিকে কর্ম্মের প্রবাহের বাহক আজমশাহ সপ্তপুত্রসহ নিহত হলেন। কর্ম্মের যজ্ঞে আহুতি দিতে কেউ থাকল না। ঔরঙ্গজীব বাদশাহ এইভাবে নিজের কাছে নিজে পরাজিত হলেন। তাঁর চরিত্রের গোপন বিলাসের দিক তাঁর অপূর্ব কর্ম্মতৎপরতার সুস্পষ্ট নিদর্শনকে পরাজিত করল। সকলের অগোচরে যে বিলাসী ঔরঙ্গজীব গোপনে কামনা চরিতার্থ করতেন তাঁরই হল জয় আর রাজত্ব পরিচালনায় দক্ষ যে ঔরঙ্গজীব, সেই কীর্তিমান

দীর্ঘজীবী বাদশার কর্ম্মধারা সম্পূর্ণভাবে মুছে গেল পৃথিবীর বুক থেকে। পৈত্রিক প্রবণতার এমন চমৎকার নিদর্শন বিজ্ঞানের বইয়ে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। (The genetic trends of hereditary evolution).

বাদশাহ শাহআলম বাহাদুর শাহের ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে দেহান্ত হওয়া মাত্র তার চার জীবিত পুত্রের মধ্যে মসনদ নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে গেল। এবারেও পিতার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আজম, আজিম-উস-সান সব থেকে ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিপন্ন হলেন। ইতিহাসের চক্রে এবারেও বাংলা বিহার উড়িষ্যার শাসনে যে প্রভূত অর্থ তিনি অর্জন করেছিলেন সৈন্য সংগ্রহের কাজে তাতে বিশেষ সাহায্য হল। যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমিররা বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন করতে লাগলেন। বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র মৈজুদ্দিন জাহান্দার শাহ মুলতানের শাসনকর্তা ছিলেন। মুলতান শাসনে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তার দক্ষতা ছিল যেমন সর্বজনমান্য তেমনি বিলাসে অর্থাৎ মদ্যপানে এবং রমণীরমণে তার প্রচণ্ড লিপ্সা ছিল সুবিদিত। জাহান্দার শাহর সব থেকে বড় দুর্বলতা তিনি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন নি তাই তার সৈন্যদলও অত্যন্ত ক্ষীণ। সুবিখ্যাত রাজনীতিবিদ আসাদ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জুলফিকর খাঁ জাহান্দার শাহর সহায় না হলে তিনি কখনই দিল্লীর মসনদে বসতে পারতেন না। জুলফিকর খাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাকে সহজেই বুঝিয়ে দিল যে জাহান্দার শাহকে বাদশা করে তিনি যদি তার উজীর বা প্রধান অমাত্যের পদ অধিকার করতে পারেন তাহলে তিনিই হবেন সত্যিকারের শাসনকর্তা। মোগল সাম্রাজ্যকে তিনিই চালনা করবেন। জুলফিকর খাঁ জাহান্দার শাহর সঙ্গে বাহাদুর শাহের অন্য দুইপুত্র রফি-উল-কাদের রফি-উস-সান এবং খুজিস্তা আখতার জাহান শাহকে যুক্ত করলেন। তদনুসারে স্থির হল যে আজিম-উস-সানকে যুদ্ধে পরাজিত করার পর রফি-উস-সান পাবেন কাবুল, কাশ্মীর, মূলতান, টাটহা আর ভাক্কর* আর জাহান শাহ পাবেন নর্মদা নদী থেকে সমস্ত দক্ষিণ ভারত। জাহান্দার শাহ ভারত সম্রাট স্বীকৃত হবেন এবং হিন্দুস্থানের বাকী অঞ্চল তাঁর থাকবে। এই সন্ধিপত্রের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ধারা হল জুলফিকর খাঁ দিল্লীর উজির বা

---

*করাচির কাছে বর্তমান নাম টাট্টা আর ডেরাইসমাইল খানের কাছে বর্তমানের ভাক্কর। উভয়স্থানই বর্তমানে পাকিস্থানে।

প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হবেন এবং অন্য দুই রাজ্যে অর্থাৎ রফি-উস-সান পরিচালিত পশ্চিমে বা জাহান খাঁ পরিচালিত দক্ষিণে উজির জুলফিকর খাঁর মনোনীত প্রার্থীদের উজির করতে হবে।[২] তিন ভাই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। তাদের সম্মিলিত বাহিনী হল ৫৩০০০ ঘোড়সোয়ার ও ৬৮০০০ পদাতিক। তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্য আজিম উস-সান নিয়ে এলেন ৩০০০০ ঘোড়-সোয়ার আর ৩০০০০ পদাতিক সৈন্য।[৩] যুদ্ধে আজিম-উস-সানের হার হল। তার জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ করিম যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হলেন। ১৭ই মার্চের (১৭১২ খ্রীঃ) যুদ্ধে পরাজিত আজিম-উস-সান হাতি চেপে পালাবার সময় সবাহন রাভী নদীর চোরাবালিতে ডুবে শোচনীয় মৃত্যুবরণ করে নিলেন।[৪]

তিন ভাই এর সন্ধিপত্র আকাশে উড়ে গেল। জুলফিকর খাঁর মন্ত্রনায় জাহান্দার শাহ জাহান খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। ২৭ শে মার্চের (১৭১২খ্রীঃ) যুদ্ধে জাহান খাঁ জ্যেষ্ঠপুত্র ফারকুলা আখতার সহ নিহত হলেন।[৫] পরের দিন ২৮শে মার্চ (১৭১২ খ্রীঃ) রফি-উস-সান নিহত হলেন।[৬] তিন দিন সম্রাট জাহান্দার শাহ তার ভাই এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের দেহ রাভী নদীর পারে বালির ওপর উন্মুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখলেন তারপর পিতা বাহাদুর শাহের শবাধারের সঙ্গে তার ভাইদের ও ভাইপোদের শবাধার কবরস্থ করার জন্য দিল্লীতে পাঠান হল। পরদিন ২৯শে মার্চ (১৭১২ খ্রীঃ) জাহান্দার শাহ নিজেকে দিল্লীর বাদশাহ ঘোষণা করলেন।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁর তখৎ-এ-তাউস নাটকে এই জাহান্দর শাহের বাদশাহী কালকে রূপায়িত করেছেন। ২৯শে মার্চ (১৭১২ খ্রীঃ) বাদশাহ হলেও জাহান্দার শাহ জুলাই মাসের আগে দিল্লীতে আসেননি। সুতরাং এই নাটকে জুলাই ১৭১২ থেকে জাহান্দার শাহের মৃত্যুর দিন অর্থাৎ ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে। নাটক রচনার উপাদান যে উইলিয়াম ইরভিন সাহেবের Later Mughals থেকে সংগৃহীত তা সহজেই অনুমান করা যায়। তখৎ-এ-তাউস নাটক মাসিক বসুমতীতে ১৩৫৮ সালের ২য় খণ্ডে ও ১৩৫৯ সালের ১ম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান আলোচনায় মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত নাটকই ব্যবহার করা হয়েছে।

তখৎ-এ-তাউস নাটক চার অঙ্কে বিভক্ত।* প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য ও চতুর্থ অঙ্কে চারটি দৃশ্য। নাটকের প্রধান চরিত্র বাদশাহ জাহান্দার শাহ ও তার উপপত্নী লালকুঁয়ার যাকে বাদশাহ হবার পর জাহান্দার শাহ ইমতিয়াজ মহল নামকরণ করেন এবং প্রধানা মহিষীর সম্মানে ভূষিত করেন। নাটকে প্রতিটি চরিত্র ঐতিহাসিক। জুলফিকর খাঁ, রাজা সভাচাঁদ, আলিমুরাদ কোকলতস খাঁ, জিন্নতউন্নিসা বেগম, ফারুকসিয়র এবং সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সকলেই নাটকে আছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে এমন ভাবে খুব কম নাট্যকারই ব্যবহার করেছেন। সে দিক এই নাটকখানি বিশেষ সম্মানের যোগ্য। প্রশ্ন হতে পারে যে নাট্যকার জাহান্দার শাহর মতো বৈশিষ্ট্যহীন একব্যক্তিকে নাটকের প্রধান চরিত্র করে তার সাতমাসের রাজত্বকে নাটকের বিষয়বস্তুতে কেন রূপান্তরিত করলেন। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। বিশেষ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত নাটক পাওয়ায় নাট্যকারের ভূমিকা বা বক্তব্যের কোন আভাস পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায় যে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অনুরোধে এই নাটক রচিত হয়েছে। শিশির ভাদুড়ী মহাশয় ১৩৫৭ সালে বা ১৯৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দ নাটকখানি তাঁর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনয় করেন। নাটকাকারে প্রকাশ হয় ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে[৭] নিজে জাহান্দার শাহের ভূমিকায় নাট্যাচার্য্য যে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাতেন তা নাট্যামোদী মাত্রেরই চিরস্মরণীয়। অভিনয়ের এই সৌকর্য ছিল দর্শক আকর্ষণের প্রধান সহায়। শিশিরকুমার অভিনীত 'পাগল জাহান্দার শাহ'র চরিত্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে এই অপূর্ব ঐতিহাসিক নাটকের শ্রেষ্ঠ কলঙ্ক, সব থেকে বিরাট অনৈতিহাসিকতা। নাটকে নায়ক হবার কোন গুণই জাহান্দার শাহের ছিল না। তার চরিত্র ও কর্মে সঙ্গতি আনার জন্য জাহান্দার শাহকে খামখেয়ালী, প্রেমিক ও 'মন্দ ভাগ্য নায়ক' হিসাবে নাটকে উপস্থিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে লালকুঁয়ারের চরিত্রের ধারাকে সুসংযত করা হয়েছে। এই প্রধান দুটি চরিত্র ইতিহাস

---

* তখৎ-এ-তাউস-রচনা প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। মাসিক বসুমতী চৈত্র ১৩৫৮ পাতা ৮৩৩-৮৩৬, বৈশাখ ১৩৫৯ পাতা ৪৪-৪৯, জ্যৈষ্ঠ পাতা ২১৫-২১৯, আষাঢ় পাতা ৩৭৫-৩৭৯ ও শ্রাবণ পাতা ৫৩৬-৫৪১।

বিরোধী। বস্তুত লালকুঁযারের চরিত্র এতই অসাধারণ যে বাঙালী দর্শক বা নাট্যকারের কল্পনার অতীত।

শ্রীরঙ্গমে যখন এই নাটকটির অভিনয় হয় তখন শিশির ভাতুড়ী মহাশয়ের বিশেষ দুরবস্থা। দৃশ্য সজ্জা ছিল অত্যন্ত মলিন। কেবলই অভিনয় কৌশলই নাটকের একমাত্র আকর্ষণ হয়ে দাড়ায। লালকুঁযার চরিত্রে অভিনয় করেন সম্ভবতঃ রাজলক্ষ্মী (ছোট), জিন্নতউন্নিসা—রেবা দেবী, জুলফিকর খাঁ—মুরারি ভাতুড়ী, কোকলতস খাঁ—কালী সরকার (সম্ভবত), নিয়ামত খাঁ—মণি শ্রীমানী আর ফাককসিয়র—বাণীব্রত। সমগ্রদল ভাল অভিনয করেন। একটা লাল রঙের দাড়ি ও চুল পরে ভাতুড়ী মহাশয জাহান্দার শাহ হতেন।

নাটকের পূর্ণ বিবরণ দেবার আগে ঐতিহাসিক জাহান্দার শাহর জীবনী আলোচনা করা যাক। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে জাহান্দার শাহর বয়স ৪১ বৎসর (জন্ম ১০ই মে ১৬৬১ খ্রীঃ)। আজিম-উস-সানের বয়স ৪৮ বৎসব (জন্ম ১৬৬৪ খ্রীঃ) রফি-উস-সানের বয়স ৩২ বৎসর (জন্ম ১৬৭০ খ্রীঃ) ও জাহান খাঁর বয়স ২৯ বৎসর (জন্ম ১৬৭৩ খ্রীঃ)। জাহান্দার শাহর প্রথম বিবাহ ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই স্ত্রী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায না। সম্ভবতঃ বিবাহের পর এর মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় বিবাহ হয় সৈয়দউন্নিসা বেগমের সঙ্গে ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই বিবাহের সন্তান বাদশাজাদা আজুদ্দিন ও ইজুদ্দিন। আজুদ্দিনকে ফাকৃকসিয়র অন্ধ করে দেন ২১শে জানুয়ারী ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইজুদ্দিন বন্দী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন ২৫শে জুলাই ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। দুইভাই সম্ভবত যথাক্রমে ১৬৮৬ ও ১৬৮৮ বা ১৬৯০ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। জাহান্দার শাহের তৃতীয় বিবাহ হিন্দু রমনী অনুপবাঈ। এঁর পুত্র আজজিউদ্দিনের জন্ম হয় ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি পরে দ্বিতীয় আলমগীর নামে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং উজির ইমাদউলমুলুক কর্তৃক নিহত হন ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে।[৮]

লালকুঁয়ার যিনি ইমতিয়াজ মহল নামে প্রধানা মহিষীর সম্মানে ভূষিত হলেন, দেখা যাচ্ছে তাঁকে জাহান্দার শাহ আদৌ বিবাহ করেন নাই। অথচ এই রমনীর প্রভাবে তার সমস্ত জীবন অসংযতভাবে চালিত হয়ে সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেছে। সম্ভবত ১৭১০ থেকে ১৭১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময় জাহান্দার শাহ লালকুঁয়ারকে সংগ্রহ করেন। তার সঙ্গে সঙ্গে লালকুঁয়ারের ভাইরা এবং

সাঙ্গপাঙ্গরা জাহান্দার শাহের স্কন্ধে ভর করেন। জাহান্দার শাহের কাছে আসবার আগে লালকুঁয়ার একজন সাধারণ বাঈজী ও দেহবিলাসিনী ছিলেন। যে শ্রেণী থেকে তিনি এলেন তাদের বলা হয় 'কলাবন্ত'। নাচ ও গান এদের পেশা। এই শ্রেণীতে পুরুষরা বাজনা বাজায় এবং স্ত্রীলোকেরা নেচে গেয়ে আনন্দদান করে।[৯] জাহান্দার শাহ ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় শিবিরে লালকুঁয়ারকে রেখেছিলেন। ব্লকম্যান সাহেব লালকুঁয়ারকে তানসেনের উত্তরপুরুষ খাসুসিয়াত খাঁর কন্যা বলে বর্ণনা করেছেন।

লালকুঁয়ার অপূর্বরূপলাবণ্যবতী রমনী ছিলেন। তার রূপ নিয়ে অনেক কবিতা রচিত হয়েছে। তার দু' একটি এখনও পাওয়া যায়।[১০] বাদশা হবার পর জাহান্দার শাহ লালকুঁয়ারকে ইমতিয়াজমহল উপাধি দিলেন এবং পরিপূর্ণভাবে তার বশীভূত হয়ে গেলেন এবং লালকুঁয়ারের ভাই বন্ধুদের নানা উপাধিতে ভূষিত করলেন। এক ভাইয়ের উপাধি হল নিয়ামত খাঁ, একে বাদশা মূলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। নৌকাতে লোক পারাপার হচ্ছে দেখে ইমতিয়াজ মহলের নৌকা জলমগ্ন হলে যাত্রীরা কি করে জলে ডুবে মরে দেখতে ইচ্ছা হল। বাদশা তৎক্ষণাৎ যাত্রীপূর্ণ নৌকাকে জলে ডোবাবার হুকুম দিলেন। সুখের বিষয় মুলতানের শাসনকর্তা বা যাত্রীদের জলে ডোবান জুলফিকর খাঁর আদেশে শেষ পর্যন্ত কার্যকারী হয় নাই।[১১] লালকুঁয়ার নিজেকে নূরজাহান বেগমের সমতুল্য মনে করতেন। তিনি তাই নিজেই বাদশাহের মতো বিচরণ করতেন, মাথার ওপরে থাকত বাদশাহী ছত্র এবং অশ্বের ওপর কাড়ানাকাড়া বাজতে বাজতে তার সঙ্গে যেত। তার নামে নাকি টাকা ছাপান হয়েছিল অবশ্য সেই মুদ্রার নিদর্শন আজ পর্যন্ত হস্তগত হয়নি। তাঁরই আদেশে দিল্লীর সব উঁচু গাছ কেটে ফেলা হয়। জহরা নামে দিল্লীর এক তরকারীওয়ালী ছিল বেগমের বন্ধু। ইমতিয়াজ মহলের আদেশে বাদশা তাকে জায়গীর ও খেতাব দিয়েছিলেন। এই স্ত্রীলোকটির এতই অহঙ্কার হয়ে গেল যে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ওমরাহ চিনকিলিচ খাঁ আসফঝা নিজাম-উল-মুলুককে সে অপমান করতে দ্বিধা করেনি। লালকুঁয়ারের অভিযোগে বাদশা কিন্তু চিনকিলিচ খাঁকেই শাস্তির যোগ্য বিবেচনা করলেন। আবার জুলফিকর খাঁর মধ্যস্থতায় ব্যাপারটি চাপা পড়ে গেল। জিন্নতউন্নিসা বেগম, ঔরঙ্গজীর

বাদশাহের কন্যা, জাহান্দার শাহের পিতৃস্বসা। লালকুঁয়ারের প্রভাবে জাহান্দার শাহ তাকে সর্বদা এড়িয়ে চলতেন। লালকুঁয়ার অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবেই ঔরঙ্গজীব-কন্যাকে কুৎসিত গালিগালাজ করতেন। জাহান্দার শাহের ছোট দুটি ছেলে ইজুদ্দিন ও আজিজউদ্দিন লালকুঁয়ারের চক্ষুশূল হল। তার ইচ্ছানুসারে বাদশাহ তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

কাপড় ও গহনার খরচ বাদে ইমতিয়াজ মহলের হাতখরচ ছিল বার্ষিক দুই কোটী টাকা। তার অনুরোধে বাদশাহ বয়েল গাড়ীতে চেপে দিল্লীর বিভিন্ন দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াতেন। লালকুঁয়ারের বন্ধু এক মদ্যব্যবসায়ীর দোকানে গিয়ে বাদশা, বেগম সাঙ্গপাঙ্গসহ মদ খেয়ে মাতলামী করতেন। এই মদ্যব্যবসায়ী লালকুঁয়ারের কৃপায় প্রচুর অর্থ ও একখানি গ্রামের রাজস্বলাভ করে। বিভিন্ন বাগানে বাগানে বাদশা ও বেগমের অশ্লীল কীর্তি লোকের মুখে মুখে ফিরত। জাহান্দারশাহ পরিপূর্ণভাবে এই রমণীতে মগ্ন হয়ে দেশবাসীর সমস্ত শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেললেন।[১২]

এমনকি প্রতিরাত্রে ইমতিয়াজের সাঙ্গপাঙ্গরা দিল্লীর কেল্লার ভেতরে গান-বাজনা করতেন তারপর মদ খেয়ে হৈহুল্লোড় সুরু হত। ইমতিয়াজের মাতাল সঙ্গীরা বাদশাহকে নাচতে বাধ্য করতেন এবং নানা অছিলায় বাদশাহকে প্রহার করতেন। এই ঘটনাতেই ছিল লালকুঁয়ারের চরম আনন্দ তিনি খুসীতে বিহ্বল হয়ে যেতেন। জাহান্দার শাহ লালকুঁয়ারকে খুসী করার জন্য মাতাল হয়ে এই অপমান, নির্যাতন ও অসম্মান হাসিমুখে সহ্য করতেন। এইখানেই কীর্তির শেষ নয়। চিরাগ-ই-দিলতে স্নান করলে পুত্র হয় প্রবাদ ছিল। লালকুঁয়ারের ইচ্ছা তার পুত্র বাদশহ হবে! তাই প্রতি রবিবার লালকুঁয়ার এবং বাদশাহ সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে এই দিঘীতে স্নান করতেন। ছোট ছেলেরা মসৃণ-পাথরে পিছলে পড়ে খেলা করছে বা নড়বড়ে পাথরে দোল খাচ্ছে দেখলেই ইমতিয়াজ মহল বেগম বাদশাহকে দিয়ে তাই করাতেন। ইমতিয়াজ মহল বাদশাহ জাহান্দার শাহকে ঠিক বাঁদরের মত নাচাতেন আর বাদশাহ নাচতেন।[১৩]

বাদশাহের রাজকার্যে মন ছিলনা। জুলফিকর খাঁ তাই নিজের ইচ্ছামত শাসন করতেন। তিনিও বিশেষ পরিশ্রম করতে প্রস্তুত ছিলেন না তাই তার কর্মচারী এক ক্ষেত্রীকে রাজা সভাচাঁদ নামে আমীর করা হল। রাজা সভাচাঁদই

শেষ পর্যন্ত রাজ্যশাসনের দায়িত্ব পালন করতেন। জাহান্দার শাহ খেলার বাদশাহ হলেন। একদিকে প্রিয় সহচরী লালকুঁয়ার ওরফে ইমতিয়াজ মহল অন্যদিকে জুলফিকর খাঁ উজিরের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে এক জড়বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। তার না ছিল নিজস্ব কোন চিন্তাশক্তি, না কোন অনুভূতি। পিতামহ বাদশাহ আলমগীর ও পিতা শাহআলমের কাছে শিক্ষিত সাহসী যোদ্ধার এ এক অদ্ভুত রূপান্তর, ভাবপ্রবণতা ও পরিণতি।

১৯৫২ তে বাংলার নাট্যজগতে এক জড় বস্তুকে নায়ক করে নাটক লেখার প্রচলন ছিলনা। তাই তখৎ-এ-তাউস নাটকে জাহান্দার শাহকে 'পাগল' করা হল। লালকুঁয়ারের খেলার পুতুল হিসাবে তাকে না দেখিয়ে সব অপকর্মের দায়িত্ব জাহান্দার শাহের খামখেয়ালী বুদ্ধির ওপর চাপান হল। অপকীর্তির প্রধান হোতা করা হল বাদশাহকে—লালকুঁয়ারকে নয়। তাই এই নাটক যা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। অর্থাৎ 'লালকুঁয়ার' হওয়া উচিত ছিল মুখ্যচরিত্র তা না হওয়াতেই ইতিহাসের বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাস অনুযায়ী জাহান্দার শাহের চরিত্র বর্ণিত হলে বাংলা নাট্য সাহিত্যে এক যুগান্ত সৃষ্টি হত সন্দেহ নাই।

কিন্তু তা হয় নাই। তাই তখৎ এ-তাউস নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর চোখ ঝলসান অভিনয়ের বাহন ছাড়া অন্য কোনরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে না। নাটক হিসাবে তখৎ-এ-তাউস অতি সাধারণ। ঘটনা বা চরিত্র বৈচিত্রে কোন বিশেষত্ব নাই। এমন কি মূলচরিত্র জাহান্দার শাহও মৌলিক নয়। শিশিরকুমার অভিনীত জলধর চট্টোপাধ্যায়ের রীতিমতো নাটকের প্রফেসর দিগম্বরের ছায়া পড়েছে জাহান্দার শাহের ওপর। জাহান্দার শাহ প্রফেসর দিগম্বরের ঐতিহাসিক সংস্করণ। দিগম্বরের পাগলামি নাটকে প্রতিষ্ঠিত। জাহান্দার শাহের পাগলামি পঞ্চভূতে সমাচ্ছন্ন। দিগম্বর রক্তমাংসের মানুষ। সুখদুঃখ আশা আনন্দ তাকে উদ্বেলিত করে। জাহান্দার শাহ একটি সীমাহীন ভাঁড়। ইতিহাসে তথা বাস্তবে যেমন অসম্ভব, নাটকেও তেমনি তাৎপর্যহীন কষ্টকল্পনা। একথা বললে অন্যায় হবেনা যে জাহান্দার শাহ ছাড়া তখৎ-এ-তাউস নাটকে আর কিছু নাই। প্রধান চরিত্রের অনৈতিহাসিকতা নাটকের মূল্যকে বিনষ্ট করেছে।

বিশেষ ইমতিয়াজ মহল, সেই অবিনশ্বর লালকুঁয়ার যাকে স্বচ্ছন্দে বিলাসিনীদের নূরজাহান বলে বর্ণনা করা যায়, এই নাটকে সম্পূর্ণ অবহেলিত। তার স্বর সর্বদা বাদশাহকে অনুসরণ করে, কখনই তাকে হুকুম করে না। নাট্যকারের হাতে ইমতিয়াজ মহলকে বোকাসোকা ভাল মানুষ সাজতে হয়েছে। বাদশাহের প্রতি প্রেম তার শ্রেষ্ঠ গুণ, বিনা দ্বিধায় বাদশাহকে সর্বত্র অনুসরণ তার মূল চরিত্র। বলাবাহুল্য এ চরিত্র সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। জাহান্দার শাহ পিতা ও পিতামহের কাছে জন্মাবধি যে শিক্ষা পেয়েছেন তাতে কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়ম তিনি লঙ্ঘন করতে পারতেন না। কিন্তু বাদশাহীর সঙ্গে সম্পর্ক রহিত এবং বাদশাহী রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ লালকুঁয়ারের পক্ষে সর্বপ্রকার নিয়ম লঙ্ঘন সম্ভব ছিল কারণ কোন শৃঙ্খলাবোধ বা নিয়মানুবর্তিতা তাকে কখন শিখতে হয় নাই। জাহান্দার শাহ নিজের সব ব্যক্তিত্ব হারিয়ে নিজেকে লালকুঁয়ারের আদেশবহতে রূপান্তরিত করেছিলেন বলেই বাদশাহীর মর্য্যাদা এত তাড়াতাড়ি নষ্ট হল। লালকুঁয়ার কখনই দেহোপজীবিনীর মানসিকতা কাটাতে পারেনি তাই তার প্রভাব জাহান্দার শাহকে তথা মোগল সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে।

এইবার তখৎ-এ-তাউস নাটকটি দেখা যাক। প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্য দিল্লীর একটি পথ। পথের ধারে গাছের নীচে এক দরগা। দরগার কাছে জনকয়েক লোক দাঁড়িয়ে কথা বলছে। এদের প্রথম সংলাপ হল যে বাদশাহ একেবারে উন্মত্ত হয়ে গেছে। দিল্লীর গাছ কেটে ফেলার কথা বলা হয়েছে আরো বলা হয়েছে যে লালকুঁয়ার ফুসমন্তরে যুদ্ধে তাকে জয়ী করেছে। চিরাগ-ই-দিলের তলাও এ উলঙ্গ হয়ে স্নান করতে যাবার খবর শোনান হয়েছে। একটি চমৎকার সংলাপ ঃ 'ঐ ডাইনির পেটে, ঐ পাগলটার যে ছেলে জন্মাবে সে ব্যাটা তখতে বসলে কি ব্যাপারটা হবে একবার ভেবে দেখেছিস্'। দ্বিতীয় দৃশ্য দিল্লীর দেওয়ানী খাস! দুপাশে দু' সারি প্রহরী। তাছাড়া আলিমুরাদ কোকলতস খাঁ, ইকলাস খাঁ, রাজা সভাচাঁদ, সাদুল্লা খাঁ প্রভৃতি। সম্রাট সভায় উপস্থিত নাই দেখে সকলে বিস্ময় প্রকাশ করছেন এবং ফারুকসিয়র পাটনায় নিজেকে সম্রাট ঘোষণা করেছেন তাই আলোচনা করছেন। এমন সময় পাগড়ীহীন হাতে চাবুক সম্রাটের প্রবেশ। সভাসদগণ ফারুকসিয়রের

খবর এবং সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ ও সৈয়দ হুসেন আলি খাঁ যে তাঁকে সমর্থন করেছেন একথা সম্রাটকে জানালেন।' সম্রাট রাজনীতিজ্ঞানহীন পাগলের মতো বলছেন, 'কোকলতস খাঁ, তুমি এখুনি এই মুহূর্ত্তে পাটনা যাও। শয়তান ফারুকশিয়রকে বল গিয়ে সে যদি জাহান্নমে যেতে না চায় তাহলে যেন এই মতলব পরিত্যাগ করে। আর সেখান থেকে আসবার সময় পাটনার শ্রেষ্ঠ গায়িকা আর পাঁচজন সুন্দরীকে নিয়ে আসবে।' সভায় উজির জুলফিকর আলি খাঁ নাই দেখে তাকে ডাকতে পাঠান হল। কিন্তু তখনই উজির প্রবেশ করায় সম্রাট ধরে নিলেন যে তিনি কোন সুন্দরীর কাছে ছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ চাবুক ঘুরিয়ে 'নিকালো' 'নিকালো' বলে সভাসদদের তাড়িয়ে দিয়ে সম্রাট জুলফিকর খাঁকে নিয়ে অন্তরালে যাবার চেষ্টা করছেন এমন সময় লালকুঁয়াব ওরফে ইমতিয়াজ মহল রাজসভায় প্রবেশ করে জানালেন যে সম্রাটের পিসী জিন্নতউন্নিসা বেগম পত্র লিখে তাকে আহারে নিমন্ত্রণ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এও লিখে জানিয়েছেন যে, 'তুমি যে বাজারের স্ত্রীলোকটিকে লইয়া দিনরাত্রি উন্মত্ত হইয়া আছ তাহাকে সঙ্গে আনিও না।'

ইমতিয়াজ মহল সম্রাট আলমগীরের কন্যাকে বাঁদী বলে সম্বোধন করে এই পত্রের জন্য উষ্মা প্রকাশ করলেন এবং সম্রাটকে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করতে অনুরোধ করলেন। সম্রাট তার প্রিয়তমাকে এই অপমান করার জন্য জুলফিকর খাঁকে আদেশ দিলেন যে বাড়ী ঘেরাও করে জিন্নৎউন্নিসা বেগমকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতে। তারপর বললেন যে, আত্মীয়দের রক্ত স্রোতে ধরণীতে তিনিও আলমগীর বাদশাহর মতো বন্যা বইয়ে দেবেন। আরও জানালেন যে, সিংহাসনের মেয়াদ কমে যাবার সম্ভাবনাতেও তিনি তার প্রেমের অমর্য্যাদা করতে পারবেন না। অবশেষে জুলফিকর খাঁ ফিকির বাতলালেন। ইমতিয়াজ মহলকে বললেন যে সম্রাটের অমঙ্গল সম্ভাবনা আছে বলেই তিনি জিন্নৎউন্নিসা বেগমকে ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করছেন। ইমতিয়াজ মহল সেই অনুরোধ রক্ষা করলে সবাই খুব খুসী হয়ে উঠলেন। সম্রাট ইমতিয়াজ মহলের মহানুভবতায় আনন্দিত হয়ে গাইয়ে বাজিয়েদের ডাকাতে বললেন। তারা এলে সবাইকে সরাব খাওয়ালেন। তারপর বাদশাহ স্বয়ং নাচতে লাগলেন। হঠাৎ তিন-চারজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। তিনজনকে ঘুঁসি মারলেন গান বাজনা

থেমে গেল। ইমতিয়াজ তখত থেকে উঠে এসে সম্রাটের হাতে চাবুক দিয়ে বললেন—'এই নাও চাবুক। তুমি বড় রসভঙ্গ কর।' আরো কিছুক্ষণ গান-বাজনা চলার পর সম্রাট সাদ্‌উল্লা খাঁকে নিয়ে রসিকতা সুরু করলেন। সে নাচতে জানেনা এবং প্রধান বক্সী হয়েও রাজকোষ অর্থ শূন্য শুনে তাকে কর্মচ্যুত করলেন। তারপরেই তার মনে পড়ে গেল মানুষ জলে কেমন করে ডোবে ইমতিয়াজ তাই দেখতে চেয়েছিলেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিয়ে দিলেন যে তিন নৌকা বোঝাই লোক যমুনাতে ডোবান হোক। প্রথম নৌকার পুরোভাগে থাকবেন সাদুল্লা খাঁ, দ্বিতীয় নৌকার পুরোভাগে রাজা সভাচাঁদ, আর তৃতীয় নৌকায় সম্রাট স্বয়ং। ইমতিয়াজ মহল সঙ্গে সঙ্গে 'সম্রাট কাছে না থাকলে আমার আনন্দের অনেকখানি কমে যাবে' বলে সম্রাটকে নিয়ে প্রস্থান করছেন।

তৃতীয় দৃশ্য জিন্নৎউন্নিসা বেগমের প্রাসাদ। জিন্নৎউন্নিসা বেগম সভাসদদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন। উপস্থিত আছেন কোকলতস খাঁ, সভাচাদ ও সাদুল্লা খাঁ। জিন্নৎউন্নিসা লালকুঁয়ারের বাঁদী সম্বোধনে অত্যন্ত অপমানিত এবং সেই জন্যই যেন জাহান্দার শাহের সিংহাসনচ্যুত চাইছেন। তাঁর আহ্বানে জুলফিকর খাঁ আসেন এবং জানান যে আলমগীর বাদশাহও বাজারের নর্তকীকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি আরও জানালেন যে ইমতিয়াজ মহল জিন্নতউন্নি-সার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করেছেন এটা তার মহানুভবতারই পরিচয়। জুলফিকর খাঁ ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজী হলেন না। জিন্নতউন্নিসা জানালেন যে তাঁদের পরিকল্পনা আজুদ্দিন সিংহাসনে বসবে। ইতিমধ্যে জমিদারেরা যে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে তা জাহান্দার শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর মাত্র। জুলফিকর খাঁ চলে যাবার পর সভাচাঁদ মৈজুদুল্লাকে সিংহাসন দেবার কথা চিন্তা করতে বললেন।

পট পরিবর্ত্তনে দেখা গেল দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাস রাত্রির শেষ প্রহর, দূরে তখৎ-এ-তাউস দেখা যাচ্ছে। সম্রাটের চুল উস্কোখুস্কো পাগলের মতো, হাতে চাবুক। দীর্ঘ বক্তৃতা। বিষয়—এই তক্তে যে বসবে তার চোখে আর ঘুম থাকবে না। তারপর তখতের চার পাশে তিনি তার পূর্বপুরুষদের অশরীরী আত্মাদের দেখতে পেলেন। আলমগীর ঔরঙ্গজীব, দারাসুকো, সুজা, মুরাদ,

সুলতান মহম্মদ, জাহান শা, সবাই তখৎ-এ-তাউসের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। স্বপ্ন দেখলেন তার জ্যেষ্ঠপুত্র আজুদ্দিন তাকে বধ করতে আসছে। তার চিৎকারে লালকুঁয়ার ছুটে এলেন। সান্ত্বনা দিয়ে বাদশাহর মিথ্যা ভয়কে প্রশমিত করে তিনি বললেন—'চল সমাট আমরা এই রাজত্বের অভিনয় ছেড়ে দিয়ে দূরের কোন পাহাড়ে পল্লীতে গিয়ে নিভৃতে শান্তিতে বাস করি।' সম্রাটের উত্তর 'বাবরশাহের বংশধরদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কেউ রাজত্ব করতে করতে সিংহাসন ছেড়ে পালিয়ে গেছে বলে শুনিনি।' অবশেষে জুলফিকর খাঁ আসেন এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে জিন্নৎউন্নিসা ও ওমরাহদের ষড়যন্ত্রের কথা আলোচনা হয়। অবশেষে আজুদ্দিনকে কেন্দ্র করে এই বিদ্রোহ দানা বাঁধতে পারে চিন্তা করে আজুদ্দিনকে ডেকে পাঠান হল। কারাগারই সিংহাসনে ওঠার প্রথম ধাপ—ঘোষণা করে বাদশাহ আজুদ্দিনকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। এইখানেই প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি খুবই ঐতিহাসিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জনসাধারনের জাহান্দার শাহ এবং ইমতিয়াজ মহলের সম্মান সম্পর্কে যা ভাবনা চিন্তা তাও খুব স্বাভাবিক। নানা ঘটনাকে সুন্দরভাবেই এই দৃশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে নাটক চলেছে ইতিহাসের ছায়া এড়িয়ে নাট্যকারের নির্দ্দেশে। তাই জাহান্দার শাহ এক অর্দ্ধোন্মাদ আর ইমতিয়াজ মহল অতি ভাল মানুষ। পাগড়ীহীন বা উষ্ণীষহীন রাজদরবারে চাবুক হাতে প্রবেশ করিয়ে নাট্যকার জাহান্দার শাহের যে চরিত্রের আভাষ দিয়াছেন তা সুরু থেকেই ভুল পথে নাটককে নিয়ে গেছে। এইখানে বলে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, মোগল দরবারের সমাজ ছিল অত্যন্ত রক্ষনশীল, নিয়মতান্ত্রিক এবং অনুষ্ঠান মান্যকারী। ছত্রপতি শিবাজী 'বুনো' আখ্যা পেয়েছিলেন তার অনিয়মিত ব্যবহারে। অনুষ্ঠানের ঘুর্ণিতে বাদশা ঔরঙ্গজীব তাকে সব থেকে বেশী অপমানিত করেছিলেন। সুতরাং জাহান্দার শাহর পক্ষে উষ্ণীষহীন ও চাবুক হাতে দৌড়ে বেড়াবার অবকাশ কোথায়? দেওয়ান-ই-আমে বাদশার আসনে আসবার পথ ও প্রকোষ্ট ভিন্ন। তেমনি দেওয়ান-ই-খাসেও মাত্র উচ্চপর্য্যায়ের কর্মচারী বা ওমরাহই বাদশার কাছাকাছি যেতে পারতেন। প্রকাশ্য দরবারে প্রধানা বেগমের প্রবেশ আর এক অসম্ভব ঘটনা। বাংলাদেশের

ব্রাহ্মমহিলাগণ বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদে মাত্র পর্দার বিলোপ করেন। দুটি মহাযুদ্ধ প্রয়োজন হয় রক্ষণশীল হিন্দু মহিলাদের পর্দাকে অস্বীকার করতে। দরবারে বেগমের প্রবেশ একটি খাঁটি ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তির বাংলা থিয়েটারী চিন্তা।

জিন্নতউন্নিসা বেগমের যে ঘটনা নাট্যকার ব্যক্ত করেছেন, ইতিহাসে তার উল্লেখ নাই এবং তা একান্ত অস্বাভাবিক। লালকুঁয়াবের ঐতিহাসিক চরিত্রের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে এমন ঘটনা ঘটলে তিনি জিন্নৎউন্নিসাকে শাস্তি দিতে দ্বিধা করতেন না এবং জাহান্দার শাহ লালকুঁয়াবের হুকুম বিনা দ্বিধায় মেনে চলতেন। মনে রাখতে হবে যে, এই সময় জিন্নতউন্নিসা বেগমের বয়স ৬৯ বছর (জন্ম ১৬৪৩ খ্রীঃ)। রাজনীতির পঙ্কের মধ্যে না গিয়ে এই সময় অবসর জীবনযাপন করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। তিনি তাই করেছিলেন বলেই ইতিহাসে, তাঁর কোন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের উল্লেখ নাই। আরো নয় বছর তিনি বেঁচেছিলেন (মৃত্যু ১৭২১ খ্রীঃ) যার মধ্যে দিল্লীর রাজনীতি অনেকবার উলটপালট হয়েছে কিন্তু জিন্নতউন্নিসা বেগমের কোন সংবাদই ঐতিহাসিক হয়ে ওঠেনি। জিন্নতউন্নিসার ইমতিয়াজমহল বেগমকে প্রকাশ্যে অপমান করা যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অসম্ভব লালকুঁয়াবের তাকে ক্ষমা করা। জাহান্দার শাহর রক্তবন্যা করার ইচ্ছা নাট্যকার শুনিয়েছেন দেখে সন্দেহ হয় যে জাহান্দার শাহর ভয়ঙ্কর ভ্রাতৃনাশা যুদ্ধ সম্বন্ধে বোধহয় নাট্যকার অবহিত নন। জজোএর যুদ্ধে জয়ী হবার পর ভাই ও ভাইপোদের ছিন্ন মুণ্ড যখন বাহাদুর শাহের সামনে রাখা হল তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। কঠিন ভর্ৎসনা করেছিলেন সেনানায়কদের। বলেছিলেন যুদ্ধে শত্রু হলেও এরা তার ভাই ও ভাইপো তাদের ছিন্ন শির দেখে তাঁর আনন্দিত হবার কোন কারণ নাই। মুণ্ডগুলি দেহের সঙ্গে জুড়ে কবরস্থ করার ব্যবস্থা হয়েছিল অবিলম্বে। আর সেই পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র জাহান্দারশাহ যুদ্ধে নিহত তার ভাই ও ভাইপোদের দেহ রাভীনদীর বালির উপর তিনদিন উলঙ্গ অবস্থায় ফেলে রেখেছিলেন। নাট্যকারের জাহান্দার শাহর চরিত্রের পরিকল্পনা যে কত ভুল তা এখানেও প্রমাণিত হচ্ছে।

বাদশাহ গাইয়ে বাজিয়েদের ডেকে নিজে নাচতে আরম্ভ করলেন এবং

কিছুক্ষণ পর নিজেই তাদের মারধর করলেন। তখন ইমতিয়াজ বললেন 'তুমি বড় রসভঙ্গ কর'। প্রকৃত ঘটনা যে বিপরীত তা আমরা আগেই বর্ণনা করেছি। বাদশাহই ইমতিযাজের উন্মত্ত সঙ্গীদের হাতে উৎপীড়িত হতেন এবং ইমতিযাজের ভয়ে সব লাঞ্ছনা সহ্য করতেন। অবশেষে যাত্রীপূর্ণ নৌকাকে জলে ডোবাবার ঘটনাকেও প্রক্ষিপ্ত করা হইযাছে। ইমতিযাজ ইতিহাসে বারবার বাদশাহের উপর তার পরিপূর্ণ কর্তৃত্বের প্রমান রেখেছেন। নাটকে বাদশাহ ইমতিয়াজের আনন্দের জন্য নিজের খামখেয়ালীপনা চরিতার্থ করেছেন।

তৃতীয় দৃশ্যে জিন্নতউন্নিসা বেগমের বাড়ীতে ষড়যন্ত্র আদৌ অসম্ভব নয়। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে আলমগীর কন্যা তাঁর দীর্ঘ অবসর জীবনের কখন রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন এমন প্রমাণ পাওযা যায না। ইচ্ছা করলে জিন্নতউন্নিসা দিল্লীর ইতিহাসে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। মারাঠা ছত্রপতি সাহু তাঁকে জননীর মত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। তার আদেশে মারাঠা নায়কগণ দিল্লীজযে অগ্রসর হতে পারতেন এবং তাতে ভবিষ্যৎকালের হিন্দুপৎ বাদশাহী স্থাপনের পরিকল্পনা আরো জোরদার হত। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে তা হয়নি। জিন্নতউন্নিসা বেগম নিশ্চিন্ত মনে অবসর জীবন যাপন করেছেন। বাদশাহীর ভাগ্য বিপর্য্যয তাঁর মনে কি তরঙ্গ তুলেছিল তা বোঝবার কোন উপায নাই। জাহান্দার শাহের বিরুদ্ধে এই হীন ষড়যন্ত্রে জিন্নতউন্নিসা বেগমের মহান চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা হয়েছে—এটা ইতিহাস অজ্ঞানতার ফল। এই অদ্ভুত ষড়যন্ত্রে জাহান্দার শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র আজুদ্দিনকে সম্রাট করার পরিকল্পনা আরো অসম্ভব কারণ ভাইদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন তাঁর পিতার পক্ষে। অন্য দুইজন অর্থাৎ ইজুদ্দিন ও আজিজুদ্দিন (অন্যনাম মৈজুদ্দৌলা) তখন কারাগারে।

পট পরিবর্তনে দেওয়ান-ই-খাসের দৃশ্যে বাদশাহের মধ্যরাত্রে তখত-এ-তাউসের চারপাশে বিচরণ করে পূর্বসূরীদের অশরীরী আত্মা দেখা ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের আলমগীর নাটকের স্বপ্নদৃশ্যের অনুগামী।

আজুদ্দিনকে কারাগারে নিক্ষেপও অনৈতিহাসিক। কারণ—একমাত্র তাঁকেই লালকুঁয়ার পছন্দ করতেন এবং আজুদ্দিন তার পিতার জীবদ্দশায় সর্বদা

মুক্ত ছিলেন। এই দৃশ্যের সব থেকে অসম্ভব কথা লালকুঁয়ারের সিংহাসন ছেড়ে পাহাড়ে পল্লীতে বাস করার ইচ্ছা। পূর্বে আলোচিত লালকুঁয়ার প্রসঙ্গ পাঠ করলেই বোঝা যাবে এই সংলাপ কত অসম্ভব। বাদশাহ ও বাদশাহীকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করাই ছিল লালকুঁয়ারের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কেন তিনি এটা করলেন বা করতেন তার কারণের অনুসন্ধান ও ব্যাখান চমৎকার নাটক হতে পারত। কি উদ্দেশ্যে লালকুঁয়ার বাদশাহ ও বাদশাহীকে এত হীন করে দিলেন, এত অসম্মানিত করলেন, নাটকের মূল বক্তব্য হতে পারত। বেগম নুরজাহান হবার জন্য লুব্ধ ইমতিয়াজ মহলের 'মুখে' তাই দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে যাবার সংলাপ অসম্ভব এবং ইতিহাস বিরোধী। জুলাই থেকে নভেম্বর ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ এক ছেদহীন বিলাসিতার ক্লেদাক্ত কর্দমস্রোতে। পঞ্চমাস জুড়ে তার প্রাবাল্য। অবশেষে ডিসেম্বরের সুরুতে যুদ্ধের দামামা নির্ঘোষে স্বপ্নভঙ্গ। এর মধ্যে পালিয়ে যাবার সংলাপের যেমন অবকাশ নাই তেমনি বাদশাহের পালিয়ে যাবার ইচ্ছার কোন মানে নাই। নাট্যকার যে ইংরাজ আমলের লোক তার প্রমাণ রেখেছেন জমিদারীর রাজস্ব আদায়ের ওপর বাদশাহীকে নির্ভর করিয়ে। বলেছেন জমিদাররা যে রাজস্ব দিচ্ছেনা এটাও একপ্রকার বিদ্রোহ। বলাবাহুল্য এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। মোঘল সাম্রাজ্যের রাজস্ব আদায় পদ্ধতি জমিদারের উপর নির্ভর করত না তার জন্য বিশদ ব্যবস্থা ছিল। এ বিষয়ে আলোচনা যথাসময়ে করা হবে।

দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য। দ্বিতীয় দৃশ্য দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাস। ইমতিয়াজ মহলের ভ্রাতা নূতন আমীর নিযামত খাঁ কলাবন্ত মাতাল অবস্থায় প্রবেশ করলেন। ইমতিয়াজ মহল অত্যন্ত চিন্তিত কারণ সম্রাটকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। সভাসদগণ খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। অবশেষে সম্রাট নিজেই উপস্থিত হলেন। জানা গেল গতরাত্রের মদ্যপান অভিযানের পর সকলে এত উন্মত্ত হয়েছিলেন যে বাদশাহ যে রথের ওপর নিদ্রিত অবস্থাতেই আছেন তা না দেখে তাকে শুদ্ধ রথশালায় রথ (গোশকট) রেখে চালক চলে যায়। এই দৃশ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে সম্রাট বলেছেন তিনি বয়েল (বলদ) দের মাঝে সারারাত্রি নিদ্রিত ছিলেন। জুলফিকর খাঁ, জিন্নতউন্নিসা বেগমের ষড়যন্ত্রের খবর আনলে বাদশাহ তা বিশ্বাস করতে রাজী হচ্ছেন না। (অথচ

আজুদ্দিনকে গত দৃশ্যেই কারাগারে পাঠিয়েছেন)। অবশেষে সমস্ত বিষয়ে অবগত হযে ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক কোকলতাস খাঁকে ডেকে পাঠাচ্ছেন। কোকলতাস খাঁ বা আবুমুরাদ সম্রাটের দুধ-ভাই এবং ছোটবেলার সঙ্গী। তাকে উজির করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাদশাহ কথার খেলাপ করায কোকলতাস খাঁ বাদশাহ এবং তার উজিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হযেছেন। এই দৃশ্যে সম্রাট কোকলতাস খাঁয়ের হাতে ছুরি দিয়ে নিজের বক্ষ উন্মোচন করে তাকে হত্যা করতে বলছেন। অনুশোচনায় যখন কোকলতাসের মন পূর্ণ হল তখন তার ওপর সৈনাপত্য দিয়ে তাকে ফারুকসিয়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন। মধ্যমপুত্র ইজুদ্দিনও ষড়যন্ত্রকারী এবং পিতৃহত্যায ইচ্ছুক জেনে তাকেও যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন কোকলতাস খাঁয়ের সঙ্গে। সৈন্যদের বেতন দেবার জন্য উজিরকে আদেশ করছেন রাজকোষে যখন অর্থ নাই, তখন যত সোনা রূপার পাত্র আছে কেটে কেটে সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দাও। সম্রাট আদেশ করলেন জুলফিকর খাঁ এবং কোকলতাস খাঁ যেন ফারুকসিয়রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বন্দী করে নিয়ে আসেন, তিনি তখন এই তখৎ-এ বসে তার শাস্তি বিধান করবেন। কারণ সিংহাসনই তার রক্ষাকবচ সেখানে তাকে বসে থাকতে দেখে শত্রুপক্ষ 'প্রহৃত কুকুরের মত পালিয়ে যাবে।' কিন্তু তা হল না, উজির ও সেনাপতির উপদেশে সম্রাটকে যুদ্ধযাত্রা করতে হল। যাবার সময উভয়কে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলেন সম্রাট। যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক তাকে যেন কেউ পরিত্যাগ করে না পালান। তাদের প্রতিজ্ঞায় নিরুদ্বিগ্ন হযে সম্রাট জয়লাভ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্য আবার জিন্নতউন্নিসার গৃহে। জিন্নতউন্নিসা বেগম কোকলতাস খাঁ ও ইজুদ্দিনকে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করছেন এবং তারা চলে যাবার পর দূত মারফত ফারুকসিয়রের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছেন। এইখানে সকলেই জানত পারছেন যে বিজয়ী ফারুকসিয়র সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সৈন্য সংগ্রহ করে সদলে যাত্রা করেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য সম্পূর্ণ ইতিহাস বিরোধী। জিন্নতউন্নিসা বেগমের ষড়যন্ত্রের গল্প যে অলীক তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ইজুদ্দিন কারাগারে সুতরাং তার সঙ্গে সংলাপের অবকাশ ছিল না। দ্বিতীয় দৃশ্যে

সম্রাটের হারিয়ে যাবার ঘটনা তথা তাঁর এবং তাঁর বেগমের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ঐতিহাসিক সত্য। কোকলতাস খাঁনের ষড়যন্ত্রের কোন নিদর্শন ইতিহাসে নাই। তাকে নির্বুদ্ধি কিন্তু জাহান্দারের প্রতি অনুগত বীর যোদ্ধা বলেই বর্ণনা করা হযেছে। আগ্রা যুদ্ধে ইজুদ্দিন যায়নি কারণ সে তখন কারাগারে বন্দী। বাদশাহের যুদ্ধে না যাবার ইচ্ছার কোন নজির নাই। তখনকার যুদ্ধে সর্বদা প্রধান ব্যক্তিদের উপস্থিতি প্রয়োজন হত। আলমগীর বাদশাহের বিভিন্ন যুদ্ধে, জজৌএর রণক্ষেত্রে, এমন কি জাহান্দার শাহের ভ্রাতৃবিরোধী যুদ্ধে সবদা প্রধান বিরোধীদের দেখা গেছে। কাজেই যুদ্ধক্ষেত্রে জাহান্দার শাহের উপস্থিতি তৎকালিন যুদ্ধনিয়মের ব্যতিক্রম নয়। দেখা যাচ্ছে জুলাই থেকে নভেম্বর এই পাঁচমাসের ঘটনা প্রথম অঙ্কের প্রতিপাদ্য। দ্বিতীয় অঙ্ক ডিসেম্বর মাসের ঘটনা।

তৃতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্য আগ্রার কাছে যুদ্ধক্ষেত্র, সম্রাটের শিবিরে নিয়ামৎ খাঁ কলাবন্ত মূলতানের শাসনকর্ত্তার পদের জন্য সম্রাটকে খোসামোদ করছেন। যুদ্ধের খবর দিচ্ছেন যে, আবুমুরাদ কোকলতাস খাঁ প্রচণ্ড যুদ্ধে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে বারবার হারিযে দিয়েছেন। নিয়ামৎ খাঁর মুখেই নাট্যকার জানাচ্ছেন যে, উজির জুলফিকর খাঁ যুদ্ধ না করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। এক জ্যোতিষী সম্রাটকে জানাচ্ছেন যে এ যুদ্ধে তারই জয় হবে। সম্রাট মহানন্দে নাচগান করার আদেশ দিচ্ছেন এমন সময় কোকলতাস খাঁয়ের প্রচণ্ড আহত হবার সংবাদ এল। একটু পরেই জুলফিকর খাঁ কোকলতাসের মৃত্যু সংবাদ বহন করে নিয়ে এলেন। তার অনুরোধ সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হন। কোকলতাস খাঁয়ের মৃত্যুতে সম্রাট স্বাভাবিকভাবেই খুব উদ্বেলিত। কিন্তু বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ যোদ্ধা সম্রাট জাহান্দার শাহ যুদ্ধে গেলেন না। ইমতিয়াজ মহল উপদেশ দিলেন পালিয়ে যেতে। সম্রাট তাতেও রাজী হলেন না বটে কিন্তু ইমতিয়াজ মহলকে তীর্থ দর্শন করাবার এইটাই সর্বাপেক্ষা সুসময় বিবেচনা করে ইমতিয়াজ মহলের পরদা ঘেরা হাওদার হাতিতে চেপে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করলেন। জুলফিকর খাঁ বাদশাহকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যেতে এসে সম্রাটের এই পলায়ন সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনিও দিল্লী অভিমুখে সদলে পলায়নের সংকল্প ঘোষণা

করলেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে জিন্নতউন্নিসা জাহান্দার শাহের পরাজয়ের খবরে উল্লসিত হয়েছেন এবং আরও খুসী হয়েছেন কারণ দূতমুখে ফারুকসিয়র, লালকুঁয়ার ও জাহান্দার শাহকে বন্দী করে তার পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জিন্নতউন্নিসার অর্থ সাহায্যের জন্যেও ফারুকসিযব তাকে ধন্যবাদ জানিযেছেন। একটু পরেই জুলফিকর খাঁর পিতা বৃদ্ধ রাজনৈতিক আসাদ খাঁ জিন্নতউন্নিসার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, উদ্দেশ্য পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাওয়া, তিনি বললেন যে জাহান্দার শাহ লালকুঁযার সহ দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেছেন। জিন্নতউন্নিসা জানালেন যে এ খবর ভুল কারণ বাদশাহ ও লালকুঁয়ার দিল্লীরই আশেপাশে লুকিযে আছেন। আসাদ খাঁ যদি লালকুঁযারকে তাঁর পাযের কাছে এনে ফেলতে পারেন তবেই তিনি জুলফিকর খাঁয়ের জন্য প্রাণ ভিক্ষা চাইবার প্রতিশ্রুতি দিতে পাবেন।

দ্বিতীয দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক এবং এক মহান মোগল মহিলাকে বিনা কারণে হীন করা হযেছে। নাটকেও এই বিসদৃশতা স্পষ্ট। জিন্নতউন্নিসা বেগম এই ষডযন্ত্রে অংশীদার হলে আসাদ খাঁ সহজেই বন্দী লালকুঁযারকে তার পায়ের কাছে ফেলে দিযে পুত্রের জীবন ভিক্ষা নিতে পারতেন, তা তিনি করেননি। জিন্নতউন্নিসা বেগমের ফারুকসিযরকে অর্থ সাহায্য করা বা নূতন বাদশাহের তাঁকে কোন প্রতিশ্রুতি দান অলীক এবং অন্যায় কল্পনামাত্র। বরঞ্চ এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের ঘটনা ইতিহাস অনুযায়ী। ৩০শে ডিসেম্বর ১৭১২ খ্রীঃ আগ্রার কাছে সামুগড়ে জাহান্দার শাহ ছাউনি ফেলেন। এইখানেই তাঁর পিতামহ আলমগীর দারাসুকোকে পরাজিত করেছিলেন ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। জাহান্দার শাহের যা সৈন্যবল ছিল তাতে তার জয় সম্পর্কে কারু মনে সন্দেহ জাগেনি। কিন্তু সর্বদা বাজারের স্ত্রীলোক লালকুঁয়ার দ্বারা প্রভাবিত এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ কর্তৃক পরিবৃত থেকে সম্রাটের কাণ্ডজ্ঞানও লুপ্ত হয়েছিল। সম্রাটের অনুপস্থিতিতে যুদ্ধের ব্যূহ রচনা প্রণালী বা আক্রমণধারা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হল না। উজির জুলফিকর খাঁ এবং সেনাপতি কোকলতাস খানের মধ্যেকার পুরাতন বিরোধ কেবল আরো স্পষ্ট আকার ধারণ করল।[১৪] ১০ই জানুয়ারী ১৭১৩ খ্রী যুদ্ধ সুরু হল। জুলফিকর খাঁ যে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন তা ঠিক নয় তবে সর্বজনগ্রাহ্য কোন পরিকল্পনা না থাকায় বিভিন্নভাবে যুদ্ধে

লিপ্ত হয়েছেন। ঘনবটায় যখন যুদ্ধ চলেছে তখন চূড়ামন জাঠ নামে ফারুকসিয়র পক্ষীয় এক পেশাদার লুণ্ঠনকারী পেছন দিক থেকে সম্রাটের শিবির আক্রমণ করে লুণ্ঠন সুরু করে। জাহান্দারশাহ তাই দেখে হাতিতে চড়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর তার হাতিকে আহত করে ক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। জাহান্দার শাহ তখন হাতি থেকে নেমে ঘোড়ায চডলেন এবং জুলফিকর খাঁকে সাহায্য করার জন্য একদল সৈন্যবাহিনী নিযে আগিযে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। বাবর বংশধর এই আলমগীর পৌত্রের বাদশাহী পাবার পর এইটাই প্রথম ও শেষ বীবত্ব। তখনি লালকুঁযার উপস্থিত হয়ে তার পর্দা ঢাকা হাওদায সম্রাটকে তুলে নিযে দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করলেন। নিজের ইচ্ছায পালিযে যাবার দায়িত্বের অধিকাবী হবার সুযোগও জাহান্দার শাহ পেলেন না।[১৫] অবশেষে হাতি ছেড়ে এক সাধারণ বয়েল গাডীতে চেপে দাড়িগোফ চেঁছে ফেলে দিযে সম্রাট আর লালকুঁযার মথুরার পথে ১৫ই জানুযাবী দিল্লী পৌছলেন। লালকুঁযাব দিল্লীতে তার নিজের বাডীতে চলে গেলেন আর সম্রাট জাহান্দার শাহ সোজা জুলফিকব খাঁর পিতা আসাদ খাঁর বাডীতে উপস্থিত হলেন।[১৬]

তখৎ-এ-তাউস নাটকের চতুর্থ অঙ্ক চাবটি দৃশ্যে বিভক্ত, প্রথম দৃশ্য তাল-পাতের সবাই। মাথা ন্যাড়া, দাড়ি গোঁফ কামান সামান্য বেশে জাহান্দার শাহ ও বুর্খায সর্বাঙ্গ ঢাকা লালকুঁযার। ক্ষুধার জ্বালায পোড়া রুটি ভাগ করে খাচ্ছেন দেখান হয়েছে। যুদ্ধে হেরে যাবাব জন্য কোন অনুশোচনা দেখা গেল না, শুধু দেখা গেল লালকুঁয়ারের প্রতি তাঁর অনির্বচনীয প্রেম আর ঈশ্বরের প্রতি একান্ত আনুগত্য। দ্বিতীয দৃশ্য আসাদ খাঁর বাড়ী। আসাদ খাঁ ও তার পুত্র জুলফিকর খাঁ আলোচনা করছেন। জুলফিকর খাঁ জানাচ্ছেন যে, দিল্লীতে ফিরলে তার বিপদ হবে জেনেও তিনি একমাত্র বৃদ্ধ পিতার কথা চিন্তা করেই এখানে এসেছেন। আসাদ খাঁ জানালেন যে জাহান্দার শাহ দিল্লী এলে সোজা তার প্রাসাদেই আসবেন। একথা আলোচনা করতে করতেই জাহান্দার শাহ 'হাস্য মুখে প্রবেশ' করে বললেন গোঁফদাড়ি তিনি স্বেচ্ছায ত্যাগ করেছেন কিন্তু রাজ্যটা এখনও ত্যাগ করেন নি। জাহান্দার শাহ জুলফিকর খাঁকে যুদ্ধ না করে দাঁড়িয়ে থাকার অভিযোগ করলেন। এই

অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে জুলফিকর খাঁ জানালেন যে কোকলতাস খাঁনের সঙ্গে একত্রে যুদ্ধ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। (ঐতিহাসিক ঘটনা যে অন্যরূপ তা আমরা পূর্ব পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছি।) তারপর বাদশাহ স্বেচ্ছায় কেল্লা অভিমুখে চললেন সেটা শত্রুপক্ষের দখলে আছে জেনেও। বললেন 'ইমতিয়াজ আগেই সেখানে গেছে। সে হয়তো আমার জন্য উৎকণ্ঠিত হচ্ছে।' জুলফিকর বললেন—উন্মাদ। তার পিতা বললেন ফাররুকসিয়রের হাতে যদি আমরা ওকে আর লালকুঁয়ারকে সমর্পণ করতে পারতাম তাহলে হয়তো তোমার উজিরি ও আমার প্রাণ অক্ষুণ্ণ থাকত। তৃতীয় দৃশ্য পুরাতন দিল্লীর ময়দানে শিবির। ফাররুকসিয়র রাজকোষ শূন্য দেখে চিন্তিত। তার সেনাপতি হুসেন খাঁ জমিদারদের বুঝিয়ে দিতে বলছেন যে বাদশাহ বদল হয়েছে তাহলেই রাজকোষ পূর্ণ হয়ে উঠবে। জুলফিকর খাঁ ও আসাদ খাঁকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। জাহান্দার শাহের খোঁজ হলে জানা গেল যে তিনি দেওয়ান-ই-খাসে বসে সম্রাটের ভূমিকা অভিনয় করছেন। আবদাল্লা খাঁ উপদেশ দিলেন যে 'আর বেশিদিন তাকে অভিনয় করতে দেওযা সম্ভব হবে না। পাঞ্জাবে শিখ, আর আগ্রায় জাঠ ও সমস্ত হিন্দুস্থান জুড়ে মারাঠা প্রবল হয়ে উঠেছে। তাদের দমনের ব্যবস্থা করতে হবে। জাহান্দার শাহ জীবিত থাকলে ভবিষ্যতে আরো গোল বাঁধবার সম্ভাবনা।' অবশেষে আসাদ খাঁ ও জুলফিকর খাঁ এলে ফাররুকসিয়র তাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করলেন এবং জুলফিকর ভাইকে পরে পাঠিয়ে দেবার আশ্বাস দেবার পর আসাদ খাঁকে আবার সসম্মানে বিদায় দিলেন। জুলফিকর খাঁ এলে তাঁকে প্রথমে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হল তারপর এক আলাদা তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে আটদশজন কালমাক ক্রীতদাস জুলফিকর খাঁকে বধ করল। ফাররুকসিয়র হুকুম করলেন —এখুনি গিয়ে আসাদ খাঁর বাড়ী আক্রমণ করে তার সমস্ত ধনরত্ন প্রাসাদে নিয়ে আসবে আর সেই শয়তান বৃদ্ধকে দূর করে রাস্তায় বার করে দেবে।

চতুর্থ ও শেষ দৃশ্য দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাস। প্রথমেই আসাদ খাঁর বাড়ী লুঠের খবর দেওয়া হয়েছে। কুড়িখানা বয়েল গাড়ী ভর্তি মোহর ও অলঙ্কার তার বাড়ীতে পাওয়া গেছে শুনে জাহান্দার শাহ অবাক হচ্ছেন। পরিপূর্ণ উন্মাদের মতো সম্রাট জাহান্দার শাহ জুলফিকর খাঁর খোঁজ করছেন,

কোকলতাস খানকে উজিরী দেবার কথা আলোচনা করছেন। ইযাব খাঁ এসে বলেন আপনি সম্রাজ্ঞীকে নিযে এখুনি পালান। লালকুঁযাব প্রতিধ্বনি তোলে তাই চলুন সম্রাট। সঙ্গে সঙ্গে জাহান্দাব শাহ মক্কায গিযে জীবনেব শেষ দিনগুলো কাটাবাব সংকল্প ঘোষণা কবেন। কিন্তু যাওয়া হল না। জাহান্দাব শাহ বলেন 'আমাকে সিংহাসনে বসে থাকতে দেখলে তাবা প্রহৃত কুকুবেব মত মাটিতে লুটিযে পডবে।' লালকুঁযাবও সম্রাটকে ছেডে পালিযে যেতে চাইলেন না। ইতিমধ্যে ফাৰুকসিযব সসৈন্য প্রবেশ কবলেন। সঙ্গে আনলেন জুলফিকব খাঁব মৃতদেহ। সম্রাট উন্মাদেব মতো ব্যবহাব কবতে লাগলেন, একবাব বললেন, তিনিতো জুলফিকব খাঁব প্রাণদণ্ড দেননি। তাবপব আবুমুবাদ কোকলতাস খাঁকে ডাকলেন জুলফিকব খাঁব হত্যাকাবীকে শাস্তি দিতে। তাকে ধবতে এলে দৌডে গিযে তখৎ-এ-তাউসএ চেপে বসলেন। প্রহবীবা টেনে নিযে গেল। জাহান্দাব শাহ তখন চাবুক চালিযে আত্মবক্ষাব চেষ্টা কবতে লাগলেন। তখন বস্তাধস্তিব মধ্যে গলা টিপে তাকে হত্যা কবা হল। মৃতদেহ দেখে ভীত ফাৰুকসিযবকে আবদাল্লা খাঁ জানাচ্ছেন--আপনাব পূর্বপুরুষ প্রায সকলেই মৃতদেহেব পাহাড অতিক্রম কবেই তখতে বসেছিলেন। তাবপব সৈযদ ভ্রাতাদেব হাত ধবে ফাৰুকসিযব সিংহাসনে আবোহন কবলেন। চাবিদিকে ধ্বনি উঠল 'জয সম্রাট ফাৰুকসিযবেব জয।' এই ধ্বনিব মধ্যেই অবশেষে নাটক শেষ হল। তখৎ-এ-তাউসেব পবিসমাপ্তি ঘটল। তামাম সুদ।

প্রথম দৃশ্যটি ছাডা অন্য তিন দৃশ্যকে কোনক্রমেই ঐতিহাসিক বলা যায় না। ১০ই জানুযাবী সামুগডে জাহান্দার শাহ পবাজিত হলেন ও ১৫ই জানুযাবী ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে পৌছলেন, ক্ষুধাব জন্য পোডা রুটি খাওযাব ঘটনা অসম্ভব নয়। ১৫ই জানুযাবী জুলফিকব খাঁ সসৈন্যে দিল্লী ফিবলেন। দিল্লীতেও তাঁব অধীনে যথেষ্ট সৈন্য ছিল। দিল্লীর কেল্লাব ভিতব থেকে ফারুকসিয়রের সঙ্গে আর একবাব যুদ্ধ কববার সংকল্প নিযেই জুলফিকব খাঁ দিল্লী ফিরেছিলেন নাটকে কথিতমত তার বৃদ্ধ পিতাকে দেখবার জন্য আসেন নি। দিল্লীতে ফারুকসিয়বকে বাধা দিতে যে তিনি সক্ষম হবেন, সে বিষযে তার মনে দ্বিধা ছিল না এবং সম্ভবত তিনি তা করতেন। একটু পরেই একজন

মাত্র দেহরক্ষী সঙ্গে করে বাদশাহ জাহান্দার শাহের আসাদ খাঁর গৃহে উপস্থিতি পিতাপুত্রের মাঝে তুমুল তর্ক সৃষ্টি করল। বুদ্ধিমান জুলফিকর স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে নূতন বাদশাহ ফারুকসিয়র তাকে জাহান্দার শাহের থেকেও বেশী ঘৃণা করেন। ফারুকসিযরের পিতা আজিম-উস-সান ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু এবং তাদের মৃতদেহের অপমানের জন্য জুলফিকব খাঁ দাযী। কাজেই নূতন বাদশাহ আর যাকে ক্ষমা করুন জুলফিকর খাঁকে করবেন না। তাই জুলফিকর খাঁর পরিকল্পনা হল জাহান্দার শাহকে নিযে প্রথমে মুলতান ও পরে কাবুল পলায়ন। তার সঙ্গে যা সৈন্যসামন্ত বা অশ্ব ছিল তাতে এই কাজ সহজেই সাধিত হবে। পবে সুসময় দেখে নূতন সৈন্যদল সংগ্রহ করে দিল্লী আক্রমণ করে আবার জাহান্দার শাহকে বাদশাহ বানিযে তিনি আবার দেশের সর্বময় কর্তা হয়ে রাজ্য শাসন করবেন। কিন্তু বৃদ্ধ আসাদ খাঁ এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। তিনি প্রস্তাব করলেন বিশ্বাসঘাতকতা করে জাহান্দার শাহকে ধরিযে দিযে এই কাজের মূল্য হিসাবে নিজের প্রাণভিক্ষা চেযে নিতে।

১৫ই জানুয়ারী জাহান্দার শাহ এসেছিলেন আসাদ খাঁব বাড়ী। পাঁচদিন পর ২০শে জানুযারী ১৭১৩ খ্রীঃ জাহান্দার শাহকে পাযে শেকল পরিযে সামান্য অপরাধীর মত রাস্তা দিযে নিযে যাওয়া হল। তাকে রাখা হল ত্রিপোলীযা বুরুজের ওপরতলায যেখানে সাধারণ চোর ডাকাতদেব কযেদ করা হত। কেবল তার শেষ সনির্বন্ধ অনুরোধে লালকুঁয়ারকে তার সঙ্গে একই বন্দীশালায় থাকার অনুমতি দেওয়া হল। ফারুকসিযর ১৯শে জানুযারী (১৭১৩ খ্রীঃ) বাদশাহ ঘোষিত হলেন। মসজিদে মসজিদে পাঠ করা হল তার দীর্ঘজীবনের জন্য খুতবা। শুক্রবারের বিশেষ উপাসনায উচ্চারিত নাম হল বাদশাহ ফারুকসিয়র।[১৭]

তখৎ-এ তাউস নাটকের চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে বাদশাহ জাহান্দার শাহ স্বেচ্ছায় লাল কেল্লায় গেলেন। আসাদ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি ধরা পড়লেন এমন কথা কোথাও নাই। আরো বলা হয়েছে যে ইমতিয়াজ মহল লালকেল্লায় জাহান্দার শাহের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এই ঘটনাগুলি সবই কাল্পনিক। ইতিহাসের বিবরণ অন্যরূপ তা আগেই বলা হয়েছে। তৃতীয় দৃশ্যও কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত।

২০শে জানুয়ারী ১৭১৩ খ্রীঃ যেদিন জাহান্দার শাহ ও লালকুঁয়ার বন্দী হলেন, আসাদ খাঁ একপত্র লিখলেন নূতন উজির সৈয়দ আবদাল্লা খাঁর কাছে। এই চিঠিতে তিনি তার নিজের এবং তার পুত্রের আনুগত্যের আশ্বাস দিলেন। ২২শে জানুযারী সৈযদ আবদাল্লা খাঁ দিল্লী প্রবেশ করলেন। প্রথমেই নূতন উজির পুরাতন উজির আর তার বৃদ্ধ পিতাকে সাহায্য করার আশ্বাস দিলেন। নূতন বাদশাহ স্বযং ১০ই ফেব্রুয়ারী দিল্লী প্রবেশ করলেন। পরদিন ১১ই ফেব্রুয়ারী বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাতের হুকুম পাওয়া গেল। আসাদ খাঁ তার পুত্রের দুইহাত বেঁধে বাদশাহের কাছে নিযে গেলেন। বাদশাহ আসাদ খাঁকে "ভাই" বলে আলিঙ্গন করে পাযের তলা থেকে তুলে মিষ্ট কথায় আপ্যাযিত করলেন। জুলফিকর খাঁকেও 'ভাই' বলে হাতের বাঁধন খুলে দিলেন, আসাদ খাঁকে বিদায় দেবার পর। জুলফিকর খাঁকে বিচারাশালার তাঁবুতে নিযে যাওয়া হল। সেখানে তিনি ঢোকবামাত্র দুইশত সশস্ত্র যোদ্ধা তাকে সম্পূর্ণ ঘিরে দাঁড়াল। তারপর কালমাক দাসগন তাকে হত্যা করল। ঢাল বাঁধার দড়ি তার গলায লাগিয়ে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হল তারপর সকলে তার বুকের ওপর চেপে তার ধরাশাযী দেহ থেকে শেষ নিঃশ্বাসটুকু বার করে দিল। তাতেও সন্তুষ্ট না হযে একটা ছোরার আঘাতে তার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করা হল। তারপর পায়ে দড়ি বেঁধে তার দেহটাকে টেনে নিযে সম্রাট ফারুক-সিয়রের তাঁবুর সামনে রাখা হল। পিতাপুত্র উভযেরই বাড়ী ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল।[১৪]

তখৎ-এ-তাউসের তৃতীয দৃশ্যে নাটকীয় ঘটনা সব বাদ পড়েছে। জুলফিকর খাঁর আশা ও হতাশার মাঝে ২০শে জানুয়ারী থেকে ১১ই ফেব্রুয়ারীর জীবন নাটকে দেখাবার যে সুযোগ ছিল তা নাট্যকার সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন। এমনকি বিচার দৃশ্যের সম্ভাবনাকে তিনি কাজে লাগাতে পারেন নি। বিশেষ জাহান্দার শাহের মৃত্যু যেখানে বিশেষত্ব বর্জিত সেখানে জুলফিকর খাঁর হত্যা দৃশ্য নাটকের উচ্চতম উত্তেজনা (climax) সৃষ্টিতে সহায়ক হত। পরবর্তী দৃশ্যে জাহান্দার শাহের মৃত্যু নাটকের যোগ্য যবনিকা হতে পারত। কিন্তু নাট্যকার এই দৃশ্যকে অতি সাধারণভাবে বর্ণনা করে তৎকালীন জিঘাংসা পরিতৃপ্তির এক চমৎকার উদাহরণ দেখাতে অক্ষম হয়েছেন।

নাটকের চতুর্থ ও শেষ দৃশ্য যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক একথা বলাই বাহুল্য। জুলফিকর খাঁর হত্যার দিন রাত্রে ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৭১৩ খ্রীঃ ফারুকসিয়র জাহান্দার শাহকে হত্যার হুকুম নিজের হাতে লিখে পাঠালেন। ঘাতকদের কয়েদঘরে ঢুকতে দেখেই লালকুঁয়ার চীৎকার করে উঠে জাহান্দার শাহকে জড়িয়ে ধরলেন। লালকুঁয়ারকে টেনে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামান হচ্ছে তখন জাহান্দার শাহর গলা টিপে ধরা হল। বলিষ্ঠ এই ঔরঙ্গজীব পৌত্র তাতে মরছে না দেখে ভারী জুতো পায়ে মোগল সৈন্যরা তার দেহের বিশেষ স্থানে (অণ্ডকোষে) লাথির পর লাথি মেরে তাকে হত্যা করল। বাদশাহের এই বীভৎস মৃত্যুর বুঝি আর তুলনা হয় না। কিছুদিন পর এই একই ঘরে বাদশাহ ফারুকসিয়রকেও হত্যা করা হয়। (২৮শে এপ্রিল, ১৭১৯ খ্রীঃ) হত্যার পর জল্লাদকে ডাকা হল। সে আসতে অস্বীকার করলে হত্যাকারীরাই জাহান্দার শাহর মুণ্ডটা কেটে ফেলল। তারপর কবন্ধ আর মুণ্ডটা নিয়ে গিয়ে জুলফিকর খাঁর দেহের পাশে রাখা হল। লালকুঁয়ারকে সুহাগপুরার বেওয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। মৃত বাদশাহের পরিবারদের জন্য এই বিধবাভবনই ছিল থাকবার একমাত্র স্থান।

১২ই ফেব্রুয়ারী এক মিছিল বেরুল দিল্লীতে। প্রথম হাতির ওপর বর্শাফলকে জাহান্দার শাহের কাটা মাথা দ্বিতীয় হাতিতে তার কবন্ধ, তৃতীয় হাতিতে জুলফিকর খাঁর দেহ নীচের দিকে মাথা করে হাতির লেজে বাঁধা। চতুর্থ হাতিতে নূতন বাদশাহ ফারুকসিয়র। তিন দিন যমুনার বালির ওপর জাহান্দার শাহ আর তার উজিরের মৃতদেহ পড়ে থাকল। ১৪ই ফেব্রুয়ারী দেওয়া হল কবরস্থ করার আদেশ। ইতিমধ্যে আসাদ খাঁর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে রাস্তায় বার করে দেওয়া হয়েছে।[১৯]

তাই নিশ্চিন্ত মনে বলা চলে চতুর্থ দৃশ্য সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত ও কাল্পনিক। জাহান্দার শাহ কখনই জুলফিকর খাঁর মৃত্যু সংবাদ, আসাদ খাঁর দুর্ভাগ্য ইত্যাদির কোন খবরই জানতে পারেননি। লালকুঁয়ারকে তিনি জীবনের শেষ কয় বছর সমর্পণ করেছিলেন—কয়েদখানাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। লালকুঁয়ার সরে যাবার পরই তার জীবনান্ত হোল। লালকুঁয়ারের অদ্ভুত চরিত্রের ও কোন নিদর্শন নাটকে নাই। বাদশাহীকে নিজের বশে পাওয়া, বিবাহ না করা

প্রধানা বেগম নিঃসন্দেহে এক নাটকীয় চরিত্র। এই নাটকে তার কোন নিদর্শন নাই। জুলফিকর খাঁ কয়েক বছরে অসামান্য বুদ্ধির বলে ক্ষমতা লাভ করলেন আবার বুদ্ধির দোষেই তার পতন হোল। বিশ্বাসঘাতকতা করে তার জীবনে উন্নতি সুরু হয়েছিল, জাহান্দাব শাহকে ধরিয়ে দিয়ে আবার বিশ্বাসঘাতকতাতেই তার পতন হোল। এই চরিত্রেরও কোন আভাষ নাটকে নাই। নাটকে জিন্নতউন্নিসা বেগমের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করা হয়েছে। লালকুঁযাবেব জন্যই তিনি জাহান্দার শাহকে অপছন্দ করতেন। জাহান্দার শাহ লালকুঁযাবের প্ররোচনাতেই তার পিতৃস্বসার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন এবং তার খোঁজ খবব নেওয়া বন্ধ করেন। লালকুঁয়ার প্রকাশ্যেই এই সম্মানিতা বৃদ্ধার প্রতি অপমানজনক ব্যবহার করতেন।

তৃতীয় দৃশ্যে তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে বলা হয়েছে (১) পাঞ্জাবে শিখ, আগ্রায় জাঠ ও সমস্ত হিন্দুস্থান জুড়ে মারাঠারা প্রবল হয়ে উঠেছে। এবং (২) 'জমিদারদের বুঝিয়ে দেব যে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে জাহান্দার শার বদলে ফারুকসিয়র বসেছেন। রাজকোষ দুদিনেই অর্থে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।' এই দুইটি উক্তিতে নাট্যকার ভারত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। পাঞ্জাবে শিখ নবগঠিত শক্তিতে প্রবল হয়ে ওঠে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পরে। তার আগে শিখশক্তির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা মুছে গিয়েছিল। বান্দা বাহাদুরের মৃত্যুর পর শিখশক্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। জাঠ রাজা সুরজমল ও তার পুত্র জবাহির সিং ভরতপুরকে কেন্দ্র করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই সুরজমল বিখ্যাত যোদ্ধা কিন্তু তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের আগে আগ্রা এবং সমগ্র গাঙ্গেয় দোয়াবে সুরজমলের ক্ষমতা অপ্রতিহত হয়নি। মারাঠা শক্তির উন্নতি সুরু ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অর্থাৎ বাজীরাও পেশোয়া হবার পর থেকে। কিন্তু বাজীরাও এর জীবিতকালে মারাঠা শক্তি দাক্ষিণাত্যে বা যমুনার দক্ষিণ পারে সীমাবদ্ধ ছিল। বাজীরাও এর মৃত্যুর পর অর্থাৎ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের পরে উত্তর, পূব ও পশ্চিম ভারতে মারাঠা শক্তির প্রাদুর্ভাব ঘটে। সুতরাং ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে উপরের উক্তি সম্পূর্ণভাবে ভুল। ১৭১৩ খ্রীঃ দিল্লীর প্রভুত্ব তখনও বজায় ছিল। বাংলা সুবায় মুর্শিদকুলি খাঁ দিল্লীর বাদশাহকে মেনে চলতেন। নিজাম-উল-মুলুক

তখনও শক্তিমান হয়ে দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নি। পাঞ্জাব ও মুলতান তখনও সম্রাটের অধীন। একবছর আগেও জাহান্দার শাহ লঙ্কাভাগের মতো অন্য দুই ভাইকে নিয়ে ভারতভাগের কল্পনা করেছেন। মারাঠা ছত্রপতি সাহু সবেমাত্র পেশোয়াব পদে বালাজী বিশ্বনাথকে নিযুক্ত করে মারাঠা শাসন-যন্ত্রকে এক অপূর্ব উৎসাহে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আল্লাহবাদের নবাব সফদরজঙ্গ তখনও শিশু। নাদির শাহ বা আহমদ শাহ আবদালীর মত দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা তখনও ভাবতবর্ষকে আক্রমণ করে লুণ্ঠন করেন নি। বাংলায ও সুরাটে ইংরেজরা তখনও বংশবদ ভাল ছেলের মতো ব্যবসা করছেন।

এইবারে নাট্যকারের দ্বিতীয় উক্তি আলোচনা করা যাক। নাট্যকার যে মোগল রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন এই উক্তিতে তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মোগল শাসন প্রণালীতে সমগ্র দেশ কতকগুলি সুবায় বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক সুবায় বাদশাহ নিযুক্ত একজন শাসনকর্তা থাকতেন ।যেমন সুবা বাংলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে এই সুবা গঠিত ছিল। অনেক সময সম্রাটপুত্র বা পৌত্ররা এই সব সুবায শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হতেন। বাদশাহ আলমগীরের রাজত্বের শেষদিকে তার তৃতীয় পুত্র আজমশাহ বাংলা সুবার শাসনকর্তা হন। বাহাদুর শাহ যখন বাদশাহ হলেন তখন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জাহান্দার শাহ মূলতান সুবায় শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন এবং দ্বিতীয় পুত্র আজিম-উন-সান (আসলে তৃতীয়পুত্র কারণ দ্বিতীয় শৈশবেই মারা যায) বাংলা সুবায় শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এই শাসন-কর্তাদের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল। তাঁরা বিভিন্ন ভাবে রাজস্ব আদায করে সম্রাটের প্রাপ্য নিয়মিত সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। ১৭২৭ খ্রীঃ খরচা বাদ সম্রাট পেতেন বার্ষিক একশত সাড়ে বিয়াল্লিশ লক্ষ সিক্কা টাকা।

সুতরাং জমিদারের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের কথায় নাট্যকার বাংলা দেশের চিরস্থাযী বন্দোবস্তের কথাই চিন্তা করছেন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। এখানেও তার রচনায় ইতিহাস অজ্ঞতার আর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে। নাটকের প্রধান দুই চরিত্র জাহান্দার শাহ ও লালকুঁয়ারের মধ্যে যেমন এই ইতিহাস বিরোধিতা স্পষ্ট তেমনি স্পষ্ট জিন্নতউন্নিসা বেগম ও বাদশাহ-জাদাদের চরিত্রে। জুলফিকর খাঁ চরিত্র সৃষ্টিতেও উন্নতির অবকাশ ছিল।

তখৎ-এ-তাউস নাটক তাই বাংলাদেশের অনৈতিহাসিক নাটক সংখ্যায় সংযোজন মাত্র। ইতিহাস অনুসরণে যে অপূর্ব নাটক এবং নূতন ধরণের চরিত্র সৃষ্টি হতে পারত তা সম্পূর্ণ অবহেলিত। সামান্য নাটকের মতো কল্পনার জল-তরঙ্গ ক্ষণিকের এক ফানুষ তৈরী করেছে। পরিপূর্ণ ভাবাবেগ কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই তখৎ-এ-তাউস এক পাগল বাদশাহর গভীর প্রেমের উপন্যাস হয়ে থাকল তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতিকে সামান্যতম প্রতিফলিত করল না। দেখা গেল রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্য যে পরিশ্রম প্রয়োজন নাট্যকার তা করতে পারেন নাই। সহজ করে ফেলেছেন ঐতিহাসিক ঘটনা। তাই নাটক হয়েছে যেমন তরল তেমনি প্রয়োজনহীন। যুগচেতনার সন্ধিক্ষণের ঘটনা উপলক্ষ করে যে নাটক রচিত হয়েছে তাতে নাট্যকারের অজ্ঞতাই প্রকাশ হয়েছে। জাহান্দার শাহর রাজত্ব মোগল সাম্রাজ্যের পতনের প্রারম্ভ। কয়েক বছরের মধ্যে এই বিরাট সাম্রাজ্য ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। নাট্যকার তাঁর সৃষ্টির সম্ভাবনা কতো সুদূরপ্রসারী উপলব্ধি করতে পারেন নাই, তাই কোন রকমে কল্পনার ভিত্তিতে এক নাটক খাড়া করেছেন। তাঁর এই ব্যর্থতা তাই বেদনাদায়ক। ঐতিহাসিক নাটক লেখার জন্য আসরে নেমে এই অপারগতা অমার্জনীয়।

জাহান্দার শাহ সম্পর্কে দ্বিতীয় নাটক প্রকাশিত হল তখৎ-এ-তাউস নাটকের তের বছর পরে। এই নাটক শিশির ভাদুড়ীর জাহান্দার শাহ চরিত্রের অভিনয় দ্বারা অনুপ্রাণিত তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না। শ্রীঅমল সরকার ৩১শে জুলাই ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মসনদে মোঘল নাটক প্রকাশিত করেন। প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ দেওয়া হয়েছে ২২শে নভেম্বর ১৯৬৩। রঙমহল থিয়েটারে এক অপেশাদারী দল নাট্যকারের পরিচালনায় এই নাটকের একমাত্র অভিনয় করেন। নাট্যকারের কৈফিয়তে শ্রীঅমল সরকার জানিয়েছেন যে ১লা জানুয়ারী থেকে ১লা মার্চ ১৯৬৩ দেওঘর ও কলকাতায় এই নাটকরচনা করেন। নাট্যকার জানিয়েছেন যে, মোঘল ইতিহাস পর্যালোচনা করে তিনি দেখেছেন যে, মোঘল বংশে অনেকে কবি ছিলেন তাই কাব্যের দিক ও প্রেমের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

এই যাত্রাধর্মী নাটকটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। সাহিত্য বা ইতিহাস কোন

গুণই নাটককে অলঙ্কৃত করতে পারেনি। তাই বাংলা নাটকের ইতিহাসে কেবলমাত্র জাহান্দর শাহ সম্পর্কে দ্বিতীয় নাটক বলে উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। তবে আচার্য শিশিরকুমারের অভিনয় এক কল্পনাপ্রবণ বাঙ্গালীর মনে কি ভাবে জাল বুনেছে তার উদাহরণ স্বরূপ এই নাটক সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে হবে।

মসনদে মোঘল নাটকের গল্পাংশ যেমন অসম্ভব তেমনি আজগুবি। জাহান্দার শাহ নামে এক নবীন যুবক দিল্লীর বাদশা হয়েছেন এবং লালকুমারী নামে এক হিন্দু নর্তকীর প্রেমে পড়েছেন। এই কারণ দেখিয়ে নাট্যকার মুসলমান আমীরদের বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছেন। এই বিদ্বেষ-বশেই তাঁরা পাটনা থেকে জাহান্দার শাহের ভাইপো ফারুকসিয়রকে ডেকে আনলেন এবং প্রথম অঙ্কের শেষে ফারুকসিয়র হঠাৎ দিল্লী এসে জাহান্দার শাহকে বধ করলেন। এই ঘটনার প্রতিশোধ নেবার জন্য লালকুমারী নাটকের শেষ দৃশ্যে ফারুকসিয়রকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেললেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্য পরিচালনার প্রয়োজনে এক হিন্দু রাজ-কুমারীকে ফারুকসিয়রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুই স্ত্রীর মাঝখানে দোদুল্যমান ফারুকসিয়রের মূর্তি যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির হাস্যোদ্রেক করবে। নাটকের শেষ দৃশ্যে লালকেল্লার 'কারাগারে' বন্দী ফারুকসিয়রের কথাবার্তা বুদ্ধিহীনতার আর এক চিহ্ন। পুনরায় কারাগারের মধ্যে পানপাত্র হাতে লালকুমারীর প্রবেশ এবং বিষদানে ফারুকসিয়রকে হত্যা নাটককে চরম অসম্ভাব্যতা দিয়েছে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি নাটকের একমাত্র উপজীব্য নয়, তার মধ্যে মুর্শিদকুলি খাঁকে আনা হয়েছে, তাঁর যোগ্য সেনাপতির অভাব থাকায় তাঁর কন্যা জিন্নৎ-উন্নিসা 'বাংলার সৈন্যদল' দিয়ে ফারুকসিয়রের বিরাট বাহিনীকে হারিয়ে দিলেন। তারপর তিনিও দুই প্রেমিকের মাঝে দোদুল্যমান হলেন। এই রকমের বহু অসম্ভব কল্পনায় নাটক কণ্টকিত।

'মসনদে মোঘল' নাটক তিন অঙ্কে সমাপ্ত। সমগ্র নাটকের পাতা সংখ্যা ১২১+১০=১৩১। নাটক ঐতিহাসিক কাল নিয়ে লেখা হলেও কয়েকটা ঐতিহাসিক নাম ছাড়া আর সব রকমেই নাটক ইতিহাসের সম্পর্ক এড়িয়ে

চলেছে। জাহান্দার শাহ যখন দিল্লীর বাদশা হলেন তখন তিনি শ্রমিক যুবক ছিলেন না। আর লালকুঁয়ার যাকে তিনি বিবাহ না করে প্রধানা বেগমের সম্মানে ভূষিত করেছিলেন নাম দিয়েছিলেন ইমতিয়াজ মহল তিনিও এক অবলা নারী ছিলেন না। এই প্রবন্ধের প্রথমে তখৎ-এ-তাউস নাটকটির সমালোচনা করবার সময় তাঁদের সম্পর্কে যথেষ্ট বলা হয়েছে। সুতরাং তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ফারুকসিয়র লালকুঁযারকে কোন অসম্মান করেন নি। বরঞ্চ তাঁকে মৃত বাদশাহদের বেগমরা যে বাড়িতে থাকতেন সেখানেই জাহান্দার শাহকে হত্যার পর উপযুক্ত সম্মানে পাঠিয়ে দিযেছেন। এই স্থানটি ছিল সুহাগপুরে নাম ছিল বেওয়াখানা। সেখান থেকে লালকুঁয়ার কখনও বাইরে এসেছেন বলে জানা যায় না। কারণ বাদশাহের বিধবাদের এই গৃহ কয়েদখানারই নামান্তর ছিল মাত্র। ফারুকসিযরের মৃত্যু হয় সম্পূর্ণভাবে সৈযদ ভ্রাতৃদ্বয়ের চক্রান্তে। ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৭১৩ জাহান্দার শাহের মৃত্যু হয বন্দীশালার যে ঘরে সেই ঘরেই ২৮শে এপ্রিল, ১৭১৯ ফারুকসিযরকে হত্যা করা হয়। একদিক থেকে জাহান্দার শাহের থেকেও চরম দুরবস্থা ফারুক-সিযরকে ভোগ করতে হয়! বাদশাহী থেকে চ্যুত করে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তাঁকে অন্ধ করে দেন এবং অন্ধ অবস্থায় দীর্ঘ বন্দীজীবন যাপন করার পর ফারুক-সিয়রকে হত্যা করা হয। এঁদের দুজনের হত্যাকাণ্ডই অত্যন্ত বিভৎসভাবে সংঘটিত হয়।

নাট্যকারের এই সব কথা জানবার অবকাশ হয় নি। আগামী দিনের দিল্লীর উজীর আল্লাহবাদের নবাব সফদারজঙ্গ তখন বালক হলেও নাট্যকার তাকে এক তোৎলা সভাসদ সাজিয়ে তাকে দিয়ে ভাঁড়ামো করিয়েছেন। চিন-কিলিচ খাঁ তখনও হায়দ্রাবাদে নিজামীর পত্তন করেন নাই। নাট্যকার ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে তাকে হায়দ্রাবাদের নিজাম বানিয়েছেন। জুলফিকর খাঁ হয়েছেন জাহান্দার শাহর অতি বৃদ্ধ উজীর। ডাক্তার হ্যামিলটন পাচ্ছেন বাংলায় ও মাদ্রাজে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার। মীরজুমলা তখনও বেঁচে রয়েছেন। মুর্শিদকুলি খাঁ সম্পর্কে নাট্যকার যে ইতিহাস জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা স্কুলের ছাত্রকেও বিব্রত করবে। শিখ মারাঠা জাঠ রাজপুত সম্পর্কে নাট্যকার যে ভুল করেছেন তার জন্তে

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর তখৎ-এ-তাউস নাটক কিয়দংশে দায়ী। জাহান্দার শাহ থেকে ফারুকসিয়র অর্থাৎ ১৭১২ থেকে ১৭২০ সময়ের মধ্যে এই তিন শক্তি কি রকম ছিল তা আগের নাটকের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তখৎ-এ-তাউসে জিন্নতউন্নিসা বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের কন্যা এই নাটকে জিন্নতউন্নিসা নাম ব্যবহার করে তাকে করা হয়েছে মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যা। সব থেকে দুঃখের কথা এই যে, নাট্যকার কেবল ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ নন। যে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তিনি নাটক লিখতে বসেছেন সে সম্পর্কে তার মূর্খতা অমার্জনীয়। আরও অনেক হিন্দু নাট্যকার-দের মতো হিন্দু চরিত্রে মুসলমান নাম বসিয়ে নাটক রচনার লোভ নাট্যকার বর্জন করতে পারেন নি। সবে মিলিয়ে বলা চলে যে নাট্যকার তখৎ-এ-তাউসের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে নিজের কপোল কল্পনায় এই নাটক রচনা করেছেন। বন্ধুবান্ধবদের দিয়ে এই নাটক অভিনয় করিয়ে জনসাধারণের সামনে প্রচার করেছেন। অথচ সামান্যতম ইতিহাস পাঠ করবার পরিশ্রম তিনি করেছেন এমন প্রমাণ কোথাও নাই। তা সত্ত্বেও এই আজগুবী এবং দুর্বল রচনাকে ঐতিহাসিক নাটক আখ্যা দিয়ে মিথ্যাচার করতে দ্বিধা করেন নি। মিথ্যাচারের আরও নিদর্শন আছে। নাট্যকার কৈফিয়তে বলেছেন। "তখৎ-এ-তাউস নাটক দেখবার বা পড়বার সৌভাগ্য আমার হয় নি।" অথচ তাঁর প্রতিটি ভুল তখৎ-এ-তাউসের অনুগামী। তিনি যে মোঘল সভাসদগণের নাম ব্যবহার করেছেন সেখানেও একই ভুল দেখে তাঁর কীর্তি সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। নাট্যকার যদি মনে রাখতেন যে, লালকুঁয়ারকে লালকুমারী লিখলেই সকলে তাঁর রচনাকে মৌলিক বলে মনে করতে সুরু করবে তাহলে এই কথাই তাঁকে শুনতে হবে যে, প্রতারকদের ধরে ফেলা সাহিত্য ক্ষেত্রে কিছু কঠিন কাজ নয়। বিশেষ সেই প্রতারক যদি তার পর্বত-প্রমাণ অজ্ঞতাকে চালাকী বলে মনে করে নিজের দুর্বুদ্ধিকে মূর্খতার জালে সীমাবদ্ধ করেন তাহলে তাকে ধরে ফেলতে কোন কষ্টই করতে হয় না।

অমল সরকারের 'মসনদে মোঘল' নাটক কোন রকম উল্লেখের দাবী রাখেনা এ কথা আগেই বলা হয়েছে। কিছু বাঙালী নাট্যকারদের মধ্যে মাঝে মাঝে নানা রকমের অসৎকীর্তি দেখা যায়। বিদেশী নাটক থেকে

অনুবাদ করে অস্বীকার করা যেমন তার একদিন অন্যের নাটকের প্রভাবে বচনা করে সেটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা আব এক দিক। 'মসনদে মোঘল' নাটক এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অপকীর্তির একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে মসনদে মোঘলেব কোন দাবী নাই। কত রকমের পরিবেশে ঐতিহাসিক নামধেয় নাটকের জন্ম হয় তাই দেখাবার জন্য এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

সূত্রনির্দেশ

১। Henry Irvine, Later Mughals, Vol I, ed. J. N. Sarkar— p. 5-6

২। Ibid p. 158-161

৩। Ibid p. 161.

৪। Ibid p. 175.

৫। Ibid p. 179-183 & 146

৬। Ibid p. 183-185.

৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য : বাংলা নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা : পরিশিষ্ট পাতা ৬৩৭।

৮। Irvine : Later Mughals Vol I p. 240-243

৯। Ibid p. 193

১০। Ibid p. 181

১১। Ibid p. 192-193

১২। Irvine : Later Mughals Vol I p. 195

১৩। Irvine : Later Mughals Vol I p. 192-197

১৪। Irvine : Later Mughals Vo I, p. 223-225
১৫। Ibid p. 229-236
১৬। Ibid p. 236-238
১৭। Ibid p. 236-240
১৮। Ibid p. 244-253
১৯। Ibid p. 254-258

নাদির শাহ

নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। দাবানলের মতো পারস্য নরপতি আফগানিস্থান থেকে দিল্লী পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করে স্বয়ং মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহকে বন্দী করেন। ভারতবাসী সবিস্ময়ে এই দুরন্ত দিগ্বিজয়ীর কীর্তিকলাপ অনুসরণ করতে লাগল। প্রচণ্ড বিক্রমে মোগল সম্রাটের বিরাট বাহিনীব পরাজয়, দিল্লীতে শাহনশাহ নাদির শাহের সিংহাসনে আরোহন এবং দিল্লী ও তার চতুপার্শ্বস্থ জনসাধাবণকে অমানুষিক অত্যাচারে হত্যা করে তাদের ঐশ্বর্য্য লুণ্ঠন, ভারতীয় জনগণ স্তম্ভিত হযে দেখেছে। ভারত সম্রাট শাহানশাহ নাদির শাহের আদেশে আফগানিস্তান থেকে সুবা বাংলা পর্য্যন্ত সর্বত্র তার নামে মুদ্রা অঙ্কিত হযেছে। অবশেষে ভারত ত্যাগের সময় তিনি মহম্মদ শাহকে ভারতের সম্রাট নিযুক্ত করেন। তাঁকে পারস্য রাজের করদ ও মিত্র রাজা বলেই গণ্য করা হযেছিল। মোগল মহিমা অস্তমিত হয়ে মোগল ভাবত পারস্য প্রসূনের পদানত হযেছিল। প্রায বিনা প্রতিবন্ধকতায় নাদিবশাহেব ভারত জয় নিঃসন্দেহে জাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। নাদিবশাহেব নিদারুণ নৃশংসতার কাহিনী সমস্ত কল্পনাকে কণ্টকিত করে রাখে। দিল্লীর এই পরাজয একাধারে নাটকীয এবং করুণ। বাংলা সাহিত্যের নাট্যরচনার উপাদান হিসাবে নাদির শাহের ভারত বিজযেব ঘটনা অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ।

নাদির শাহের জীবন অনুসরণে দুইটি নাটক এ পর্য্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যে পাওয়া গেছে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে (১০ই পৌষ ১৩২৮) বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত প্রণীত 'নাদির শাহ বা শয়তানের স্বপ্ন' প্রকাশিত হয় ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৫) যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী রচিত 'দিগ্বিজয়ী' নাটক প্রকাশিত হয়। নাট্যকারের নিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি যে উভয় নাটকই পেশাদার মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। 'নাদির শাহ' মিনার্ভা নাটমঞ্চে অভিনীত হয়েছে এবং 'বহুল অর্থ ব্যায় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া' মিনার্ভা থিয়েটারের সত্বাধিকারী উপেন্দ্র কুমার মিত্র এবং নাট্যকারের বন্ধু সতীশ চন্দ্র মিত্র কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। অভিনয়ে নাদির

শাহের ভূমিকায় হাঁদু বাবু,* বেগম-সুশীলা ও আকবরী-চারুশীলা উল্লিখিত হয়েছেন।[১] অভিনয়ের কাল ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ। ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেলোর কীর্ত্তির পরে এবং রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও নরেশ চন্দ্র মিত্র অভিনীত চন্দ্রগুপ্ত ও সাজাহান নাটকদ্বয়ের অব্যবহিত পূর্বে নাদির শাহের অভিনয় হয়।[২] ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর মিনার্ভা থিয়েটার আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।[৩]

'দিগ্বিজয়ী' নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনীত হয় ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৮।[৪] উৎসর্গ পত্রে নাট্যকার নাটকের পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে লিখেছেন, 'এ নাটক আপনিই লিখতে বলেছিলেন নামকরণেও আপনার ইঙ্গিত ছিল।······আপনি স্বেচ্ছায় এর পোষণ ও পালনের ভার নিয়ে একে স্বাস্থ্যবান, সতেজ ও জীবন রস মণ্ডিত করে তুলেছেন। সুতরাং নাটকখানার উপর আপনার অধিকার আমার চেয়ে একটুও কম নয়।' অভিনয়ে নাদির শাহের ভূমিকায় শিশির কুমার ভাদুড়ী ছাড়া নাট্যকার স্বয়ং, শৈলেন চৌধুরী, জীবন গাঙ্গুলী, অমলেন্দু লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, রবি রায়, হরিসুন্দরী, চারুশীলা, কৃষ্ণভামিনী প্রভৃতি তৎকালীন শিশির সম্প্রদায়ের সব অভিনেতা ও অভিনেত্রী অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ মনোমোহন থিয়েটারে নিশিকান্ত বসুরায় রচিত পথের শেষে নাটকের উদ্বোধন হয়। এই নাটকের ভূমিকালিপিতে দানী বাবু (সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ) স্বয়ং সঙ্গে নূতন যুগের অভিনেতৃকুল নির্মলেন্দু লাহিড়ী, সরযূবালা প্রভৃতি অপূর্ব অভিনয় করায় দিগ্বিজয়ীর অভিনয় ম্লান হয়ে যায়।[৫] সম্ভবত সামাজিক নাটক 'পথের শেষে' বাঙ্গালী দর্শক মনে বিদেশী পরস্বাপহারী নাদির শাহের থেকে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। ভাবালুতায় আবেগশীল নাট্যামোদিগণ বাঙ্গালী বৃদ্ধ পিতার দুঃখে সমব্যাথী হয়েছেন। দিগ্বিজয়ীর চমক তাঁদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। দিগ্বিজয়ী হয়েও নাদিরশাহ তাই পরাজিত হলেন এক রুক্ষ কঠোর বৃদ্ধ বাঙ্গালী পিতার কাছে। বস্তুত বাংলা ঐতিহাসিক

হাঁদু বাবু—খ্যাতনামা অভিনেতা মন্মথ নাথ পাল মৃত্যু ৯ই মার্চ ১৯৪৪ নিজেরে হারায়ে খুঁজি, অহীন্দ্র চৌধুরী, অমৃত ২১শে আগষ্ট ১৯৭০।

নাটকের ক্ষেত্রে বারবার এই কাহিনীর পুনরুল্লেখ দেখতে পাব। প্রতি পদক্ষেপে শোনাতে হবে ভাবালুতার কাছে বুদ্ধি বা সত্যের হেরে যাবার সংবাদ। হৃদযাবেগ বাংলা থিয়েটারে এমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়েছে যে যুক্তি তর্ক বা চিন্তা দীর্ঘদিন বাংলা নাট্যসাহিত্যের কাছাকাছি আসতে পারেনি এবং যার ফলে সাহিত্য সমালোচকগণ সেদিন পর্য্যন্ত বাংলা নাটককে সাহিত্যের পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে রাজী হন নি।

আলোচ্য নাটক দুটির মুখপত্রে উভয় নাট্যকার ইতিহাসকে নাটকের মুখ্য বস্তু হিসাবে ব্যবহারের কথা জানিয়েছেন। বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত লিখেছেন 'আমি প্রয়াস পাইয়াছি আমার যতদূর সাধ্য ইতিহাসকে অক্ষুন্ন রাখিয়া সেই চরিত্র (অর্থাৎ নাদির শাহের) অঙ্কিত করিতে।' 'ইতিহাসকে অক্ষুন্ন রাখিয়া' কথাগুলির তলায় কাল দাগ দিয়ে ছাপা বইতেও তাঁর ইতিহাস প্রীতির কথা বুঝিয়েছেন। নাট্যকার প্রথমেই জানিয়েছেন, 'ইতিহাস প্রসিদ্ধ "নাদির শাহের" চরিত্র একটি প্রহেলিকা।' একটু পরে লিখেছেন, 'আমি মনোবিজ্ঞানে পণ্ডিত নই। এরূপ একটা দুরূহ কার্য্যময় জীবন—যাহা এককালে এশিয়ার ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল, যাহা পারশ্যের জাতীয় জীবনে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল আবার যাহার রক্তাক্ত স্মৃতি বহুকাল পর্য্যন্ত এশিয়ার দক্ষিনার্দ্ধে একটা বিভীষিকায় পরিণত হইয়াছিল—তাহাকে পরিস্ফুট করিতে যাইয়া আমাকে শয়তানের অবতারনা করিতে হইয়াছে।' এই বক্তব্যের সমালোচনার আগে নাট্যকারের উদ্দেশ্য দেখা কর্ত্তব্য। বরদাপ্রসন্ন বলেছেন, "নাদিরশাহ" ঐতিহাসিক নাটক—অর্থাৎ ইতিহাসের ভিত্তির উপর ইহার গল্পাংশ গর্বিত। 'ইতিহাস ইহার ভিত্তি,—অবলম্বন সার্বজনীন ধর্ম, একমাত্র যাহাকে আশ্রয় করিয়া সকল জাতি সকল সমাজ দাঁড়াইতে সমর্থ হয়,—পূর্বপক্ষ সেই বিরাট সমস্যা যাহা যুগে যুগে মানবের চিন্তাশক্তিকে আলোড়িত করিয়াছে—"ঈশ্বরোহস্তি ন বা," উত্তরপক্ষ সেই চরাচরের একমাত্র ধ্রুবসত্য।' সুতরাং তিনটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে—(এক) নাটক ঐতিহাসিক, (দুই) নাদির শাহ চরিত্র প্রহেলিকা ও (তিন) ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তিনিই যে একমাত্র ধ্রুবসত্য প্রমাণ করা এবং সেই জন্যেই শয়তান চরিত্রের অবতারনা এবং নাটকের দ্বিতীয় নাম 'শয়তানের স্বপ্ন'।

নাটক সম্পর্কে বিশদ আলোচনার সময় দেখা যাবে যে বস্তুত এই তৃতীয় উদ্দেশ্যই নাটকের মূল বক্তব্য এবং শয়তানের স্বপ্নই নাটকের সার্থক নামকরণ। নাদির শাহর চরিত্রকে নাট্যকার কেন 'প্রহেলিকা' বলে বর্ণনা করেছেন তা বোঝা দুষ্কর। এশিয়ার ইতিহাসে কোন যুগান্তকারী কাজের জন্য নাদির-শাহের সাধুবাদ প্রাপ্য তাও নাটকের কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। পারস্যের জাতীয় জীবনে কেমন করে নাদিরশাহ নবযুগের প্রবর্ত্তন করেছিলেন তার কোন আভাষ নাটকে দেখা যায় না। এশিয়ার দক্ষিণার্ধে তাঁর নাম যে বিভীষিকায় পরিণত হয়েছিল একথা ভুল। উত্তর ভারত ও মধ্য এশিয়া মাত্র তাঁর অত্যাচার অনুভব করেছে।[৬] দিল্লী ছাড়া আর কোথাও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হয়েছে বলে জানা যায় না, নাটকের মধ্যেও সে রকমের কোন আভাষ নাই। নাদিরশাহ সুন্নী সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমান ছিলেন। তিনি কখন স্বধর্ম ত্যাগ করেননি সুতরাং নাট্যকার কেন তাঁকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী বলার চেষ্টা করেছেন তা বোঝা যায় না। বরঞ্চ ভারত ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে নিজ কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে একজন বাদশাহী মোগল বংশের রাজকুমারীর বিবাহ চিরাচরিত রক্ষণশীল মুসলমান মতেই অনুষ্ঠিত হয়।[৭] দেখা যাচ্ছে যে নিবেদনে নাট্যকার যা বলেছেন নাটকের মধ্যে তা বলতে পারেননি। সুতরাং এবার 'নাদিরশাহ বা শয়তানের স্বপ্ন' নাটকটিকে বিশদ ভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। নাটকের সুরুতে প্রস্তাবনা দৃশ্য শয়তানের দরবার। শয়তান তার চরদের পৃথিবীতে পাঠাচ্ছেন উদ্দেশ্য—শয়তানের ভাষায় 'ঈশ্বরকে তার উচ্চ আসন হতে যেমন করে পার টেনে নাবিয়ে দেবে।' প্রথম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে আটটি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে সাতটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে নয়টি দৃশ্য এবং পঞ্চম অঙ্কে সাতটি দৃশ্য। প্রথম হতে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্য পর্য্যন্ত পারস্যের ঘটনাবলী, চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে নবম দৃশ্য পর্য্যন্ত (মাঝে সপ্তম দৃশ্য আবার পারস্য) ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ, পঞ্চম অঙ্ক আবার পারস্যে। নাট্যকার ইরান ও পারস্য উভয় নাম ব্যবহার করায় ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় করার অসুবিধা হয়। নাদিরশাহের সময় পারস্য নামেই দেশের পরিচিতি ছিল।

সংক্ষেপে নাটকের সারাংশ হল—তাহামাস কাজভীনের সুলতান, অত্যন্ত দুর্বল চরিত্র, ইন্দ্রিয়াশক্ত, কুক্রিয়ামগ্ন এবং কুকর্মী পরিবৃত। তার বৃদ্ধ পিতা শাহ হুসেন আফগান দেশে বন্দী এবং তার বৃদ্ধ মাতা বাঁদীর ছদ্মবেশে বৃদ্ধ স্বামীর নিকটই থাকেন। পিতামাতাকে উদ্ধারের চেষ্টা না কবে সুলতান স্ত্রীলোক উপভোগে মগ্ন এবং এই কাজে তাব প্রধান সহায় সেনাপতি সৈফুদ্দিন। নাদির শাহর পিতাব নামকরণ হযেছে জুলফিকর খাঁ এবং ভগিনী নূব কাজভীনেব শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। সুতবাং সুলতানের আদেশে নূর অপহৃতা ও জুলফিকব বন্দী হলেন। তাবপব সতীত্ব রক্ষাব জন্য জুলফিকর কন্যাকে গুলি কবলেন এবং সৈফুদ্দিনকে অভিশাপ দিযে নিজেও আত্মহত্যা করলেন। প্রথম অঙ্ক অবসিত হল। নাদিরকে নানা পবোপকাবে রত দেখা যায়। তারপর শযতান উপস্থিত হলেন ও সব কাজে নাদিরকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হলেন। ফলে সদ্য মৃত স্বামীর বক্ষ থেকে রূপসী আকবরী অপহৃতা হয়ে নাদিবের অঙ্কশাযিনী হলেন। আহম্মদ শাহ আবদালী এক দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা। শযতানী ক্ষমতা সম্পন্ন নাদিরের কাছে পবাজিত হযে আর দাসত্ব স্বীকার করলেন। তাহা মাস সুলতান নাদিবকে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করলেন। এই হল দ্বিতীয অঙ্ক। তৃতীয় অঙ্কে হঠাৎ সুলতানের পিতামাতার জন্তে অনুশোচনা জেগে উঠল ফলে নাদির আফগান দেশে অভিযান করলেন। অবশেযে বিজযী সুলতান বন্দীশালায এসে দেখলেন পরাজিত শত্রু পিতাকে হত্যা করেছে এবং সে খবর দেবার পরই মাতাও দেহ রক্ষা করলেন। সুলতান অত্যন্ত ব্যাকুল হলেন এবং নাদিরের মৃত্যুপথযাত্রী পিতার (প্রথম অঙ্ক) অভিশাপ স্মরণ করে তিনি ফকিরি নিলেন এবং নাদির সুলতান হতে অস্বীকৃত হলেও তাহামাসের শিশুপুত্রের নামে সাম্রাজ্য শাসন করতে রাজী হলেন। কিন্তু দুই দৃশ্য পরেই শিশু সুলতান আব্বাসের মৃত্যু সংবাদ ও নাদিরের পারশ্য সুলতান হবার খবর দেওয়া হয়েছে। অঙ্কের শেষে নাদিরের মুখে সংলাপ, 'খোদা? কে খোদা?— কোথায় খোদা? খোদা নাই। আজ হতে আমিই খোদা—এই পৃথিবীতে আমিই সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর—আমি—আমি—আমি—শাহান-শা-বাদশা নাদিরশা।' চতুর্থ অঙ্কের প্রথম ও সপ্তম দৃশ্য পারস্তে, অন্যগুলি ভারত অভিযান বিষয়ক। ভারতবর্ষের সাতটি দৃশ্য বিশেষ অনুধাবনের দাবী রাখে। দ্বিতীয় দৃশ্য দিল্লীর উপকণ্ঠস্থ

রাজপথ। মূল বক্তব্য শয়তানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের দূত মোল্লাবাসীর সাবধান-বানী এবং মোগল সৈনিক ইব্রাহিম ও দিল্লীর বাদশা মহম্মদ শাহকে পালিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া। গৌণ উদ্দেশ্য নাদিরশাহ দিল্লীর পথে যাত্রা সুরু করেছেন এবং সেই খবর পেয়ে সাধারণের পলায়ন সংবাদ দর্শককে জানান। তৃতীয় দৃশ্য—দিল্লীর রাজকক্ষ—চিন্তাকূল বাদশাহ মহম্মদ শাহ। চিন্তায় কার্য্যে অক্ষম বৃদ্ধ মহম্মদ শাহ বলছেন—'আমি এই নির্জন অন্ধকারময় দিল্লীর রংমহলে হতভাগিনী কন্যাকে নিয়ে দিগ্বিজয়ী শয়তান নাদির শাহের আগমন প্রতিক্ষা করি।' মনে হয় নাদির শাহের বিজয় অভিযানের খবর পেযে দিল্লীর বাদশাহ জড়বস্তুতে রূপান্তরিত হয়েছেন এবং লালকেল্লার সব আলো নিভিযে দিয়ে অন্ধকারে প্রাণভয়ে ভীত জানোয়ারের মতো বিচবণ করছেন। চতুর্থ দৃশ্য, কর্নাল—নাদিরেব শিবির। প্রথমেই অসহ্য গোলামী সম্পর্কে আহম্মদ আবদালীর স্বগোতক্তি। তারপর নাদিরের আস্ফালন। যূপকাষ্ঠে নীত মেষ শাবকের মতো দিল্লীর বাদশাহর প্রবেশ ও নাদিরের আনুগত্য গ্রহণ। কোহিনূর হীরক দেখে নাদির শাহের লোভ এবং মহম্মদ শাহর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে, আবদালীর কাছে ময়ূর সিংহাসনের লোভও ব্যক্ত করা। এই দৃশ্যেই নাদির সৈন্যদের যথেচ্ছ লুণ্ঠনের আদেশ জারি করছেন। পঞ্চম দৃশ্য অতি সংঘাতপূর্ণ দরবার কক্ষ। নাদির শাহকে মহম্মদ শাহ ময়ূর সিংহাসন দেখান মাত্র তিনি সেটা কেড়ে নিলেন। তারপর মহম্মদ শাহকে কন্যা পরিবানুর সঙ্গে আহম্মদ আবদালীর বিবাহের প্রস্তাব করলেন। মহম্মদ বিনীত ভাবে নাদিরের 'পালিত পুত্র' শাহজাদা রেজাকুলি খাঁর সঙ্গে বাদশা কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করামাত্র তা অনুমোদিত হল। অতিথিবৎসল মহম্মদ শাহর কোন আপত্তি যখন নাদির শাহ বিবেচনা করলেন না তখন পরিবানু নাদিরের সামনে আত্মহত্যা করলেন। চতুর্থ দৃশ্যের কোন নাম নেই—সম্ভবত দিল্লীর রাজপথ। এটি তরল দৃশ্য। হকিম, দর্জি, আতরওয়ালা, জহুরী প্রভৃতি এই দৃশ্যের কুশীলব। নাদির শাহের মৃত্যু হওয়ার গুজব কেমন করে চালু হল সেটা বলাই নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য। নাদিরের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দিল্লীর নাগরিকগণ পারস্য সৈন্যদের হত্যা করতে লাগল। অষ্টম দৃশ্য—দিল্লীর প্রসাদকক্ষ। নাদিরের বিজয় লালসার আভাষ দেওয়া হয়েছে। নাদির বলছেন—'আন্দোলী, দামাস্কাস, বোগদাদ, ইহুদির দেশ, আর্মানীর ভূমি,

রূপসীর বাজার—এ আমার চাই। তুর্কীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। এই আরবস্থান, প্রাচীন খলিফাদের রাজ্য, বালুকাময় মরুভূমি, বেদুইন দস্যুর আবাস· · · এও আমার চাই। ইরাণ, তুর্কীস্থান, আফগানিস্থান, হিন্দুস্থান এতো আমারই-আমারই মুঠোর মধ্যে। বাকী শুধু চীন এবং রুষিযার বিশাল সাম্রাজ্য যেদিন ইচ্ছা করব সেদিনই আমার হবে। সাইবেরিয়ার বরফ ক্ষেত্রে আমার বিজয পতাকা উড্ডীন হবে, পিকীনের রাজপ্রাসাদ আমার পদধূলিতে গৌরবান্বিত হবে, কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরদেশে আমার গ্রীষ্মাবাস প্রস্তুত হবে।' কিন্তু নাদিরেব এই স্বপ্নবাতুলতায় বাধা পডল। আবদালী দিল্লীর পথে 'ইরাণী' সৈন্য নিহত হবার সংবাদ দিলে ক্ষিপ্ত নাদির দিল্লীবাসীর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করলেন। নবম দৃশ্য দিল্লী, মর্মরপ্রাসাদের দ্বিতল বারান্দা—নিম্নে রাজপথ। এই বারান্দায দাঁড়িযে নাদির দিল্লীবাসীর হত্যাকাণ্ড দেখলেন। বাদশাহ মহম্মদ শাহ বহু অনুনয বিনয করেও নাদির শাহকে নিরস্ত করতে পারলেন না। শেষে ঈশ্বর বিশ্বাসী মোল্লাবাসীর দীর্ঘ বক্তৃতায এই দৃশ্য ও নাদিরের ভারত অভিযান সম্পূর্ণ হল। মোল্লাবাসী নাদিরকে জানালেন যে মূর্খ জানেনা বাহুবলে পৃথিবীজয় করা যায় না। অতঃপর শেষ অঙ্ক। প্রথম দৃশ্যেই আবদালী মোল্লাবাসীর অনুগামী হলেন। নাদির পত্নী আকবরীর স্বামীর বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র এবং নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতার বাগদত্তার প্রতি নাদিরের লোলুপতা এই দৃশ্যের মূল কথা। এখানেই শেষ নয়, আকবরীও নাদিরের ভাইএর রূপ মুগ্ধ হযে নাদিরের মাথা লক্ষ করে পিস্তল ছুঁড়লেন বটে কিন্তু তার প্রেমাস্পদ অর্থাৎ হানিফ আহত হলেন। সমগ্র পঞ্চম অঙ্কই ইস্পাহান সম্পর্কীয সে জন্য ২য দৃশ্যে সেই দেশের ক্ষুধার্ত ও পীড়িত নরনারীর হাহাকার দেখান হয়েছে। অবশেষে মোল্লাবাসীকে দেখে সবাই নিশ্চিন্ত হযেছেন। তৃতীয় দৃশ্যে নৃত্যগীত মদ্যপান এবং জুলফিকরের অভিশাপের ফল স্বরূপ সেনাপতি সৈফুদ্দিন নিজ কন্যা বুলবুলকে নাদিরের লালসাবহ্নিতে নিক্ষেপ করতে নিয়ে আসবার ঘটনা। কিন্তু ঈশ্বরবিশ্বাসী কন্যা নাদির শাহকে শুনিয়ে দিল—'তিনি যাকে রাখেন সেই থাকে। তিনি যাকে মারেন সেই মরে। তুমি কে? কেউ নও।' এই বালিকার কথা শুনে নাদিরের আত্মবিশ্বাস টলে গেল এবং সেনাপতিকে আদেশ করলেন যে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্বে এই কন্যাকে তার শয়নকক্ষে নিয়ে উপস্থিত

করতে হবে। চতুর্থ দৃশ্য হানিফের প্রতি আকবরীর প্রেম নিবেদন ও হানিফের খোদার প্রতি বিশ্বাসের জন্য আত্মসম্বরণ। হানিফ আকবরীব পূর্বস্মৃতি জাগবিত কবে তাকে লজ্জা দিযেছেন। পঞ্চম দৃশ্য—সৈফুদ্দিনের আত্মগ্লানি। জুলফিকবেব ছাযামূর্তি অভিশাপের কথা মনে করার। ষষ্ঠ দৃশ্য —গান। সপ্তম ও শেষ দৃশ্যে বুলবুল, সৈফুদ্দিনের কন্যা ও নাদির শাহ। ঈশ্বরভক্তি ও শযতান বিক্রম। নমাজ কবে বুলবুল নিদ্রামগ্ন হলে নাদির সে চিরনিদ্রা ভাঙাতে পারলেন না। ইতিমধ্যে তার পালিত পুত্র রূপে-বর্ণিত বেজাকুলি তাকে গুলি কবল এবং স্ত্রী আকববী তাকে বিষ পান করিযে পিতা ও পুব স্বামীব পক্ষে প্রতিহিংসা নিল। শযতান পরাজয স্বীকার করল—খোদাব অস্তিত্ব স্বীকার করে খোদার নাম মুখে নাদিবেব মৃত্যু হল। তাবপর আকবরী ও সৈফুদ্দিনের আত্মগ্লানি ও ভগবৎ বিশ্বাস। অবশেষে মোল্লাবাসী শযতানেব সাম্রাজ্য কখন স্থাপিত হবে না ইত্যাদি নাতিদীর্ঘ ভাষণে নাটকের সমাপ্তি হল।

নাট্যকার একাধিকবার জানিয়েছেন যে 'ইতিহাস ভিত্তি করিযা' এই নাটক রচিত। তলায দাগ দিযে লিখেছেন যে 'ইতিহাস অক্ষুণ্ণ রাখিযা' তিনি নাদির শাহর চরিত্র অঙ্কিত কবেছেন। দুঃখের বিষয নাটক পাঠে এই সব কথা মূল্যহীন বলেই মনে হয। প্রথম থেকেই গোলমাল। পাত্রপাত্রী পরিচয়ে নাদিরের পিতা একজন দরিদ্র অধ্যাপক অথচ ৪র্থ অঙ্ক ৫ম দৃশ্য নাদিব শাহ বলছেন—'ভেড়ীওযালার পুত্র নাদির কুলির কাছে দযার প্রত্যাশা কর!' দেখাযাচ্ছে নাদিরের পিতৃ পবিচয সম্পর্কে নাট্যকার মনস্থির করতে, পাবেন নি। নাদির কি করে পারস্য সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতির পদ পেলেন না জানার জন্য 'শযতানের' ওপর নির্ভর কবতে হয়েছে। তেমনি আহম্মদ আবদালীকে বশীভূত করতে শযতান ছাড়া কোন গতি থাকেনি। নাদির শাহের দিল্লী অভিযান সম্পর্কে নাট্যকারের অজ্ঞানতা অত্যন্ত স্পষ্ট। মনে হয় বিনাযুদ্ধে মহম্মদ শাহ আত্মসমর্পণ করলেন, মনে হয তার কোন সৈন্য-সামন্ত অমাত্য বন্ধু কেউ ছিল না। নাদিরের ভারত জয় সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক তথ্য না জানার জন্যেই নাদিরের চরিত্র মদ্য অর্থ নারীলোলুপ এক পিশাচে রূপান্তরিত হয়েছে। নাদিরের পারস্যে ফিরে যাওয়া থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঈশ্বরের

বিশ্বাস কি ভাবে শয়তানের প্রভাবকে পরাভূত করল দেখান হয়েছে। ইতিহাস কোথাও স্থান পায় নাই। সমগ্র নাটকে নাদিরশাহ, মহম্মদ শাহ, আহম্মদ আবদালী ও রেজাকুলি খাঁ প্রভৃতির নাম ভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্র দেখা যায় না। নাদির শাহর চরিত্র 'প্রহেলিকা' মনে করার একমাত্র কারণ ইতিহাস অজ্ঞতা এবং সম্ভবত কি আষাঢ়ে গল্পকে ইতিহাস বলে বিশ্বাস করার বাতুলতা।

নাদিরের ইতিহাস বলার আগে এই নাটকে কি কি তথ্য পাওয়া যায় এটা বিচার্য্য। প্রথমেই নাট্যকার বলেছেন তিন বৎসর আগে যখন নাটক "নাদির-শাহ" লিখিতে বসিয়াছিলাম'—অর্থাৎ নাট্যরচনার কাল ১৩২৫ অর্থাৎ ১৯১৮-১৯১৯। এটা জালিয়ানওয়ালাবাগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের বছর। দুই ঘটনার প্রভাবই নাটকে পড়েছে বলে মনে হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নাদিরশাহের দিল্লীবাসীদের নৃশংস হত্যাকে সহজেই সংযুক্ত করা যায়। খিলাফৎ আন্দোলনের বছর বলেই 'এই পুস্তক মুসলমান ভ্রাতৃগণের উদ্দেশ্যে' উৎসর্গিত এবং মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে থিয়েটারদেখা হিন্দু দর্শককে অবহিত করার চেষ্টা হয়েছে। আর এক বিষয়ে নাট্যকার সম্ভবত নিজের অজান্তে আমাদের অবহিত করেছেন। সেটা হল ইংরেজ সরকারকে জনসাধারণের ভয়। কোন ব্যক্তিকে ইংরেজ গর্ভনমেণ্ট অপছন্দ করলে তার অবস্থা কুষ্ঠরোগীর থেকেও শোচনীয় হত। দিল্লীর বাদশা মহম্মদ শাহের নিদারুণ নিঃসঙ্গতা ইংরেজ অপাঙতেয় মানী লোকের শোচনীয় একাকীত্বের কথাই স্মরণ করায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে কংগ্রেস তখনও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান নয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। মাত্র তিন দিন পরে ৩০শে ডিসেম্বর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ কলিকাতার মডারেটগণ অধিবেশনে মিলিত হন।[৮]

ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। তারই সুযোগে তুরস্কের অধীনস্থ সাম্রাজ্য ইংরেজ ও ফরাসী-শক্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। সুতরাং অমিত বিক্রমশক্তির আধার নাদিরশাহ, এই প্রবল পরাক্রান্ত শয়তান সেবিত ইংরেজশক্তির প্রতিভূ হয়ে দেখা দেবেন এটা বিচিত্র নয়। হয়তো ইংরেজের সঙ্গে নাদিরের মিল আর বেশী দেখান সম্ভব ছিল কিন্তু নাট্যকার

সে সুযোগ গ্রহণ করেন নি। সম্ভবত ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের বিভিন্ন নাটক রাজরোষে বাজেয়াপ্ত হবার স্মৃতি তখনও ম্লান হয়ে যায় নি। বরদাপ্রসন্ন নাদিরশাহ লিখেও স্বস্তি পান নাই তাই তার পরবর্তী নাটক "রকমারি" "শ্রীদুর্গা" এবং "সুভদ্রা"।[২]

নাট্য প্রযোজনার ইতিহাসে কিন্তু 'নাদিরশাহ' মূল্যবান। নাট্য আঙ্গিক ও দৃশ্য সজ্জা এই সময়ে (১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে) প্রভূত উন্নতি করে যার ফলে বন্যার জলপূর্ণ নদীতে সন্তরণ (১মঃ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য), গভীর বনের আঁকাবাঁকা পথে পলায়ন ও পর্বত আরোহণ (২য় অঙ্ক ৭ম দৃশ্য), প্রভৃতি চক্ষুমুগ্ধকর বহু দৃশ্য দেখান সম্ভত হযেছে। সমসাময়িক নাটকের অন্যান্য লক্ষণ এই নাটকেও পূর্ণমাত্রায় উপস্থিত—যেমন ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়, সতীত্বের অলংঘ্য তেজ, অভিশাপ, অপকীর্ত্তির পর অনুশোচনা ইত্যাদি। বস্তুত চরিত্র ও দৃশ্যের নাম বদলিয়ে দিলে অন্য নাটকের বক্তব্য বা গতিপ্রকৃতির সঙ্গে নাদিরশাহের পার্থক্য থাকবে না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নাটক হিসাবেও নাদিরশাহ অতি সাধারণ পর্য্যায়ের।

এবার ঐতিহাসিক নাদিরশাহ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। নাদির কুলি বা নদর কুলি বেগ ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে খোরাসানের এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ইমাম কুলি। এরা জাতে তুর্কী এবং আফসার গোষ্ঠির লোক। নাদিরের পিতা ছাগল ও ভেড়ার চামড়ার পোষাক ও টুপি তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বলাবাহুল্য প্রথম জীবনে নাদিরকে অত্যন্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। উজবেক দস্যুরা একবার তাকে অপহরণ করে তাতার দেশে নিয়ে যায় সেখানে চার বছর বন্দী জীবন যাপন করতে হয়। বহুকষ্টে পারস্যে ফিরে এসে তিনি ডাকাতের দল গঠন করেন এবং ডাকাতি করেই কিছুকাল জীবন ধারণ করেন। যুদ্ধের পাঠ এইভাবে নাদিরের জীবনে সুরু হয়। বলবান ও পরিশ্রমী লোক পেলেই তিনি তাদের নিজের দলভুক্ত করতেন। কিছু দিনের মধ্যেই তার দলে বহু শক্তিমান লোক যোগ দিল। পারস্যের সাফাভি বংশের দুর্বলতার সুযোগে আফগানগণ পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করল। এই বৈদেশিক আক্রমণের

সুযোগে নাদির আর্থিক উন্নতির সুযোগ পেলেন। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে পারশ্য আফগানদের পদানত হল। নাদির খোরাসান প্রদেশ আক্রমণ করে কালাট দুর্গ অধিকার করলেন। তারপরই আফগানদের আক্রমণ করে তাদের হাত থেকে নইসাবুর প্রদেশ আবার পারশ্য রাজ্যেব অধীন করলেন। কৃতজ্ঞচিত্তে সুলতান তাহমাস নাদিরকে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর অন্যতম সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। পারশ্যকে সম্পূর্ণভাবে আফগান প্রভাব মুক্ত করতে আরো দু'বছর লাগল। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির পারশ্যের প্রধান সেনাপতি পদ পেলেন। নাদিরের আহ্বানে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা তার পতাকাতলে সম্মিলিত হলেন। নাদির যেমন একাধারে বীর ও নৃশংস যোদ্ধা অন্যদিকে তেমনি বিচক্ষণ সেনাপতি ও কুশলী নাযক ছিলেন। তাঁর অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যগণ অন্ধের মতো তার আদেশ মেনে চলতেন। পারশ্যেব ত্রাণ কর্তা নাদিরকে জনসাধারণ ভক্তি করত এবং ভালবাসত। নাদির যখন পূর্ব-সীমান্তে যুদ্ধে ব্যস্ত তখন পশ্চিম সীমান্তে একেরপর এক যুদ্ধে হেবে সুলতান তাহমাস এক লজ্জাকব সন্ধি করে দুটি পাবশ্য প্রদেশ তুর্কীদেব দিতে রাজী হলেন। দেশের মধ্যে অসন্তোষেব বন্যা বযে গেল। অবশেষে ২৬শে আগষ্ট ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান তাহমাস রাজ্যত্যাগ করলেন। সমবেত সেনাপতি ও যোদ্ধাগণ নাদিরকে সুলতানের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করল কিন্তু নাদির রাজী হলেন না। তিনি তাহমাসেব আটমাস বযস্ক শিশুপুত্র আব্বাসের নামে পারশ্য শাসন সুরু কবলেন। চার বছর পর এই শিশুসুলতানের মৃত্যু হওযায় শাহানশাহ নাদিরশাহ পারশ্যরাজ হলেন ২৬শে ফেব্রুযারী ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে।[১০]

কেবলমাত্র এশিযা নয ইওবোপ ভূখণ্ডে নাদিরশাহকে অস্ত্র ধরতে হয়েছে। ইওরোপের রাজনীতিই নাদিরের উন্নতির পথে প্রধান সহায। পোলাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তখন বিভিন্ন ইওবোপীয় রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনীতির খেলা চলছে। রুশ ও অস্ট্রিযাব স্বার্থ তুরস্ককে অন্যত্র ব্যস্ত রাখা। পারশ্যের সঙ্গে যদি তুরস্ক যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তার দৃষ্টি সর্বদা দক্ষিণ সীমান্তে আটক থাকবে উত্তর ও পূর্ব সীমান্তে নূতন যুদ্ধে লিপ্ত হবার জন্যে সে ব্যাগ্র হবে না। তাহামাস তুরস্কের সঙ্গে লজ্জাকর সন্ধি করায় রুশ শক্তিকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখা যায়। তাহমাসের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিদ্রোহে ক্ষে

রুশ হস্তক্ষেপ একেবারে ছিলনা তা মনে করা কঠিন। তাই তাহমাসের রাজ্যচ্যুতির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রুশদেশ থেকে প্রতিনিধিদল পারস্থে আসেন নাদির শাহকে অভিনন্দন জানাবার জন্য। এই দৌত্যের ফলে রুশ ও পারস্থ বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। রুশ দেশ থেকে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি লাভের প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যায়। তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে নাদির শাহ প্রথমে হীরাট প্রদেশ (মহারাজ চন্দ্রগুপ্তর সময় ভারতের অন্তর্গত ছিল) ও পরে আজারবাইজান ও টাব্রিজ অধিকার করলেন। জয়ের আনন্দে অধীর নাদির শাহ ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে বাগদাদ অবরোধ করলেন। এই অতিপ্রসারণের ফল অচিরে দেখা গেল। তুরস্কের প্রবীন যোদ্ধা বীর টোপাল ওসমান প্রথমে সুমেরাতে ১৯শে জুলাই এবং কয়েক মাস পরে লাইতানে পারস্থ শক্তিকে সম্পূর্ণ পরাজিত করলেন। কিন্তু পরাজয়ের পর সেই সব এলাকাকে পুনরাক্রমণের বিরুদ্ধে সংগঠিত করার কোন চেষ্টা তুরস্ক সম্রাট করলেন না। পরাজয়ে যুদ্ধ বিদ্যায় নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নাদিরশাহ আবার আক্রমণ করলেন। মেনদেলির যুদ্ধে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হল। বীর যোদ্ধা টোপাল ওসমান নিহত হলেন। এই সুযোগে রুশ রাণী অ্যান ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধির সর্ত অমান্য করে জর্জিয়া প্রদেশ পারস্থকে দিয়ে দিলেন। সন্ধির সর্ত ছিল পারস্থ রাজ্যের কয়েকটি প্রদেশ তুরস্ক ও রুশদের অধীনে থাকবে। জর্জিয়া থেকে তুর্কীদের তাড়িয়ে দিতে নাদিরের বেশী সময় লাগল না। তুরস্কের সঙ্গে এরজেরামে নাদিরশাহ নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করলেন ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। তদনুযায়ী দুটি বিরাট প্রদেশ জর্জিয়া ও আজারবাইজান পুনরায় পারস্থ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। বর্তমানে এই দু'টি প্রদেশই রুশ অধিকৃত। নামে লক্ষণীয় হল রুশ চরিত্র। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সন্ধি পত্র পাকাপাকি ভাবে লিখিত হল। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রুশ রাজনীতি সফল হল। তাদের মনোনীত চতুর্থ চার্লস পোল্যাণ্ডের শাসক হলেন। নাদির শাহের বন্ধুত্বে যে এটা সম্ভব হয়েছে একথা বলা বাহুল্য মাত্র।[১১]

পশ্চিম সীমান্তকে সুরক্ষিত করে নাদির শাহ আশি হাজার সৈন্য নিয়ে কান্দাহারের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন, উদ্দেশ্য এবার পূর্ব সীমান্তের সুরক্ষা।

এক বছর ধরে যুদ্ধ চলল অবশেষে ১২ই মার্চ ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ কান্দাহার সহর ও দুর্গের পতন হল। বিজয়ীর আদেশে দুর্গকে সমভূমি করে এক নূতন সহর গড়ে তোলা হল তার নাম হল নাদিরাবাদ। কিন্তু কালের গতি এমনই হাস্যকর যে এই সহরই এখন নয়া কান্দাহার নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। আফগানদের সঙ্গে নাদির অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করেন। খিলজাই ও আবদালী গোষ্ঠী তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁর অধীনে চাকুরী ও সৈনাপত্য গ্রহণ করে। দয়ালু শত্রু এবং মহান নেতা হিসাবে নাদিরের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।[১২]

দেখা যাচ্ছে রক্তলোলুপ পিশাচ বলে নাদিরের যে ছবি আঁকা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তার সৈন্যদলও লুণ্ঠনপ্রিয় একদল বর্বর ছিলনা। যুদ্ধ অভিজ্ঞ নাদিরশাহ একাধারে বীর ও রাজনৈতিক ছিলেন। দিগ্বিজয়ের কোন আকাঙ্খাই তার ছিল না। তাঁর ভারত আক্রমণের পেছনে ছিল অর্থলাভের সুযুক্তি। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার আগে অন্য নাটকটি পরীক্ষা করা যাক।

দিগ্বিজয়ীর নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রথমাবধি স্থির করে ফেলেছেন যে নাদিরশাহ দিগ্বিজয় করতেই ভারতে আসেন। 'নিবেদন' লিখতে গিয়ে তিনি এটাকে ঐতিহাসিক নাটক আখ্যা দিয়েছেন—'নাটকখানি ঐতিহাসিক হইলেও ইহার মূল ভাবটি চিরন্তন।' 'নায়ক ইতিহাস বিশ্রুত শক্তিমান পুরুষ এবং ঐতিহাসিক গবেষণার দিক দিয়া না হইলেও, নাটক লিখিবার (দিক) দিয়া তাহার ও সমসাময়িক ঘটনাবলীর ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য নয়।' অতি উত্তম কথা এবং অত্যন্ত সত্যি কথা। এবার নাট্যকার কি ভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংগ্রহ করেছেন দেখা যাক। 'ঐতিহাসিক স্যার-মর্টিমার ডুর‍্যাণ্ড ইতিহাস ও কিংবদন্তি মিশাইয়া নাদিরশাহের একখানি সুখপাঠ্য জীবনী লিখিয়াছেন, নাটকের গল্পাংশ গঠনে আমি দু' একটি স্থলে সেই পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি।' প্রথম কথা এই যে মর্টিমার ডুর‍্যাণ্ড ঐতিহাসিক নন—তিনি লিখেছেন নাদিরের জীবনী নয়—নাদির শাহকে নায়ক করে গল্প। কিন্তু স্যার মর্টিমার নাদির শাহর ইতিহাস পাঠ করেছেন গল্পে এমন নিদর্শন আছে। নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী সে গল্পও সম্পূর্ণ

গ্রহণ করেন নাই ফলে নাদিরের চরিত্রের প্রধান গুণ তার খরদীপ্ত বুদ্ধি ও নেতৃত্ব করার সহজাত ক্ষমতা অপ্রকাশ্য থেকে গেছে। নাদির শাহের সঙ্গে যারা নেপোলিয়নের তুলনা করেন তারা যেন চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে মেবারেব রাণা প্রতাপ সিংহের তুলনা করেন। একজনার উদ্দেশ্য ছিল ছিন্নবিছিন্ন ভারত সাম্রাজ্যকে একতা সূত্রে গেঁথে তোলা। উপায় যুদ্ধ এবং সহজ জয় লাভে এই কার্য্যের হাতিয়ার, বুদ্ধি, বৃহৎ অর্থে রাজনীতি। অন্যজনার উদ্দেশ্য নিজের দেশ ও জাতির উন্নতি। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারলে শান্তি বিরাজিত হবে—তবেই দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সম্ভব। উভয়েই বীর কিন্তু এঁদের বীরত্ব প্রকাশের ধরন ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। নেপোলিযনের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ইওরোপ ও এশিয়ার কিছু অঞ্চলকে জুড়ে তার ব্যক্তিগত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। নাদির শাহের উদ্দেশ্য আরামে পারশ্য শাসন এবং অর্থকষ্ট দূর করবার জন্যে মাঝে মাঝে অন্য রাজ্য লুণ্ঠন। বস্তুত ভোগবিলাস ও স্ত্রীলোকাসক্তি নাদিরের পতনের অন্যতম কারণ। শরীরে জরার আক্রমণের বৃদ্ধির সঙ্গে তার ভোগ লালসা আকাশচুম্বি হয়ে উঠল। নাট্যকার আরো বলছেন 'কোন স্থলেই আমি ইচ্ছা করিযা ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করি নাই এবং নাটকের বাহিরের ঐতিহাসিক রূপটিকে অবহেলা করি নাই, তবে স্বাধীন কল্পনায় নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিকের যে চিরন্তন অধিকার আছে, তাহা আমি অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছি।' সহজ সরল ভাষায় এই কথাগুলোর অর্থ কি? এ যুক্তি কোন যুক্তিই নয় কেবল যুক্তির নামে বিভ্রম সৃষ্টিকারী। এই কথাগুলিকে সামনে থেকে পেছনে পাঠ করা যায়; পেছন থেকেও সামনে পাঠ করা যায় কিন্তু কোন মানে পাওয়া যায় না।

দিগ্বিজয়ী নাটক যে নাদির শাহ নাটক অনুসরণ করে লেখা হয়েছে তার প্রমাণও নাটকে রয়েছে। নাদির শাহকে অতি মানব হিসাবে দেখাবার চেষ্টা এবং ধর্ম সম্পর্কে তার অবিশ্বাস দুই নাটকেরই প্রতিপাদ্য। কয়েকটি চরিত্র যেমন মোল্লাবাসী, প্রতিহিংসাপরায়না প্রথম নাদির মহিষী এখানে নাম, সুলতানা বেগম এবং বাদশাহ মহম্মদ শাহ এক ছাঁচে সৃষ্ট। নাদিরের ছেলেদের নামে একই ভুল। প্রথম ভুলই দ্বিতীয় ভুলের জনক

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। উভয় নাট্যকারই মহম্মদ শাহকে ভীরু বৃদ্ধ ও অসহায় ব্যক্তি রূপে চিত্রিত করেছেন। কাপুরুষ প্রতিপক্ষ হওয়ায় নাদিরের যুদ্ধকুশলতা বা বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখাবার প্রযোজন হয় নাই। বরদাপ্রসন্ন নাদিরশাহকে শয়তানের প্রতিনিধি করেছেন। যোগেশচন্দ্র একধাপ এগিযে এসেছেন। নাদিরের মুখে সংলাপ দিয়েছেন—'আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি—জগতের শাস্তিদাতা।' বিষযকে আরো স্পষ্ট করার জন্য বলা হযেছে—'যে ঈশ্বর রাত্রিদিন সর্বভূতে দযা করে—ক্রেস্তান সাধুর, সুফি কবির, হিন্দু বৈষ্ণবের সে ঈশ্বর নয়—এক প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বরের। যে মানুষের সামান্য ত্রুটীও ক্ষমা করে না, জাতির ত্রুটী ক্ষমা করে না—সেই ক্ষমাহীন, দয়াহীন, বিচারক ঈশ্বর, আমায পৃথিবীতে পাঠিযেছে—পাপীর দণ্ড-বিধান করতে।' নাদিরশাহকে হত্যা করার সময় তার ভূতপূর্ব বন্ধু সালেহ বেগের মুখে একই ধর্মের আভাষ পাই। সালেহ বেগ নাদিরকে আঘাত করার সময বলছেন—'তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করবো না। প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বর আমায় পাঠিযেছে—তোমার মনুষ্যত্ব আবরনকারী গর্বী পশুকে হত্যা করে ইরাণকে তোমার হাত থেকে মুক্ত করতে।' নাট্যকারের সম্ভবত জানা ছিল না যে প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বর, জিহোবার ধর্ম। এই জিহোবার ধর্ম পালনে রত, ইহুদিদের এই সম্প্রদায় (Bible এর Old Testament এ যারা বিশ্বাসী) মুসলমানদের জ্ঞাতি শত্রু ও জাতির শত্রু। গোঁড়া মুসলমান নাদিরশাহকে সহসা জিহবাপন্থী বলা কেবলমাত্র অনৈতিহাসিক নয় অনৈতিক ও অন্যায়। তৈমুরলং নিজেকে বলতেন ভগবানের চাবুক। সম্ভবত সেই বাক্যের সঙ্গে নাদিরশাহকে যুক্ত করার ফলে এই অপকীর্তি সংঘটিত হয়েছে। পূর্বে বলা হয়েছে যে ধর্মের ব্যাপারে নাদিরশাহ চিরকালই রক্ষণশীল। সিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত সুলতান তাহমাসকে রাজ্যচ্যুত করে সুন্নী সম্প্রদায়ের নাদিরশাহ পারশ্য সম্রাট হওয়ায় তার রক্ষণশীল হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সেই জন্য সুন্নী সম্প্রদায় ভুক্ত জনৈক মোগল রাজকুমারীর (মহম্মদ শাহের কন্যা নয়) সঙ্গে নিজের কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিতে নাদির উৎসুক হয়েছিলেন। *এই রাজনৈতিক বিবাহের ফলে নাদিরশাহের ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ঐতিহাসিক নাটকের নাট্যকাররা প্রায়ই নিজেদের বিশ্বাস ও চিন্তা অনুসারে সংলাপ চরিত্রের মুখে যোগ করেন কিন্তু একবার ভেবে দেখেন না যে ইতিহাসের আবহাওয়াতে সেই চরিত্রের মুখে সেই সংলাপ উপযুক্ত কি না। এই নাটকে এই ধরনের ঘটনার প্রাচুর্য্য আছে। সুফীকবি, ক্রেস্তান সাধু ও হিন্দু বৈষ্ণব সম্পর্কে নাদিরশাহর সংলাপ অত্যন্ত বিসদৃশ। নাদির প্রায় নিরক্ষর ছিলেন। পাণ্ডিত্যের প্রশংসা তিনি কখন পান নি এবং পাবার প্রযোজনও অনুভব করেননি।

দিগ্বিজয়ী নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত প্রতি অঙ্কে একটি করে দৃশ্য কেবল মাত্র পঞ্চম অঙ্কে দুইটি দৃশ্য। প্রথম অঙ্কের দৃশ্য—কর্ণালে নাদিরশাহের শিবির। কর্ণাল যুদ্ধের পর দিবস—রাত্রিকাল। দ্বিতীয় অঙ্কে দিল্লীর রাজপ্রাসাদ, বেগম মহল। তৃতীয় অঙ্কে—দিল্লীর চাঁদনী চকে রুকনুদ্দৌল্লা মসজিদের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গন। চতুর্থ অঙ্ক—মেশেদ রাজপ্রসাদ, হারেমের কক্ষ ও পঞ্চম অঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে যথাক্রমে—খোরাসানের পল্লীস্থ প্রান্তর ও খোরাসনের গ্রাম্য প্রান্তরে সম্রাটের শিবিরাভ্যন্তর। সুতরাং এই নাটককে নাদিরের জীবনের শেষাংশের ঘটনাবলীর নাটক বা ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ ও তার পরবর্তী কালের নাটক বলা যেতে পারে। ভারতে অবস্থিতি প্রথম তিন অঙ্কের প্রতিপাদ্য অর্থাৎ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের এবং শেষ দুই অঙ্ক তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বকালের অর্থাৎ ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা।

ভারতবর্ষে নাদিরশাহের অবস্থান সম্পর্কে বহু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই সব বিবরণ সমসাময়িক হিন্দু ও মুসলমানদের লেখা। এই সকল তথ্য মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শীর রচনাও রয়েছে। তাছাড়া নাদির পক্ষীয় পারশ্যের যোদ্ধাদের বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। নাদিরশাহের ভারত আক্রমণ তাই দুই দিক থেকেই দেখা সম্ভব। আচার্য্য যদুনাথ সরকার হেনরী আরভিন অনুসরণে এইসব প্রামান্ত তথ্যের সহযোগে Later Mughals বই এর দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অধ্যায়ে নাদিরের অভিযান বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

দুঃখের বিষয় নাদিরশাহ সম্পর্কিত আলোচ্য নাটক দুটির কোনটাই

নাদিরশাহের ভারত বিজয় দেখান হয় নাই। ভারত বিজয়ের পরবর্ত্তী ঘটনা অর্থাৎ করনাল যুদ্ধের পরবর্ত্তি ঘটনাই দেখান হয়েছে। নাদিরশাহের চরিত্র বুঝতে হলে, হয় তুরস্ক যুদ্ধ নয় ভারত যুদ্ধ অনুধাবন করা কর্তব্য। দু'টি নাটকই সযত্নে এই পরিশ্রমকে এড়িয়ে গেছে। নাটকে যুদ্ধ বা যুদ্ধের প্রস্তুতি ও ফলাফল কি ভাবে দেখান সম্ভব এ প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য হলে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একাধিক নাটকের উল্লেখ করা যায় যেমন চন্দ্রগুপ্ত নাটকে নন্দর সঙ্গে যুদ্ধের পূর্বক্ষণে চাণক্য মুরাকে দিয়ে চন্দ্রগুপ্তকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধের বূ্যহ রচনা করেছেন। সাজাহান নাটকে ঔরঙ্গজীবের যুদ্ধ প্রস্তুতি, মেবারপতনে যুদ্ধের ফলাফল। নাদিরের মতো বিচক্ষণ যোদ্ধার সুনামের একমাত্র কারণ বিভিন্ন রণকৌশল সম্পর্কে তার গভীর বোধ, অবর্ণনীয় সাহস, প্রচণ্ড অবিমৃষ্যকারিতা এবং সার্বিক সফলতা। সহজাত নেতৃত্বের যে কবচকুণ্ডল নাদিরশাহের অঙ্গাভরণ ছিল তা বারবার তার গলে জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছে। কাবুল যুদ্ধ থেকে করনাল যুদ্ধ পয্যন্ত অনুধাবন করলে দেখা যায় যে অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বের অধিকারী হয়েও নাদির শাহ কখনই সোজাসুজি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন নাই। কুরুক্ষেত্রের কাছে করনাল রণাঙ্গনে দেখা যাবে যে জয়লাভই নাদিরের মুখ্য লক্ষ্য এবং সেজন্য নানা উপায়ে শত্রুপক্ষকে দুর্বল করে হঠাৎ দুর্ব্বার বেগে শত্রুর সামনে এসে ঝটিকাগতিতে তাদের বিভ্রান্ত করে চলে যেতেন। পরমুহূর্তে নাদিরের আর এক বাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে হতচকিত শত্রুকে বিনাশ করত। মোগল রাজত্বের রণকৌশল যা তখনও ভারতবর্ষে চলে এসেছে তা নাদিরশাহের এই যুদ্ধ পদ্ধতিতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। হলদিঘাটের যুদ্ধ (মেবারের রাণা প্রতাপের সঙ্গে আকবর বাদশাহর), সামুগড়ের যুদ্ধ (দারাশিকোহর সঙ্গে ঔরঙ্গজীব ও মুরাদের সম্মিলিত বাহিনীর) বা জজৌ এর যুদ্ধ (ঔরঙ্গজীবের পুত্রগণের মধ্যে) রীতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। করনালের যুদ্ধের সঙ্গে প্রকৃতিগত বা নিয়মগত কোন মিল নাই।

১০ই মে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পারস্যসম্রাট শাহানশাহ নাদিরশাহ উত্তর আফগানিস্থান অভিযান করলেন। এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল

আফগান দস্যুদের শাস্তি দেওয়া। এই দস্যুরা প্রতি বছর পারস্য সীমান্তে নাগরিক ধনপ্রাণ লুণ্ঠন করত। 'মুখর' নামে একটি ঝর্ণা তখন ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের সীমান্ত বলে গন্য হোত। সুতরাং তর্কের খাতিরে যদিও বলা যায় যে এই ঝর্ণা অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত অভিযান সুরু কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নাদিরশাহের তখনও ভারত আক্রমণের কোন কল্পনা ছিল না। সীমান্ত অতিক্রম করে নাদির কারাবাগ সহরে ঘাঁটি স্থাপনা করলেন ও কনিষ্ঠপুত্র নাসিরুল্লা বা নাসর-উল্লার অধীনে একদল সৈন্যকে উত্তর পশ্চিম কাবুলের আফগানদের শায়েস্তা করতে পাঠালেন। ৩১ মে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গজনী নাদিরের বশ্যতা স্বীকার করল। গজনীর গন্যমান্য ব্যক্তিদের বহু সম্মানে ভূষিত করে তিনি তার বাহিনীর পশ্চাৎভাগ ও পার্শ্ব সুরক্ষিত করে কাবুল অভিযান সুরু করলেন ১০ই জুন। ইতিমধ্যে নাদির পুত্র উত্তর দিক থেকে কাবুল আক্রমণ করেছেন। সাতদিনের কঠোর নিষ্করুণ যুদ্ধের পর ১৯ শে জুন কাবুলের পতন হোল। কাবুল যুদ্ধই ভারত আক্রমনের সুত্রপাত। কাবুলে নাদিরশাহ চল্লিশ দিন অবস্থান করেন। এখান থেকেই ভারতসম্রাট মহম্মদশাহকে তিনবার পত্র লেখেন যে পলায়ন পর যে সব আফগানরা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করছে তিনি যেন তাদের ধরে নাদিরশাহের কাছে পাঠিয়ে দেন। মহম্মদ শাহের সঙ্গে পারস্যের বন্ধুত্ব সূচক চুক্তি স্মরণ করিয়ে নাদির পারস্য রাজদূতকে বৎসরাধিককাল দিল্লীতে নানা ছুতায় আটকিয়ে রাখার অভিযোগ করেন। তিনি আরো লেখেন যে আফগানরা পারস্য দেশের থেকেও ভারতবর্ষে অত্যাচার বেশী করছে। আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযান করে তিনি ভারতের প্রকৃত বন্ধুর কাজই করছেন, সে জন্য ভারতসম্রাটের উচিত তাকে পরিপূর্ণ ভাবে সাহায্য করা। কিন্তু সম্রাট মহম্মদ শাহের কাছে পৌছবার আগেই জালালাবাদে নাদিরশাহের এই পত্র বাহকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তা সত্বেও যারা বাদশা মহম্মদ শাহর কাছে যাবার চেষ্টা করে তাদের হত্যা করা হয়। দুতের বধের খবর পেয়ে নাদির ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যে (১লা জুলাই ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) কনিষ্ঠ পুত্র নাসিরুল্লা উত্তর কাবুল জয় করে পিতার সঙ্গে মিলিত হলেন। এই সম্মিলিত বাহিনীর আক্রমণ রোধ করা যে কোন শক্তির পক্ষেই কঠিন। অতি সহজেই জালালাবাদ নাদিরের হস্তগত হল

৭ই সেপ্টেম্বর ১৭৩৮ খ্রীঃ। জালালবাদ জয় করা মানেই মোগল শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া একথা বুঝতে নাদিরশাহের দেরী হয়নি। ভারত যুদ্ধ দীর্ঘদিন ধরে চলবে এবং বহু লোকক্ষয় হবে এমন কি তার নিজের জীবনও বিপন্ন হতে পাবে এ আশঙ্কা নাদির করেছিলেন। তাই দেখা যায় দীর্ঘদিন ধরে সমর প্রস্তুতি। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জা রেজাকুলিকে পারশ্যে ফেরৎ পাঠালেন তাঁর প্রতিনিধি হয়ে সাম্রাজ্য শাসন করবার জন্য। তাঁর ভারতে মৃত্যু হলে যাতে মির্জা রেজাকুলি সহজেই দেশের রাজা হতে পারেন তাই তার নামকরণ হল সহকারী সুলতান বা রাজপ্রতিনিধি। ভারতবর্ষের সঙ্গে দীর্ঘযুদ্ধে লিপ্ত হবার আগে নাদিরশাহের এই কীর্তিগুলিতে তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা ও শাসকের কর্তব্য সম্পর্কে বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নাদিরশাহ মাত্র ১২০০ অশ্বারোহী এবং ৬০০০ পদাতিক সৈন্য নিয়ে পেশোয়ারের পথে যাত্রা করলেন ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর। পেশোয়ারের মোগল রাজ্যপাল নাসির খাঁ ২০০০০ সৈন্য নিয়ে তার গতিরোধের জন্য প্রস্তুত হলেন। খাইবার গিরিবর্ত এক দুর্ভেদ্য প্রণালী। মুষ্টিমেয় সৈন্য সেখানে বিরাট বাহিনীর গতিরোধ করতে পারে। নাসির খাঁ খাইবারে নাদিরশাহের গতিরোধ সম্পর্কে পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন। নাদিরশাহের রণকৌশল সম্পর্কে অজ্ঞতাই নাসির খাঁর পরাজয়ের কারণ (১৫ই নভেম্বর ১৭৩৮ খ্রীঃ)। নাদিরশাহ প্রচলিত পথে না এসে দুর্গম ও দুস্তর গিরিপথ ধরলেন। তারপর অতিকষ্টে ঘোড়াসুদ্ধ পাহাড়ের ওপর আরোহন করে তীব্রবেগে পাহাড় থেকে নেমে পাশ থেকে মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। একদিনে পঞ্চাশ মাইল অতিক্রম করে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করাই কঠিন কিন্তু দুর্গম বিপদসঙ্কুল পাহাড়ে পথ অতিক্রম করে পথহীন গিরিশিখরে উঠে ঝড়ের মতো নেমে আসা যে কতো অসম্ভব ব্যবস্থা তা বোঝাবার প্রয়োজন রাখে না। নাদিরশাহ বারবার এই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। নাসির খাঁর বাহিনী যে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম করছিল সেখান দিয়েই নাদিরশাহের আক্রমণে বিভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। পেশোয়ার নাদিরশাহের করতলগত হল।

পেশোয়ারের পর লাহোর। এ্যাটকে সেতু বানিয়ে নাদির সিন্ধু নদ পার হলেন। ১২ই জানুয়ারী ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ লাহোরের পতন সুরু হল। লাহোরের বীর রাজ্যপাল জাকারিয়া খান পরাজিত হলেও নাদিরের কাছে ভাল ব্যবহারই পেয়েছেন। লাহোরে নাদিরশাহ ষোলদিন ছিলেন এবং মহম্মদ শাহের যুদ্ধ প্রস্তুতির সঠিক খবর এখানে বসেই সংগ্রহ করেন। যার ফলে উনি ঘোষণা করেন যে তিন দিনের মধ্যে কুড়ি লক্ষ টাকা না পেলে তিনি সমস্ত নগরবাসীকে হত্যার আদেশ দেবেন। শেষ পর্য্যন্ত জাকারিয়া খান সরকারি তহবিল থেকে এবং লাহোরের অর্থবান নাগরিকদের কাছ থেকে এই অর্থ সংগ্রহ করে লাহোর রক্ষা করেন।

নাদিরশাহ এবার বাদশাহ মহম্মদশাহকে চমৎকার এক পত্র দিলেন। তিনি লিখলেন যে তিনি বন্ধুভাবেই ভারতে এসেছেন। কেন যে মহম্মদশাহ তাঁকে বার বার আক্রমণ ও আঘাত করছেন তা তাঁর অনধিগম্য। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য পলাতক আফগানদের বন্দী করা এবং সে কাজ সম্পন্ন হলেই তিনি পারস্যে ফিরে যাবেন। মহম্মদশাহ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হচ্ছেন এ খবর পেয়ে তিনি খুবই মর্মাহত হযেছেন। তিনি ও মহম্মদশাহ উভয়েই সুন্নী মতাবলম্বী, তুর্কীজাতি ও তৈমুরের বংশধর সুতরাং নাদির সর্বদাই মহম্মদশাহর বন্ধুত্বই কামনা করেন। তবুও যদি মহম্মদশাহ যুদ্ধ চান, নাদিরশাহ তাকে শিক্ষা দিতে প্রস্তুত। তবে এই যুদ্ধেব ফলে তার রাজত্ব ছারখার হয়ে যাবে।

বাদশাহ মহম্মদশাহ এই পত্রের জবাব দিলেন না। নাদিরশাহ অবশ্য পত্রের জবাব পাবার জন্যে বসে ছিলেন না। তাঁর অভিযান চলল পাঞ্জাবের ভেতর দিয়ে। ওয়াজিরাবাদ, যামিনাবাদ, গুজরাট ও জলন্ধর সহরগুলি একে একে নাদিরের অত্যাচারে নিশ্চিহ্ন হল। নূতন আর এক বিপদ দেখা দিল। নাদিরবাহিনী চলেযাবামাত্র অরক্ষিত সহর ও গ্রামবাসীদের ডাকাতের দল আক্রমণ করে লুণ্ঠন করতে লাগল। ৫ই ফেব্রুয়ারী সারহিন্দের পতন হল। ৮ই ফেব্রুয়ারী স্বয়ং বাদশাহ মহম্মদ শাহের নেতৃত্বে বিরাট মোগল বাহিনী করনালে সমবেত হতে আরম্ভ করার আগেই নাদিরশাহের নেতৃত্বে ৭ই ফেব্রুয়ারী আম্বালার পতন হল। পিছনের সব বাধা দুরিভুত করে নাদিরশাহ করনালে উপস্থিত হলেন।

কুরুক্ষেত্রের বাইশ মাইল দক্ষিণে করনালের অবস্থান। করনালের কুড়ি-মাইল দক্ষিণে পানিপথের অবস্থিতি। বাদশাহ স্বয়ং রাজ্যের প্রধান আমিরগণ-সহ করনালে সমবেত হলেন। তৎকালীন নিয়মানুসারে বেগমবাঁদী শিবির ও শকট সবই তাদের অনুগমন করল। ফলে দেখা গেল বাদশাহর এই যুদ্ধ শিবিরের জনসংখ্যা বার লক্ষ। এই সংখ্যার মধ্যে এক লক্ষ সৈন্য। সমগ্র শিবিরের পরিধি হল বার মাইল স্কোয়ার (অর্থাৎ ১২ × ১২)। মাটির দেওয়াল দিয়ে শিবিরের চারিদিক সুরক্ষিত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু অল্প সময়ে বার মাইল প্রাচীরবদ্ধ করা সহজ নয় কাজেই বহু জায়গা উন্মুক্ত থেকে গিয়েছিল। মহম্মদশাহ নাদিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় কোন কার্পণ্য করেন নি। কেবল যুদ্ধের প্রস্তুতিতেই এককোটি টাকা ব্যয়িত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে বাদশাহের প্রধান উপদেষ্টারা উপস্থিত ছিলেন উজির বা মহামন্ত্রী ইতমাৎ-উদ-দৌল্লা কামারুদ্দিন খান, ভকিল বা প্রতিনিধি নিজাম-উল-মুলুক আসফ ঝা এবং আমির-উল-উমরাও বক্সী বা প্রধান সেনাপতি খান দুরান। অযোধ্যার নবাব সাদৎখান ১২ই ফেব্রুয়ারী মধ্যরাত্রে এসে পৌছলেন।

অন্যপক্ষে নাদিরশাহের শিবিরের জনসংখ্যা একলক্ষ ষাট হাজার তার মধ্যে পুরুষের পোষাকে সজ্জিত ছয় হাজার অশ্বারোহী স্ত্রীলোক ও পঞ্চান্ন হাজার সৈন্য। এই ৫৫০০০ সৈন্যের অধিকাংশ অশ্বারোহী বা উস্ট্রারোহী। উটের পিট থেকে দুই পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হাল্কা কামান করনাল যুদ্ধের চমক দেওয়া পাশুপৎ অস্ত্র।

নবাব সাদৎ খান যখন বাদশাহর সঙ্গে যোগ দিতে এলেন তখন নাদিরশাহী বাহিনী যে প্রায় পানিপথ থেকেই তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে তা তার অজ্ঞাত ছিল। সৈন্যবাহিনী সহ সাদৎ খান নবাব শিবিরে প্রবেশ করলে, তাঁর রসদবাহী পাঁচশত উট আটক করে নাসিরুল্লা পারশ্য শিবিরে নিয়ে গিয়ে তুললেন। রসদের অভাব বাদশাহের বিরাট শিবিরকে পঙ্গু করে দেবে বুঝতে নাদিরের একটুও দেরী হয় নি। তাই খুব ছোট ছোট অশ্বারোহী দলে বিভক্ত হয়ে দিল্লীর বাদশাহের শিবির থেকে মকাই বা অন্য খাদ্য সামগ্রী, ঘাস ও জ্বালানী প্রভৃতি নিয়মিত অপহরণ করা শুরু হয়। মোগলবাহিনীর সব থেকে বড় দুর্বলতা প্রকাশিত হল মন্ত্রণাসভায়, দেখা গেল বারজন প্রধান সভাসদের

কেউ কাউকে সহ্য করতে পারেন না। এবং সকলেই সকলের প্রতি ঈর্ষাতুর। সবাই ভেবেছেন যে তিনি একা নাদিরশাহকে বন্দী করে এনে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হবেন। নাদিরশাহের শিবিরের ধনরত্ন লাভের লোভও কম ছিল না।

মঙ্গলবার ১৩ই ফেব্রুযারী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পারস্য বাহিনীকে অদূরে দেখা গেল। সবার নিষেধ অমান্য করে সাদৎখান তার কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে নাদিরশাহকে বন্দী করার লোভে আক্রমণ সুরু করলেন। নাদিরশাহ এমন সুযোগের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করছিলেন। বাদশার শিবির আক্রমণ করতে হলে এক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও অবরোধের আশ্রয় নিতে হত কিন্তু বাদশার বাহিনী আক্রমণ করায় যুদ্ধ সহজ হয়ে গেল। সাদৎ-খানের আক্রমণ পারস্য বাহিনী প্রতিহত করল না বরঞ্চ হেরে যাবার অভিনয় করে সবাহিনী সাদৎখানকে তিনচার মাইল দূরে একটি টিলার কাছে সরিয়ে নিয়ে গেল। টিলার কাছাকাছি আসামাত্র পারস্য অশ্বারোহী বাহিনী অদৃশ্য হয়ে গেল আর টিলার ওপর জেগে উঠল হাল্কা কামানবাহী উটের বাহিনী। গোলাবর্ষনে দলে দলে সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। বীরের মতো যুদ্ধ করে সন্ধ্যা নাগাদ সাদৎখান বন্দী হলেন। এদিকে সাদৎখানের অভিযানের খবর পেয়ে অপ্রস্তুত সৈন্যদল নিয়ে খান দুরানকেও যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে হল। কিন্তু সাদৎখানের বাহিনীর সঙ্গে তিনি মিলিত হতে পারলেন না। মাত্র ৫০০ অশ্বারোহীর এক একটি পারস্য সৈন্যদল ঝটিকাবেগে তাঁর সৈন্যবাহিনী বিনষ্ট করে চলে যেতে লাগল। ফলে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে চলে গেলেন। অবশেষে নাদিরশাহ স্বয়ং মাত্র একহাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে খানদুরানের সৈন্যবাহিনীর মাঝে আক্রমণ করলেন। সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। খান দুরান সাংঘাতিক ভাবে আহত হলেন। তাকে বহুকষ্টে শিবিরে নিয়ে আসা হল। দু'দিন পর ১৫ই ফেব্রুয়ারী তার মৃত্যু হল। বহু সেনাপতি সহ মোগল পক্ষের মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় কুড়িহাজার। পারস্যদের মৃতের সংখ্যা মাত্র ২৫০০। সন্ধি করা ছাড়া মুহম্মদ শাহের গত্যন্তর থাকল না। খাদ্য ও রসদের অভাবে এবং আহত সৈন্যদের চীৎকারে মোগল শিবির নরকের রূপ নিয়েছিল। বন্দী

সাদাৎখানের অনুরোধে নিজাম-উল-মুলুক আসফ ঝা সন্ধির শর্ত আলোচনা করার জন্য ১৪ই ফেব্রুয়ারী নাদিরশাহের শিবিরে উপস্থিত হলেন। নগদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এবং সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ পাবার সর্তে রাজী হয়ে নাদির আসফ ঝা মারফৎ বাদশাহ মহম্মদশাহকে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। বিজয়ী পারস্যরাজের এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করার ক্ষমতা বাদশাহ মহম্মদশাহের ছিল না। ১৫ই ফেব্রুয়ারী দুই সম্রাট মিলিত হয়ে একত্রে পান ভোজন করলেন। নাদিরশাহর সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে মহম্মদ শাহ মুগ্ধ হলেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী খানদুরানের মৃত্যু হলে বাদশাহ আসফ ঝার ছেলে ফিরুজ জঙ্গকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতিদের অসন্তোষ প্রকাশিত হল। আসফ ঝার নবীন পুত্র প্রধান সেনাপতি হওযায অন্যান্য প্রধান সেনাপতিগণ অসন্তুষ্ট হলেন। সাদৎখানের প্ররোচনায নাদিরশাহ কুড়িকোটি টাকা দাবী করলেন এবং নিজাম-উল-মুলুক আসফ ঝাকে এই টাকা সংগ্রহের জামিনদার করলেন এ ছাড়া নাদিরশাহের নিজস্ব প্রয়োজনে কুড়ি হাজার সৈন্য চাওয়া হল। বাদশাহ ও আসফ ঝা হঠাৎ আলোচনাপ্রবাহ পরিবর্তনে, ঘটনার বৈচিত্রে এবং নাদিরের দাবীতে স্তম্ভিত হযে গেলেন। বাদশাহর শিবির অবরুদ্ধ হল এবং সকলে অবর্ণনীয কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করলেন। অবশেষে নিজামকে সঙ্গে করে ভারত সম্রাট মহম্মদ শাহ ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ আত্মসমর্পন করলেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী বাদশাহর বেগম, সন্তান, পরিচারক মায় তাঁবু ও জিনিষ পত্র পর্য্যন্ত পারস্য শিবিরে নিয়ে যাওয়া হল। মোগল দরবারে মারাঠা প্রতিনিধি বাবুরাও মলহর মোগল বাহিনীর সঙ্গেই করনালে এসেছিলেন। ২৫ শে ফেব্রুয়ারী তিনি তার দলবল নিয়ে পলায়ন করেন। তাঁর বিবরণেও করনাল যুদ্ধের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায।

সাদৎখান পারস্য সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে দিল্লী অধিকার করলেন ২৭শে ফেব্রুয়ারী। ৯ই মার্চ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ বন্দী মহম্মদশাহকে নিয়ে নাদিরশাহ দিল্লী প্রবেশ করলেন। মহম্মদ শাহের অবস্থিতি হল দেউরির কাছে আসাদ বুরুজে। সেইদিন রাত্রেই যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে না

পারার জন্য সাদৎখান প্রচণ্ডভাবে তিরস্কৃত হলেন। পরদিন শনিবার ১০ই মার্চ ১৭৩৯ ইদ-উদ-জোহা ছিল। জুম্মা মসজিদে নমাজ সেরে সেখানে দাঁড়িয়েই নাদিরশাহ ঘোষণা করলেন যে ভারতের সম্রাট মহম্মদশাহই থাকবেন। তিনি চিরকাল তার বন্ধুত্ব কামনা করেন। এ ছাড়া চোদ্দই ফেব্রুয়ারীর সর্ত অনুসারে তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র গ্রহণ করতে রাজী আছেন। বাদশাহ মহম্মদ শাহ অত্যন্ত দীনভাবে নাদিরকে অভিবাদন জানিয়ে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং রাজকোষের বহু অমূল্য রত্ন নাদিরকে গ্রহণ করতে বারবার অনুরোধ করলেন। সেইদিনই সন্ধ্যায় নাদিরশাহের মৃত্যু সংবাদ রটনা এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেখানে সেখানে পারশ্য সৈন্যদের হত্যা করা শুরু হল। ছোট ছোট দলে অপ্রস্তুত পারশ্য সৈন্যদের আক্রমণ করে নিষ্ঠুরভাবে তাদের বধ করা হল। রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত এই হত্যালীলা চলল। কিছুক্ষণের বিশ্রামের পর পরদিন সকাল থেকে আবার হত্যাকাণ্ড শুরু হল। সে দিন ছিল ১৩ই ফাল্গুন হোলি উৎসবের দিন। দিল্লীবাসী পারশ্য সৈন্যদের রক্তে সারাদিন ধরে যে হোলি খেলল ইতিহাসে বুঝি আর নজির নাই। কমপক্ষে তিনহাজার কোন কোন মতে সাত হাজার পারশ্য সৈন্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিনষ্ট হল। সংবাদ নেবার জন্য নাদিরশাহ যাদের পাঠালেন তারা কেউ ফিরে গেল না। অবশেষে পূর্ণবর্মাচ্ছাদিত হয়ে নাদিরশাহ নিজে তার সৈন্যবাহিনীকে সংহত করলেন তারপর চাঁদনীচকের রোকন-উদ-দৌল্লার স্বর্ণমসজিদে নিজে উপস্থিত হয়ে খোঁজ নিলেন কারা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী। সব থেকে আশ্চর্য্য বিষয়, নাদিরের হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত একজন পারশ্য সৈন্যও দিল্লীবাসীদের আঘাত করেনি। নাদিরশাহ জাতিধর্ম বয়স নারীপুরুষ শিশুবৃদ্ধ নির্বিশেষে দিল্লীবাসীদের বধ করতে হুকুম দিলেন। ১১ই মার্চ আদেশ ঘোষিত হল। কয়েকদিনের মধ্যে তিনশত অভিজাত বংশীয় শুদ্ধ কুড়ি হাজার দিল্লীবাসী নিহত হল। বহুলোক বিশেষ করে স্ত্রীলোকগণ আত্মহত্যা করে সম্মান রক্ষা করলেন। পারশ্য সৈন্যগণ দিল্লীর চারপাশে প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ মাইল পর্য্যন্ত হত্যা ও লুণ্ঠনের বিভীষিকা সৃষ্টি করল। একদল সৈন্য থানেশ্বর শহর লুঠ করে ফিরে এল। প্রিয় সৈন্যদলের হত্যা যেন নাদিরশাহকে ক্ষিপ্ত করে

দিয়েছিল। দিল্লী অবস্থানের পরবর্তী দুই মাস কেবল অর্থসংগ্রহ হয়ে দাঁড়াল নাদিরের একমাত্র কাজ। এর মধ্যে ২৬শে মার্চ মির্জা নাসিরুল্লার সঙ্গে বাদশা বংশীয় দাবারবক্সের কন্যার বিবাহ মহাধূমধাম করে সাঙ্গ হল। বাদশা ঔরঙ্গজীবের কন্যার সঙ্গে তাঁর ভ্রাতা শাহজাদা মুরাদের পুত্রের বিয়ে হয়। দাবারবক্স এই বিবাহের সন্তান। মুরাদ হলেন তাঁর ঠাকুর্দাদা আর ঔরঙ্গজীব দাদামশায়। সম্ভবত এই বিবাহের পরেই নাদিরের ক্রোধ কিছু প্রশমিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে বিবাহের উৎসব চলে। দিওযান-ই-খাস আলোকমালায সজ্জিত হল। নানা জীবজন্তুব লড়াই প্রতিদিনের উৎসবকে বিশিষ্টতা মণ্ডিত করত। আমোদআহ্লাদের বন্যা ডেকে গেল। এই বিবাহের উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যগীত পটিয়সী নূর বাঈকে নাদিরের ভাল লাগে এবং তাকে কিনে নিয়ে যাবার জন্য চার হাজার টাকা দাম দিতেও নাদিরশাহ রাজী ছিলেন। বুদ্ধিমতী নূরবাঈ শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন এটাই আনন্দেব কথা। পারশ্যে ফিরে নাদিরশাহ যে অত্যন্ত বিলাসী হযে পড়েছিলেন তারই সূচনা দেখা যায় দিল্লীতে। মোট সাতান্ন দিন নাদিরশাহ দিল্লীতে অবস্থান কবেন এবং প্রায় সত্তর কোটি টাকা মূল্যের অর্থ ও সামগ্রী নিযে পারশ্যে ফিরে যান। বলা বাহুল্য বিভিন্ন ব্যক্তির হিসাবে তফাৎ রযেছে। নাদিরের একান্ত সচিবের হিসাব অনুসারে—

স্বর্ণ রৌপ্য ও অর্থ	—	৩০ কোটি টাকা
ধনরত্ন যায় কোহিনূর হীরক ও ময়ূর সিংহাসন ইত্যাদি	—	৩৬ ” ”
যুদ্ধসজ্জা, কামান ও রসদ	—	৪ ” ”
		৭০ কোটি

এছাড়া ৩০০ হাতি, ১০০০০ ঘোড়া ও উটও নাদিরশাহ সঙ্গে করে নিয়ে যান।

দিল্লী থাকা কালে আজমীরে মৈনুদ্দিন চিস্তির সমাধিতে তীর্থ যাত্রা করার ইচ্ছা নাদিরশাহ প্রকাশ করেছিলেন। সম্ভবত রাজপুত রাজ্যগুলি লুণ্ঠন করার

ইচ্ছা তার ছিল। উদয়পুরের সওয়াই জয়সিংহ সংবাদ পাবামাত্র তার পরিবারবর্গকে সরিয়ে দিয়ে যুদ্ধসাজে প্রস্তুত হলেন। পেশোয়া বাজীরাও চম্বলে নাদিরশাহের পারস্য বাহিনীর সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সম্ভবতঃ এদের প্রস্তুতির খবর পেয়েই নাদিরশাহ তীর্থযাত্রা বন্ধ করলেন। ১লা মে মঙ্গলবার ওমরাহ নানা রকম খেলাত ও উপহার পেলেন। ইতি-মধ্যে সাদৎখানের অযোধ্যায় মৃত্যু হয়েছে। মহম্মদশাহ সিন্ধু নদের পশ্চিম পার কাশ্মীর ও সিন্ধুসহ নাদিরশাহকে উপঢৌকন দিলেন। এই দরবারেই নাদিরশাহ ঘোষনা করলেন যে মহম্মদশাহ তার বন্ধু, সকলে বিশেষ মারাঠা ও রাজপুত যেন তাকে মান্য করে তা না হলে তাদের নাদিরের রোষবহ্নিতে দগ্ধ হতে হবে। আরো জানালেন যে খুতবা ও মুদ্রায় মহম্মদ শাহের নামই আবার প্রচলিত হবে। অবশেষে ৫ই মে ১৭৩৯ নাদিরশাহ দিল্লী ত্যাগ করলেন, যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে চললেন ১৩০ জন হিসাবরক্ষক যারা মোগল শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশ ওয়াকেবহাল। তাদের সঙ্গে যুক্ত হল ৩০০ রাজমিস্ত্রী, ২০০ ছুতোর আর ১০০ পাথর খোদাইকর। উদ্দেশ্য পারস্যে দিল্লীর মতো এক সুন্দর নগরী গড়ে তুলবেন। লাহোর পৌছবার আগেই অধিকাংশ লোকই নানা ছুতোয় পালিয়ে যেতে লাগল। নাদিরের ফেরার পথ সুগম ছিল না। সোনা ও খাদ্যের লোভে শিখ ও জাঠরা ক্রমাগত নাদিরের বাহিনীর পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করেছে। লাহোরে পৌছে বীর রাজ্যপাল জাকারিয়া খাঁনের অনুরোধে তিনি সমস্ত ভারতীয় বন্দীদের মুক্তি দিলেন এবং স্বেচ্ছায় যাঁরা তাঁর সঙ্গে যেতে চাইল তাদের পোষাক, ঘোড়া ও মোটা বেতন দিয়ে পারস্য যাত্রা করলেন। ভারত ত্যাগের পূর্বমুহূর্তে নাদিরশাহের এই মহানুভবতা সত্যই অননুকরণীয়।

নাদিরশাহের এই সুদীর্ঘ জীবনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য প্রমাণ করা যে 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে, চরিত্রে বা ঘটনায় ইতিহাস অনুসৃত হয় নি। নাদিরশাহ দিগ্বিজয়ী নন কখন দিগ্বিজয় করতে যাননি। ভারতের ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি তাকে লুব্ধ করে থাকতে পারে কিন্তু সে অভিযান দিগ্বিজয় নয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভারতে বার বার হয়েছে। নাদিরকে দিগ্বিজয়ী বললে সেই গজনীর মামুদ থেকে সবাইকেই দিগ্বিজয়ী আখ্যা দিতে হয়। লুণ্ঠন বা হিংসা কোনটাই

নাদিরের চরিত্রের প্রধান উপকরণ নয়। সাদৎ খাঁন প্রভৃতি সেনাপতিগণ আসফ ঝাকে অপদস্থ করার জন্য নাদিরশাহকে লুব্ধ না করলে তিনি দিল্লী অভিযান করতেন কিনা সন্দেহ। দিল্লীর নাগরিকগণ নাদিরের সৈন্যদের হত্যা না করলে পারস্য রাজের প্রতিহিংসা স্পৃহা জেগে উঠত কিনা সন্দেহ। হত্যাকাণ্ডের পরেও দুইমাস নাদির দিল্লীতে ছিলেন এবং নিজের কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে মুরাদের নাতির কন্যার বিবাহ দিলেন। রক্ষণশীল মুসলমান হিসাবে তিনি নিযমিত মসজিদে গিয়েছেন ও সকল ধর্মানুষ্ঠান পালন করেছেন। নিজেকে ঈশ্বর বা প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বরের প্রতিনিধি গণ্য করেছেন এমন সামান্যতম দৃষ্টান্ত পাওযা যায় না।

কেবল নাদির চরিত্রে নয অন্যান্য চরিত্রেও ইতিহাস জ্ঞানের অভাবই লক্ষিত হয়েছে। প্রথম অঙ্কে সাদৎ খানকে বিশ্বাসঘাতক করা হয়েছে। এটা ঠিক নয়। করনাল যুদ্ধের পর দিবস অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুযারী তো নযই। আসফ ঝার কাছে এক অসম্ভব অর্থদণ্ড চাইবার হেতু যদি সাদৎ খানকে মনে করা হয় তাহলে ৯ই মার্চ জুম্মা মসজিদে নাদিরশাহর প্রথমদিনের সর্তাবলীতে ফিরে যাবার ইচ্ছার কোন কারণ পাওযা যায না। সম্ভবত নাদিরশাহকে দিল্লী সম্পর্কে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল। তিনি নিজে এসে তাই যখন দেখলেন যে মহম্মদ শাহ যা বলেছেন তাই সত্যি তখন প্রথমদিনের সর্তেই ফিরে যেতে নিজে থেকে রাজী হলেন। পরবশ্য সৈন্য হত্যা না হলে নাদিরের লুণ্ঠন প্রবৃত্তি জেগে ওঠবার অবকাশ পেত না। দিগ্বিজয়ীর নাট্যকার নাদিরের ছেলে দুটির নাম ভুল করে লিখেছেন রেজা কুলি খাঁ ও নসর কুলি খাঁ। এ ভুলের কারণও আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অঙ্কের শেষের দিকে যে ভারতীয় বাঁদীকে নাদিরের বিবাহ করবার গল্প দেওয়া আছে তা শুধু ইতিহাসের পরিপন্থী নয় অসম্ভব। সাধারণ অবস্থা থেকে অভিজাত শ্রেণীতে যারা উন্নীত হয়েছেন তারা বিবাহাদি ব্যাপারে সর্বদাই উপর দিকেই দৃষ্টি রাখেন দেখা যায়। পুত্রের সঙ্গে মোগল রাজকুমারীর বিবাহই তার প্রমাণ। আসফ ঝার সঙ্গে নাদিরের আলাপের নিদর্শনও অদ্ভুত। নাদির তর্জন-গর্জন করে আসফ ঝাকে ফিরিয়ে দিলেন। অথচ ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে বলেছে আসফ ঝার সঙ্গে ১৪ই ফেব্রুয়ারী সন্ধির সর্ত

স্থির করা হয়। মহম্মদ শাহের সঙ্গে যে ব্যবহার দেখান হয়েছে তাতে নাট্যকারের নাদির চরিত্র সম্পর্কে, সমসাময়িক ইতিহাস সম্পর্কে বা দেশের শাসনকর্তাদের ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে সামান্যতম ধারণা আছে বলে মনে হয় না। মহম্মদশাহের প্রতি নাদিরশাহের ব্যবহার সর্বদা অত্যন্ত সৌজন্যমূলক। মহম্মদশাহ সর্বদা নাদিরশাহকে মহামান্য অতিথির মর্য্যাদা দিয়েছেন। দিল্লীর হত্যাকাণ্ডও মহম্মদ শাহের চেষ্টাতেই বন্ধ হয়। নাট্যকার অজ্ঞানতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নাদিরের মুখে সংলাপ দিয়েছেন—'যদি আপনি রাজ্যশাসনে যোগ্য হন উত্তম, যদি অযোগ্য হন, ভারতে মোগল শাসন পুরাতন ও অনাবশ্যক বলে পরিত্যক্ত হবে।' নাদির শাহ দিল্লী ছেড়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন। তাহলে কি ধরে নেওয়া হবে যে তিনি মহম্মদশাহকে রাজ্য-শাসনের যোগ্য বিবেচনা করেছেন। নাদিরশাহকে নির্বোধ ভাবলে নাদির চরিত্রকে অবমাননাই করা হবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রায় সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। এই অঙ্কে নাদিরের মৃত্যু সংবাদ রটনার ঘটনা শুনে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় নিরক্ষর নাদিরশাহ বিংশ শতাব্দীর ইওরোপীয় দর্শনে প্রাজ্ঞ এক পণ্ডিতের মতো উক্তি করেন—'জাতির জীবনী শক্তির পরীক্ষা হয় তার যুদ্ধেচ্ছার পরিমাণের দ্বারা।' অর্থাৎ দিল্লীর নাগরিকগণ পারশ্য সৈন্যদের বধ করে 'জাতির যুদ্ধেচ্ছার' প্রমাণ দিয়েছে। সব থেকে হাস্যকর পরিবেশন 'শাহজাদা রেজাকুলী খাঁ—আহমেদ আবদালীর সঙ্গে তার গোপন ষড়যন্ত্র।' অর্থাৎ নাদিরের পুত্র পিতৃহত্যার জন্য আহমেদ আবদালীর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নাদিরশাহ এই সন্দেহ করেছেন। ঐতিহাসিক মতে প্রথম জন তখন পারস্যে ও দ্বিতীয় জন আফগানিস্থানে। বরদাপ্রসন্ন লিখিত নাটকের অনুসরণেই আহমেদ আবদালী নাদিরশাহের একজন সেনাপতি ও প্রধান সহকর্মী। ইতিহাস আহমেদ আবদালীর সঙ্গে নাদিরশাহর এই সময় যে যোগ-সূত্রের সংবাদ দেয় তাতে আহমেদ আবদালী নিকৃষ্ট ভৃত্যমাত্র।[১৬] মজাটা শেষ করা যাক। নাদিরশাহ দিগ্বিজয়ী নাটকে বলছেন—'রেজাকুলি আর আহমেদ আবদালী আমার দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্ত।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে দিগ্বিজয়ী নাদির শাহ হস্তহীন খঞ্জ। এই হল নাট্যকারের কীর্তি!

তৃতীয় অঙ্কে দিল্লীর নাগরিকদের হত্যা করার আদেশ দিচ্ছেন নাদিরশাহ।

মহম্মদশাহ যখন দয়া ভিক্ষা কবছেন তখন বলা হচ্ছে—'যদি করনালে আপনাব বাহিনীকে চূর্ণ ও বিদলিত করে আপনাকে বন্দী করে আপনার রাজধানীতে প্রবেশ কবতাম তা হলে আমার বশ্যতা স্বীকার করায আপনার প্রজাদের কোন বাধা থাকত না।' এই ইতিহাস জ্ঞানবিহীন উক্তি সম্পর্কে টিকা নিষ্প্রয়োজন। আবাব অসৌজন্যের প্রকাশ—'কে আপনি মোগল—তখতের কাপুরুষ উত্তবাধিকাবী' আবার 'আপনি কৃতজ্ঞ না হলেও আমার কোন ক্ষতি হবে না।' দার্শনিক চিন্তায নাদিবশাহ বাঙ্গালী—'দুর্বল মানবের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিও বোধ হয় কাপুরুষত্ব ব নামান্তর। আবার কোন আলোচনা অপ্রয়োজন। এবার নাট্যকাব নাদিবের জীবনের তত্ত্বকথাকে স্পষ্ট রূপ দেবাব জন্যেই দেখাচ্ছেন যে এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই নাদির পুত্রের সঙ্গে মহম্মদ শাহের কন্যাব বিবাহ হচ্ছে। কয লাইন মুখরোচক সংলাপেব লোভ নাট্যকাব বা পরিচালক আটকাতে পারলেন না। নাদিব বলছেন—'আমারই ইচ্ছায় জনগণ পরিপূর্ণ এই বাজপথ আজ শ্মশান। আবাব আমাবই ইচ্ছায় শ্মশান মুহূর্তে উৎসব সভায পরিণত হবে। আমি নীববতাকে মুখর করবো, তামসী নিশিকে সহস্র দীপমালিনী কবব। হ্যা আমি বেঁচে আছি।' আবার টিকা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। বরঞ্চ অঙ্কেব শেষে দিল্লীর এক পতিপুত্রহীনা রমনীব নাদিরেব সামনে এসে ছুরি বুকে মেরে আত্মহত্যা করা অত্যন্ত নাটুকে হলেও অন্য ঘটনাগুলির তুলনায অনেক বেশী সম্ভাব্য। এ ছাড়া আব যা আছে তা নাটকেব কথা ইতিহাসের নয়।

ভারত অভিযানের আট বছর পব অর্থাৎ ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫৯ বছর বয়সে এক আততায়ীর হস্তে নাদিরশাহ নিহত হন। এই শেষ আট বৎসর তিনি বিলাসী সন্দিগ্ধচিত্ত ও খামখেয়ালী হয়ে পড়েন। ইতিহাস এই শেষ আট বৎসর সম্পর্কে নীরব। কোন উল্লেখ যোগ্য ঘটনায় এই সময় আলোকিত নয়। সুতরাং নাটকের শেষ দুই অঙ্ক সম্পর্কে বলাব কিছু নাই। মহানন্দে নাট্যকার নাদিরের বেগমদের মধ্যে কলহ দেখিয়েছেন। নাদির তার কনিষ্ঠা বেগম ও জ্যেষ্ঠপুত্রকে সন্দেহের চোখে দেখছেন এবং বীভৎস ভাবেই তাদের মধ্যে প্রেমের আস্বাদ পাচ্ছেন। ফলে পুত্র অন্ধ, স্ত্রী বিতাড়িত। নাট্যকারের হাতে যখন কলম তখন সব অসম্ভবই সম্ভব। আবার বস্ত্রাপ্রসঙ্গের অনুকরণ স্পষ্ট।

মির্জা রেজাকুলি পিতৃহত্যায় উদ্যত তাও দেখা গেল। নাদিরের বক্তব্য, 'পুত্র বিষাক্ত হবে—হারেম বিষক্ত হবে—পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে। ঈশ্বর, ঈশ্বর, সম্ভবত তুমি নাই—যদি থাক তুমি শুধু জগতের শাস্তিদাতা।'

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে একদা পারস্য সম্রাট মহিষী খোরাসানের পথে প্রান্তরে গানগেয়ে বেড়াচ্ছেন। ইনি সেই ক্রীতদাসী যাকে নাদির প্রথম অঙ্কে বিবাহ করলেন। ইনি নাকি আবার হিন্দু বেগম—সুতরাং নাদিরের ভূতপূর্ব বন্ধু ও যুদ্ধ সচিব এবং তার দার্শনিক ছাত্র এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। নাদিরের অধঃপতনে দুঃখ প্রকাশ করলেন। 'হিন্দু বেগম' ধরা না দিযে পালিয়ে গেলেন। অবশেষে শেষ দৃশ্য। নাট্যকার প্রথম থেকে যে গল্প শোনাতে চেযেছেন তা হল পারস্যের অভিজাতগণের নাদিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। দিল্লীতে নাট্যকার নাদির শাহের যে বর্বর আচরণ দেখিযেছেন তার কারণ এই ষড়যন্ত্র এবং এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নাদিরের প্রথম মহিষী ও তার ভাই যিনি নাদিরের পরামর্শদাতা হিসাবে সর্বদা তার সঙ্গী। বলাবাহুল্য এ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ইতিহাস বিরোধী। নাটকের নিয়মেই শেষ দৃশ্যে হিসাবনিকাশ ওযাশীল করা হয়েছে। বেগম ও পুত্রের জন্য নাদিরের ব্যথা প্রকাশ পেযেছে। কুচক্রীদের সব ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেছে। নাদির শাহ তার প্রিয় সেনাপতি আহমেদ আবদালীকে পারস্য সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেন। অবশেষে নাদির শাহ ও তাঁর হিন্দু বেগমের একসঙ্গে মৃত্যু। আততায়ী নাদিরের প্রিয় বন্ধু প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বরের আর এক প্রতিনিধি। শেষ অঙ্ক দুটিতে যে ইতিহাসের স্থান নাই একথা আবার বলার প্রয়োজন দেখি না। নাটকীয়তা ও হিন্দু বেগমের 'সতীত্ব' অতীব উজ্জ্বল রঙে আঁকা হয়েছে। নাদিরকে রক্ষা করতে গিয়ে 'হিন্দু বেগমের' মৃত্যু ও শেষে নাদিরশাহেব হত্যা দেখিয়ে নাটক শেষ হয়েছে।[১৭]

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবী শান্ত। রুচিশীল পণ্ডিত শিশিরকুমার ভাদুড়ী বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের নবতম জ্যোতিষ্ক। নাটকের মধ্যে ইওরোপীয় দর্শন সম্ভবত এই কারণেই এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতের রাজনীতিতে তখনও মধ্যপন্থীদের প্রাবল্য। লালা লাজপত রায়, বিপিন চন্দ্র পাল, মতিলাল নেহেরু ও অ্যানি বেসান্ত তখনও সর্বজনমান্য নেতৃবৃন্দ। সব দল মিলে কলিকাতায় মিলিত

হয়েছেন ২রা ডিসেম্বর। ২৯ থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে মতিলাল নেহেরু কমিটির সংবিধান গ্রহণ করা হল। গান্ধিজী এক বছরের মধ্যে পূর্ণ স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিলেন।[১৮] সামাজিক জীবনে ইওরোপীয় দর্শন ও চিন্তাধারা নূতন ভাবে আসতে সুরু করেছে একদিকে বেন্থাম ও এডামস্মিথ অন্য দিকে মার্ক্স ও এঙ্গেলস শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনকে আলোড়িত করেছেন। নানা জায়গার 'ঈশ্বরবাদ' ও 'নাস্তিকতা' আলোচনার বস্তু হয়েছে। এই সব চিন্তাধারার প্রতিফলনের ফলেই 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের উৎপত্তি। অভিনয়ের চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও নাটক হিসাবে নাদির শাহ খুব উঁচু স্থান পায়নি তার কারণ রচনার মধ্যে কোন উঁচু ভাব বা আদর্শ নাই। প্রচলিত নাট্যধারার থেকে পৃথক হলেও সেই চিরাচরিত নাট্যরীতি ষড়যন্ত্র বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে বদ্ধ থেকে গিয়েছে। নাদিরের মুখে যে প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বরের রূপ দেওয়া হয়েছে শ্রীচৈতন্যের দেশের দর্শক তা কোন সময়ে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। ইতিহাসের বিচারে নাটকের বক্তব্য বা নাদিরের চরিত্র কোনটারই সঠিক রূপায়ণ হয়নি।

একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে দুটি নাটকেই নাদিরশাহকে কেন দিগ্বিজয়ীর বেশ পরাণ হয়েছে। 'নাদিরশাহ' নাটকে চীন, রুশিয়া, বাগদাদ, দামাস্কাস, ইহুদির দেশ, আরবদের দেশ থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা অর্থাৎ ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত জয় করার ইচ্ছা দেখান হয়েছে। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের প্রথমেই বলা হয়েছে 'তুমি কি মনে কর পৃথিবী জয়ে আমি অশক্ত?' (প্রথম অঙ্ক পাতা-৭) কিছু পরে বলা হয়েছে 'পারশ্য বলতো শুধু তিহারাণ আর ইস্পাহানের চতুর্দ্দিকের ক্ষুদ্র ভূ-ভাগকে' (প্রথম অঙ্ক পাতা-১৭) তারপর 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হয়ে যারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ বিগ্রহ ব্যাপৃত ছিল—আজ তারা এক জাতি, এক ধর্মাবলম্বী।' (প্রথম অঙ্ক পাতা-১৮)। প্রিয়বন্ধু সালেহবেগের মুখে নাদিরের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে—'তুমি চাও প্রভুত্ব, তুমি চাও পূজা, তুমি চাও মানবের রক্তে স্নান করতে—আমি চাই মানব জাতির মুক্তি! তুমি ভারত জয় কর, চীন জয় কর জগৎ জয় কর কিন্তু সালেহবেগকে আর দেখতে পাবে না' (তৃতীয় অঙ্ক পাতা-৬৯)। একমাত্র উত্তর এই যে, কোন নাট্যকারেরই নাদিরের

ইতিহাস জানা ছিল না ফলে নানা গল্পে উপন্যাসে যে দানব চরিত্র দেখা গেছে তাকেই নাদিরশাহ বলে দেখাতে ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু নাট্যকারদ্বয়ের সেটাও ক্ষমতায় কুলায় নাই। সম্ভবত এক প্রচণ্ড অত্যাচারী চরিত্র দেখিয়ে বাঙ্গালী দর্শকদের ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যেই ছু'টি নাটকেরই জন্ম। সেখানেও মনের ভয় বাধা সৃষ্টি করেছে। 'নাদিরশাহ' ও 'দিগ্বিজয়ী' ছুটি নাটকই সমসাময়িক বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ছুটি ছোট্ট প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।

নাদিরের দিল্লী অধিকারের ফলে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে আলোড়ন লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সুবার শাসনকর্তা নবাব সরফরাজ খাঁ (নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র) নাদিরের নামে মুদ্রা প্রচলিত করলেন। সম্ভবত কেবল নামমাত্র অঙ্কিত হলে বাদশাহ মহম্মদশাহ ক্রুদ্ধ হতেন না কিন্তু 'দিল্লীর বাদশাহ নাদিরশাহ' লিখিত হওয়ায় নাদিরশাহের ভারত ত্যাগের পর বাদশাহ মহম্মদশাহ প্রতিশোধ নিতে দ্বিধা করেননি। যখন গিরিয়ার রণক্ষেত্রে ৯ই এপ্রিল ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহী সভাসদ ও সেনাবহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দি খাঁ নবাব বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন তখন সরফরাজ খাঁকে ধ্বংস করার বাদশাহী ইচ্ছাও আলিবর্দি খাঁকে জানান হয়েছে। মোগল দরবারে মারাঠা দূত বাবুরাও মলহর নাদিরশাহর যুদ্ধপদ্ধতি সম্পর্কে মহারাষ্ট্র নায়কদের অবহিত করায় মারাঠাগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। রাজপুত রাজাদের মধ্যেও নাদিরের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রস্তুতি দেখা গেছে। নাদিরশাহের অভিযান সম্পর্কে যে সব বিবরণ আছে তা থেকে সাধারণ লোকেদের মনোভাব বোঝা যায়। আনন্দরাম, হরচরণ দাস, আব্দুল করিম, আলি হাজিম প্রভৃতির বিশদ বিবরণ আছে। দিল্লীর উপকণ্ঠে অবস্থিত ওয়াকিলপুরাতে অবস্থিত আনন্দরামের মহল্লাও আক্রান্ত হয়েছিল। এই সব বিবরণ বা ঘটনার কোন খবরই নাট্যকারদের বিব্রত করে নাই বা তাঁদের কল্পনা রাজ্যে বিচরণকে ব্যাহত করে নাই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নাদিরশাহের সম্পর্কে নাটক রচনা করার সময় ইতিহাস নয় কল্পনাই ছিল নাট্যকারদের মূল উপজীব্য। ডুরাণ্ড

সাহেবের গল্পে কিছু পরিমানে ইতিহাসের কথা থাকায় যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর নাটকে সামান্য ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় কিন্তু বরদা প্রসন্ন দাসগুপ্তর নাটকে ঐতিহাসিক তথ্য কিছুই নাই। নাদিরশাহকে নাটকের উপজীব্য করার তাই কোন স্পষ্ট কারণ অথবা সার্থকতা দেখা যায় না। নাট্যকারের খেয়ালে তার উদ্ভব ও বিলুপ্তি। নাট্য ইতিহাসে দুইটি বুদ্বুদ।

সূত্রনির্দেশ

১। Hemendra Nath Dasgupta, The Indian Stage, Vol. IV p. 99.

২। Ibid. p. 99-100.

৩। Ibid. p. 100.

৪। Ibid. p. 292.

৫। Ibid. p. 293.

৬। Jadunath Sarkar, Fall of the Mughal Empire, Vol. I p. 109-111.

৭। Ibid.

৮। Ramesh Chandra Majumdar, History of the Freedom Movement, Vol. III p. 307-325

৯। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিশিষ্ঠ ৬৩১-৬৩৩ পাতা (দ্বিতীয় সংস্করণ)

১০। Henry Irvine, Later Mughals, Vol. II, Ed. Jadunath Sarkar, p. 317-319.
ভারতকোষ, চতুর্থ খণ্ড, ১৯৬-১৯৭ পাতা

১১। Arthur Hassal, The Balance of Power. p. 98-120.

১২। Henry Irvine, Later Mughals, Vol. II, Ed. Jadunath Sarkar. p. 319-320.

১৩। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, দিগ্বিজয়ী, পঞ্চম অঙ্ক, ১৫৫ পাতা

১৪। তদেব

১৫। তদেব ১৫৭ পাতা

১৬। Henry Irvine, op cit. p. 111-112

১৭। দিগ্বিজয়ী নাটক সম্পর্কে বিশদ সমালোচনার জন্য অজিত কুমার ঘোষের বাংলা নাটকের ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ) দ্রষ্টব্য, ৩০২-৩০৮ পাতা

১৮। Ramesh Chandra Majumdar, op cit. p. 307-325

বাজীরাও

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসে বাজীরাওতুল্য কীর্তিমান সত্যই পাওয়া সহজ নয়। মহারাজ শিবজী-প্রতিষ্ঠিত মারাঠা-রাজত্বকে বাজীরাও অর্ধভারতব্যাপী বিস্তার করেন এবং মোগল বাদশাহকে দিল্লীতে এবং বাদশাহের প্রধান ওমরাহ ও সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শক্তিমান নেতা নিজাম্-উল-মুলুক্ আসফ ঝাকে তাঁর রাজত্ব হায়দ্রাবাদে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেন। স্বয়ং নাদিরশাহ্ বাজীরাও-এর বলবীর্যের বিষয়ে অবহিত ছিলেন; সেজন্য মারাঠা সাম্রাজ্যের অঙ্গস্পর্শ করেননি। বাজীরাও কিন্তু নাদিরশাহের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এই যুদ্ধ সংঘটিত হলে দুই যুদ্ধপ্রাজ্ঞ সেনাপতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতর কে জানা যেত, কিন্তু সে সংঘর্ষ শেষ পর্যন্ত হয়নি। মহাবীর শিবজী-প্রতিষ্ঠিত রাজত্বকে বাজীরাও সুদূরপ্রসারী করে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী করলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাজীরাও-এর মতো পুরুষসিংহ আর হয়নি। টিপুসুলতান, নানা ফাড়নীশ, ও রঞ্জিত সিংহের কথা মনে রেখে এবং তাদের কর্মের সঙ্গে তুলনা করলে বাজীরাও-এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। মনে রাখতে হবে যে তখন পূর্ব-ভারতে ইংরেজশক্তি ক্রমবর্ধমান। তা সত্ত্বেও পশ্চিম-ভারতে বাজীরাও সুরাট ও বোম্বাই-এর ইংরাজ ঘাঁটিকে এতটুকু প্রশ্রয় দেননি। সেদিন পূর্ব-ভারতে বাজীরাও তুল্য নেতা থাকলে ইংরেজ বা অন্য কোন বিদেশী শক্তি শাসনক্ষমতা হরণ করতে পারত কিনা সন্দেহ। যমুনা পর্যন্ত এলেও বাজীরাও পূর্ব-ভারতে গঙ্গানদীর সীমা অতিক্রম করেননি। মারাঠাশক্তি বাজীরাও-পুত্র বালাজী বাজীরাও-এর সময়ে বাংলাসুবা আক্রমণ করে। নবাব আলিবর্দি উড়িষ্যা প্রদেশ ও বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিতে রাজী হন, ফলে আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ও উত্তরে যমুনা থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত মারাঠা প্রভুত্বের ব্যাপ্তি ঘটে। বাজীরাও বাংলাদেশে এলে ভারতের ইতিহাস যে সম্পূর্ণ অন্য পথে যেত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪০ বছর বয়সে অকস্মাৎ বাজীরাও-এর মৃত্যু হয়। মাত্র ১৯ বছর বয়সে মারাঠাছত্রপতি সাহু তাঁকে পেশোয়া বা প্রধান অমাত্যের পদে বরণ করেন। ২০ বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় ও যুদ্ধবিগ্রহে

বিশাল মারাঠা সাম্রাজ্যের স্থায়ী ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। তাই এই ক্ষণজন্মা বীর মারাঠা কবিদের অনুপ্রাণিত করেছেন। বহু কাব্য, গাঁথা, বিজয়গীতি ও প্রশস্তি তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে। চারণ কবিরা তাঁর জীবন নিয়ে বহু গান রচনা করেছেন। পরবর্তী যুগেও বাজীরাও বহু রচনার বিষয়বস্তু। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়ে নানা ঐতিহ্যের সঙ্গে বাজীরাও-এর কীর্তিও অবশ্য পঠনীয়। বাংলা নাটকে বাজীরাওকে দেখে অবাক হবার কারণ নাই। বরঞ্চ বাজীরাও সম্পর্কে একাধিক নাটক রচিত হয়নি দেখে আশ্চর্য হতে হয়। বাজীরাও মোগল ও নিজামী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর নিজের জাতির ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেদিক থেকে তাঁর কীর্তি ও বীরত্ব শিবাজী, প্রতাপ সিংহ বা গুরুগোবিন্দের তুলনায় কম নয়। এইসব প্রাতঃস্মরণীয় বীরগণ যেখানে সাফল্যলাভ করতে পারেননি সেখানে বাজীরাও-এর সফলতা শৌর্যের ইতিহাসে এক অতুলনীয় সম্পদ। বাজীরাও-এর জীবন সাফল্যের এক অভূতপূর্ব কাহিনী। ভারতীয় নায়ক-দের মধ্যে বাজীরাও অবিনশ্বর।

বাংলাদেশে বাজীরাও সম্পর্কে একমাত্র নাটক রচনা করেন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ২৯ জুলাই ১৯১১ মহাসমারোহে এই নাটকের প্রথমা-ভিনয় রজনী উদ্‌যাপিত হয়।

> "বাজীরাও খোলার দিন ফুটবল মাঠে (আই-এফ-এ) শীল্ড-ফাইনালে মোহনবাগান বনাম ঈষ্ট ইয়র্কস্ খেলা ছিল। রাত্রি ৮॥০টার সময় অভিনয় আরম্ভ কিন্তু ৭॥০টা বাজিয়া গেল ; অমরেন্দ্রনাথ (দত্ত) স্বয়ং টিকিট-ঘরে বসিয়া আছেন, মাত্র মুষ্টিমেয় দর্শক দর্শনে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাকি এক ঘণ্টার মধ্যে যে কি বিপুল দর্শক সমাগম হইল, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। সকলের মুখে এক কথা—মোহনবাগান শীল্ড জিতিয়াছে। তাই অমরেন্দ্রনাথ পরের শনিবার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন—Mohun Bagan has won the Shield, Baji Rao has gained the Victory. বস্তুতঃ 'বাজীরাও' অভিনয় দর্শকসমাজে যেরূপ আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল, বহুদিন সেরূপ দেখা যায় নাই। বাজীরাও-এর ভূমিকা অমরেন্দ্রনাথ জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন।"[১]

গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে এই অভিনয় হয়। নাটক ও অভিনয়ে নূতনেত্বর আভাষ পেয়ে দর্শককুলে ও সমালোচকমহলে সাড়া পরে গিয়েছিল। Amrita Bazar Patrika ১৯-৮-১৯১১ খ্রীস্টাব্দে লিখলেন :

"Today will be staged the new drama Baji Rao, which has already made sensation in the city."[২]

পরে স্টার থিয়েটারেও নাটকটি অভিনীত হয়।[৩] পুস্তকাকারে বাজীরাও-এর প্রকাশ ওই বছরেই অর্থাৎ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে।[৪] ৮ বছরে, অর্থাৎ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

সর্বদিক থেকেই 'বাজীরাও' নাটকের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এখন নাটক সম্পর্কে আলোচনা কর্তব্য। 'বাজীরাও' ৫ অঙ্কে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অঙ্ক গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। গর্ভাঙ্কের সংখ্যা প্রথম অঙ্কে ৫টি, দ্বিতীয় অঙ্কে ৮টি, তৃতীয় অঙ্কে ৭টি, চতুর্থ অঙ্কে ৮টি, ও পঞ্চম অঙ্কে ৫টি। মুখপত্রে 'বাজীরাও ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক' লিপিবদ্ধ আছে।

নাটক শুরু হয়েছে মস্তানী নামে এক অপূর্ব সুন্দরী মুসলমান রমনীকে নিয়ে। হায়দ্রাবাদের নিজামের ভয়ে তিনি দেশ ছেড়ে পলায়ন করছেন। নিজাম ঘোষণা করেছেন, মস্তানীকে যে আশ্রয় দেবে তিনি হবেন তার চিরশত্রু। সুতরাং অভিভাবক তোরাব খাঁকে সঙ্গে করে মস্তানী বিপদ-গ্রস্ত, পলায়িত, সর্বদা নিজামের সৈন্যের ভয়ে শঙ্কিত। এমন সময়ে মলহর রাও হোলকারের স্ত্রী গৌতমা তাদের আশ্রয় দিলেন। মলহর রাও-এর পরিচয়ে বলা হয়েছে 'হোলপুরের জমিদার"। এদিকে মালবরাজ গিরধরের কর্মচারী মস্তানীকে ধরে নিজামের কাছে পাঠাতে ইচ্ছুক। মলহর রাও মস্তানীকে আশ্রয় দেওয়ায় মালবসৈন্য হোলকারের প্রাসাদ আক্রমণ করল। প্রচণ্ড বীরত্ব দেখিয়ে অবশেষে তিনি মালবরাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। মস্তানীকে নিজের আশ্রয়চ্যুত করতে বা মালব-রাজের হাতে সমর্পন করতে মলহর রাও অস্বীকার করলেন। মালবরাজ গিরিধর তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে বলায় তাঁর সেনাপতি রণজী (রণোজী) সিন্ধিয়া বিদ্রোহ করলেন এবং মলহর রাওকে মুক্ত করে

দুজনে পালিয়ে গেলেন। মলহর রাও-এর বাড়িতে পৌছান মাত্র মালব-সৈন্য তাঁদের আক্রমণ করল। সেই আক্রমণে যখন নায়কদল বিধ্বস্ত, তখন রণজীর মুখে ভাষণ দেওয়া হয়েছেঃ "ভাইসব! আমি তোমাদের সেই রণজী সিন্ধিয়া। যার আদেশ একদিন অবনতমস্তকে পালন করেছ—যার অঙ্গুলী হেলনে ·" ইত্যাদি। শেষে "কিন্তু আজ আমি তোমাদের সামনে প্রভুরূপে, তোমাদের আদেশদাতারূপে দাঁড়িয়ে নেই" ইত্যাদি। অবশেষে —"এই আমি তোমাদের সামনে বুক পেতে দিয়ে দাঁড়ালেম। তোমাদের যা অভিরুচি তাই কর।" (বাজীরাও—১ম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, পাতা—২৬-২৭) সৈন্যগণ তরোয়াল তুলে দাঁড়িয়ে রইল এবং বিনা বাধায় নায়কগণ গৌতমা ও মস্তানীকে নিয়ে পলায়ন করলেন। রণজী সিন্ধিয়ার এই ভাষণ দীর্ঘকাল পরে শচীন সেনগুপ্তের "সিরাজদ্দৌল্লার" শেষদৃশ্যে সিরাজের শেষ ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রমাণ করেছে যে, ১৯১১ থেকে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা নাটকের বিবর্তন কত শ্লথগতি। প্রথম অঙ্ক শেষ হচ্ছে মহারাজ সাহুর দরবারে। বাজীরাওকে পেশোয়া নির্বাচিত করায় চন্দ্রসেন ক্ষোভপ্রকাশ করছেন এবং ওই পদ তাঁরই প্রাপ্য বোঝাবার চেষ্টা করছেন। ইংরেজী ডেমোক্রেসির ছায়ায় বসে নাট্যকার চন্দ্রসেনের মুখে ভাষণ দিয়েছেনঃ "আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে মহারাজ কারো মত না নিয়ে এত শীঘ্র তাকে পেশোয়ার পদে অভিষিক্ত করবেন।" আবার "বাজীরাও-এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে মহারাজ যদি রাজদ্রোহ মনে করেন তাহলে আমি নাচার।" একটু পরেই বাজীরাও প্রবেশ করে একপৃষ্ঠাব্যাপী বক্তৃতা করে শেষে বলেছেনঃ "পতিপ্রাণা হিন্দুললনাগণ অত্যাচারী দস্যুদের কবলিত হয়ে ভীষণ নির্যাতন ভোগ করছে। ··সীমান্ত অঞ্চলে আজ শোচনীয় অবস্থা সেই সব উৎসাদিত পল্লী হতে অনশনক্লিস্ট দরিদ্র প্রজার জীর্ণাবাস ভেদ করে মর্মভেদী হাহাকার হাওয়ায় হাওয়ায় ছুটে এসে যেন আমার কর্ণপটহে আঘাত করছে।" নাট্যকার সকলকে জানালেন যে, বাজীরাও প্রজার সুখসমৃদ্ধি চান এবং সেজন্য তিনি পেশোয়াপদ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। কিন্তু বাংলা নাটকের নায়কের মতো শেষ পর্যন্ত তিনি পেশোয়াপদ ছাড়লেন না। অবশেষে গৌতমা সমভিব্যাহারে মস্তানীসহ নায়কদ্বয়ের প্রবেশ। কিন্তু আশা বিফল হল।

মহাবাজ সাহু নিজাম ও মালবরাজের সঙ্গে যুদ্ধের ভয়ে কিছুতেই তাদের আশ্রয় দিতে বাজী হলেন না। তখন বাজীবাও বললেন: "আমি তোমাদেব আশ্রয় দেব—কোন ভয় নাই তোমাদেব।" গৌতমা শুনে বললেন "আপনি তাহলে মানুষ নন শাপভ্রষ্ট দেবতা"। বস্তুত নাটকে বাজীবাওকে দেবতারূপে প্রমাণ কবাব চেষ্টাই হযেছে। আবাব একপাতাব সংলাপশেষে বাজীবাও আশ্বাস দিলেন "যেমন কবে হোক শবণাগতকে বক্ষা কবব। ভয নেই মস্তানী, আজ থেকে তু ম আমাব আশ্রিতা—আমি আশ্রযদাতা।"

এইটাহ দাঁডালো নাটকেব মূল প্রতিপাদ্য যে আশ্রিতা এক মুসলমান সুন্দবীব জন্য বাজীরাও নিজাম, মালব ও শেষ পযন্ত মোগলশক্তির সঙ্গেও ঘোব প্রতিদ্বন্দ্বিতা কবছেন। ইতিহাস-অজ্ঞতা যে বীবপূজাব বাধাই হয, সহায হয় না, তাব প্রমাণ 'বাজীবাও' নাটকেব প্রতিছত্রে বযেছে।

দ্বিতীয অঙ্ক শুরু হচ্ছে চ'সেনেব বিশ্বাসঘা•কতাব পবিকল্পনা দিযে। একাধাবে মস্তানীব প্রতি আসক্তি ও বাজীরাও-এব প্রতি হিংসা চন্দ্রসেনেব মালববাজেব সঙ্গে যোগদানেব ইন্ধন হযেছে। মস্তানীব প্রতি প্রেম নিবেদন কবে উপেক্ষিত হচ্ছেন চন্দ্রসেন। মালব-কর্মচারী বলদেব গৌতমাকে লাভ করাব জন্যে পুরুষবেশী গৌতমাব সঙ্গে পবামর্শ কবছে ও শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত হচ্ছে, দেখান হল। পরবর্তী দৃশ্যে ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীকে বাজীবাও-এব গুরুদেবরূপে দেখান হযেছে। বাজীবাও মালবরাজ্য আক্রমণ কবতে গেছেন এবং চন্দ্রসেন তাঁব পেছনে পেছনে গেছেন জানতে পেবে স্বয়ং মস্তানী সাহায্যের জন্য উপস্থিত। গুরুদেবের দলবল নিয়ে মস্তানী বাজীবাওকে সাহায্য করতে ছুটে গেলেন। এদিকে বাজীরাও মালবরাজকে বন্ধন করে, বন্দিত্বকামী মলহর রাওকে মুক্ত করছেন। পিপাসার্ত মালবরাজ ও তাঁর কর্মচারী বলদেবকে জল দিলেন গৌতমা। অন্যদিকে চন্দ্রসেনের অকস্মাৎ আক্রমণে বিপর্যস্ত বাজীবাওকে বক্ষা করলেন গুরুদেবেব শিষ্যদের নিয়ে মস্তানী। এই যুদ্ধে মস্তানীব অভিভাবক তোরাব খাঁব মৃত্যু। এইখানে রাজনৈতিক সংলাপ বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। বাজীরাও বলছেন, "গুরুদেব, অনন্ত আশায়—অনন্ত উৎসাহে জীবনপাত পরিশ্রমে যে অজেয় সৈন্যদল প্রস্তুত কবেছি, যাদের সঙ্গে নিয়ে বীরদর্পে বিজয়উল্লাসে মাতুঃ শ্রীভবানীর নামে মেদিনী কাঁপিয়ে আগ্রা-

দুর্গের উপর সাতারার বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেবার প্রতীক্ষা করছি,—আজ সেই সৈন্যদল নিয়ে আগ্রায় না গিয়ে—মালবেশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে?" ব্রহ্মেন্দ্র উত্তর দিচ্ছেন "বাজীরাও! রাজা গিরিধরকে তুচ্ছ জ্ঞান কর না! দিল্লীশ্বরের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এই গিরিধর! ওকে দমন কর বাজীরাও! দুর্মতি মালবপতিকে আয়ত্ত করে—বলদীপ্ত নিজামকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে—উন্মত্ত আবেগে আগ্রায় ধাবিত হও। আগ্রা ও দিল্লীর বিশালকায় বিশীর্ণ মোগল-তরুর উচ্ছেদ সাধন কর।"[৫] বাজীরাও ছত্রে ছত্রে প্রতিজ্ঞারক্ষার সংকল্প নিয়ে একপাতা ভাষণ দেবার পর এই অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্কে মস্তানী নায়িকা ও বাজীরাও নায়করূপে প্রতিষ্ঠিত। মালব নিজাম, ও আগ্রা (দিল্লী নয়?) বিজয়ের সংকল্প নিয়ে তিনি যাত্রা সুরু করেছেন বটে, কিন্তু তার কোনো কারণ কোথাও বলা হয় নাই। মারাঠারাষ্ট্র বা মারাঠা জাতীয়তা সম্পর্কে কোনো কথা না দেখে আশ্চর্য হতে হয়। হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে সংকল্প ছত্রপতি শিবজীকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য স্থাপন করে তাকে রূপ দিয়েছে তারই পূর্ণ বিকাশ ঐতিহাসিক বাজীরাও-এর চরিত্রের প্রধান উপকরণ। শিবজীবংশের কারো মনে অখিল ভারতীয় হিন্দুপৎ-পাদশাহীর চিন্তা আসেনি, এসেছে ছত্রপতির ব্রাহ্মণ কর্মচারীপ্রধান বাজীরাও-এর মনে। যজনযাজন পঠনপাঠন ছেড়ে তিনি সাম্রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করলেন এবং রাজপুতানার রাজাদের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে হিন্দুপৎ-পাদশাহীর পরিকল্পনাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করলেন। বাজীরাও যে কত বড় রাজনৈতিক ছিলেন, তার প্রমাণ পাই যখন দেখা যায় তিনি মেবারের মহারাণাকে প্রথম হিন্দু পাদশাহ হবার অনুরোধ জানান। মহাপরাক্রান্ত বাজীরাও ঐভাবেই রাজপুতদের দিল্লীর পতাকাতল থেকে সরিয়ে নিলেন।

বাজীরাও নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে এই বিষয়ে আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। নাট্যকার সে সুযোগ গ্রহণ না করায় সন্দেহ হয় যে, বাজীরাও সম্পর্কে ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাব এই ত্রুটির প্রধান কারণ।

বাজীরাও মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন ধার্মিক সন্ন্যাসীকে ভক্তিশ্রদ্ধা জানাতেন; কোনো একজন ব্যক্তি তাঁর গুরু ছিলেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হিন্দু-

রাজত্বে গোব্রাহ্মণ, বিশেষ সন্ন্যাসীদের যে বিশেষ সম্মানের আসন থাকবে, এটাই বাজীরাও দেখাতে চেয়েছেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও এই শ্রদ্ধা-ভক্তি জানানর প্রয়োজন ছিল এবং তাতে সুফল ফলেছিল। নাটকে তাই ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীকে বাজীরাও-গুরু বলে দেখান যেমন ভুল হয়েছে, তেমনি ভুল হয়েছে এই সন্ন্যাসীকে সামরিক শিক্ষক হিসাবে কল্পনা করা। বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর শিষ্যরা যেমন ধর্মাচরণে তেমনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। বাজীরাও বা মস্তানী ব্রহ্মেন্দ্রের এই যোদ্ধা-শিষ্যদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এই বক্তব্য বা ঘটনা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। ব্রহ্মেন্দ্র ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন তাঁর শিষ্যসম্প্রদায়কে কোনো রকম সামরিকশিক্ষা দেননি। বরঞ্চ ব্রহ্মেন্দ্রের ধর্মস্থান বিনষ্ট হলে বাজীরাও যুদ্ধযাত্রা করেছেন।

ব্রহ্মেন্দ্রকে 'আনন্দমঠে'র সন্ন্যাসীদের মতো লেখক কল্পনা করেছেন এবং যুদ্ধপারঙ্গম সন্ন্যাসীসৈন্যের সৃষ্টি হয়েছে কেবলমাত্র সেই কারণেই। মনে রাখা কর্তব্য যে, আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'আনন্দমঠে'র ঐতিহাসিক ভূমিকা : যদুনাথ সরকার; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ)। সুতরাং তাদের প্রতিবিম্বে যে মারাঠা সন্ন্যাসীসৈন্য সৃষ্টি হল, তাও সম্পূর্ণ ভুল। তাই আমরা অবাক হয়ে দেখলাম যে, প্রথম অঙ্কের পরিপূর্ণ কাল্পনিক নাট্যারম্ভের পর দ্বিতীয় অঙ্কে ইতিহাস-কাল ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের ছায়া পড়েছে বটে, কিন্তু অস্তগামী সূর্য যেমন উদ্দেশ্যহীন বিরাট প্রলম্বিত ছায়ার সৃষ্টি করে তেমনি ব্যক্তি ও কালের ছায়া কায়া হবার কোনো সুযোগ পায় নাই। ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়েই অন্তর্ধান করেছে। ইতিহাস হয়ে গেছে কল্পনা, যা ধাপে ধাপে রূপ নিয়েছে কষ্টকল্পনার এবং সমস্ত নাটক জুড়ে দেখা যায় কষ্টকল্পনা দানবের অশান্ত দাপাদাপি।

এবার তৃতীয় অঙ্ক থেকে নাট্যকার কি বলতে চেয়েছেন, দেখা যাক। তৃতীয় অঙ্কে চন্দ্রসেন তরবারি হস্তে প্রবেশ করে প্রতিহিংসা, সাধসিদ্ধি, শত্রুর নিপাত প্রভৃতি ভাষণে তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সঙ্গী মালব রাজকর্মচারী (বয়স্য বলাই যুক্তিসঙ্গত ছিল, এমনই ভাঁড়ের মতো চালচলন) বলদেব। ইতিমধ্যে তাঁরা রণজীকে একলা পেয়ে বধ করতে উদ্যত, এমন সময়ে রণরঙ্গিণী বেশে গৌতমার প্রবেশ এবং তাঁর কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মালব-

সৈন্যদের রণজীর সৈন্যদলে যোগদান। রণজী মালবরাজ গিরিধরকে পরাজিত ও বন্দী করলেন। কিন্তু যখন রাজা গিরিধর আত্মহত্যায় উদ্যত এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাঁকে অনুগমন করতে প্রস্তুত, তখন রণজী "চোখের উপর ব্রহ্মহত্যা-স্ত্রীহত্যা দেখতে পারব না" বলে তাঁদের সকলকে মুক্ত করে দিলেন। বাজীরাও এই খবর পেয়ে বিচলিত হলেন, কিন্তু রণজীর উদার মনের পরিচয় পেয়ে তাঁর ওপর অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে বললেন "আরও অধিক তুষ্ট হয়েছি বন্ধু তোমার সত্যনিষ্ঠায়।" (৩য় অঙ্ক ৩য় গর্ভাঙ্ক, পৃ ৭৯) এই অঙ্কের শেষের দিকে কয়েকটি বিশেষ সংলাপ বাজীরাও-এর মুখে দেওয়া হয়েছে। প্রথম—"রণজী। পেশোয়ার সিংহাসনে আবশ্যক নাই, পেশোয়া রাজ্যকামী নয়"। দ্বিতীয়—"এই মুহূর্তে আমাদের কর্ণাটে অভিযান করতে হবে।" এই দুইটি বক্তব্য সম্পর্কেই বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে এবং যথা সময়ে তা করা হবে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে নিজাম বাহাদুর প্রবেশ করে দেড়পাতা ভাষণ দিচ্ছেন। অনেক ঐতিহাসিক কথা স্বভাবতই তাঁর মুখে বসান হয়েছে। যেমন—"দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহ-র মন্ত্রিত্ব উপেক্ষা করে দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলাম তাতে আমারই বিজয় হল। আগ্রায় আজ আমার পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল নেই, দিল্লীশ্বরের সে বিশ্বব্যাপী বিক্রম এখন স্তিমিতপ্রায়, নিজামই এখন হিন্দুস্থানের অদ্বিতীয় শক্তি। এখন আমার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী পেশোয়া বাজীরাও। আশা ছিল, আমার রাজ্য হতে পলায়িতা মস্তানীকে উদ্ধার করার অছিলায় আমি সাতারা অভিযান করব। মহারাষ্ট্র রাজধানী অধিকার করে মুসলমান গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব।" কিন্তু তা হল না। গৌতমা মুসলমান বালক সেজে নিজামকে ভুল খবর দিলেন, ফলে নিজামের ত্রিশ হাজার সৈন্য বুরহানপুর অভিমুখে স্বয়ং নিজামের নেতৃত্বে যাত্রা করল। মলহর রাও হোলকার পত্নীর বুদ্ধিবলে অবশিষ্ট নিজামীসৈন্যকে পরাজিত করলেন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে মস্তানী রণরঙ্গিনী বেশে বাজীরাও-এর পশ্চাদ্ধাবিনী। নিজাম ও তাঁর সৈন্যদল যখন নৃত্যগীতে ব্যস্ত, তখন বাজীরাও-এর আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। নিজামপক্ষে দেখান হয়েছে নিজাম, গিরিধর, চন্দ্রসেন, শম্ভুজী, বলদেব ইত্যাদি। স্থান গোদাবরীতীর—পশ্চাতে সেতুবন্ধের দৃশ্য। (গোদাবরী-

তীরে এ কোন সেতুবন্ধ ?) যুদ্ধে জয়ী হয়ে বাজীরাও তাঁর প্রতিপক্ষদের বন্দী না করে মুক্তি দিয়ে তাঁর ঔদার্য প্রদর্শন করলেন। জয়ের চরম মুহূর্তে খবর এল যে, বুন্দেলাগণ প্রয়াগের সুবেদার মহম্মদ খাঁ বঙ্গস দ্বারা আক্রান্ত। বুন্দেলারাজ ছত্রশাল বাজীরাও-এর সহায্যপ্রার্থী। এখানেই জানা গেল যে, মস্তানীর জন্মস্থান বুন্দেলা। সুতরাং মস্তানীর সনির্বন্ধ অনুরোধে বুন্দেলখণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে জানা গেল মস্তানী মহারাজ ছত্রশালের কন্যা। (অর্থাৎ হিন্দু ও ব্রাহ্মণ—পেশোয়ার সঙ্গে বিবাহের উপযুক্ত পাত্রী)। সুতরাং রণজী ও মলহর রাও-এর উপর আগ্রাজয়ের ভার অর্পন করে বাজীরাও মস্তানী সমভি-ব্যাহারে বুন্দেলখণ্ড যাত্রা করলেন। এইখানে তৃতীয় অঙ্কের পরিসমাপ্তি।

প্রথম তিন অঙ্ক জুড়ে দেখা গেল, মালবের সঙ্গে যুদ্ধ এবং তৃতীয় অঙ্কে নিজাম মালব চন্দ্রসেন ও শম্ভাজীর মিলিত শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ এবং বুন্দেলখণ্ডে যুদ্ধযাত্রা। এরই মাঝে পেশোয়াকে সিংহাসনে বসাবার কথা একবার আলোচিত হয়েছে এবং মস্তানীর পরিচয়ে বলা হয়েছে, তিনি মুসল-মান নন, বরং ব্রাহ্মণ মহারাজ ছত্রশালের কন্যা।

চতুর্থ অঙ্ক অবশ্যম্ভাবীভাবে বাজীরাও-এর জয় ও মস্তানীকে বিবাহ করার পর শুরু হয়েছে। বাজীরাও মুসলমান বিবাহ করেছেন শুনে সৈন্যরা ভগ্নো ৎ-সাহ। বাজীরাও মস্তানীর প্রেমে ক্লীবে পরিণত হয়েছেন, সমস্ত যুদ্ধোদ্যম হারিয়ে আগ্রাজয়ের প্রতিজ্ঞা ভুলে বসে আছেন। (কি আশ্চর্য! এতদিন মস্তানীকে সদাসঙ্গিনী পেয়ে কোনো বিভ্রম দেখা দেয়নি, বিবাহের পরেই এই অধঃপতন!) কিছুতেই বিশ্রামাকাঙ্ক্ষী পেশোয়াকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করা গেল না। তিনি মস্তানীকে নিয়ে অবকাশযাপন করতে লাগলেন। স্বয়ং মস্তানী তাঁর নিদ্রা ভাঙাতে পারল না। সংলাপ—বাজীরাও বলছেন, "চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠুক জ্বলতে দাও—তারপর যখন আমার কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙবে—বিশ্রাম-বাসনা টুটবে তখন আবার আমি পেশোয়া হয়ে দাঁড়াব।" কিন্তু তিন মাস পরেও পেশোয়ার নিদ্রাভঙ্গ হল না। প্রমোদকুঞ্জের রক্ষীকে হত্যা করে রণজী পেশোয়া-সকাশে উপনীত হলেন। তীব্র ভৎর্সনাতেও বাজীরাও অটল। মস্তানীর কথার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের রাজরানী নাটকের রাজার মুখের সংলাপ এসে যায়। বাজীরাও বলেন, "তুমিই সেই মজ্জমান জীবনতরণীর

মঙ্গল কিরণবর্ষী ধ্রুবনক্ষত্র। তোমার ওই গভীর অপ্রমেয় অনন্ত প্রেমই আমার অবলম্বন।' (চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, পৃ. ১১৮।) অগত্যা পেশোয়াকে স্বসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করতে মস্তানী আত্মহত্যা করে পথ মুক্ত করলেন।

পরের দৃশ্যে বাজীরাও মহারাষ্ট্রশিবিরে উপস্থিত হয়ে শুনতে পেলেন, তাঁর নিজরাজ্য সাতারা শত্রুদ্বারা আক্রান্ত। "মোহের ছলনায় যে সর্বনাশ" হয়েছে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে বাজীরাও সাতারা চললেন। দেখান হয়েছে, বাজীরাও পুত্র বলজী আক্রান্ত এবং ভগিনীপতি শঙ্কর দস্যুর হাতে হত। গৌতমার বীরত্ব ও বাজীরাও-এর বিশ্বস্ত অনুচর রাঘবের চন্দ্রসেনের হাতে মৃত্যু। এই মৃত্যুপুরীতে বাজীরাও-এর সদলে প্রবেশ ও শোক। প্রস্তাব করলেন, "শঙ্কর রাও-এর হত্যাকারী ঐ বিশ্বাসঘাতক ত্র্যম্বকরাও—আমি ত্র্যম্বকের মৃতদেহ চাই।' দ্বিতীয় প্রস্তাব—"পর্তুগীজশক্তি ধ্বংস কর। আমার সমস্ত রণপোত নিয়ে—নৌসেনাপতি আংগ্রের সাহায্যে · বন্দরে অভিযান কর।"

চতুর্থ অঙ্কে মস্তানীর মৃত্যুর সঙ্গে সাতারার আক্রমণ ও বাজীরাও-পক্ষীয়দের মৃত্যুকে যুক্ত করা হয়েছে। মনে হয়, পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অভিযান বাজীরাও-এর শোকের এক কারণহীন প্রকাশ। বাজীরাও-এর পুত্রকে এই অঙ্কে দেখতে পাই।

পঞ্চম অঙ্কের শুরু বরোদার ডভই প্রান্তর। প্রতিপক্ষ চন্দ্রসেন, পিলাজী ও ত্র্যম্বকরাও। দৃশ্যশেষে পর্তুগীজবন্দর অধিকার ও পর্তুগীজশক্তি বিধ্বস্ত হবার সংবাদ ও ত্র্যম্বকরাও-এর মৃত্যু। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাজীরাও-এর বিরুদ্ধে বিরাট রাষ্ট্রসংগঠনের অভিযান। 'প্রতিপক্ষ দিল্লী, অযোধ্যা, জয়পুর, যোধপুর, যশল্মীর, নিজাম, মালব, রোহিলা। ভূপাল রণস্থল। তিনলক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে একা বাজীরাও। এই যুদ্ধদৃশ্য চমৎকার। সমস্ত নাটকের মধ্যে এই একটি দৃশ্য সত্যই সুরচিত। অবশেষে বাজীরাও-এর জয়। সংলাপ—"আমি দিল্লীশ্বরের প্রার্থনা গ্রাহ্য করলেম। বাদশাহ মহম্মদ সাহকে সিংহাসনচ্যুত করে আমি মুসলমান সমাজের হৃদয়ে আঘাত হানতে অনিচ্ছুক। জগন্মান্য দিল্লীশ্বরের বিপন্ন বংশধরকে নিরাশ্রয় না করে পুত্তলিকাবৎ সিংহাসনে বসিয়ে রাখাই আমি সঙ্গত মনে করি। হিন্দুস্থানে শান্তিস্থাপন আমার অভিপ্রায়—মুসলমানদের সর্বনাশ আমার ইচ্ছা নয়।" মারাঠা রাজ্য স্থাপন বা তার পরিধি

বিস্মৃতি বা চৌথ আদায় সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। তখনকার দিনে হিন্দুস্থান বলতে নর্মদা নদীর উত্তরভাগের ভারতবর্ষকে বোঝাত। কখনো কখনো গোদাবরীর উত্তরকে বলা হত হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণভাগকে বলা হোত খালি দক্ষিণ—যা থেকে Deccan কথাটির উদ্ভব হয়েছে। নাট্যকার সব-ভাবে অর্থে হিন্দুস্থান কথাটি ব্যবহার করেছেন। নাট্যকার এইবার মহারাষ্ট্র-পতি সাহুর বাজীরাও-এর পরাক্রমে ভীত হবার দৃশ্য দেখিয়েছেন। চন্দ্রসেন সাহুকে বলছেন, "আমি সেই চন্দ্রসেন—যার অসিবলে আপনার সিংহাসন সাতারায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।" (হতে পারে এই মিথ্যা গর্ব নাট্যকারের ইচ্ছে করে দেওয়া, উদ্দেশ্য চন্দ্রসেনের হীন চরিত্র প্রমাণ করা।) সাহু শেষ পর্যন্ত বাজীরাওকে গুপ্তহত্যা করতে অস্বীকার করে চন্দ্রসেনকে বিতাড়িত করলেন। অবশেষে মলহর রাও হোলকার এসে সাহুর ভয় অপনোদন করে বাজীরাও-এর রাজভক্তির নিদর্শনগুলি "মহারাজের হস্তে অর্পণ করছেন।" সাহু তখন বলছেন "উদার কর্তব্যনিষ্ঠ বীর—আমায় মার্জনা কর।"

নাটক শেষ হয়ে আসছে। সুতরাং রাঘবের পত্নীর ছুরিকাঘাতে চন্দ্রসেনের মৃত্যু হোল (৫।৫, ১৫-১৬৯)। বাজীরাও তাঁর গুরু ব্রহ্মেন্দ্রকে জানালেন যে, তাঁর জীবন সম্পূর্ণ—আয়ুষ্কাল পূর্ণ। তিনি গুরুদেবকে প্রণাম করে পুত্র বালাজীকে নানা সদুপদেশ দিয়ে তাকে মারাঠা দরবারে তার বিপক্ষ-দলীয়দের হাতে সমর্পন করলেন। সকলে মুগ্ধ। বাজীরাও-এর পতাকাতলে সমস্ত মারাঠা নায়কগণ একতাবদ্ধ। এই শুভ সন্ধিক্ষণে বাজীরাও-এর মৃত্যু। পিলাজীর সংলাপ, "মহাপ্রাণ নরদেবতা! নরকের অন্ধকার থেকে পুণ্যের আলোকময় পথে আমাদের পৌছে দিয়ে চলে গেলে তুমি!"

বাজীরাও নাটককে বিশদভাবে আলোচনা করা হোল, কারণ প্রচুর ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে অনৈতিহাসিক নাটক লেখার এমন উদাহরণ বিরল। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ভুল প্রয়োগ ও ভুল ব্যাখ্যা নাটকটার নামাবলী। অথচ এই ভুলের মধ্যে যোগসূত্র এবং কীর্তি ও কর্মের গঠন আছে। সুতরাং বলা চলতে পারে যে, কালের গণ্ডী ও ঐতিহাসিক প্রয়োজন উপেক্ষা করে নাট্যকার তাঁর ইচ্ছামতো এক মনোরম গল্প রচনা করেছেন। এইজন্যেই মস্তানীকে নিয়ে নাটক শুরু হয়েছে এবং তার মৃত্যুর কিছু পরেই নাটক শেষ

হয়েছে। নাট্যকার মস্তানীকে বাজীরাও এর জীবনের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করেছেন যে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মস্তানীকে রক্ষার জন্যই বাজীরার-এর সমস্ত জীবনের যত যুদ্ধবিক্রম ও সমরসজ্জা। এই চিন্তা সম্পূর্ণই কবিকল্পনা। মস্তানীর ইতিহাস যদিও উপন্যাসের থেকেও মধুর, কিন্তু বাজীরাও নাটকে তার কোনো আভাষ নাই। সুতরাং সকলের জ্ঞাতার্থে মস্তানীর ইতিহাস বলা যাক।

ভারত-ইতিহাসে ছত্রপতি শিবজীর সব থেকে বড় দান কেবল মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপন নয়, মোগলশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছোট ছোট রাষ্ট্রের বিদ্রোহ করবার সাহস [illegible] দান। শিবজীর মৃত্যুর পর থেকেই এই ব্যবহার স্পষ্ট। শিবজীর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে ছোট্ট ছত্রশাল রাজত্ব মোগলশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পান্না ছিল ছত্রশালের রাজধানী। এই বিদ্রোহের মোকাবিলা করতে এলেন বিখ্যাত মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ পাঠান নেতা মুহম্মদ খাঁ বঙ্গস। ছত্রশালের [illegible] বয়স তখন ৭৭ বৎসর (জন্ম ১৬৫০)।[৬]

১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুহম্মদ খাঁ বঙ্গসের অভিযান শুরু হল। কিছুতেই মোগলশক্তির [illegible] মারাঠা প্রভুত্ব স্বীকার করে সাহায্যপ্রার্থী হলেন বাজীরাও [illegible]। বাজীরাও তখন মালবজয়ে ব্যস্ত। ১২ মার্চ ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও [illegible] হাজার সৈন্য আর বিশ্বাসী সহকারী-গণ, যেমন পিলাজী যাদব, [illegible], টুকোজী পাওয়ার এবং দাভলজী সোমবংশী সহ বঙ্গসকে আক্রমণ করলেন। মারাঠা যুদ্ধের প্রধান রীতি সম্মুখসমরে অবতীর্ণ না হওয়া। ছোট ছোট দলে বিভক্ত অশ্বারোহী সৈন্য ক্রমান্বয়ে তীব্র আক্রমণে শত্রুপক্ষকে বিপর্যস্ত করল। পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে মুহম্মদ খাঁ বঙ্গস মারাঠাদের ক্রমাগত আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন, অবশেষে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। তিন হাজার ঘোড়া ও ১৩টি হাতি মারাঠা করতলগত হল। চার মাস আগে মোগলসম্রাটকে মালব-রাজ্য হারাতে হয়েছে, এবার গেল বুন্দেলখণ্ড। ক্রোধে অধীর বাদশা পরাজিত মুহম্মদ খাঁ বঙ্গসকে পদচ্যুত করে সরবুলন্দ খাঁকে এলাহাবাদের সুবাদার নিযুক্ত করলেন। রাজা ছত্রশাল এই অপূর্ব জয়ের প্রতিদানে বাজী-রাওকে মস্তানী নামে এক অপরূপ সুন্দরী মুসলমান নর্তকী উপহার দিলেন। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ঘটনা।[৭]

বলা বাহুল্য, তৎকালীন ভারতবর্ষে এইরকম উপঢৌকন দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। মোগল হারেমে হিন্দু ও মুসলমান রমণীর অভাব কখনই হয় নাই। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাদশাহের বেগম হবার সম্মান লাভ করেছেন। হুগলিতে পর্তুগীজদের হারিয়ে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে কাশিম খাঁ সাতজন পর্তুগীজ রমণী সম্রাট সাজাহানকে উপঢৌকন দেন। দারার কাশ্মীরী বেগম নর্তকী ছিলেন এবং সম্ভবত ধর্মে খ্রীষ্টান ছিলেন। দারার হত্যাকাণ্ডের পর ঔরঙ্গজীব ভ্রাতৃবধূর রূপে মোহিত হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন, নাম দেন উদিপুরী বেগম। এঁরই গর্ভজাত পুত্র কামবক্স মোগল সিংহাসন পাবার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর উত্তরাধিকারী মোগল মসনদে উপবেশন করেছেন। হিন্দু রাজাদের মুসলমান উপপত্নী থাকত। তাদের পুত্রকন্যাগণ প্রায়ই নানা রাজত্ব স্থাপন করেছেন বা সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতার অর্ধাঙ্গিনী বা অঙ্কশায়িনী হয়েছেন। বাজীরাও এবং মস্তানীর পুত্র সামসের বাহাদুর বান্দা রাজত্বে নবাবি স্থাপনা করেন। তাঁর বার্ষিক আয় ছিল ৩৩ লক্ষ টাকা। বলার কথা এই যে, সুন্দরী স্ত্রীলোক গ্রহণ বা দান প্রাক-ইংরেজ ভারতীয় সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থাবলীর অন্যতম ছিল।

মস্তানীর বংশপরিচয় পাওয়া যায় না। প্রচলিত কথিকা যে, হিন্দু পিতা ও মুসলমান নর্তকী মাতা মস্তানীর জনকজননী। উপন্যাসের প্রয়োজনে ছত্রশালকে পিতৃত্ব আরোপ করলেও তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ঐতিহাসিক কাগজপত্রে মস্তানীর নাম পাওয়া যায় ১১ জানুয়ারী ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও-এর প্রথম পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে। মস্তানীর প্রতি ভালবাসা বাজীরাওকে তাঁর আত্মীয়স্বজনমহলে কলঙ্কিত করেছে। পুত্রের বিবাহের সময়ে যুদ্ধের অছিলায় তাঁকে বাইরে থাকতে হয়। ওই বছরে পুনার শানিবার প্রসাদ তৈরী করালেন বাজীরাও মস্তানীর জন্য। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের পুত্র সামসের বাহাদুরের জন্ম হোল। মারাঠাগণ মদ্য ও মাংস বর্জন করে চলতেন, কিন্তু রাজপুতগণ এগুলি গ্রহণ করতেন। উত্তর ভারতের বিলাসব্যসন দেখেই বাজীরাও মদ্য ও মাংসে আসক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর এই আসক্তির জন্য সকলে মস্তানীকেই দোষী সাব্যস্ত করেন। মস্তানী হিন্দু স্ত্রীর মতো পোশাক পরিধান করতেন ও আচারব্যবহারে হিন্দুর নিয়মকানুন মেনে চল-

তেন,. এমনকি বার্ষিক গণপতি পূজাতে সাড়ম্বরে অংশগ্রহণ করতেন। সব-বিষয়ে তিনি বাজীরাও-এর বিবাহিতা স্ত্রীর মতোই ব্যবহার করতেন। মস্তানীর প্রতি ভালবাসার ফলে সামাজিক ব্যাপারে বাজীরাওকে তাঁর আত্মীয় ও পরিজনগণ প্রায় পুরাপুরি বর্জন করেছিলেন। সম্ভবত এই ঘটনার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে বাজীরাও-এর অসমসাহস এবং প্রচণ্ড যুদ্ধপ্রজ্ঞার যোগাযোগ আছে। বাজীরাও তাম্রকুট সেবনের অভ্যাস করেন এবং প্রাচীন চিত্রে এক মারাঠা ব্রাহ্মণকে ফরসি খেতে খেতে মলহর রাও হোলকারের সঙ্গে আলাপ করতে দেখা যায়।

মস্তানী বাজীরাও-এর সঙ্গে নিয়মিত যুদ্ধে যেতেন। তখন মারাঠা রমণী-দের যুদ্ধ করা প্রচলিত ছিল না। শিবজী-মাতা জিজবাঈ বা শিবাজী-পুত্রবধূ তারাবাঈ রাজনীতি বা শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করলেও কখনও যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নেন নি। সুতরাং বাজীরাও নাটকে গৌতমা বা রঙ্গিনীর চরিত্র সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রক্ষিপ্ত। মস্তানী নিয়মিত যুদ্ধে যেতেন, বাজীরাও-এর পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে চলে লাজলজ্জাকে উপেক্ষা করেছেন। এজন্য তাঁকে লোকাপবাদ ও গুজব-গুঞ্জনের বস্তু হতে হয়েছে। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের-শেষের দিকে বাজীরাও এর জ্যেষ্ঠ পুত্র নানাসাহেব ও ভ্রাতা চিমনজী আপ্পা মস্তানীকে বন্দী করে পুনায় আবদ্ধ করে রাখেন। বাজীরাও তখন অন্যত্র যুদ্ধে লিপ্ত। এই খবর পাবার পর তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পান। বহুযুদ্ধে বিজয়ী বীর তাঁর প্রেমাস্পদাকে রক্ষা করতে পুনা যেতে পারছেন না, এটাই সব থেকে মর্মান্তিক ঘটনা। অন্যের রাজত্ব যিনি হেলায় অধিকার করেন, তিনি নিজ রাজত্বের সর্বশক্তিমান ব্যক্তি হয়েও তাঁর প্রিয় সহচরী মস্তানীকে রক্ষার জন্য কিছুই করার ক্ষমতার অধিকারী নন—এর থেকে বিয়োগবিধুর আর কি ব্যথা হতে পারে? তবে কি পুত্র আর ভ্রাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন? নানাসাহেব ও চিমনজী বহুদিন ভেবে তারপর মস্তানীকে বন্দী করার সংকল্প গ্রহণ করেন। এই সংকল্প গ্রহণের প্রথম ও প্রধান কারণ বাজীরাও-এর তাঁর পরিবারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। ভাই চিমনজীই বাজীরাও-এর সমস্ত কর্তব্য সমাধা করতেন। এমনকি পিতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী বালাজী বাজীরাও সম্পূর্ণভাবে তাঁর খুল্লতাতের উপদেশ ও আদরে বর্ধিত

হয়েছেন। পিতা বাজীরাও-এর কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব তাঁর উপর পড়েনি। জ্যেষ্ঠ পুত্র নানাসাহেব বিবাহের সময় থেকে পিতার মস্তানী প্রীতিতে রুষ্ঠ। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের গোলমাল প্রকট আকার ধারণ করল যখন চিমনজীর কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ রাও-এর উপনয়ন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র সদাশিব রাও-এর বিবাহ উপলক্ষে কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিত আসতে রাজী হলেন না। তাঁদের বক্তব্য, মুসলমানের সঙ্গে বসবাস করে বাজীরাও জাতিচ্যুত হয়েছেন, এবং তাঁকে জাতিচ্যুত না করায় তাঁর পরিবারও জাতিচ্যুত হয়েছেন। সুতরাং তাঁদের বাড়ির কোনো ধার্মিক ক্রিয়া-কর্মে তাঁরা অংশগ্রহণ করবেন না। ক্রোধের বশে নানাসাহেব হয়তো মস্তানীকে হত্যা করতেন। কিন্তু মহারাজ সাহু খবর পেয়ে তাকে বাধা দিলেন। সাহু জানালেন, মস্তানীর প্রতি অবিচার তিনি কেবল বাজীরাও-এর নয় তাঁর নিজের অসম্মান বলেই গণ্য করবেন। মস্তানীকে তাঁর নিজের প্রাসাদে নজরবন্দী করে রাখা হোল। ৪ ও ৭ ফেব্রুয়ারী ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে চিমনজীর পুত্রদ্বয়ের উপনয়ন ও বিবাহ নির্বিঘ্নে পুনায় সমাধা হল। বাজীরাও এই অনুষ্ঠানের কোনটাতেই যোগদান করলেন না। তিনি নিজামপুত্র নাসির জঙের সঙ্গে তখন যুদ্ধে ব্যস্ত। এটাই তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ। ১২ মার্চ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ঔরাঙ্গাবাদে যুদ্ধজয়ী বাজীরাও বিজিত নাসির জঙের সঙ্গে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। এখানেই ভাই চিমনজী আপ্পার সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎ হয়। পুনায় ফেরার পথে বাজীরাও নর্মদার দক্ষিণতীরে অবস্থিত রাভারে পৌঁছে অসুস্থ হয়ে পড়লেন শুক্রবার ২৫ এপ্রিল। এটাই তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ অসুস্থতা। সংবাদ পেয়ে কাশীবাঈ কনিষ্ঠ পুত্র জনার্দনকে নিয়ে এসে পৌঁছাবার পরই দিগ্বিজয়ী বাজীরাও ২৮ এপ্রিল ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বাজীরাও-য়ের মৃত্যুসংবাদ পুনায় পৌঁছানমাত্র মস্তানী প্রাণত্যাগ করেন। আত্মহত্যা কিংবা বিরহবেদনা, তা আজও জানা যায়নি। পুনা থেকে কুড়ি মাইল দূরে পাবল নামে এক জায়গায় তাঁকে কবরস্থ করা হয়। প্রায় সব মত অনুসারেই মস্তানী সেযুগের এক অপূর্ব মহিলা।[৯] মস্তানীর রূপের খ্যাতিও দিগন্তবিস্তারিত। তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে কাঞ্চনী ও কাঞ্চনবর্ণারূপে। নৃত্যগীতপটিয়সী, অশ্বারোহণে পটু, এমনকি যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শিনী এই রমণীকে তলোয়ার ও বর্শার ব্যবহারে যে কোনো বীরের সমকক্ষ বলা হয়েছে।[১০]

বাজীরাও-মস্তানীর কাহিনী অদ্ভুত ঘটনাবহুল রোমান্স। প্রেম ও দুঃখের মধ্যে দিয়ে তাঁরা পরস্পরকে কাছে পেয়েছেন। পরিণামে এসেছে শুধু কলঙ্ক আর হতাশা। নাটক লেখার উপকরণ বটে। কিন্তু এই বিরাট প্রণয়কাহিনী রচনা করবার জন্য যে জ্ঞান ও কলমের প্রয়োজন, যে হৃদয় ও চিন্তাবৃত্তির প্রয়োজন, তা মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজীরাও নাটকে অনুপস্থিত। তাই সৃষ্ট হয়েছে এক অতি সাধারণ নাটক—চিন্তায় ক্ষীণ ও পরিপূর্ণভাবে অনৈতিহাসিক।

মস্তানীর প্রতি প্রেম বাজীরাও চরিত্রের মাত্র একদিক। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রধান গুণ অপূর্ব দেশাত্মবোধ এবং তার জন্য প্রাণ তুচ্ছ করে যুদ্ধ করা। যুদ্ধে জয়লাভ বাজীরাও-এর চরিত্রের আর একদিক। কখনও তাঁকে তাই অপ্রয়োজনে ঝুঁকি নিতে দেখা যায় না। যুদ্ধে জয়লাভের এই পটুতা তাঁকে অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিকের সম্মানে ভূষিত করেছে, তাঁকে মহারাজ শিবজীর যোগ্য উত্তরসাধক করেছে।

মারাঠা-স্বরাজ্যের পরিকল্পনা মহারাজ শিবজীর অবিনশ্বর কীর্তি। মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলি থেকে চৌথ বা জমির উৎপাদনের এক চতুর্থাংশ এবং সরদেশমুখী অর্থাৎ রাজস্বের এক-দশমাংশ মারাঠা সম্রাট দাবি করলেন, বিনিময়ে মারাঠাশক্তি এই দেশগুলিকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এমনকি মোগলের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করলেও মারাঠাশক্তির চৌথ বা সরদেশমুখী দিতে হবে। এই উপায়ে মোগল প্রভাব খর্ব হবে এবং অন্যান্য রাজ্যগুলি মারাঠা প্রভাবে এসে যাবে। এই সাংঘাতিক রাজনৈতিক বুদ্ধির উদ্ভাবনকারী মহারাজ শিবজীকে বাদশা ঔরঙ্গজীব ডাকতেন "শয়তান শিবা" বলে। এই মারাঠা বুদ্ধিকে ঠেকাবার জন্য জীবনের শেষ বৎসরগুলি দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করে কেটে গেছে বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের। শিবজী জীবিত না থাকলেও তাঁর বুদ্ধির কাছে ঔরঙ্গজীব পরাজিত হয়েছেন। শিবজীর পুত্র শম্ভাজীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেও বাদশাহ ঔরঙ্গজীব মারাঠা সংগঠন রোধ করতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর মাত্র ১৩ বছর পরেই বাজীরাও-এর বিজয়যাত্রা শুরু।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ আগস্ট বাজীরাও-এর জন্ম। পিতা বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পিতার পেশোয়াপদ মহারাজ সাহু বাজীরাওকে

দিলেন, ১৮ এপ্রিল ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ। চিৎপাবন ব্রাহ্মণগোষ্ঠির এই তরুণ, পেশোয়াপদ পাওয়ামাত্র ভারতীয় রাজনীতি ভালভাবে অনুধাবন করলেন। দিল্লীতে তখনও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রচণ্ড প্রভুত্ব। আজ বাদশাহ বানিয়ে কাল তাঁকে বাদ দিয়ে নয়া বাদশাহ বানান তাঁদের দৈনন্দিন খেলা। দিল্লীর বাদশাহর গলায় নিজেদের পা থেকে গহনা খুলে পরান বা বাদশাহর বেগমকে ধরে এনে তাকে সামান্য বারাঙ্গনার মতো সপারিষদ উপভোগ করা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের নানা কীর্তির অন্যতম। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁরা যা ইচ্ছা তাই করেছেন। ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহর আত্মীয় রোশন আখতারকে মহম্মদ শাহ নাম দিয়ে তাঁরা দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নিজাম-উল-মুলুক আসফ ঝাঁ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধপক্ষ। সুতরাং হায়দ্রাবাদের শাসনকর্তা-রূপে তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হলেন। এখানেই দিল্লীর দৃষ্টির বাইরে তিনি পরাক্রম সংগ্রহ করেছেন। উদ্দেশ্য সৈয়দ-ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধাচরণ করা। এবিষয়ে মহম্মদ শাহের গোপন সম্মতি ছিল।[১১] সুতরাং বাজীরাও নাটকে যে স্বাধীন স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে নিজামের মুখে সংলাপ দেওয়া হয়েছে, তা অংশত সত্য ; কারণ এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাজীরাও-এর মৃত্যুর পরবর্তীকালে। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে নিজামকে শিক্ষা দেবার জন্য সৈয়দরা বিরাট এক সৈন্যদল দাক্ষিণাত্যে পাঠালেন। মারাঠারাজ সাহুকে এই নিজামধ্বংস-যজ্ঞে সাহায্য করতে বলা হল। নিজামও সাহুর সাহায্য চাইলেন। বুদ্ধিমান সাহুর পরামর্শে বাজীরাও দুপক্ষের সঙ্গেই আলোচনা চালিয়ে গেলেন, কিন্তু কোনোপক্ষে যোগদান করলেন না। ফলে নিজামের হাতে বাদশাহী ফৌজের প্রচণ্ড পরাজয় হল। বাদশাহ মহম্মদ শাহ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। বাদশাহী ষড়যন্ত্রে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় যথাক্রমে ১৭২০ ও ১৭২২-এর অক্টোবর মাসে নিহত হলেন। নিজাম হলেন বাদশাহর প্রধান সহায়। উজীর আমিন খানের ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হলে নিজাম ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহের উজীর বা প্রধান অমাত্য নিযুক্ত হলেন। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিজামের প্রভাব মালব, গুজরাট আর দাক্ষিণাত্য এই তিন প্রদেশে প্রসারিত হল। এই ক্ষমতাবৃদ্ধিতে বাদশাহ ভীত হয়ে নিজামকে অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। নিজাম মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে দাক্ষিণাত্যে ফিরে এসে উজীরীতে ইস্তফা দিলেন। নিজামের সঙ্গে বাজীরাও-এর তিনবার আলোচনা বসে। তৃতীয়

আলোচনাসভা সাঙ্গ হল ১৮ মে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে। নিজাম ও বাজীরাও সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। তদনুযায়ী বাদশাহ কর্তৃক স্বীকৃত মারাঠা দাবি অনুযায়ী স্বরাজ্য, চৌথ ও সরদেশমুখী নিজাম মেনে নিতে রাজী হলেন। মালব ও গুজরাটের চৌথ ও সরদেশমুখী মারাঠাদের আদায় করার অধিকার স্বীকার করা হল। কিছুদিনের মধ্যেই বাজীরাও বাদশাহের প্রতিনিধির কাছ থেকেও এই সুবিধাগুলি আদায় করে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করলেন। উপরন্তু বহু ভূখণ্ড মারাঠা অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হল। নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মারাঠাগণ বাদশাহকে সাহায্য করতে রাজী হলেন। রাজনীতির চেহারা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে—একদিকে মোগল, অন্যদিকে নিজাম, মাঝখানে মারাঠা নানা শর্তসন্ধিমূলে নিজেদের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়ে চলেছেন। নিজামের হাত থেকে মালব রক্ষা করার জন্য গিরধর বাহাদুরকে বাদশাহ মালবের শাসনকর্তা ও সরবুলন্দ খাঁকে গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। নিজামকে বিদ্রোহী ঘোষণা করা হল।

১৭২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে মোগল ও নিজামে যুদ্ধ। নিজামের সঙ্গে বাজীরাও-এর চতুর্থ সাক্ষাৎকার ও খেলাৎ-বিনিময়। অবশেষে বাদশাহর নিজামকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তাপদে পুনর্নিয়োগ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রথম চার বৎসর কেবল কূটনৈতিক চালেই বাজীরাও মারাঠা সাম্রাজ্য ও তার অধিকার বিস্তার করেছেন। দুঃখের বিষয়, বাজীরাও নাটকে এই চার বৎসরের ঘটনার কোনো উল্লেখ নাই। ১৭২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও কর্ণাটকে দুইবার অভিযান করেন। এই কর্ণাটক অভিযানের ফলে নিজামের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল। নিজাম কর্ণাটক রাজ্যকে তাঁর অধিকারভুক্ত বলে মনে করতেন। সুতরাং নিজামকেও কর্ণাটক অভিযান করতে হল। কিছুদিন যুদ্ধবিগ্রহের পর ২৭ আগস্ট ১৭২৭ কর্ণাটকের প্রধান নেতারা বাজীরাও-এর প্রভুত্ব মেনে নিলেন। ক্রুদ্ধ নিজাম সন্ধির শর্ত উপেক্ষা করে সাহুর রাজ্য আক্রমণ করলেন। সাহুর আত্মীয় শম্ভাজীকে নিজাম ছত্রপতি ঘোষণা করলেন। ইতিমধ্যে নিজামের প্ররোচনায় মারাঠা-অধীন অনেক নেতা জানালেন যে, শম্ভাজীও যখন চৌথ ও সরদেশমুখীর দাবিদার, তখন এইগুলি কার প্রাপ্য স্থির না হলে তাঁরা কাউকেই অর্থ দেবেন না। বলা বাহুল্য, সাহু এতে আরো বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। নিজামের

সঙ্গে বোঝাপড়া অথবা নিজামের ক্ষমতাহ্রাস একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বাজীরাও সেই মুহূর্তেই নিজামকে আক্রমণের উপদেশ দিলেন। বহু অমাত্যের বিরোধিতা স্বত্বেও ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ অক্টোবর সাহু নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মারাঠা যুদ্ধবিদ্যায় প্রাজ্ঞ বাজীরাও এবারও প্রচলিত মারাঠা যুদ্ধরীতিতেই আক্রমণ রচনা করলেন। ছোট ছোট দলে বিভক্ত মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্যগণ বিভিন্ন জায়গায় নিজামের সেনাপতিদের আক্রমণ করলেন। বাজীরাও-এর সুযোগ্য সহকারীগণ মলহররাও হোলকার ও রণোজী সিন্ধিয়া যথাক্রমে তুর্ক-তাজ খাঁ ও আইভাজ খাঁকে আক্রমণ করলেন। টুকোজী পাওয়ার পুণার দিকে আইভাজ খাঁর অগ্রগতি প্রতিহত করলেন। ফতে সিং ও রঘুজী ভোঁসলে শম্ভাজীর অনুগত চন্দ্রসেন যাদবকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করলেন। বাজীরাও উত্তর খান্দেশ জয় করে বুরহানপুরের কাছে উপনীত হলেন। বাজীরাও ঔরঙ্গাবাদ আক্রমণ করতে পারেন বিবেচনা করে নিজাম পুনাযাত্রা স্থগিত রেখে রাজধানী রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে ঔরঙ্গাবাদ থেকে ২০ মাইল দূরে পালখেদের রণাঙ্গনে বাজীরাওকে শিক্ষা দিতে গিয়ে নিজাম আবিষ্কার করলেন, তিনি মারাঠাবাহিনীর বেড়া-জালে আবদ্ধ। জলকষ্টে নিজাম সসৈন্যে আত্মসমর্পন করলেন। তাঁদের মুঙ্গীসেবগ্রামে জল ও খাদ্য দেওয়া হল। এখানেই নিজাম সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন। তারিখ ৬ মার্চ ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ। বাজীরাও ও নিজামের পঞ্চম সাক্ষাৎকারে উভয়ে উভয়কে বহু উপঢৌকন ও সম্মানে ভূষিত করলেন। নিজাম আবার সাহু মহারাজের অধিকার স্বরাজ্য আর চৌথ ও সরদেশমুখীর দাবী স্বীকার করে নিলেন। পালখেদের যুদ্ধ নিজামবিজয়ী বাজীরাওকে মাত্র ২৮ বছর বয়সে শ্রেষ্ঠ যুদ্ধজ্ঞানী রাজনৈতিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করল। এতদিন এই সম্মানে নিজাম-উল-মুলুক আসফ ঝা স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নিজামের বয়স তখন ৫৮ বৎসর।

নিজামের সঙ্গে সন্ধি মালবজয়ে বাজীরাওকে উদ্বুদ্ধ করল। বর্ষার ঘন-ঘটার মধ্যে বাজীরাও ভ্রাতা চিমনজী আপ্পার সঙ্গে বসে মালবজয়ের খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করে ফেললেন। বাজীরাও নাটক পড়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, যুদ্ধ করাটা একটা হঠাৎ-মনে-আসা গোঁয়ারতুমি। "চল, অমুক দেশ

আক্রমণ করা যাক্" বা "চল, অমুককে শিক্ষা দিয়ে আসি"—একমাত্র নাট্যকারের কাণ্ডজ্ঞানহীনতাতেই হওয়া সম্ভব। প্রকৃত প্রস্তাবে বহুদিক চিন্তা করে এবং সম্পূর্ণ যুদ্ধনীতি ও পরিকল্পনা স্থির করেই যুদ্ধ হয়। বাজীরাও এর জীবনে এই ঘটনা বার বার দেখা যাবে, আর দেখা যাবে এই পরিকল্পনা রচনায় ভ্রাতা চিমনজী আপ্পার পাণ্ডিত্য। বস্তুত স্বাস্থ্যবান বাজীরাও তাঁর এই হীনস্বাস্থ্য ভাই-এর উপর যুদ্ধপরিকল্পনা বিষয়ে খুব নির্ভর করতেন। উভয় ভ্রাতায় মিলে যে সব অভিযান করেছেন, অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হলেও তার প্রত্যেকটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হল না। দুই ভাই একই দিনে দুই বিভিন্ন পথে মালবজয়ে অগ্রসর হলেন। চিমনজী পশ্চিমদিক থেকে বাগলান ও খান্দেশের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললেন। রাজ্যের প্রধান বাহিনী নিয়ে বাজীরাও পূবদিক দিয়ে অর্থাৎ আহমেদনগর, বেরার, চন্দা ও দেবগড়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলেন। দুই ভাই পথে নিয়মিত সংবাদ আদানপ্রদানের ও যোগাযোগ রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। চিমনজীর সঙ্গে সহকারী বাজী ভিবরাও রেতরেকার, গণপৎরাও মেহেনদালে, নারো শঙ্কর, অন্তাজী মানকেশ্বর ও গোবিন্দ পন্থ খেরপরে বুন্দালে প্রভৃতি মাবাবা বীরগণ। বাজীরাও-এর সঙ্গে মলহররাও হালকার, রণোজী সিন্ধিয়া আর উদাজী যাদব। কিছু পেছনে বাজীরাও-এর পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করবার জন্য চললেন পিলাজী যাদব ও দাভলজী সোমবংশী।

মোগল-বেতনভুক গিরধর বাহাদুর ও ভ্রাতা দয়া বাহাদুর এই আচাশি আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ২৯ অক্টোবর ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিমনজীর বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। আমঝেরার যুদ্ধে মোগলপক্ষের নিদারুণ পরাজয় হল। গিরধর বাহাদুর ও দয়া বাহাদুর উভয়েই এই যুদ্ধে নিহত হলেন। অনেক সৈন্য, বড বড় কামান ও ছোট আগ্নেয়াস্ত্র থাকা সত্ত্বেও মোগলবাহিনীর এই পরাজয় বিস্ময় সৃষ্টি করে। মারাঠারা কোনো কামান ছাড়াই এই যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। মালবে মারাঠা-প্রভুত্ব স্থাপিত হল। এরপরই ছত্রশালের ঘটনা। মস্তানীর ইতিহাস লেখার সময়ে সবিস্তারে সব ঘটনা জানানো হয়েছে, সুতরাং তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাজীরাও যখন ছত্রশালকে সাহায্য করছেন, তখন চিমনজী উজ্জয়িনী দখল করতে ব্যস্ত। (ডিসেম্বর ১৭২৮

খ্রীষ্টাব্দ)। মালবজয় প্রসঙ্গে তাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, গিরধর বাহাদুর মালবের রাজা নন বা দিল্লীশ্বরের প্রধান পৃষ্ঠপোষকও নন, তাঁর বেতনভুক কর্মচারী মাত্র। গিরধর প্রসঙ্গে নাটকের কোনো অংশই ইতিহাস আশ্রয় করেনি। মালবজয় মোগলশক্তির বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত বিদ্রোহ; সুতরাং মালবজয়ে যেতে বাজীরাও যে উৎসাহের অভাব দেখিয়েছেন, তা বাজীরাও-এর চরিত্র ও ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপন্থি ও সম্পূর্ণভাবে কল্পনাশ্রয়ী।

মালব ও বুন্দেলখণ্ডের পর গুজরাটজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল। আবার বাজীরাও ও চিমনজী একসঙ্গে বসলেন। যুদ্ধের এক খসড়া প্রস্তুত করা হল। সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা গোপন রাখার জন্য মারাঠারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন সময়ে গুজরাট অভিমুখে চললেন। ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে চিমনজী গুজরাটে অনুপ্রবেশ করলেন। গুজরাটের শাসনকর্তা সরবুলন্দ খাঁ ভীত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। সন্ধির শর্তের মধ্যে অন্যান্য প্রদেশের মতো গুজরাটের চৌথ ও সরদেশমুখী মারাঠাদের দিতে রাজী হলেন সরবুলন্দ খাঁ। এই খবর পেয়ে বাদশাহ মহম্মদ শাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মারাবার-রাজ অভয়সিংহকে গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। যুদ্ধের পথে না গিয়ে অভয়সিংহ বন্ধুত্বের পথে অগ্রসর হলেন। তাঁর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে বাজীরাও স্বয়ং আহমেদাবাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হল। অভয়সিংহ চৌথের বদলে বাৎসরিক ১৩ লক্ষ টাকা বাজীরাওকে দিতে রাজী হলেন এবং তার মধ্যে ৬ লক্ষ টাকা তখনই দেওয়া হল।

মালব-শাসনকর্তার পদে মুহম্মদ খাঁ বঙ্গস নিযুক্ত হয়েছেন। বাদশাহ তাঁর উপর দুইটি গোপন ও কঠিন কাজের ভার দিয়েছেন। প্রথমটি হল, নিজামের সঙ্গে মিলে প্রথমে মারাঠাশক্তিকে ধ্বংস করা এবং দ্বিতীয়, নিজামকে ধ্বংস করা। নিজাম ইতিমধ্যে বাজীরাও-এর অপসারণের জন্য মারাঠা দরবারে বহু টাকা খরচ করে ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্য করতে আরম্ভ করেছেন। বিভিন্ন ভাবে সাহুকে বোঝান হচ্ছে যে, বাজীরাওকে পদচ্যুত করলেই তিনি শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারবেন। কিন্তু সাহু মহারাজের রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা যেখানে স্বয়ং বাদশাহ ঔরঙ্গজীব ও তাঁর কন্যা জিন্নতউন্নেসা বেগম[১২] সেখানে

অন্যের সাধ্য কি তাঁকে বিভ্রান্ত করে। ষড়যন্ত্রে বিফল হয়ে নিজাম সৈন্য সাজাতে শুরু করলেন। চিমনজী নর্মদাপারে নিজামের প্রতি গতিবিধি নজর রাখতে লাগলেন। বাজীরাও ইতিমধ্যে বরোদা আক্রমণ করে ত্র্যম্বকজী দাভাদে ও পিলাজী গাইকোয়াড়ের বিরুদ্ধে পূর্বশত্রুতার শোধ তুলেছেন। মারাঠা-পতনের ইতিহাসও তাই বাজীরাও-এর সময় থেকেই শুরু। বিভিন্ন মারাঠা নেতাদের মধ্যে ঈর্ষা, অসূয়া ও হিংসা মারাঠাশক্তির পতনের এক প্রধান কারণ। বাজীরাও কর্তৃক বরোদা আক্রমণে এই গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত দেখতে পাই। এদিকে মারাবার আক্রান্ত হচ্ছে দেখে অভয়সিংহ মারাবার যাত্রা করলেন। বাজীরাও গুজরাটে অবস্থান করতে লাগলেন। মালবে মারাঠা-প্রভুত্ব যাতে কমে না যায়, তাই ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ জুলাই সিন্ধিয়া, হোলকার ও পাওয়ারকে মালব রাজত্ব ভাগ করে দেওয়া হল। প্রত্যেক নেতা তাঁর নিজের অধীন অংশ রক্ষা করতে লাগলেন। (পরবর্তীকালে এইগুলি তাঁদের রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। এঁদের বংশধররাই এই সব উপাধির অধিকারী রাজন্যবর্গ)।

১৭৩২ থেকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ ক্ষমতারক্ষার জন্য ও বাৎসরিক অর্থসংগ্রহের জন্য বাজীরাওকে যুদ্ধ করে যেতে হয়েছে। একদিকে নিজাম অন্যদিকে মোগলের সঙ্গে কখনও যুদ্ধ কখনও সন্ধি হয়েছে বটে, কিন্তু বাজীরাও-এর গলাতেই বিজয়লক্ষ্মী বার বার জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছেন।

এরই মাঝে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাজীরাও-এর সুযোগ্য পুত্র বালাজী বাজীরাও-এর যুদ্ধশিক্ষা শুরু। শিক্ষাদাতা চিমনজী ও পিলাজী যাদব। ১৭৩২-এ নিজাম ও বাজীরাও-এর সাক্ষাৎকার ও সন্ধি। ১৭৩৩-এ চিমনজী ও হোলকারের বুন্দেলখণ্ড অধিকার। পিলাজী যাদব ১৭৩৪-এ বুন্দি অধিকার করলেন। ১৭৩৫-এ মোগল সেনাপতি খানদুরান ও কামারুদ্দিন খানের মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা। সিন্ধিয়া ও হোলকারের হাতে রামাপুরায় মোগলবাহিনীর পরাজয়। এইসবের মধ্যে পেশোয়ামাতা রাধাবাঈ চলেছেন তীর্থযাত্রায়। সময় ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ। মোগল, রাজপুত, নিজাম সবাই সসম্ভ্রমে পেশোয়ামাতার তীর্থভ্রমণকে নির্বিঘ্ন করছে। রাধাবাঈ প্রথমে গেলেন উদয়পুর, সেখান থেকে জয়পুর, তারপর মথুরা, বৃন্দাবন, কুরুক্ষেত্র এবং প্রয়াগ। বেনারস পৌছালেন বাজীরাও মাতা ১৭ অক্টোবর ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ। ফিরে এলেন পুনায়

১ জুন ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দ। মোগল-মারাঠা যুদ্ধের মধ্যে তাঁর এই নির্বিঘ্নে ভ্রমণ এক অভাবনীয় ঘটনা। ইতিমধ্যে বাদশাহ নিজামকে স্মরণ করেছেন দিল্লীতে, নিজাম তাঁর সামনে গেলে তাঁকে সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ওমরাহ বলে খাতির করেছেন। উদ্দেশ্য নিজামের সাহায্যে মারাঠাসাম্রাজ্য ধ্বংস করা। বাদশাহের ভয় পাবার কারণ দিল্লীর দরজায় বাজীরাও-এর আগমন। বাজীরাও-এর অভিযান গোপন ছিল না, কিন্তু তিনি যে দিল্লীতে উপনীত হবেন, এটাও কেউ ভাবেনি। তাই ক্ষিপ্রগতি বাজীরাও যখন ২৮ মার্চ ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ দিল্লীর বাইরে ছাউনি স্থাপন করলেন তখন দিল্লী সহরে দারুণ আতঙ্ক উপস্থিত হল। ২৯ মার্চ রামনবমীর দিন বাজীরাও তাঁর ভাই চিমনজীকে লিখেছেন: "এইদিন আমরা অল্পস্বল্প লুণ্ঠন করতেই দারুণ ভীত হয়ে পডলেন বাদশাহ।" সন্ধির প্রস্তাব এল ৩০ মার্চ। বাজীরাও শঙ্কিত দিল্লীবাসীদের কথা ভেবে ছাউনি তুললেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাদশার ৮০০০ সৈন্য তাঁদের আক্রমণ করল। সিন্ধিয়া, হোলকার ও পাওয়ার বাদশাহী সৈন্যদের পরাজিত করলেন। বাহিনীর অধিনায়ক মীর হাসান কোকা হত হলেন। দিল্লী-অভিযান বাজীরাওকে অভূতপূর্ব সম্মানে ভূষিত করল। এমনকি রাজপুত নরপতিগণ জয়পুররাজের নেতৃত্বে মোগলশক্তির বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধযাত্রা করবেন কিনা আলোচনা করতে লাগলেন। হিন্দু-পাদশাহীর চিন্তা ও মোগল-নিজামের বিরুদ্ধে মারাঠা-রাজপুতের অভ্যুত্থান এই সময়কার রাজনীতির সব থেকে বড় প্রশ্ন। মোগল-মারাঠা যুদ্ধ ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দের শুরু থেকেই আরম্ভ হয়েছে। উত্তর ভারতের যুদ্ধে বাজীরাও নেতৃত্ব করেছেন আর দক্ষিণ ভারতের যুদ্ধ চিমনজীর তত্ত্বাবধানে ছিল। প্রায় সব মারাঠা নেতারা এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। অবশেষে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও ও নিজাম আবার মুখোমুখি হলেন। ভূপালের রণক্ষেত্রে আবার শক্তিপরীক্ষা হল। নয় বছর পর নিজাম আবার বাজীরাও-এর উন্নত রণনৈপুণ্যের কাছে পরাজিত হলেন ১৪ ডিসেম্বর ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। বাজীরাও সসম্মানে নিজামকে মুক্ত করে দিয়ে অভূতপূর্ব কীর্তি স্থাপন করলেন। কি রাজনৈতিক চিন্তাধারায়, কি হৃদয়ের ব্যাপ্তিতে, কি যুদ্ধনৈপুণ্যে বাজীরাও নিজামকে পরাভূত ও অভিভূত করলেন। ৭ জানুয়ারি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল দোরাহাসরাইতে। তদনুযায়ী মোগল সরকার সমগ্র মালব রাজত্ব মারাঠা-অধিকারে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন। নর্মদা ও

যমুনার মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চল মারাঠা-র জয়ের মধ্যে এল এবং ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল মারাঠাদের। এইসব অঞ্চলের অধিকর্তাদের নিজাম পেশোয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা পেশোয়ার কাছে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন। ছত্রপতির-সাম্রাজ্য যমুনা নদী পর্যন্ত বিস্তারিত হল। বাজীরাও-এর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মানলাভ ও কীর্তি এই ভূপালের যুদ্ধ। কোটা রাজ্য জয় করে দশ লক্ষ টাকা নিয়ে বিজয়ী বাজীরাও পুনায় ফিরে এলেন ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। এই সাফল্যের জন্য প্রায় সমানভাবে সম্মানীয় বাজীরাও ভ্রাতা চিমনজী আপ্পা। সুপণ্ডিত ছত্রপতি সাহু মহারাজ এই দুই বীরকে প্রভূত সম্মানে ভূষিত করলেন।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করলেন। দিল্লীর মারাঠা প্রতিনিধি প্রতিদিন বাজীরাও-এর কাছে নাদির শাহ ও দিল্লীর সংবাদ পাঠাতেন। তদনুযায়ী পেশোয়া নাদির শাহের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে মারাঠাসাম্রাজ্য রক্ষার ব্যবস্থা করলেন। সাহু মহারাজের নাদির শাহের শক্তিপরীক্ষার ইচ্ছা কম ছিল না। নাদির শাহকে পরাজিত করতে পারলে বাদশাহ ঔরঙ্গজীবকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করা হবে এবং মোগল বাদশাহ চিরকালের মতো মারাঠা-শক্তির উপর নির্ভরশীল হবেন। বাজীরাও এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বুরহানপুর পৌঁছে খবর পেলেন নাদির শাহ দিল্লী ত্যাগ করে চলে গেছেন। (১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস)। এই বছরেই শেষ মাসে নিজামপুত্র নাসির জং গোদাবরী নদীর পারে মারাঠাসাম্রাজ্য আক্রমণ করতে না করতেই দুই ভাই বাজীরাও ও চিমনজী তাঁকে পরাজিত করলেন (১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ জানুয়ারি)। এইটাই বাজীরাও-এর জীবনে শেষ যুদ্ধ। ওই বছরেই ২৮ এপ্রিল বাজীরাও-এর মৃত্যু হল।

এইবার এই প্রবন্ধে বাজীরাও নাটকের যে সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে সেটা আর একবার পড়লেই বোঝা যাবে যে, মহৎ চরিত্রের এক প্রাতঃস্মরণীয় বীরের জীবনী-নাটক লিখতে গিয়ে ইতিহাস নয়, কল্পনাই নাট্যকারের ভরসা-স্থল। ভারত-জোড়া সেই বিরাট রাজনৈতিক বিপ্লবের কোনো চিহ্নই বাজীরাও নাটকে উপস্থিত নাই। স্বচ্ছন্দে নায়কের নাম বাজীরাও না দিয়ে সীতারাম বা চম্পৎরাও দেওয়া যেত। বাজীরাও-জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা তাঁর

দিল্লীর দ্বারে উপস্থিতি নাটকে নাই। ভূপালের যুদ্ধ এক অদ্ভুত রূপে প্রকাশিত হয়েছে। ইতিহাস-অজ্ঞানতাই এই অপরাধের জন্য দায়ী।

প্রবন্ধ শেষ করার আগে সাহু মহারাজ সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা দরকার। তা না হলে এই প্রবন্ধে জাগরিত প্রশ্নের সমাধান হবে না। বলা হয়েছে যে, বাদশাহ ঔরঙ্গজীব সাহু মহারাজের রাজনৈতিক গুরু। কথাটার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ছত্রপতি শিবজীর পুত্র শম্ভাজীকে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের আদেশে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। তারপর রায়গড় দুর্গ জয় করে শম্ভাজীর স্ত্রী যেসুবাঈ ও পুত্র সাহুকে বন্দী করা হয় মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে (৩ নভেম্বর)। তদবধি সাহু মাতাসহ বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের নানা অঞ্চলে বন্দীজীবন যাপন করেছেন। সাহুর ভাল নাম শিবজী। ঔরঙ্গজীব বাদশাহ ছত্রপতি শিবজীকে বলতেন—"শিবা শয়তান"; ছোট্ট শিবজীপৌত্রকে আদর করে বলতেন—"শিবা সাহু" অর্থাৎ সাধু। সাহু নামটা রয়ে গেল। বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের সাহুর প্রতি স্নেহ দেখলে অবাক হতে হয়। যে লোক নিজের ছেলেমেয়ে বা নাতিকে সামান্য সন্দেহে অবরুদ্ধ বা হত্যা করেছেন, পরম শত্রুর পৌত্রের প্রতি তাঁর এই বাৎসল্য মানব চরিত্রের এক অপূর্ব উদ্ঘাটন। ঔরঙ্গজীব ছোট্ট সাহুর সঙ্গে খেলা করেছেন, তার সঙ্গে নিয়মিত আলোচনায় সময় অতিবাহিত করেছেন। কন্যা জিন্নতউন্নেসার উপর ছিল সাহু ও তাঁর মাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার। জিন্নতউন্নেসা মাতার স্নেহে, ভগ্নীর প্রণয়ে সাহু আর তাঁর মাতার নিত্যকার দেখাশোনা করেছেন। সাহুকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করার বাদশাহী ইচ্ছা জিন্নতউন্নেসার জন্যই ফলবতী হতে পারেনি। হিন্দুবিদ্বেষী সর্বশক্তিমান মোগল বাদশাহের হারেমে সাহু এবং তাঁর মাতা পরিপূর্ণ হিন্দুমতে থেকেছেন, এর থেকে বৈচিত্র্যময় আর কি হতে পারে!

এদিকে শম্ভাজীর মৃত্যুর পর শিবজীর এক পুত্র রাজারাম ছত্রপতি হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বালকপুত্রকে দ্বিতীয় শিবজী নাম দিয়ে মাতা তারাবাঈ রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। স্ত্রীলোকের শাসনে মারাঠা সর্দারগণ অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজীবের আদেশে মহা

ধুমধাম করে সাহুর বিবাহ সংঘটিত হল। সাহুর বয়স তখন ২১ বছর (জন্ম সম্ভবত ১৬৮২)। মৃত্যুর এক বছর আগে ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজীব সাহুকে মুক্তি দিলেন। যাবার সময়ে শুধু এক অনুরোধ করলেন যে, যদি তাঁর বংশধরেরা কখনও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়, সাহু যেন তাঁদের সাধ্যমতো সাহায্য করেন। এই কারণেই নাদির শাহের বিরুদ্ধে সাহু বাজীরাওকে সজ্জিত করে দিল্লী অভিমুখে পাঠিয়েছিলেন।

সাহুকে পেয়ে মারাঠা সর্দারেরা তাঁকেই ছত্রপতির আসন দিলেন। সাহু অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো পেশোয়াপদ সৃষ্টি করে তাকে প্রধান অমাত্যের মর্যাদা দিলেন এবং সেই পদে শ্রেষ্ঠ মারাঠা নেতা বালাজী বিশ্বনাথকে নিয়োগ করলেন। তিনিই হলেন মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রথম পেশোয়া। সাহু খুব ভাল করেই জানতেন যে, সাত বছর থেকে চব্বিশ বছর (১৭০৬) পর্যন্ত মোগলসান্নিধ্যে থেকে তাঁর চালচলন দৃষ্টিভঙ্গিতে মোগল ছাপ পড়েছে। সেজন্য মারাঠা জাতীয়তার পূর্ণাঙ্গ উন্মেষ করতে হলে একজন রক্ষণশীল মারাঠা নায়কের প্রয়োজন। তাঁর হাতে রাজকার্য দিয়ে তিনি উপদেষ্টার ভূমিকা স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছিলেন। একই পরিবারে পর পর তিনজন সুযোগ্য পেশোয়া তাঁর চিন্তাধারার সাফল্যে সাহায্য করেছেন। বালাজী বিশ্বনাথের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র বাজীরাও এবং বাজীরাও-এর আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর অষ্টাদশবর্ষীয় বালকপুত্র বালাজী বাজীরাও পেশোয়াপদের সুযোগ্য অধিকারী হন। তাই বলা হয়েছে, ১৭ বছর ঔরঙ্গজীব সান্নিধ্যে কাটিয়ে সাহু মহারাজ, বাদশাহর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা শিক্ষা করেছেন, কিন্তু অবিশ্বাস প্রভৃতি কুচিন্তাগুলি অনুকরণ করেননি। সাহু সত্যই সাধু।

বাজীরাও নাটক যে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক, তা বলা হয়েছে। প্রথম থেকেই মস্তানীর ঘটনা যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, তাও প্রমাণ করা হয়েছে। গিরধর মালবরাজ ছিলেন না। চন্দ্রসেন যাদব কোনদিনই সাহু বা গিরিধরের অমাত্য ছিলেন না। বরঞ্চ বলা যায়, তিনি নিজামের সাহায্যপুষ্ট একজন মারাঠা নায়ক যাঁকে নিজাম নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতেন। মলহররাও হোলকার হোলপুরের জমিদার নন। বস্তুত হোলপুর বলে কোন রাজ্য ছিল না। রণোজী সিন্ধিয়া চিরকাল বাজীরাও-এর একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসী সহচর; কদাচ

মালবেশ্বর বা গিরধরের বেতনভোগী নন; বরঞ্চ পরবর্তীকালে এই মালব প্রদেশের অংশে সিন্ধিয়ারাজ্য স্থাপনা করেন। নাটকে অবিচার করা হয়েছে চিমনজীর উপর। বাজীরাওয়ের সাফল্যে চিমনজীর দান অতুল এবং দুই বিভিন্নচরিত্র ভাই-এর মধ্যেকার ভালবাসা অনন্যসাধারণ। অবিচার করা হয়েছে বাজীরাও-এর বিশ্বস্ত সহকারী পিলাজী যাদবের উপর। তাঁকে বিশ্বাসঘাতকরূপে দেখান হয়েছে। সম্ভবত বরোদাযুদ্ধের পিলাজী গাইকোয়াড়ের সঙ্গে তাঁকে গোলমাল করা হয়েছে। বরোদাযুদ্ধে গাইকোয়াড ছিলেন বাজীরাও-এর শত্রু। তিনিও বিশ্বাসঘাতক নন। সব থেকে বড় অবিচার করা হয়েছে নিজাম ও সাহু মহারাজের উপর। সেই যুগের এই দুই মহান নেতাকে মনে হয় বুদ্ধিবৃত্তিহীন দুটি জানোয়ার—একের সঙ্গে অন্যের কোনো তফাৎ নাই। মস্তানীর মতো এক অপরূপ নারীচরিত্রকে নাট্যকার ছাঁচে-ঢালা পুতুলের মতো দেখিয়েছেন। অন্যান্য স্ত্রীচরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। শম্ভাজী নামে যে চরিত্র দেখান হয়েছে, তিনি রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র এবং দ্বিতীয় শিবজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। নিজাম তাঁকে মারাঠা ছত্রপতি বলে স্বীকার করে সাহুকে বিপদগ্রস্ত করতে চেষ্টা করেন। এই ঘটনাটিও নাটকে স্পষ্ট করে বলা হয় নাই; তাই সন্দেহ হয় যে, ভারতবব্যাপী এই যে চমৎকার নাটকীয় যুগসন্ধি, নাট্যকার সম্ভবত তা উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ছোট ছোট ত্রুটি উপেক্ষা করেও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ঐতিহাসিক বাজীরাও-এর জীবনের কোনো অংশই নাট্যকার চিত্রিত করতে পারেন নাই। কল্পনা-শ্রয়ী বাজীরাও নাটক ইতিহাসের সীমানার বাইরেই বিচরণ করেছে, ইতি-হাসের বিচারে অপাংক্তেয় হয়েছে—এটাই নাট্যকারের সব থেকে বড় বিফলতা।

সমকালীন রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রকাশেও বাজীরাও নাটক অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। নাটক প্রকাশ ও অভিনয় কাল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের পরেই সন্ত্রাসবাদীগণের ইংরেজ নিধন পরিকল্পনা। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ নভেম্বর বাংলার লাটসাহেব অ্যাণ্ড্রু ফ্রেসারকে হত্যা করার জন্য গুলি ছোঁড়া হয়। অল্পের জন্যে স্যার অ্যাণ্ড্রু রক্ষা পান। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের লোক ও পুলিশকে সাহায্যকারীদের এই সময় নিয়মিত বধ করা শুরু হয়।

১৯০৮ থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদীদের হাতে বহু সরকারী এবং সরকারকে সাহায্যকারী ব্যক্তি হত বা আহত হত। স্বদেশী ডাকাতি ১৯০৮ সাল থেকেই প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু স্বদেশী ডাকাতি সমস্ত বাংলা জুড়ে সংঘটিত হয় এবং লক্ষ লক্ষ টাকা ও গহনা লুঠ করা হয়।[১৩] বাজীরাও নাটক এই স্বদেশী হাওয়াকে প্রতিফলিত করতে পারত। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য বাজীরাও এবং তাঁর সহকারীগণ জীবনপণ যুদ্ধ করেছেন। হত্যা ও লুণ্ঠন দুই বিষয়েই বাজীরাও যে সফলতা অর্জন করেছেন, তা সত্যই উল্লেখনীয়। গেরিলা যুদ্ধ বা ছোট ছোট অশ্বারোহী দলে বিভক্ত হয়ে নানাদিক থেকে সুপরিকল্পিতভাবে হঠাৎ আক্রমণকরাকে বাজীরাও তাঁর যুদ্ধপদ্ধতিতে প্রধান আসন দিয়েছিলেন। তরঙ্গের পর তরঙ্গ যেমন বেলাভূমির উপর আছড়ে পড়ে, তেমনি একের পর এক অশ্বারোহী দল দিয়ে তরঙ্গায়িত আক্রমণ বার বার বাজীরাওকে সাফল্য এনে দিয়েছে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে বাজীরাও নাটক লিখলে তা নাট্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারত। জনসাধারণ এই সময় ইংরেজ শাসকদের কি পরিমাণ ঘৃণার চোখে দেখেছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এক ইংরেজ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে খেলে, তাদের হারিয়ে মোহনবাগান ক্লাবের আই. এফ. এ শীল্ডবিজয়ে। মোহনবাগান ক্লাব তখন সম্পূর্ণ বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হত, তাঁরা খেলতেন খালিপায়ে; শাদা চামড়ার গোরা সৈন্যদল খেলত বুট পরে। মোহনবাগানের এই বিজয় শাসক ইংরেজদের হারিয়ে সাধারণ বাঙ্গালীর জয়যাত্রা ঘোষণা। সেদিন মোহনবাগান ক্লাবের জয় এক জাতীয় জয়ের দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সেইদিন বাজীরাও নাটক শুরু হওয়ায় সেই বিজয়ের গন্ধ বাজীরাও নাটকের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বাজীরাও নাটক যে অন্যতম জাতীয়তাবাদী নাটক হিসাবে চিহ্নিত হল না, রাজরোষে পড়ে বাজেয়াপ্ত হল না, বাজীরাও-রচয়িতার পক্ষে এটাই সব থেকে লজ্জাকর ঘটনা। নাট্যকারের অসাফল্যে বাজীরাও-নাটক বিস্মৃতির অতলতলে সমাহিত।

সূত্রনির্দেশ

১। রমাপতি দত্ত, রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ, পৃ. ৪৬৩-৪৬৪।

২। তদেব।

৩। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাজীরাও।

৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস, 'পরিশিষ্ট'।

৫। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাজীরাও, ৪র্থ সংস্করণ, ২য় অঙ্ক ৫ম গর্ভাঙ্ক, পৃ. ৬৫-৬৬।

৬। G. S. Sardesai, New History of the Marathas, vol. II, pp. 106-108.

৭। তদেব।

৮। তদেব।

৯। তদেব, pp. 178-181.

১০। তারিখ-ই-মুহম্মদশাহী।

১১। W. Irvine, Later Mughals, vol. II, ed. J. N. Sarkar.

১২। এবিষয়ে বিশদ বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।

১৩। R. C. Mazumdar, History of the Freedom Movement vol. II, pp. 264-327.

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ

তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে মাত্র একখানি নাটক আছে। নাটকের নাম 'যুগবিপ্লব', রচয়িতা অমর কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকখানি এখন পাওয়া যায় না। নাট্যকারের নিজস্ব গ্রন্থাগারের কপি পাঠ করার সুযোগ নেওয়া হয়েছে। সেজন্য নাট্যকার কৃতজ্ঞতাভাজন।

'যুগবিপ্লব' পড়ে অনেক প্রশ্ন মনে আসে নাটকে যার উত্তর দেওয়া হয় নাই।

প্রথমেই মনে হয় এই যুদ্ধ কেন হোল তা কোথাও স্পষ্ট ভাবে লিপিবদ্ধ নাই। তবে কি আহমেদশাহ আবদালীর রাজ্যলিপ্সা এই যুদ্ধের কারণ? দিল্লী জয় করে তার বাদশাহ হয়ে ভারতবর্ষকে শাসন করার ইচ্ছাই যদি আফগান বাদশার ছিল তাহলে তিনি বারবার তার স্বদেশে ফিরে যাচ্ছিলেন কেন? মারাঠারা এই সময়কার এক প্রচণ্ড শক্তি। তারা দিল্লীতে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তাই কি বিরোধ? বালাজী-বাজীরাও-এর মনে কি শাহনশাহ বা ভারতের সম্রাট হবার বাসনা ছিল? গোকুলের যুদ্ধে তাঁর যে বীরত্ব নাট্যকার দেখিয়েছেন তারপর পাণিপথে তাঁকে না দেখে আশ্চর্য হতে হয় বৈকি। সব থেকে অবাক হতে হয় পেশোয়া প্রাসাদে মুসলমান শাহজাদীকে দেখে। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপরিবার মুসলমান গৃহে উপস্থিত থাকলে রন্ধনকার্য করেন না। বিশেষ বাজীরাও-মস্তানীর কলঙ্কিত উপাখ্যান এবং তার স্বজন ও পরিবারবর্গের বাজীরাওকে ত্যাগ করার ঘটনার পর বাজীরাও পুত্রের গৃহে মুসলমান মহিলার গল্প কাল্পনিক হওয়াই স্বাভাবিক। তাহলে এই ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাসকে কতখানি মর্য্যাদা দিয়েছে? পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের মতো এক রাজনৈতিক যুগসন্ধিক্ষণকে স্পষ্ট না বুঝলে নাটকের পরিপূর্ণ বিচার করা যাবেনা।

প্রথমে নাট্যকারের মুখেশোনা (২৩ ডিসেম্বর ১৯৭০) নাটক রচনার ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করা যাক। তারাশঙ্করবাবু বলেন যে ১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে একবার কাণপুর যেতে হয়। তিনি গ্রাণ্ট ডাফের (Grant

Duff) মারাঠা ইতিহাসকে তার সঙ্গী করেন। কানপুরেই পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে নাটক লেখার ইচ্ছা তার মনে জাগে এবং তার ফলে যে নাটক রচিত হয় তার নাম 'মারাঠা তর্পন'। কানপুরে ও বাংলায় এই নাটক লেখা হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজগ্রাম লাভপুরে নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। নাট্যকার জানান যে এই নাটকে ইতিহাসের থেকে কল্পনাই প্রধান ছিল। নাটরচনার ধারায় ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রভাবও ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। 'বাজীরাও' চরিত্র নাট্যকারকে মুগ্ধ করে তাই তিনি পিতার চরিত্র পুত্রে আরোপ করেছেন অর্থাৎ বাজীরাও চবিত্র অনুযায়ী বালাজী বাজীরাওকে অঙ্কিত করেছেন। এই নাটকখানি ষ্টার থিয়েটারে পাঠান হয় কিন্তু অপরেশচন্দ্র নাটকটি বাতিল করে দেন। অত্যন্ত মনঃকষ্টে নাট্যকার সেই পাণ্ডুলিপিটি অগ্নিতে অর্পন করেন।

দীর্ঘদিন পরে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরা পত্রিকাতে এই নাটক সম্পর্কে পড়ে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী নাটকটি সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলে নাট্যকার 'মারাঠা তর্পণ'কে নূতন করে লেখার প্রযোজন উপলব্ধি করেন। তখন তিনি আচার্য্য যদুনাথের মোগল সাম্রাজ্য পতনের ইতিহাস পাঠ করেন এবং মারাঠা তর্পণের অন্য একটি পাণ্ডুলিপির সাহায্যে এই 'যুগ বিপ্লব' নাটক রচনা করে অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন। দুঃখের বিষয় এবারও নাটক অভিনয় হবার উপযুক্ত বিবেচিত হলনা। নাটকের ভূমিকায় তারাশঙ্করবাবু তাই লিখেছেন—'নিন্দা প্রত্যাখ্যান ব্যর্থতা—জীবনের সাধনার সোপান।'[১]

'যুগবিপ্লব' নাটকটি পাঠ করলে এই প্রত্যাখ্যানের কারণ বুঝতে দেরী হয়না। নাটক হিসাবে এটি তারাশঙ্করবাবুর সর্বাপেক্ষা দুর্বল নাটক। ইতিহাস ও কল্পনা, তেল ও জলের মতো সর্বদা আলাদা হয়ে আছে। প্রধান চরিত্র-গুলির মধ্যে এই বিভিন্নতা নিদারুণ ভাবে ফুটে উঠেছে। বাজীরাও এর প্রভায় তার পুত্রকে সৃষ্টি করায় অসুবিধা চরম হয়েছে কারণ বালাজী বাজীরাও এর চরিত্র ছিল তার পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং পাণিপথের পরাজয়ের এক বড় কারণ হল এই মারাঠা নায়কের চরিত্র। পেশাদার থিয়েটারের জন্যে লিখিত হওয়ায় আহমেদশাহ আবদালীর চরিত্রে অনেক

থিয়েটারি চঙ আরোপিত হয়েছে ফলে আবদালী এক নরপশুতে রূপান্তরিত। যুদ্ধ অভিজ্ঞ রাজনৈতিক আবদালীকে সমসাময়িক ঘটনা বিবর্তন যে সুযোগ করে দিয়েছে—তার ইতিহাস অনুপস্থিত থাকায় আবদালীর কীর্তিকলাপ কাল্পনিক হয়ে গিয়েছে। সব থেকে বিপদ ঘটেছে প্রেম নিয়ে। তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধে নায়ক নায়িকার প্রেমের সুযোগ নাই। অথচ প্রেমছাড়া ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পেশাদার নাট্যশালায় নাটক অভিনয় কেউ কল্পনা করতে পারতেন না। তাই গন্না বেগম * ও জবাহিরের মধ্যে দিয়ে কল্পনা ব্যাপ্তি লাভ করেছে। সব থেকে সাংঘাতিক হয়েছে পেশোয়াপুত্র বিশ্বাসরাও ও বাদশা-জাদী নসীবনের মধ্যে প্রেমের আভাষ। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বহু চাল-তাল কথা গলাধঃকরণ করলেও বাঙ্গালী থিয়েটার দর্শক হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিবাহের সম্ভাবনা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে সহ্য করতেন না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ক্ষত তখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই। তার ওপর এই নাটকে বক্তৃতা, গলাবাজী প্রভৃতি চটকদার কিছু নাই। সুতরাং পেশাদার নাট্যশালার পক্ষে এ নাটক প্রত্যাখ্যান করাই স্বাভাবিক হয়েছে।

ভূমিকায় নাট্যকার তারাশঙ্করবাবু প্রথমেই লিখেছেন 'যুগবিপ্লব নাটক-খানি তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের ঘটনা অবলম্বনে ঐতিহাসিক নাটক।' এই বিবৃতি বিশেষ প্রাণিধান যোগ্য। সাক্ষাৎকারের সময় তিনি খুব স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছেন যে তিনি এই নাটকের মধ্যে দিয়ে তার নিজের সমসাময়িক কালকে প্রতিফলিত করতে চান নি। তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তৃতীয় পাণিপথের ঘটনা এবং তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করা।[২] তারাশঙ্করবাবুর মতো অভিজ্ঞ সাহিত্যিক ও নাট্যকারকে ঐতিহাসিক নাটক রচনায় বিফল হতে দেখে অবাক হতে হয়। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক যদি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে গিয়ে সফলতা অর্জন না করতে পারেন তাহলে কি ঐতিহাসিক নাটক রচনা সোনার পাথরবাটির মতোই অসম্ভব! অথচ তারাশঙ্কর বাবুর সঙ্গে আলোচনা করে

* বলাবাহুল্য গন্নাবেগম এই মোগলমহিলার ডাক নাম। গন্না মানে ইক্ষু বা আখ।

বোঝা যায় যে তিনি অত্যন্ত সচেতন মন নিয়ে এই ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রয়াস করেন।

যুগবিপ্লব নাটক বিচার করার আগে বারবার ভারত ইতিহাসের এই অধ্যায় তাই দেখতে হয়েছে। বিশেষ আচার্য যদুনাথের মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস ও নানা সরদেশাই রচিত মারাঠা ইতিহাস পড়ে মনে হয়েছে যে সমসাময়িক অর্থাৎ তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের সময়কার সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের সামাজিক পরিবেশ তারাশঙ্করবাবু নাটকে ধরতে পারেন নাই বলেই রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অস্পষ্ট রয়েছে। ইংরেজ শাসন ও শিক্ষার ঘনঘটা তাঁর চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করেছে বলেই ইংরেজ যুগের আগে, মোগলশাসনের দুর্বলতম যুগে যে প্রচণ্ড অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল, দেশব্যাপী যে সাংঘাতিক অনাচার চলেছিল তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নাই। পশুশক্তির দলবদ্ধ বিচরণভূমিতে নৃশংসতার চিহ্ন দেখা যায় বটে কিন্তু সাহিত্যে, বিশেষ নাটকে তাকে ১৯৫১-র যুগে প্রকাশ করা সহজ ছিল না। এই কঠিন ও অসম্ভব কাজে প্রয়াসী হয়েছেন বলেই তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হবে, তাঁর এই কীর্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করতে হবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর সময় থেকে (১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ) সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৮ খ্রীঃ) কাল পর্য্যন্ত কমবেশী অরাজকতা বিরাজ করেছে। এই সময়ের মধ্যেই মারাঠা শক্তির পরিপূর্ণ অভ্যুত্থান ও পতন। তার মধ্যে ১৭৩৯ খ্রীঃ থেকে অর্থাৎ নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময় থেকে ১৭৬৪ খ্রীঃ অর্থাৎ ইংরেজের সঙ্গে মীরকাশিম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদৌল্লার বক্সারের যুদ্ধ পর্য্যন্ত ভারতের নৈরাজ্যের ইতিহাস অবর্ণনীয়। দিল্লীতে বাদশাহ ক্ষমতাচ্যুত কাষ্ঠপুত্তলিকামাত্র। উজির বা প্রধানমন্ত্রী একনায়কের ক্ষমতায় সমাসীন। একজন একনায়কের পতনের পর আর একজনার অভ্যুত্থান। ফারুকসিয়র বাদশাহ হলে সৈয়দদের প্রতিপত্তি, বাদশাহ মহম্মদশাহের সময় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন, তারপর কখন নিজাম-উল-মুলুক আসফ ঝা কিংবা তার বংশধরগণ কখন অযোধ্যার নবাব সফদরজঙ্গ ও তার পুত্র সুজা-উদ-দৌল্লা কখন সুবিখ্যাত নাজিব খান বা অন্য কেউ, প্রধান মন্ত্রীর পদ-অধিকার করে স্বয়ং বাদশাহকে বধ বা বন্দী করে নিজের পছন্দমত

কোন বাদশাহ বংশধরকে সিংহাসনে বসিয়ে শাসনকার্য্য চালিয়েছেন। ক্রমে ক্ষমতাসম্পন্ন ওমরাহ * বা নিজস্ব সৈন্যদল সম্পন্ন প্রধান মন্ত্রীদের দলবেঁধে সরিয়ে দিয়ে দুর্বল ওমরাহ রাজনৈতিক বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এরা বিনা দ্বিধায় প্রয়োজন অনুসারে মারাঠা জাঠ বা আফগানদের সাহায্য নিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বজায় রেখেছেন। অর্থের বিনিময়ে রাজকোষ শূন্য করে অন্যের সৈন্যদল পুষেছেন। প্রয়োজন হলে আফগানিস্থানের বাদশাহকে সাদরে আহ্বান করে এনেছেন। দিল্লীর দরবারের এই বিচিত্ররূপ কল্পনা করা দুষ্কর।

দিল্লীর বাদশাহের শোচনীয় অবস্থা বুঝতে পারা যায় যখন দেখি বাদশাহ ঘর বদল করলেন কিন্তু তাঁর ভাঙ্গা পুরাতন ঘর সারান হল না কিংবা বাদশাহের বেগমরা ক্ষুধায় অধীর হয়ে জেনানার সব মর্য্যাদা ভুলে গিয়ে রন্ধন শালার দরজায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেন কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে বাদশাহর বেগমদের ত্যাগ করে ফেলে সবাই পালিয়ে গেলেন। তাঁরা মারাঠা শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে উপক্রুত হলেন অথবা লাঞ্ছিত হলেন। এমনি শত শত ঘটনা। হিংসা ও ঘৃণার রংবাহারে দিল্লীর বাদশাহী রঙমহলও সেদিন হারমেনেছিল। কতো রকমের বিরোধ, কতো বর্ণের কতো ঢঙের। হত্যা মৃত্যু লুণ্ঠন কামচরিতার্থতা যুক্ত না থাকলে দিল্লীর এই সং নূতন এক হাসির খেলা হত কিন্তু স্বার্থপরতার জিঘাংসায় এর রূপ হল অতি ভয়াল। পুতুলের সঙ্গে পুতুল নাচিয়ের বিরোধের মতোই বাদশাহর সঙ্গে তার প্রধান মন্ত্রীর বিরোধ ষড়যন্ত্রের বিষবাষ্পে ফুলে ফেঁপে বিরাট অজগরের আকার ধারণ করল। ক্রমান্বয়ে চলতে লাগল ইরানীর সঙ্গে তুরানীর বিরোধ, সিয়ার সঙ্গে সুন্নীর, অন্যদিকে মোগল আর তুর্কিতে বিরোধ। ভারতীয় আমীর আফগানি আমীরকে সহ্য করতে পারেন না। তারপর এল হিন্দুরা আর শিখরা। এদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ ধর্মযুদ্ধের রূপ নেয়। হিন্দুরা নিজেদের মধ্যেও ছন্নছাড়া। জাঠ, মারাঠা, রাজপুত আর শিখ সর্বদা পরস্পর বিবদমান। বাদশাহের বা তার প্রধান মন্ত্রীকে একদল যখন সাহায্য করেছে অন্যদল থেকেছে দূরে। হিন্দুপৎ পাদশাহীর চিন্তা অর্থাৎ দিল্লীতে হিন্দু বাদশাহ বসাবার স্বপ্ন প্রথম আসে বাজীরাওএর চোখে। তখনই তিনি ঘোষণা করেন দিল্লীর সিংহাসনে বসার একমাত্র অধিকারী

* আমীর শব্দের বহুবচন ওমরাহ।

মেবারের রানা মহোদয়। একমাত্র তাঁর বংশ কখনও মোগলের কাছে মাথা নীচু করেনি, মোগলের ঘরে এই বংশের কেউ কখনও কন্যা সম্প্রদান করেন নাই। বাজীরাও তাঁর নিজের প্রভু ছত্রপতি সাহুকে বাদ দিয়ে মেবারের রানাকে হিন্দুপৎ বাদশাহ করতে চাওয়ার পেছনে কেবল রাজনৈতিক নয় সামাজিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বাজীরাও দিল্লীর তোরণ পর্য্যন্ত মারাঠা বিজয়বাহিনী নিয়ে গিয়েও দিল্লী প্রবেশের সুযোগ পেলেন না। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তার জীবন প্রদীপের সঙ্গেই হিন্দু পাদশাহীর বাস্তব চিন্তাও সমাহিত হল। তারপর হিন্দু পাদশাহীর কথা বলা হয়েছে বটে কিন্তু তাব মধ্যে প্রাণ ছিল না, কোন রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছিল না। হিন্দু পাদশাহী কেবলমাত্র লোক ঠকান, সৈন্য খেপান বুলিতে পর্য্যবসিত হয়েছিল। বালাজী বাজীরাও-এর সময় মারাঠা সৈন্য দীর্ঘদিন দিল্লীর ভেতর বসবাস করেছে। বিভিন্ন প্রধান মন্ত্রী ও ওমরাহের ষড়যন্ত্রে যোগদান করেছে। উজির ইমাদ-উল-মুলুক মারাঠা সৈন্যদের কাছে উজিরী রক্ষার জন্য সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন বারবার, কিন্তু হিন্দু পাদশাহীর চিন্তা মারাঠা নায়কদের মন থেকে তখন বহু দূরে সরে গেছে। উজিরের নির্দেশে মারাঠা অন্তজীকে ছয় হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করেছেন বাদশাহ। খ্যাতনামা মারাঠানায়ক মলহররাও হোলকারের যুদ্ধবিদ পুত্র খাণ্ডেরাও (বিখ্যাত অহল্যাবাঈ-এর স্বামী) যখন বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তখন বাদশাহ তাকে মনসবদারী দিতে চাইলেন। দুর্বিনীত খাণ্ডেরাও উত্তরে বললেন 'আমাদের ভৃত্যকে (অর্থাৎ অন্তজীকে) আপনি মনসবদারী দিয়েছেন আমাকে তার থেকে অনেক বেশী সম্মান দেখাতে হবে। আমাকে ২২০০০ স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন দিতে হবে। কারণ আমি আপনার ভৃত্য নই, রক্ষক।'[৩] এই হল ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। ওই বছরের ২৬শে ডিসেম্বর বাদশার সঙ্গে খাণ্ডেরাওএর সাক্ষাৎকার হয়। এই সাক্ষাৎকারে খাণ্ডেরাও যে ঔদ্ধত্য ও অভদ্রতা প্রকাশ করেন তাতে বাদশাহের দরবারের অসহায়তা ও ক্ষমতাহীনতাই প্রকাশ পায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় ছত্রপতি শিবজীর প্রতি বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের দুর্ব্যবহারের কাহিনী। শাহানশাহ দ্বিতীয় আলমগীর মারাঠা ছত্রপতির প্রধান কর্মচারী পেশোয়ার অনুগামী হোলকার পুত্রকে দরবার ত্যাগের অনুমতি দিলে খাণ্ডেরাও জবাব

দেন, 'আমার এখন আপনার মহান পদযুগলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে।'[৪] মোগল বাদশাহের আদেশের অবমাননায় দেওয়ান-ই-আম কেঁপে উঠল না। একজন আমীরও বাদশাহের সম্মানে আসি নিস্কাসন করে খাণ্ডেরাওকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করলেন না। বার বার বাদশাহ তাকে বিদায় দিলেও খাণ্ডেরাওকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া অবশেষে সম্ভব হল সুরার লোভ দেখিয়ে। বস্তুত দিল্লী অবস্থানের বাকি সময় খাণ্ডেরাও দিবারাত্র মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে থাকতেন। বাদশাহ ঔরঙ্গজীব আলমগীর শিবজী ছত্রপতির সঙ্গে যে দুর্ব্যবহার করেছিলেন তারই প্রায়শ্চিত্ত করলেন তারই নামধারী এক প্রপৌত্র। ইতিহাসের বিধান অমোঘ।

দিল্লী দরবারের অবস্থা বোঝবার জন্যেই সবিস্তারে খাণ্ডেরাওএর কুকীর্তিকে বিবৃত করা হল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের ক্ষমতা ও শক্তির অবধি ছিল না কিন্তু হিন্দু পাদশাহীর চিন্তা তাদের রাজনীতিকে ভারাক্রান্ত করেনি। খাণ্ডেরাও হোলকারের দিল্লীর বাদশাহকে অপমান করার ঘটনা দেশব্যাপী কুষ্ঠরোগের একটি বুদ্বুদের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। হিন্দু বা মুসলমান কারু চিন্তাই সুস্থপথ ধরে চলেনি। লোভ আর স্বার্থপরতার বেদীমূলে দেশের উন্নতি এবং জাতির ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়েছে। দলবদ্ধ লুণ্ঠন অনাচার অত্যাচারে মারাঠা, আফগান, জাঠ, রোহেলা, মোগল ও পাঠানদের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। বাংলা দেশে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মারাঠা অত্যাচারের বিবরণ পড়লে শিহরিত হতে হয়।[৫] বর্গীর হাঙ্গামা নামে খ্যাত এই মারাঠা অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন ও ভীতির সঞ্চার করে নিয়মিত চৌথের নাম করে অর্থ আদায়। রাজ্য-বিস্তার করে স্থায়ী শাসন ক্ষমতা স্থাপনের কোন চেষ্টাই মারাঠা শক্তি করে নাই। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যা মারাঠা অধিকারে যাওয়া সত্ত্বেও কোন শাসন ব্যবস্থা সেখানে প্রসারিত হতে দেখা যায় না। ইংরেজ বাহিনী তাই যখন উড়িষ্যা দখল করে নিল তখন শান্তিতে জীবনধারনের আশায় সাধারণ নরনারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। বর্গীর দস্যুতার স্মৃতি মারাঠা কীর্তির একমাত্র অবদান হয়ে গেল, হিন্দু পাদশাহী পরিকল্পনার এত বড় ব্যর্থতা আর কোথাও এমন স্পষ্টরূপে চিত্রিত হয় নাই।

সৈন্যবাহিনীর কাছে অর্থ স্বর্ণ স্ত্রীলোক ও মূল্যবান দ্রব্য সম্ভার চিরকালই কাম্য। কিন্তু এই যুগের মতো সৈন্যবাহিনীর পশুত্ব আর কখনও দেখা যায় নাই। দলপতিরা ইচ্ছা করেই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে লোভের প্রশ্রয় দিতেন, লুণ্ঠনের আশ্বাস দিতেন। যুদ্ধ করতে যাবার এটাই ছিল সব থেকে বড় আকর্ষণ। মুসলমানবাহিনী[৬], জাঠবাহিনী[৭] বা মারাঠাবাহিনীর[৮] স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে তা পড়লে লজ্জায় শির নত হয়ে যায়। লুণ্ঠন বা অত্যাচারের সময় কোন জাতিভেদ মানা হত না, শিশু বৃদ্ধ যুবার মধ্যে তফাৎ করা হতনা, ধর্মস্থান বা পূণ্যস্থান স্বীকার করা হতনা, সন্ন্যাসী বা দরবেশকে নিষ্কৃতি দেওয়া হতনা আর স্ত্রীলোক পাওয়ামাত্র তাকে উপভোগ করা হত। হিন্দু বা মুসলমান সৈন্যে কোন প্রভেদ ছিল না। এইসব ঘটনা জানা না থাকায় নাদিরশাহকে অত্যাচারী বলার স্পর্ধা করেন অনেকেই। এই শৃঙ্খলাহীনতার যুগের চিত্র যে নাদিরশাহের তুলনায় কতো কলুষিত, কতো বেশী অশালীন তা স্বীকার করতে পরাঙ্মুখ হওয়া সত্যের অপলাপ মাত্র।

বিশৃঙ্খলার স্পষ্ট ছবি পেতে হলে আচার্য যদুনাথের মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস ভাল করে পড়া দরকার। ক্লীব বাদশাহ হয় ওমরাহের মধ্যে বিরোধ ঘটাচ্ছেন নয় হচ্ছেন তাদের মধ্যে যুদ্ধের নিশ্চল সাক্ষী। তারই মাঝে সুযোগ পেলে এক উজিরের পতন ঘটিয়ে অন্য এক ক্ষমতাবানকে উজিরপদে নিযুক্ত করে নিজের ক্ষমতাবৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। নিজের স্বার্থ ক্রমান্বয়ে জোটের চরিত্র বদল করেছে। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই রূপটা বোঝা যাবে। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উজির ইমাদ-উল-মুলুক অসহায় শিশুর মতো মারাঠাদের স্তন আঁকড়ে পড়েছিলেন, বলেছেন আচার্য যদুনাথ।[৯] ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ছক বদলে গেল। উজির ইমাদের বিরোধিতায় নামলেন অযোধ্যার সুজা-উদ-দৌল্লা, সুরজমলজাঠ ও মারাঠা। কয়েকমাস যেতে না যেতেই উজির ইমাদ মারাঠা সহযোগিতায় নাজিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন।[১০] ১৭৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ ও উজিরের বিরুদ্ধে শাহাজাদা শাহ আলমের যুদ্ধে মারাঠা ও রোহেলা আফগানরা শাহাজাদার পক্ষে।

দিল্লীশ্বর জগদীশ্বরেরই আরেক নাম—মোগলশাসন তা প্রমাণ করেছে। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দেও এই প্রচলিত বুলি আওড়ান হতে বটে কিন্তু দিল্লীশ্বরের

কোন ক্ষমতাই তখন অবশিষ্ট ছিলনা। মোগল সম্রাট আহমদ শাহকে বন্দী করলেন উজির ইমাদ-উল-মুলুক তারপর বাদশাহী পোষ্যদের চিড়িয়াখানা থেকে নিয়ে এসে বাদশাহ করলেন নূতন এক বাদশাহী পৌত্রকে। নূতন বাদশাহ নাম নিলেন দ্বিতীয় আলমগীর। কৌতুকের আর কিছু বাকী থাকলনা। তখন বাংলা ও বিহারে নবাব আলিবর্দির একচ্ছত্র প্রভুত্ব। সুজা-উদ-দৌল্লার অধীন এলাহাবাদ ও অযোধ্যা। দক্ষিণে নিজামের রাজত্ব দিল্লীর অধিকার স্বীকার করেনা। মারাঠা প্রভুত্ব নিজামের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে ব্যাপ্ত। সেখানে মোগলের কোন অধিকার নাই। উত্তরে যমুনা পর্য্যন্ত মারাঠা অধিকারে। গুজরাট ও মালবে মারাঠা-নায়কগণ স্থিতিবান। বস্তুত এই মারাঠানায়কগণই স্বাধীন রাজত্বের যে সূচনা সেদিন করেণ তা দীর্ঘদিন স্থিতিশীল ছিল। মলহররাও হোলকার রণোজী সিন্ধিয়া, পিলাজী গাইকোয়াড, টুকোজী পাবার প্রভৃতির বংশধররাই পরে হয়েছিলেন রাজন্যবর্গ নামে খ্যাত। মারাঠা প্রভাব ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণশিখর ছুঁয়েছে। পূর্বে উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যন্ত অর্থাৎ বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর পর্য্যন্ত মারাঠা প্রভুত্বের প্রসার, উত্তরে যমুনা আর দক্ষিণে ভারতমহাসাগর বা কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত তাদের ব্যাপ্তি। সেখানেই শেষ নয়। রাজপুত রাজারা দিল্লীর প্রভাব থেকে সরে দাঁড়ালেন। এখন মারাঠাশক্তি তাদের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। দস্যুতা ও ব্যক্তিগত ক্ষমতাযুদ্ধে বিভিন্ন মারাঠা নায়কগণ যুক্ত হয়ে না পড়লে রাজপুতানায় তাদের প্রভাব বৃদ্ধি হত। দীর্ঘ যোগসূত্রের ফলে কোন কোন রাজপুত রাজা যেমন জয়পুর, দিল্লীর নির্দেশ মানলেও নিজেদের স্বার্থের সংঘর্ষে তারা হতেন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী। সমস্ত দেশজুড়ে মারাঠারা চৌথ আদায়ের নামে অর্থ সংগ্রহ ও লুণ্ঠন করে বেড়াত। তাদের সামান্যতম বিরাগভাজন হলে গ্রাম নগর পুড়ে শেষ হয়ে যেত। তারা নবাব আলিবর্দি কিংবা জয়পুরের মহারাজা কাউকেই চৌথ থেকে রেহাই দিত না এবং নির্মম নিয়মানুবর্ত্তিতায় সেই অর্থ আদায় করত। কেবল অন্যে কেন স্বয়ং দিল্লীর বাদশাহকে চৌথ দিতে বাধ্য করল মারাঠারা। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া ভ্রাতা রঘুনাথরাও বিনাবাধায় দিল্লী প্রবেশ করে সাড়ে বিরাশী লক্ষ টাকা চৌথ দাবী করলেন।[১১] অবশেষে ৪০লক্ষ টাকায় রফা হল। উজির নিজে ক্ষমতাসীন থাকার জন্য ২৫লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে

প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু মারাঠাদের প্রচণ্ড লোভ তাকে বাঁচিয়ে দিল। মাত্র ৯লক্ষ টাকা মারাঠানেতা মলহররাও হোলকারকে দেওয়া হল আর ১৭২ লক্ষ টাকার হাতচিটা মহাজনদের সহিযুক্ত করে দেওয়া হল। দিল্লীর রাজ-সভার মারাঠা প্রতিনিধি ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পুনায় পেশোয়াকে চিঠিতে জানালেন—'বাদশাহের কোষাগার শূণ্য। উজিবের কাছে একটা পয়সা নাই। প্রতিদিন ছুরিতে শাণ দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ধনরত্ন বা অলঙ্কাবের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। নিরুপায় উজিব দিল্লীর চারপাশের বাদশাহী জমি দেবার প্রস্তাব করেছেন।' দিল্লীর জমি অবশ্য পাওয়া যায় নাই বাদশাহ শেষ পর্য্যন্ত ২৫শে অক্টোবর ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বেরিলি, বৈরাট, সম্ভর, কোরা প্রভৃতি মহালের ৪২২ লক্ষ টাকার রাজস্ব দিযে দিলেন। কিন্তু এটাকাও যখন সম্পূর্ণ আদায় হলনা তখন গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চল মারাঠাদের ছেড়ে দেওয়া হল। অবশেষে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মারাঠারা দিল্লীর ভেতর ও চতুর্পাশ থেকে সরে গেল। উজির ইমাদ-উল-মুলুক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।[১২]

সবিস্তারে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ইতিহাস লেখার অর্থ তৎকালীন ভারতবর্ষের অবস্থা বোঝা এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্ত্তি ঘটনার বিচার করা। নাটকের মাধ্যমে, বিশেষ একটি নাটকে দেশের এই যুগবিপ্লবকে প্রকাশ করা অসম্ভব। অথচ ১৭৫৪ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তিনবছর পর ১৭৫৭ তে আহমেদ-শাহ আবদালীর দিল্লী অধিকার বোঝা সহজ নয়। দিল্লী অধিকার করাটা যে কিছুই ছিলনা এটা বুঝলে দিল্লী অধিকারকে কেউ উচ্চ সম্মানে ভূষিত করবেন না। নিরুপায় অবলা স্ত্রীলোকের মতো বিজয়ীর কাছে দিল্লী বারবার আত্মসমর্পণ করেছে। বিজয়ী সৈন্যরা যথেচ্ছ লুটপাট করেছে অত্যাচার করেছে। জাতি বয়স ধর্ম বা জীবিকা লুঠেরাদের নিবৃত্ত করতে পারেনি। স্থান কাল পত্র বিবেচনা না করেই তারা অত্যাচার করেছে। ১৭৫৪ তে মারাঠা অত্যাচারের কথা যেমন সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে তেমনি সবিস্তারে ১৭৫৭র আফগানী অত্যাচার লিপিবদ্ধ হয়েছে।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীমাস তিনবছর একমাস। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ পাণিপথের যুদ্ধের বছর। তারাশঙ্করবাবুর নাটক এই একমাস ও

তিনবছরের ঘটনাবলি অনুসরণ করে রচিত হয়েছে। সুতরাং এই চারবছরে আহমদশাহ আবদালী ও মারাঠারা কে কোথায় ছিলেন বোঝা দরকার। সময়ানুগ তালিকা করে এই বিচিত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বরূপ বোঝাবার চেষ্টা করা হবে।

খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫৬ অক্টোবর—আবদালী কাবুল থেকে ও রঘুনাথরাও পুনা থেকে যাত্রা করলেন। উভয়ের গন্তব্য দিল্লী।

২০শে ডিসেম্বর—আবদালী লাহোর অধিকার করলেন। জম্মু তাঁর অধিকার স্বীকার করল। পাঞ্জাব আবদালীর অধিকারভুক্ত।

খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫৭ ১০ই জানুয়ারী—আবদালীর সারহিন্দ জয়।

১২ই জানুয়ারী—পাণিপথে ঘাঁটি স্থাপন ও দোয়াব দখল।

২৮শে জানুয়ারী—আবদালীর দিল্লী প্রবেশ।

হোলির সময়—আফগানহত্যার প্রতিশোধে বহু দিল্লীবাসী হত্যা। (২৮শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৬ই মার্চ)

১লা ফেব্রুয়ারী—আবদালীর সঙ্গে অন্তজী মানকেশ্বরের যুদ্ধে দিল্লী বাদশাহের মনসবদার অন্তজী প্রচণ্ডভাবে পরাজিত হয়ে মথুরায় পালালেন। (J, p. 110-114)

২৬-২৭ ফেব্রুয়ারী—আবদালীর সঙ্গে ভরতপুরের সুরজমল জাঠের যুদ্ধ ও পরাজয়। (p. 114-18)

১লা মার্চ—মথুরা অধিকার ও লুণ্ঠন। যমুনা রক্তে লাল। (p, 118-20)

১৫ই মার্চ—আবদালীর গোকুল অধিকারের যুদ্ধ ও নাগা সন্ন্যাসীদের বিক্রম। (p. 120-22)

২১শে মার্চ—আবদালীর প্রধান সেনাপতি জাহানখাঁর আগ্রা দখল ও লুণ্ঠন। (p. 122-23)

৩০শে মার্চ—আবদালীর ফরিদাবাদে উপনীত। (p, 126-27)

৩রা এপ্রিল—ইমাদ-উল-মুলুক আবদালীর আদেশে বাদশাহ-

কর্তৃক আবার উজির নিযুক্ত। নাজিব খান আফগানের ক্ষমতা হ্রাস। (p. 130)

খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫৭ এপ্রিল—আবদালীর সদলবলে ভারতত্যাগ সঙ্গে হজরত বেগম বধূ ও মহম্মদশাহের বিধবাগণ। (p. 129-30)

মে—রঘুনাথরাও আগ্রায় উপস্থিত। নাজিবখানের বশ্যতা স্বীকার। (M. P p. 392)

অগাষ্ট—রঘুনাথরাও-এর দিল্লীতে উপস্থিতি। সঙ্গে মলহর-রাও হোলকার। দিল্লীতে নাজিবখান পরাজিত।

সেপ্টেম্বর—দোয়াব আবার মারাঠা অধিকারে। নাজিব-খানের দিল্লী ত্যাগ।

অক্টোবর—রঘুনাথরাও-এর পাঞ্জাব অভিমুখে অভিযান (দশেরা)

খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫৮ জানুয়ারী—কুঞ্জপুরা দখল।

মার্চ—সারহিন্দ দখল। লাহোর দখল। আবদালী পুত্র তৈমুরশাহ ও প্রধান সেনাপতি জাহানখাঁ মারাঠা-কর্তৃক লাহোর থেকে বিতাড়িত।

১১ই এপ্রিল—রঘুনাথরাও-এর লাহোরে অবস্থিতি।

মে—রঘুনাথরাও লাহোর থেকে পুনঃ যাত্রা করলেন।[১৩]

উপরের ঘটনাক্রম থেকে যুদ্ধরীতি স্পষ্টরূপ নিচ্ছে। দিল্লীর বাদশাহ ক্ষমতাহীন তাই অর্থ বা রাজস্বের বিনিময়ে মারাঠা সাহায্য প্রয়োজন হয়। মারাঠারা আবদালীর প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করেন। কারণ আবদালী বা তার সৈন্যগণ ভারতীয় গ্রীষ্ম সহ্য করতে পারতেন না। গ্রীষ্মকাল এলেই তারা স্বদেশে ফিতে যেতেন। তখন মারাঠারা এসে আফগান সৈন্য ও শাসক সরিয়ে নিজেদের বা দিল্লীর বাদশাহের শাসন কায়েম করতেন। ঘটনা তরঙ্গ অনুসরণ করা যাক।

খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫৮ জুলাই—টুকোজী হোলকার ও সবাজী সিন্ধিয়া সমগ্র পাঞ্জাব অধিকার করে আটক দুর্গে মারাঠা পতাকা উড্ডীন করলেন।

আগষ্ট—রঘুনাথ রাও, দত্তাজী সিন্ধিয়া (রণোজীর দ্বিতীয় পুত্র) ও জানকোজী সিন্ধিয়া (রণোজীর পৌত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র জয়াপ্পার পুত্র)-র ওপর পাঞ্জাব রক্ষার ভার দেন।

—বার্ষিক তের লক্ষ টাকার বিনিময়ে মারাঠারা দিল্লীতে বাদশাহকে রক্ষার জন্য ৫০০০ অশ্বারোহী রাখতে রাজী হল।[১৪]

একবছর মারাঠারা রাজপুতানায় অর্থ সংগ্রহে সময় কাটাল। স্বয়ং পেশোয়া তার ভাই রঘুনাথ রাওকে লিখে পাঠালেন প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে। এমন কি উদয়পুরের মহারাণাও বাদ পড়লেন না। পেশোয়া লিখিত আদেশ পাঠালেন, 'মহারাণা যদি সহজে অর্থ না দেন তাহলে তার সম্মানের খাতিরেও যেন আদায়ের চাপ কমান না হয়।'[১৫] পেশোয়া বাজীরাও-এর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির সমাধি এই ভাবেই ঘটল তার পুত্র বালাজী বাজীরাও-এর হাতে। জয়-পুরের রাজার কাছ থেকে ১৭৫৮র জন্য ১২ লক্ষ ও ১৭৫৯-এর জন্য ৯ লক্ষ টাকা আদায় করা হল। অন্যান্য রাজপুত রাজারা ক্রমান্বয়ে অর্থ দিয়ে মারাঠা রক্ষা কবচ কিনতে কিনতে বিরক্ত হয়ে পড়লেন। এই সব কারণেই মারাঠা-দের বিপদের সময় একখানা রাজপুত অসিও উত্তোলিত হল না। যেমন বাংলায় বর্গীরা তেমনি রাজপুতানায় মারাঠারা দস্যুর নামান্তর হয়েছিল। তাদের পতনের সম্ভাবনায় সাধারণ বাঙ্গালী হিন্দুর মতো, হিন্দু রাজপুতেরা আনন্দিত হয়েছিল।

১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে শীতকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে আহমেদশাহ আবদালী আবার ভারত অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। পাঞ্জাবের উর্বরভূমির শস্যশ্যামলতা তাঁর মনে ভারতের এই প্রদেশটিকে নিজের অধিকারে রাখার ইচ্ছা জাগিয়ে ছিল।

খ্রীষ্টাব্দ ১৭৫৯ অক্টোবর—আবদালী লাহোর জয় করে নিলেন।

নভেম্বর—সবাজী সিন্ধিয়া সোকরাতালে দত্তাজী সিন্ধিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলেন।

৩০শে নভেম্বর—উজির ইমাদ বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরকে হত্যা করে আর এক বাদশাহ পৌত্রকে শাহজাহান সানী নামে বাদশাহ ঘোষণা করলেন। পিতার হত্যা

সংবাদ পেয়ে বাদশাজাদা আলি গোহর (পরে দ্বিতীয় শাহ আলম) বিহারে নিজেকে বাদশা ঘোষণা করলেন।

২৪শে ডিসেম্বর—থানেশ্বরে আবদালীর সঙ্গে দত্তাজীর প্রচণ্ড যুদ্ধ।

৩১শে ডিসেম্বর—বরারীঘাটে আবদালীর সঙ্গে দত্তাজীর যুদ্ধ সুরু।

খ্রীষ্টাব্দ ১৭৬০ ১০ই জানুয়ারী—বরারীঘাটের যুদ্ধে দত্তাজীর মৃত্যু। জানকোজী আহত। আবদালীর দিল্লী অধিকার। নাজিব খাঁ আবদালীর পক্ষে।

৫ই ফেব্রুয়ারী—মলহররাও হোলকার সিন্ধিয়া বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত।

ফেব্রুয়ারী-মার্চ—মারাঠা ও আবদালীর মধ্যে ক্রমান্বয়ে লড়াই।

মার্চ—দত্তাজীর মৃত্যু সংবাদ পেশোয়া পেলেন ও মারাঠা প্রধান সেনাপতি এবং তার খুড়তুতো ভাই (বিখ্যাত চিমনজী আপ্পার জ্যেষ্ঠপুত্র) সুবিখ্যাত যোদ্ধা সদাশিবরাও ভাউকে আবদালীর সঙ্গে মোকাবেলা করতে পাঠালেন। সঙ্গে কামান বিশেষজ্ঞ ইব্রাহিম খাঁ ও অনেকগুলির ভারি কামান। পতদুর থেকে ওই মাসেই ভাউসাহেব যাত্রা করলেন।

এপ্রিল মাসে নর্মদা পার হয়ে মে মাসে গোয়ালিয়রে উপস্থিত হলেন।

জুন—আগ্রার নিকটে উত্তরের মারাঠা সর্দাররা ভাউসাহেবের সঙ্গে মিলিত হলেন। সুরজমল জাঠও এলেন। আবদালী আলিগরে সৈন্য সন্নিবেশ করলেন।

জুলাই—ভাউসাহেব সদলবলে মথুরায় উপনীত হলেন। সুজাউদৌল্লা আবদালীর পক্ষে যোগ দিলেন।

২রা আগষ্ট—মারাঠারা আবদালীর হাত থেকে দিল্লী কেড়ে নিল। আবদালী যমুনার অপরপারে দিল্লীর সামনাসামনি ছাউনি ফেললেন।

খ্রীষ্টাব্দ ১৭৬০ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর—মারাঠারা প্রচণ্ড রসদ ও খাদ্যের অভাব ভোগ করল। দিল্লীতে হল দুর্ভিক্ষ। আবদালীর সঙ্গে সন্ধির আলোচনা সুরু হল।

৭ই অক্টোবর—ভাউসাহেব সসৈন্যে দিল্লী ত্যাগ করে কুঞ্জপুরায় চলে গেলেন।

১০ই অক্টোবর—শাহ আলমকে দিল্লীর বাদশাহ ঘোষণা করা হল।

১৭ই অক্টোবর—মারাঠাদের কুঞ্জপুরা অধিকার। দত্তাজীর হত্যাকারী কুতুবশাহকে বধ।

২৫শে অক্টোবর—আবদালীর পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা।

২৮শে অক্টোবর—সোনেপথে আবদালী।

৩০শে অক্টোবর—ভাউসাহেব পাণিপথে এলেন।

৪ঠা নভেম্বর—পাণিপথে আবদালী ও ভাউসাহেব মুখোমুখী।

১৯শে নভেম্বর—যুদ্ধ সুরু।

১৭ই ডিসেম্বর—গোবিন্দপন্থ বুন্দেলার আফগান হস্তে মৃত্যু। ইনি ছিলেন পাণিপথের মারাঠা সৈন্যদের রসদ ও খাদ্য সরবরাহক।

৩১শে ডিসেম্বর—পেশোয়ার উত্তর ভারতের দিকে বিরাট বাহিনী নিয়ে যাত্রা সুরু।

খ্রীষ্টাব্দ ১৭৬১ ১২ জানুয়ারী—মারাঠাদের শেষ আক্রমণ পরিকল্পনা।

১৪ই জানুয়ারী—শেষ প্রচণ্ড যুদ্ধ ও হত্যা। পাণিপথে মারাঠা পরাজয়। মৃত সদাশিবরাও ভাউ, পেশোয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বাসরাও, জানকোজী সিন্ধিয়া, সামসের বাহাদুর এবং আরো অনেক অনেক বীর।[১৬]

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষে অর্থাৎ নাটক সুরু হবার সময় দেখা যাচ্ছে একমাত্র দিল্লী ও তার চতুষ্পার্শ্ব মাত্র মোগল বাদশার অধিকারে। বাদশাহ স্বয়ং উজির ইমাদ-উল-মুলুকের হাতে ক্রীড়নক। ইমাদ মারাঠাদের পছন্দ করেন না বটে কিন্তু বিপদে পড়লেই সাহায্যের আবেদন করেন এবং কেবল অর্থলোভে

মারাঠাগণ মোগল প্রদেশ রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তার জন্য মূল্য আদায় করেন, চৌথ আদায় করেন, সাধারণ নাগরিকগণ অবাধে লুন্ঠিত হন। ১৭৫৬ র অক্টোবরে আহমেদশাহ আবদালী চতুর্থবার ভারতে আসেন এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে ভারত ত্যাগ করেন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে পঞ্চম ভারত অভিযানে আবদালী আবার পাঞ্জাবে উপনীত হন এবং ১৭৬১ র জানুয়ারী মাসে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের পর ২৭শে মার্চ আম্বালা হয়ে দেশে ফিরে যান। সুতরাং যুগবিপ্লব নাটকের প্রতিপাদ্য হওয়া উচিত ছিল আবদালীর দুটি অভিযান এবং তার মধ্যবর্তী ও পরবর্তী অবস্থা। নাটকের প্রথম ও প্রধান দুর্বলতা যে এই রাজনৈতিক যুগসন্ধিক্ষণের অনিশ্চয়তা প্রকাশিত হয় নাই, মারাঠাদের সঙ্গে বাদশাহ ও তার উজিরের সম্পর্ক এবং মারাঠাদের রাজনৈতিক প্রয়োজন কোথাও স্পষ্ট বোঝা যায় না, এমনকি আহমেদশা আবদালীর দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা অভিযান একসঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় সেটিকে একটি সফল দিগ্বিজয় বলেই ভ্রম হয়। মনে হয় ভারতজয়ই বুঝি আবদালীর উদ্দেশ্য এবং সেই অভিযান যেন সার্থক হয়েছে। মোগল পরাজয়ে যেন মারাঠারা স্বেচ্ছায় ভারতরক্ষার ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নিল ও মহানুভবতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ মৃত্যু বরণ করল। সত্য যে এই চিন্তার বিপরীত রূপেই প্রকাশিত তা আমরা আগে আলোচনা করেছি। পাণিপথের এই যুদ্ধকে হিন্দুশক্তির পতন হিসাবে দেখান হয়েছে এবং হিন্দুপৎ পাদশাহীর নানা মুখরোচক সংলাপ শোনান হয়েছে। বালাজী বাজীরাও যে সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে হিন্দু পাদশাহী সহজেই স্থাপিত হতে পারত কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে সে চিন্তাকে পেশোয়া কখনই মনে বিশেষ ঠাঁই দেন নাই। পাণিপথে মারাঠা শক্তির পতন হল একথা মনে করাও ইতিহাস বিরোধী কারণ আবদালী পাণিপথে জয়ী হয়েও নিজেই সন্ধির প্রত্যাশী হন এবং পেশোয়াকে তার পুত্র ও ভ্রাতার মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়ে এবং ক্ষমা চেয়ে যে চমৎকার চিঠি দেন তা সত্যই তার মহানুভবতার পরিচায়ক। ভুলে গেলে চলবে না যে আবদালীকে এশিয়ার নেপোলিয়ন বলা হয়। কয়েক বছর পর মহাদাজী সিন্ধিয়া, (জয়াপ্পাও দত্তাজীর কনিষ্ঠ ভাই) দিল্লী অধিকার করে প্রমাণ করেন যে মারাঠা শক্তি তখনও ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

বালাজী বাজীরাও নিজে যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন শাসক ছিলেন তেমনি

পেয়েছিলেন তার চার পাশে বহু নির্ভীক ও বুদ্ধিমান নেতা। কিন্তু এই সুযোগের ফল ঘটল বিপরীত। বাইরে প্রচণ্ড শক্তি থাকলেও নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ মারাঠা শাসনের মেরুদণ্ডকে হীন করেছে। ভারতের একছত্র অধিপতি হওয়া যাদের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক ছিল তারা হয়ে উঠলেন ভারতের এক নশ্বর লুণ্ঠনকারী, ভারতের শ্রেষ্ঠ দস্যু এবং অর্থের বিনিময়ে শত্রু নাস করার সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এক ভীষণ যন্ত্র। এই অবস্থা থেকে মারাঠা জাতিকে উদ্ধার করার ক্ষমতা একমাত্র বালাজী বাজীরাও-এর ছিল। কিন্তু ছত্রপতি সাহুর মৃত্যুর পর নূতন ছত্রপতি রাজারামকে কেন্দ্র করে যে গৃহবিবাদ মারাঠা শক্তির হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করল তাকে রক্ষা করতেই বালাজী নিজের সব শক্তি নিয়োগ করলেন। তাতে রাজারাম ও তাঁর পিতামহী তারাবাঈ-এর বিবাদ নিষ্পত্তি হল বটে কিন্তু হিন্দু পাদশাহী বা মারাঠা কর্তৃত্বের সব স্বপ্ন ভেসে গেল। বস্তুত বালাজী উত্তর ভারতে নিজে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তি কোন সময় আসতে পারলে সমগ্র উত্তর ভারতের রাজনীতির ধারা পালটে যেত। তাই বা কেন, হয়ত ভারত ইতিহাসের গতিপথ বালাজী বাজীরাওএর স্পর্শ পেলে ভিন্ন প্রবাহে বাহিত হত। বালাজী না আসতেই যে প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে তাতেই বাদশাহ আহমদশাহ ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তার সভাসদ মারাঠা প্রতিনিধি বাপুরাও হিঙ্গানেকে বার বার জানিয়েছেন যে তিনি বালাজীর লোক এবং বালাজীর কথামত চলতে প্রস্তুত।[১৭] বলাবাহুল্য যে বালাজীরাও দিল্লী আসতে পারলে বাদশাহর ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন। সম্ভবত বাদশাহকে চালনা করতেও পারতেন। পাণিপথের যুদ্ধ শেষ হবার আগে বালাজীরাও যমুনা পার হয়ে হিন্দুস্থানে পদার্পণ করলেন না এটাই নিয়তির পরিহাস। বালাজী যমুনার উত্তর পারে এলেন পাণিপথের যুদ্ধে ভবিষ্যতের সব আশা সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাবার পর। প্রিয়তম পুত্র ও স্বজন হারিয়ে তাঁর মনের এমন অবস্থা যে কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা তার পক্ষে একান্ত কঠিন। বালাজীরাও-এর পর সদাশিবরাও ভাউ ছিলেন শ্রেষ্ঠ মারাঠা নায়ক। ইনি বাজীরাও এর বিখ্যাত ভ্রাতা চিমনজীর জ্যেষ্ঠপুত্র অর্থাৎ বালাজীর খুল্লতাত পুত্র। বালাজী যেমন খুল্লতাতের স্থিরবুদ্ধির সঙ্গে পিতার তীক্ষ্ণ রাজনীতি জ্ঞানের অধিকারী হয়েও যুদ্ধপ্রাজ্ঞতা বা যুদ্ধবিদ্যায় কুশলী ছিলেন না তেমনি এই অভাব পূরণ করে দেবার জন্যে ছিলেন সদাশিব-

রাও। তিনি ছিলেন খুল্লতাত বাজীরাও-এর যুদ্ধপ্রাজ্ঞতার উত্তরাধিকারী। সম্ভবত এই কারণেই বালাজী সদাশিবরাওকে ভয় করতেন এবং এই গোপন অবিশ্বাস মারাঠাশক্তির ধ্বংসের কারণ হল। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তিকালে এমনকি সদাশিবরাও উত্তরভারতে থাকলেও মারাঠাশাসন ও প্রভাব সুশৃঙ্খল হত। কিন্তু সদাশিবরাও যখন উত্তর ভারতের ভার পেলেন তখন তার সামনে পাণিপথের যুদ্ধ অন্য কোনদিকে দৃকপাতের অবকাশ নাই। পাণি-পথের যুদ্ধের জন্য সদাশিবরাও-এর সঙ্গে নিজের প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্রকে পাঠান সত্ত্বেও পাণিপথের নিয়মিত খবর সংগ্রহ ও রসদ ও অর্থ সরবরাহে অবহেলা বালাজীর জীবনের চরম কলঙ্করূপে বিরাজ করবে। ১৭৫২ তে বালাজী উত্তর ভারতের ভার দিয়েছিলেন নিজ ভ্রাতা রঘুনাথরাও-এর উপর। উত্তর ভারতের রাজনীতি রঘুনাথরাও-এর পূর্ণ অসাফল্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছে। ১৭৫৭ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে ইন্দোরে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও রঘুনাথরাও আবদালীর দিল্লী অধিকারে কোন বাধা দেবার চেষ্টা করেন নাই।[১৮] ক্ষমতা না থাকার অজুহাত অচল কারণ রাজপুতানায় তখন ভিটল শিবদেব, মলহররাও হোলকার, নারোশঙ্কর এবং সামসের বাহাদুরের মতো বিখ্যাত মারাঠা দলপতিরা অবস্থান করছেন।[১৯] মার্চ মাসে যখন মথুরা ও গোকুলের ওপর আবদালী সৈন্যদের ঝড় বয়ে গেল, লুণ্ঠন হত্যা অনাচারের বান ডেকে গেল একটি মারাঠা আঙ্গুল প্রতিবাদে উত্তোলিত হয়নি। রঘুনাথরাওকে এই কাপুরুষতার জন্যেও দায়ী করা যেতে পারে। আচার্য যদুনাথ সক্ষোভে লিখেছেন হিন্দুধর্মী ও হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা ক্ষমতাশালী মারাঠাশক্তি হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মস্থান মথুরা ও গোকুল রক্ষার জন্য একবিন্দু রক্তও বিসর্জন করেনি। আসমুদ্রহিমাচল হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের চিন্তা যে জাতির কল্পনায় ছিল তারা মথুরা রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করলেন না এটা শুনতে যেমন বিকট লাগে তার থেকে শতগুণে কলঙ্কিত কীর্তিতে। বৈষ্ণবদের এই প্রিয় ধর্মস্থানগুলিকে অক্লেশে আফগানরা ধ্বংস করল, পরাক্রান্ত মারাঠারা রাজপুতানায় দাঁড়িয়ে দেখলেন। একজন মারাঠারও রক্তপাত হল না। আবদালীর সৈন্যরা গোকুলে অকথ্য অত্যাচার করে বহু সাধু-বিনাশ করলেন।[২০] রঘুনাথরাও তখন চিঠি লিখছেন। একবার লিখছেন, শীঘ্র দত্তাজী সিন্ধিয়াকে পাঠাও আমাদের শক্তি আবদালীর সম্মুখস্থ হবার

পক্ষে যথেষ্ট নয়। আবার লিখছেন-এবার দেওয়ান সখারামবাপুর মাধ্যমে এই ফাল্গুন মাসে আমার আর মল্লহরের সৈন্যদল মিলিত হবে। আবদালী খুব পরাক্রান্ত শত্রু।[২১]

নাটকের মধ্যে নানারকমের ভুল ঠাঁই পেয়েছে। রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে ভুল হয়েছে, ভুল হয়েছে ঘটনা সন্নিবেশে। বালাজীরাওকে ১৭৫৭ খ্রীঃ দিল্লীর উপকণ্ঠে দেখান হয়েছে, আবদালীর আক্রমণের সময় মথুরায় দেখান হয়েছে। নাট্যকার বালাজী বাজীরাও-এর প্রচণ্ড সম্মান অনুধাবন করতে পারেননি। ওই ভাবে একা একা নিঃসঙ্গ পথিকের মতো বালাজীরাও এমনকি পাণিপথের পরাজয়ের পরেও যে ঘুরে বেড়াতে পারেন না এটা নাট্যকার ভাবতে পারেননি। বালাজী ছিলেন স্বয়ং দিল্লীশ্বরের রক্ষাকর্তা—তার নামমুখে দিল্লীর বাদশাহ নিজেকে রক্ষা করতেন সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে তার প্রচণ্ড সম্মান সহজেই অনুমেয়। সমসাময়িক একটা উদাহরণ যথেষ্ট হবে। বালাজী বাজীরাও-এর অধীনস্থ একদলপতি নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলে। তাঁর অধীনস্থ সেনাপতি ভাস্কররাম, যার সঙ্গে সুবে বাংলার শাসনকর্তা নবাব আলিবর্দি মিলিত হয়েছিলেন। মানকড়ের সেই আলোচনা সভায় ভাস্কররামের সঙ্গে আলোচনার জন্য সপরিষদ নবাব আলিবর্দিকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল।

যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে তেমনি ধর্মের ক্ষেত্রেও যুগবিপ্লব নাটক সম্পূর্ণ ভুল ভিত্তির-উপর প্রতিষ্ঠিত। নাট্যকার ধর্মের দ্বন্দ্ব দেখাবার জন্যে দুইটি সমান্তরাল চরিত্রের অবতারনা করেছেন একজন মুসলমান ফকির সাহফানা এবং অন্যজন নরিন্দরগিরি গোস্বামী। বলাবাহুল্য উভয়েই ইতিহাসের চরিত্র কিন্তু যে ভাবে তাদের ব্যবহার করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। ফকির শাহফানা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে এই মুসলমান ফকিরকে আবদালী অত্যন্ত সম্মান করতেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন আবদালী পাঞ্জাব জয় করে দিল্লী অভিমুখে ধাবিত তখন শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে দিল্লীর বাদশাহ পাঠালেন ইয়াকুব আলিখানকে (ইনি আবদালীর উজির শাওয়ালীখানের সম্পর্কে ভাই এবং রাতারাতি তাকে ছয়হাজারী মনসবদার করে দেওয়া হল সন্ধি প্রস্তাবের বাহক হবার জন্য) সঙ্গে গেলেন ফকির শাহফানা। ধর্ম কখনই

বৃহৎ রাজনীতির অসম্পর্শ করতে পারে না বরঞ্চ রাজনীতির সাহায্যে ধর্মকে চিরকাল গণিকার মতো ব্যবহার করা হয়েছে। এবারও তার ব্যাতিক্রম হলনা। শাহফানার উপস্থিতি আবদালীর দিল্লী জয়ে বাধা সৃষ্টি করল না। ইতিহাসে শাহফানার আর কোন সংবাদ নাই।[২২] নাট্যকার তাকে মোগল শাহাজাদার গুরু করেছেন, তার রাজনৈতিক ভূমিকা দিয়েছেন, তাকে দিয়ে নরিন্দর গিরির একটি চক্ষুকে অন্ধ করেছেন এবং তাকে দিয়ে আবদালীর প্রতি তর্জনগর্জন ও অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, অবশেষে আবদালীর আদেশে তার মৃত্যু হয়েছে। শাহফানা চরিত্রের এই সবদিকগুলি ইতিহাসের পরিপন্থী। তাকে আবদালী শিবিরে আবদালীর মন্ত্রণাদাতা হিসাবে দেখালে অন্তত কিছু যুক্তি থাকত।

নরিন্দরগিরি গোস্বামীর অনৈতিহাসিকতা আরো প্রচণ্ড। এইনামে কোন ঐতিহাসিক চরিত্র নাই। যিনি আছেন তার নাম রাজেন্দ্র গিরি। মথুরা আক্রমণের সময় রাজেন্দ্র গিরি গোস্বামী জীবিত ছিলেন না। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে উজির সফদরজং (সুজাউদ্দৌল্লার পিতা) যখন বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল্লী আক্রমণ করলেন তখন প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করে দিল্লী অধিকারের মুহূর্তে রাজেন্দ্র গিরি নিহত হন। মথুরার নাগা সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বা গিরি গোস্বামী সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজেন্দ্র গিরি গোস্বামীর কোন সম্পর্ক ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাজেন্দ্র গিরি গোস্বামী ছিলেন প্রয়াগের গিরি সম্প্রদায়ের নেতা। ইনি সফদরজঙের অধীনে চৌধুরীর কর্ম গ্রহণ করেন অর্থাৎ প্রয়াগের রাজস্ব আদায়কারী হন। ক্রমে তার বীরত্ব ও সাহস তাকে সামরিক নেতায় রূপান্তরিত করল। তিনি সর্বদা প্রভুর পক্ষে অর্থাৎ সফদরজঙের পক্ষেই যুদ্ধ করেছেন। এবং তার জন্য হিন্দু মারাঠা বা মুসলমান বাদশাহ বা তার সভাসদদের বিপক্ষাচরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। সফদরজং তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং গোস্বামী নিজস্ব পতাকা ওড়াবার ও ঘোড়ার ওপর কাড়ানাকাড়া বাজাবার অনুমতি পেয়েছিলেন (এটা সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ওমরাহদের অধিকার)। রাজেন্দ্র গিরি কখন সফদরজংকে অভিবাদন করতেন না সর্বদা আশীর্বাদ করতেন। এই দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা এবং তার শিষ্য-গণের নিজস্ব কামান ও বন্দুক ছিল এবং তাঁরা যুদ্ধের প্রচলিত কোন নিয়মই

মানতেন না।[২৩] রাজেন্দ্র গিরির মৃত্যুর পর অনুপগিরি এই সম্প্রদায়ের প্রধান হন ও সুজাউদ্দৌলার কর্মচারী ও অন্যতম সেনাপতির কর্মে নিযুক্ত থাকেন।[২৪] আবদালীর সঙ্গে যুদ্ধে ইনি বা এর সম্প্রদায় কোন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায় না। তবে পাণিপথের যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা আবদালীর পক্ষে সসৈন্যে যোগদান করেন সুতরাং অনুপগিরিকে আবদালীর পক্ষে মারাঠাদের বিপক্ষে যুদ্ধরত দেখালে সম্ভাব্য ঘটনার গণ্ডী অতিক্রম করা হোতনা।

এই রাষ্ট্রবিপ্লবে ধর্ম ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত স্বার্থ ছিল বলবান। মারাঠাদের মথুরা ও গোকুল রক্ষা করার উদাসীনতা বা বিভিন্নদেশে বিশেষ সুবা বাংলায় মারাঠা দস্যুতা ধর্মস্থান বা ধার্মিকব্যক্তির প্রতি কোন সম্মান দেখায় নাই। বর্গির হাত থেকে বাঁচবার জন্য বহু স্ত্রীলোক মন্দির বা মঠে আত্মগোপনের চেষ্টা করেছেন। তাদের সেখান থেকে টেনে এনে বা বহু ক্ষেত্রে সেখানেই ধর্ষণ করা হয়েছে। বর্গির হাত থেকে রক্ষা পাবার স্ত্রীলোকদের একমাত্র উপায় ছিল আত্মহত্যা করা।[২৫] সুতরাং যুগবিপ্লবের নাট্যকার ধর্মকে নাটকের এক প্রধান ভূমিকা দেওয়ায় এবং শাহফানা ও নরেন্দ্র গিরিকে দুটি প্রধান চরিত্র করায় ইতিহাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত করা হয়েছে এবং নাটকের বক্তব্য ইতিহাসের পরিপন্থী হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনা বিন্যাস, রাজনৈতিক প্রবাহ বা ধর্মের প্রভাব কোনটিতেই নাট্যকার ইতিহাসকে বজায় রাখতে পারেননি কিন্তু সামাজিক চিত্রের বিরাট অসঙ্গতি আর সবদোষের উপর উঠে গেছে।

ইংরেজ শাসনে ও স্বাধীন ভারতে জীবন অতিবাহিত করে নাট্যকার সমসাময়িক সামাজিকরূপকে ভারতের শাশ্বতরূপ বলে ভুল করেছেন বলে মনে হয়। সামাজিক সংগঠনে প্রাকইংরেজ ভারতের সঙ্গে পরবর্তী যুগের যে কোন মিল নাই এটা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। প্রাকইংরেজ ভারতে স্ত্রীলোক ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়—হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এবিষয়ে কোন মতভেদ ছিলনা। মোগলহারেমের গল্প ও বাদশাহ এবং তার ওমরাহদের বহু নারীপ্রিয়তার সংবাদ সবিস্তারে লিখিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং ছত্রপতি শিবজীর আটজনস্ত্রী এবং দুইজন উপপত্নী ছিল এ খবর সকলের জানা,

না থাকতে পারে।[২৬] অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক জীবনে স্ত্রীলোক একাধারে উপেক্ষিত এবং সযত্নে রক্ষিত। বাজীরাও ও মস্তানীর বিবরণ, বাজীরাও প্রবন্ধে সবিস্তারে জানান হয়েছে। এইজন্যে নারীচরিত্র সৃষ্টি করার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় আলোচ্য নাটকে তা হয় নাই। তাই প্রথম দৃশ্যেই রাস্তার পাশের কূয়াতে গন্নাবেগমের আত্মহত্যার চেষ্টা এবং জবাহির জাঠের তাকে রক্ষা করার খবর দেওয়া হয়েছে। গন্নাবেগম যুগবিপ্লব নাটকের অন্যতম নায়িকা এবং একে ঘিরে বহু ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে। তারাশঙ্করবাবুর এই চরিত্রটি বিশেষ ভাল লেগেছে তাই গন্নাবেগম নামে এক উপন্যাস সৃষ্টি করে তিনি এই চরিত্রটিকে মর্য্যাদায় ভূষিত করেছেন। নাট্যকারের কল্পনায় গন্নাবেগমের এই আত্মহত্যার চেষ্টা এবং উদ্ধার সম্পূর্ণ ইতিহাস বিরোধী। গন্নাবেগমের পরিচয় দিলে এই কল্পনা যে কতো অসম্ভব তা বোঝা যাবে। গন্নাবেগম ছিলেন দিল্লীর বাদশাহর উজির ইমাদ-উল-মুলুকের স্ত্রী। এই সর্বশক্তিমান উজিরের স্ত্রীর পক্ষে পথিপার্শ্বস্থ কূপে আত্মহত্যার চেষ্টার সদুত্তরে নাট্যকার গন্নাবাঈ এর মুখে সংলাপ বসিয়েছেন—'আমার বাবা মাকে ধর্মমতে সাদী করেন নি। আমি রইস সমাজে অচল।'[২৭] এই উক্তি সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। গন্নাবেগমের পিতা আলিকুলিখান পারশ্যের রাজ-বংশের সন্তান। তিনি একাধারে ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'মসনাভি-ই-ওয়ালা সুলতান' আজও পারস্যে সুবিখ্যাত। কাব্য-রচনার সময় তিনি 'ওয়ালা' ছদ্মনাম গ্রহণ করতেন। আলিকুলি প্রধানত নাদিরশাহের অত্যাচারের ভয়ে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে আসেন (জন্ম ইসাফানে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে) এবং প্রথমে জাফর-জঙ্গ ও পরে খান-ই-জামান উপাধি প্রাপ্ত হয়ে দ্বিতীয় আলমগীরের একজন ওমরাহ ও সাতহাজারী মনসবদার পদ পান। তিনি কবি ও নৃত্যগীত পটিয়সি এক বাঈজীকে বিবাহ করেন। এদের সন্তান গন্নাবেগম। গন্নাবেগমও কবি ছিলেন কিন্তু তার রূপের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়। তার পিতার মৃত্যুর পর এই বিবাহের জন্য গন্নাবেগম দিল্লী থেকে অযোধ্যা যাত্রা করেন। পথিমধ্যে জবাহির সিং জাঠ দলবল নিয়ে তার গতিরোধ করে—উদ্দেশ্য অপূর্ব রূপলাবণ্যবতী গন্নাবেগমকে

বিজের অঙ্কশায়িনী করা। নিজের বুদ্ধিবলে এই ডাকাতদলের হাত থেকে পালিয়ে গন্নাবেগম ফরাক্কাবাদে তার পিতৃবন্ধু নবাব আহমেদ খাঁ বঙ্গসের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আহমেদ খাঁর উপদেশেই গন্নাবেগমের মাতা উজির ইমাদ-উল-মুলুককে কন্যার পাণিগ্রহণে অনুরোধ করেন। ইমাদ এদিকে সুবিখ্যাত মুঘলানিবেগমের কন্যা উমদা বেগমের সঙ্গে বাগদত্ত। গন্নাবেগমের রূপ ইমাদের বাক্যচ্যুতি ঘটাল। ইমাদ গন্নাবেগমকে বিবাহ করে প্রধানা মহিষীর সম্মান দিলেন। মুঘলানিবেগম এই অপমানে ইমাদের শত্রুতে রূপান্তরিত হলেন। অবশেষে দীর্ঘদিন পর আবদালীর হুকুমে ইমাদ মুঘলানিবেগমের কন্যা উমদাবেগমকে বিবাহ করে প্রধানামহিষীর সম্মান দিতে বাধ্য হন। (২১ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭) বেচারা গন্নাবেগম উজিরের অপ্রধান বেগম হয়েই জীবন অতিবাহিত করেন এবং ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যু হয়।[২৮] সুতরাং গন্নাবেগমের মাতাকে তার পিতা বিবাহ করেননি এটা যেমন অসিদ্ধ তেমনি অসিদ্ধ তার 'রংইসমহলে অচল' হবার সংবাদ। সুজাউদ্দৌলার বাগদত্ত বধূ স্বয়ং বাদশাহী সমাজে সচল। নাটকের শেষে জবাহির জাঠের সঙ্গে গন্নার প্রেমও তাই অনৈতিহাসিক ও স্বাভাবিক ইতিহাসতরঙ্গের পরিপন্থী।

আলিকুলির সামান্য বাঈজী বিবাহকে করা তৎকালীন সামাজিক নিয়মের প্রচলিত অঙ্গ ছিল। দিল্লীর প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ এবং তার পুত্র পৌত্রগণ এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রনী ছিলেন। বাদশাহ সাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র সুপ্রসিদ্ধ দারা শিকোহ এক কাশ্মিরী নর্তকীকে বিবাহ করেছিলেন। দারার মৃত্যুর পর ঔরঙ্গজীব বাদশাহ বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করে নাম দেন উদিপুরী বেগম। এই বিবাহের ফলে সাহাজাদা কামবক্সের জন্ম হয়। কামবক্সের বংশধরগণ দিল্লীর মসনদে বসেছেন। বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের পর তার দ্বিতীয় পুত্র শাহআলম বাদশাহ হন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র জাহান্দার শাহ বাদশাহ হন। জাহান্দার শাহ দিল্লীর এক নর্তকী লালকুঁয়ারকে কখন বিবাহ না করেই প্রধান বেগমের সম্মান দেন। (জাহান্দার শাহ প্রবন্ধের বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য) বাদশাহ মহম্মদ শাহের মহিষী উধমবাঈ একজন বাজারের সাধারণ নর্তকী ছিলেন। যদুনাথ লিখেছেন বাদশাহর মহিষী ও

মাতা হয়েও তার চরিত্রে এতটুকু পরিবর্তন আসেনি। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তার দুশ্চরিত্র বাদশাহদের লজ্জার কারণ হয়েছে।[২৯] বাঈজী বিবাহকে তাই কখনই সামাজিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলা চলে না। গন্নাবেগমের সামাজিক প্রতিষ্ঠা কম ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরঞ্চ উজিরের পত্নী হিসাবে তার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানটাই অসম্ভব ব্যবস্থা। একা কেবল জবাহির জাঠকে সঙ্গী করে মথুরা বা পাণিপথে উপস্থিতিও সম্পূর্ণ কাল্পনিক বিশেষ ইমাদ-উল-মুলুক তার প্রিয়তমা মহিষীকে কখনও ত্যাগ করেছেন এ সংবাদ যখন নাই।

উজিরের পত্নী হিসাবেও গন্নাবেগমকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। ১৭৫৭ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে বর্বর রোহেলাগণ যখন উজিরের গৃহ আক্রমণ করে লুঠতরাজ চালায় এবং স্ত্রীলোকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে তাদের খোলা রাস্তায় সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে উন্মুক্ত করে রেখে যায় তখন উজিরের হারেমের অন্য সকলের সঙ্গে গন্নাবেগমও পথে দাঁড়িয়ে অপমান ভোগ করেন।[৩০] এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে নাট্যকার গন্নাবেগমের চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত করেছেন তা ইতিহাসের কাছ দিয়েও যায় না।

মহম্মদ শাহের কন্যা হজরৎ বেগমের চরিত্র সৃষ্টিতেও নাট্যকার তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থা না বোঝার প্রমাণ রেখেছেন। হজরৎ বেগম রূপের জন্যে বিখ্যাত ছিলেন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আহমদশাহকে অন্ধ ও বন্দী করে উজির ইমাদ-উল-মুলুক দ্বিতীয় আলমগীরকে বাদশাহ করলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হজরৎ বেগম ১৬ বছর বয়সে উপনীত হওয়া মাত্র ৫৭ বছর বয়স্ক বাদশাহ তাকে বিবাহ করার জন্য ক্ষেপে উঠলেন। শেষে পাত্রী যখন আত্মহত্যার ভয় দেখালেন তখন বরের উত্তেজনা প্রশমিত হল। পাছে আর কাউকে হজরৎ বেগম বিবাহ করেন তাই একাকিনী নিঃসঙ্গ বন্দীত্ব তাকে বাদশাহর আদেশে ভোগ করতে হয়।[৩১] ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল সব প্রতিবাদ উপেক্ষা করে আহমেদ শাহ আবদালী হজরৎ বেগমকে বিবাহ করেন। আবদালী তার নব পরিনীতা বধূ নিয়ে পারস্যে ফিরে যান, সঙ্গে নিয়ে যান মৃত বাদশাহ আহমদ শাহের দুই বিধবা পত্নীকে মালিকা-ই-জামানি এবং সাহিবা মহলকে। আরো নিয়ে যান মৃত বাদশাহ আহমদ শাহের কন্যা মুহতারাম-উন-নিসা আর ১৬ জন

সুন্দরী হারেমবাসিনীকে। আবদালী পুত্র তৈমুর শাহের স্ত্রী দ্বিতীয় আলমগীর বাদশাহর কন্যা গৌহর-উন-নিসা এবং আবদালীর উপপত্নী মৃত নাদিরশাহের পুত্র নাসরুল্লার স্ত্রী ও বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের নাতি কন্যা আইফৎ-উন-নিসাও তার সঙ্গে পারস্য যাত্রা করেন। এ ছাড়া আরো চারশত মহিলাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।[৩২] আবদালীর স্ত্রীলোক প্রীতি আর কোন আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

হজরৎ বেগম সম্পর্কে নাট্যকার যে কল্পনার জাল বুনেছেন তা ঐতিহাসিক ঘটনাতরঙ্গ অস্বীকার করে। দ্বিতীয় আলমগীর বাদশাহর অবরোধ থেকে তাঁর পক্ষে বাইরে আসাই কঠিন। তর্কের খাতিরে যদি সে অসম্ভবকে সম্ভব বলে মনে করা যায় তাহলে দেখা যাবে হজরৎ বেগমের এই পলায়নের চেষ্টার পেছনে কোন উদ্দেশ্য নাই। তার মথুরায় অবস্থিতি একেবারেই অবাস্তব। মথুরায় আবদালী সৈন্যরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্ত্রীলোকদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তা পড়লে শিউরে উঠতে হয়। যমুনার বুকে চিরবিশ্রাম লাভ করে মথুরার বহু রমনী নিজেদের সম্মান রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হয় মৃত্যু নয় আবদালীর সৈন্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে মর্য্যাদা বিলোপ এই ছিল মথুরার মহিলার সামনে একমাত্র বিকল্প। হজরৎ বেগমের সৌন্দর্য্য কেবল মথুরায় নয় ভারতের পথে পথেও কেবল বিপদের আহ্বান। কেবল মথুরায় অবস্থিতি নয় পেশোয়ার প্রাসাদে হজরৎ বেগমের উপস্থিতিও আর এক অসম্ভব ঘটনা। যে বালাজী তাঁর পিতার মুসলমান উপপত্নী মস্তানীকে তাঁর সর্বশক্তিমান পিতার জীবিতকালে বন্দী করে রাখার স্পর্দ্ধা ও সাহস দেখিয়েছেন তাঁর প্রাসাদে মুসলমানের অবস্থিতি সবরকমের সাধারণ চিন্তাধারার ব্যতিক্রম। নাট্যকার ধর্ম নিয়ে বিপদে পড়েছেন। সমাজ জীবনে ধর্ম ছিল না। তিনি সেখানে ধর্মের প্রভাব দেখিয়েছেন আর ব্যক্তিগত জীবনে যেখানে ধর্মের প্রভাব ছিল সর্বাধিক সেখানেই তিনি বিংশ শতাব্দীর সংস্কারমুক্তপন্থী মনের পরিচয় দিয়েছেন। মথুরায় গোকুলনাথের বিগ্রহের পাশে হজরৎ বেগমের অবস্থান এমনি আর এক অসম্ভব পরিকল্পনা। শুধু সেদিন নয় আজও।

হজরৎ বেগম ও পেশোয়াপুত্র বিশ্বাসরাও এর মধ্যে প্রেমের আভাষ আবার

আর একটি অসম্ভব কল্পনা। বাজীরাও মস্তানীকে বিবাহ করতে পারেন নি। মোগল বাদশাহরা হিন্দুবাঈদের বিবাহ করেছেন মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে। ১৭৫৬ এর ভারতে এই প্রেম যেমন অদ্ভুত তেমনি অসম্ভব। হজরৎ বেগম ও বিশ্বাসরাও একই বয়সী সুতরাং পেশোয়ার পক্ষে বাদশাহ কন্যা ও তার নিজ পুত্রকে একসঙ্গে রাখা অসম্ভব। দ্বিতীয়ত মুসলমানী গৃহে থাকলে হিন্দুরা রন্ধন করতেন না এই সামাজিক নিয়মও বাদশাজাদীর অবস্থানের অসম্ভাব্যতা সৃষ্টি করেছে। তৃতীয় পালকী যেখানে মহিলাদের যাতায়াতের একমাত্র যান (মাঝে মাঝে নৌকা) সেখানে মহারাষ্ট্রে যাওয়া তা সে পুনাই হোক আর সাতারাই হোক এবং সেখান থেকে আবার স্বচ্ছন্দে দিল্লী ফিরে আসা নাট্যকল্পনাতেই সম্ভব।

আবদালীর সঙ্গে বিবাহ দেখান হয়েছে পাণিপথের পর অর্থাৎ ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের পর। আসল বিবাহের দিন কিন্তু চার বছর আগের ঘটনা। বিবাহের অব্যবহিত পূর্বে হজরৎ বেগমের আত্মহত্যা সম্বন্ধে নাট্যকার জবানবন্দী করেছেন যে নাটকের অনুরোধই তিনি ইতিহাসের এই ব্যাতিক্রম করেছেন সুতরাং এ বিষয়ে টিকা নিষ্প্রয়োজন।

এইবার 'যুগবিপ্লব' নাটকের বিশদ বিবরণ দেওয়া যাক। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই নাটক তিন অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে ৬টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে ৪টী দৃশ্য ও তৃতীয় অঙ্কে ৬টী দৃশ্য আছে। প্রথম অঙ্কে ১ থেকে ৪৫ পাতা, দ্বিতীয় অঙ্কে ৪৬ থেকে ৯৪ পাতা ও তৃতীয় অঙ্কে ৯৫ থেকে ১৪৪ পাতা। মোট পাতার সংখ্যা ১৪৪ আর মুখপত্র, উৎসর্গপত্র ভূমিকা ও চরিত্রলিপি ৬ পাতা মোট ১৫০ পাতার বইখানি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

প্রথম অঙ্ক সুরু হয়েছে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের শীতার্ত প্রথম প্রহর রাত্রে। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে যে দিল্লীবাসীরা পালিয়ে যাচ্ছে। আর্তের মরণার্ত চিৎকার ও নারীর ক্রন্দনধ্বনী নাটকের প্রথম আওয়াজ। জবাহির জাঠ এক উচুমনের চাষী তার সঙ্গে আলোচনারত শাহাজাদা মিল্লাত যিনি পরে দ্বিতীয় সাজাহান (মতান্তরে তৃতীয় সাজাহান[৩৩]) নামে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুয়া হতে গন্না বেগমকে জাঠ জবাহির উদ্ধার করেছে

এখন তার রক্ষনা বেক্ষণের জন্য ভদ্রলোকের আশ্রয় চাইছে। তারপর ইয়াকুবের সঙ্গে আসছেন তৎকালীন ভারতের শাসনকর্তা উজির ইমাদ-উল-মুলুক গাজিউদ্দিন নাটকে তাকে আমিদুল মুল্ক নামে লেখা হয়েছে। এই আমিদ, আবদালীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার বর্ণনা করছেন এবং কথাপ্রসঙ্গে জানাচ্ছেন যে আবদালী তার কাছে দুই কোটি টাকা দাবী করেছে যেটা তার দেবার ক্ষমতা নাই। এই সূত্রেই মুঘলানী বেগমের কীর্তি-কলাপও শোনাচ্ছেন। মুঘলানী বেগমই আবদালীকে জানিয়েছেন যে মহম্মদশাহের কন্যা হজরৎ বেগম ও ফকিরিণী বেগম হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। তাই আবদালী তাদের পাবার জন্যে পাগল হয়ে গেছেন। আমিদ আরো বলছেন যে তিনি মুঘলানী বেগমের কন্যা উমধাবেগমকে বিবাহ করতে রাজী কারণ 'তয়ফাওয়ালীর নেশা আমার মিটে গেছে। আমি তার খবর রাখি না। শুনেছি তারা দিল্লী ছেড়ে পালিয়েছে।' (প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য পাতা ৭, সামান্য নাশাকচি এসে উজির সাহেবকে তিনতাড়া দিয়ে বলছে—'চলে যাও ওয়াজির সাহেব······জলদি যাও।' (১/১ পাতা ৯) তারপর মিল্লাত গন্নাবেগমসহ প্রবেশ করে তাকে নিজের আশ্রয় দিচ্ছেন। গন্নাবেগম নিজের নসীবকে ধীক্কার দিয়ে বলছেন 'বাদশাহের বাদকশাহী সিপাহী। আবদালী আসছে, লড়াইয়ের ভয়ে তারা কেল্লা থেকে পালাচ্ছে। পথে শহর লুটছে, জেনানীয় ইজ্জত ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে।·········আমার মা আর আমি দিল্লী ছেড়ে চলে যাচ্ছিলাম, পথে তারা আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ল। মাকে খুন করলে। লুঠে নিলে আমাদের বয়েলগাড়ীর সবকিছু জিনিষ। আমি ছুটে গিয়ে কুঁইয়া দেখে তাতেই পড়লাম ঝাঁপ দিয়ে।' (১/১ পাতা ১১) মিল্লাত নিজের পরিচয় দিচ্ছেন ও গন্নাবেগর পরিচয় নিচ্ছেন। গন্না বেগম বলছেন 'আমি তয়ফাওয়ালী যমনাবাঈ-এর বেটি গন্না বেগম—রট্টাবাঈ'। মিল্লাত শুনে বলছেন, 'তুমি গন্না বেগম? কবি গন্নাবেগম? কবি কুইলিখাঁর বেটি?' (১/১ পাতা ১৩) গন্নাবেগমের উত্তর—'হ্যা। আবদালী আসছে, আমাকে বাঁদী করে পাঠাবে কান্দাহারে। তার ঝাড়ুদারকে দেবে বখশিস।' (১/১ পাতা ১৩) মিল্লাত গন্নাবেগমকে নিয়ে স্থানান্তরে গমন করলেন। দ্বিতীয় দৃশ্য দিল্লীর লালকেল্লার অভ্যন্তর। প্রথমেই ঘোষণা আবদালী দিল্লীর বাদশাহ হয়েছেন। জেনানা মহলে হতাশার চিত্র। বাদশাহ মহম্মদ শাহের অন্ধ বেগম উধমবাই এবং কন্যা নসীবন বা হজরৎ

বেগম আলোচনা করছেন বাদশাহ আজিজুদ্দিন আলমগীরের কাপুরুষতা এবং আবদালীর ভারত জয়। তারপরই বেগম উধমবাঈ এর গুরু রূপে ফকির শাহফানার প্রবেশ। শাহফানা জানাচ্ছেন যে মুঘলানী বেগমই আবদালীর লালসাবহ্নিকে লেলিহান করে তুলছে। নসীবন জানায় যে তার এক পোষা গোক্ষুরা সর্প আছে সুতরাং প্রয়োজন হলে তিনি মৃত্যু বরণ করতে দ্বিধা করবেন না। মিল্লাত এসে সাপ দেখে আতঙ্কিত হলেন। ফকির গণনা করে বলে দিল যে এখন নসীবনের মৃত্যু নাই—'বরঞ্চ স্থানচ্যুত হবার আভাষ রয়েছে' (১/২ পাতা ২৩)। ঠিক তখনই পাথরের ঘায়ে সাপের মৃত্যু হল। উৎসাহিত শাহফানা ঘোষণা করলেন 'মুসলমানী বাদশাহী রাখতে হবে।' 'জন্মলগ্নে আছে বাদশাহী যোগ, তোমার চরিত্রে আছে শয়তানকে হারমানাবার গ্রহ-সমাবেশের শুভদৃষ্টি।' (১/২ পাতা ২৩) কাজেই নসীবনকে দিল্লী ছেড়ে যেতে হবে। শাহফানা মিল্লাতকে বলছেন—'তোমার নসীবে আছে তুমি বসবে তক্তে। এ সতরঞ্চি খেলায় তুমিও আমার ঘুঁটি।' (১/২ পাতা ২৫) মিল্লাতের সঙ্গে নসীবনকে দিল্লী ছেড়ে পালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে শাহফানা উধমবাঈকে বললেন 'উঁচু জায়গা থেকে পড়ে তুমি মরবে। সম্ভবত আবদালী নসীবনকে না পেয়ে তোমাকে কেল্লা থেকে নীচে ফেলে দেবে।' 'আফশোষ কোর না উমধা। কিসের আফশোষ। শোন! দিল্লী কাঁদছে শোন।' (১/২ পাতা ২৬)।

তৃতীয় দৃশ্য মথুরা হতে কয়েক মাইল উত্তরে যমুনা তীরবর্তী বনপথ। রোহিলাদের সঙ্গে জাঠদের সংঘর্ষ। নেপথ্যে মিল্লাত ও নসীবনের পলায়ন চতুর্থ দৃশ্য মথুরার নিকটস্থ মহাবন গোকুলতীর্থ। গিরি সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের আশ্রমে বালাজী বাজীরাও প্রবেশ করে নরিন্দর গিরি গোস্বামীর সঙ্গে আলোচনায় রত হলেন। বালাজী জানাচ্ছেন যে তিনি তীর্থ ভ্রমণ করে বেড়াতে বেড়াতে তার আশ্রমে উপনীত হয়েছেন। (১/৪ পাতা ৩০) বালাজী জানালেন যে আবদালী 'তৃতীয়বার হিন্দুস্থানে প্রবেশ করেছে।' (১/৪ পাতা ৩০) 'হিন্দুপাদ পাদশাহ' সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। বালাজী জানাচ্ছেন যে মহম্মদ শাহের কন্যা হজরৎ বেগম বিচিত্র ভাবে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। আবদালী তাকে খুঁজতে সমস্ত দেশ তোলপাড় করছেন। (পাতা ৩২) এইখানে কয়েকটি

অদ্ভুত সংলাপ রাজনৈতিক চিন্তার আভাষ দেয়। নরিন্দর জিজ্ঞাসা করছেন—'এইবারেই কি তোমরা আবদালীকে বাধা দিয়ে তার (অর্থাৎ হিন্দুপৎ পাদশাহী স্থাপনার) শুভারম্ভ করবে পণ্ডিত?' উত্তরে বালাজী বলছেন—'না গোস্বামীজী, এবার নয়।' এখনও সময় হয়নি গিরি মহারাজ। এখন আমরা বাধা দিতে গেলেই আফগান মুঘল এক হয়ে যাবে।' (১/৪ পাতা ৩২-৩৩) নরিন্দর মারাঠাদের অত্যাচারের নীতির বিরোধীতা করায় বালাজীর মুখে ভাষণ, 'মারাঠার অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে তার রাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন হবে' (পাতা ৩৪) একটু পরেই সবিস্ময়ে বালাজীর ভাষণ—'ধর্ম ছাড়া শান্তি হয় না? সংসারে তো ধর্মের সংখ্যা নাই মহারাজ।' (পাতা ৩৪) অবশেষে মন্দিরের দরজায় বালাজীকে রক্ষক রেখে নরিন্দর গিরি যুদ্ধ সাজে সাজলেন (পাতা ৩৬-৩৭)। খবর এল জাহান খাঁ আর নজিব খাঁ মথুরার দিকে ছুটে আসছে।

পঞ্চম দৃশ্য জাঠগ্রাম চৌমুহা। বৃদ্ধ জাঠ সর্দার যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়েছেন সঙ্গে তার পুত্র জবাহির। মথরানাথকে রক্ষার জন্য চাষী জাঠরা দুরানী আফগানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল এটাই নাট্যকারের বক্তব্য। নসীবনের রূপ দেখে জবাহির তাকে 'রাধারাণী' নামে অভিহিত করছে। দশ হাজার চাষী জাঠ আবদালীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হল আর রঘুর স্ত্রী ঘন জঙ্গল গোকুল মহাবনে নসীবনকে লুকিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি দিল। (পাতা ৪১) এইখানে রাজেন্দ্র গিরি গোস্বামীর সঙ্গে নরেন্দ্র গিরির যোগাযোগ সাধিত হচ্ছে। সংলাপ 'হিন্দুস্থানের রুদ্র দেওয়ের সিদ্ধভক্ত—সিংহের মতো সাহসী রাজেন্দ্র গিরি গোস্বামী। তারই দল। নরেন্দ্র গিরি গোস্বামী মোহন্ত এখন।' (১/৫ পাতা ৪২) আগের দৃশ্যেও এই যোগাযোগের নিদর্শন আছে। বালাজী লোভ দেখাচ্ছেন নরিন্দর গোস্বামীকে। তার প্রতিদ্বন্দী অনুপগিরিকে অধীন হতে বাধ্য করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বালাজী। (১/৪ পাতা ৩৩) ষষ্ঠ দৃশ্য গোকুলতীর্থ। নেপথ্যে আবদালীর সঙ্গে সন্ন্যাসীদের যুদ্ধ চলছে। ওপারে মথুরা পুড়ছে। 'একা বালাজীরাও দাঁড়াইয়া আছেন বন্দুক হাতে।' (১/৬ পাতা ৪৩) জানা গেল দশ হাজার জাঠ প্রাণ দিয়ে আবদালীকে আটকাতে পারেনি কিন্তু আট হাজার সন্ন্যাসী আবদালীর আক্রমণ বারবার প্রতিহত

করলেন। আত্মঘাতী হতে উদ্যোগী হজরৎ বেগমের হাত থেকে পেশোয়া ছুরি কেড়ে নিলেন। জানা গেল আবদালী ফিরে যাচ্ছে। যমুনার জল গলিত শবের বিষে পচে উঠেছে। বাংলার উকিল যুগোল কিশোর এসেছেন। শাহ আবদালী তৃষ্ণার্ত। এক লোটা জলের কাঙাল। গোকুলের গিরি সন্ন্যাসীরা আবদালীকে প্রতিহত করে ফিরিয়ে দিলেন। পেশোয়া বাজীরাও নিলেন হজরৎ বেগমের রক্ষার ভার। (১/৬ পাতা ৮৫)।

প্রথম অঙ্ক থেকেই ইতিহাস লঙ্ঘন করা হয়েছে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আহমেদশাহ আবদালীর ভারত অভিযান 'চতুর্থ ভারত আক্রমণ' নামে খ্যাত। অর্থাৎ এটি আবদালীর কোন নূতন কীর্তি নয় এবং এর আগে তিনবার তার আক্রমণে ভারতবাসী জর্জরিত হয়েছে। এই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের দিল্লী আক্রমণ সম্পর্কে অনেক প্রামাণ্য বিবরণ আছে। পারস্য ভাষায় লেখা অমূল্য দিল্লীর ইতিহাস আচার্য যদুনাথের সম্পাদনায় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে Indian Historical Record Commissionএর বিবরনীতে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তারিখ-ই-আলমগীর সানী আর একখানি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সমসাময়িক রচনা। শেখ গোলাম হোসেন সামিনের বিবরণের ইরভিন সাহেবের করা অনুবাদ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের Indian Antiquaryতে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া মারাঠা চিঠিপত্র ও দিল্লীর মারাঠা প্রতিনিধির বিবরণ একালের ঐতিহাসিক-দের হস্তগত হয়েছে। সুতরাং ১৭৫৭ র দিল্লী সম্পর্কে বহু সংবাদ সহজেই লভ্য।

আবদালীর দিল্লী আসার সংবাদে দিল্লীবাসীর পলায়ন এবং আবদালী-কে সন্ধির প্রস্তাবে রাজী করবার জন্য ইয়াকুবআলি খাঁ ও শাহফানা ফকিরকে প্রেরণ নাটকে আলোচিত হয়নি। আবদালী দিল্লী দখলের পর সৈন্যরা যথারীতি লুটপাট করেছে বটে কিন্তু সম্পত্তি লুঠের সুসংবদ্ধ সরকারী পরিকল্পনার কাছে সেটা কিছুই নয়। প্রত্যেক অর্থবান লোকের বাড়ীতে গিয়ে তার বাড়ীর সমস্ত মূল্যবান সম্পত্তি মায় জড়ি ও আসবাব পর্য্যন্ত লুঠ করা হয়। স্বর্ণ অর্থ না পাওয়া পর্য্যন্ত অকথ্য অত্যাচার চালান হয়—গৃহস্বামী বা গৃহভৃত্য কেউ নিস্তার পায়নি।

দিল্লীতে সোনার দাম হয়ে যায় ৮ থেকে ১০ টাকা তোলা, রূপা ২ টাকা

তোলা অন্যদিকে ভক্ষ্যদ্রব্যের দাম আগুন হয়ে উঠে টাকায় মাত্র তিনসের আটা পাওয়া যেতে লাগল। লুণ্ঠনে সর্বস্ব হারিয়ে দিল্লীর বহুলোক আত্মহত্যা করলেন। পাঞ্জাবের মৃত শাসনকর্তার স্ত্রী মুঘলানি বেগম প্রতিশোধ বসে আবদালীর প্রধান সংবাদ সরবরাহকারীর কাজ করেন। তার নাম অত্যন্ত ঘৃণায় উচ্চারিত হত। আবদালীর ভয়েই এর কন্যাকে বিবাহ, উজির ইমাদ-উল-মুলুককে করতে হয়েছে। গন্নাবেগমকে বিদায় দেবার কোন কথাই ইতিহাসে নাই। গন্নাবেগম প্রসঙ্গে আলোচনার সময় সে কথা বলা হয়েছে। প্রথম দৃশ্যে ইমাদের পক্ষে যেমন রাস্তায় ঘুরে বেড়ান অসম্ভব, কারণ তিনি তখন আবদালীর বন্দী, তেমনি অসম্ভব বাদশাজাদার দিল্লীর পথে ভ্রমণ। বাদশাহ বংশীয়দের বন্দীত্বের কথাও বহু আলোচিত। এই সময় গন্নাবেগম ও মিল্লাতের সংলাপ ও সংলাপের বক্তব্য দুই অনৈতিহাসিক। দিল্লীর মূলত একনায়ক ইমাদ-উল-মুলুক যতই দুরাবস্থায় পড়ুন নানা উপায়ে বারবার নিজের আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং আবদালীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়েছে। তার প্রিয়তমা স্ত্রীর পক্ষে রাস্তার কুয়াতে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু চেষ্টা পরিপূর্ণ কবিকল্পনা। দ্বিতীয় দৃশ্য পরিপূর্ণ কাল্পনিক। তৃতীয় দৃশ্যে জাঠ ও রোহিলাদের মধ্যে সংঘর্ষ দেখান হয়েছে। স্মরণে রাখা কর্তব্য যে রোহিলাগণ বা রোহিলাসর্দার নাজিবখাঁ আবদালীর কর্মচারী নন। নাজিবখাঁ দিল্লীর এক আমীর। ইমাদ-উল-মুলুকের ঘোর প্রতিদ্বন্দী। তাই নিজের স্বার্থ অনুসারে তিনি কখনও কখনও আবদালীর পক্ষভূত। এই দৃশ্যে হজরৎ বেগম ও মিল্লাতের মথুরা অভিমুখে পলায়ন সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনা।

চতুর্থ দৃশ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস ও কল্পনা এমনভাবে মিশ্রিত যে ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ প্রয়োজন হবে। প্রথমে বলা হয়েছে গিরিসম্প্রদায়ের আশ্রম। তারপর বলা হয়েছে নরিন্দর গিরি সুবিখ্যাত রাজেন্দ্র গিরির প্রধান শিষ্য। নরেন্দ্র গিরি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি। তার আশ্রম ছিল প্রয়াগে এবং সেখান থেকেই তিনি অযোধ্যার নবাবকে সাহায্য করেছেন। নরেন্দ্র গিরির মৃত্যুর পর তার প্রধান শিষ্য অনুপগিরি এই সম্প্রদায়ের প্রধান হন। তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মথুরার নরিন্দর গিরি কাল্পনিক এবং গিরি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। তর্কের খাতিরে

নরেন্দ্র গিরির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলেও আবদালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধোত্তম প্রক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কারণ অযোধ্যার সুজাউদ্দৌল্লা আবদালীর বন্ধুদের অন্যতম; ১৭৫৭তে অস্পষ্টভাবে এবং ১৭৬১তে পাণিপথে মারাঠা নিধন যজ্ঞে স্পষ্টভাবে। সুতরাং তার অনুগত গিরি সম্প্রদায়ের সঙ্গে মথুরায় বা অন্য কোথাও সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা ছিল না। ১লা মার্চ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আবদালীর সৈন্যরা মথুরায় ঢুকে পড়ে। যুদ্ধের কোন প্রশ্নই নাই কারণ মথুরায় কোন সৈন্যদল ছিল না। চারঘণ্টা ধরে মথুরার হিন্দু জনসাধারণের ওপর নারীপুরুষ নির্বিশেষে অকথ্য অত্যাচার ও হত্যালীলা চালান হয়। এমন কি সন্ন্যাসীরাও বাদ যায়নি। বহু মুসলমান বাসিন্দাও ভুলক্রমে নিহত হন। গোকুল মহাবন আক্রমণে স্বয়ং আবদালী নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এইখানে চারহাজার নাগা সন্ন্যাসী সর্বাঙ্গ ছাইলিপ্ত করে উলঙ্গ দেহে উলঙ্গ অসি নিয়ে আবদালীর সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁদের প্রচণ্ড আক্রমণে ও মরণপণ যুদ্ধে আবদালী হতচকিত। সন্ন্যাসীরা যুদ্ধ জয় করতে চাননি চেয়েছিলেন ধর্মের সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে। তাই চারহাজার সন্ন্যাসী তাদের সমসংখ্যার থেকে কিছু বেশী সৈন্য নিয়ে মহাপ্রয়াণ করলেন। বাংলার সুবাদার সিরাজউদ্দৌল্লার কর্মচারী যুগোলকিশোর তীর্থযাত্রা করে গোকুলে এসেছিলেন। তিনি আবদালীকে নিরস্ত্র করেন এবং বোঝান যে সন্ন্যাসীদের কাছে কোন অর্থ বা সম্পত্তি পাবার আশা নাই। একজন মারাঠা সৈন্য অথবা জাঠ চাষী অথবা কোন হিন্দু যোদ্ধা মথুরা বা গোকুল রক্ষা করতে আগিয়ে আসেনি। মথুরায় বালাজী বাজীরাও-এর অবস্থিতি বা একাকী তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অসম্ভব ঘটনা। বালাজী বাজীরাও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুস্থানে বা উত্তর ভারতে উপস্থিত থাকলে ভারত ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্নপথে প্রবাহিত হত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃশ্যও সম্পূর্ণ কাল্পনিক। মুসলমান বাদশাজাদীর হিন্দুমন্দিরে অবস্থিতি যে কত অসম্ভব তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। বালাজীরাও-এর নসীবনকে আত্মহত্যা করা থেকে রক্ষা করা এবং তাকে আশ্রয় দেওয়া পরিপূর্ণভাবে কাল্পনিক ও ইতিহাস বিরোধী ঘটনা। মিল্লাতের যে চরিত্র প্রথম অঙ্কে দেখান হয়েছে প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম দৃশ্যে তা নাটকের আলোচনার শেষে, মিল্লাতের ঐতিহাসিক চরিত্র আলোচনার সময় উল্লিখিত হবে।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য আবদালীর আক্রমণ বিধ্বস্ত উত্তর ভারতের গ্রামাঞ্চল। দেখা গেল গন্নাবেগম মেয়ের দল নিয়ে গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন। যুদ্ধে আহত জবাহির জাঠ বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে গেছে—তার সেবায় গন্নাবেগম তৎপর। নরিন্দর গিরি এসে জানাচ্ছেন যে জাঠ জবাহিরকে পেশোয়া পুরস্কৃত করবেন। গন্নাকে দেখে তিনি চমৎকৃত, বলছেন—রট্টাদেবী, তুমি বেটি আশ্চর্য! গন্নাকে একেবারে মুছে দিয়ে রট্টা হয়ে উঠেছ। বসরার গুলাব—জবাফুল হয়ে গেল।' এই দৃশ্যে আবার হিন্দুপৎ পাদশাহীর আশা শোনান হচ্ছে। নরিন্দর গিরি রট্টাদেবীকে প্রণাম করে চলে গেলেন। (২/১)

দ্বিতীয় দৃশ্য পেশোয়ার প্রাসাদ (কোথায় তা বলা হয় নাই) সময় বলা হয়েছে দেওয়ালীর দিন। প্রথম হজরৎ বেগম বা নসীবন উন্নিসার পেশোয়াপুত্র বিশ্বাসরাও এর-প্রতি আকর্ষণ দেখান হয়েছে তারপর পেশোয়া বালাজীরাও স্বয়ং এসে ঘোষণা করছেন যে আজ তাঁরা উত্তর ভারত অভিযান সুরু করবেন। তিনি নসীবনকে স্পষ্ট ভাষাতেই তার পরিকল্পনা শোনাচ্ছেন। নসীবনকে ভারত সাম্রাজ্ঞীর আসনে বসিয়ে পেশোয়া হিন্দুপৎ পাদশাহীর সূচনা করতে চান। দৃশ্যের শেষে আবার দেখানো হয়েছে নসীবনের বিশ্বাসরাও-এর প্রতি উৎসুক কামনা। তিনি একবার বিশ্বাসরাওকে কুমার বলে সম্বোধন করছেন। (২/২) তৃতীয় দৃশ্য পেশোয়ার দরবার। নির্দেশ দেওয়া হল বাহিনীর যাত্রা শুরু হবে দ্বিতীয় প্রহরের প্রথম পাদে মহাকালীর পূজারম্ভ হওয়া মাত্র। (৬৭ পাতা) জানা গেল নসীবন শাহ-জাদীর নামে দিল্লী দখল করা যাবে না কারণ তাতে শাহজাদীর আপত্তি রয়েছে। গোস্বামী সৈন্যদের আর জাঠ সৈন্যদের সাহায্য পাওয়া যাবে একথাও বালাজী জানালেন। সমরসজ্জায় সবাই প্রস্তুত—এবার চৌথ আদায়ের অভিযান নয় দিল্লীজয়ের অভিযান। (৬৭-৬৮পাতা)। নরিন্দর গিরি এলেন এবং জানালেন যে সন্ন্যাসীদের সাহায্য পাওয়া যাবে না। মারাঠা প্রধান সেনাপতি নিজামজয়ী সদাশিবরাও ভাউকে একজন বদমেজাজী কর্মচারী-রূপে দেখান হয়েছে। জাঠ জোয়ান জবাহির সিংহকে পুরস্কার দেওয়া হল তরবারি আর মুদ্রাপূর্ণ থলি। শোনান হল 'হিন্দুপাদ পাদশাহী'র কথা। তারপরই সদাশিবরাওএর জাঠ জোয়ানদের প্রতি অসৌজন্যতামূলক ব্যব-

স্থারের প্রতিবাদ করলেন নরিন্দর গোস্বামী। নসীবনের হাত থেকে ধাতুপাত্র এবং মুদ্রাপূর্ণ থলি সশব্দে পতিত হল। জবাহির নসীবনকে জানাল যে তার রাধারানীর জীবন রক্ষার জন্য কোন পুরস্কার গ্রহণ করতে সে অস্বীকার করে, তারপর নাটকীয় ভাবে দৌড়ে পালাল। সদাশিব, মলহররাও ও বিশ্বাসরাও বাহিনীর সঙ্গে যাত্রা করলেন। নরিন্দর গিরি গোস্বামী নসীবন শাহজাদীকে দিল্লী পৌছানোর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। (২/৩) চতুর্থ দৃশ্য পুরান দিল্লীর একটি প্রাচীন পরিত্যক্ত দরগা। মিল্লাত দিল্লী ফিরে এসে শাহফানার সঙ্গে দেখা করছেন। নসীবন হারিয়ে গেছে শুনে ফকির উন্মাদ প্রায়। গণনা করেছেন যে নসীবন দিল্লীর তখতের ভাবি উত্তরাধিকারী। নরিন্দর গিরি গোস্বামীর হাতে শাহজাদী পড়েছেন শুনে ফকির সাহেব ক্ষিপ্তপ্রায়। উপস্থিত হন উজির ইমাদ-উল-মুলুক। জানান যে শাহজাদা মিল্লাতকে দিল্লীর তখৎ-এ বসতে হবে। সংলাপ একখণ্ড সত্যি চমৎকার। ‘আপনি বাদশাহির ছক নিয়ে সতরঞ্চ খেলছেন।······ওই একই ছকে আমিও খেলছি আবদালীর সঙ্গে—মারাঠার সঙ্গে, বাদশাহীর খেল।’ (পাতা ৮৩)। কারণ—‘চারিদিকে দুশমন আমার। আবদালী, মারাঠা, বাদশাহ, নাজিব খাঁ, ইন্তেজাম, সুরজমল জাঠ, সুজাউদ্দৌল্লা নবাব, সব সব সব। এদের সঙ্গে লড়াই দিয়ে বাচতে হবে আমাকে।’ (পাতা ৮৫) তাই ‘আবদালীর স্তাবক আলমগীরকে সরাতেই হবে আমাকে।’ (পাতা ৮৪) এল নাজিব খাঁ জানাল পঙ্গপালের মতো মারাঠা ফকিররা উড়েছে। আসছে চৌথ আদায় করতে। ইতিমধ্যে বাদশাহ হতে রাজী হয়ে বোরখা পরে ভাবি-বাদশাহের পলায়ন। তোপের আওয়াজে মারাঠা আক্রমণের সূচনা। নাজিব খোঁজ নিতে যাবার অবকাশে উজিরের পলায়ণ। অবশেষে নরিন্দর গিরি ও শাহফানা হিন্দু মুসলমান দুই ফকির মুখোমুখি। হিন্দুপৎ পাদশাহীর ভয়ে বিহ্বল শাহফানার হঠাৎ আক্রমণে নরিন্দর গিরির একটি চক্ষু নষ্ট। তারপর নরিন্দর গিরি নসীবনকে দিল্লী কেল্লায় সসম্মানে পৌছে দিলেন। (২/৪)

প্রায় সমগ্র দ্বিতীয় অঙ্ক প্রক্ষিপ্ত। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আবদালী নসীবন বা হজরৎ বেগমকে বিবাহ করে ভারত ত্যাগ করে চলে

গেছেন একথা কোথাও জানান হয় নাই। নাটক পড়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আবদালী তখনও দিল্লীতে বসে আছেন এবং তার বিরুদ্ধেই মারাঠাদের যুদ্ধসজ্জা এবং দিল্লী জয়ের সংকল্প। পেশোয়া প্রাসাদের অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনা তাই সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। দীপাবলীর দিন মারাঠাদের উত্তর ভারত অভিযান সুরু হল বলায় মনে হয় যে নভেম্বর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিযান সুরু। আসলে বিশ্বাসরাওকে সেনাপতি সাজিয়ে সদাশিবরাও ভাউকে তার রক্ষক, মন্ত্রণাদাতা এবং অভিভাবক করে অভিযান সুরু হয় মার্চ মাসে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে (ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ছক দ্রষ্টব্য)। জুন মাসে মলহররাও হোলকার এবং উত্তর ভারতে অবস্থিত অন্য মারাঠা সর্দারেরা বিশ্বাসরাও ও সদাশিবরাও পরিচালিত বিরাট বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হন। চতুর্থ দৃশ্যের ঘটনা অর্থাৎ মারাঠাদের দিল্লী অধিকার ঘটে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অগাষ্ট। তখন যুদ্ধের আবহাওয়া। আবদালী পঞ্চমবার ভারত অভিযানে বেরিয়ে লাহোর জয় করেছেন ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। বস্তুত ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আবদালীর সঙ্গে যুদ্ধ করে দত্তাজী সিন্ধিয়া দিল্লীর অদূরে বরারীঘাটের যুদ্ধে ১০ই জানুয়ারী নিহত হলেন। দত্তাজীর মৃত্যুর খবর পাবার পরই পেশোয়া বিশ্বাসরাও ও সদাশিবরাও ভাউ এর অধীনে এই বিরাটবাহিনী প্রেরণ করেন। নাটকে তাই ইতিহাসকে উল্টে-পাল্টে সুবিধামত ব্যবহারের যে চেষ্টা হয়েছে তা কল্পনা অনুসারী সম্পূর্ণ ভাবে। চতুর্থ দৃশ্যে ইমাদ, মিল্লাতকে বাদশাহ হতে রাজী করালেন, মারাঠাদের দিল্লী আক্রমণ ও অধিকারের সময় যদি এই ঘটনা ঘটত তাহলে সময় হত ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-অগাষ্ট মাস। কিন্তু উজির ইমাদ-উল-মুলুক দ্বিতীয় আলমগীর বাদশাহকে হত্যা করে মিল্লাতকে শাহজাহান সানী নামে বাদশাহ করেন ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর। এখানে একবছর পেছনের ঘটনাকে আগিয়ে আনা হয়েছে। বাদশাহ আলমগীরের হত্যার খবর পেয়েই আবদালী দিল্লী অভিমুখে অভিযান করেন। সুতরাং এখানেও ইতিহাস লঙ্ঘিত হয়েছে। হিন্দুমুসলমান দুই ফকিরের গল্প একেবারেই কল্পনা প্রসূত। নরিন্দর গিরিও কাল্পনিক চরিত্র এক অসম্ভব পরিস্থিতিতেতে বিরাজিত। বাদশাজাদী হজরৎ বেগমের উপস্থিতিও সর্বত্র অসম্ভব কারণ তিনি ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসেই পারস্য চলে গেছেন।

এই অঙ্কে হিন্দুপৎ পাদশাহী সম্পর্কে অনেক আলোচনা আছে। আগেই বলা হয়েছে হিন্দু পাদশাহীর চিন্তা বাজীরাও এর সঙ্গেই মৃত। বালাজীরাও সে চিন্তাকে মনে স্থান দেন নাই। তার জীবনের লক্ষ্য হয় অর্থ আর চৌথ আদায় তাই রাজপুত বা জাঠ কেউ তাকে কোন সাহায্য করেনি। সন্ন্যাসী-দের সাহায্যের কথাও অচিন্তনীয় কারণ নরিন্দর গিরি কাল্পনিক চরিত্র। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৈন্য বলে মথুরা বা গোকুলে কোন কিছুই কখন ছিল না। নসীবনের নামে দিল্লী অধিকারের গল্পও বানানো। তাছাড়া যদি মারাঠাদের কারু নাম ব্যবহার করে কিছু করার প্রয়োজন থাকত তাহলে তারা তা করতেন। সে জন্য সেই ব্যক্তির অনুমতি প্রার্থনা প্রভৃতি সুক্ষ্ম ব্যাপারগুলো রাজনীতির উঁচু পর্য্যায়ে কখনই ঠাই পায় না, আজও নয়। বেচারা নসীবনের বিশ্বাসরাওকে কামনা দেখিয়ে নাট্যকার বাদশাজাদীর প্রতি চরম অন্যায় করেছেন। ত্রিপোলীয়া দুর্গের বন্দিশালায় যারা জীবন যৌবন নষ্ট করে অন্ধ হয়ে গেছে, বিজয়ীর কাছে যারা সামান্য পণ্যরূপে গণ্য হয়ে বাদশাহ কন্যার কোন সম্মানই পাননি এমন কি সামান্য নারী হিসাবেও যারা অবহেলিত, তাঁদেরই প্রতিভূ হলেন নসীবনউন্নিশা। আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে তিনি বৃদ্ধ দ্বিতীয় আলমগীরের কামনাকে বাধা দিতে পেরেছিলেন কিন্তু আবদালী তাকে স্বর্ণমূল্যে ও বাহুবলে কিনে নিয়ে চলে গেলেন। মোগল হারেমের রমনীর অসম্মান অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের এক বিরাট কলঙ্ককালিমা। দুইটি উদাহরণ দিলে বক্তব্য স্পষ্ট হবে। প্রথম মুরাদের পৌত্রের (ইনি আবার বাদশা ঔরঙ্গজীবের দৌহিত্র*) কন্যার সঙ্গে শাহানশাহ নাদিরশাহের কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়, ২৬শে মার্চ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে। নাদিরশাহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তার পুত্র নসরুল্লার স্ত্রী পাদশাবংশীয়া আইফৎ-উন-নিসাকে উপপত্নী রূপে দখল করে নেন আহমদশাহ আবদালী। চতুর্থ বার ভারত অভিযানের সময় অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই উপপত্নী তার সঙ্গে দিল্লী আসেন ও ফিরে যান। দ্বিতীয় উদাহরণ। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে উজির ইমাদের অকীর্তিতে স্বয়ং বাদশাহর হারেমে খাদ্যের অভাব এমন প্রচণ্ড আকার ধারণ করল যে এক মুঠো সবজি বা জলের জন্য হাহাকার পড়ে গেল।[৩৪] একেবারে কোন

* নাদিরশাহ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

খাদ্য না পেয়ে বাদশাজাদীরা অবশেষে রন্ধনশালার দরজায় গিয়ে ধর্না দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনাবলি তাই সম্পূর্ণ ভাবে অনৈতিহাসিক প্রমাণিত হল। সব থেকে অসংলগ্ন হয়েছে যে প্রথম অঙ্ক ও দ্বিতীয় অঙ্কের মাঝে যে তিন বছর কেটে গেছে, অর্থাৎ মথুরার অত্যাচার ও গোকুলের যুদ্ধর (১লা ও ১৫ই মার্চ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) পর পেশোয়ার উত্তর ভারত অভিযানে বাহিনী পাঠানর (মার্চ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ) মাঝে আবদালী ভারত ত্যাগ করে গেছেন ও আবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছেন একথা কোথাও বলা হয় নি। আবদালীর চতুর্থ ও পঞ্চম অভিযানকে একটি অভিযান হিসাবে যেন দেখান হয়েছে। ফলে দুই অভিযানের মধ্যবর্তি ঘটনাবলি প্রকাশ না করায় কার্য্যকারণ সম্পর্কে ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ দত্তাজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু উত্তর ভারতে বিরাট মারাঠা বাহিনী পাঠাবার অন্যতম প্রধান কারণ। সে ঘটনার কোন উল্লেখ না থাকায় যুগবিপ্লব নাটক দ্বিতীয় অঙ্কে গালগল্পে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

অবশেষে নাটকের তৃতীয় অঙ্ক। প্রথম দৃশ্য পাঞ্জাবের পশ্চিম প্রান্ত সীমায় আহমদ শাহ আবদালীর ছাউনি শিবির অভ্যন্তর। এইখানেই আবদালীকে প্রথম দেখা গেল। নর্তকীদের নৃত্যগীতের পর তরুণী মানবাঈ এর সঙ্গে শিখ জাঠ লুঠেরাদের সম্পর্কে আর পাতিয়ালায় আলা সিং সম্পর্কে আলোচনা। আবদালী বলছেন 'আলা সিং তো জমিদার ধনী সর্দার।' নাজিব জানাতে এসেছে আলমগীর বাদশাহের হত্যার সংবাদ এবং নয়া বাদশাহ শাহজাহানের তখৎ পাবার খবর। কিন্তু দেখা গেল আবদালী সবই জানেন। দেখা যাচ্ছে আবদালী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এবং মারাঠা সৈন্য বাহিনীর খবর নিচ্ছেন। আবদালী গোকুল মহাবনে যোদ্ধা সন্ন্যাসী আর বাজপাখী চোখ বালাজীরাও এর প্রশংসা করছেন। শিখ আর জাঠরা ক্রমাগত আবদালীর ঘোড়া আর বন্দুক লুঠ করে চলেছে। আবদালী তাদের নাম দিয়েছেন 'নেকড়া'। নেপথ্যে গান শুনে আবদালীর প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল যে রত্না গান গেয়ে পাঞ্জাবের চাষীদের জাগাচ্ছে। একটু পরেই গরীব মানবাঈ এর প্রতি আবদালীর সহানুভূতি আর হুকুম না মানা সৈন্যর প্রতি আবদালীর হৃদয়হীন পৈশাচিক ব্যবহার দেখান হয়েছে। তারপর নাজিবকে দিয়ে পেশোয়াকে পত্রলেখা হল। আবদালীর দুই অনুরোধ হজরৎ বেগমকে তার

চাই আর পাঞ্জাব তাকে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর বন্দী শাহফানার চোখ অন্ধ করে দেওয়া হল। শাহফানা হুঁশিয়ার করে দিল যে হজরৎ বেগমের সঙ্গে বিশ্বাসরাও এর বিবাহ হলে হিন্দু পাদশাহী সুপ্রতিষ্ঠিত হবে কেউ রুখতে পারবে না। আবদালী যেন এই মুহূর্তে দিল্লী যাত্রা করেন। আবদালী গীত গাহানেওয়ালীকে আগুণ জ্বালানেবালী বলে তার জন্যে যেন বেশ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। (৩।১) দ্বিতীয় দৃশ্যে গন্নাবেগম নিজের কবর নিজেই রচনা করছেন। নিজের জন্যে নিজেই অশ্রুপাত করছেন। এখানেও কিন্তু গন্না বেগম যে স্বয়ং সুজাউদৌল্লার বাগদত্তা ছিলেন একথা নাট্যকার জানাচ্ছেন না। জবাহির আবার খুঁজে পাচ্ছে তার আঁধিয়ারার গুলাবকে (পাতা ১১৩) তারপর জবাহির বলছে 'রট্টা, মেরে রাধা।' গন্না বলছে 'মেরে সর্দার! মেরে রুস্তম!' (৩।২ ১১৫ পাতা)

তৃতীয় দৃশ্যে দিল্লীর হারেমে মিল্লাত ও হজরতের সংলাপ। দিল্লীর সিংহাসনে পেশোয়াপুত্র বিশ্বাসরাও বসবে তার জন্যে নূতন বাদশাহ আনন্দিত। তিনি বাদশাহী ছেড়ে দেবার আনন্দে আহ্লাদিত। ধর্মে কর্মেই তার মত ও মতি। হজরৎ বেগম চাইছেন জপের মালা কিন্তু বাদশাহ দিতে চান মুক্তার মালা ও গোলাপ ফুল। বিশ্বাসরাওএর প্রতি হজরৎ বেগমের প্রণয় তার অজানিত নয় এবং তিনি তার পোষকতাও করেন। হজরৎ বেগম বলছেন 'ইহকাল পরকাল কুলমান সম্পদ—সমস্ত কিছু দরিয়াতে ভাসিয়ে দিয়েও তাকে (বিশ্বাসরাওকে) আমার চাই' (পাতা ১১৯)। বাদশাহ শাহজাহান বলছেন 'হিন্দু মুসলমান ওসব ছেঁদো কথা। তুমি মালা গেঁথে রাখ। বিজয়ী বিশ্বাসরাও এলে তাকে পরিয়ে দিও' (এ থেকে কি মনে করা যায় যে বাদশাহ হজরৎ বেগমের সঙ্গে বিশ্বাসরাও এর বিবাহের সংকল্প করছেন?)। অবশেষে জানা গেল যে ফুল বা মুক্তার মালা ছাড়া আর এক মালাও তার কাছে আছে—'সাপের মণির মালা। আমার মণির কণ্ঠহার।' (পাতা ১২১) অর্থাৎ সাপের বিষ শাহজাদী আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা কাছে রাখেন। (৩।৩)

চতুর্থ দৃশ্য পেশোয়া বালাজীরাও এর প্রাসাদ। উত্তর ভারত থেকে আসা পত্রাদি পাঠ করা হচ্ছে। নরিন্দর গোস্বামী এলেন জাঠ জবাহির সিং ও রঘুনাথ

সর্দারদের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব করতে। মারাঠা সেনাপতি তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন। জাঠদের প্রতি মারাঠাদের নির্য্যাতনের অভিযোগ করলেন। সে সব শোনার সময় নাই কারণ বালাজীরাওএর সামনে পাণিপথের যুদ্ধ। নরিন্দর গোস্বামী তাকে আত্মপ্রবঞ্চনার অভিযোগ করলেন। অবশেষে বালাজী আবদালীর পত্রের জবাব দিলেন। অস্বীকার করলেন পাঞ্জাব অথবা হজরৎ বেগমকে আবদালীর হাতে তুলে দিতে। নরিন্দর বালাজীরাও এর আকাশস্পর্শী দম্ভকে ধিক্কার দিয়ে সদাশিবরাও এর অপঠিত পত্র পড়তে বললেন। বালাজী পত্র পড়লেন—অর্থ ভাণ্ডার শূন্য, মাত্র সাত সপ্তাহের রসদ বর্ত্তমান। রসদ সরবরাহকারী গোবিন্দ বল্লাল বুন্দেলা নিহত। হিসাব করে দেখলেন পত্রলিখিত সাত সপ্তাহের মধ্যে চার সপ্তাহ চলে গেছে। চিৎকার করে উঠলেন 'বিশ্বাসরাও! সদাশিব! মারাঠা! পাণিপথ! আমি যাব।' (৩।৪)

পঞ্চম দৃশ্য পাণিপথ সন্নিহিত গ্রাম্য প্রান্তরের জঙ্গল। জবাহির সিং ও গন্নাবেগমের আলোচনায় পাণিপথের ভয়াবহ যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। গন্না বলেন সবই মানুষের কর্মফল তাই বিশ্বাসরাও আর সদাশিবরাও ভাউ পাণিপথে খতম হয়ে গেল। নরিন্দর গিরি এলেন। তাকে জবাহির বিশ্বাসরাও আর সদাশিবরাওএর মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনা করল। আবদালীকে সর্বদা আচমকা আক্রমণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জবাহির আর তার রাণী বিদায় নিল। বিকৃত মস্তিক বালাজীরাওকে দেখা গেল তিনি তার মারাঠাকে ডাকছেন। ডাকছেন বিশ্বাসরাওকে, সদাশিবরাওকে। (৩।৫) শেষ দৃশ্য আহমদশা আবদালীর শিবির। হজরৎ বেগমকে বিবাহ করতে হবে। হজরৎ বেগম সাপের কঙ্কালের মালা আবদালী পরাতে চাইলেন। আবদালী সভয়ে পিছিয়ে গেলেন। তারপর হজরৎ বেগম আবদালীকে অধার্মিক বলে খুব গালি দিলেন। আবদালী উত্তরে বললেন—তুই কাফিরের মহব্বতির দেওয়ানা। (পাতা ১৩৯)। হজরৎ বেগম অভিযোগ করলেন—বিশ্বাসরাও এর মাথা কেটে বর্শায় গেঁথে আফ্গানরা উল্লাস করছে। অবশেষে কিছু নাটুকে সংলাপের পর হজরৎ বেগম বিষ মাখান কাঁটা নিজের গলায় বসিয়ে দিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। আবদালী চিৎকার করতে লাগলেন 'আমি হেরে গেলাম' (পাতা ১৪২)

ইতিমধ্যে জাঠরা আক্রমণ করল। আবদালী নাজিবকে হুকুম করলেন—'জলদি ছাউনি তোল। জলদি। কবরস্থান পাণিপথ। কবরস্থান' (পাতা ১৪৪)। নেপথ্যে বালাজীর চিৎকার ভেসে এল 'মারাঠা, মারাঠা।' নাটক শেষে নাট্যকার লিখেছেন—দূরে পাহাড়ের আড়ালে নীলাভ আলোয় দেখা যাইতেছে—গন্না, মধ্যস্থলে নরিন্দর কণ্ঠে তার সঙ্গীত—পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা থেকে একেবারে ভারত ভাগ্যবিধাতা পর্যন্ত। অবশেষে নাটকের সমাপ্তি। নাটকের শেষে শিখ বিদ্রোহের সঙ্কেত রাখা হয়েছে এবং এই ঘটনার সূত্রধরে তারাশঙ্কর তার গন্নাবেগম নামে উপন্যাস রচনা করে নাট্য ঘটনার উপসংহার রচনা করেছেন। যুগবিপ্লব নাটক আবদালীর শিবিরে হজরৎ বেগমের মৃত্যু দিয়েই শেষ হয়েছে। (৩১৬)

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দুই অঙ্কের তুলনায় সামান্য বেশী ইতিহাসপন্থী। কারণ পাণিপথের যুদ্ধের যে বিবরণ জবাহির সিং ও গন্নাবেগমের মুখে দেওয়া হয়েছে তা ইতিহাস অনুসরণ করে। কিন্তু গন্নাবেগম বা রহ্টাবাঈ শেষ পর্যন্ত কাল্পনিক চরিত্রের রূপ গ্রহণ করছে। একমাত্র নাম ছাড়া গন্নাবেগমের জীবনের কিছুই ইতিহাস অনুসারী নয়। গন্নাবেগমের মৃত্যু হয় ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৭৬১ তে নিজের কবর রচনার দৃশ্যটি তাই কাল্পনিক। এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আবদালীর চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। তৎকালীন এশিয়ার প্রাজ্ঞতম যুদ্ধবিদ্যা বিশারদকে নাটকে দেখা যায় না। এ আবদালী এক অর্ধোন্মাদ অত্যাচারী। পাতিয়ালার আলা সিংকে আবদালী 'মহারাজা' উপাধি দেন। এখানেও বছরের ভুল। বাদশাহ বদলের দিন ৩০শে নভেম্বর ১৭৫৯। আবদালীর শিবিরের ঘটনা ১৭৬০ এর জুলাই মাসের আগে নয়। তৃতীয় দৃশ্য সম্পূর্ণ কাল্পনিক মারাঠাদের দিল্লী জয় ২রা আগষ্ট ১৭৬০ এর ঘটনা। অর্থের অভাবে সদাশিবরাও দেওয়ান-ই-খাস থেকে রূপা খুলে নয় লক্ষ মুদ্রা ছাপান। রসদের অভাবে বিরাট মারাঠা বাহিনী এমন নির্জীব হয়ে পড়ে যে বাধ্য হয়ে দিল্লীর বাইরে ছাউনি ফেলা হয়। অনেক চেষ্টা করেও বাদশাহী ধনরত্ন সদাশিব হস্তগত করতে পারেন নি। বাদশাজাদাদের সঙ্গে গোপন আলোচনা ফলবতী হয় না। নাটকে উল্লিখিত মতো বাদশাহ শাহজাহান॰ মারাঠা পক্ষীয় হলে মারাঠাদের বহু সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। মারাঠাদের এই

বিশাল সৈন্যবাহিনীর জন্য মাসে কেবল খাদ্য খরচ বাবদ ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা লাগত।[৩৫] অর্থ সংগ্রহ মারাঠা যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হয়ে দাঁড়াল আর সেই অস্ত্র সংগ্রহের সুব্যবস্থা না থাকায় সদাশিবরাও বিফল হলেন।

চতুর্থ দৃশ্যও প্রক্ষিপ্ত। বালাজীরাও সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে পরম নিশ্চিন্ত ছিলেন। উত্তর ভারতের রাজনীতি বা আবদালীর সাফল্য সম্পর্কে তার কাছে খবর আসত অনেক পরে। পাণিপথের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার বেশ কিছুদিন পরে তার কাছে এই মর্মান্তিক খবর আসে এবং তখন তিনি উত্তর ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। নরিন্দর গোস্বামীও প্রক্ষিপ্ত চরিত্র একথা বার বার বলা হয়েছে। মারাঠাদের অর্থলোলুপতা, রাজপুত বা মুসলমান কাউকেই বাদ দেয়নি। তাই ভরতপুরের রাজা সুরজমল জাঠ শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ালেন। রাজপুতরা মহানন্দে মারাঠা শক্তিক্ষয় দেখলেন। শিখদের সঙ্গে যোগাযোগের কোন চেষ্টাই করা হল না। 'মহারাজা' উপাধি ভূষিত পাতিয়ালার শিখ সর্দার আলাসিং আবদালীর বিরোধিতা করলেন না। অন্যদিকে উজির ইমাদ-উল-মুলুক অর্থাদি সম্পদ নিয়ে পলাতক হলেন। আহম্মদ খাঁ বঙ্গস ফরাক্কাবাদের ভেতর দিয়ে মারাঠাদের অবাধগতির অনুমতি দিলেও নিরপেক্ষ ছিলেন না। অযোধ্যার নবাব সুজাউদৌল্লা আবদালীর পক্ষে যোগদিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করলেন। নাজিব খাঁ তার বিরাট রোহিলা বাহিনী নিয়ে আর মুঘলানী বেগমের পাঞ্জাবী সৈন্যরা আবদালীর পক্ষে যুদ্ধ করেছে। সবাই জানত যে আবদালী কেবল লুঠ করতে ভারতে আসেন। ভারতে বসবাস করে ভারতশাসন তার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মারাঠাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি হলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। এ আশঙ্কা অমূলক ছিলনা। সদাশিবরাওকে হুকুম দেওয়া হয়েছিল যে আবদালীকে শায়েস্তা করে বা তার সঙ্গে সন্ধি করে বাংলা সুবা আক্রমণ করে এককোটি টাকা আনবে। ফেরার পথে কাশী ও এলাহবাদ জেলাদুটি অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে কেড়ে নেবে। আবদালী মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করে, ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, প্রধানত নাজিবখানের জন্যই তিনি যুদ্ধ করতে রাজী হন। বিশেষ সুজাউদৌল্লা তার পক্ষে যোগদানের পর তিনি আশ্বস্ত হন। পাণিপথে মারাঠা পরাজয়ে বাংলাসুবা মারাঠা

অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। বালাজীরাও-এর আকাশচুম্বি অহঙ্কার মারাঠাদের পতনের কারণ হল। সবার ওপর ছিল অনিয়মানুবর্তিতা, স্বপ্রাধান্য ও প্রচণ্ড লুঠের আকুলতা। আবদালীর দুর্ধর্ষ আফগান যোদ্ধারা তুলনায় শতগুণ আজ্ঞাবাহী ও যুদ্ধের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। পাঞ্জাব বা হজরৎ বেগম আবদালীকে দেওয়া বা না দেওয়া সম্পর্কে পেশোয়ার কোনও বক্তব্য থাকতে পারেনা। কারণ তিনি বা তাঁর প্রভু রাজারাম কোনটির মালিক নন। তাছাড়া হজরত বেগম তখন বিবাহিত।

পঞ্চম দৃশ্যে পাণিপথের যুদ্ধের বিবরণ ইতিহাস অনুযায়ী। শেষ ও ষষ্ঠ দৃশ্যে আবদালীর বিবাহদৃশ্য অনৈতিহাসিক কেন তা আগেই বলা হয়েছে। হজরৎ বেগমের আবদালীকে সাপের কঙ্কালের মালা পরাতে যাওয়া সত্যই হাস্যকর, একি হিন্দুবিবাহ যে মালাবদল হবে। বিজিতনেতার মুণ্ডু কেটে বর্ষার ফলকে বিঁধে সকলকে দেখান যদিও ছিল প্রচলিত যুদ্ধরীতি কিন্তু আবদালীর হুকুমে বিশ্বাসরাও-এর মৃতদেহকে কবন্ধ করা হয় নাই। এমনকি সদাশিবরাও-এর মাথা কেটে নিয়ে যাওয়া হলেও কোন কোন মত অনুসারে সুজাউদৌল্লার অনুরোধে আবদালী সেটা আবার মৃত কবন্ধে সেলাই করে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। উভয় মৃতদেহকেই যথাযোগ্য সম্মানে তিনদিন পর সৎকার করা হয়।

পরবর্তীকালে একপত্রে এই দুই বীরের মৃত্যুর জন্য আবদালী দুঃখ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে পেশোয়া বালাজীর কাছে পত্র লেখেন ও সন্ধি ভিক্ষা করেন। আবদালীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এর থেকে বড় উদাহরণ আর নাই। মারাঠাদের ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর। বিশ্বাসরাও আর সদাশিবরাও এর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন যশোবন্তরাও পাবার, পিলাজী যাদবের একপুত্র, টুকোজী সিন্ধিয়া এবং শান্তজী বাঘ। জানকোজী সিন্ধিয়া সাংঘাতিক আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন কিন্তু নাজিবের আদেশে গুপ্তঘাতক তাকে হত্যা করে। অন্তজী মানকেশ্বর ফারুকনগরে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হন। ইব্রাহিম খাঁ গারদী বন্দী হন, তাকেও হত্যা করা হয়। হিন্দুদলে তিনিই ছিলেন এক প্রধান মুসলমান অধিনায়ক। বাজীরাও মস্তানীর পুত্র সামসের বাহাদুর প্রচণ্ড আহত অবস্থাতেও কুম্ভেরে সুরজমল

জাঠের আশ্রয়ে পৌছান। বহুচেষ্টা করেও তার প্রাণ বাঁচান গেল না। একমাত্র মলহররাও হোলকার পলায়ন করতে সক্ষম হন। মহাদাজী সিন্ধিয়া এই যুদ্ধেই আহত হয়ে খঞ্জ হয়ে যান। নানা ফাড়নিশও আহত হন।

পেশোয়া বালাজীরাও এর মস্তিষ্ক বিকৃতির খবর ঐতিহাসিক। পাণিপথের আঘাত তিনি সহ্য করতে পারেন নি, পুণায় ২৩শে জুন ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মাত্র একবছর আগে ২৭শে জুন ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে পৈথানে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন।[৩৬]

পাণিপথের যুদ্ধের বিখ্যাত দিন ১৪ই জানুয়ারী ১৭৬১। যে পাণিপথের যুদ্ধ বর্ণনা নাটক লেখার উদ্দেশ্য সেই পাণিপথের যুদ্ধকে নাটকে দেখান হয় নাই। যুদ্ধের আগে দাক্ষিণাত্যের এক দৃশ্য এবং যুদ্ধের পর তৃতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে যুদ্ধবর্ণনা করে দায সারা হয়েছে এইটা নাটকের আরেক মূল দোষ। যুদ্ধ হবার কারণগুলি যেমন অনুধাবন করা হয় নাই যুদ্ধের প্রধান পাত্র-পাত্রী-গণকেও তেমনি অবহেলা করা হয়েছে। সদাশিবরাও ভাউ হয়েছেন অতি সাধারণ এক পার্শ্বচরিত্র। তাঁর স্ত্রী পার্বতীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে তার সঙ্গেই ছিলেন এবং পূর্ণ অন্তঃস্বত্তা অবস্থায় অশেষ দুঃখভোগ করে পাণিপথ থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হন। তাঁর কোন উল্লেখ নাই। প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণ জানকোজী সিন্ধিয়া বা রণোজী সিন্ধিয়ার দুই বীর পুত্র টুকোজী আর মহাদাজী, বাজীরাও পুত্র সামসের বাহাদুর, কামান অভিজ্ঞ ফরাসীপ্রথায় যুদ্ধবিশারদ ইব্রাহীমখাঁ গারদী, অন্তজী মানকেশ্বর যার বিবরণীতে দিল্লী-দরবারের বহুখবর জানা যায়—পাণিপথ যুদ্ধের বিবরণ তার কাছ থেকে না পাওয়া ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সবথেকে বড় ক্ষতি, নানা ফাড়নিশ প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র নাটকে স্থান পায়নি। সুরজমল জাঠ যিনি পলায়িত সমস্ত মারাঠাদের স্থান দেন এবং যার উপদেশ ছিল যে তাঁর রাজত্ব ভরতপুরে ঘাঁটি স্থাপন করে পাণিপথে জয় ও পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা এই নাটকে স্থান পান নাই। বস্তুত সুরজমলের কথা শুনলে সদাশিবরাওকে এই বিরাট ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হত না। পাণিপথে হারলেও আবার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হতে পারতেন। পরাজয় এমন বিধ্বংশীরূপ নিতে পারত না। গোবিন্দ পন্থ বুন্দেলা যিনি ছিলেন প্রধান রসদ সরবরাহকারী এবং যার নিহত হবার

সঙ্গে সঙ্গে পাণিপথের ভাগ্যনির্ণয় হয়ে গেল, নাটকে নাই। মাত্র ছয়হাজার সৈন্য নিয়ে নারোশঙ্কর দিল্লী রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনিও নাটকে নাই। নাই বলবন্তরাও মেহেন্দেলে, সদাশিবরাও এর প্রধান সহকারী ও মন্ত্রণাদাতা। পাণিপথ শিবিরে ৭ই ডিসেম্বর ১৭৬০ এ তার মৃত্যুর পর সদাশিবরাওকে বুদ্ধি দেবার কোন অন্তরঙ্গ থাকল না।

অন্যপক্ষেও তাই। মারাঠাদের সঙ্গে সম্মুখ সমরে অনিচ্ছুক আবদালীর কোন চিহ্ন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এক নিমেষে তিনি মারাঠা পরিকল্পনা বুঝে যে প্রচণ্ড ব্যূহ রচনা করলেন তার চিহ্নও বিরল। নিজের অর্ধেক সৈন্যকে যুদ্ধের অর্ধেক সময় পূর্ণবিশ্রামে রেখে শেষ মুহুর্তে ক্লান্ত মারাঠা সৈন্যদের ওপর তাদের ছেড়ে দেওয়ার যে প্রচণ্ড যুদ্ধ প্রাজ্ঞতা তাও নাটকের কোথাও বলা হয় নাই। পাণিপথের যুদ্ধের প্রধান কারণ নাজিবউদৌল্লার ধূর্ত্ততা। পাণিপথে আবদালীর জয়ের ফলে যিনি পরবর্তি নয়বছর (১৭৬১ থেকে ১৭৭০) দিল্লীর শুধু মীর বক্সী এবং ফৌজদার নয় হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে বসেন। কোথায় সেই কপট কঠিন রোহিলা চাণক্য। পার্শ্বচরিত্রে যা সৃষ্টি হয়েছে তার নাম হোসেন খাঁ বা বকরুল্লা দিলেও কোন ক্ষতি ছিলনা এ চরিত্র এত অনৈতিহাসিক। সুজাউদৌল্লা, অযোধ্যার নবাবের কোন উল্লেখ নাই—অথচ তিনি সাহায্যে না এলে, আবদালী মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন কি না সন্দেহ। উল্লেখ নাই আবদালী সেনাপতিদের—জাহানখাঁ, শাহ পসন্দ, শাহ ওয়ালি খাঁ বরখহুরদার, আমির বেগ, ডুণ্ডি বা হাফিজ রহমতের। খোঁড়া আহমদ খাঁ বঙ্গস যে শেষ পর্য্যন্ত সসৈন্যে আবদালীর পাশে দাঁড়িয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই ধর্মযুদ্ধে স্বীয় ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তার কোন উল্লেখ নাই। কি চমৎকার চরিত্র হতে পারতেন কাশীরাজ শিবরাও পণ্ডিত—সুজাউদৌল্লার পুরুষানুক্রম কর্মচারী। এই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ আবদালী শিবিরে বসে মারাঠা পতন দেখেছেন আর কেঁদেছেন। মূলত তাঁর রচনা থেকেই পাণিপথের এই যুদ্ধের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর আনুগত্য মুসলমান প্রভুর প্রতি কখনও ম্লান হয় নাই অথচ মারাঠা বীরত্ব তার হৃদয়কে উদ্বেলিত করেছে।[৩৭]

পাণিপথের যুদ্ধের সময় যেমন তেমনি ১৭৫৭-র ঘটনাগুলিতে। প্রধান

চরিত্র দত্তজী সিন্ধিয়ার কোন চিহ্ন নাই। রঘুনাথরাও বালাজী ভ্রাতা বা বিজয়ী মলহররাও বা তার পুত্র খাণ্ডেরাও কোথায়? কোথায় মেবারের মহারাণা বা জয়পুরের রাজা? মারাঠার আকাশচুম্ব লোভ যাদের মারাঠা বিদ্বেষী করে তুলল। কোথায় সেই বিজয়ী বুদ্ধিমান সুচতুর আবদালী, মোগল হারেমের সমস্ত সুন্দরীকে যিনি পারস্যে নিয়ে গেলেন বয়সের কোন বাছবিচার না করে? কোথায় সেই বিখ্যাত মুঘলানীবেগম যার আহ্বানে আবদালী ভারতে অভিযান করলেন? মুঘলানীবেগম এক অপূর্ব চরিত্র। স্বয়ং আবদালী তাকে 'পুত্র' বলে সম্বোধন করতেন উপাধি দিয়েছিলেন 'সুলতান মিরজা।'[৩৮] কোথায় দিল্লীর একনায়ক সুবিখ্যাত নিজামবংশধর ইমাদ-উল-মুলুক যিনি একের পর এক বাদশাহকে হত্যা করে নূতন বাদশাহ করেছেন! কোথায় মোগল দরবারে মারাঠা সাংবাদিক অন্তজী মানকেশ্বর পরে যিনি কলম ছেড়ে অসি ধরে বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষ হলেন! কোথায় মোগল দরবারে মারাঠা প্রতিনিধি বাপুজী হিঙ্গান—পাণিপথে বিশ্বাসরাও এর মৃত দেহ রক্ষা করা হয়েছিল যার জীবনের শেষ সামরিক কর্তব্য![৩৯] ছোট চরিত্রের মধ্যে সিরাজউদৌল্লার কর্মচারী যুগোল কিশোর গোকুলের সন্ন্যাসীদের রক্ষা করার কিছু কৃতিত্ব নিতে পারেন। নাটকে তিনিও নাই।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত চার বছরের ঘটনা নাটকের প্রতিপাদ্য। কিন্তু কি চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে, কি ঘটনার দিক থেকে, নাটকে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই, একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে। উত্তরভারতে বালাজীরাওএর কিছুই করনীয় ছিল না। সদাশিবরাও এর অধীনে বিরাট মারাঠা বাহিনী পাঠান ছাড়া পাণিপথের যুদ্ধের আর কোন দায়িত্ব পেশোয়া পালন করেননি। মিল্লাতের মধ্যে এক অদ্ভুত ধার্মিক দিল্লীর বাদশাহ সৃষ্টি করায় নাটকের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় নাই। ২৯শে নভেম্বর ১৭৫৯ থেকে ১০ই অক্টোবর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় শাহজাহানের বাদশাহী। তিনি ধার্মিক ছিলেন না, মারাঠা বন্ধুও ছিলেন না। কারণ দিল্লীজয়ের পর সদাশিবরাও ভাউ তাকে বিতাড়িত করে দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র আলি গৌহরকে দ্বিতীয় শাহ আলম নামে দিল্লীর বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন। কাজেই মুহি-উল-মিল্লাতের যে চরিত্র নাট্যকার দেখিয়েছেন তা

প্রক্ষিপ্ত। তেমনি প্রক্ষিপ্ত হজরৎ বেগম ও গন্নাবেগমের চরিত্র। নরিন্দর গিরি গোস্বামী আর শাহফানা নামে দুটি কাল্পনিক চরিত্রকে নাটকে এত প্রাধান্য দেবার কারণ পাওয়া যায় না। জবাহির সিং নামে সুরজমল জাঠের এক ছেলে ছিল। সেই সম্ভবত জবাহির ডাকু নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। তার হাত থেকে পালিয়ে গন্নাবেগম ইমাদ উল-মুলককে বিবাহ করেন। তাকে হঠাৎ নায়কের ভূমিকা দিয়ে খলনায়ক করবার কারণ বোঝা যায় না। গন্না বেগমের গান গেয়ে জাতকে উদ্বুদ্ধ করার গল্পও পুরাপুরি কবি কল্পনা—ইতিহাসে তার কোন সমর্থন নাই। হজরৎ বেগম বা নসীবনের দিল্লী থেকে মথুরা যাওয়া, সেখান থেকে পুণা চলে যাওয়া এবং তারপর দিল্লীতে ফিরে চলে আসা অনৈতিহাসিক তো বটেই কিন্তু হাস্যকরও। নাট্যকার ট্রেণ ভ্রমণের যুগে বাস করে ১৮ শতাব্দীর যানবাহনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে বসে আছেন। সন্ন্যাসীদের ভূমিকাতেও স্পষ্ট আনন্দমঠের ছাপ পড়েছে।

রাজনৈতিক, সামাজিক বা ঐতিহাসিক কোন দিক দিয়েই এই নাটকের রচনা ১৭৫৯ থেকে ১৭৬১-র কালকে প্রকাশ করতে পারে নি। নাটকের চরিত্র চিত্রনে বারবার বিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ফুটে উঠেছে। অথচ নাট্যকার স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ ও মারাঠা বিক্রমের ধ্বংস দেখান ছাড়া নাটক রচনার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না এবং নাট্যকারের এ কথা যে পরিপূর্ণ ভাবে সত্য তা সন্দেহ করার কোন অবকাশ নাই। তাহলে কেন এই ভ্রম?

ব্যক্তিগত সামাজিক চিন্তা ভাবনা থেকে বাঙ্গালী মুক্ত নয়। আজও নয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দেও নয়। সুতরাং নিজের অজান্তে যে সব ভাবনা মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে তার প্রকাশ সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সেই রকম ঘটনা ঘটেছে বলে সন্দেহ করা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সূত্র নরিন্দর গিরির পেশোয়া বালাজী বাজীরাওকে 'পণ্ডিত' বলে সম্বোধন করা। একাধিকবার এই সম্বোধন নাটকে আছে। দ্বিতীয় সূত্র অনৈতিহাসিক চরিত্র দুটি, যুদ্ধমান হিন্দু সন্ন্যাসী ও হিন্দুদ্বেষী মুসলমান ফকির। তৃতীয় সূত্র বাদশাজাদী নসীবনের সঙ্গে পেশোয়া পুত্র বিশ্বাসরাও এর প্রেম। এই মিলন সংঘটিত হলে দেশের চরম মঙ্গল সাধিত হবে এবং হিন্দুপৎ পাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হবে বলা হয়েছে। নায়ক ও

নায়িকার বিভিন্ন ভাবে মৃত্যুতে এই পরিকল্পনার ব্যর্থতা বিঘোষিত হচ্ছে। চতুর্থ সূত্র জাঠচাষী জবাহির ও হিন্দু নামধারী মুসলমানের স্ত্রী কবি রত্নাবাঈ বা গন্নাবেগম। এই সূত্রগুলির কোনটির সঙ্গেই ইতিহাসের সম্পর্ক নাই বলেই এইগুলি নাট্যকারের উদ্দেশ্য বোঝার সূত্র হয়েছে।

খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও সাহিত্যিক ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বসে যে পাণিপথের যুদ্ধকে নাটকে রূপায়িত করেছেন তার তারিখ ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭, ১৪ই জানুয়ারী ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ নয়। ভারত বিভাগে নাট্যকার মনের মধ্যে যে দারুণ ব্যথা অনুভব করেছেন নাটকে হয়েছে তারই প্রকাশ। বালাজীরাও তাই পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর প্রতিভূ হয়েছেন। বালাজীকে অনৈতিহাসিক 'পণ্ডিত' সম্বোধনে ডেকে নিজের অজান্তে নাট্যকার আমাদের অবহিত করেছেন। জহরলাল নেহেরু প্রধান মন্ত্রী হযে হিন্দু ধর্মের ধ্বজা বহন করতে অস্বীকার করলেন। নরিন্দর গিরিকে যেমন বালাজী ফিরিয়ে দিলেন, বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ আমি রাষ্ট্রনীতি পরিচালক।..... স্নেহ মমতা এ সবের তৃষ্ণা আমার নাই।' (১২৬-১২৭ পাতা) বালাজীও ধর্মকে রাষ্ট্রনীতির উর্দ্ধে স্থান দিতে চাননা এমনকি মনুষ্যধর্মকেও নয়। নরিন্দর গোস্বামীর মুখ দিয়ে নাট্যকার বলিয়েছেন, 'বিশ্বগ্রাসী কামনা, আকাশস্পর্শী দম্ভ নিয়ে দৃষ্টির সম্মুখে মরীচিকা রচনা করে তুলেছ তুমি। মাথার উপরে তোমার নেমে আসছে উদ্যত বজ্র তোমার ভ্রুক্ষেপ নাই। পায়ের তলায় মাটির মানুষে বুকে জড়িয়ে ধরে তোমাকে রক্ষা করতে চাইলে, কাঁদলে, তুমি শুনলে না।' এ ইতিহাস ১৯৪৭এর ভারত বিভাগের সময়কার ইতিহাস, পাণিপথের যুদ্ধের ইতিহাস নয়। জনসাধারণের ভারত বিভাগ না করার আকুতিকে উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাচারী নেতৃবৃন্দের কীর্তিই প্রতিফলিত হচ্ছে। শত শত হিন্দুর দুঃখ দুর্দশা উপেক্ষা করে এই রাজনৈতিক কর্মকেই নাট্যকার সমালোচনা করেছেন। ধর্মকে কোন স্থান দেওয়া হল না এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে। মরীচিকা সৃষ্টি সেখানে অটুট থাকল। হিন্দু সন্ন্যাসী ও হিন্দুদ্বেষী মুসলমান ফকিরের মধ্যে দিয়ে ভারত ও পাকিস্থানের ধর্মীয় নেতাদের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। স্বভাবতই মুসলমান ফকির স্বার্থপর ও হিংস্ররূপে অঙ্কিত।

স্পষ্ট না হলেও সম্ভবত এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে হিন্দু সন্ন্যাসীর কথা শুনে

জনসাধারণকে ধর্মের ডাকে উদ্বুদ্ধ করলে পাণিপথে পরাজয় ঘটত না অর্থাৎ ভারত বিভাগ হত না।

আমাদের যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনায় যে তার যুগের চিন্তা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। জাতীয় নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা লাভের জন্য এই আপোষ ভারতবাসী সহজ মনে কখনও গ্রহণ করতে পারেনি। জাতির অন্যতম সাহিত্যিকের রচনায় তার প্রতিফলন তাই একান্ত স্বাভাবিক।

তৃতীয় সূত্রটিও চমৎকার। বাদশাজাদী নসীবন ও পেশোয়া পুত্র বিশ্বাসরাও এর মধ্যে প্রেমের আভাষে উচ্চ পর্য্যায়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলন সংকল্প ঘোষিত হচ্ছে। গান্ধী জিন্না, নেহেরু লিয়াকত আলি, এমন কি প্যাটেল আজাদ প্রভৃতির মিলনের চেষ্টা বার বার নানা কারণে ব্যর্থ হয়ে গেছে। নাট্যকার সত্যই পাদশাহীর যে গৌরবময় স্বপ্ন দেখেছেন তা হিন্দুমুসলমান দলপতি ও নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় সফল হতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে নানা পারিপার্শ্বিক কারণে তা সংঘটিত হল না। এমন কি গান্ধীজী শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যর্থতার জন্যই আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। কিন্তু উচ্চ পর্য্যায়ে মিলন সম্ভব না হলেও নিম্নপর্য্যায়ে তা সম্ভব হল। তাই আসছে চতুর্থ সূত্র— জবাহির ও গন্নাবেগমের প্রেম। নাট্যকার স্পটই বলেছেন যে কবি গায়ক চারণদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সেতু গড়া সম্ভব হয়েছে। হয়ত সে সেতু খুব ছোট বা হালকা বা সামান্য কিন্তু কবি সাহিত্যিকরা মিলনের প্রথম রাখী বেঁধে যোগাযোগের সূত্র রচনা করেছেন। নাট্যকার স্বভাবতই কবি গন্নাবেগমের সঙ্গে নিজেকে একিভূত করেছেন তাই গন্নাবেগম হয়েছেন নাট্যকারের প্রতিভূ। তারই মাধ্যমে নাট্যকার নিজের বক্তব্য জনসাধারণকে শুনিয়েছেন। নিজের ঐতিহাসিক চরিত্র ছাড়িয়ে চলে গেছেন তাই গন্না-বেগম—পোষাক পাল্‌টে হয়েছেন রট্টাবাঈ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দেশবাসীকে জনসাধারণকে গান গেয়ে উদ্বুদ্ধ করাই যার জীবনের একমাত্র লক্ষ। গন্না-বেগমের শেষরূপ বিংশ শতাব্দীর চারণ কবি বা স্বদেশ প্রেমিক সাহিত্যিকের সঙ্গে মিশে গেছে।

এইখানে নাট্যকার একটু অসুবিধায় পড়েছেন। একদিকে নাটকের বাঁধাধরা পরিধি, চরিত্র আর চিত্রণের গণ্ডী অন্যদিকে ইতিহাসের শাসন এই

দুই এর মাঝে পড়ে নাট্যকার না পেরেছেন কল্পনার ডানা মেলতে, না পেরেছেন ঐতিহাসিক ঘটনা ও তারিখের পেছনে মাথা নুইয়ে চলতে। বিরাট এক ময়ূর তৈরীর পরিকল্পনায় সৃষ্টি হল উটপাখী। জানোয়ারও নয় পাখীও নয় কিন্তু দুইই। নাম উট, চরিত্র পরিচয় পাখী। 'যুগবিপ্লব' এমনই এক সৃষ্টি। নাটক হিসাবে সাধারণ, ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে অনুল্লেখ্য, কিন্তু সমসাময়িক কালের অর্থাৎ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্ত্তিযুগের ভারতবর্ষের প্রতীক চিত্র হিসাবে সুন্দর এবং তৎকালীন লেখক সাহিত্যিকের মনোভাবের প্রকাশ হিসেবে অনন্য। এই কারণেই নাটকের পরবর্তি ঘটনা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে উপন্যাস গন্নাবেগম। মাধ্যাকর্ষণের ভয় নাই পাখী নির্ভয়ে ডানা মেলেছে।

ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে যুগবিপ্লব হারিয়ে যাবে কালের তরঙ্গে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্ত্তি যুগের সামাজিক ইতিহাসের প্রতিফলন নিয়ে যারা গবেষণা করবেন তাদের কাছে এ নাটক অমূল্য। এই নাটক থেকে জানা যাবে বাংলার এক খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ ভারত বিভাগে যে ব্যাথা অনুভব করেছিলেন তা তার ঐতিহাসিক নাটক রচনার সমস্ত প্রয়াসকে বিফল করে দিয়ে কি ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এই নাটকের মাধ্যমে তিনি যেন মাতৃ অঙ্গচ্ছেদের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। মারাঠা রক্তে মাতৃতর্পণ করেছেন।

উপসংহারে তাই স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে তারাশঙ্করের চিন্তাধারায় স্বাদেশিকতার প্রকাশ যুগবিপ্লব নাটককে মূল্য দিয়েছে। ১৯৫১র ঐতিহাসিক কাল ও তার সমসাময়িক শিল্পী সাহিত্যিকদের মনোভাব এই নাটকে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। মুখ্যত পাণিপথের যুদ্ধের নাটক লেখা হয়েছে বলেই এমন খাঁটি চিত্রটি উঠে এসেছে। ভারত বিভাগ এক বাঙালী সাহিত্যিকের মনে যে ব্যথার কি তরঙ্গ তুলেছিল, যুগবিপ্লব নাটক তার চিরকালের সাক্ষী হয়ে থাকল। নাটক শেষ হয়েছে জনগণমন অধিনায়ক গানের কয়টি ছত্রে—'দারুণ বিপ্লব মাঝে, তব শঙ্খধ্বনী বাজে, সংকট-দুঃখ ত্রাতা, হে ভারত ভাগ্য বিধাতা!' এটাও ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের প্রার্থনা।

সূত্রনির্দেশ

১। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগবিপ্লব, ভূমিকা, ও এই বইএর পরিশিষ্টে 'সাক্ষাৎকার' দ্রষ্টব্য।

২। সাক্ষাৎকার, তারাশঙ্কর, পরিশিষ্ট।

৩। Jadunath Sarkar, Fall of the Mughal Empire
Vol I, p. 289-290

৪। Ibid, p. 290-291

৫। Ibid, p. 42-100

৬। Ibid, p. 220-226

৭। Ibid, p. 256-271

৮। Ibid, p. 302

৯। Ibid, Vol II, p. 8-26

১০। Ibid, Vol II, p. 9-11

১১। Ibid, Vol II, p. 20-22

১২। Ibid, Vol II, p. 20-31

১৩। Ibid, Vol II, p. 110-113
and G. S. Sardesai, New History of the Marathas,
Vol I, p. 257

১৪। Jadunath Sarkar, Op, Cit. Vol II, p. 159

১৫। Ibid, Vol II, p. 193-198

১৬। G. S. Sardesai, Op. Cit. Vol I, p. 193

১৭। Jadunath Sarkar. Op. Cit. Vol, I p. 265

১৮। G. S. Sardesai, Op. Cit. Vol II, p. 393

১৯। Jadunath Sarkar. Op. Cit. Vol II, p. 190

২০। Ibid, Vol II, p. 116-122

২১। Ibid, Vol II, p. 193

২২। Ibid, Vol II, p. 87

২৩। Ibid, Vol I, p. 226, 269-277

২৪। Jadunath Sarkar, Op. Cit. Vol II, p. 133

২৫। Ibid, Vol I, p. 73-100

২৬। G. S. Sardesai, Op. Cit. Vol I, p. 257

২৭। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যুগবিপ্লব, পাতা ১৪

২৮। Jadunath Sarkar, Op. Cit, Vol II, p. 108-109

২৯। Ibid, Vol I, p. 187-189

৩০। Ibid, Vol II, p. 7-11 and 147

৩১। Ibid, Vol II, p. 4-5

৩২। Ibid, Vol II, p. 127-130

৩৩। Majumdar, Dutta, Roychowdhury, Advanced History of India. see : the Chart of the Mughal Emperors in the Appendix.

৩৪। Jadunath Sarkar, Op. Cit. Vol II, p. 30

৩৫। Ibid, Vol II, p. 261-267

৩৬। Ibid, Vol II, p. 359

৩৭। Ibid, Vol II, p. 333-372

৩৮। Ibid, Vol II, p. 65

৩৯। Ibid, Vol II, p. 373-424

সীতারাম

বাদশাহ ঔরঙ্গজীব সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাকে বলতেন তাঁর সাম্রাজ্যের নন্দনকানন। তার কারণ তখন এ দেশে কোন কিছুর অভাব ছিল না। রাজস্ব আদায়ের দিক থেকেও বাংলার প্রচুর সম্পদ মোগল রাজভাণ্ডার পূর্ণ রাখত। দেশের আভ্যন্তরিণ শান্তি ব্যবসা বানিজ্যের সহায়ক ছিল। বাংলা সুবা তাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুবা বলে গণ্য হত।

বাদশাহ ঔরঙ্গজীব ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর অব্যবহিত কয়েক বছর আগে তিনি দেওয়ান করতলব খাঁকে দাক্ষিণাত্যে ডেকে পাঠিয়ে মুর্শিদকুলি খাঁ উপাধি এবং সেই সঙ্গে খেলাত, পতাকা ও কাড়ানাকাড়া উপঢৌকন দিলেন। বাদশাহের অনুমতি নিয়ে করতলবখাঁ নিজের উপাধি অনুসারে মকসুদাবাদের নামকরণ করলেন মুর্শিদাবাদ এবং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সুবার রাজধানী ঢাকা থেকে সেখানেই স্থানান্তরিত হল। এক সরকারি টাঁকশাল স্থাপিত হল। মুর্শিদকুলি খাঁ হলেন বাংলা ও উড়িষ্যার দেওয়ান এবং মুর্শিদাবাদের ফৌজদার।[১] ঢাকা থেকে আসার সময় তার সঙ্গে এলেন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যবসায়ী শেঠ মানিকচাঁদ। রাজস্থানের নাগর শহরের অধিবাসী হীরানন্দ শাহ ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবসা সূত্রে আসেন পাটনায়। তারই উত্তরপুরুষ শেঠ মানিকচাঁদ। ইনিই জগৎশেঠ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মানিকচাঁদ নবাব নিবাসের দুই মাইল দূরে মহিমাপুরে বাসস্থান স্থাপন করলেন।[২]

বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর তার পুত্রগণ জজৌ এর রণক্ষেত্রে শক্তি পরীক্ষা করলেন। অন্য ভাইদের যুদ্ধে নিহত করে মুয়াজ্জিম 'প্রথম বাহাদুর শাহ' নামে সিংহাসনে আরোহন করলেন। (জাহান্দার শাহ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলা সুবা থেকে সরিয়ে দেওয়া হল ১৮ই অক্টোবর ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে। দিয়া আল্লা খাঁ হলেন বাংলার দেওয়ান এবং মুর্শিদাবাদের ফৌজদার এবং সামসির খাঁ হলেন বিহারের দেওয়ান। কয়েকমাস পরে সরবুলন্দ খাঁ বর্দ্ধমান ও আকবর নগরের (রাজমহল) ফৌজদার নিযুক্ত হলেন। বাংলা বিহার উড়িষ্যা বাহাদুরশাহের দ্বিতীয় ও প্রিয়তম পুত্র বাদশাজাদা মহম্মদ

আজম আজিম-উস-সানের সুবাদারীর অন্তর্ভুক্ত করা হল। মুর্শিদকুলি খাঁর পদোন্নতি হল তিনি ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। কিন্তু বাংলা শাসন করা বড় সহজ ব্যাপার হল না। সুবাদারের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় সরবুলন্দ খাঁ দিল্লী ফিরে গেলেন। মুর্শিদাবাদের প্রকাশ্য পথে ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে দিয়া আল্লা খাঁ নিহত হলেন। কাজেই সেই বছরই মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলায় ফিরিয়ে আনা হল। ১৭১০ থেকে আমৃত্যু ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত (৩০শে জুন) একটানা সতের বছর মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলা সুবায় নবাবী করেন এবং দিল্লীর নিত্য বাদশাহ বদলের সুযোগে স্বাধীন ভাবেই বাংলা শাসন করেছেন। জাহান্দার শাহের সঙ্গে যুদ্ধে আজিম-উস-সানের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। মুর্শিদকুলি খাঁ একাধারে বাদশাহের বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং বিচক্ষণ-শাসক ছিলেন। দিল্লীতে বাংলার নিয়মিত রাজস্ব ছিল এক পরম আশ্বাসের বস্তু। মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলা দেশের শাসন ব্যবস্থায় বহুল পরিবর্তন করেন যার ফলে বাদশাহী রাজস্ব এক কোটি তিন লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি হয়ে হল বার্ষিক ১,৪০,৭২,৭২৫ সিক্কা টাকা। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে নূতন রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়ে নূতন এক শ্রেণীর জমিদার বা জামিনদার সৃষ্টি করল। সরকারী রাজস্ব আদায়ের ভার থাকল এই জামিনদারদের ওপর। এই ভাবে খরচ না বাড়িয়ে রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্তের প্রচলন করলেন মুর্শিদকুলি খাঁ।[৩]

মুর্শিদকুলি খাঁ একদিকে যেমন সুপরিকল্পিত রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করলেন অন্যদিকে তেমনি দেশের মধ্যে সুশাসন প্রবর্তন করলেন। অপরাধী-দের এমন ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা হল যে দেশের লোক শাস্তির ভয়ে অপরাধ থেকে বিরত হল। ছোট বড় কারু নিষ্কৃতি ছিল না। জামিনদারদের জন্য সৃষ্টি হল বৈকুণ্ঠ, চোরের শাস্তি হল হস্তকর্তন এবং নারী নিগ্রহের শাস্তি মৃত্যু। কথিত আছে যে এক হিন্দু নারীর উপর অত্যাচার করার জন্য মুর্শিদকুলি খাঁ নিজের একমাত্র পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দেন। পিতৃস্নেহ তাকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারেনি। কিন্তু কর্তব্য তাকে পুত্রহীন করেছে। স্বভাবতই সবাই তাকে 'জেন্দাপীর' আখ্যা দিয়েছিল এবং তার সময় সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থায় দেশের উন্নতি হয়েছে। দেশে শান্তি থাকার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যবসায় লগ্নি হয়েছে।

জনসাধারণ নির্ভয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করতে পারতেন এমনকি রাত্রে অর্গল বন্ধ না করে নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যেতে পারতেন।[৪]

মুর্শিদকুলি খাঁর রাজত্বকালেই রাজা সীতারামের বিচরন। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাসের ঐতিহাসিক ভূমিকায় আচার্য যদুনাথ সরকার সীতারাম রায়ের সেই সময়ের কীর্ত্তিকলাপ নির্দেশ করেছেন। দেখা যায় যে মুর্শিদকুলি খাঁ ও সীতারাম রায় সমসময়িক ব্যক্তি। এদের উভয়ের জীবন নানাসূত্রে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। উভয়ের উত্থান পতনে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। প্রথমে তাই আচার্য যদুনাথ অনুসরণে ইতিহাসের সীতারামের জীবনী আলোচনা করা যাক। সীতারাম রায় ১৬৫৮-৬০ এর মধ্যবর্তী কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে তার জন্ম অসম্ভব নাও হতে পারে। জন্মস্থান সম্ভবত ঢাকা কারণ সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ রায় যখন মধুমতী নদীর অপরপারে হরিহরনগরে নিজের বাসস্থান নির্মাণ করেন তখন সীতারামের বয়স ১০-১২ বৎসর। সেটা ছিল ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দ। উদয়নারায়ণ ভূষনার মুসলমান ফৌজদারের অর্থাৎ একাধারে জেলা শাসক ও স্থানীয় সৈন্যাধ্যক্ষের 'সজোয়াল' অর্থাৎ প্রধান তহশিলদার ও কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি মহম্মদপুরের পার্শ্ববর্তী শ্যামনগরে একটি জোত বন্দোবস্ত করে নেন। সীতারামের পিতৃবংশ মুসলমান শাসকগণের দীর্ঘদিনের বেতনভোগী। উদয়নারায়ণের পিতামহ শ্রীরামদাস বাংলার সুবাদার রাজা মানসিংহের অধীনে রাজস্ব সেরেস্তায় চাকরি করে খাস-বিশ্বাস উপাধি লাভ করেন।[৫]

সীতরাম যুবাকাল থেকেই অশ্বারোহণে এবং অস্ত্রচালনায় দক্ষ। রাজস্ব বিভাগের কায়স্থ আমলার উপযোগী ফারসী ভাষা এবং বৈষ্ণবের প্রিয় সংস্কৃত ভাষাও তিনি অভ্যাস করেন। পিতৃপিতামহের মতোই সীতারাম প্রথমত নবাবের অধীনে রাজস্ব আদায়ের ও হিসাবনিকাশের কাজে নিযুক্ত হন। এই কর্মের সময় মফঃস্বলে দলবদ্ধ ডাকাত ও বিদ্রোহী পাঠান জমিদারদের দমন করে পুরস্কার স্বরূপ বিশাল নলদী পরগণা বাংলার সুবাদারের কাছ থেকে নিজ নামে বন্দোবস্ত করে নেন। আচার্য যদুনাথ লিখেছেন— 'আমলার পুত্র এইরূপ তালুকদার হইলেন, ক্রমে জমিদার হইবেন, রাজা হইবেন, অবশেষে বিদ্রোহী সামন্ত হইবেন, তাহার আয়োজন আরম্ভ হইল।'[৬]

উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ সীতারাম নলদী পরগণা পেয়ে অর্থ ও লোকবলে

বলীয়ান হয়ে উঠলেন। নবাব সরকার থেকে আরো অনেক তালুক বন্দোবস্ত করে নিয়ে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করলেন। খাজনা আদায় ও বিদ্রোহ দমনের নাম করে বহু ছোট ছোট জমিদারদের পদানত অথবা তাদের জমিদারী লুঠ করতে লাগলেন। ফলে তার ক্ষমতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। তৎকালীন বাংলার সুবাদার গ্রন্থকীট শান্তিপ্রিয় বৃদ্ধ নবাব ইব্রাহীম খাঁ অরাজক অঞ্চলে শান্তি স্থাপিত হয়েছে খবর পেয়ে আর কিছু খাজনা পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতেন। এরই মাঝে (১৬৮৯ থেকে ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়) সীতারাম সুবাদারকে সন্তুষ্ট করে এবং তার সুপারিশে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি ও জমিদারী ফার্মান লাভ করেছেন। বাদশাহ ঔরঙ্গজীব তখন দাক্ষিণাত্যে—সীতারাম স্বয়ং দিল্লী গিয়ে সেখানে রাজমন্ত্রীদের উৎকোচে বশীভূত করে উপাধি ও ফারমান লাভ করেন। এবার এই নূতন পদমর্য্যাদার উপযুক্ত রাজধানী স্থাপনের প্রয়োজন। তাঁর পৈতৃক পুরাতন কাছারী সূর্য্যাকুণ্ড গ্রাম এবং পৈতৃক বাসস্থান হরিহরনগর এই দুইটির মাঝে বাগজানি গ্রামে নূতন সহর গড়ে উঠল নাম হল মহম্মদপুর।[৭]

নানারকমের লোক এল তাঁর পতাকাতলে। প্রথম দুইজন বড় বন্ধু, 'রঘুরাম (মতান্তরে রামরূপ) ঘোষ, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ, বীর পালোয়ান। সম্ভবত বিশাল চেহারার জন্য মেনাহাতি নামে পরিচিত হলেন। দ্বিতীয় জন মুনিরাম রায় বঙ্গজ কায়স্থ উকিল ও মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। এই দুইজনেই যথাক্রমে সীতারাম রায়ের সেনাপতি ও মন্ত্রী ছিলেন বলা চলতে পারে। তাছাড়া রাজস্ব বিভাগের দেখা-শোনা করার জন্য ছিলেন দেওয়ান যদুনাথ গাঙ্গুলী উপাধি মজুমদার। সেনা বিভাগের কর্ত্তা হলেন ভূতপূর্ব ডাকাত সর্দার বখতীওর খাঁ, তার অধীনে ছিলেন আমল বেগ মুঘল, রূপচাঁদ ঢালী, ফকরে মাছকাটা অর্থাৎ নমঃশূদ্র শিকারী। এছাড়া মোচড়া সিংহ, গাবুরডলন প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়।[৮]

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা সীতারাম রায় যে পরম নির্বিঘ্নে রাজ্য শাসন করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ণযৌবনে এই নিশ্চিন্ততাই সীতারামকে বিলাসের মোহপঙ্কে নিমজ্জিত করে। (এই সময় সীতারামের বয়স ২৯ থেকে ৩২ বৎসরের মধ্যে।) ১৬৯০ থেকে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাংলায় প্রচণ্ড অরাজকতা বিরাজ করে। শোভা সিং ও রহিম খাঁর বিদ্রোহ জাগ্রত

বিভীষিকার মতো বাংলাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। অবশেষে মহম্মদ হাদি, সুবাদার শাহজাদা মহম্মদ আজম, আজিম-উস-সানের দেওয়ান নিযুক্ত হলেন ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে। মহম্মদ হাদির উপাধি হল করতলব খাঁ (পরে মুর্শিদকুলিখাঁ)। অপূর্ব দৃঢ়তায বিদ্রোহ দমন হল। রহিম খাঁ যুদ্ধে নিহত হলেন, অপঘাতে মৃত্যু হল শোভা সিং এর। শোভাসিং এর দলের নেতৃত্ব এল মহাসিং-এর ওপর। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ হবার আগেই বাংলার বুক থেকে বিদ্রোহীর দুঃস্বপ্ন মুছে গেল।[৭]

বাংলাদেশের অরাজকতার সময় সীতারাম রায়ের রাজত্বে সুশাসন ছিল মনে হয় কারণ বিদ্রোহীরা অর্থের লোভেও রাজা সীতারামের এলাকায় ঢোকেনি। এই রাজ্যের পরিধি তখন বেশ বৃহৎ। উত্তর-সীমা পাবনা, দক্ষিণ-সীমা ভৈরব নদ, পূর্বে মধুমতীর ওপারে তিলিহাটি পরগণা ও পশ্চিমে মামুদশাহী পরগণা পর্য্যন্ত। সবল রাজ্য না হলে শোভাসিংএর হাত থেকে বাঁচা মুস্কিল কারণ ঢাকা, মকসুদাবাদ ও রাজমহল সর্বত্র শোভাসিংএর পদচিহ্ন পড়েছে। এই সময়ের তিনটি মন্দির ফলক বা ফলকের লিপির নকল পাওয়া গেছে তারিখ ১৬৯৯, ১৭০৩ ও ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ। সবগুলিতেই রাজা সীতা-রামের নাম লেখা। অনুমান করা অন্যায় হবেনা যে মোগলবাংলার অরা-জকতা সীতারামের রাজ্য স্পর্শ করে নাই। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় সীতারাম অবাধে রাজ্যবিস্তার করে নিষ্কণ্টক রাজ্যসুখ ভোগ করেন। শান্তির আশায় তার রাজত্বে দলে দলে লোক বসবাস করতে এল। সুতরাং ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সীতারামের জীবন (বয়স তখন ৪৩ থেকে ৪৬ বৎসরের মধ্যে) সুখে কেটেছে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মোগল সাম্রাজ্যে অশান্তি ও অত্যা-চারের সুযোগে সীতারামের উত্থান ও ক্ষমতালাভ অত্যন্ত সহজেই হতে পেরেছে। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে গোলমাল সুরু হল।

১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী স্থানান্তরিত হল মকসুদাবাদে নূতন নামকরণ হল মুর্শিদাবাদ। স্থাপিত হল টাঁকশাল তার দারোগা নিযুক্ত হলেন মুর্শিদ-কুলি খাঁর বিশ্বস্ত অনুচর রামজীবন আমলা। ভূষণার কাছাকাছি নবাবের অবস্থিতি স্বভাবতই সীতারামকে সাবধান করল। মাটির প্রাচীর দিয়ে মহম্মদপুরকে দুর্গে রূপান্তর এই সময় অথবা শোভাসিংএর আক্রমণের প্রস্তুতি হিসাবেই হওয়া সম্ভব। মুর্শিদকুলি খাঁ সীতারাম সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং

তার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হলেন। ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হল (১৭০৭)। জজো রণক্ষেত্রে বিজয়ী হয়ে বাহাদুর শাহ হলেন বাদশাহ। মুর্শিদকুলি খাঁ বদলি হলেন দাক্ষিণাত্যে। তিন-চার বছরে বাংলার অরাজকতা চরমে উঠল। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ আবার বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হলেন।[10]

এই অরাজকতার মাঝেই সীতারাম রায় বিনাবাধায় রাজ্যবিস্তারের সুযোগ পেলেন। ১৬৯৯ থেকে ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। এই উন্নতির ফলেই অনেক সঙ্গী সহায় এসে গেল। নানারকমের লোক নব প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করল। রাজা সীতারাম রায়ের বিলাসিতা চরমে উঠল।[11]

যতদিন বাহাদুর শাহ বাদশাহ ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ কর্ত্তব্যকর্মের বেশী কিছু করলেন না। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হলে তার চার জীবিতপুত্র সিংহাসনের জন্য যুদ্ধে মেতে উঠল। অবশেষে বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠপুত্র জাহান্দার শাহ জয়ী হয়ে বাদশাহ হলেন।

ভূষণার ফৌজদার আবুতুরাব সীতারামের আদেশে নিহত হলেন ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে। অতি নৃশংস এই হত্যা। জীবন্ত অবস্থায় তার দেহের চামড়া খুলে নেওয়া হয়েছিল। এই খবর পেয়ে মুর্শিদকুলি খাঁ সীতারামকে দমন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নিজ আত্মীয় বকথ্‌স আলি খাঁকে ভূষণার নূতন ফৌজদার করা হল। এই পদে অভিষিক্ত হওয়া মাত্র তিনি সীতারাম দমনে সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। পার্শ্ববর্ত্তী সব জমিদারদের সীতারামের বিরুদ্ধে এই অভিযানে সাহায্য করবার হুকুম জারি করা হল। হুকুমের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। চারপাশের জমিদাররা সীতারামের ভয়ে এতই ভীত হয়েছিলেন যে সানন্দে সীতারামের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে আগিয়ে এলেন। সীতারামের তখন দুরদৃষ্ট—তিনি বিলাসে মগ্ন, সেনাপতি মেনাহাতি অতর্কিতভাবে স্নানের সময় নিহত হলেন। অরক্ষিত দুর্গ, ছত্রভঙ্গ রাজধানী, প্রায় বিনাযুদ্ধে মহম্মদপুরের পতন হল। সীতারামের পরিবারের অনেকেই পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। সীতারামের এই পরাজয়ে প্রধান গোতা রামজীবন আমলা (নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সীতারামকে বন্দী করে তার কর্মচারী দয়ারাম রায়ের (দিঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা)

হেফাজতে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দিলেন। মুর্শিদাবাদ ও ভূষণার চৌরাস্তার মোড়ে সীতারামের নৃশংস প্রাণদণ্ডের বিবরণ সালিমুল্লার তারিখ-ই—বাংলাতে এবং পরে ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে লেখা হয়েছে।[১২] সদ্যমৃত গরুর চামড়ায় মুড়িযে সীতারামকে শূলে দেওয়া হয় তারপর সেই বীভৎস মৃতদেহ গাছে টাঙ্গিয়ে রাখা হয়। কয়েকদিন পর কঙ্কালে রূপান্তরিত হলেন একদা পরাক্রান্ত রাজা সীতারাম।[১৩] যদুনাথ লিখেছেন 'তাঁহার পরাজয়ের তারিখ ফেব্রুয়ারী ১৭১৪ এবং মৃত্যু ওই বছরের অক্টোবর মাস।' সীতারামের পরিবার হুগলিতে ধরা পড়েন ৫ মার্চ ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে। ফৌজদার কয়েদ করেন সীতারামের দুইপুত্র (নাতিও হতে পারে) এক কন্যা (নাতনি হতে পারে) পরিবারস্থ ছয়জন মহিলা এবং চারজন ভৃত্য। পরবর্ত্তীকালে এদের আর কোন খবর পাওয়া যায় না।[১৪] মৃত্যুকালে রাজা সীতারাম রায়ের বয়স ৫৩ থেকে ৫৬ বছরের মধ্যে।

দুইটি ঘটনা মুর্শিদকুলি খাঁকে সাহায্য করেছে। প্রথম দিল্লীর অরাজকতা এবং দ্বিতীয় ফারুকশিয়রের সিংহাসন লাভ। মুর্শিদকুলি খাঁ ক্রমে মুর্শিদাবাদকে কেন্দ্রকরে বাংলাসুবায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেন। সীতারামের সম্পত্তি ভাগকরে নিলেন রামজীবন আমলা, দয়ারাম রায় প্রভৃতি। সৃষ্ঠ হল নূতন জমিদার—নাটোর, দিঘাপতিয়া, নলডাঙ্গা, নড়াইল ইত্যাদি।[১৫] সীতারামের সুশাসন বা বিলাসব্যসনের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকল না।

অনেক সময় আবুতোরাবের নিহত হবার ঘটনাকে হালকা করে দেখাবার প্রবণতা পাওয়া গেছে এবং সীতারামের নৃশংস হত্যা লঘু পাপে গুরুদণ্ডের নিদর্শন হিসাবে দেখান হয়েছে। এটা ঠিক নয়। সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। আবুতোরাবের মৃত্যু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কতটা গুরুত্বপূর্ণ অনুমান করা যাবে যদি মনে রাখা যায় যে তৎকালীন বাংলা দেশ (বাংলা ও উড়িষ্যা এবং বিহারের কিছু অংশ) তেরটি চাকলায় বিভক্ত ছিল। চাকলাগুলির নাম বন্দর বালাসোর, হিজলী, মুর্শিদাবাদ (বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের অংশ শুদ্ধ এই চাকলার অন্তর্গত), বর্দ্ধমান (বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের অংশ এই চাকলার অন্তর্গত), হুগলী বা সাতগাঁও, ভূষণা, যশোর, আকবরনগর (রাজমহল), ঘোড়াঘাট, কুড়িবাড়ী (রংপুর ?), জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা), শ্রীহট্ট ও ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)। প্রত্যেক চাকলায় একজন ফৌজদার থাকিতেন। সুতরাং ফৌজদার পদ-

মর্য্যাদায় দেওয়ানের পরেই বলা চলে। ফৌজদারকে হত্যা করে সীতারাম বিদ্রোহী বলেই গণ্য হলেন তাই তার মৃত্যু অমন ভয়াবহ। মুর্শিদকুলি খাঁ সীতারামের নৃশংস প্রাণদণ্ডের মধ্যে দিয়ে যেন দেশবাসীকে বাদশাহী কর্মচারী হত্যানুষ্ঠান আর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সাবধান করে দিলেন। সীতারামের প্রাণদণ্ডের পর বাংলা সুবা শাসনে মুর্শিদকুলি খাঁর আর কোন অসুবিধা হয় নি। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হল, ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার হল বাংলা সুবা ক্রমে এক সার্বভৌম রাষ্ট্রের রূপ নিল। মুর্শিদকুলি খাঁকে সুবাদার নিযুক্ত করার সুপারিশ নিয়ে স্বয়ং শেঠ মানিকচাঁদ দিল্লী যাতায়াত করেন। তারই প্রতিদান স্বরূপ ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী টাঁকশাল তুলে দিয়ে শেঠ মানিকচাঁদের বংশধর শেঠ ফতেচাঁদের ওপর দেওয়া হল টাকা ছাপাবার একচ্ছত্র অধিকার। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে শেঠ মানিকচাঁদের মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও পালিত পুত্র শেঠ ফতেচাঁদ পিতার আরব্ধ কাজ শেষ করেন। শেঠ ফতেচাঁদই দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে 'জগৎ শেঠ' উপাধি পান ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে। তদবধি এই বংশের বড় ছেলেরা এই উপাধি গ্রহণ করতেন। এ বছরেই মুর্শিদকুলি খাঁ রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত চালু করে বাংলা দেশের জমি বন্দোবস্তের আমূল সংস্কার করেন। এই সময় থেকে প্রচলিত জমিদারী বা জামিনদারী ব্যবস্থা সুসংস্কৃত হয়েছে বলা চলতে পারে। আগে সুবা বাংলায় ১৩৫০টি পরগণা ছিল, মুর্শিদকুলি খাঁ তাকে ১৬৬৯ পরগণায় বিভক্ত করেন। তার সময়ে চাকলার বিভাগ ও প্রতি চাকলার সুনির্দিষ্ট জমা ও বার্ষিক হস্তবুদ জমা কামেল তুমারী নামে অভিহিত হয়। বাংলার জায়গীর সমেত মোট জমার পরিমাণ ছিল ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে দক্ষতায় আর কোন শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খাঁর কাছাকাছিও আসতে পারেন না। সত্যি তিনি ছিলেন 'জেন্দাপীর' বা মহাপুরুষ। তাঁর মৃত্যুতে হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই অনাথ হয়েছে।[১৬]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সীতারাম' উপন্যাসে ঐতিহাসিক সীতারাম সম্পর্কে সব আলোচনা এক কথাতেই শেষ করেন। বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন 'সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে। যাঁহারা সীতারামের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা Westland সাহেব কৃত

যশোহরের বৃত্তান্ত এবং Stewert সাহেব কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিবেন।' নিজে বঙ্কিমচন্দ্র যে কাল্পনিক উপন্যাস রচনা করেছেন, এই ভূমিকাতে তাই স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বঙ্কিমের সীতারাম থেকে নাট্যকৃত রূপকে ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক সীতারাম সৃষ্টির চেষ্টা না করলেও সীতারামের জীবনের মূল ঘটনাগুলি বিকৃত করেন নাই। সীতারামের উত্থান, রাজ্যস্থাপন, উপাধি, ফার্মান ও ক্ষমতালাভ, বিলাসিতায় অধঃপতন, আবুতোরাবের হত্যা ও পতন মোটামুটি ভাবে ইতিহাসের কাঠামো অনুযায়ী হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের মধ্যে এক মহান দেশপ্রেমী প্রজারঞ্জক নৃপতি সৃষ্টি করেছেন বলেই তার বিলাস ও অধঃপতনের কারণ দেবার চেষ্টা করেছেন। তখনই এসেছে শ্রী নন্দা ও রমার কাহিনী। গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতার ভিতর দিয়ে তিনি বাঙ্গালী চরিত্রের এক দুর্বল দিকই সকলের সমক্ষে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনায় যদুনাথ গাঙ্গুলী হয়েছেন চন্দ্রচূর, রঘুরাম ঘোষ হয়েছেন মৃন্ময়। সব মিলে সীতারামের চরিত্র ও কীর্তি ইতিহাসের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে নাই।

নাটকের সীতারাম কিন্তু যথেচ্ছ বিচরণ করেছে। অধিকাংশ নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের নাট্যকৃত হলেও নাট্যকারগণ নিজস্ব জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেচনা অনুসারে তাদের নাটকে নানা চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ করেছেন এবং নিজ নিজ মতে তাদের সীতারামকে চালনা করেছেন। ফলে এই নাটকগুলি না হয়েছে বঙ্কিমের সীতারামের সার্থক নাটরূপ না হয়েছে ঐতিহাসিক সীতারামের প্রতিচ্ছবি। অথচ অনেকগুলি সীতারাম নাটককে ঐতিহাসিক নাটক আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সীতারামের প্রথম নাট্যরূপদাতা কোন কোন মতে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। এই নাটকটি বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসে অভিনীত হয়। কিন্তু এই নাটকটি লুপ্ত। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে সীতারামের নাট্যরূপ গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনার তালিকার সব শেষে স্থান পেয়েছে।[১৭] ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ অক্টোবর বসুমতী কার্য্যালয় সীতারামের এই নাট্যরূপ প্রকাশিত করেন। আখ্যাপত্রে 'অতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক নাট্যকারে গ্রথিত' কথাটি মুদ্রিত আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবারের চিঠিতে

(আশ্বিন ১৩৫২) প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এইটাই গিরিশচন্দ্রের সীতারাম 'অতুলকৃষ্ণ মিত্র' নাম ভুলক্রমে লেখা হয়েছে।[১৮] সীতারাম নাটক কিন্তু গিরিশ গ্রন্থাবলীতে অন্তর্গত হয় নাই। বরঞ্চ সীতারাম নাটকের গিরিশচন্দ্র কৃত গানগুলিমাত্র অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এবং ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের ১০ম খণ্ডে "সীতারাম গীতিকা" নামে অলংকৃত হয়েছে। সর্ব-সমেত ১৫খানি গান আছে। এই গানগুলি থেকে মোটামুটিভাবে নাটকের চরিত্র সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা করা যায়। প্রথম গান মিশ্র ঠাকুরের (বাঙ্গালি—কারফা) 'মেরে রামা হো! বিভীষণ! চিত বাঁধ রহো। রাক খাসা তু, না হো কুলিন্‌মে, কপি হীনমতি বনমে ঘুমে, রাম কহো ভাই রাম কহো ইত্যাদি। দ্বিতীয় গান শ্রী ও চন্দ্রচূড় কর্তৃক গীত (সিন্ধু মিশ্র—একতালা) ভীমা রণরঙ্গনী মা। মুক্তকেশী ষোড়শী উমা, হর-রঙ্গিনী শ্যামা।' ইত্যাদি। তৃতীয় গান শ্রীর (সিন্ধু ভৈরবী—একতালা) 'তারে ছেড়ে এসেছি। সুখসাধে কেন সাধে জলাঞ্জলি দিয়েছি।' চতুর্থ গান গাইছেন চাঁদশাহ ফকির (পিলু বারোয়া—ঠুংরী)। পঞ্চম গান জয়ন্তীর (ভৈরবী—তেওরা) উদার অম্বর, শূন্য সাগর, শূন্যে মিলাও প্রাণ।' ইতিমধ্যে নাটক সম্ভবত খুব গম্ভীররূপ ধারণ করেছে তাই দর্শক মনোরঞ্জন করতে ষষ্ঠ গান গাইছেন উড়েনীগণ (ঝিঁঝিট মিশ্র—খেমটা)। সপ্তম গান জয়ন্তীর (সুরাট-মিশ্র—পটতাল)—'বনরাজী নীল সুনীল অম্বর, নীল নীলাচল নীল জলধর, নীল কলেবর জগন্নাথ।' অষ্টম গান গাইছেন গঙ্গাধর স্বামী (যোগিয়া মিশ্র—ত্রিতালী)। নবম ও দশম গান আবার শ্রীর। 'আমি সন্ন্যাসিনী, রাজরাণী নহি আমি, শূন্যমনা উন্মাদিনী' (মূলতান মিশ্র—ত্রিতালী) ও 'বিহগ-বিহগী অনুরাগী মাধুরী মোহিত তুলিছে তান' (বেহাগ মিশ্র—ঠুংরী)। একাদশ গান গাইছেন জয়ন্তী (ইমন কল্যাণ —তালফেরতা)। দ্বাদশ গান নাগরিকাগণের 'আমোদ তুফান চলে কানে কান। ডোবে ওঠে চলে হেলেদুলে ভেসে প্রাণ।' (খাম্বাজ মিশ্র—ঠুংরী)। ত্রয়োদশ গান গাইছেন নাগরিকগণ—'নয়ন ভরি হেরি রাজা-রাণী (ঝিঁঝিট মিশ্র—খেমটা) মাঝে রয়েছে 'জয় সীতারাম, বল অভিরাম, হিন্দুস্থান পাবে প্রাণ' (খাম্বাজ মিশ্র—ঠুংরী)। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ গান শ্রী ও জয়ন্তীর দ্বৈত সঙ্গীত। 'বীর চল সমরে' (মল্লার—ত্রিতালী) ও 'ত্রিপুরান্তকারী, ভৈরব শূল-ধারী,ভুবন সংহার কারণ হে' (পঞ্চমবাহার—ত্রিতালী)। সীতারাম লক্ষ্মী-

নারায়ণ শিলা সেবী ছিলেন সুতরাং বাংলা দেশের তৎকালীন আবহাওয়া অনুযায়ী তার বৈষ্ণব হওয়াই স্বাভাবিক। অন্তত শৈব বা কালীসাধনা তিনি কখন করেছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গান রচনার সময় সম্ভবত এই তথ্যগুলি গিরিশ চন্দ্র ঘোষের অগোচরে ছিল।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশ চন্দ্র অভিনীত সীতারাম সুরু হয়। গিরিশচন্দ্র বা অতুল কৃষ্ণ যিনিই নাট্যরূপ দিয়ে থাকুন এইটাই সম্ভবত প্রথম সুপরিচিত নাটক "সীতারাম"। এই নাটকের বিষয়ে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।[১৯] তবে "সীতারাম" নাটক নিয়ে গিরিশচন্দ্র ও অমরেন্দ্র দত্তের বিরোধ নাট্য ইতিহাসে স্থায়ী আসন নিয়েছে। ঘটনার সুরু হল, যখন, 'থিয়েটার আগমন-কালে বিডনষ্ট্রীটে এক বাড়ীর দেওয়ালে একটি প্ল্যাকার্ড অমরেন্দ্র নাথের নজরে পড়িল—মিনার্ভায় সীতারাম। থিয়েটারে আসিয়াই তিনি সীতারাম উপন্যাস আনাইয়া, সেই রাত্রির মধ্যেই তাহাকে নাটকাকারে পরিবর্তন করিয়া ফেলিলেন ও মাত্র এক সপ্তাহব্যাপী মহলার পর ৩০শে জুন তারিখে সীতারামের প্রথম অভিনয় হইল। সে রজনীর পাত্রপাত্রীগণ :—

সীতারাম—অমরেন্দ্র নাথ দত্ত, গঙ্গারাম—মহেন্দ্রলাল বসু, চন্দ্রচূড়—হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, চাঁদশা—নটবর চৌধুরী, ফকির—জীবন কৃষ্ণ সেন, মৃন্ময় অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, গঙ্গাধর স্বামী—পান্নালাল সরকার, নবীন ভাণ্ডারী ও শ্যামচাঁদ—অক্ষয় কুমার চক্রবর্ত্তী, রামচাঁদ—অহীন্দ্রনাথ দে, শ্রী—কুসুমকুমারী, নন্দা—রানীসুন্দরী, রমা—হরিসুন্দরী, (ব্ল্যাকী) জয়ন্তী—ভূষণ কুমারী, মুরলা—হরিদাসী (গুলফম)।

ইহার পূর্ব সপ্তাহে গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নামভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া মিনার্ভায় সীতারাম খুলিয়াছেন। অমরেন্দ্র নাথ সদর্পে ঘোষণা করিলেন—ক্লাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবা, স্থবির নহে।' দুই নটের মধ্যে হ্যাণ্ডবিল মাধ্যমে তুমুল বিতণ্ডা সুরু হয়ে গেল। কবিতা লেখা হল—

> অশ্বপৃষ্ঠে সীতারাম—কি অপূর্ব শোভা !
> ছুটে যেন রোধিবারে—গিরিশ প্রতিভা !
> নটগুরু সনে রণ ! দম্ভে করে আস্ফালন
> ক্লাসিকের সীতারাম বলদৃপ্ত যুবা।[২০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গিরিশের পরবর্তী সীতারামের নাট্যরূপদাতা

হলেন অমরেন্দ্র নাথ দত্ত। কিন্তু বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে অমরেন্দ্র নাথের পুস্তক তালিকায় "সীতারাম" নাট্যরূপের উল্লেখ নাই।[২১] বিভিন্ন থিয়েটারে অভিনয়ের তালিকা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখান থেকে এই নাটক বিষয়ে কোন খবর জানা যায় না।

'মিনার্ভায গিরিশচন্দ্র বঙ্কিকচন্দ্রের সীতারামের নূতন রূপ দিয়া এবং অনেক নূতন নূতন ভাব অবতারনা করিয়া নিজে সীতারামের ভূমিকা গ্রহণ করেন। (২৩শে জুন ১৯০০) দানী বাবু গঙ্গারামের এবং তিনকড়ি শ্রীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।'..... 'কোকিলকণ্ঠী সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী সুশীলাসুন্দরী সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর ভূমিকায়' প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করেন।' মিনার্ভায় দানীবাবু ও ক্লাসিকে মহেন্দ্রবাবুর গঙ্গারামের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে। ক্লাসিকে সীতারামরূপী অমরেন্দ্রনাথ ঘোড়ায় চড়ে স্টেজে ঢুকতেন। তার অশ্বারোহী সীতারামের আলোকচিত্র প্রচারপত্রে বিলি করা হত।[২২] ক্লাসিকে সীতারাম উপর্য্যপরি সাত শনিবার অভিনীত হয়। মিনার্ভায় ততোধিক বা সামান্য কয়েকরাত্রি বেশী অভিনীত হয়। প্রথম তিন রাত্রির পর চুনিলাল দেব গিরিশচন্দ্রের সীতারামের ভূমিকায অভিনয় করেন।[২৩]

১৯শে জুলাই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা অমরেন্দ্র নাথের সীতারামের এক বৃহৎ সমালোচনা প্রকাশ করে'। 'The original, admittently does not lend itself to the purposes of the stage, and liberties have therefore been taken with a view to rendering the text not only stage worthy, but also considering the present day taste, audiance worthy. Expansion of characaters is one of the things only, it is necessary, when the original is a synthetic or suggestive kind, The characters of Sitaram and Chandra Chura have therfore gained by expansion but creation is another story. The characters of Jiban Bhandari his worthy spouse and his tiny son as introduced in a scene set apart for them as also those of Ramchand anc Shamchand are evidently meant to represent comic

relief, the well balanced audience owe the dramatiser much thanks.

ইণ্ডিয়ান মিরর স্পষ্টই লিখেছেন নাট্যরূপদাতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বয়ং। এ পত্রিকার বিবরণী থেকে জানা যায় যে নাটকের শেষে অমরেন্দ্রনাথ বঙ্কিম প্রদর্শিত পথে নাটক শেষ করেননি। অমরেন্দ্রনাথের সীতারাম দুই স্ত্রীর সঙ্গে দুর্গপ্রাকার হতে নদীতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতেন। সীতারাম চরিত্র সম্পর্কে পত্রিকা লিখেছেন 'Sitaram, is in the hands of the dramatiser, who ranges over the whole gamut of feelings with exceptional skill'.

গিরিশ-অমরেন্দ্র বিরোধ চলতে থাকে। কবিতা, গান, কার্টুন, গালাগালি ব্যঙ্গচিত্র এমনকি নাটকও রচিত হয়। পরবৎসর ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র সপুত্র অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগদান করলে এই বিরোধ মিটে যায়।

সীতারামের এই দুই নাট্যরূপ যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে তার বিবরণ দেওয়া হল কিন্তু এই নাটক দুইটির কোনটি পাঠ করার সুযোগ না পাওয়ায় নাটকের ঐতিহাসিকতা বিচার সম্ভব হল না। ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার বিবরণ থেকে মনে হয় অমরেন্দ্রনাথ নিজ ইচ্ছ মত নাট্যরূপ দিয়েছেন। এই দুটি নাটকের কোনটি ইতিহাস আশ্রয় করে রচিত হয়েছে একথা মনে করার কোন কারণ নাই।

পরবর্ত্তী যুগে সীতারামকে নায়ক করে তিনটি নাটক পাওয়া গেছে। প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'ভাগ্যচক্র' নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। নাটকের প্রকাশ-কাল ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ (১৩১৯-২০) বলে অভিহিত হয়েছে।[২৪] রচনা কাল ১৩১৬ খ্রীষ্টাব্দ। নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে নাট্যকার জানাচ্ছেন যে দুর্গেশনন্দিনী ও রাজসিংহ উপন্যাস দুইটি তিনি নাটকে রূপান্তরিত করেন। সীতারাম উপন্যাস তাঁর মোটেই পছন্দ হয় নাই। ভূমিকায় (পরিচয়) তাই তিনি অভিযোগ করেছেন—'সীতারাম রায়ের সম্বন্ধে অনেক কপোল কল্পনা বঙ্গ সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। রূপকথার কাঙ্গালী বাঙ্গালী পাঠক তাহা সত্য বলিয়া পরিতৃপ্তির সহিত পরিপাক করিতে পারে, কিন্তু সেইসব কলঙ্ককাহিনী সীতারামের প্রেতাত্মার প্রীতি-তর্পণের কার্য্য করে নাই……অতীত গৌরবকে এমন করিয়া ভিখারী সাজাইবার

অধিকার কোন দেশের কোন ভাষা ব্যবসায়ীর নাই।' কাজেই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি এক 'ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক' সৃষ্টি করলেন। 'পরিচয়ে' লিখেছেন 'কিঞ্চিদধিক দুইশত বৎসর পূর্বের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই নাটকখানি রচনা করি। ঘটনাটি এই—হরিহরপুরে সীতারাম রায় নামে একজন ভূস্বামী বাস করিতেন। সীতারাম রায় পরে হরিহরপুর হইতে মহম্মদপুর বা ভূষণায় বাসস্থান উঠাইয়া লন। হরিহরপুর ও ভূষণার ভৌগলিক অবস্থান এবং সীতারাম রায় সম্পর্কীয় বিস্তৃত বিবরণ যাঁহারা অবগত নন, তাঁহারা ইতিহাস হইতে তাহা সংগ্রহ করিবেন।' অতি সাধু প্রস্তাব। কিন্তু নাট্যকার নিজেও যদি সেটি একটু পাঠ করতেন তাহলে ভূষণাকে মহম্মদপুর বলতেন না। নাট্যকারের ভূমিকা অনুসরণ করা যাক। 'আমি নাটকের অন্যান্য ভাগের সহিত পাঠকের একটা মোটামুটি পরিচয় করাইতে যাইতেছি মাত্র। সীতারাম রায়ের সমসাময়িক ভূষণার ফৌজদার—আবু তোরাপ এবং বাঙলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ। এই সময় নরহত্যা পরস্বাপহরণ প্রভৃতির বড়ই বাড়াবাড়ি হয়। ভূষণা ও পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি অবিচারে ও অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া উঠে।' 'সীতারাম ইহার প্রতিকারের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি আওরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট হইতে ভূষণার আবাদী সনন্দ ও রাজা ফারমান আনিয়া ভূষণায় আপনাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং শতশত নিরীহকে নিত্যনূতন লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতারামের কার্য্যকলাপ আবু তোরাপের পছন্দ হইল না।' 'সীতারামের সহিত আবু তোরাপের বিবাদ বাধিল। সেই সূত্রে কুলিখাঁর সহিত মনোমালিন্য ঘনাইয়া উঠিল। একদিন সীতারামের সহিত মুর্শিদকুলির প্রকাশ্য সংঘর্ষ হয়। তাহার ফলে, সীতারামের ভাগ্যচক্রের বিবর্ত্তন।' এই ভূমিকা পড়লে এবং চরিত্রগুলির নাম লক্ষ্য করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে প্রমথ রায়চৌধুরী সীতারামের ইতিহাসে চোখ বুলিয়েছেন। কিন্তু সে ইতিহাস গ্রহণ করতে তিনি অনিচ্ছুক হলেন। তাই নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিমতো তিনি তাঁর কল্পলোকে আর এক নূতন নায়ক সৃষ্টি করলেন যিনি ইতিহাসেরও নন, বঙ্কিমেরও নন কেবলমাত্র এই নাটকের নাট্যকারের। ইতিহাস অনুসরণ করে তিনি যদু মজুমদারকে দেওয়ান ও মুনিরামকে উকিল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যদু মজুমদার হয়েছেন এক প্রয়োজনহীন ক্ষুদ্র চরিত্র

আর মুনিরামকে করা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক। সীতারাম উপন্যাসের গঙ্গারাম চরিত্রের নানাদিক এই মুনিবাম চরিত্রে দেখা যায়। মেনাহাতীর নিজস্ব নাম পছন্দ না হওয়ায় তার ক্ষেত্রে বঙ্কিমী নাম—মৃন্ময় ব্যবহার করা হয়েছে। বখতাওর খাঁ-বক্তাব খাঁ নামে এই নাটকে জায়গা পেয়েছেন। সীতারামের মায়েব নাম হয়েছে দযাময়ী, স্ত্রী ও কন্যার নাম যথাক্রমে কমলা ও অরুণা। এক পর্তুগীজ বণিক বার্ণাডোকে বলা হযেছে সীতারামের সেনাপতি। সীতাবামেব দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হযেছেন লক্ষ্মীনারায়ণ নামে সীতারামের লক্ষ্মণ ভাই। আবু তোরাপেব সব অপকর্ম তার আশ্রিত অনাথ বালক বানচাল করে দেয়। মুর্শিদকুলি খাঁ বাঈজী নিয়ে স্ফূর্তির বাণ ডাকান। বক্স আলি ভূষণা জয় করেন।

পাঁচ অঙ্কের বিরাট নাটক। পাতা সংখ্যা ১৯৬। প্রথম অঙ্কে সাতটি দৃশ্য। দ্বিতীয় অঙ্কে সাতটি দৃশ্য, তৃতীয অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে নয়টি দৃশ্য ও পঞ্চম অঙ্কে আটটি দৃশ্য। নাটক হিসাবে যেমন নিম্নশ্রেণীর, ঐতিহাসিক নাটক হিসাবেও তেমনি আজগুবি ঘটনার সমাবেশে পূর্ণ। লেখক ধবে নিয়েছেন সীতারাম বাংলার রাজা এবং তাব উদ্দেশ্য মুর্শিদকুলিখাঁর হাত থেকে বাংলা উদ্ধার করা। মুনিরাম ঈর্ষাপরবশ হয়ে সীতারামের বিরোধিতা করছেন এবং এই কাজে ইন্ধন হয়েছেন তার কন্যা। এই বিধবা সীতারামের প্রতি আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে না পেরে সীতারামের কাছে যান এবং মিষ্ট বাক্যে সীতারাম যখন তার অন্যায় আচরণ বুঝিয়ে দিলেন তখন প্রচণ্ড ক্ষোভে তিনি সকলকে জানালেন যে সীতারাম তাকে ধর্ষণ করেছেন। সীতারামের লাম্পট্যের দুর্নামের অভিযোগ খণ্ডন করার জন্তেই নাট্যকারের এই প্রচেষ্টা। উপসংহারে বলা যায় যে, বঙ্কিমের সীতারামের সুস্পষ্ট ছায়ায় এই নাটক রচিত। বঙ্কিমের কাহিনী বাদ দিতে গিয়ে যে গল্প দাঁড়িয়েছে তা হাস্যকর শুধু নয় সমালোচনার অযোগ্য। ঐতিহাসিক নাটক আখ্যা দিলেও ইতিহাসের চিহ্নমাত্রও নাটকের কোথাও নাই। এই নাটক আবার প্রমাণ করল যে অজ্ঞতা ও অসারতা নিয়ে স্মৃতিতর্পণ করা যায় না। অতীতের গৌরব প্রমান করতে জ্ঞানের আলোক প্রয়োজন। কল্পনা বিকাশে গৌরব নাই, তাতে মনের ভিখারীত্বই প্রকট হয়ে ওঠে যেমন হয়েছে এই ভাগ্যচক্র নাটকে।

পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক নাটকের নাম 'মহারাজা সীতারাম।' প্রকাশকাল ১৩৩২ সাল (মাঘ) বা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ, রচয়িতা সুরেশচন্দ্র মজুমদার। ভূমিকার শেষে নাম লিখেছেন সুরেশচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ। ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে সর্বত্র পরিচয় দিলেও লেখক 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছেন। 'এই গ্রন্থের কিয়দংশ বঙ্গের অমরকবি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাস অবলম্বনে লিখিত এবং কতিপয় চরিত্রের নামকরণও উক্ত গ্রন্থানুসারে করা হইয়াছে। এজন্য আমি সেই স্বর্গীয় মহাত্মার নিকট অশেষ ঋণপাশে আবদ্ধ, এবং এই ঋণের কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। কেন আমি ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইলাম তাহার একটু কৈফিয়ৎ দান এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।··· ৺উমেশচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় একদিন আমার নিকট আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, আমাদের মাতৃভাষায় সীতারামের মতো বীরের সম্বন্ধে একখানিও নাটক নাই এবং তিনি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। তাঁহার এই আগ্রহাতিশয্য দর্শনে আমিই এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করি এবং নাটক রচনার জন্য উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। ইহার অল্প কিছুদিন পরেই সীতারাম সম্বন্ধীয় একখানি ঐতিহাসিক নাটক বাজারে বাহির হয়, কিন্তু ইহা পাঠ করিয়া মৈত্রেয় মহাশয় নিরাশ হন।' উপরোক্ত নাটক যে 'ভাগ্যচক্র' সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বঙ্কিমের উপন্যাসের সঙ্গে ভাগ্যচক্র নাটকের নানা বিষয় ও চরিত্র সংমিশ্রিত হয়ে যে অদ্ভুত নূতন নাটকের সৃষ্টি হয়েছে তা অতি হাস্যকর। নাট্যকার যে এই নাটক রচনায় কোন ঐতিহাসিক ঘটনার বা বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করেননি তা স্পষ্টই বোঝা যায়। নিবেদনের শেষে তাই লিখেছেন 'যাঁহারা সীতারামের যথার্থ ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে চাহেন, তাঁহারা স্টুয়ার্ট প্রণীত বাংলার ইতিহাস এবং জেমস ওয়েষ্টল্যাণ্ড প্রণীত 'যশোরের ইতিহাস' পাঠ করিবেন।' বঙ্কিম-চন্দ্রের ভূমিকা অবলম্বনেই এই বই দুটির নাম দেওয়া হয়েছে মনে হয়। এর কোনটি নাট্যকার নিজে পাঠ করেছেন এমন কোন প্রমাণ নাটকের মধ্যে নাই। তিনি কল্পনা আশ্রয় করেই তাঁর মহারাজা সীতারাম রচনা করেছেন। উপকরণ এসেছে বঙ্কিমের সীতারাম ও প্রমথ রায়চৌধুরীর ভাগ্যচক্র থেকে। সীতারামের স্ত্রীদের নামকরণে এই জগাখিচুড়ী অত্যন্ত স্পষ্ট আকার ধারণ

করেছে। বঙ্কিম অনুসরণে সীতারামের তিন স্ত্রী কিন্তু ভাগ্যচক্র অনুসরণে প্রথম স্ত্রীর নাম কমলা। দ্বিতীয় বা আসলে তৃতীয় স্ত্রীর নাম বঙ্কিম অনুসরণে রমা দিতে নাট্যকার কুণ্ঠিত হয়েছেন, তিনি নাম দিয়েছেন মনোরমা। তৃতীয় স্ত্রী যিনি বস্তুতঃ প্রথম স্ত্রী সুরেশচন্দ্রের নাটকে যোগেশ্বরী নাম ধরেছেন। পরিচয় ক্ষেত্রে নাট্যকার অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে ইনি অন্য কেউ নন, ছদ্মবেশিনী শ্রী নাম্নী সীতারামের পরিত্যক্তা স্ত্রী। ভাগ্যচক্রের মতো এখানে সীতারামের মায়ের নাম দয়াময়ী। গঙ্গারাম এই নাটকে রমার প্রতি নয় সীতারাম কন্যা বীনাকে লাভ করার জন্য উদগ্রীব। শ্রীর ভাই বলেই এ নাটকেও গঙ্গারামের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাই এই আকর্ষণ অত্যন্ত বিসদৃশ লাগে। শ্রী ও জয়ন্তী চরিত্র দুটি একত্রে মিলেই যোগেশ্বরী চরিত্র হয়েছে।

পুরুষ চরিত্রগুলিতে বঙ্কিমী প্রভাব স্পষ্ট যদিও সীতারাম রায় 'ভাগ্যচক্র' অনুসরণে এখানেও 'ভূষণার জমিদার—পরে স্বাধীন রাজা'। চন্দ্রচূড়, মৃন্ময়, গঙ্গারাম, আবু তোরাব, মুর্শিদকুলি খাঁ প্রভৃতি চরিত্রগুলি আছে। এছাড়া 'রঘুনন্দন' তাকে মুর্শিদকুলিখাঁর দেওয়ান বলা হয়েছে। বেচারা দয়ারাম রায় মোগল সেনাপতিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। সীতারামকে যুদ্ধে হারিয়ে দেবার কৃতিত্ব তারই প্রাপ্য হয়েছে। এই যুদ্ধে শ্রী আলুলায়িত কুন্তলা হয়ে কামান চালনা করেন। বস্তুত অপ্রস্তুত সীতারামের রাজ্য রক্ষার প্রথম কৃতিত্ব তাঁরই পাওনা হয়। তারপর গুপ্তহত্যার বন্যায় নাটক শেষ হয়েছে। মদন নামে সীতারামের এক সৈন্যাধ্যক্ষ দয়ারামকে যুদ্ধে যখন কাবু করে ফেলেছে তখন গঙ্গারাম তাকে অতর্কিত বধ করলেন, চন্দ্রচূড় বধ করলেন গঙ্গারামকে তারপর বধ্য হলেন সিংহরামের। শেষ দৃশ্যে যুদ্ধে আহত সীতারাম যোগেশ্বরীর কোলে মাথা রেখে জানতে পারলেন তিনিই তাব প্রথমা পত্নী শ্রী। গুরু যোগানন্দ মাথায় পা রাখলেন—'গুরুদেব-মাই-মা দশভূজে-বাঙ্গলা-মহম্মদপুর' বলে সীতারাম অন্তিম নিঃশ্বাস ছাড়লেন নাটকও শেষ হল। সীতারাম বৈষ্ণব এ খবর এই নাট্যকারেরও অজানা ছিল।

বলা বাহুল্য যে বঙ্কিমের সীতারামের কোন মানসিক উদ্বেগ বা দুর্বলতা এই সীতারামের নাই। তার মুখে সংলাপ দেওয়া হয়েছে—'এইবার হয় পরাজয়—নয় হিন্দুস্থান' (৫/৩)। শেষ পর্যন্ত হিন্দুস্থান মানে দাঁড়াচ্ছে মহম্মদপুর। মুর্শিদকুলিখাঁর

সরাব পিপাসা ও স্ত্রীলোকের তৃষ্ণা কিছুতে মেটেনা (৫/১)। তিনি সর্বদা নাচগান নিয়েই যেন মশগুল। আবুতোরাবের সীতারামের বিরুদ্ধাচারণ করার কারণ—'প্রকাশ্যে রাজদ্রোহ ? যত পলাতক খুনী আসামীকে আশ্রয় দেওয়া, তারপর রাজকর দিতে অস্বীকার, আমার উদ্দেশ্যে আনিত স্ত্রীলোক কেড়ে নেওয়া' (২/২)। আবার আবুতোরাবের মুখের আর এক সংলাপ—'আশ্চর্য্য জীব এই গঙ্গারাম দাস। অমন প্রজারঞ্জক রাজা সীতারাম তারই ধ্বংসসাধনে এ ব্যক্তি কৃত সঙ্কল্প। আমার ইচ্ছা আমার স্বকার্য্য সাধন হবার পর ঐ ব্যক্তির সর্বশরীরে তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করে নির্মম যন্ত্রণা দিতে দিতে এর জীবননাশ করি' (২/৫)। নাট্যকার সম্রাট আওরঙ্গজেবকে নাটকে এনে তাঁর হাত দিযেই সীতারামকে খেতাব দেওয়া করিয়েছেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে সীতারামের বক্তব্য শুনে সম্রাট বলছেন—'শোন সীতারাম তোমার স্পষ্ট কথায় আজ আমি বড সন্তুষ্ট হয়েছি। অন্য কেহ আমার সম্মুখে এমনভাবে যদি স্পর্দ্ধা প্রকাশ করত তবে আমি তার মাথা কেটে ফেলবার হুকুম দিতাম। কিন্তু তুমি বীরপুরুষ··'(২/৪)। সব থেকে সাংঘাতিক সংলাপ বাদশার মুখে—'তোমার বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপ আমি তোমাকে নিম্নবঙ্গের আধিপত্য দান করলেম' (২/৪)। গোটা নাটক জুড়ে এইরকমের সংলাপ। অনৈতিহাসিক, অসংলগ্ন এবং অদ্ভুত।

মহারাজা সীতারাম নাটকে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৭, পাঁচ অঙ্কের নাটক। প্রথম অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে সাতটি ও পঞ্চম অঙ্কে আটটি দৃশ্য। এছাড়া ক্রোড়াঙ্ক নামক শেষ দৃশ্যে সীতারামের মৃত্যু দেখানো হয়েছে। নাটক লেখার পূর্বে কোন রকমের নাট্যপরিকল্পনা হয়েছে বলে মনে হয়না। কল্পনার তরী বেয়েই নাটকের বিস্তার ও সমাপ্তি। নাটক হিসাবে বা সীতারামের নাট্যরূপ হিসাবে মান অতি নিকৃষ্ট।

এবার বঙ্কিমের সীতারামের নাট্যরূপদুটি আলোচনা করা যাক। এই দুইটি নাটকেই বঙ্কিম অনুসরণে সোজাসুজি নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে। অতুলকৃষ্ণ মিত্রর [১৮৫৭-১৯১২] নাটক "সীতারাম" বসুমতী সাহিত্য মন্দির হতে প্রকাশিত। প্রকাশকাল দেওয়া নাই বটে তবে ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত আধুনিক সংস্করণ। এই নাটক গিরিশচন্দ্র দ্বারা অভিনীত

হওয়া সম্ভব। গিরিশচন্দ্র রচিত পনের খানি গানের মধ্যে ছয়টি নাটকের মধ্যে ছাপা হয়েছে। এই নাট্যরূপ অতুলকৃষ্ণর দেওয়া নয় একথা মনে করায় অনেক সঙ্গত হেতু আছে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উপন্যাসের পূর্ণ মর্য্যাদা বজায় রাখা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে গিরিশচন্দ্রের মতো একজন অভিজ্ঞ অভিনেতা ও নাট্যকার সীতারামের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ও নাট্যশিক্ষা দিয়েছেন। এই নাট্যরূপের মাঝে মাঝে তাই গৈরিশী ধরনের সংলাপ স্বাভাবিক ভাবেই এসে গিয়েছে। বিশেষ সীতারামের একাধিক বক্তৃতা যে গিরিশ রচিত এবং অভিনয়ের সময় নাটকের অঙ্গীভূত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এমনকি গঙ্গারামকে হত্যার পর শেষ দৃশ্যটি সম্পূর্ণ গিরিশরচিত মনে হয়। এই দৃশ্যে বঙ্কিম অনুসরণে জয়ন্তী সীতারামকে ছেড়ে অন্তর্ধান করলেন। সীতারাম শ্রীকে নিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করলেন। নাটকের শেষে সীতারামের মুখে গৈরিশী সংলাপ—(সীতারাম শ্রীকে বলছেন) 'করবো, করবো—গ্রহণ করবো—নদীর জলে গ্রহণ করবো কি কোথায় করবো ? দেখ অট্টালিকায় গেলে তোমার সঙ্গে আমার কথা হবেনা। সেথা রমা মরেছে—আমায় ভালবেসে মরেছে। নদীর জলে তোমায় গ্রহণ করা হবেনা—যবন সৈন্য মরেছে। প্রান্তরে অনেক প্রাণ নাশ হয়েছে। নগরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না—কুটীর শূন্য করে কুটীরবাসী পালিযেছে। করবো—গ্রহণ করবো। চল স্থান খুজিগে চল। করবো—করবো—গ্রহণ করবো। আমার এখনও মমতা যায়নি। করবো,—করবো—তোমায় গ্রহণ করবো। চল চল স্থান খুজিগে চল। তবে এসো, স্থান খুজিগে চল।' তাই বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে অতুলকৃষ্ণ মিত্রের নামে প্রচলিত নাটকে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব অতি প্রকট। গিরিশচন্দ্রকে নাট্যরূপদাতা বলতে কেবল ব্যাকরণই বাধা দিতে পারে।[২৫]

পাঁচ অঙ্কের এই নাটকটি ১৪১ পৃষ্ঠা সংখ্যা। প্রথম অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কে নয়টি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্কে সাতটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্কে আটটি দৃশ্য ও পঞ্চম অঙ্কে সাতটি দৃশ্য। চরিত্র ও পরিচয় পরিপূর্ণভাবে সীতারাম উপন্যাসের অনুগামী। স্থান ও কাল সেইরকম। উপন্যাসের অনুসরণ করতে গিয়েই বহু দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। ঐতিহাসিকতা বিচারে তাই পূর্ব উল্লিখিত কথাগুলিই বলতে হবে। এই সীতারামের নাট্যরূপে কোনরকম

ঐতিহাসিকতা নাই বা তা দেবার কোন চেষ্টা নাট্যরূপদাতা করেন নাই। এই দিক থেকে 'ভাগ্যচক্র' বা মহারাজ সীতারামএর সঙ্গে এই নাটকের প্রকৃতিগত প্রভেদ। ওই দুই নাটকেই ইতিহাসের নামে নিজেদের খণ্ড কল্পনাকে ব্যবহার করার মিথ্যাচার দেখা গেছে।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এখন পর্য্যন্ত সীতারামের শেষ নাট্যরূপদাতা। বঙ্কিম-চন্দ্রের উপন্যাসের এই নাট্যরূপ মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর তারিখ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। নাট্যরূপদাতা নিবেদনে জানিয়েছেন ঘূর্ণায়মান বঙ্গমঞ্চের জন্য সীতারাম রচিত হয়। অহীন্দ্র চৌধুরী ও শরৎ চট্টোপাধ্যায় রঙমহল মঞ্চে এই নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। 'তারপর কি জানি কি অজ্ঞাত কারণে 'রঙমহল' সহসা সীতারাম নাটক অভিনয়ের সংকল্প পরিত্যাগ করেন।' নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আগ্রহে মিনার্ভামঞ্চে এই নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। সীতা-রামের ভূমিকায় কমল মিত্র, গঙ্গারাম—জহর গাঙ্গুলী, চন্দ্রচূড—রবি রায়, শ্রী—সরযূবালা ও জয়ন্তীর ভূমিকায় মুকুলজ্যোতি অভিনয় করেন। রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ চরিত্র দুটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সন্তোষ সিংহ ও জীবেন বোস এই দুটি চরিত্রে অভিনয় করেন। নাটকের এইটাই সব থেকে বড় কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াল। রামচাদ শ্যামচাঁদ নাটক নিযে পালিয়ে গেল আর বীর রাজা সীতারাম দর্শকের সহানুভূতিটুকুও পেলেন না। নাট্যরূপদানের ত্রুটি এই অসাফল্যের প্রথম এবং অভিনয়ে দুর্বলতা দ্বিতীয় অন্যতম কারণ।

এই নাটকের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ে প্রযোজিত হলেও নাটক সাফল্যলাভ করে নাই। রামচাঁদ শ্যামচাঁদ মুখ্য দুটি চরিত্রে রূপান্তরিত ও সুঅভিনীত হওয়ায় নাটকের অন্য চরিত্র হাল্কা হয়ে যায়। অন্যান্য চরিত্রগুলিও সুঅভিনীত হয়না। শ্রী ছাড়া অন্য স্ত্রী চরিত্রগুলি বিশেষ জয়ন্তী চরিত্রটির অভিনয় অত্যন্ত স্তিমিত হয়। শ্রী চরিত্র সুঅভি-নীত হলেও বৃক্ষারূঢা শত্রুসংহারিণী বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীর যে কল্পনা দর্শকমনকে পূর্ণ করে আছে তা অভিনীত শ্রী চরিত্রের থেকে অনেক মহান। পুরুষ ভূমিকা-গুলির, মধ্যে একমাত্র চন্দ্রচূড সুঅভিনীত হয়। সীতারাম অত্যন্ত নীরসভাবে অভিনীত হওয়ায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। মৃন্ময় হাস্যরসের সৃষ্টি করে। সমগ্র

নাটকটি একাধারে বঙ্কিমের উপন্যাসের ব্যর্থ সংস্করণ এবং জাতীয় উদ্দীপনা-হীনরূপেই প্রতিভাত হয়।

পাঁচ অঙ্কের এই নাটকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৩, সংযোজিত দৃশ্য পৃষ্ঠা ধরলে সংখ্যা ১৫৪। প্রথম অঙ্কে ৪টি দৃশ্য, ২৯ পাতায় শ্রীর অন্তর্ধান পর্য্যন্ত ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উত্তেজনা এই প্রথম অঙ্কে একেবারেই প্রতিফলিত হয় নাই এবং সেজন্যই প্রধানত নাটক ব্যর্থ হয়েছে বলা চলতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্কে ৪টি দৃশ্য, ৩০ থেকে ৫৪ পাতায় সীতা-রামের মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপন পর্য্যন্ত দেখান হয়েছে। নাটক অভিনয়ের কাল ১৯৪৬ তাই অবশ্যম্ভাবীভাবেই নাট্যরূপদাতা হিন্দু-মুসলমান প্রীতির বিষয় সীতারামের মুখে কিছু বক্তৃতা আরোপ করেছেন। বঙ্কিম অনুসরণে এটা যে অত্যন্ত প্রক্ষিপ্ত তা বলাই বাহুল্য। তৃতীয় অঙ্কে ৬টি দৃশ্য, ৫৫ থেকে ৯৯ পাতার মধ্যে আবু তোরাবের সঙ্গে বিরোধ, গঙ্গারাম-রমা বৃত্তান্ত এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য গঙ্গারামকে বন্দী করা পর্য্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। নাট্যরূপদাতা যখনই উপন্যাসের অতিরিক্ত ঐতিহাসিক সংলাপ রচনার প্রয়াসী হয়েছেন তখনই চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। আবু তোরাপ বলছেন—'আমি সীতারামকে বিদ্রোহী প্রমাণ করবই। তখন বাদশাহ বুঝবেন কাকে তিনি মহারাজধিরাজ সনদ দিয়াছিলেন।' (৩/৫)। বস্তুত আবুতোরাপের হত্যার আগে সীতারামকে দমনের সরকারী প্রয়োজন হয় নাই। ষষ্ঠ দৃশ্যে সীতারামের মহম্মদপুরের প্রাসাদের মধ্যে আবুতোরাপের কামানের গোলায় মৃত্যু এবং 'ওঃ খোদা' সংলাপে ঈশ্বরপ্রাপ্তি একাধারে প্রক্ষিপ্ত ও হাস্যকর। নাট্যরূপদাতা জয়ন্তীকে দিয়েও কামান চালিয়েছেন, উপন্যাসে এমন কোন নিদর্শন নাই। চতুর্থ অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, ৯৫ থেকে ১২১ পাতার মধ্যে গঙ্গারামের বিচার, বন্দীত্ব, ও মুক্তি দেখান হয়েছে। শ্রী ও সীতারামের মধ্যে চিত্তবিশ্রামের সেই বিখ্যাত দৃশ্যটিও এই অঙ্কের অঙ্গীভূত কিন্তু নাট্যরূপদাতার অপটুতায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শ্রীর প্রতি কামনাই যে সীতারামকে অস্থির করেছিল এবং শ্রীর অভাব পূরণের জন্যই যে সীতারাম বহুরমণীসেবী হয়ে বিলাসিতার পঙ্কপল্বলে নিমজ্জিত হলেন নাট্যরূপদাতা তা প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এই ঘটনাই সীতারামের জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত—নাটকের যোগ্য climax সেজন্য এই অঙ্কের শেষে এই

দৃশ্যের অবস্থান স্বাভাবিক হত। কিন্তু নাট্যরূপদাতা তার নিজের ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই অঙ্কের মধ্যে 'গোলে হরিবোলে' কর্তব্য সম্পাদনা করেছেন মাত্র। রমার মৃত্যুতে অঙ্কের শেষ করলেও সীতারামের বিলাসিতার কোন পরিচয় দিতে বা উল্লেখ করতে নাট্যরূপদাতা কুণ্ঠিত হয়েছেন। এখানেই চরম দুর্বলতার সৃষ্টি। বঙ্কিমের সীতারাম যেমন বীর তেমনি তার পতন তার নিজের বিলাসিতার ফল। খোদার ওপর খোদকারি করেছেন নাট্যরূপদাতা, বঙ্কিমের সীতারামের কোন কলঙ্কের উল্লেখ করেন নাই। ফলে বঙ্কিমের সীতারামের অঙ্গহানি হয়ে চরিত্র অসম্পূর্ণ থেকে গেল। বস্তুত এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রণের এক স্থায়ী কলঙ্ক। নায়কের গুণাবলী প্রায়ই বহুগুণ বর্ধিত হয় কিন্তু তার সামান্যতম ত্রুটিকে অপ্রকাশ রাখাই প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চম অঙ্কে ৪টি দৃশ্য, ১২২ থেকে ১৪৩ পাতার মধ্যে শ্রীর পলায়ন, জয়ন্তীর নিগ্রহ, সীতারামের শেষ যুদ্ধ ও মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে। মনে হয় নাট্যরূপদাতা হঠাৎ নাটক শেষ করার তাগিদ পেয়েছেন যার ফলে সীতারামের চরিত্রের জটিল-তম দিক প্রকাশ করার তিনি কোন চেষ্টাই করলেন না—চরিত্র অসম্পূর্ণ রেখে তিনি নাটক শেষ করলেন। নাটক পাঠ করলে বুঝতে দেরী হয়না যে সীতারামের চরিত্রের বিভিন্ন দিক নাট্যরূপদাতার অবোধ্য রয়ে গেছে। চরিত্রের মধ্যে যখনই দ্বন্দ্ব এসেছে তখনই নাট্যরূপের চরম ব্যর্থতা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে এবং এখানেই এই নাটকের অসাফল্যের কারণ নিহিত রয়েছে। নাট্য-রূপদাতার কৃতিত্বের কথাও বলা দরকার। তিনি রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের মধ্যে দিয়ে সার্থক একজোড়া ভাঁড়ের সৃষ্টি করেছেন। এই চরিত্রদুটি এত জীবন্ত ও এত সজীব যে তুলনায় সীতারাম এবং তার সাঙ্গপাঙ্গকে প্রায় জড়বস্তু বলেই মনে হয়। আধুনিক কালের ধারা অনুসরণ করে নাট্যরূপদাতা যদি রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদের দৃষ্টিতে সীতারাম নাটক রচনা করতেন তাহলেও উপভোগ্য হত কিন্তু ভাঁড়ামীর মেজাজ নিয়ে বঙ্কিমের সীতারামকে নাটকে রূপান্তরিত করতে গিয়ে তিনি পরিপূর্ণ ব্যর্থতাই বরণ করে নিয়েছেন। ব্যর্থ হয়েছে নাট্যরূপদান, ব্যর্থ হয়েছে নাটক রচনার চেষ্টা।

উপসংহার। উপসংহারে বলা চলে যে, এ পর্যন্ত সীতারামকে অবলম্বন করে সম্ভবত ছয় বা সাতটি নাটক রচিত হয়েছে। অতুলকৃষ্ণ মিত্রের

নাট্যরূপ ছাড়া গিরিশচন্দ্র যদি অন্য কোন নাট্যরূপ দিয়ে থাকেন তাহলে সংখ্যা হবে সাত নইলে ছয়। মনে হয় গিরিশচন্দ্র অতুলকৃষ্ণর নাট্যরূপেই নিজ সঙ্গীত ও নিজ সংলাপ আরোপ করেছেন। সুতরাং অতুলকৃষ্ণর নামীয় নাট্যরূপকেই প্রথম সার্থক কিন্তু দ্বিতীয় নাট্যরূপ বলা যায়। প্রথম সীতারাম নাটকের প্রথম অভিনয় সম্ভবত হয় বেঙ্গল থিয়েটারে একথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। নাট্যরূপদাতা সম্ভবত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় অথবা জনৈক প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়। এই নাট্যরূপে মৃন্ময়ের সঙ্গে জয়ন্তীর বিবাহ দেওয়া হয়েছিল এবং সীতারাম মুসলমানদের পরাজিত করে শ্রীকে ফিরে পেয়ে তিন স্ত্রী নিয়ে সুখে শান্তিতে রাজ্যপালন করতে থাকেন।[২৬] এই হাস্যকর প্রযোজনার পর গিরিশচন্দ্র প্রযোজিত সীতারাম অভিনীত হয়। তারপর অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রযোজিত এবং রচিত সীতারাম অভিনয় হল। তারপর ভাগ্যচক্র অভিনীত হয়। মহারাজা সীতারাম কখনও অভিনয় হয় নাই বলে মনে হয়। কাজেই দীর্ঘদিন পরে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সীতারামের অভিনয় স্বাধীনতার পূর্বমুহূর্তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

প্রত্যেক নাটক নানা কারণে ব্যর্থ হয়েছে। প্রধানতঃ দুটি দুর্বলতা নজরে পড়ে। প্রথম নাট্যকার অপটু, দ্বিতীয় উপন্যাসের নাট্যরূপ সর্বদাই কঠিন। বিশেষ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ বিশেষ দুরূহ। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাট্যরূপ দিলে সার্থক নাটক আশা করা যেত।

আচার্য্য যদুনাথ আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, বঙ্কিমের প্রতিভা সীতারামের তুচ্ছ ভোগবিলাসকে এক অন্তর্গূঢ় কারণে মণ্ডিত করে সীতারাম চরিত্রকে অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত করেছে। 'নায়কের এই চরিত্র পরিবর্ত্তনই সীতারাম উপন্যাসকে শেক্ষপীয়রের ম্যাকবেথের মতো শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক করিয়া তুলিয়াছে। এই দুটি কাব্যেই আমরা দেখি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে, প্রায় অদৃশ্য গতিতে বাহ্য ঘটনার আঘাতে অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণে, একজন দেবচরিত্র বীর অবশেষে দানব হইয়া উঠেন।'[২৭] সীতারামের চরিত্রের এই নাট্যসম্ভাবনা কোন নাটক রচয়িতার চিন্তাপথে আসে নাই। এই সম্ভাবনার সুযোগ নিলে সীতারাম এক সুবিখ্যাত নাট্যচরিত্রে রূপান্তরিত হতে পারত। সেক্সপীয়র রচিত এ্যাণ্টনী চরিত্রের সঙ্গেও আচার্য্য যদুনাথ সীতারাম চরিত্রের মিল পেয়েছেন। উভয়েই বীর দক্ষ ও কর্মকুশলযোদ্ধা

কিন্তু উভয়েরই মৃত্যু অত্যন্ত হীন কাপুরোষিত ইন্দ্রিয়পরায়ণ কামিনীর দাস হয়ে জীবন যাপনের পর। নিঃসন্দেহে সীতারাম এক নাটকীয় চরিত্র। বঙ্কিম অনুসরণে এই নাটকীয়তা ব্যাহত হয়না বরঞ্চ বর্ধিত হয়। সীতারামের নাট্যরূপের ব্যর্থতা বঙ্গ সাহিত্যে সফল নাট্যরূপদাতার দৈন্য ঘোষণা করে। সীতারামকে নায়ক করে আজ বাংলা সাহিত্যে যে চমৎকার কোন নাটক নাই এর থেকে বড় কলঙ্কের কথা ভাবতে পারা যায় না। বাংলায় শতাব্দী-ব্যাপী সার্থক নাট্যকারের অভাবই এতে প্রমাণিত হচ্ছে মাত্র।

সীতারাম উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে গিয়ে নাট্যকারদের আরেক দুর্বলতা নজরে পড়ে। উপন্যাসের বক্তব্য না প্রকাশ করে নিজস্ব চিন্তায় ও কল্পনায় নাট্যরূপকে প্রায়ই ব্যাহত করা হয়। সীতারাম উপন্যাসের নাট্যরূপ দুইটিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে শক্তিমান পুরুষ সিংহের চিত্র অঙ্কন করেছেন, যার বীরত্ব মহান বলেই পতন অত দুঃখজনক—তাঁকে এই নাট্যরূপ দুটিতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। বঙ্কিম অনুসরণে খড় মাটি দিয়ে যে বিরাট বীর ও স্বদেশপ্রেমিক সৃষ্টি করার চেষ্টা হয়েছে তা প্রাণহীন। মনে হয় বঙ্কিমের রচনা ধৈর্য্য ধরে পাঠ করে তাকে নাট্যরূপে অনুসরণ করার ইচ্ছা নাট্যরূপদাতাদের ছিল না। সীতারাম চরিত্র বোঝার ইচ্ছা বা বঙ্কিমের রচনার বিশিষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতাও বোধহয় তাদের ছিল না। তাই নাট্যরূপের সীতারাম আর থিয়েটারি সীতারামের প্রত্যেকটি, নাটক হিসাবে বিফল হয়েছে। ঐতিহাসিক নাটক হিসাবেও তাদের কোন মূল্য নাই।

এই প্রবন্ধের শেষে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন যে অন্যান্য প্রবন্ধের মতো প্রতি নাটকের বিশদ আলোচনা করা হয় নাই। তার কারণ প্রতি নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাসে এত বেশী নির্ভর করেছে যে নাটকের প্রতিপাদ্য সম্পর্কে বলতে গেলে পুনরুক্তির দোষে দোষী হতে হত।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। See : Dr A. Karim, Murshid Quli Khan and his Times (Dacca 1963)

২। See : J. H. Little, The House of Jagat Seth. (Calcutta 1967)

৩। Dr A. Karim, *Op. Cit.*

৪। Dr N K. Sinha, Economic History of Bengal, Vol. 1, p 52 and নিখিল নাথ রায মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ২৫৪ পাতা।

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সীতাবাম। বঙ্গীয সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ। ঐতিহাসিক ভূমিকা, যদুনাথ সবকার ৬-৭ পাতা।

৬। তদেব

৭। তদেব

৮। তদেব ৭-৮ পাতা।

৯। তদেব ৮-১২ পাতা।

ও Revolt of Shobha Sing, *Bengal Past and Present* Vol 89, No 167, p 58-73

১০। Sir Jadunath Sarkar, ed, History of Bengal, Vol II

১১। যদুনাথ সরকাব, সীতারামের ঐতিহাসিক ভূমিকা, দ্রষ্টব্য

১২। তদেব

১৩। Dr A. Karim, *Op Cit.*

১৪। Ibid.

১৫। যদুনাথ সরকার, সীতাবামের ঐতিহাসিক ভূমিকা।

১৬। নিখিলনাথ রায, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ৪১৭-৪৫৮ পাতা।

১৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালাব ইতিহাস, ২০৩ পাতা।

১৮। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সীতারাম, ভূমিকা, ২২-২৩ পাতা (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ)

১৯। অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, (১৩৩৪), ৪৪৯-৪৫৬ পাতা।

২০। রমাপতি দত্ত, রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ (১৩৪৮), ২৬৫-২৬৬ পাতা।

২১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, ১৯৫-১৯৬ পাতা।

২২। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু (১৩৪৪), ৪৮-৪৯ পাতা।

২৩। রমাপতি দত্ত, রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ, ২৬৮-২৬৯ পাতা।

২৪। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ৬২৮ পাতা।

২৫। অমৃতলাল বসু, রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর (আধুনিক সংস্করণ), ১১২ পাতা।

২৬। অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, ৪৫৬ পাতা
ও রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা ২৫ পাতা

২৭। যদুনাথ সরকার, সীতারামের ঐতিহাসিক ভূমিকা, ১৫ পাতা।

আলিবর্দী খাঁ ও সিরাজ-উদ-দৌল্লা

১৭৪০ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা

প্রস্তাবনা

বাংলার ইতিহাসে ১৭৪০ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সতের বছরের মধ্যে একাধিক রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছে এবং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে আমূল পরিবর্তন এসেছে। আচার্য্য যদুনাথের কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলতে দ্বিধা নাই যে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়ে নূতন এক আলোকবর্ষ বাংলার আকাশে উজ্জলিত হল। শিক্ষায় সংস্কৃতিতে দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতিতে বাঙ্গালীর জীবন নবীনযুগের প্রভায় আলোকিত হয়ে উঠল। সমস্ত পৃথিবী বাঙালীর আযত্তে এল।

১৭৪০ থেকে ১৭৫৭ এই সতের বছরে মোগল যুগের শ্বাসকষ্ট ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। মারাঠা প্রতিভা ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করে সমস্ত ভারতে তাদের পদচিহ্ন অঙ্কিত করেছে। ইংরেজ বণিক বাণিজ্যের উন্নতির সাথে সাথে শস্ত্র ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচয় অর্জন করেছে। অন্যান্য বিদেশীয়দের যথা ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার পর্তুগীজ ও আর্মানীয়দের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর শক্তি হিসাবে প্রতিভাত করেছে। সতের বছর প্রচণ্ড গুরুত্ব নিয়ে বাঙালীর চোখের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। এই সতের বছরে তিনজন নবাব বাংলা শাসন করেছেন। সরফরাজ খাঁ, মুর্শিদকুলি খাঁর আদরের দৌহিত্র ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিযার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। বিদ্রোহী আলিবর্দী খাঁ হলেন নবাব। দীর্ঘ শাসন ও দীর্ঘ জীবনের অবসান হোল ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এবার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন তাঁর প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌল্লা* (আমরা এখন থেকে তাঁকে সিরাজদৌল্লা বলব)। ভাগ্যচক্র ঘূর্ণিত হল। চৌদ্দ মাস রাজত্ব করার পর সিরাজ রাজত্ব এবং প্রাণ হারালেন (৯ই এপ্রিল ১৭৫৬ থেকে ২রা জুলাই ১৭৫৭ খ্রীঃ)। সরফরাজ খাঁর সঙ্গে সিরাজদৌল্লার চরিত্রগত মিল দেখলেও অবাক হতে হয়। উভয়েই বয়সে ছিলেন তরুণ, উভয়ের জীবনই

* সিরাজ-প্রদীপ, সিরাজ-উদ-দৌল্লা-সাম্রাজ্যের প্রদীপ

কুক্ষচিপূর্ণ, উভয়েই সভাসদদের অপমান করেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রে প্রাণ হারান। সরফরাজ খাঁ রাজত্ব করেন মাত্র তেরমাস। (১৩ই মার্চ ১৭৩৯ থেকে ৯ই এপ্রিল ১৭৪০ খ্রীঃ)। এত যোগ আছে এই দুই হতভাগ্য নবাবের মধ্যে যে মনে হয় যেন একে অন্যের প্রতিবিম্ব।

মাঝের দীর্ঘ সময়ের যোগসূত্র রক্ষা করেছেন নবাব আলিবর্দী খাঁ মহাবত জঙ্গ। ৯ই এপ্রিল ১৭৪০ এর সঙ্গে ৯ই এপ্রিল ১৭৫৬ কে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে বাংলার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে বর্গীদের চরম অত্যাচার, মারাঠা ক্ষমতার সর্বাপেক্ষা কুশ্রী নিদর্শন। স্বর্ণপ্রসূ বাংলা স্বর্ণশিকারীদের বিচরণভূমি হয়েছে।

এই সময়কার ইতিহাস নিয়ে নাটক রচনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। যুগ-বিপ্লবের এমন ইতিহাস পাওয়া সহজ নয়। কেবল ঘটনা অনুসরণ করে গেলেই ইতিহাস নাটকীয় হয়ে ওঠে। এই সতের বছরের ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে দশখানি নাটক পাওয়া গেছে। নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধকেও এই দশখানি নাটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে সরফরাজ খাঁ-আলিবর্দী খাঁকে নিয়ে একখানা নাটক, আলিবর্দী খাঁ-সিরাজদৌল্লাকে নিয়ে দুইখানি নাটক, কেবল সিরাজদৌল্লাকে নিয়ে ছয়খানি নাটক এবং রামপ্রসাদ-সিরাজ-দৌল্লাকে নিয়ে একখানি নাটক এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে।

উপক্রমনিকা॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা।

প্রথমে ঐতিহাসিক উপক্রমনিকা করা যাক। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সুবা বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত প্রচলিত করেন। বেতনভোগী সরকারী কর্মচারীদের বাতিল করে রাজস্ব আদায় ও সেটা রাজ্য সরকারে জমা দেবার ভার অবৈতনিক জমিন্দার বা জামিন্দারদের ওপর ন্যস্ত করেন। এই জমিন্দার বা জামিন্দাররাই পরবর্তী যুগে জমিদার রূপে পরিচিত হন। মুর্শিদকুলি খাঁ সৃষ্ট সব থেকে বড় জামিন্দার হলেন নবাবের টাঁকশালের দারোগা রঘুনন্দনের ভাই রামজীবন।[১] প্রথমে বাৎসরিক ৫২ লক্ষ টাকা এবং পরে ৬০ লক্ষ টাকা আয় হয়েছিল রামজীবন রায়ের নাটোর জমিদারীর।[২] ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দেই জগৎশেঠ ফতেচাঁদের ওপর টাঁকশাল ও টাকা ছাপাবার ভার দিলেন

নবাব। রঘুনন্দন রায় রায়ানের পদে উন্নীত হলেন। রাজস্ব আদায়ের সুব্যবস্থা হল। সেই রাজস্বের মধ্যে দিল্লীর বাদশাহর পাওনা অংশ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ নিয়মিত পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই টাকা ঠিক সময়ে পাঠাবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা ছিল। বাংলা সুবায় কেউ রাজস্ব সময়মত না দিলে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ না করে প্রচণ্ড শাস্তি দেওয়া হত। দেয় অর্থ যার যত বেশী তাকে ততো কঠিন সাজা পেতে হত। সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক অপরাধের শাস্তিও সহজ ছিল না। অন্যের অর্থাদি অপহরণে হাতের বিভিন্ন অংশ কাটা যেত। স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচারের শাস্তি ছিল মৃত্যু। কথিত আছে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ এই অপরাধে নিজের একমাত্র পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মুর্শিদকুলিখাঁর রাজত্বে লোকে দ্বার অর্গলবদ্ধ না করে ঘুমুতে বা স্ত্রীলোকেরা মধ্যরাত্রে একস্থান হতে অন্যস্থানে যেতে দ্বিধা করতেন না। এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় একটিমাত্র ছিদ্র ছিল তা হল বৃদ্ধ মাতামহের স্নেহ। নবাবের একান্ত ইচ্ছা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয়তম পৌত্র সরফরাজ খাঁ নবাবী পদ পান।

৩০শে জুন ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ পরলোক গমন করলেন। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়ালের কাছ থেকে ওরা জুলাই কলকাতায় খবর পৌঁছাল আর সেই সঙ্গে জানা গেল সরফরাজ খাঁ নবাব ঘোষিত হয়েছেন। এবার কিন্তু সরফরাজের নবাব হওয়া হলনা। শ্বশুরের মৃত্যুর খবর পেয়ে উড়িষ্যার শাসনকর্তা সুজাউদ্দিন বিরাট এক সেনাবাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করলেন। পিতার আগমনে ভীত সরফরাজ নবাবীর গদি তাকে ছেড়ে দিতে একমুহূর্তও দেরী করলেন না।

সুজাউদ্দিন মহম্মদ খাঁ সুবা বাংলার নবাব হলেন। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা বাংলা সুবার অন্তর্গত ছিল। বাংলার পরিধিও ছিল বৃহৎ। বর্তমান পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশ, মণিপুর ও শ্রীহট্ট ছিল পূর্ব সীমানা, পশ্চিম সীমানায় মানভূম, সাঁওতাল পরগণা এবং উড়িষ্যার কিছু অংশ, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।[৩] এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন সহজ ছিল না। নবাব মুর্শিদকুলিখাঁকেও উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ানী ও নায়েব নাজিমীতে সুজাউদ্দিনকে নিযুক্ত করতে হয়। সুজাউদ্দিন তার দুইজন সহকারীর সাহায্যে উড়িষ্যায় সুশাসন প্রবর্তন করেন। নবাব মুর্শিদকুলির মৃত্যুর পর বিরাট বাহিনীর পুরোধায় যখন নবাব সুজাউদ্দিন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করলেন

তখন এই দুজন সুযোগ্য সহকারীও নবাবের সঙ্গে রাজধানীতে এসে উপস্থিত হন। এই দুই বিচক্ষণ ভ্রাতার নাম হল হাজি আহমদ এবং মির্জা মহম্মদ আলি।

এঁরা একজন ও উভয়ের বংশধর এই প্রবন্ধের প্রধান চরিত্র, সুতরাং ভ্রাতৃদ্বয়ের একটু বংশপরিচয় নেওয়া যাক। এঁরা জাতিতে আরব। এদের পিতামহ দিল্লীতে এক তুর্কী রমনীকে বিবাহ করেন এবং বাদশাহী ফরমানে ছোটথাটো মনসবদারে পরিণত হন। পিতা মির্জা মহম্মদ বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের তৃতীয় এবং প্রিয়পুত্র আজমশাহের দরবারে চাকুরী করতেন। সেইখানেত এই দুইভাই প্রথম বেতনভোগ করেন। মির্জা আহমদের ওপর বাদশাহ পুত্রের রন্ধনশালার তদারকির ভার ছিল। মির্জা মহম্মদ আলি দেখতেন পিলখানা (হাতিশালা) ও জারদোর্জথানা অর্থাৎ জরীর কাজের দর্জিশালা। সুযোদ্ধা ও সাহসী বলে দুই ভায়ের খ্যাতি ছিল। বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর জজৌ রণক্ষেত্রে তার পুত্রদের মধ্যে যে সাংঘাতিক যুদ্ধ হয় তাতে দুই ভাই আজমশাহের পক্ষে যুদ্ধ করেন। আজমশাহের পরাজয় ও মৃত্যুর পর এরা নিজেদের প্রাণ বাচাতে সচেষ্ট হন। মির্জা আহমদ সপরিবারে মক্কায় পলায়ন করেন। মির্জা মহম্মদ আলি সপরিবারে দাক্ষিণাত্যের পথে কটকে আসেন এবং নবাব সুজাউদ্দিনের অধীনে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরী গ্রহণ করেন। মির্জা মহম্মদের বীরত্ব ও প্রভুভক্তি নবাব সুজাউদ্দিনকে সন্তুষ্ট করায় তিনি তাকে আলীবর্দী খাঁ উপাধিতে ভূষিত করেন। ইতিমধ্যে মক্কা ফেরত মির্জা আহমদ-হাজি আহমদ নাম নিয়ে কটকে এসে নবাব সুজাউদ্দিনের চাকুরী গ্রহণ করেন। এমনকি তার তিনপুত্র মহম্মদ রেজা, আগা মহম্মদ সৈয়দ এবং মির্জা মহম্মদ হাসিম যথাক্রমে ৩০ টাকা, ২০ টাকা ও ১০ টাকা মাসিক মাহিনায নবাব সরকারে চাকুরী সুরু করলেন। হাজি আহমদের বেতন নির্দ্দিষ্ট হল ৫০ টাকা।[8] নবাব সুজাউদ্দিন সুযোগ্য শাসনকর্তা ছিলেন বটে কিন্তু নারী লালসা তাঁর চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল। কথিত আছে হাজি আহমদ নবাবের লালসায় ইন্ধন জুগিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই নবাব দরবারে নিজেদের কায়েমী আসন করে নিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের মতে দুই ভাইযের ক্ষমতার লোভ এত প্রবল আকার ধারণ করল যে নবাবের কাছে নিজেদের স্ত্রী কন্যাদের আগিয়ে দিতে তাঁরা কার্পণ্য

করেন নাই। ইংরেজ লেখকদের তথ্য খাঁটি কি মিথ্যা সেই জটিল সমস্যায় উপনীত হবার কোন কারণ নাই। নবাব সুজাউদ্দিন ভাই দুটিকে ভালবাসতেন এবং তাদের ওপর নির্ভর করতেন একথা সত্য।

সুবা বাংলার নূতন নবাব সুজাউদ্দিনের সঙ্গে হাজি আহমদ ও আলিবর্দী খাঁ মুর্শিদাবাদে এলেন। ইতিমধ্যে স্বঘরের অভাবে এক ভাইএর তিন পুত্রের সঙ্গে অন্য ভাইয়ের তিনকন্যার বিবাহ সমাধা হল। হাজি আহমদের তিনপুত্র আলিবর্দী খাঁর তিন জামাই হলেন। জাতকুলমান সমাজ সংস্কার সবই বাঁচল বটে কিন্তু 'genetics' এর অমোঘ নিয়মে বংশের অসদগুণ দ্বিগুণ বর্ধিত হয়ে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে দেখা গেল। নবাব সুজাউদ্দিন খাঁ এক মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করলেন তাতে নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর প্রধান মন্ত্রণাদাতা জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ও দেওয়ান বা রাজস্বমন্ত্রী আলমচাঁদ (এই পদটি চিরকাল হিন্দুরা পেয়েছেন রাজা গুরুদাস পর্যান্ত), এঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন হাজী আহমদ। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দী খাঁকে চাকলা আকবর নগরের (রাজমহল) ফৌজদার করে পাঠান হল। হাজি আহমদের পুত্রগণ ভালভাল পদ পেলেন। মহম্মদ রেজার নাম হল নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ, তিনি হলেন বক্সী। সৈন্যবাহিনীকে বেতন দেবার ভার থাকল তার ওপর। আগা মহম্মদ সৈয়দের নাম হল সৈয়দ আহমেদ খাঁ, তিনি ফক্কর কোণ্ডির (রংপুর) ফৌজদার নিযুক্ত হলেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম হল জৈনুদ্দিন আহমদ খাঁ। এই বিরাট সাম্রাজ্য সুশাসনের সুবিধার জন্য নবাব তার পুত্র সরফরাজ খাঁকে পাটনায় নায়েব দেওযানীর ও নিজামীর পদ দিতে চাইলেন বটে কিন্তু স্ত্রী (জিন্নতউন্নেসা) ও পুত্র সমস্বরে আপত্তি করলে তিনি ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৩৩) আলিবর্দীখাঁকে পাটনায় নায়েব দেওযানী ও নিজামীর পদ দিলেন। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তখন থেকে নবাব আলিবর্দী খাঁ নামটি চলন হয়। রাজমহলের ফৌজদারীর শূন্যপদে জৈনুদ্দিন আহমদ খাঁ নিযুক্ত হলেন।

মুর্শিদকুলিখাঁ প্রবর্ত্তিত সুশাসন দেশে শান্তি স্থাপন করেছিল। সুজাউদ্দিন তাই প্রথমেই সাম্রাজ্যের প্রধান অর্থকরী পদগুলি নিজের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বণ্টন করলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার নামমাত্র দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ তকী খাঁ উড়িষ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন, জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকার শাসনকর্তা হলেন। এই সময় থেকেই

রাজবল্লভের উন্নতি সুরু হয়। নৌবিভাগের করণিকের পদ থেকে বৈদ্য রাজবল্লভ, মুরাদ আলিখাঁর অনুগ্রহে তার পেশকার নিযুক্ত হলেন। মুরাদ আলি সরফরাজখাঁর কন্যাকে বিবাহ করে, ঢাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং দ্বিতীয় মুর্শিদকুলিখাঁ উপাধি গ্রহণ করেন। রাজবল্লভ বৈদ্য তখন তাঁর সঙ্গে ঢাকায় চলে যান। সুজাউদ্দিনের সময় বাংলার শাসনব্যবস্থার উন্নতি হয়। তিনি বার্ষিক এক কোটি টাকার উর্দ্ধ রাজস্ব দিল্লীতে পাঠাতেন। ১১ বছর ৮ মাস ও ১৩ দিনের রাজত্বে তার দিল্লীতে রাজস্ব পাঠাবার মোট পরিমাণ ১৪,৬২,৭৮, ৫২৮ সিক্কা টাকা।[৫] ১ সিক্কা টাকা সমান ১·০৮ আরকট টাকা। চলতি টাকার বিনিময় মূল্য ১০৮ থেকে ১১২ পর্য্যন্ত হতে পারত। কারণ তখন নানারকম টাকার প্রচলন ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ নিজে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতেন, কিন্তু সুজাউদ্দিন তাঁর কুশলী সভাসদগনের ওপব নির্ভর করতেন। স্বভাবতই তাদের ক্ষমতা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। বিশেষ মন্ত্রণা পরিষদের সদস্য তিনজনের ক্ষমতা এবং বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তাদের ক্ষমতা আকাশচুম্বী হয়ে উঠল। অন্যদিকে বিলাসে মগ্ন নবাব স্ত্রীদেহ সম্ভোগ লালসার পরিতৃপ্তিতে সাম্রাজ্য সম্পর্কে সব রকম ভাবনা চিন্তা মন থেকে বিসর্জন দিলেন। সুজাউদ্দিনের মৃত্যু পর্য্যন্ত কিছু ঘটল না। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর সরফরাজ খাঁ নবাব হওযা মাত্র বুঝতে পারা গেল হাজি আহমদ ও আলিবর্দী খাঁ কি প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়েছেন। মূর্খ সরফরাজখাঁ কোন খবরই রাখতেন না। তাই বিলাসেব স্রোতে ভেসে যেতে তিনি দ্বিধা করেন নি। সম্ভবত ধারণা ছিল যে, পিতার মতো তিনিও বাসনাসাগরে নিমজ্জিত হয়ে জীবন অতিবাহিত করবেন। কতকগুলি ঘটনা তার এই ইচ্ছার তরঙ্গে বাধা সৃষ্টি করল।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদিরশাহ দিল্লী আক্রমণ করে বিজয়ী হলেন। সকলে তাঁকে ভারতের বাদশাহ বলে অভিনন্দন জানালেন। ভারত আকাশে ইনি নূতন সূর্য ভেবে সরফরাজখাঁ নাদিরশাহের কাছে উপঢৌকন পাঠালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নাদিরশাহের নামে মুদ্রা প্রচলন করলেন। সরফরাজ খাঁর প্রথম মুদ্রা নাদিরশাহের নাম বুকে ধারণ করে ছাপা হল। কিন্তু প্রচলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই মুদ্রার দাম কমে গেল। বাংলার জনসাধারণ নাদিরশাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। বিপদে পড়লেন জগৎশেঠ,

নূতন মুদ্রা তার টাঁকশালে বৃদ্ধি পেতে লাগল। ইংরেজ কোম্পানী জগৎ-শেঠের কাছে টাকা ধার করতে গিয়ে জানলেন যে নাদিরের নামাঙ্কিত টাকা ছাড়া অন্য কোন টাকায় ধার দেওয়া হবে না। ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী খুব ভাবনায় পডলেন। অর্থ তাদেব প্রয়োজন অথচ নাদিরশাহ নামাঙ্কিত অর্থ নেওয়া মানে পূর্ণ মূল্যে যে টাকা তারা নেবেন বাজারে তার বিনিময় হাব কম পাবেন—সুতরাং অবশ্যম্ভাবী লোকসান। ইংরেজ কোম্পানী ভারত ইতিহাসে তাদের পদচিহ্ন ফেলে যাবার কারণ এই ছোট্ট ঘটনা থেকেই বুঝতে পারা যায়। দারুণ অর্থকষ্ট সত্ত্বেও তাবা নাদিরশাহ নামাঙ্কিত টাকা নিতে অস্বীকার কবলেন। ইতিমধ্যে নবাব সরফরাজ খাঁ আরো কীর্তি কবেছেন। নাদিরশাহ তাঁর শত্রুদেব বিনাশ করবেন এই আনন্দে তিনি পদস্থ কর্মচাবীদেব অপমান করলেন। হাজি আহমদকে প্রকাশ্য দরবারে 'স্ত্রীলোক জোগানদার' বলে আখ্যাত করলেন। সাহস এত বৃদ্ধি হল যে জগৎশেঠের পৌত্রবধূকে কামনা করলেন।

১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে নাদিরশাহ দিল্লী ত্যাগ করে গেলে জোয়ারের জল নামা সুরু হল। জগৎশেঠ নবাবেব হুকুমের অপেক্ষা না করে বাদশাহ মহম্মদ শাহর নামে মুদ্রা ছাপলেন। বাদশাহের কাছে খবর গেল সরফরাজ খাঁব নাদির প্রীতির। বাদশাহর কাছ থেকে এমন হাবভাব এল যাতে মনে হয় যে সফররাজের নবাবী গেলে তিনি খুশী হবেন। ষড়যন্ত্রজাল খুব তাডাতাড়ি রচনা হল। জগৎশেঠের ভয়, শাসন ব্যবস্থা নবাবী অনীহাতে যে রকম ভেঙ্গে পডতে সুরু করেছে তাতে তাঁর ব্যবসার দারুণ ক্ষতি হচ্ছে, অবিলম্বে ব্যবস্থা না হলে লোকসান চরম হবে। হাজি মহম্মদ তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে বিভিন্ন জায়গায় ক্ষমতাসীন করেছেন। অর্থ ও ক্ষমতা দুই তার করতলগত। অন্যদিকে অপটু নবাব বিলাসব্যসনে শাসন ব্যবস্থা রসাতলে নিক্ষেপ করছেন। নবাবের অকীর্তিতে বিশৃঙ্খল রাজ্য। সামরিক শক্তিতে ক্ষমতা সম্পন্ন আলিবর্দী খাঁ বিহার থেকে সামরিক বাহিনী নিয়ে গিরিয়ায় উপনীত হলেন। ১৫০০ কামিনীর হারেম থেকে বেরিয়ে এলেন নবাব আলা-উদ-দৌল্লা হায়দার জঙ্গ সরফরাজ খাঁ। নবাবী করা যার হল না সে গিরিয়ার রণক্ষেত্রে নবাবের মতো অসিহস্তে প্রাণ দিল।

বাংলার মসনদ : ক্ষীরোদপ্রসাদ ১৩১৭ ॥

এই ঐতিহাসিক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত বাংলার মসনদ (প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩১৭) আলোচনা করা যাক। নাটকের মূল বক্তব্য আলিবর্দীর সঙ্গে যুদ্ধে গিরিয়াতে নবাব সরফরাজ খাঁর মৃত্যু। দেখান হয়েছে সিংহাসনের প্রবল লোভে আলিবর্দী খাঁ তাঁর কন্যা ঘসেটি বেগম এবং হাজি আহমদ ষড়যন্ত্র করছেন। সরফরাজ খাঁকে একজন চমৎকার ভদ্রলোক রূপে দেখান হয়েছে। তিনি একাধারে সত্যনিষ্ঠ ও চরিত্রবান। ষড়যন্ত্রকারীগণ প্রথমে তাকে স্ত্রীলোকের মোহে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করলেন এবং সুন্দরী স্ত্রীলোক অপহরণ করে নবাবের ভোগে দেওয়া হল। ওদিকে আলিবর্দী কন্যা ঘসেটি বেগম রূপের জালে তরুণ নবাবকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। নাটকে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, একজন হিন্দু ওমরাহ ও কুশীদজীবি—তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর গচ্ছিত অর্থ অপহরণের লোভে সরফরাজ খাঁর বিরোধিতা করলেন। অবশেষে অপ্রস্তুত নবাব যুদ্ধ-যাত্রা করলেন। গিরিয়ার যুদ্ধে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে নবাব বাহাদুর হত হলেন। বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দী খাঁ যুদ্ধে জিতলেন বটে কিন্তু মনের শান্তি হারালেন। সেজন্য প্রকৃতপক্ষে সরফরাজ খাঁই জয়ী হলেন। সমালোচকের মতে এ নাটকে সরফরাজ খাঁ নায়ক হাজি আহমদ প্রবল খল-চরিত্র বা ভিলেন ও আলিবর্দী খাঁ তাঁর হাতের ক্রীড়নক এবং সহকারী। বাংলার মসনদ লাভ নাটকের প্রধান কথা।

বাংলার মসনদ নাটক পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত এবং প্রথম সংস্করণের পাতা সংখ্যা ১৫২। প্রথম অঙ্ক ছয়টি গর্ভাঙ্কে বিভক্ত (১-৩৮ পাতা), দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি গর্ভাঙ্ক (৩৯-৭১ পাতা), তৃতীয় অঙ্কে চারটি গর্ভাঙ্ক (প্রথম তিনটিকে গর্ভাঙ্ক বলে শেষের দিকে হঠাৎ চতুর্থ দৃশ্য বলা হয়েছে। ৭২-৯৯ পাতা), চতুর্থ অঙ্কে পাঁচটি গর্ভাঙ্ক (১০০-১৩২ পাতা) এবং পঞ্চম অঙ্কে চারটি গর্ভাঙ্ক (১৩৩-১৫২ পাতা)। এই নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়েছে বলে ছাপা হয়েছে কিন্তু কোন তারিখ বা প্রথম রজনীর পাত্রপাত্রীর নাম উল্লিখিত নাই। এই নাটকে ২১টি পুরুষ এবং ৬টি স্ত্রী চরিত্র ছাড়া খুচরা কিছু স্ত্রী পুরুষ চরিত্র আছে।

ভূমিকায় নাট্যকার লিখেছেন—মদীয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় প্রণীত ইতিহাস হইতে এই নাটক রচনার সাহায্য লইয়াছি। (বিজ্ঞাপন, বাংলার মসনদ)। দুঃখের বিষয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'নবাবী যুগে বাংলা' ও নিখিলনাথ রায় রচিত 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' ও 'মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে' লিখিত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত রূপই নাটকে দেখান হয়েছে। গ্রন্থকার কেবল ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা করেন নাই। জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে বিকৃত করেছেন। এই দিক থেকে বাংলার মসনদ নাটকের রচয়িতা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধে অপরাধী। নিখিলনাথ রায় স্পষ্ট লিখেছেন—'সরফরাজ খাঁ অত্যন্ত বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন এবং তাহার সেই ভয়ানক দোষ দিনদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় ও শাসনকার্য্যে তার অমনোযোগ দর্শনে রায় রায়ান আলমচাঁদ নবাবকে সতর্ক করার অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আলমচাঁদ নবাব সুজাউদ্দিনকে সর্বদা সৎ পরামর্শ প্রদান করিতেন বলিয়া সুজা বিলাসপরায়ণ ও মুক্তহস্ত হইয়াও রাজকোষ শূন্য করেন নাই। আলমচাঁদ সরফরাজকে সেইরূপ ভাবে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করিলে, সরফরাজ তার উপদেশ শ্রবণ করা দূরে থাকুক, বরঞ্চ আলমচাঁদকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন। তদবধি আলমচাঁদ তাঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নবাবের মঙ্গলের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতেন না। অধিকন্তু তাঁহার বিপক্ষবর্গের সহিত যোগদান করিয়া সরফরাজকে রাজ্যচ্যুত করার জন্য চেষ্টা করেন।'[৬] জগৎশেঠের সঙ্গে বিবাদের বিষয় লিখিত হয়েছে—'নবাব শিবিকা পাঠাইয়া জগৎশেঠের গৃহলক্ষ্মীকে নিজ ভবনে আনয়ন করেন এবং প্রাণভরিয়া সেই পুণ্যের অখণ্ড ফলের ন্যায় তাহার রূপসুধা পান করিয়া তাঁহাকে গৃহে যাইতে অনুমতি দেন।'[৭] সরফরাজ খাঁর ইন্দ্রিয়পরায়ণতার কথা বারবার মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, 'তিনি বিলাসের ক্রীতদাস ছিলেন' (৫৭১); 'তাহার উপর বিলাসপরায়ণ হইয়া প্রতিনিয়ত রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেন' (৫৭৬); 'ফলতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ায়' (৫৭১), 'তাঁহার অন্তঃপুর প্রায় অর্দ্ধ সহস্র রমনীতে পরিপূর্ণ ছিল, রমনীগণের তৃপ্তিসাধনকে প্রজাপালন অপেক্ষা গুরুত্ব প্রদান করতেন।' 'মুতাক্ষরীনকার বলিয়াছেন তাহার সামান্য কোন প্রকার শাসনজ্ঞান এমনকি সামান্য কার্য্যদক্ষতা ছিল না। তাঁহার মতে যদি আর কিছুদিন সরফরাজ খাঁ রাজত্ব করিতেন তাহইলে তাঁর রাজ্যমধ্যে যেরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতেই হয়ত একেবারে সমস্ত

বাংলা প্রদেশ ধ্বংস হইয়া যাইত।'[৮] আরো লিখেছেন—'রমনীর রূপসুধা পানের জন্য সর্বদাই তার চিত্ত ধাবিত হইত। এই ভীষণ প্রবৃত্তির বশবতী হইয়া তিনি জগৎশেঠের গৃহলক্ষ্মীকে যেরূপ স্বীয়ভবনে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ তাহার ন্যায় বিলাসী ও অকর্মন্য নবাব যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রদেশত্রয়ের শাসনভার পরিচালনে সম্পূর্ণ অক্ষম তাহাতে সন্দেহ নাই।'[৯] নাট্যকার বিজ্ঞাপনে লিখেছেন যে তিনি নিখিলনাথ রায় রচিত ইতিহাস পাঠ করে নাটক রচনা করেছেন। তার রচিত সরফরাজ চরিত্র দেবতা বিশেষ। নিখিলনাথের সরফরাজ এক ঘৃণিত পশু। সন্দেহ হয় ক্ষীরোদপ্রসাদ নিখিলনাথ রায় রচিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাস আদৌ পাঠ করেছিলেন কিনা? পাঠ করে থাকলে তিনি স্বেচ্ছায় মিথ্যাচার করেছেন। সরফরাজ চরিত্রকে বিকৃত করে তৎকালীন বাংলাদেশের ত্রাতা আলিবর্দী খাঁকে অহেতুক এবং অনর্থক কলঙ্কিত করেছেন। বিজ্ঞাপন পাঠে মনে হওয়া একান্ত স্বাভাবিক যে তাঁর রচিত বাংলার মসনদ নিখিলনাথের ইতিহাস অনুগামী ঐতিহাসিক নাটক। এদিক থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ অন্যান্য ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ নাট্যকারদের তুলনায় অনেক বেশী অপরাধী।

ক্ষীরোদপ্রসাদ স্বীকার করতে লজ্জা পেয়েছেন যে তিনি গিরিশচন্দ্রের অনুগমন করেছেন। সম্ভবত তার মনে হয়েছে ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত ও প্রকাশিত নাটকে গিরিশচন্দ্র যদি সিরাজদৌল্লার কলঙ্কভঞ্জন করে থাকেন তাহলে তিনি সরফরাজখাঁকে নিয়ে ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দে আর এক গিরিশচন্দ্র হতে পারবেন না কেন? সমসাময়িককাল, ঈর্ষা ও অজ্ঞতার শাস্তি কি ভাবে দিয়ে থাকে ক্ষীরোদপ্রসাদের এই কীর্তিই তার উদাহরণ। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে হয়নি যে এই কীর্তি মুষিকের পর্বতের সঙ্গে প্রতিযোগিতার নামান্তর মাত্র। গিরিশপ্রতিভা নাট্য সিরাজদৌল্লার চরিত্রের অনৈতিহাসিকতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত। ক্ষীরোদপ্রসাদের বাংলার মসনদ এক বিস্মৃতপ্রায় অপকীর্তি। স্বকপোলকল্পনাকে ইতিহাস বলে চালাবার মতলব মাত্র নয়, তাকে ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের নামের সঙ্গে যুক্ত করে প্রামাণ্য বলে বর্ণনা করার অপচেষ্টা।

সমস্ত নাটকটি মিথ্যা ঘটনার এক অপরূপ পঞ্জিকা। প্রথমে বলা হয়েছে যে হাজি আহমদ ও আলিবর্দী খাঁ নবাব সুজাউদ্দিনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে-

ছিলেন কিন্তু নবাবের মৃত্যু হল (১/১ পাতা ১)। বলা বাহুল্য একথা একেবারেই মিথ্যা। নবাবের বিলাসব্যসন সুজাউদ্দিনের সময়ে শাসনকার্য্যকে অনিয়মিত করেনি। সরফরাজের সময় করেছে বলেই নবাবকে সরিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়েছে। ঘসেটি বেগমকে ষড়যন্ত্রকারিনী বলা হয়েছে (১/২ পাতা ৫-১০)। বলা হয়েছে তিনি বৃদ্ধ নবাব সুজাউদ্দিনের কামনা জাগিয়ে তাকে মৃত্যুপথে ঠেলে দিয়েছেন। বর্তমানে সরফরাজ খাঁকে প্রলুব্ধ করতে চান। গিরিশচন্দ্রের ঘসেটি বেগমের জনপরিচয় ব্যবহার করার দুরভিসন্ধি এতে প্রকাশ পাচ্ছে। সরফরাজ খাঁর সময় ঘসেটি বেগম এবং তার স্বামী নওয়াজেস মহম্মদ (১/২ পাতা ৫-১১) ঢাকায় অবস্থান করতেন। নবাব সুজাউদ্দিনের কাছে স্বার্থ-রক্ষার জন্য ঘসেটি বেগমকে পাঠান সত্য হতে পারে। কিন্তু বৃদ্ধ নবাবকে কামনা সাগরে ভাসিয়ে তার মৃত্যু ঘটান অলীক কল্পনা। ঢাকায় এই সময়ে ঘসেটি বেগমের উপস্থিতি আর এক নাটকীয় পরিবেশ তৈরী করেছে। সেই নাটকের প্রধান চরিত্ররা হলেন নওয়াজেস মহম্মদ, রাজবল্লভ ও হোসেন কুলি খাঁ।

সরফরাজ খাঁকে বাংলার মসনদের নাট্যকার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ (১/৩ পাতা ১১-১৮), অত্যন্ত চরিত্রবান (২/৬, ৬৭-৭২ পাতা), বাংলা সুবার উন্নতির চিন্তায় বিভোর (১/৬, ৩২-৩৮ পাতা) এবং পত্নীগত প্রাণ (৩/৪ পাতা ৮৮-৯৭) দেখিয়েছেন। বলা বাহুল্য এগুলি সবই ইতিহাস পরিপন্থী নাট্যকারের কল্পনা। জগৎশেঠ সম্পর্কেও নাট্যকারের ধারণা স্পষ্ট নয়। তাই নানা রকম অদ্ভুত ঘটনার অবতারণা হয়েছে (৩/৩)। জগৎশেঠ বা আলমচাঁদের গৃহে নবাব মহিষীর আবির্ভাব প্রায় পাগলামির পর্য্যায় পড়ে। নাট্যকারের বাতুলতা অবশ্যই—নবাব মহিষীর নয়। মুর্শিদকুলিখাঁর অর্থ জগৎশেঠের গদীতে থাকা এই রকমের আর এক অসম্ভব কাহিনী। ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায় বালক জালিমসিংহের এক সুন্দর কাহিনী রচনা করেছেন। (একটি ক্ষুদ্র কাহিনী। মুর্শিদাবাদের কাহিনী—নিখিলনাথ রায় পাতা ১২১-১২৯ ২য় সং) এই কাহিনী অনুযায়ী সরফরাজ খাঁর এক রাজপুত সেনানায়ক বিজয়সিংহ গিরিয়ার যুদ্ধে নিহত হলে তার নবমবর্ষীয় বালকপুত্র জালিমসিংহ অসীম সাহসে পিতার মৃতদেহ রক্ষা করে। আলিবর্দী খাঁ এই বীর বালকের সাহসে মুগ্ধ হয়ে তাকে পুরস্কৃত করেন এবং তার পিতার দেহ যথাযোগ্য সম্মানে

সৎকারের আদেশ দেন। এই ঘটনা মুতাক্ষরীন ও রিয়াজুস শালাতিনের লেখকদ্বয়ও সস্নেহে বর্ণনা করেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ জালিম সিংহকে নাটকের চরিত্র করে তাকে দিযে নানা অসম্ভব ঘটনা করেছেন। এমনকি নবাব প্রাসাদে যুবক জালিমসিংহকে রক্ষী হিসাবে দেখিয়ে অন্তঃপুরে তাকে অবাধ গতি দিয়েছেন (৪/১)। এই আলোচনায় ছেদ টেনে বলা অনুচিত হবেনা যে 'বাংলার মসনদ' নাটক অত্যন্ত নিম্নপর্য্যাযের রচনা। ইতিহাসের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই। নাট্যকার বাংলার তথনকার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে যে নাটক রচনা করেছেন তাতে ১৭৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নাই এটাই বোঝা যায।

সরফরাজ খাঁকে কেন্দ্র করে ভাল নাটক লেখার সুযোগ আছে। শাসন-কর্তার বিলাসে দেশ যথন অধোগামী তথন সভাসদরা যুদ্ধ করে নবাবকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে সফল হযেছেন এমন দৃষ্টান্ত এদেশে বেশী নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায যে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের বিরুদ্ধে ক্রমওয়েলের বিদ্রোহ ও যুদ্ধের সঙ্গে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনার মিল আছে। কিন্তু বাংলার মসনদ কোন উঁচুভাব নিয়ে রচিত হয নাই। নেহাৎ দর্শক-তুষ্টির কল্পনাশ্রয়ী নাটক সমসাময়িক কালের (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পরবর্তীকাল) ফ্যাসান অনুযায়ী রচিত। ইতিহাসের নামাবলী কেবল দর্শকদেব ফাঁকি দেবার মতলবেই এই নাটকের গায়ে জড়ান হয়েছে।

পরবর্তীকালের ইতিহাস দেখলে সন্দেহ থাকেনা যে গিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে আলিবর্দীর জয়ে বাংলার কতো উপকার হয়েছে। নবাব আলিবর্দীখাঁ মহবৎ জঙ্গ নামধারণ করে মসনদে আরোহণ করলেন। শিথিল শাসন ব্যবস্থাকে শক্ত হাতে টেনে ধরলেন। নওয়াজেস মহম্মদ (বড় জামাই) ঢাকার শাসনকর্তা থাকলেন তাকে সেথানকার নায়েব দেওয়ানী ও নিজামীর পদ দেওয়া হল। তার ওপর নবাবদের নিজস্ব জায়গীরগুলিও দেখাশোনার ভার পড়ল। হোসেন কুলিখাঁ তার সহকারী নিযুক্ত হলেন। সৈয়দ আহমদখাঁকে (মেজ জামাই) পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল। প্রিয়তমা কন্যা আমিনার স্বামী জৈনুদ্দিন আহমদখাঁ হৈবৎজঙ্গকে (ছোট জামাই) পাটনার শাসনকর্তা ও নায়েব দেওয়ানী ও নিজামীর পদ দেওয়া হল। দেওয়ান আলমচাঁদের এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে তাই জানকীরাম (ইনি আলিবর্দীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির দেওয়ান ছিলেন)

দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। সবার প্রতি দাক্ষিণ্য দেখিয়ে আলিবর্দী খাঁ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সরফরাজখাঁর পক্ষীযদের বশীভূত করলেন। রাজকোষে অর্থাভাব দূর করার জন্য আদায়েব দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওযা হল। রাজস্ব ঘাটতি সুদৃঢ়ভাবে দমন করা হল। বাংলার বৃহত্তম জামিনদার ৬০ লক্ষ টাকা আয়ের নাটোর রাজবংশ দীর্ঘদিনের রাজস্ব বাকী ফেলেছিলেন। একাধিক তাগিদ দিযে কোন ফল না পেযে নবাব আলিবর্দীখাঁ ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামকান্তের (রাণী ভবানীর স্বামী) জামিনদার পদ খারিজ করে দিযে ওই বংশের বিষ্ণুরামের পুত্র দেবীপ্রসাদ রায়কে নাটোরের রাজবংশের অধিকর্তা ও রাজস্বের জামিনদার ঘোষণা করলেন। নবাব আদেশে সৈন্যদল গিয়ে দেবীপ্রসাদকে বহাল করে এল। রাজা রামকান্ত আর রাণী ভবানী ছুটে এলেন মুর্শিদাবাদে। ডেকে আনলেন তাদের বৃদ্ধ দেওয়ান দযারাম রায়কে। তারপর বহু আবেদন নিবেদন করে রাজস্বের পরিমাণ বাড়িযে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং জগৎশেঠের আনুকুল্যে আবার স্বপদ ফিরে পেলেন দীর্ঘ চার মাস পর। দয়ারামের মধ্যস্থতায় দেবীপ্রসাদ কিছু সম্পত্তি পেলেন।[১০] বিস্তারিতভাবে এই ঘটনা বলার উদ্দেশ্য তৎকালীন শাসন ব্যবস্থার প্রতিরূপ স্পষ্ট করে দেখান। এই ঘটনায় বোঝা যায় যে মুর্শিদকুলি সৃষ্ট ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দের নয়া রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের ফলে রাজস্ব আদায়ের জামিনদার পদ সৃষ্টি হয় জমিদার পদ নয়। নবাবের ইচ্ছাতেই তাই এই শ্রেণীর স্থায়িত্ব ও পদমর্য্যাদা নির্ভর করত। এই শ্রেণীর জমির ওপর কোন অধিকার ছিলনা। রাজস্ব আদায় করে নবাব সরকারে প্রেরণ করা এবং আদায়ী কর ও সরকারী রাজস্বের ব্যবধান ভোগ করাই ছিল তাদের একমাত্র অধিকার।

কেবল শাসনব্যবস্থা নয় নবাবী ফৌজকেও আলিবর্দী খাঁ ঢেলে সাজালেন। এ কাজে তাঁর থেকে যোগ্য ব্যক্তি সমস্ত মোগল সাম্রাজ্যে ছিল কি না সন্দেহ। এই কাজে তার সুযোগ্য সহকারী হলেন মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ যিনি মীরজাফর নামে বাংলার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছেন। ইনি বকসী নিযুক্ত হলেন। সৈন্যবাহিনীকে বেতন দেওয়া হল এর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। মীরজাফর তার প্রভুর মতই ভাগ্যান্বেষী। কপর্দক শূন্য এই কঠোর যুদ্ধ ব্যবসায়ীকে আলিবর্দী খাঁ কেবলমাত্র নিজের মনের মতো করে গড়ে তুললেন না তাঁকে আপনার বৈমাত্রেয় ভগিনী শাখানুমের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে অত্যন্ত

বিশ্বাসের আসনে স্থাপনা করলেন। কালে মীরজাফর আলিবর্দী খাঁর প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে এই বিশ্বাসকে নিজের শক্তি ও বুদ্ধিতে অটুট রাখেন।

আলিবর্দী যখন পাটনার শাসনকর্তা তখন তাঁর দৌহিত্র মির্জা মহম্মদ সিরাজদৌল্লার জন্ম হয় ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে)। তাঁর মাতা আমিনা বেগম নবাব আলিবর্দীর কনিষ্ঠা কন্যা এবং পিতা জৈনুদ্দিন আহমদ খাঁ আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজি আহমদ খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র। জন্মাবধি সিরাজ মাতামহের নয়নের মণি। তার জন্মের সঙ্গে আলিবর্দীর শ্রী, ঐশর্য্য, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির বৃদ্ধি ঘটায়, তিনি সিরাজকেই তার সৌভাগ্যসূর্য্য বিবেচনা করতেন। বিশেষ তাঁর পুত্র না থাকায় সিরাজ পুত্রাধিক স্নেহে লালিত হলেন। সিরাজের দুটি ভাই ছিল মির্জা কাজিম ও মির্জা মেহেদী। মির্জা কাজিমকে নিঃসন্তান নওয়াজেস আহমদ খাঁ ও ঘসেটি বেগম দত্তক গ্রহণ করেন। তখন তার নাম হল এক্রামাদৌল্লা। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে এক্রামাদৌল্লার মৃত্যু হলে নওয়াজেস মহম্মদ শোকে অধীর হয়ে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। এক্রামাদৌল্লার শিশুপুত্রকে মুরাদদৌল্লা নামে বিধবা ঘসেটি বেগম বর্ধিত করেন। প্রচলিত ইতিহাস অনুযায়ী পলাশীর যুদ্ধের পর মুরাদদৌল্লার মীরনের প্ররোচনায় গুপ্ত ঘাতকের হাতে মৃত্যু হয়। কিন্তু এ ইতিহাস ভুল। পলাশীর যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরেও মুরাদদৌল্লার বেঁচে থাকার প্রমাণ আছে। যথাসময়ে তা বিবৃত হবে। সিরাজকে হত্যা করাবার পর মীরজাফর পুত্র মীরণ (সিরাজের মামা মীরণ শোনায় ভাল) নৃশংস ভাবে সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মির্জা মেহেদীকে হত্যা করান। দুই খণ্ড কাঠের তক্তার মাঝে তাকে চেপে মারা হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে। এই কারণে ঐতিহাসিকগণ মনে করেছেন যে আলিবর্দী বংশের সব জীবিত পুরুষরাই মীরণের বলি হয়েছে।

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় জন্ম হলেও ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর হতে সিরাজদৌল্লা মাতামহের কাছে মুর্শিদাবাদে বসবাস করতেন। মাতামহের আদরের দুলাল, পিতা মাতা অথবা ভ্রাতা ভগিনীর সম্পর্কচ্যুত হয়ে একা বিলাস-ব্যসনের মধ্যে বর্ধিত হলেন। অত্যন্ত বালক অবস্থা থেকেই তিনি নিজেকে এই ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষুদে নবাব ভাবতে অভ্যস্ত হলেন। তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করা হত। সুতরাং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে তার কুপ্রবৃত্তিগুলি শতগুণে বৃদ্ধি পেল। মাতামহর

স্নেহ সিরাজদৌল্লার জীবনে প্রচণ্ড অভিশাপ হয়ে তাঁর জীবনকে বিপথগামী করে দিল।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ আসার সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিল। ওই বছর ২০শে এপ্রিল ইংরেজ কোম্পানী কলকাতা থেকে লণ্ডনের কোর্ট অফ ডিরেকটরদের লিখেছেন :—"আমরা কাশিমবাজারের স্যার ফ্রান্সিস রাসেলের কাছ থেকে গত ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল খবর পেয়েছি যে কাশিমবাজারে মারাঠা আক্রমণ হতে পারে। বর্ধমান রাধানগর ও অন্যান্য জায়গা থেকে আমাদের ব্যবসায়ীরা এই খবরই এনেছে। কলকাতা থেকে কুঠি রক্ষার জন্য একটি বড় শক্তিশালী সৈন্যদল অনতিবিলম্বে কাশিমবাজারে পাঠান হল।[১১] মারাঠাদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য কুঠির চারিদিকে উঁচু প্রাচীর ও মাঝে কামান বসাবার জন্য গম্বুজ তৈরী করা হল। লণ্ডনে চিঠি লেখা হল কুঠি এখন দুর্ভেদ্য। তবে ভাবনা গেল না। ভয় হল নবাবী নজরাণার পরিমাণ ভালই হবে। প্রতি গম্বুজের জন্য আলাদা নজর দিতে হবে। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নবাবী সমন না পেয়ে ইংরেজ অবাক হল। লণ্ডনে লিখে পাঠাল যে যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নবাব সম্ভবত অনুমোদন করেছেন। নজরাণার দাবী দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত করা হবে না আশা করা যায়।[১২]

১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর মারাঠা দস্যুরা বাংলায় আসতে সুরু করল। নবাব স্বয়ং বর্গী দমনের ভার নিলেন। বার বার যুদ্ধে হেরে গিয়েও মারাঠা দস্যু দমিত হল না। সাময়িক শান্তির পর আবার গ্রামনগর আক্রমণ করে লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অত্যাচার, অপহরণ সুরু করত। বর্গীর হাঙ্গামা বাংলা বিহারের জাগ্রত বিভীষিকা। নবাব কখনও তাদের অর্থ দিয়ে শান্ত করতেন কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন। শেষে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের গুপ্ত হত্যা নবাবের প্ররোচনায় সংঘটিত হল। কিন্তু পর বৎসর আবার বর্গীরা এল দস্যুতা ও অগ্নিসংযোগে গ্রাম বাংলাকে ছারখার করতে লাগল।

১৭৪২-এর মার্চ মাসে বর্গাদের আগমন সংবাদ দাবাগ্নির মতো কাশিম-বাজারে এসে পৌঁছল। বীরভূম ধ্বংস করে ৮০০০ অশ্বারোহী মুর্শিদাবাদ অভিমুখে ছুটে চলেছে নিমেষ মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল। আরো রাষ্ট্র হল যে

মারাঠা দস্যু কেবল লুণ্ঠন ও অত্যাচার করেনা সুযোগ পেলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আটক রেখে অর্থ আদায় করে। স্ত্রীলোকমাত্র উপভোগের সামগ্রী। জাতি কুল মান নির্বিশেষে তাদের ওপর অত্যাচার করা হয় দলবদ্ধ ভাবে। দেবালয়ে আশ্রয় নিলেও বর্গীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না। একমাসের মধ্যে পলায়ন সম্পূর্ণ হয়ে গেল। প্রভাবশালী একটি ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীকে মুর্শিদাবাদে বা কাশিমবাজারে দেখা যেত না। অন্য মানুষের পক্ষে লুকিয়ে থাকা বা পালিয়ে যাওয়া সম্ভব কিন্তু জগৎশেঠের মহিমাপুরের বাড়ী বা টাঁকশাল শুধু প্রকৃতিতে নয় আকৃতিতেও বিরাট। সেখানে নবাবের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে মারাঠা দস্যুরা জগৎশেঠের গদী লুঠ করে দুই কোটি (মতান্তরে তিন লক্ষ) টাকা নিয়ে চলে গেল। তার সঙ্গে নিয়ে গেল নানা রকমের মূল্যবান খুচরা জিনিষ।[১৩] কাশিমবাজার থেকে কলকাতায় চিঠি দিলেন ইংরেজ কোম্পানী ৭ই জুন ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ যে বর্গীর হাঙ্গামার পর কাশিম-বাজার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এমন কি রাজধানী মুর্শিদাবাদেও নিয়ম শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। কুঠির নিকটবর্তী একাধিক চুরি ডাকাতির প্রতি নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে নবাব আলিবর্দী বর্গীদের পেছনে ধাওয়া করে তাদের কাটোয়া পর্য্যন্ত তাড়িয়ে দিলেন। সলিমুল্লা লিখেছেন দেশের সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাদের স্ত্রীলোক ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য গঙ্গার পূর্বপারে দলে দলে সরে গেলেন। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিমপারে মারাঠাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে নবাব প্রস্তুত হলেন।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামা আবার সুরু হল। জগৎশেঠ এবার আগে থেকেই সাবধান হয়েছেন। টাকাকড়ি, সম্পদ, বাড়ীর মেয়েদের এমন কি ছোট ছেলে মেয়েদের পর্য্যন্ত ঢাকায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। স্বয়ং নবাব আলিবর্দী ও নবাব ভ্রাতা হাজি আহমদও অর্থ ও সম্পদ ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন। তারপর বর্গীদের একটা দলকে অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করে অন্য দলকে নবাব যুদ্ধে পরাজিত করলেন। গঙ্গারামের বিবরণী থেকে বর্গীর অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী ভয়াবহতা জানতে পারা যায়। বর্গী কথার উৎপত্তি মারাঠা 'বার্গীর' শব্দ থেকে। সব থেকে নিম্নতম মানের সৈন্যদের এই নামে ডাকা হত। ফেব্রুয়ারী মাস থেকে বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হল। নবাব যুদ্ধ সাজে প্রস্তুত হলেন। কলকাতায় ইংরেজ বণিকরা সহরের তিন ধারে পরিখা খনন করে তার নাম দিল মারাঠা ডিচ।

এই বছরেই ৩০শে মার্চ চৌবিয়াগাছিতে (বহরমপুর থেকে ১০ মাইল বর্তমানে নাম সাবিগাছি। ভাগিরথীর পশ্চিমপারে নবাবের সঙ্গে মারাঠা নায়ক পেশোয়া বালাজী রাওএর সাক্ষাৎ হয়। নবাব বার্ষিক ২২ লক্ষ টাকা চৌথ হিসাবে দিতে রাজী হলেন। পেশোয়া নিজে রঘুজী ভোঁসলাকে সামলাবার দায়িত্ব নিয়ে কথা দিলেন যে তার দলবল আর বাংলা সুবায় অত্যাচার করবে না। এরপরই কাটোয়া থেকে বীরভূম যাত্রী রঘুজী ভোঁসলার দলকে আক্রমণ করলেন নবাব ও পেশোয়ার যৌথ বাহিনী। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস থেকে ১৭৪৪ খ্রী: ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত, নয় মাসের ক্ষণস্থায়ী শান্তি বাংলায় অনুভূত হল।[১৪]

পরবৎসর কিন্তু মারাঠারা আবার এল। একদল নয়, দুইদলই তাদের অত্যাচারী বাহিনী দিয়ে বাংলাকে তছনচ করে দিল। ইতিমধ্যে পেশোয়া ও ভোঁসলার মধ্যে বোঝাপড়া হয়েছে কাজেই নবাবের সঙ্গে সন্ধির সর্ত হাওয়ায় উড়ে গেল। নবাব বুঝলেন যে বাইশলক্ষ টাকার বিনিময়ে তিনি একটির জায়গায় দুইটি লুব্ধ মারাঠাবাহিনীর সামনে লুণ্ঠনের ও ধর্ষণের পথ উন্মুক্ত করেছেন. দিল্লী থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবেনা বুঝে নবাব নিজের বুদ্ধির ওপর এবং তার মন্ত্রণা পরিষদের ওপর নির্ভর করতে প্রস্তুত হলেন। রাজা জানকীরাম এক চমৎকার বুদ্ধি দিলেন। ৩০শে মার্চ ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ, মারাঠা সেনাপতি ভাস্কররাম কোলহাতকার যিনি ভাস্কর পণ্ডিত নামেই সমধিক পরিচিত, বাইশজন সৈন্যাধ্যক্ষকে সঙ্গে করে নবাব আলিবর্দীর সঙ্গে মিলিত হলেন মুর্শিদাবাদের মানকড় পরগণায়। ভাস্কর পণ্ডিত আশা করেছিলেন গতবছরে পেশোয়াকে যেভাবে নবাব সন্তুষ্ট করেছেন ২২ লক্ষ টাকা দিয়ে এবারও তাই করবেন। অর্থের ব্যাপারে মারাঠা নায়কগণ কেউ কাউকে বিশ্বাস করতেন না। পাছে সুযোগ পেয়ে ভাস্কর পণ্ডিত নিজের ভাগে বেশী টাকা রাখেন তাই বাইশজন সৈন্যাধ্যক্ষ নবাবের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন। চৈত্র মাস রাজস্ব আদায় সবে সাঙ্গ হয়েছে নবাবের রাজকোষ পরিপূর্ণ। তাছাড়া গতবছর এইদিনেই তো পেশোয়ারের সঙ্গে নবাবের বোঝাপড়া হয় নগদ বাইশলক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। অর্থলোভ ছাড়া তেইশজন মারাঠা নায়কের নবাবের সঙ্গে দেখা করতে আসার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। মানকড়ের নবাবী শিবিরের বর্ণনা ও

ইতিহাস মুসলমানী এবং মারাঠা ইতিহাসে অপূর্ব নাটকীয় রচনা। এই সাক্ষাৎকারকে কেন্দ্র করে সুন্দর নাটক সৃষ্টি হতে পারে। বিয়োগান্ত নাটক। আলোচনা চলাকালীন ভাস্কর পণ্ডিত ও তার বাইশজন সহাধ্যক্ষকে নবাবের আদেশে হত্যা করা হয়।[১৫] এই হত্যালীলার নায়ক মীরজাফর এবং সহ-কর্মীদের মধ্যে ছিলেন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা আর মীরকাশিম নামে এক সাহসী তরুণ যুবক। এই হত্যাকাণ্ডে তিনি যে বীরত্ব দেখালেন তাতে মীরজাফর খাঁ তাকে তার জামাতা করে ফেললেন।

বর্গীব হাঙ্গামা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কেন বর্গীর হাঙ্গামা হল সেটাও বোঝা দরকার। মারাঠারা দস্যু ছিল না। বাংলা বিহারের অত্যাচার করবার তাদের ছিল আইনসঙ্গত বাদশাহী অধিকার সেটাই এবার বিবৃত হবে। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বাদশাহী অনুমোদনই বর্গীর হাঙ্গামার কারণ। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলা নবাব আলিবর্দীর সঙ্গে মিলিত হন। সঙ্গে ছিলেন ভাস্কর পণ্ডিত। এই সময়ে নবাব জানতে পারেন যে দিল্লীর বাদশাহ, মারাঠা ছত্রপতি সাহুকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বার্ষিক ৩৫ লক্ষ টাকা চৌথ দান করেছেন। একমাত্র সর্ত যে রাজা সাহুকে ঐ চৌথ বাহুবলে আদায় করতে হবে। রাজা সাহু এই চৌথ রঘুজী ভোঁসলাকে দান করলেন। দিল্লীর বাদশাহ কিন্তু ইতিমধ্যে পেশোয়া বালাজীরাওকে এই খবর জানিয়ে দিয়েছেন। পেশোয়া বালাজীরাও রঘুজী ভোঁসলার দীর্ঘদিনের শত্রু। কাজেই বাদশাহী আদেশে চৌথ আদায় করা এবং রঘুজীকে নিরস্ত্র করবার জন্য বালাজীরাও সসৈন্যে বাংলা সুবায় প্রবেশ করলেন। রঘুজী ইতিমধ্যে উড়িষ্যায় ঘাঁটি স্থাপনা করেছেন। সুতরাং বাদশাহী আদেশের ফলস্বরূপ দুইদল মারাঠাবাহিনী বাংলায় এল এবং অত্যাচারে অনাচারে বাংলার জীবন দুর্বিসহ করে তুলল। অবশেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী সুবর্ণরেখা নদীর ওপারে মারাঠাদের সরে যেতে হল এবং তৎকালীন উত্তর উড়িষ্যার কিছু অংশ মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে যুক্ত হল। শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশ ও বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিতে নবাব স্বীকৃত হলে বর্গীর উপদ্রব সম্পূর্ণভাবে নিরসিত হল।[১৬]

বঙ্গেবর্গী : নিশিকান্ত বসুরায়॥

নিশিকান্ত বসুরায় 'বঙ্গে বর্গী' নাটকে নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্বের

প্রথম চার বছরের ইতিহাস অবলম্বন করেছেন এবং ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুতে নাটকের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। এই নাটকের ঐতিহাসিক কাল ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। বঙ্গে বর্গী ১৩২৮ সালে (1922 Feb) প্রকাশিত হয় (প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায এণ্ড সন্স)। একবছরের মধ্যে ১৩২৯ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয। সুতরাং নাটক হিসাবে এটি যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাটকে প্রথম অভিনয় রজনীব তারিখ লেখা আছে, মনোমোহন থিয়েটার শনিবার ২৮শে মাঘ ১৩২৮ সাল। ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকায খ্যাতনামা অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) অপূর্ব অভিনয় করায জনসাধারণের মধ্যে নাটক অত্যন্ত আদৃত হয়েছিল।

গল্পাংশে বলা হয়েছে যে ভাস্কর পণ্ডিত নবাব আলিবর্দীর কাছে এককোটী মুদ্রা ও নবাবের সঙ্গে যে সমস্ত রণহস্তি আছে সেগুলো দাবী করেছেন। দাবীর কারণ স্বরূপ ভাস্কব পণ্ডিতেব সংলাপ, 'বাহুবলে মহম্মদ সাহকে পরাস্ত করে রাজকরের এক চতুর্থাংশ চোথ আদাযের ফার্মান পেযেছি। বাংলায় পদার্পণ করে আমি মাত্র একলক্ষ মুদ্রা চৌথ চেযেছিলাম। তখন আমার সে প্রস্তাব ভিক্ষুকের কাকুতি মনে করে আপনারা গ্রাহ্য করেননি। আজ আমার চাইবার অধিকার হযেছে—তবু মাত্র এককোটি মুদ্রা চেয়েছি।' (পাতা ৯॥ ১/২) সুতরাং ভাস্কর পণ্ডিতের বাংলায় আসার কারণ শান্তভাবে তাঁর প্রাপ্য চোথ আদায করা এবং নবাব আলিবর্দী খাঁ এই অর্থ দিতে অস্বীকার করায় বিরোধ ঘনীভূত হচ্ছে। প্রথম দৃশ্যেই দেখান হয়েছে বর্দ্ধমানে নবাব অবরুদ্ধ, নবাব দৌহিত্র যুবক সিরাজ পিপাসায় মৃতপ্রায়। অবশেষে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে জানকীরাম জল এনে তৃষ্ণার্থ সিরাজদৌল্লাকে বাঁচালেন এবং নবাব সঙ্গে সঙ্গে তাকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করলেন। সিরাজদৌল্লা এই নাটকের এক প্রধান চরিত্র। তাকে উপনায়ক বা প্রতিনায়ক বলা চলে। মোহনলাল এই নাটকে নায়কের মর্য্যাদা পেয়েছেন। তিনি বাঙালী বীর এবং তাঁর ভগ্নীর নাম মাধুরী। দুইজোড়া গল্প একসঙ্গে চালান হয়েছে। প্রথম গল্প গ্রামস্থ বৃদ্ধ প্রতিপত্তিশালীদের ইচ্ছা মোহনলালের ভগ্নীর সঙ্গে এক বৃদ্ধের বিবাহ হয়। মোহনলাল তাতে আপত্তি করায় তাঁরা রুষ্ট হলেন। তারপর মাধুরীকে বর্গীরা অপহরণ করলে তাঁরা তাকে স্বেচ্ছায় কুলত্যাগিণীর কলঙ্ক দিয়ে মোহনলালের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করলেন। ভাস্কর পণ্ডিতের

আনুকূল্যে নিষ্পাপ মাধুরী স্বগ্রামে এসে শুনলেন তাদের সর্বস্ব যায় গৃহখানিও ভূমিসাৎ হয়েছে। রুষ্ট তিক্ত মাধুরী যখন বর্গীদের এই গ্রামস্থ হিন্দুদের বধ করার আদেশ দিয়েছেন তখন ভাস্কর পণ্ডিত বাধা দিচ্ছেন। ভাস্কর পণ্ডিতের মহত্বে মাধুরী স্থির হলেন বটে কিন্তু যখন ভাস্কর পণ্ডিতের নিজ কন্যা গৌরী অপহৃতা হয়ে সিরাজকুঞ্জে নীত হলেন তখন মারাঠা নায়ক আর স্থির থাকতে পারলেন না। সেকথা বলার আগে দ্বিতীয় গল্প। সিরাজ ফৈজীকে ভালবাসেন। কিন্তু ফৈজীকে ব্যাভিচারিণী দেখে তাকে হত্যা করার হুকুম দিলেন। নারীজাতির প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণায় সিরাজ আদেশ দিলেন প্রতি রাত্রে তাঁর নিত্যনূতন সঙ্গিনী চাই এবং প্রতিদিন সকালে তাদের নিয়মিত বধ করা হবে। সুতরাং নাটকের প্রয়োজনে ভাস্কর পণ্ডিতের কন্যা অপহৃতা হয়ে সিরাজের ভোগের জন্য এলেন। এবার নানারকমের মহত্ব সুরু হল। মাধুরী এলেন মারাঠা পক্ষে গৌরীবাঈকে উদ্ধার করতে। নবাব পক্ষে মোহনলাল বাধা দিলেন। সিরাজ গৌরীবাঈকে ভগ্নী সম্বোধনে যথাযোগ্য সম্মানে ফেরৎ পাঠালেন। লুৎফউন্নিসা নামে এক বাঁদী এই ব্যাপারে প্রচুর মহত্ব প্রকাশ করায় নবাব আলিবর্দী সিরাজদৌল্লার সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছিলেন। নাটকের মীরজাফররা চিরকালই কুচক্রী, কাজেই সিরাজ তাকে হীরাঝিলের গোলকধাঁধাঁয় ফেলে বিভ্রান্ত করলেন। বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দী সিরাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন।

ওদিকে কন্যাকে হারিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত উন্মাদপ্রায় ধ্বংসলীলা সুরু করেছেন। চমৎকার সংলাপের ভাষা—'আজও বাংলাকে শকুনী গৃধিণী শৃগালের বিলাস-কাননে পরিণত করতে পারনি—এখনও রক্তের সমুদ্র, কঙ্কালের পাহাড় তৈরী হয়নি—আজও অভিশপ্ত দেশটাকে ভেঙ্গেচুরে পিষে সাগরে বিলীন করতে পারনি—কি করেছ! কি করেছ মূর্খ অকর্মন্য অপদার্থের দল।' উত্তরে তাঁর প্রধান সহকারী তানোজী বলেছেন—'যা করেছি, শয়তানও বোধহয় তা করতে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। মায়ের বুক থেকে ছেলে ছিনিয়ে এনে মায়ের সম্মুখে তাকে হত্যা করেছি···শোকসন্তপ্তা জননীর হাহাকারে ভরা বুকখানি পদাঘাতে চূর্ণ করে হাসতে হাসতে চলে এসেছি। শিশুর থেকে অসহায় বৃদ্ধ, যম যাকে স্পর্শ করতে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় তারও—তারও বক্ষে অম্লান-বদনে শেল বিঁধিয়ে দিয়েছি।···যজ্ঞোপবীত

দেখে ডরাইনি, ব্রহ্মহত্যায় কুণ্ঠিত হইনি, মাতৃজাতির ধর্ম নিয়ে—পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী—আর আমি সেই পাপ চিত্রের কথা স্মরণ করতে পারছিনা।' (১৪৫-১৪৬ পাতা ৪/৬) ইত্যাদি। ইতিমধ্যে গৌরীবাঈ পিতার কাছে ফিরে যাচ্ছেন। ভাস্কর পণ্ডিত যুদ্ধ উন্মাদ, কন্যাকে তোপের মুখে উড়িয়ে দিলেন। তাই শেষ দৃশ্যে ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন তাঁকে গুপ্তহত্যা করার খবর পেয়েও। কন্যা হত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি যেন বিশ্বাসঘাতক নবাবের অস্ত্রের তলায় আত্মবলী দিলেন। তাই তার মরণ বাঞ্ছিত, কন্যার সঙ্গে মিলনের স্বপ্নে বিভোর। হত্যাকাণ্ড ঘটে যাবার পর মহৎ চরিত্ররা যথা সিরাজ, মোহনলাল ও মাধুরীর প্রবেশ, সংলাপ 'বড় দেরী হয়ে গেল।'

বঙ্গে বর্গী নাটক পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৬। প্রথম অঙ্কে নয়টি দৃশ্য (১ থেকে ৪১ পাতা), দ্বিতীয় অঙ্কে নয়টি দৃশ্য (৪২ থেকে ৯২ পাতা), তৃতীয় অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য (৯৩ থেকে ১২৪ পাতা), চতুর্থ অঙ্কে সাতটি দৃশ্য (১২৫ থেকে ১৫১ পাতা) ও পঞ্চম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য (১৫২ থেকে ১৭৫ পাতা)। ভূমিকায় নাট্যকার, অগ্রজতুল্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) এবং সুসাহিত্যিক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। একথা আর একবার নিঃসন্দেহে স্বীকার করা চলে যে কেবল নাটক হিসাবে বঙ্গে বর্গী উঁচু দরের নাটক। প্রত্যেক ঘটনার কার্য্য-কারণ দেওয়া হয়েছে। বর্গীর অমানুষিক অত্যাচার এবং সিরাজদৌল্লার সম্ভোগ পিপাসার পেছনে ব্যক্তিগত ঘটনার কারণ দেখিয়ে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। আত্মদানের মহত্বে ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যু এক অতি মহৎ কীর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাটকের সমালোচনা করার আগে তাই নাট্যকারকে সাধুবাদ জানাই। ঐতিহাসিক ঘটনার ভিত্তিতে তিনি সুন্দর এক নাটক বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছেন অথচ অন্য অনেকের মতো তাকে ঐতিহাসিক নাটক আখ্যা দিয়ে মিথ্যাচার করেননি। সাধুতার দিক থেকে নিশিকান্ত বসুরায় মহাশয় আমাদের নমস্য।

বঙ্গে বর্গী নাটকের ইতিহাস যে সম্পূর্ণভাবে প্রক্ষিপ্ত সে কথা বলাই বাহুল্য। ভাস্কর পণ্ডিত কোন বাদশাহকে কখন পরাজিত করেননি বা চৌথ আদায়ের কোন অধিকার তার ছিল না। তিনি নাগপুরের মারাঠা অধিকর্তা

রঘুজী ভোঁসলের কর্মচারী হিসাবেই বাংলায় আসেন এবং লুণ্ঠনে অত্যাচারে দেশকে জর্জরিত করেন। তার মৃত্যুতে বাঙ্গালী স্বস্তি পেয়েছিল। ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুর পরও কিন্তু মারাঠা আক্রমণ বা বর্গীর অত্যাচার থামেনি। প্রতি বছর অর্থাৎ ১৭৪৫, ১৭৪৬, ১৭৪৭, ১৭৪৮, ১৭৪৯, ১৭৫০ ও ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দেও বাংলায় নিয়মিত মারাঠা আক্রমণ হয়েছে এবং নবাব তাদের দমন করতে সৈন্যবাহিনীর পুরোধায় ছুটে বেরিয়েছেন। ৬৪ বছর বয়স থেকে ৭৩ বছর বয়স পর্য্যন্ত নবাব আলিবর্দী অশ্বারোহণে নিজে বারবার সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করেছেন। বৃদ্ধ নবাবের এই কর্মঠতা খুবই প্রশংসাযোগ্য। বঙ্গে বর্গীতে যে স্থবির নবাব আঁকা হযেছে যিনি সহজে কোনকাজেই মনস্থির করতে পারেন না, ঐতিহাসিক নবাব চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নাট্যকার প্রধান দুই প্রতিপক্ষ অর্থাৎ ভাস্কর পণ্ডিত ও নবাব আলিবর্দীকে যেভাবে দেখিয়েছেন এবং বিরোধের যে কারণ বলেছেন তা সবই ইতিহাস বিরোধী এবং কাল্পনীক।[১৭]

অন্য চরিত্রগুলির মধ্যে সিরাজদৌল্লা, মোহনলাল ভগিনী, লুৎফউন্নিসা বাঁদী ও ফৈজী ঐতিহাসিক চরিত্র এবং সিরাজদৌল্লার জীবনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ভাস্কর পণ্ডিতের গুপ্ত হত্যার সময় সিরাজের বয়স মাত্র ১১ বৎসর (জন্ম ১৭৩৩ খ্রীঃ)। সুতরাং সিরাজকে কেন্দ্র করে সমস্ত ঘটনাই কাল্পনিক ও অনৈতিহাসিক। সিরাজদৌল্লা সম্পর্কে আলোচনার সময় এই বিষয়গুলি আবার উল্লেখিত হবে। মিরজাফর চরিত্র এই নাটকে অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তাকে তাঁর পরবর্তী পরিচয় অনুযায়ী খল নায়কের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে নবাব আলিবর্দী নিজ হাতে রাজ্যশাসন করতেন, তাঁকে বাজে কথায় ভুল বোঝান কঠিন ছিল। কঠোর চেষ্টায় নবাব আলিবর্দী বাংলায় শান্তিস্থাপনা করেন। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে নবাব আলিবর্দীর মৃত্যু পর্য্যন্ত বাংলার অর্থনৈতিক উন্নতি একান্তভাবে লক্ষণীয় এবং অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। উপসংহারে একথা নিশ্চিন্তভাবেই বলা চলে যে বঙ্গে বর্গী নাটক পরিপূর্ণভাবে কাল্পনিক গল্প।

'মোহনলাল এই নাটকের এক মুখ্য চরিত্র। বলা হয়েছে তিনি বাঙ্গালী, মহান ও ন্যায়পরায়ণ। ভাস্কর পণ্ডিতের গুপ্ত হত্যা বন্ধ করতে তিনি চেষ্টা

রেছেন নাটকে দেখান হয়েছে। বলা বাহুল্য এগুলি সবই ভুল তথ্য। মোহনলাল কাশ্মীর নিবাসী এক যুদ্ধ ব্যবসায়ী। তার সঙ্গে নবাব দৌহিত্র সিরাজদৌল্লার সখ্য ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে হয়েছে এমন কোন প্রমাণ নাই। উপরন্তু ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছে এটাই প্রমাণ সাপেক্ষ। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মোহনলাল তার ভগ্নিকে সিরাজের কাছে বিক্রয় করেন। এই সুন্দরী মহিলা সিরাজের প্রিয় সহচরী হয়ে লুৎফউন্নিসা নামে জনসমাজে পরিচিত হলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গোশকটে পাটনা যাত্রার সময় সিরাজদৌল্লার সঙ্গে লুৎফউন্নিসার উল্লেখ দেখা যায়। লুৎফউন্নিসা প্রসঙ্গে বিশদ বিবরণ পরে দেওয়া হবে। এই নাটকে উল্লিখিত ফৈজীর ঘটনা সত্য।[১৮] মুতাক্ষরীণ অনুযায়ী ফৈজী ছিলেন দিল্লীর এক নর্তকী (বাঈজী বলা চলে)। তাকে এক লক্ষ টাকায় সিরাজদৌল্লা ক্রয় করেন। ফৈজীর রূপলাবণ্যের বিবরণ, সিরাজের ভগ্নিপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁর (গোলাম হোসেন নয়) সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয় এবং অবশেষে প্রতিহিংসা পরায়ণ সিরাজের ক্রোধে ফৈজীর নৃশংস হত্যা মুতাক্ষরীণ অনুসরণে নিখিলনাথ রায় বিবৃত করেছেন।[১৯] এই ঘটনার সময় সম্ভবত ১৭৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ অন্তত তার আগে নয় অর্থাৎ সিরাজের বয়স তখন চোদ্দ পনের। অপরিণত নবাব দৌহিত্রকে ফেলে তার পরিণত ভগ্নিপতির প্রতি আকর্ষণ তাই স্বাভাবিক কারণেই হতে পারে। অনুমান করা যাচ্ছে ফৈজীকে হত্যা করার পর লুৎফউন্নিসাকে সিরাজ ক্রয় করেন (জারিয়া)। এবিষয়ে সঠিক কিছু বলা কঠিন। ফৈজীর ঘটনা পরবর্তীকালে ঘটাও অসম্ভব নয় তবে কোন ক্রমেই ১৭৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে নয়। বাঙ্গালী বীর মোহনলাল এবং তার ভগিনী মাধুরী সম্পূর্ণভাবে ইতিহাসের সম্পর্কহীন কাল্পনিক চরিত্র একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

সিরাজদৌল্লা ॥

এবার ঐতিহাসিক সিরাজদৌল্লার সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যাক। সিরাজদৌল্লার পুরো নাম মির্জা মহম্মদ সিরাজদৌল্লা। ইনি আলিবর্দী খাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগম ও হাজি আহমদের কনিষ্ঠ পুত্র জৈনুদ্দিন আমেদ খাঁ হৈবৎজঙ্গএর প্রথম পুত্র। তাঁর দুইভাই যথাক্রমে মির্জা কাজিম ও মির্জা মেহেদী নামে পরিচিত। এদের কথা কিছু আগেই বলা হয়েছে। সিরাজ

জন্মের পর থেকেই মাতামহের কাছে মানুষ। অত্যধিক আদরে, বিলাস-ব্যসনে ও সুরাপানে তরুণ সিরাজ অল্প বয়সেই উচ্ছন্নে যাবার সব গুণের অধিকারী হলেন। ইতিহাসে তার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মাত্র ১৩ বছর বয়সে। মির্জা ইরাজ খাঁর কন্যা ওমদাৎউন্নিসার সঙ্গে সিরাজের বিবাহ অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ঘটনা। নবাব আলিবর্দী প্রিয়তম দৌহিত্রের বিয়েতে প্রচণ্ড স্ফুর্তির বন্যা ডাকিয়েছিলেন।[২০] ১৭৪৬ থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এটাই সিরাজদৌল্লার প্রথম এবং একমাত্র বিবাহ। অন্য কোন বিবাহের সংবাদ কোথাও পাওয়া যায় না। নিঃসন্দেহে বলা চলে ওমদাৎউন্নিসা সিরাজের একমাত্র মহিষী। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন সম্প্রীতি ছিলনা। এই বিবাহের কোন সন্তান নাই। নবাব মহিষীর দীর্ঘজীবনের অবসান হয় ১০ই নভেম্বর ১৭৯৩ মুর্শিদাবাদ সহরে।[২১] মোগল সাম্রাজ্যের অবসান বেগম ওমদাৎউন্নিসা বা উমদাৎউন্নিসা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলেন। বসে বসে দেখলেন বাংলা সুবার অবলুপ্তি।

সিরাজদৌল্লা সম্পর্কে ইতিহাসচর্চার পরিপূর্ণ সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তির লিখিত নানা রচনা এই সময়ের ওপর আলোকপাত করে। ভারতীয় সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের লেখা অনেক বই আছে। সৈয়দ গোলাম হোসেনের লেখা 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ' এই সময়কার ইতিহাসের এক মূল্যবান আকর গ্রন্থ। সৈয়দ গোলাম হোসেন পাটনায় জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন এবং ঐতিহাসিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর গ্রন্থে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে। সৈয়দ গোলাম হোসেন কিছুদিন পূর্ণিয়াতে বসবাস করেন। নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুর পর ইনি পাটনায় চলে যান। আর একটি বইএর নাম 'মুজাফ্‌ফরনামা' লেখক করম আলি। এই বইখানিতে ১৭২২ থেকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুবে বাংলার ইতিহাস লিখিত আছে। ইনি ঘোড়াঘাটের ফৌজদার ছিলেন। নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুর পর ইনিও প্রথম পূর্ণিয়াতে ও পরে পাটনায় পলায়ন করেন। ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠির রোজনামচা বা ফ্যাকটরি রেকর্ডস ইতিহাসের মূল্যবান সূত্র। এছাড়া কলকাতার কাউন্সিলের দৈনন্দিন কর্মের বিবরণী, লণ্ডনের ও কাশিমবাজারের সঙ্গে কলকাতা অফিসের চিঠির আদানপ্রদান অত্যন্ত মূল্যবান। অনেক কাগজপত্র কলকাতা

জয়ের সময় নষ্ট হলেও যা পাওয়া যায় তাতে সিরাজদৌল্লার জীবনী সুন্দর-ভাবেই লেখা যায়। ইংরেজীতে লিখিত দরকারী কাগজপত্রের মধ্যে ক্লাইভ, ওয়াটসন, স্ক্রাফটন, ওয়াটস্, কুট প্রভৃতির চিঠিপত্র পাওয়া যায়। কুট আর ওয়াটসনের রোজনামচার বই আছে। এছাড়া ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটস্ পালিয়ে এলে সে বিষয়ে কলকাতায় তাঁকে লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। পরে ওয়াটসের সহকারী কোলেটকে প্রশ্ন করে ওয়াটসের কথার সত্যতা যাচাই করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে মীরজাফর খাঁর সঙ্গে ৫ই জুন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেই বিখ্যাত চুক্তিব পরও ওয়াটসকে জবাবদিহি করতে হয়। এই সময় থেকে একবছর আগে অর্থাৎ ২রা জুন ১৭৫৬ খ্রীঃ সিরাজদৌল্লাকে বিনাযুদ্ধে কাশিমবাজার কুঠির দখল দেবার জন্যও ওয়াটস্ সাহেবকে জবাবদিহি করতে হয়। এই সমস্ত কাগজপত্র দেখা কঠিন নয়। চন্দননগরে ও পলাশীতে সৈন্য হতাহতের জন্য কর্নেল ক্লাইভকে পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে সাক্ষী দিতে হয়। এগুলি প্রচুর সংবাদের উৎস।

সিরাজদৌল্লা সম্পর্কে সব থেকে মূল্যবান সংবাদ উৎস জাঁলার স্মৃতিকথা। জাঁলা ছিলেন কাশিমবাজারে ফরাসী কুঠির প্রধান। নবাবের ইনি শুভানু-ধ্যায়ী ছিলেন এবং নবাব সিরাজদৌল্লার সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতেন। নিজের জীবন বিপন্ন করে জাঁ লা সাহেব সিরাজকে উদ্ধারের জন্য ছুটে আস-ছিলেন। সিরাজ তাকে ফেলে যখন একাই পলাশীতে যুদ্ধ করতে গেলেন তখন জাঁ লা তার অনুচর সাঁফ্রকে পাঠালেন। কোনক্রমেই সাঁফ্র যেন নবাবকে ত্যাগ না করে এই ছিল নির্দেশ। এই সাঁফ্র যাকে কেউ কেউ সিনফ্রে লেখেন পলাশীতে সর্বাধিক ইংরেজ সৈন্য বিনষ্ট করেন। নিজের বিমূঢ়তায় সিরাজ যখন ভগবানগোলায় বন্দী হলেন জাঁলা সাহেব তখন মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে, সৈন্য সামন্ত নিয়ে অপেক্ষমান। লা সাহেব সিরাজের রাজ অভিষেক থেকে অর্থাৎ ১৫ই এপ্রিল ১৭৫৬ থেকে তিনি নিজে কাশিমবাজার ত্যাগ করা পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৬ই এপ্রিল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। সাঁফ্রর সঙ্গে তাঁর পত্রের আদানপ্রদানও নবাব চরিত্রের বহু বিচিত্র দিককে স্পষ্ট করেছে। আর একটি সূত্র আছে খুবই বৈচিত্রপূর্ণ। কলকাতার সমাজে পরবর্তীকালে যিনি বেগম জনসন নামে খ্যাতি ও অখ্যাতির শীর্ষে আরোহন করেন তিনি প্রথম যৌবনে ওয়াটস্ সাহেবের স্ত্রীরূপে কাশিম-

বাজারে অবস্থান করতেন। ১৭৫৬ খ্রীঃ কাশিমবাজার কুঠি অভিযানে নবাব নাকি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। বেগম জনসনের সিরাজদৌল্লার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ের সংবাদ খুবই উত্তেজনাপূর্ণ কিন্তু সত্য কিনা সন্দেহ আছে।

সিরাজদৌল্লা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে না গিয়ে তার সম্পর্কে জানিত ঘটনাগুলি কালানুক্রমিকভাবে সাজালে বহু প্রশ্নের সমাধান হবে যাবে। প্রথমে ১৭৩৩ থেকে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা দেখা যাক।

১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ — জন্ম পাটনা।
১৭৪৬ „ — মুর্শিদাবাদে বিবাহ।
১৭৪৭ „ — ফৈজীকে ক্রয় ও হত্যা।
১৭৪৭-৪৮ „ — মোহনলালের ভগিনীকে ক্রয় (জারিয়া)
১৭৪৮ „ — লুৎফউন্নিসার সহিত গোশকটে পাটনা যাত্রা।
— পাটনার ঘটনাবলী ও মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তন।
১৭৫৩ „ — ইংরেজ কোম্পানী সিল্কের সম্ভার ও অন্যান্য উপঢৌকন দেয়।
১৭৫৪ „ — হুসেন কুলি খাঁকে হত্যা।
(কাশিমবাজার ফ্যাক্টরির ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৫ এর পত্রে এ খবর জানান হয়েছে)
১৭৫৬ „ — নবাব হওয়া।

সিরাজদৌল্লার চরিত্র বুঝতে হলে নবাব হবার আগেকার ঘটনা অনু-ধাবন করা দরকার। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহের পর কয়েকটা মাত্র উল্লেখ আছে সিরাজের নবাব হবার আগে। প্রথম উল্লেখ ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। নবাব আলিবর্দীর পক্ষে অত্যন্ত দুর্বৎসর। বিহারের শাসনকর্তার পদে সিরাজ-পিতা জৈনুদ্দিন আহমদ খাঁকে নিযুক্ত করেন নবাব আলিবর্দী খাঁ। তখন থেকেই তিনি সপরিবারে পাটনায় থাকতেন। বৃদ্ধ নবাব ভ্রাতা হাজি আহমদও রাজকার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করে পাটনায় ছেলে বৌএর সঙ্গে থাকতেন। বিহারের রাজধানী পাটনা, শুকনো আবহাওয়ায় বৃদ্ধের শরীর, মুর্শিদাবাদের জোলো হাওয়া থেকে ভালই থাকত। কিন্তু সুখ সহ্য হলনা। চরম অবিমৃষ্যকারিতায় জৈনুদ্দিন আহমেদ ৩০০০ পাঠান অশ্বা-রোহীকে স্থায়ী চাকরীতে বহাল করেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই জৈনুদ্দিনের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে পাঠান সৈনিকরা বিদ্রোহ করল। জৈনুদ্দিন

তাদের হাতে নিহত হলেন। রাজকোষের খবর পাবার জন্য পাঠানরা বৃদ্ধ হাজি আহমদের ওপর এমন অত্যাচার করল যে কারাগারেই তার মৃত্যু হল। আলিবর্দীকন্যা আমিনা বেগম হলেন বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী। বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ করা স্থগিত রেখে বৃদ্ধ নবাব তখনই পাটনা যাত্রা করলেন। পাঠানদের যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ করে নবাব আলিবর্দী সহর দখল করে কন্যাকে মুক্ত করলেন।[২২] সিরাজকে এবার পাটনায় আসার জন্য খবর পাঠান হল।

সিরাজ তাঁর অতি প্রিয় একজোড়া বলীবর্দ্দচালিত শকটে সদ্যক্রীতা দাসী লুৎফউন্নিসাকে সঙ্গে করে পাটনা যাত্রা করলেন। এই বলীবর্দ্দ দুইটি সম্পর্কেও পূর্ণ বিবরণ বর্তমান। এদের রং ছিল তুষারশ্বেত, জাতি ছিল গুজরাটি, এবং উচ্চতায় এত প্রকাণ্ড ছিল যে মাটিতে দাঁড়িয়ে তাদের ককুধ স্পর্শ করা কঠিন ছিল। অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির বলীবর্দ্দদ্বয় বারশত টাকায় ক্রীত হয়। পরবর্তীকালে মীরজাফর খাঁ নবাব হলে তিনি এই দুইটি ওয়াটস্ সাহেবকে দান করেন।[২৩] মুতাক্ষরীণে স্পষ্টই লিখিত আছে 'সিরাজদৌল্লা তাঁহার সহচরী লুৎফউন্নিসাকে সঙ্গে করিয়া গোশকটে আরোহন করিয়া প্রস্থান করেন।' পিতা ও পিতামহের মৃত্যু ও মাতার বন্দীত্বের খবর পেয়ে সিরাজদৌল্লা গোশকটের থেকে দ্রুতগামী কোন যান ব্যবহার করলেন না। সঙ্গিনী একমাত্র তাঁর জারিয়া বা Bond-maid বা ক্রীতদাসী।

পাটনায় নবাব আলিবর্দী ইতিমধ্যে শান্তি স্থাপন করেছেন। মৃত জামাতার জায়গায় নবাব আলিবর্দী দৌহিত্র সিরাজদৌল্লাকেই নামমাত্র শাসন-কর্তা নিযুক্ত করে তাঁর বিশ্বস্ত দেওয়ান রাজা জানকীরামের হাতে বিহারের শাসনভার অর্পণ করেন। পাটনা বিদ্রোহের তারিখ ১৭৪৮ সালের জানুয়ারী মাস। মুর্শিদাবাদে ফেরা মাত্র পাটনায় খবর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। পঞ্চদশ-বর্ষীয় সিরাজ শাসনকার্য্য বা যুদ্ধবিদ্যায় পটুত্ব লাভ না করলেও অপকর্মে বেশ পারদর্শী হয়েছিলেন। চাটুকার ও বিলাসসঙ্গীদের কুপরামর্শে তিনি প্রবীণ রাজা জানকীরামকে পদচ্যুত করে স্নেহময় মাতামহ স্বয়ং নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সুরু করেন। এইসব খবর পেয়ে নবাব আলিবর্দী সিরাজকে মুর্শিদাবাদে নিজের কাছে তাড়াতাড়ি নিয়ে এলেন। জানকীরামই বিহারের শাসনকর্তার পদে পরিপূর্ণভাবে নিযুক্ত হলেন।[২৪]

বস্তুত বিলাস পরায়ণতা, সুরাপান ও কামিনী সম্ভোগ তখনকার নবাবী

রীতিনীতির অন্তর্গত ছিল। ব্যতিক্রম কেবল মুর্শিদকুলি খাঁ ও আলিবর্দী খাঁ। এক্রামৌদৌল্লা, সওকতজঙ্গ বা সিরাজদৌল্লা একই পদ্ধতিতে জীবন-যাপন করতেন। তবে সিরাজ ছিলেন সব থেকে আদরের নাতি, দাদুর সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী তাই সব বিষয়েই তার প্রতাপ কিছু বেশী ছিল। সমাজের উচ্চস্তরের জীবনযাত্রার এই ছিল রূপ। নবাবের দৌহিত্ররা যে বিলাসপরায়ণ হবেন এটাই স্বাভাবিক। এই বিলাসপরায়ণতা নবাবী মহিলাদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। নবাব কন্যাদের প্রমোদের কাহিনী যেমন কদর্য্য তেমনি কুৎসিত। হোসেনকুলি খাঁকে নিজের আয়ত্তে রাখার জন্য ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগম যে জঘন্য প্রতিযোগিতার অবতারণা করেছিলেন তা কামনা ও দেহলিপ্সার সব মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে আসঙ্গ পিপাসার এক নূতন নরকের পরিচয় দেয়। নবাব কন্যাদের এই কীতির কুশ্রীতা সিরাজদৌল্লাকেও বিচলিত করেছে। তাই রাস্তার মাঝখানে দিনের আলোয় সবার সামনে সিরাজের অনুচরেরা হোসেনকুলি খাঁকে যখন খণ্ড বিখণ্ড করে কেটে ফেলল কেউ এটাকে অস্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে করেনি। আচার্য্য যদুনাথ সরকার এই ঘটনার সময় নির্দেশ করেছেন ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়েছে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে। দেশে তখন শান্তি বিরাজ করছে। কাশিমবাজার কুঠি থেকে ইংরেজ কর্মচারী হোসেনকুলি খাঁ ও তাঁর ভ্রাতার হত্যাকাহিনী কলকাতার অফিসকে জানাচ্ছেন ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৫।[২৫]

নবাব আলিবর্দীর জীবনের শেষ কয় বৎসর ১৭৫১ থেকে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার বাবসায়িক প্রসার লক্ষনীয়। বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা রেশমের কারবারে প্রচুর লাভ করেন। ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও দাদনীদার বছরে কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার টাকার লেনদেন করেছেন। শুধুমাত্র ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে তেত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার পঞ্চাশ সিক্কা টাকা বাংলার ব্যবসায়ে লগ্নী করেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায় যে একটি বিদেশী কোম্পানী যখন ৩৩,৬৬,০৫০ সিক্কা টাকা লগ্নী করেছেন তখন দেশে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজিত ছিল। এই সময় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার হয়। বাংলার রেশম এই সময় থেকে পৃথিবীর বিপনীতে সুনামঅর্জন করা সুরু করে এবং ক্রমে তার চাহিদা বাড়তে থাকে।[২৬]

পলাশীর যুদ্ধে বাংলার তথা ভারতের পরাধীনতার সুরু হয়েছে বলে প্রচলিত বিশ্বাস। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌল্লা পরাজিত হন। পলায়নরত অবস্থায় তাকে বন্দী করা হয় এবং ২রা জুলাই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারে গুপ্তঘাতক তাকে হত্যা করে। বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ। এই নবজাগরণের প্রকাশ হয়েছে কাব্যে-সাহিত্যে। পরাধীনতার কলঙ্ক থেকে মুক্তি পাবার জন্য দেশের নেতারা জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করলেন। সাহিত্যিকরা তুলে ধরলেন অতীত গৌরবের চিত্র। প্রতাপসিংহ, রাজসিংহ, শিবজী প্রভৃতি দেশনায়কগণ স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর প্রতিভু হয়ে দাঁড়ালেন। রাণা প্রতাপের প্রভায় বাংলার প্রতাপাদিত্য ও বারভূইঞাগণ সমাদৃত হলেন। পলাশীর পরাজয় ও সিরাজের নৃশংস হত্যা তাঁর জীবনের বিফলতাকে উপন্যাসের উপজীব্য করে তুলল। ইতিহাস উপেক্ষা করে নবাব সিরাজদৌল্লা সাহিত্যিক নাট্যকারদের দয়ায় দেশভক্ত বীর রূপে আখ্যাত হলেন। তাঁদের প্রায় শতাব্দীকালের চেষ্টায় সিরাজদৌল্লা বাঙ্গালীর নয়নের মণি, ভারতের অন্যান্য বীর যোদ্ধা ও দেশপ্রেমীর প্রতিফলনে তিনিও এক মহান জননায়কে রূপান্তরিত। তিনি এবং তাঁর বন্ধুবর্গ সকলেই দেশহিতৈষীরূপে চিত্রিত এবং তাদের মৃত্যু সর্বদাই দেশের পক্ষে এক দুর্ঘটনা। ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে। বলে সিরাজদৌল্লা, মোহনলাল বা ফরাসী সিনফ্রে বা সাঁফ্রে কেউ উৎসর্গীকৃত প্রাণ শহীদ ছিলেন না। সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও সিরাজ চরিত্রের পরিবর্তন এবং যথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা এবার বিবৃত হবে।

সিরাজদৌল্লাকে নিয়ে যে আটখানি নাটক রচিত হয়েছে সেগুলি নীচে কালানুক্রমিকভাবে সাজান হল। নবীনচন্দ্র সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য, নাটক নয় কিন্তু এটিও নাট্যকৃত হয়ে অভিনীত হয়েছে এবং 'দেশপ্রেমী সিরাজদৌল্লা' বিষয়ে এটাই প্রথম রচনা তাই 'পলাশীর যুদ্ধ'কে এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হল। বস্তুত পলাশীর যুদ্ধ রচিত না হলে সিরাজদৌল্লা কখন কাব্য ও সাহিত্যের, বিশেষ নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

১।	পলাশীর যুদ্ধ	—	নবীনচন্দ্র সেন	১৮৭৫ প্রকাশ
২।	নবাব সেরাজুদ্দৌল্লা	—	লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী	১৮৭৬ ,,

৩।	সিরাজদ্দৌল্লা	—	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	১৯০৫	,,
৪।	সিরাজদ্দৌল্লা	—	শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৯৩৮	,,
৫।	সিরাজের স্বপ্ন	—	বঙ্কিমচন্দ্র দাসগুপ্ত	১৯৪২	,,
৬।	পলাশী	—	হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	১৯৪৫	,,
৭।	রামপ্রসাদ	—	তারক মুখোপাধ্যায়	১৯৪৬	,,
৮।	মোহনলাল	—	শীতাংশু মৈত্র	১৯৫৩	,,

এই নাটকগুলির মধ্যে দিয়ে তৎকালীন বাংলার বিশেষ পলাশীর যুদ্ধের এবং সমসাময়িক ঘটনার রূপ সম্পূর্ণ বিকৃতভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে। ভুলের উপর্য্যপরিতার ও চরিত্র-চিত্রণের একমুখী ইতিহাস বিমুখতার এমন নিদর্শন সচরাচর বিরল। প্রথমে তাই সিরাজদ্দৌল্লার শাসনকালকে কালানুক্রমিকভাবে সাজান যাক।

১৭৫৬॥ সিরাজের বয়স ২৩।

১০ই এপ্রিল—নবাব আলিবর্দীর মৃত্যু।

১৫ই এপ্রিল—সিরাজের রাজ্যাভিষেক।

১৫ই মে—ঘসেটি বেগমের সম্পত্তি অপহরণ। রাজা রাজবল্লভ কারারুদ্ধ। মীরজাফর ও রায় দুর্লভরামের পদচ্যুতি। কাশ্মিরী যুদ্ধ ব্যবসায়ী মোহনলাল মন্ত্রী ও মীরমদন সেনাপতি নিযুক্ত।
জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় অপমানিত।

২রা—৩রা জুন—কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ। কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস ও সহাধ্যক্ষ কোলেট বন্দী। ওয়াটস গৃহিণী (বেগম জনসন)র কেচ্ছাকাহিনী।

৯ই জুন—ওয়ারেন হেষ্টিংস কারারুদ্ধ। কাশিমবাজারের ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ ভেরনেট সাহেব ৩০০০ টাকা জামিনে হেষ্টিংসের মুক্তি ক্রয় করেন।

১৬ই জুন—কলকাতা আক্রমণ।

২০শে জুন—কলকাতা জয়। ফোর্ট উইলিয়ামে ডুলি চেপে সিরাজদ্দৌল্লা।

২১শে জুন—অন্ধকূপ হত্যার দিন বলে অঙ্কিত।

জুলাই—ওয়াটস ও কোলেটের মুক্তি।

আগষ্ট—সওকত জঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি।

২৪শে সেপ্টেম্বর—সওকত জঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ। পূর্ণিয়া আক্রমণ।

১৬ই অক্টোবর—মণিহারির যুদ্ধে সওকত জঙ্গের মৃত্যু। সিরাজদৌল্লার পক্ষে রাজা মোহনলালের যুদ্ধ জয়।

নভেম্বর—রাজা মোহনলালের মহারাজা উপাধি ও বাহারবন্দ পরগণা জায়গীর লাভ। তিনি পূর্ণিয়ার শাসনকর্তাও হলেন।

সিরাজদৌল্লার দিল্লীর ফারমান লাভ।

১৫ই ডিসেম্বর—ক্লাইভের ফলতায় ইংরেজ পক্ষের সৈনাপত্য গ্রহণ।

২৭শে ডিসেম্বর—কলকাতা পুনরাধিকারে ইংরেজ উদ্যম সুরু।

৩০শে ডিসেম্বর—ইংরেজ বজবজ দুর্গ অধিকার করল।

ডিসেম্বর—মহারাজা মোহনলালের মুর্শিদাবাদে মরণাপন্ন অসুস্থতা।

১৮৫৭॥ সিরাজের বয়স ২৪।

২রা জানুয়ারী—নবাব হুগলীতে সসৈন্যে উপনীত।

২৮শে জানুয়ারী—আহমেদশাহ আবদালীর দিল্লী প্রবেশ।

৩রা ফেব্রুয়ারী—নবাবের কলকাতার উপকণ্ঠে উমিচাঁদের বাগানবাড়ীতে ঘাঁটি স্থাপন।

৫ই ফেব্রুয়ারী—ক্লাইভের নবাবী ঘাঁটি আক্রমণ।

৬ই ফেব্রুয়ারী—পাল্কিতে চেপে নবাবের পলায়ন।

৯ই ফেব্রুয়ারী—আলিনগরের সন্ধি সাক্ষরিত। নবাবের বিশেষ ফারমান সন্ধিপত্র অনুযায়ী কলকাতায় ইংরেজদের অধিকার ও দুর্গ স্থাপনের ক্ষমতা নবাব স্বীকার করলেন। বিভিন্ন কুঠিতে ইংরেজদের অধিকার স্বীকার করা হল। ইংরেজদের প্রায় দশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে এবং নিজস্ব সিক্কা টাকা বানাতে দিতে সিরাজ সম্মত হলেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—এই সন্ধিপত্রে নবাব দস্তখত করলেন।

১৩ই মার্চ—ক্লাইভের ফরাসী চন্দননগর আক্রমণ। হুগলীর ফৌজদার রাজা নন্দকুমারের বিশ্বাসঘাতকতা।

২৩শে মার্চ—ক্লাইভের চন্দননগর জয়। ফরাসীদের কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠিতে পলায়ন।

মার্চ—জাঁলা সাহেবের দরবার বর্ণনা।

৩০শে মার্চ—আহমেদ শাহ আবদালী গোকুল ও মথুরা ধ্বংস করে ফরিদাবাদে উপনীত। সিরাজ আবদালীর আক্রমণ ভয়ে আশঙ্কিত।

১৬ই এপ্রিল—কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জাঁলা সাহেব নবাব আদেশে ফরাসী কুঠি তুলে দিয়ে পাটনা চলে গেলেন সদলবলে। তাঁকে বন্ধু জেনেও ভীত নবাব ইংরেজদের ভয়ে সাহায্য করলেন না। জাঁলা সাহেবও নবাবকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেন না। অসুস্থ মোহনলালের সঙ্গে জাঁলার সাক্ষাতকার। নবাবকে বিপদের সময় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাঁলা সাহেব কাশিমবাজার ত্যাগ করলেন। পাটনা যাবার পথেও জাঁলা নবাবের অস্থির মনের পরিচয় পেয়েছেন। এক চিঠিতে তাকে ফিরে আসতে অনুরোধ করে পরবর্তী চিঠিতেই তাকে চলে যাবার আদেশ করেছেন।

এপ্রিল—আহমেদ শাহ আবদালীর ভারত ত্যাগ।

মে—জগৎশেঠরা প্রকাশ্য ভাবে ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।

৫ই জুন—ওয়াটস মীরজাফর চুক্তি সাক্ষর। ষড়যন্ত্র পাকা হল।

১২ই জুন—ওয়াটস, সাইকস, কোলেট, হেষ্টিংস ও মারিয়টের কাশিমবাজার হতে পালিয়ে অগ্রদ্বীপে (নদীয়া) ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যোগদান ও কলকাতা অভিমুখে যাত্রা।

১৯শে জুন—ইংরেজদের কাটোয়া দুর্গ জয়। পলাশীর প্রস্তুতি।
জাঁলা সাহেব ৫০ জন গোলন্দাজ সহ সাঁফ্রেকে পাঠালেন নবাবের কাছে। একান্ত অনুরোধ তিনি সসৈন্যে পৌছানর আগে নবাব যেন যুদ্ধযাত্রা না করেন। নবাব জাঁলাকে খবর পাঠালেন সব ঠিক আছে ভাবিত হবার কোন কারণ নাই।

২০শে জুন—নবাব যুদ্ধে চললেন। নবাবকে রক্ষার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাঁফ্রে তার ছোট্ট বাহিনী নিয়ে নবাবের সাথী। বিরাট আয়োজন। সকলেই চললেন মীরজাফর, রায়দুর্লভ, ইয়ারলতিফ খাঁ। আক্রমণ বিভাগে কেবল মীরমদন ও মোহনলাল।

২৩শে জুন—পলাশীর যুদ্ধ। বিকাল ৪টায় নবাব প্রথম পলাতক। হাতিতে চেপে মতান্তরে উটে চেপে তিনি যুদ্ধ পূর্ণদ্যোমে চলাকালিন

পলায়ন করেন। মীরমদন হত। নবাবকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সাঁফ্রে। তাকে ইংরেজদের আক্রমণ করতে পাঠান হল। তিনি জানতে পারলেন না যে নবাব পলায়নের সংকল্প করেছেন। নবাব মুর্শিদাবাদে নিজের পরাজয় সংবাদ বহন করলেন। তাঁর একাকী পলায়ন ত্রাসের সঞ্চার করল।

২৪শে জুন—প্রথমে গোশকটে ও পরে নৌকাযোগে নবাবের পলায়ণ।

২৯শে জুন—ক্লাইভের মুর্শিদাবাদে প্রবেশ ও মীরজাফরের নবাবী লাভ।

৩০শে জুন—ভগবানগোলায় সিরাজ ধৃত ও বন্দী হয়ে মীরকাশিম সকাশে এলেন।

২রা জুলাই—মীরজাফর পুত্র মীরণের প্ররোচনায় গুপ্তঘাতকের হাতে সিরাজদৌল্লার মৃত্যু।

৩রা জুলাই—হস্তিপৃষ্ঠে মৃতদেহের নগর ভ্রমণ ও সমাধি।

নবাব সিরাজদৌল্লার ইতিহাস আমরা সাধারণ ভাবে পর্য্যালোচনা করলাম। দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক নাট্যকার কতকগুলি ইতিহাস বিরোধী সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করে নাটক রচনা করেছেন। প্রথমেই সিরাজদৌল্লাকে এক দেশপ্রেমিক নৃপতি রূপে কল্পনা করা হয়েছে। লুৎফউন্নিসাকে তার একমাত্র বিবাহিতা পত্নী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। মোহনলালকে বাঙালী বীর এবং তার ভগ্নীর নাম মাধুরী বলা হয়েছে। পলাশীর পরাজয়ের কারণ দেখান হয়েছে মীরজাফর প্রমুখদের বিশ্বাসঘাতকতা। সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের একমাত্র কারণ দেখান হয়েছে সিংহাসনের প্রতি মীরজাফরের লোভ। জগৎ শেঠ ভ্রাতৃদ্বয় ও রায় দুর্লভরামের ভূমিকা সম্ভবতঃ নাট্যকাররা সবাই হিন্দু হবার জন্য তুলনায় মীরজাফরের মতো অত জঘন্য নয়। ষড়যন্ত্রকারীদের নিয়ে নাট্যকাররা বিশেষ বিপদে পড়েছেন। এ বিষয়ে তাদের মতভেদের কারণ যথাসময়ে আলোচনা করা হবে। ইংরেজদের নিয়েও এই গোলমাল বিচিত্র আমোদের সৃষ্টি করে সময়ে সময়ে। ঘসেটি বেগমকে নিয়েও নাট্যকারগণ অনুরূপ বিভ্রম সৃষ্টি করেছেন। পলাশীর যুদ্ধ ভারতের পরাধীনতার প্রথম পদক্ষেপ এবং এক নিদারুণ দুঃখের ঘটনা একথাই নাট্যকাররা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। পলাশীর উল্লেখমাত্র বাঙালী সাহিত্যিকের লেখনী উচ্ছসিত

ও দৃষ্টি বাষ্পাকুল হয়ে ওঠে। এই ভাবালুতার কোন সঙ্গত কারণ আছে কিংবা এটা কল্পনা প্রবণ জাতির নিছক ভাববিলাস এবার আলোচনা করা হবে।

নবীন চন্দ্র সেন : পলাশীর যুদ্ধ ১৮৭৫ ॥

নাটকীয় ভাষায় বলা যায় যে, 'পলাশীর যুদ্ধ' সিরাজদৌল্লার অভিযান সুরু করে। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ ১২৮২) কবি নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশিত হয়। বস্তুত এটি নাটক নয় কাব্য। মোট পাতা সংখ্যা ১২৮ এবং পাঁচটি সর্গে বিভক্ত। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ)। প্রথম সর্গ, মুরশিদাবাদ—জগৎশেঠের মন্ত্রণাভবন, ৪ পাতা থেকে ৩০ পাতা। দ্বিতীয় সর্গ, কাটোয়া—বৃটিশ শিবির, ৩১ পাতা থেকে ৫৪ পাতা। তৃতীয় সর্গ, পলাশীর ক্ষেত্র, ৫৫ পাতা থেকে ৮০ পাতা। চতুর্থ সর্গ, যুদ্ধ, ৮১ পাতা থেকে ১০৬ পাতা। পঞ্চম সর্গ, শেষ আশা, ১০৭ পাতা থেকে ১২৭ পাতা। গল্পাংশ অত্যন্ত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। নবীনচন্দ্র কাব্য রচনার আগে যে নবাব সিরাজদৌল্লার ইতিহাস ভালভাবেই পাঠ করেছেন সেটা বুঝতে কিছু কষ্ট হয় না। প্রথম সর্গের সুরুতে দেখা যায় যে জগৎশেঠের মন্ত্রণাকক্ষে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। এটি নবাব সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র। প্রথম ষড়যন্ত্র হয়েছিল সিরাজদৌল্লাকে সরিয়ে দিয়ে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সিরাজের মাসতুতো ভাই (আলিবর্দী খাঁর দ্বিতীয় বা মধ্যম কন্যা ও হাজি আহমদের দ্বিতীয় পুত্রের সন্তান) নবাব সওকত জঙ্গকে নবাব করার উদ্দেশে। কিন্তু সিরাজদৌল্লার সঙ্গে যুদ্ধে সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে তাই এই দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রের সূচনা। (১/৪৩ পাতা ২০) ষড়যন্ত্রের সময়, ফরাসী চন্দননগরের পতনের পর অর্থাৎ ২৩শে মার্চের পরবর্তী সময়ে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। কবি বলেছেন—

মোগল-গৌরব-রবি, আরঙ্গজিব সনে
অস্তমিত ; নহে দূর দিল্লীর পতন।
শুনিয়াছি দাক্ষিণাত্যে ফরাসি বিক্রম
হতবল, মহাবল ক্লাইভের করে।
বঙ্গদেশে এই দশা—বৃটিশ কেতন
উড়িছে ফরাসী দুর্গে হাসিয়া অম্বরে! (১/৫২, পাতা ২৪)

নবীনচন্দ্র সেন সমসাময়িক ইতিহাস সম্পর্কে যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মধ্যে তার একান্ত অভাব দেখে বিস্মিত বোধ করতে হয়।

দাক্ষিণাত্যে, যেইরূপ মহারাষ্ট্র পতি
হতেছে বিক্রমশালী, কিছুদিন আর
মহারাষ্ট্র-পতি হবে ভারত-ভূপতি।
অচিরে হইবে পুনঃ ভারত উদ্ধার।
সার্দ্ধ পঞ্চশত দীর্ঘ বৎসরের পরে
আসিবে ভারত নিজ সন্তানের করে। (১/৫৫ পাতা ২৫)

উপরের দুইটি উক্তিই রাণী ভবানীর মুখে দেওয়া হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারী-রূপে দেখা যাচ্ছে জগৎশেঠ, মীরজাফর, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ ও রাণী ভবানীকে। পরে উমিচাঁদেরও উল্লেখ করা হয়েছে। একমাত্র রাণী ভবানী সিরাজের উচ্ছেদ চাইলেও ইংরেজ সাহায্যে সেটা চাননি এটাই কবি বলতে চান। ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য মীরজাফর খাঁকে নবাব করা কারণ তাহলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা আছে।

নবীনচন্দ্র সিরাজদৌল্লা সম্পর্কে বলেছেন—

ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল নিশীথিনী
নীরবে নবাব-ভয়ে করিছে রোদন;
নীরবে কাঁদিছে আহা! বঙ্গ বিষাদিনী
নীহার নয়ন জলে তিতিছে বসন
নীরব ঝিল্লীর রব; স্তব্ধ সমীরণ;
মাতৃবুকে শিশুগণ, দম্পতি শয্যায়
পতি প্রাণ ভয়ে, সতী সতীত্ব কারণ,
ভাবিছে অনন্যমনে কি হবে উপায়।
বিরাম দায়িনী নিদ্রা ছাড়ি বঙ্গালয়
কোথায় গিয়াছে, ডরি নবাব নিদয়। (১/৫ পাতা ৪-৫)

আরো বলেছেন—

একেতো অদূরদর্শী নৃশংস যুবক
আজন্ম বর্দ্ধিত পাপে। হিংসা অহঙ্কার

অলঙ্কার তার। তাহে পথপ্রদর্শক
হয়েছে ইতরমনা যত কুলাঙ্গার
নীচাশয়। ইহাদের পরামর্শে হায়
ফলিছে বঙ্গের ভাগ্যে যে বিষম ফল
বলিতে বিদরে বুক। যথায় তথায়
হাহাকার ধ্বনি রাজ্যে উঠিছে কেবল। (১/৩৭ পাতা ১৭-১৮)

বর্গীর হাঙ্গামা আর নবাব আলিবর্দীর কি চমৎকার চিত্র এঁকেছেন নবীনচন্দ্র মুগ্ধ হতে হয়। ইতিহাস যে কল্পনার বাধা না হয়ে সাহিত্য কর্মে সহায় হয় নবীনচন্দ্র বারবার প্রমাণ করেছেন—

সেইদিন মহারাষ্ট্র-বিপ্লবে বিশেষ
এ দেশ উপর্য্যুপরি হয়েছে [illegible]।
যথা এই দস্যুদল করেছে প্রবেশ
ভীমরোষে দাবানল রূপে আচম্বিতে
অগ্নিতে, অসিতে, অপহরণে সে দেশ
হইয়াছে মরুভূমি। সন্ত্রাসে কৃষক
বিষাদে বিজন বনে করেছে প্রবেশ
না ডরি শার্দ্দূলে সিংহে; কুরঙ্গ শাবক
অদূরে শুনিয়া ব্যাধ বন নিপীড়ন,
সভয়ে যেমতি পশে নিবিড় কানন!
ইহাদের দুরবস্থা করিতে মোচন,
কি যত্ন না করিয়াছে স্বর্গীয় নবাব
বীরশ্রেষ্ঠ আলিবর্দী, সমরে শমন
শিবিরে অপক্ষপাতী অমায়িক ভাব।
জীবনের অবসান, তথাপি উজ্জ্বল
ছিল ভস্ম আচ্ছাদিত বহ্নির মতন;
প্রভায় সমস্ত বঙ্গ ছিল সমুজ্জ্বল;
ছিল যেই সিংহাসনে, ইন্দ্রের মতন
পরাক্রমে পরন্তপ এতাদৃশ শূর,
এখন বসেছে এক ঘৃণিত কুক্কুর! (১/৩৮, ৩৯ পাতা ১৮-১৯)

দেখা যাচ্ছে যে সিরাজদৌল্লাকে বিতাড়ন করার জন্য সবাই ইংরেজদের সাহায্য নিতে মনস্থ করেছেন। এইখানেই রাণী ভবানীর প্রবল আপত্তি। তিনি বলছেন—'ইন্দ্রিয় লালসামত্ত সিরাজদৌল্লায় রাজ্যচ্যুত করা নহে আমার অমত।" (১/৬৪ পাতা ২৮) কিন্তু তার জন্য ইংরেজদের সাহায্যের কি প্রয়োজন? "অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোসিয়া অসি, সাজিয়া সমর সাজে নৃপতি সমাজ প্রবেশ সন্মুখ রণে।" (১/৬৫ পাতা ২৯)

দ্বিতীয় সর্গ কাটোয়ার বৃটিশ শিবির—কাটোয়া দুর্গ জযের অব্যবহিত পরে। তারিখ নিঃসন্দেহে ১৯/২০ জুন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। ক্লাইভের চরিত্রের অপূর্ব চিত্রণ এ দৃশ্যের মহান কীর্তি। ক্লাইভ রণনীতি চিন্তা করছেন। মীরজাফর উমির্চাদ জোটকে বিশ্বাস করা যায় কি না সন্দেহ করছেন। ভাগিরথীর অপরূপ রূপ তাঁর মনে স্বদেশের চিন্তা জাগিয়েছে—তাঁর কর্তব্য নির্দ্ধারণ কঠিন হয়ে পড়েছে। এই বিপদে ইংল্যাণ্ডের রাজলক্ষ্মী বৃটানিয়া আবিভূত হযে ক্লাইভকে মন্ত্রণা দিলেন এবং অভয় দান করলেন। দৈব তেজে বলীয়ান হয়ে ক্লাইভ পলাশী অভিমুখে সৈন্য চালনা করলেন। নবীনচন্দ্রের ইতিহাস জ্ঞান এ সর্গেও স্পষ্ট। ক্লাইভের চরিত্র চিত্রিত করার সময সেক্সপীয়র পড়া ইংরেজের রূপ ফোটাতে তার সযত্ন প্রযাস ফুটে উঠে অনির্বচনীয় কাব্যসুষমা সৃষ্টি করেছে।

'ধন্য আশা কুহকিনী' পদে পদে ম্যাকবেথ স্মরণ করায়। বিশেষ—'পেযে তব বল যুঝিছে জীবন যুদ্ধ হায়! অনিবার। নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজীকরে, নাচাও তেমতি তুমি অর্বাচীন নরে।' (২/১১, ১২ পাতা ৩৫) মনে পড়ে Life's but a walking shadow. A poor player that struts and frets his hour upon the stage to be heard no more. Like a tale told by an idiot, full of sound and fury signifying nothing. ক্লাইভের জীবন বলতে গিয়েও কবি ইতিহাস লঙ্ঘন করেন নি।

দুরন্ত যুবক ছিল দুষ্প্রবৃত্তি রত
নির্ভয় হৃদয় সদা, পিতা মাতা যার
পাঠাল ভারতবর্ষে সৌভাগ্যের তরে
অথবা মরিতে দূরে মান্দ্রাজের জ্বরে। (২/২১ পাতা ৩৯)

তৃতীয় সর্গ 'পলাশি ক্ষেত্র' তারিখ ২২শে জুন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। কবি

যুদ্ধ ক্ষেত্রেও নবাবের বিলাসী রূপ এঁকেছেন। 'পলাশি প্রান্তরে নৈশ গগন ব্যাপিয়া, উথলিছে শত স্রোতে আমোদ লহরী ; এমন ইন্দ্রিয়-সুখ-সাগরে ডুবিয়া কেন চিন্তাকুল আজি নবাবের মন।' (৩/৬ পাতা ৫৭) কবি কল্পনা করেছেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হয়েও নবাব বিলাসে ও নৃত্যে গীতে মোহিত। বিবসনা সুন্দরী ও সুরাপানে নবাব বিভোর। অন্যদিকে ষড়যন্ত্রীগণ ক্রমান্বয়ে চক্রান্ত-জাল রচনা করছেন। মৃত্যুভয়ে অধীর নবাব দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠলে নবাব মহিষী তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এইখানে সেক্সপীয়রের তৃতীয় রিচার্ডের স্পষ্ট প্রভাব বোঝা যায়। সিরাজদৌল্লার আজ্ঞায় যাদের হত্যা করা হয়েছে তারা স্বপ্নে এসে সিরাজের আগামী যুদ্ধে পরাজয়ের ভবিষ্যৎবানী করেছে। তৃতীয় স্বপ্ন :—আমারে ডুবায়ে জলে বধিলি জীবনে,

ডুবিবে জীবন-তরী কালি তোর রণে। (পাতা ৭২)

পঞ্চম স্বপ্ন :—পুরাইতে পাপ আশা, বালিকা বয়সে
বলেতে আমারে পাপি ! করিলি হরণ
বধিলি জীবন মম কলঙ্ক পরশে,
হারাবি সে পাপ রাজ্য, হারাবি জীবন।

একমাত্র স্ত্রীর মহিমময় প্রেম কাপুরুষ সিরাজকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। নবাব চিন্তা করছেন মীরজাফর খাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন।

অন্যদিকে ক্লাইভও অনিদ্রা উপভোগ করছেন। তার চিন্তা অন্য রূপ :—

আমরা বীরের পুত্র যুদ্ধ ব্যবসায়ী ;
আমাদের স্বাধীনতা বীরত্ব জীবন,
রণক্ষেত্রে এই দেহ হলে ধরাশায়ী,
তথাপি ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন। (৩/৫৪ পাতা ৭৬)

চতুর্থ সর্গ 'যুদ্ধ' তারিখ ২৩শে জুন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। বীর বাঙালী মোহন লালের নেতৃত্বে আম্রবন লক্ষ্য করে নবাব সৈন্য আক্রমণ করল। তারপর যুদ্ধের চমৎকার বর্ণনা আছে। ইংরেজরা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট। তারপরই দেখা যাচ্ছে সেনাপতি মীরজাফর সুসজ্জিত হয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। তথাপি মোহনলাল একাই সৈন্যদের উৎসাহিত করে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এমন সময় তূর্য্যধ্বনি হল। 'ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ। কর অস্ত্র

সম্বরণ! নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ!' (৪/৫৬ পাতা ৯৩) নবাব সৈন্য যুদ্ধ হতে বিরত হল এবং সেই সুযোগে ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করল। 'মূর্চ্ছান্তে মোহনলাল মেলিয়া নয়ন দেখিলা সমরক্ষেত্র মুহূর্তে তুলিয়া ম্লানমুখ।' (যুদ্ধান্ত ৪/১ পাতা ৯৪) ইংরেজ জয়ী হল। গভীর শোকে বাঙ্গালী কবির বুক ফাটা শ্লোক—

এই নহে ভারতের রোদনের শেষ ;
পলাশি-যুদ্ধের নহে এই পরিণাম।
যেই শক্তি স্রোতস্বতী, ভেদি বঙ্গদেশ
নির্গত হইল আজি, ভ্রমি অবিশ্রাম
হিমাচল হতে বেগে করিবে গমন
কুমারীতে, লঙ্কাদ্বীপে লঙ্ঘি পারাপার।
প্রতিদিন ইহার বাড়িবে আয়তন,
হইবে তাহাতে ভীম ঝটিকা সঞ্চার।
যবে পূর্ণ বলে ক্রমে হবে বলবতী
কার সাধ্য নিবারিবে এই স্রোতস্বতী? (৪/১২ পাতা ৯৯)

দেশের জন্য দুঃখিত হলেও কবি কিন্তু একবারও পলাশীর পরাজয়ের ফল সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। নবাবের রাজত্বের অবসান বাংলার অন্ধকার যুগের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। দেশে জনসাধারণের পক্ষে এই যুদ্ধ যে নবযুগের সূচনা করেছে সে কথা বলতে কবি দ্বিরুক্তি করেন নাই।

ভারতের নহে আজি অসুখের দিন
আজি হতে যবনেরা হল হতবল ;
কিবা ধনী, মধ্যবিত্ত কিবা দীন হীন
আজি হতে নিদ্রা যাবে নির্ভয়ে সকল। (৪/১৬ পাতা ১০০)

মিলটনের অনুকরণ শুনে অবাক হবার কারণ নাই। পরাধীন ভারতের দুঃখময় জীবনের ছবি কবি তুলে ধরেছেন।

ভারতের নহে আজি অসুখের দিন।
পশিয়া পিঞ্জরান্তরে, বনবিহগীর

কিবা সুখ, কি অসুখ ? সমান অধীন।
পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস, অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হতে সুখী সমধিক। (৪/১৫ পাতা ১০০)

পঞ্চম সর্গ, 'শেষ আশা'। সময় নিঃসন্দেহে ২রা জুলাই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। মুর্শিদাবাদের কারাগারে বিভিন্ন কক্ষে নবাব ও নবাব মহিষী বন্দী। মীরজাফরের অভিষেকের পর কামিনীকুল মত্ত। মীরণ সুরা আর রমনী নিয়ে আবিষ্ট। জনসাধারণ পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে আলোচনারত। কেউ কেউ ক্লাইভের বীরত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মীরণ নবাব মহিষীকে লাভের জন্য দূত প্রেরণ করলেন। দূত দেখল দ্বারে মস্তক আঘাত করে নবাবের স্ত্রী, 'রক্তস্রোতে শোকস্রোতে হয়ে অচেতন, মৃত্যুর অশোক অঙ্কে করিল শয়ন।' (৫/৩১ পাতা ১২১) সিরাজদৌল্লার প্রতি কবি অত্যন্ত কঠোর।

এই কি সিরাজদৌল্লা ? এই সে নবাব
যার নামে বঙ্গবাসী কাঁপে থর থর ?
যার এই বঙ্গে ছিল প্রচণ্ড প্রভাব
সেই কি পতিত আজ ধরার উপর ?
কোথায় সিরাজ তব মহিষী মণ্ডল ;
কোথায় সে রাজদণ্ড ? খচিত ভূষণ ;
কেন আজি অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগল ?
এযে মহম্মদি বেগ তব অনুচর
তুমি কেন পড়ে তার চরণ উপর ?
দুই দিন আগে এই দুর্দান্ত সিরাজ
চাহিত না মুখ তুলি যেই অনুচরে
আজি সে নবাব-আহা ! বিধির কি কাজ !
কাঁদিছে চরণে তার জীবনের তরে।

(৫/৪১, ৪২ পাতা ১২৪)

অবশেষে 'সিরাজের ছিন্নমুণ্ড চুম্বিল ভূতল' 'ভারতের শেষ আশা হইল স্বপন।' (৫/৪৭ পাতা ১২৭) এইভাবে সিরাজ-মহিষীর কারাগারে মৃত্যু এবং

মহম্মদী বেগের হাতে নবাবের গুপ্ত হত্যা দেখিয়ে কাব্য শেষ হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধ কাব্যকাল তাই মার্চ থেকে জুলাই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সীমাবদ্ধ। ষড়যন্ত্রে শুরু আর নবাবের মৃত্যুতে শেষ। নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ এক সার্থক কাব্য।

নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধ লেখার সময় যে ভাল করেই ইতিহাস পড়েছিলেন তা আমরা কাব্য পাঠে বুঝতে পারি। প্রচলিত কথিকাও তাকে প্রভাবিত করেছে। তিনি নবাবের যে ছবি এঁকেছেন তা বিলাসী সিরাজ যিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও একাধিক নর্তকী ও সুরায় মত্ত। প্রথম সর্গ থেকেই নবাবের অত্যাচারের ও অপকীর্তির যে ছবি দেখান হয়েছে তা কতখানি সত্য, সিরাজ-চরিত্র বিশ্লেষণের সময় দেখা যাবে। প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে দেখিয়েছেন জগৎশেঠ, মীরজাফর, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা রাজবল্লভ ও রাণী ভবানীকে। ষড়যন্ত্রের সময় তাঁর মতে চন্দননগর পতনের পর। এইখানে কিছু বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছে। রাজত্ব প্রাপ্তির একমাসের মধ্যে সিরাজদৌল্লা, মীরজাফর ও রায় দুর্লভকে পদচ্যুত করার পর থেকে ষড়যন্ত্রের সুরু। জগৎশেঠ ভাইদের অপমান করার পর ষড়যন্ত্র ভালভাবে গড়ে উঠল। কে নবাব হবেন এই নিয়ে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হল। জগৎশেঠেদের ইচ্ছা ছিল যে ইয়ার লতিফ খাঁর মতো শাসনপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি নবাব হবেন কিন্তু মীরজাফর খাঁ তাকে নবাব না করলে ষড়যন্ত্র থেকে সরে দাঁড়াবেন হুমকী দিলে বাধ্য হয়েই জগৎ শেঠ ও তার ভাই মহারাজ স্বরূপচাঁদ মীরজাফর খাঁকে নবাব করতে রাজী হলেন। জগৎশেঠের মূল লক্ষ ছিল তার ব্যবসার প্রসার সেজন্য দেশে শান্তি থাকার প্রয়োজন ছিল। জগৎশেঠের তখন বিরাট ব্যবসা। পেশোয়ার থেকে কামরূপ এমন কি পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে অর্থাৎ সুমাত্রা জাভা প্রভৃতি জায়গাতেও জগৎশেঠের নামাঙ্কিত হাতচিটার টাকা লেনদেন হত। বাংলাদেশে পায়ে সোনার গহনা পরবার অধিকার নবাব সিরাজদৌল্লা ছাড়া একমাত্র জগৎশেঠ বংশীয়দের ছিল। তার স্থান সর্বদা নির্দিষ্ট ছিল নবাবের বামে। এই ব্যবস্থা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অটুট ছিল।[২৭] বাংলায় সুশাসন প্রবর্তনের উদ্বেগ প্রকাশ করে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় কোন অনধিকার চর্চা করেননি। বস্তুতঃ শাসনতন্ত্রের ছোট অংশীদাররূপেই তাঁরা মুর্শিদকুলি খাঁর সময় থেকে রাজ-কার্য্যে সাহায্য করেছেন। নবাব আলিবর্দী খাঁ প্রায়ই জগৎশেঠের কাছে

টাকা ধার নিতেন। তাতে শেঠদের মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পেল। নবাব সিরাজদৌল্লার চালচলনে শেঠরা চিন্তিত হলেন। ইংরেজদের দিয়ে নবাবকে সরিয়ে দেবার বুদ্ধিও শেঠদের কাছ থেকেই এল। খোলাখুলি-ভাবেই ষড়যন্ত্র করলেন জগৎশেঠ আর তার পেছনে এসে দাঁড়ালেন রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এবং ইতর ভদ্র সকলেই। ফরাসী লা সাহেব তাঁর আত্মজীবনীতে স্পষ্টই লিখেছেন যে ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল শেঠভ্রাতৃদ্বয়, তাদের কাছে জোর না পেলে ইংরেজরা ষড়যন্ত্রে আদৌ যোগ দিত কিনা সন্দেহ। জগৎশেঠের বংশের বধূকে সিরাজদৌল্লা হরণ করেছেন বলে নবীনচন্দ্র যে অভিযোগ করেছেন তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। সরফরাজ খাঁর গল্পকে সিরাজদৌল্লার ওপর চাপিয়ে জগৎশেঠের মনোদুঃখের কারণ ঘটাবার চেষ্টা হয়েছে। মীরজাফর এবং রায় দুর্লভ অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী। কবি রায়-দুর্লভের জায়গায় রাজা রাজবল্লভকে এনেছেন। এই বৈদ্য ভদ্রলোক ঘসেটি বেগমের মন্ত্রী ছিলেন। ঘসেটি বেগমের সম্পত্তি অপহরণের সময় তিনি কারারুদ্ধ হন। তিনি তার পুত্র কৃষ্ণদাসকে বহুধনরত্ন সহ কলকাতায় ইংরেজ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। শ্রীক্ষেত্র দর্শনের নাম করে রাজবল্লভ পুত্র সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। নবাব সিরাজদৌল্লা সন্দেহ করতেন যে ঘসেটি বেগমের বহু ধনরত্ন রাজবল্লভ পুত্রের সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়েছেন সেজন্য কৃষ্ণদাসের মুর্শিদাবাদে ফিরে আসার আজ্ঞা ঘোষণা করেন। ষড়যন্ত্রের সময় রাজা রাজবল্লভ আদৌ কারাগারের বাইরে ছিলেন কিনা সন্দেহ। থাকলেও নবাবের বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস তার হবেনা বলেই মনে হয়। পলাশীর যুদ্ধে বা তার অব্যবহিত পরবর্তীকালে রাজা রাজবল্লভের কোন ভূমিকা নাই। তাঁকে এরপর দেখা যাবে মীরণের দেওয়ান রূপে। সুতরাং ষড়যন্ত্রে তিনি অংশগ্রহণ করে থাকলেও কোন মুখ্য ভূমিকা তার ছিলনা। পরবর্তীকালের কায়স্থ রাজা রাজবল্লভের সঙ্গে এঁকে প্রায়ই গোল-মাল করা হয়। রাজা রাজবল্লভ (কায়স্থ) ছিলেন রাজা দুর্লভরামের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। আলিবর্দীর সুবিখ্যাত দেওয়ান রাজা জানকীরাম এঁর পিতামহ। নবীনচন্দ্র সেন রাজা রাজবল্লভকে যে ভূমিকা দিয়েছেন এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যে ভুলের পুনরুক্তি করেছেন তাঁর সিরাজদৌল্লা নাটকে তাতে জাতীয় চরিত্রের কোন দিক প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা সামাজিক

ইতিহাসের গবেষকরা বিচার করবেন। বর্তমান পরীক্ষায় নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে, জগৎশেঠ, মীরজাফর ও রায়দুর্লভের নেতৃত্বে ও ইংরেজদের সহযোগিতায় নবাব সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে চক্রান্ত পূর্ণ হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও রাণী ভবানী মনে মনে বিভিন্ন কারণে নবাবের পতন চাইলেও প্রত্যক্ষভাবে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কবা কঠিন ছিল। কারণ তখন ভূমিবণ্টনের নিয়ম ছিল ভিন্ন। বড় বড় ভূস্বামীরা রাজস্বের জামিনদার ছিলেন। সমস্ত জমির মালিক ছিলেন দিল্লীর বাদশাহ তথা বাংলার সুবেদার বা নবাব। নবাবের একটি পরোয়ানায় ভূম্যধীকারীদের অধিকার-চ্যুতির সম্ভাবনা ছিল। নবাব আলিবর্দীর আদেশে দুইবার রাণী ভবানীকে রাজত্ব হারাতে হয়েছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দী করে রাখার যে গল্প পঞ্চম সর্গে বর্ণিত হয়েছে সেটিও এক প্রচলিত কথিকা মাত্র। বস্তুত কৃষ্ণচন্দ্রের বন্দীত্বের সময় আলিবর্দীর রাজত্বকালে।

দ্বিতীয় সর্গে কাটোয়া দুর্গজয়ের ঘটনা বর্ণনা করে নবীনচন্দ্র তার ইতিহাস জ্ঞানেরই পরিচয় দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদে যুদ্ধ করার চাবি ছিল কাটোয়া দুর্গ। রাজমহল পর্য্যন্ত আর কোন দুর্গ না থাকায় নবদ্বীপ থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড ইংরেজ অধিকারে এসে গেল কাটোয়া দুর্গজয়ের পরে। রণনীতিতে ক্লাইভ যে কেমন পারদর্শী ছিলেন কাটোয়া দুর্গ জয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মেজর আয়ারকুটের ডায়ারী (রোজনামচা) থেকে আমরা জানতে পারি যে ক্লাইভ নিজে এবং সমর-পরিষদের অধিকাংশ সদস্য অবিলম্বে পলাশী যাত্রা করতে রাজী হলেন না। মেজর আয়ারকুট বারবার বলেছেন যে সসৈন্য লাসাহেবের নবাবের বিরাট বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ যেমন করেই হোক বন্ধ করতে হবে। জাঁলা সাহেব এবং তার ফরাসী সৈন্যা-ধ্যক্ষরা নবাব বাহিনীর পরিচালনার ভার নিলে মীরজাফরের যুদ্ধ না করার চুক্তি বাতাসে ভেসে যাবে। কেবল সৈন্য সংখ্যার গরিষ্ঠতায় নবাব ইংরেজদের বিপদে ফেলবেন। এইসব যুক্তি সত্ত্বেও ক্লাইভ সৈন্যবাহিনীকে গঙ্গা পার হবার নির্দেশ দেননি কিন্তু হটাৎ মধ্যরাত্রে ক্লাইভ সৈন্যদের নদী পার হবার এবং পলাশীতে সমবেত হবার নির্দেশ জারী করলেন। নবীনচন্দ্র এইখানে ইংল্যাণ্ডের বিজয়লক্ষ্মী ব্রিটানিয়াকে আবির্ভূত করেছেন।

তৃতীয় সর্গ কবির কল্পনা। নর্তকী ও বেগম নিয়ে সিরাজ যুদ্ধ করতে

গিয়েছিলেন কিনা বলা সহজ নয় কারণ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলেছেন বটে এবং নবাবের চরিত্র ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এমন ঘটনা অসম্ভব নয়। তবে নর্তকী ও মহিষী দুই থাকা অসম্ভব। সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে নর্তকী নিয়ে যেতে পারেন রণক্ষেত্রে নবাব কিন্তু যে স্ত্রীর সঙ্গে জীবনে কোন সম্পর্ক রাখেননি তাকে নিয়ে লড়াই করতে নিশ্চয়ই যানান। পলায়নের সময় সঙ্গে ছিলেন প্রিয় সহচরী লুৎ-ফউন্নিসা—তিনি সিরাজদৌল্লা মহিষী নন চিরসহচরী মাত্র।[২৮]

চতুর্থ সর্গ পলাশীর যুদ্ধ। এইখানেই মোহনলালকে বাঙ্গালী বীররূপে প্রথম প্রতিষ্ঠা করা হয়। আগেই বলা হয়েছে মোহনলাল বীর বটে কিন্তু বাঙ্গালী নন। পলাশীয় যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলাল বীরত্ব দেখাবার সুযোগ পাননি। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি মরণাপন্ন ব্যাধি থেকে আরোগ্যলাভ করেন। সেজন্য বিশেষ পরিশ্রমে তিনি অপারগ হন। তারপর মধ্যাহ্নের পরে তিনি ইংরেজ গোলায় সাংঘাতিক আহত হন তাই নবাবের পলায়নের সময় তাকে বিরত করতে বা সঙ্গদান করতে সক্ষম হননি। ইংরেজপক্ষের শতকরা আশি ভাগ ক্ষতি হয় ফরাসী সাঁফ্রে আর তার গোলন্দাজের চেষ্টায়। মীরমদন ইংরেজবাহিনীর ক্ষয়ের আর এক কারণ। কবি মোহনলালের বীরত্বের যে ছবি এঁকেছেন তাতে সাঁফ্রে আর মীরমদনের উল্লেখ না থাকায় ঐতিহাসিক সত্য লঙ্ঘন করা হয়েছে। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার চিত্রটি কবি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। পলাশীর যুদ্ধের চিত্রগুলিও খুবই চমৎকার।

পঞ্চম সর্গে সিরাজদৌল্লার গুপ্তহত্যা ইতিহাস সঙ্গত। মহম্মদী বেগ ঘাতক। মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করাও সত্য। পরদিন এই খণ্ডিত মস্তক বর্শার মাথায় গাঁথা হয় এবং কবন্ধ হাতির ওপর চাপিয়ে নগর ভ্রমণ করা হয়। মীরণের লুৎফউন্নিসার প্রতি লালসাও সত্য ঘটনা। অবশ্য লুৎফউন্নিসা নবাবের পত্নী নন এবং নবাব পত্নীর কারাগারে মৃত্যু হয়নি। লুৎফউন্নিসা ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন।[২৯] সিরাজদৌল্লার পত্নী ওমদাৎউন্নিসা ১০ই নভেম্বর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে পরলোকগমন করেন।[৩০] নবাব মহিষীর মৃত্যু দৃশ্য অলীক কল্পনা মাত্র। কবি যে বিলাসী ও কাপুরুষ নবাব সৃষ্টি করেছেন তা ইতিহাস বিরোধী নয়। তাই নবীনচন্দ্রের কাব্য প্রতিভার

বিকাশে বিস্মিত হতে হয়। তিনি সিরাজের অপকীর্ত্তিকে নিন্দা করেছেন কিন্তু সিরাজের পতনে, তার অপঘাত মৃত্যুতে সমবেদনায় মূর্ত হয়ে উঠেছেন, পাঠকের মনকে উদ্বেলিত করেছেন। অত্যন্ত কঠিন পথে সিরাজ চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছেন নবীনচন্দ্র। তাঁর সাফল্য ইতিহাস-সাহিত্যের আসরে এক বিরাট কীর্ত্তি। পলাশীর যুদ্ধ তাই মহাকাব্যের সংজ্ঞা পাবার দাবী রাখে।

নবীনচন্দ্র সেন সর্বপ্রথম পলাশীর যুদ্ধ ও নবাব সিবাজদৌল্লাকে সাহিত্যের মধ্যে নিয়ে আসেন, তাঁর দায়িত্ব তাই কম ছিল না। কাব্য পাঠ করে তাই একথা বলা চলে যে ইতিহাসেব দিক থেকে নবীনচন্দ্র সে দায়ীত্ব অনেকখানি পালন করেছেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হয়। তখন বাঙালী শিক্ষিত সমাজ ইংরেজী শিক্ষায শিক্ষিত হয়ে সবেমাত্র দেশ ও জাতির কথা ভাবতে শিখেছেন। পরাধীনতার কলঙ্কে তাদের মন হয়েছে সচেতন। ইংরেজ শাসন ও শাসনকর্তাদের উন্নাসিকতা বাঙালী শিক্ষিত সমাজকে নিজেদের অসহায় অবস্থা বুঝতে শিখিয়েছে। পনের বছর আগে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পনম নাটকম্" প্রকাশিত হয়ে শাসকসমাজে যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার ঢেউ তখনও স্তিমিত হয় নাই। দেশের এই অবস্থার মধ্যে 'পলাশীর যুদ্ধ' রচিত। স্বভাবতই কবি ভাল করে ইতিহাস পড়ে তবেই কল্পনার খেয়া খুলেছেন। দেশের তখনকার আবহাওযা বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তথা বন্দেমাতরম (প্রকাশ কাল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ) তখনও প্রকাশিত হয় নাই। নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধে কোন রাজনৈতিক নায়ক সৃষ্টি করেন নাই। সিরাজদৌল্লা স্পষ্টতই কুপথগামী নবাব। ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন স্পষ্ট বিদ্রোহ তাই পলাশীর যুদ্ধে পাওয়া না গেলেও দেশভক্তির অপূর্ব তরঙ্গ মনকে আচ্ছন্ন করে। তৎকালীন সমসাময়িকদের মনোভাব লক্ষণীয়। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর লিটারেচর অফ বেঙ্গলে নবীনচন্দ্রকে বিষয় নির্বাচনে সাধুবাদ জানিয়ে লিখলেন—"He has struck a still deeper chord in the hearts of his countrymen." হিন্দু পেট্রিয়ট ও নব্য-ভারত এই কাব্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ মনীষীগণ পলাশীর যুদ্ধের বিষয় নিয়ে আলোচনা না করে কেবল নবীনচন্দ্রের রচনাশৈলী আলোচনা করে কমবেশী সাধুবাদ দিলেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী

দে বেঙ্গল ম্যাগাজিনে সমালোচনা প্রসঙ্গে বিষয় নির্বাচন সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন, পলাশীর যুদ্ধ এক কলঙ্ক কাহিনী। বাঙ্গালীর কোন গৌরব যেমন সৃষ্টি হয় নাই, তাদের বীরত্বও তেমনি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নবীনচন্দ্রের দক্ষতার অপব্যবহার হয়েছে এই বিষয়বস্তুর জন্য। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অভিযোগ করলেন যে নবীনচন্দ্র সিরাজ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতার বিদগ্ধ সমাজে 'পলাশীর যুদ্ধ' যে আলোড়ন এনেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লিখলেন—'যে বাঙালি হইয়া বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালি জন্ম বৃথা।' 'পলাশির যুদ্ধ যে বাঙ্গালীর সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি বহুমূল্য রত্ন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।' (বিবিধ প্রবন্ধ। পলাশির যুদ্ধ। বসাপ সংস্করণ পাতা ৩৫২)।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর শনিবার বেঙ্গল থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে "দি নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশানাল) থিয়েটার কর্তৃক প্রথম অভিনীত হয়। ক্লাইভের ভূমিকায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ও ব্রিটানিয়ার ভূমিকায় বিনোদিনীকে নিয়ে যে অভিনয় হয় তা সম্ভবত ১৮৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে ন্যাশনাল থিয়েটারে হয়েছিল। নবীনচন্দ্র আত্মজীবনীতে স্বয়ং লিখেছেন—'বঙ্গ সাহিত্য জগতে হুল-স্থুল পড়িয়া গেল পলাশির যুদ্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে।' ইংরেজ আমলের প্রারম্ভ নিয়ে নাটক অথবা কাব্য রচনা করতে তখন কেউ সাহসী হয় নাই। ইংরেজ শাসনের জ্বালা জাতির বুকে প্রচণ্ড দাহের সৃষ্টি করেছে, পরাধীনতার কলঙ্কে বাঙ্গালী মূক। তখনই বাঙ্গালীর মনীষা বিদ্রোহ করেছে। সেই বিদ্রোহের স্পষ্ট ছবি গবেষণাগারের ছকের মতো সাহিত্যে ধরা পড়েছে। প্রথম বিক্ষোভ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, নীলদর্পণে। অত্যাচারী নীল কুঠিয়াল সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ইংরেজ সরকারের শাসনক্ষমতাকে কটাক্ষ, বুঝতে কারু ভুল হয় নাই। তাই দেখি নীলদর্পণ রাজরোষে পতিত। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আর এক সরব প্রতিবাদ। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যায়—

> হে বিধাতঃ! কোন্ পাপ করিল সে জাতি ?
> কেন তাহাদের হল এত অবনতি ?
> ···সংখ্যাতীত নরপতি—প্রণামে যাহার

চরণে হইয়াছিল মুকুট অঙ্কিত
কুরুক্ষেত্র জয়ী বীর। দয়ার আধার,
ধর্মপুত্র যুধিষ্টির ছিল বিরাজিত,
বসিল—লজ্জার কথা বলিব কেমনে?
যবনের ক্রীতদাস সেই সিংহাসনে! (যুদ্ধান্ত ৪/২৬ পাতা ১০৪)

দেশমাতার জন্যে নবীনচন্দ্রের বেদনা স্পষ্টই ব্যক্ত হয়েছে—

পাণিপথে সেই রবি গেল অস্তাচলে,
ভারতে উদয় নাহি হইল আবার। (যুদ্ধান্ত ৪/২৬ পাতা ১০৪)

নিজে সরকারী কর্মচারী ছিলেন বলে উপরওয়ালার চাপে নবীনচন্দ্রকে প্রথম সংস্করণের অনেক পাঠ বদলাতে হয়। রাজদ্রোহিতার অপরাধে কতরকমের দলাদলি ও ঈর্ষাপ্রসূত নির্য্যাতন নবীনচন্দ্রকে ভোগ করতে হয়েছিল তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনে'র শেষ চারভাগে বর্ণিত হয়েছে। নবীনচন্দ্রের সাধনা ব্যর্থ হয় নাই। পলাশির যুদ্ধ কাব্যে যে দেশপ্রেম প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সমসাময়িককাল তাতে পরিপূর্ণভাবে আপ্লুত হয়েছে। মুখে মুখে ফিরেছে—

—অধীনতা অপমান সহি অনিবার
কেমনে রাখিবে প্রাণ, নাহি পাবে পরিত্রাণ
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক হইবে অঙ্গার। (৪/৩৫ পাতা ৮৮)
ভুবনবিখ্যাত সেই যশের কারণ,
ধর্ণিতা, দুহিতা তরে, লও অসি লও করে
ভারতের লাগি সবে কর তবে রণ! (৪/৪২ পাতা ৯০)

এই দেশভক্তির তরঙ্গে দোলায়িত হয়ে পলাশীর যুদ্ধ কাব্য প্রকাশের সাতবছর পর যে মানিক্য প্রকাশিত হল তা রূপে বর্ণে এক অত্যুজ্জল বিস্ময়। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হল আর সেই সঙ্গে মুক্তি পেল এক পরাধীন জাতির জাগরণের বীজমন্ত্র বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত।

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী : নবাব সেরাজুদ্দৌল্লা ১৮৭৬

নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে নিয়ে প্রথম নাটক প্রকাশিত হল 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশের একবছর পরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন, নাট্যকার লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী। পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশের ফলেই 'নবাব সেরাজুদ্দৌল্লা' রচিত হয়েছে

মনে করবার কারণ আছে। যদিও বিষয়বস্তু উপস্থাপনে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী, নবীনচন্দ্র সেনের দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত হন নাই কিন্তু পলাশীর প্রচণ্ড যুদ্ধ ও মোহনলালের বীরত্ব এই দুই রচনার মধ্যেই দেখা গেছে। উভয়ে সযত্নে বাঙালীর বীরপণা ও প্রভুভক্তি, মোহনলাল চরিত্র মারফৎ দেখিয়েছেন। মোহনলালের প্রভুভক্তি স্বদেশপ্রীতি বলে কথিত হয়নি একবারও। এ নাটকটি অত্যন্ত বিরল ও দুষ্প্রাপ্য তাই বিশদভাবে আলোচনা করা হবে।

এই নাটকের প্রথম পাতা এইরূপ ছাপা হয়েছে—

'নবাব সেরাজদ্দৌলা (ঐতিহাসিক নাটক)

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী প্রণীত

'Pass we to matters masculine , to strains,

Where weightier themes may pay the readers pains,

Again disclose we counsels of wise,

Deeds of the warlike :—let the curtain rise "

কলিকাতা। ১০৭ নং শ্যামবাজার স্ট্রীট।

কর-প্রেসে শ্রীযদুনাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত। সন ১২৮৩ সাল ॥'

নাটক ছয় অঙ্কে ১৩৬ পাতায় শেষ হয়েছে। প্রথম অঙ্ক ১-২৩ পাতা, দ্বিতীয় অঙ্ক ২৪-৪৯ পাতা, তৃতীয় অঙ্ক ৫০-৭৬ পাতা, চতুর্থ অঙ্ক ৭৭-৯৫ পাতা, পঞ্চম অঙ্ক ৯৬-১০৭ পাতা ও ষষ্ঠ অঙ্ক ১০৮-১৩৬ পাতা। নাটকে নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব থেকে সিরাজের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটনাবলী দেখান হয়েছে অর্থাৎ বলা চলে ১৭৫৬ এবং ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা এই নাটকের বিষয়বস্তু। আমাদের সমসাময়িক নাট্যকারদের তুলনায় লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের গল্পকে যে শক্ত বাঁধুনী দেওয়া হয়েছে তা পরবর্তী নাট্যকারগণের, বিশেষ গিরিশচন্দ্রের পরবর্তী নাট্যকারগণের তুলনায় অনেক বেশী জোরদার। ইতিহাসকে মোটামুটিভাবে মেনে চলায় প্রক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিকে বলতে হয় নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে ঘটনার ব্যাখ্যা।

নাটক শুরু হচ্ছে, রানী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরীর আর্ত চীৎকারে। সিরাজদ্দৌল্লার আদেশে মহম্মদী বেগ তারা-হরণ করছে। রাণী ভবানীর সাহায্যের আহ্বানে ছুটে এলেন রাজা রাজবল্লভের ছেলে, এই নাটকে তাঁকে

কুমার কৃষ্ণদাস বলা হয়েছে, আর গোঁসাইদাস নামে রাণী ভবানীর আশ্রিত এক ব্রাহ্মণ যুবক। এদের চেষ্টায় তারাসুন্দরী রক্ষা পেলেন বটে কিন্তু তাদের পালাতে হল। কৃষ্ণদাস কলকাতায় পলায়ন করলেন। গভীর ক্ষোভে 'সিরাজদৌল্লা' গোঁসাইদাসের সুন্দরী তরুণী ভার্য্যা সত্যবতীকে অপহরণ করে নিযে হারেমে পুরে ফেললেন। মহল্লী খাজে সেরা নামে একটা চরিত্র করা হয়েছে যার পরিচয়-প্রধান কুঞ্চকী। তিনি নিজমুখে আত্মপরিচয় দিযে বলেছেন যে সিরাজকে তিনিই কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। সিরাজের অপকর্ম দেখে তিনি ভৎর্সনা করছেন—'মামুদ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি তোমার আর নিস্তার নাই। এই সকল অত্যাচার, এ প্রকার প্রজা-পীড়ন, অবিরাম ইন্দ্রিয় সেবন অবিলম্বেই তোমার সর্বনাশ করবে।' (প্রথম অঙ্ক ২য় দৃশ্য ১০ পাতা) একশত বছর আগে হলেও নাট্যকার খোঁজ খবর নিয়ে লিখেছেন। সিরাজদৌল্লার নাম যে মীর্জা মহম্মদ তাও অজানা ছিল না। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই বৃদ্ধ নবাবের অসুস্থতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে প্রজারা, বলছে—'মিরজা মামুদ সুবেদার হলে এদেশের কি নিস্তার থাকবে?' এখানে গিরিশ-পরবর্তী নাট্যকারদের তুলনায় লক্ষ্মী-নারায়ণ চক্রবর্তী অনেকবেশী ওয়াকেবহাল। তিনি জানতেন যে বাংলার নবাবরা সবাই দিল্লীর সুবেদার ছিলেন কেউই স্বাধীন ভূপতি ছিলেন না।

দুই পলাতক বীরের দেখা হল পলাশীতে। কৃষ্ণদাস বললেন 'সেরাজদৌল্লার পতনে দুর্বৃত্ত দশাননের নিধনে প্রপীড়িতা পৃথিবী যে ভারমুক্ত হবেন তার আর সন্দেহ নাই।' (১/৪, ২১ পাতা) গোঁসাই দাস সাজলেন 'ফতিমা' সিরাজের অপকর্মের প্রতিবিধান হল তার প্রতিজ্ঞা। (সন্দেহ হয় গিরিশচন্দ্রের জহরা চরিত্র ফতিমার দ্বারা অনুপ্রাণিত কিনা!) ফতিমা মীরনের মনে ঈর্ষা জাগায়। সম্পদ, সুরা, স্ত্রীলোক সিরাজ ইচ্ছামত পায় মীরন পায় না। তাকে অপেক্ষা করতে হয় 'মামুদের' উচ্ছিষ্ট ত্যাগের জন্য (২/১)। তিনি পিতা মীরজাফরের কাছে নিজের ব্যথা প্রকাশ করলেন। ওদিকে নবাব আলিবর্দীর মৃত্যু হয়েছে। প্রথম দিনের দরবারেই নূতন সুবেদার সিরাজ সকলকে অপমান করছেন। কৃষ্ণদাস তাঁরা হরণে বাধা দিয়েছে সে জন্য তিনি কৃষ্ণদাসের ওপর রুষ্ট। কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় ইংরজেরা আশ্রয় দিয়ে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেঁ। রাজবল্লভ ও তার পুত্রের প্ররোচনায় ইংরেজরা ছোট বেগমের (ঘসেটি বেগম)

সঙ্গে যোগ দিয়েছে উদ্দেশ্য বেগমের নাবালক নাতিকে সুবেদার করা। এই হল নবাব সিরাজদৌল্লার অভিযোগ। ভীষণ রেগে নবাব রায়দুর্লভকে বলছেন—'বজ্জাৎ কাফের আমি খুব দরিয়াফত করেছি। তুমিও নেমকহারাম রাজবল্লভের বদ মতলবের মধ্যে আছ।' একটু পরে বলছেন—'শুয়ার আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।' (২/২ ৩১ পাতা) জগৎশেঠও বাদ পড়ছেন না। তাঁকে বলা হচ্ছে—'দরবারে আর একটা হিন্দু বাচ্ছা রাখব না।' তারপর 'চাকর হয়ে মুনিবের হুকুম শুনবে না।' (২/২ ৩২ পাতা) পরবর্তী দৃশ্যেই তাই সবাই জগৎশেঠের বৈঠকখানায় সমবেত হয়েছেন। এই দৃশ্যে জানান হয়েছে যে ছোট বেগম (ঘসেটি বেগম) বন্দী এবং তার পৌত্র সিরাজ দ্বারা নিহত। সমবেত হয়েছেন জগৎশেঠ, পাটনার শাসনকর্তা রামনারায়ণ ও রাণী ভবানী। প্রসঙ্গত বলা হয়েছে রাণীর কন্যা মাতুলালয়ে। গোঁসাই ও রায়দুর্লভ যোগদান করায় তাঁদের বিক্ষোভ প্রকাশিত হল। রাজবল্লভও যোগদান করলেন। লক্ষ্য করার বিষয় সব হিন্দুরা মিলে মুসলমান সুবেদারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়েছেন। রায়দুর্লভ পরামর্শ দিলেন যে মীরজাফরকে সুবেদারীর লোভ দেখিয়ে দলে টানতে। তিনি প্রধান সেনাপতি সুতরাং তিনি সিরাজের বিরুদ্ধাচারণ করলে সুবেদারের পতন ত্বরান্বিত হবে। রাজা রাজবল্লভ এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। পরবর্তী দৃশ্য মীরজাফরের নাচঘর। সহকর্মী রায়দুর্লভকে নবাব অপমান করায় মীরজাফর খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। একটু আশাঙ্কিত হয়েছেন তাঁকেও সিরাজ প্রকাশ্য দরবারে অপদস্ত করতে পারেন এই ভয়ে। (২।৪ পাতা ৩৯—৪৪) ফতিমার কথায় মীরণ প্রলোভিত হচ্ছেন। তার পিতা সুবেদার হলে তিনি অখণ্ড পরাক্রমের অধিকারী হবেন। 'মামুদের উচ্ছিষ্ট' আর গ্রহণ করতে হবেনা। সাধারণ মানুষও সিরাজের কুৎসা করে বলে—'মেয়ে মানুষের পেট চিরে যে ছাবাল দেখে সে শালার নবাব কি মানুষ? শয়তান শয়তান।' (২।৫, পাতা ৪৪) সিরাজকে মদ্যপানে ও বিলাসে মগ্ন দেখা যায়। নর্তকীদের নৃত্যের মাঝেই মোহনলাল ইংরেজদের চিঠি পড়ে শোনান—'তারা কৃষ্ণদাসকে দেবেনা, রাজস্ব বৃদ্ধি দেবেনা।' ক্রুদ্ধ নবাব চীৎকার করে ওঠেন—'ওদের কাশিমবাজার কুঠি লুঠ কর।' (২।৫ পাতা ৪৪-৪৯)

উমিচাঁদ অভিযোগ করেন যে কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেবার জন্যই নবাব

কলকাতা আক্রমণ করতে আসছেন। ‘আপনার জন্যই এই কাণ্ডটা হল’ (৩।১ পাতা ৫৩)। ইতিমধ্যে মীরণ স্পষ্টই পিতা মীরজাফরকে অনুরোধ করলেন সিরাজদৌল্লাকে হটিয়ে সুবেদার হয়ে বসতে। (৩/২ পাতা ৫৬-৫৮) ফতিমারূপী গোঁসাই হীরাঝিলে স্ত্রী সত্যবতীর সঙ্গে দেখা করে তাকে ‘পিশাচ বধের’ জন্য প্রস্তুত করে গেলেন। (৩/৩ পাতা ৫৮-৬৩)। নবাব কলকাতা জয় করে মোহনলালের পাশে পাশে ঘোড়ায় চেপে ফিরে এলেন। জগৎশেঠের বাড়ীতে ষড়যন্ত্রের আসর বসল। আলোচনায় প্রধান অংশ নিলেন জগৎশেঠ, তাঁর ভাই রূপচাঁদ রায়, (মহারাজা স্বরূপচাঁদ হবে) গোঁসাই ও রায়দুর্লভ। রায়দুর্লভ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পরাঙ্মুখ। জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ তাকে বোঝান—‘এখন মোহনলালের হুকুমে তোমায় কাজ করতে হবে।’ তারপর সিরাজ চরিত্র নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে,

> ……গর্ভিনী রমনী ধরি বিদরে উদর,
> লোকপূর্ণ নৌকা সব জলে ডুবাইয়া,
> দেখেছে কৌতুক দুষ্ট, করতালি দিয়া। (৩/৫ পাতা ৭৩)

মীরজাফর ষড়যন্ত্রে যোগদান করতে রাজী হয়েছেন শুনে অবশেষে রাযদুর্লভ বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন যে মোহনলাল নবাবের সহায় আছেন। ‘মোহনলালকে খুব সাবধান’। (৩/৫ পাতা ৭৭) চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের দরবার দৃশ্যটি খুবই সংঘাতপূর্ণ। নবাবের পক্ষে মোহনলাল প্রশ্ন করে “২৪শে পৌষের সন্ধির পণগুলো ইংরেজ ভুলে গেল?” উমিচাঁদ জবাব দেয় ‘নবাব ফরাসীদের সাহায্য করলে ইংরেজ নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে নচেৎ নয়।’ সিরাজ আবার অপমান করেন রায়দুর্লভকে, জগৎশেঠ তার হাত ধরে গভীর ক্ষোভে দরবার ত্যাগ করেন। সিরাজ ঠিক করলেন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। যুদ্ধে তার ভয় দেখান হয়েছে,. ভাষণ দেওয়া হয়েছে—“শীতকালের লড়াইয়ে বেশ বুঝেছি, ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কেহই জয়ী হতে পারবে না।” (৪/১, পাতা ৮৪) বলা-বাহুল্য নবাব ৫ই ফেব্রুয়ারীর যুদ্ধের কথা এবং সে যুদ্ধে হেরে যাবার কথাই ঘোষণা করছেন। ২৪শে পৌষের সন্ধির পণের উল্লেখও সেই কারণে। (৪/১ পাতা ৭৭-৮৫) সত্যবতীর রূপমুগ্ধ সিরাজ তাকে উপভোগের জন্য

ব্যস্ত। এমন সময় মহল্লী খাজে সেরা খবর আনে—'কাটোয়া কেল্লা ইংরেজরা কেড়ে নিয়েছে।' (৪/২ পাতা ৮৫-৯১) পরবর্তী দৃশ্যে অর্থাৎ চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নাট্যকার কাটোয়া কেল্লায় ক্লাইভ ও কুটকে দেখিয়েছেন। লক্ষনীয় নবীনচন্দ্র সেনের ক্লাইভের মতোই এই দুই সাহেবও সোজা বাংলাতেই কথা বলেন। পরবর্তী যুগে ইংরেজ ফরাসী পর্তুগীজ প্রভৃতি ইউরোপীয় চরিত্রের মুখে যে এক অদ্ভুত অসংস্কৃত ভাষা দেওয়া প্রচলিত পদ্ধতিতে দাঁড়িয়ে গেছে তখনও তার প্রচলন হয় নাই। তাই ক্লাইভ ও কুটের যুদ্ধসজ্জা, উমিচাঁদের জন্য জাল দলিল তৈরী করা, কুটের ক্লাইভকে ধিক্কার দেওয়া এবং অবশেষে ক্লাইভের রণবাদ্যসহ যুদ্ধযাত্রা ঘটনাবলী বুঝতে কোনই অসুবিধা হয়না। (৪/৩ পাতা ৯১-৯৫)

পঞ্চম অঙ্ক পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে সিরাজদৌল্লা আর তার পাশে মহারাজ মোহনলালকে নিয়ে সুরু। যুদ্ধের খবর আসছে। জানা গেল মীরজাফর যুদ্ধ করছেন না। মোহনলালের পুত্র আর মর্দ্দন (মীরমদন) যেদিকে আছে সেইদিক থেকে একমাত্র গোলাবর্ষন হচ্ছে। এইসব দেখে মোহনলাল স্বয়ং নবাবের পাশ ছেড়ে যুদ্ধ করতে গেলেন। ইতিমধ্যে সিরাজ মীরজাফরকে ডেকে পাঠিয়ে বলছেন, "চাচাজী আমাকে বাঁচাও।" (পাতা ৯৮) মীরমর্দ্দনের মৃত্যুর খবর পেয়ে সিরাজ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি একাকী পলায়নের সংকল্প করলেন। মহল্লী খাজা সেরার অনুরোধ উপেক্ষা করে মন্ত্রী বা সেনাপতিদের কাউকে কোন খবর না দিয়ে নবাব শিবির থেকেই পলায়ন করলেন। (৫/১ পাতা—৯৬-১০১) অন্যদিকে মীরজাফরের শিবিরের ঘটনা দেখান হয়েছে। মোহনলালের বীরত্বে মীরজাফর স্পষ্টই ভীত ও ত্রাস্ত। সংলাপ—'সমরক্ষেত্রে মোহনলাল বিদ্যুতের ন্যায় বিচরণ করছে।' (পাতা ১০২) মীরজাফরের মনকষ্ট দেখান হয়েছে। নবাবের পলায়ন সংবাদে মীরজাফরের বুক থেকে বোঝা নেমে গেল। নবাবসৈন্যকে ছত্রভঙ্গ ও পলায়নপর দেখে মীরজাফর দ্রুত ইংরেজ শিবিরে প্রস্থান করলেন। (৫/২ পাতা ১০১-১০৪) হীরত ঝিলে পরবর্তী দৃশ্যে গোঁসাই তাঁর স্ত্রী সত্যবতীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। (৫/৩, পাতা ১০৫-১০৭)।

দরবার দৃশ্যেই ষষ্ঠ অঙ্ক সুরু। মীরজাফরের রাজ্যাভিষেক হল। জগৎ-

শেঠ বক্তৃতা করলেন—'রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের মুক্তি দেখতে কার না ইচ্ছা হয়।' (পাতা ১০৮) রায়দুর্লভ, ক্লাইভ, রাজবল্লভ, রামনারায়ণ প্রভৃতি সভাসদরা উপস্থিত। (৬/১ পাতা ১০৮-১১২) পরের দৃশ্যেই গোঁসাই দাস গঙ্গাগর্ভে তরণীতে পলায়নপর সিরাজকে ধরে ফেলেন। মহল্লী খাজা সেরা শত উপরোধ অনুরোধ করলেও গোঁসাইএর মন টলল না। সিরাজের মুখে ধরা পড়ার মুহূর্তে সংলাপ—'অ্যাঁ তুমিই কি সত্যবতীর স্বামী অ্যাঁ? (তদুপরি পতন)' (৬/২ পাতা ১১১-১১৭) তৃতীয় দৃশ্যে আবার দরবার। মীরজাফর ইংরেজদের খরচ বাবদ দিলেন ২৫ লক্ষ টাকা। কুট সেলামী চাইলেন আরো ত্রিশ লক্ষ টাকা। মীরজাফর বিপাকে পড়লেন। অনেক লাভের আশায় আনন্দিত উমিচাঁদের দলিল জাল প্রমাণিত হওয়ায় তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। তারপর বন্দী সিরাজ আর তার ভৃত্য মহল্লী খাজা সেরাকে দরবারে উপস্থিত করা হল। এই দৃশ্যে প্রাণভয়ে ভীত সিরাজের সকলের পায়ে পড়ে জীবনভিক্ষার দৃশ্যটি সত্যই খুব করুণ। নবীনচন্দ্রের মতন নাট্যকার এক কাণ্ডজ্ঞানহীণ যুবকের জন্যই দুঃখপ্রকাশ করছেন—তার পরিণামে দর্শকের করুণা ভিক্ষা করেছেন। নবীনচন্দ্র সেন থেকে সম্ভবত সূত্র সংগৃহীত 'এ যে মহম্মদীবেগ তব অনুচর। তুমি কেন পড়ে তার চরণ উপর?' এখানেও সিরাজ তার সভাসদদের চরণে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন। বলছেন, 'বাঁচতে দাও' আক্ষেপ করছেন—'আঃ মোহনলাল নাই। বীর কেশরী মোহনলাল।' (পাতা ১২১) ক্ষোভে ক্রন্দন করছেন। দৃশ্যটি হৃদয় বিদারক সন্দেহ নাই। (৫/৩, পাতা ১১৭-১২৩) পরের দৃশ্য নগর প্রান্তরে উন্মাদ উমিচাঁদ (৫/৪, পাতা ১২৩-১২৮)। মীরনের প্ররোচনায় মহম্মদী বেগ সিরাজকে হত্যা করতে কারাগারে উপস্থিত। গোঁসাই দাস খবর পেয়ে এসেছেন হত্যা বন্ধ করতে। তার মতে সিরাজের যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে—মৃত্যু তাঁর অভিপ্রেত নয়। কিন্তু মীরণের অর্থ মহম্মদীর অঙ্গে। দুজন দিব্যাঙ্গনা এসে ভবিষ্যৎ-বানী করলেন যে কৃতকর্মের জন্য সিরাজের মৃত্যু হবে। নেপথ্যে মহম্মদী বেগ সিরাজকে হত্যা করলেন। গোঁসাই গৃহত্যাগী হলেন। (৫/৫ পাতা-১২৮-১৩১) শেষ দৃশ্য রাণী ভবানীর শয়নাগার। সত্যবতীর কৃতকর্মের হাহাকার এবং অবশেষে রাণীর কোলে মাথা রেখে মৃত্যু। সুরুতে রাণীর কন্যা ও সত্যবতী অপহরণে নাটকের ঘটনাপ্রবাহ মুক্তি ও শেষে সত্যবতীর

রাণীর কোলে মৃত্যু তাকে রাণী ভবানীর কন্যাকল্প করা হয়েছে। বিয়োগব্যথায় নাটকের শেষ অংশ বিধুর হয়েছে। (৫/৬ পাতা ১৩২-১৩৬)

নাট্যকার লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী যে পলাশীর যুদ্ধ ও নবীনচন্দ্রের কবি কল্পনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি পলাশীর যুদ্ধ অনুকরণে নাটক রচনা না করে ইতিহাস পাঠ করে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এটাই অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। 'নবাব সেরাজুদ্দৌল্লা' নাটক পাঠ করলে নাট্যকারের ইতিহাসমুখীতা স্পষ্টই বোঝা যায়। নাটকের উপস্থাপনায় যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। রাণী ভবানীর কন্যার অপহরণ প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের বিক্ষোভ ক্রমে রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠের প্রকাশ্য অপমানে বেড়ে গেল। তারা অত্যাচারী সুবেদারকে বিনষ্ট করার জন্য সেনাপতি মীরজাফরের আনুকূল্য কামনা করলেন। সুবেদারীর লোভ আর পুত্রের আবদার মীরজাফর খাঁকে বিশ্বাসঘাতক করল। ইতিমধ্যে রাজবল্লভ-পুত্রকে আশ্রয় দেবার জন্য নবাব সিরাজদৌল্লা ইংরেজদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমে কাশিমবাজার কুঠি ও পরে কলকাতা আক্রমণ করে জয়ী হলেন। ইংরেজরা প্রতি আক্রমণ করে 'শীতকালে' কলকাতা দখল করে নিল, কাটোয়া কেল্লা অধিকার করল ও অবশেষে পলাশীতে সমবেত হল। মীরমদনের মৃত্যুতে ভীত সুবেদার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন। মীরজাফর সুবেদার পদে অভিষিক্ত হলেন। সিরাজকে বন্দী করে দরবারে আনা হল। তিনি সকলের পায়ে ধরে প্রাণভিক্ষা করে ক্রন্দন করলেন। অবশেষে মীরণের প্ররোচনায় গুপ্তঘাতকের ছুরিতে তার মৃত্যু হল। মন্ত্রী মোহনলাল বীর ও বিচক্ষণ রূপে চিত্রিত। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের মৃত্যু হয়েছে বলা হয়েছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী যে ভাবে নাট্য ঘটনা পরিবেশন করেছেন তা ইতিহাস অনুযায়ী নয়। যেমন রাণীভবানীর কন্যার অপহরণ কেন্দ্র করে কোন রকম ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হয় নাই বা সিরাজদৌল্লার পতন কেবল হিন্দুদের অভিপ্রেত ছিল একথা মনে করাও অসমীচীন। তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নাই যে ইতিহাসকে নাট্যকার যে ভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে তার মনীষা প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাস বিকৃত না করেও তিনি তার নিজের মনমতো উপন্যাস দর্শকদের শুনিয়েছেন। ষড়যন্ত্রের প্রধান হোতা করেছেন রাণী ভবানী, জগৎশেঠ,

রামনারায়ণ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ ও গোঁসাই দাসকে। পরে মীরজাফর ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেও কোন আলোচনার দৃশ্যে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। মুসলমান অত্যাচারী সুবেদারের বিরুদ্ধে হিন্দুদের বিদ্রোহ কল্পনাই ষড়যন্ত্র-কারীদের নাম স্থির করে দিয়েছে। শেষের দিকে জগৎশেঠ ভ্রাতা স্বরূপচাঁদও ষড়যন্ত্রে যোগ দিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গ 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করবার সময় বিশদভাবে দেখান হয়েছে। রামনারায়ণ ছিলেন পাটনার শাসনকর্তা। পলাতক সিরাজ পাটনায় রামনারায়ণের কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করছিলেন। প্রচলিত মত অনুযায়ী বিশ্বাস করা স্বাভাবিক যে সম্ভবত তিনি নবাবের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু যেহেতু পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত আগে ও পরে রামনারায়ণের মতামত বা গতিবিধি জানা যায় না সেহেতু জোর করে বলা চলে না যে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগ কখনও স্থাপিত হয় নাই। এখানে নাট্যকারের কল্পনা এমন এক জায়গায় 'ছিপ ফেলেছে' যে ইতিহাস কিছু বলতে পারে না। তবে এটা ঠিক যে রামনারায়ণ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে ছিলেন না কারণ পাটনায় তার গতিবিধির নিদর্শন আছে। তর্কের খাতিরে কেউ যদি বলেন যে রামনারায়ণ গোপনে মুর্শিদাবাদে এসে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছেন ইতিহাস তা প্রমাণ সাপেক্ষে সন্দেহ করতে পারে, সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারবে না। গোঁসাইদাস কল্পিত চরিত্র সুতরাং তার সম্বন্ধে আলোচনার প্রশ্ন নাই। জগৎশেঠ ভ্রাতাদের উপস্থিত করা নাট্যকারের ইতিহাস জ্ঞানের পরিচয়। শুধু নাম ভুল হয়েছে। জগৎশেঠকে বলা হয়েছে 'মাতাব রায়' হবে মহাতপ চাঁদ। আর তার ভাইকে বলা হয়েছে রূপচাঁদ হবে স্বরূপচাঁদ। রায়দুর্লভ ও রাজবল্লভের ষড়যন্ত্রের ভূমিকা আগেই বলা হয়েছে। এই নাটকে উভয়ের ষড়যন্ত্র করার চমৎকার কারণ দেওয়া হয়েছে। রায়দুর্লভের দরবারে অপমান ও পদচ্যুতি এবং কৃষ্ণদাসের (রাজবল্লভ পুত্র) কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ ইতিহাস সম্মত সত্য।

নানাদিক থেকেই এ নাটকে বহু ইতিহাস-সম্মত ঘটনাবলী আছে। রাণী ভবানীর কন্যার অপহরণ প্রচেষ্টা, জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভের দরবারে অপমান, মীরজাফরের সুবেদারীর লোভ, ইংরেজ সাহায্য ভিক্ষা, কাশিমবাজার কুঠী জয়, কলকাতা অভিযান ও জয়, শীতকালের যুদ্ধে কলকাতা ইংরেজদের পুনর্দখল

কাটোয়া দুর্গ দখল এবং অবশেষে পলাশী। নাট্যকার সব থেকে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সিরাজ-চরিত্র পরিকল্পনায়। ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা অপরিণামদর্শী, ভীরু, বিলাসী এক তরুণ উচ্ছৃঙ্খল যুবককে স্পষ্ট দেখা যায়। নাট্যকার তার মুখে যে অসভ্য ভাষণ দিয়েছেন তাও যেন তরলমতি, চরিত্রহীন এবং নৃশংস নবাবের মুখে খাপ খেয়ে যায়। কুসঙ্গী পরিবৃত হয়ে কেবল সুরা আর আসঙ্গলিপ্সায় যার জীবন কেটেছে তার মুখ থেকে সুসংস্কৃত ভাষা আশা করা যায় কি! নাট্যকার সিরাজের কোন মহিমার ঝঞ্ঝাট রাখেন নি। তাই গোঁসাই পত্নীকে ভোগ করার লালসার মাঝে নাট্যকার নবাবের মনে যে ভালবাসার আকাঙ্খা জাগিয়েছেন তা একদিক থেকে যেমন মানবিক তেমনি নাটকীয় হয়েছে। চরম অবিমৃষ্যকারিতায় পলাশী যাওয়া এবং সেখান থেকে সর্বাগ্রে পলায়ন করে নবাব যে কাপুরুষতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তা সুন্দরভাবে চিত্রিত। শেষ দরবার দৃশ্যে সিরাজ সকলের পায়ে পতিত হয়ে ক্রন্দন করছেন এবং জীবন ভিক্ষা চাইছেন ঐতিহাসিক সত্য নয় যদিও দৃশ্যটি খুবই সুপরিকল্পিত ও সুলিখিত। নেপথ্যে সিরাজকে হত্যা দেখিয়ে এক বীভৎস দৃশ্যকে অন্তরালে রাখা হয়েছে। সিরাজকে হত্যা করে তখনি তার মুণ্ডটি কেটে ফেলা হয় এবং সেই ছিন্নমুণ্ড মিরণকে দেখিয়ে মহম্মদী বেগ পুরস্কার লাভ করেন। বলা বাহুল্য এ দৃশ্য নাট্য প্রযোজনায় অসম্ভব তাই নেপথ্যে সিরাজ হত্যা খুবই বিবেচনার কাজ হয়েছে।

একটি দৃশ্যে সিরাজের অশ্বারোহণে প্রবেশ ঘোষিত হয়েছে। এই অংশ-টুকুর আলোচনা প্রয়োজন। ইতিহাস কখন সিরাজকে অশ্বারোহী দেখে নাই। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা যাত্রা কালে গোশকট। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা জয়ের পর বিজয়ী নবাব ডুলিতে চেপে ফোর্ট উইলিয়াম প্রবেশ করলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারীর যুদ্ধে ক্লাইভের অতর্কিত আক্রমণে সিরাজ হালসীবাগানে উমিচাঁদের বাগান থেকে পালকী চেপে পলায়ন করলেন। কয়েকমাস পর ২৩শে জুন বিকাল চারটায় পলাশী রণাঙ্গন থেকে পলায়ন করলেন হাতিতে চেপে, মতান্তরে উটে। মুর্শিদাবাদ থেকে সেইরাত্রে নবাব প্রাণ রক্ষার জন্ম প্রথম গোশকটে এবং পরে নৌকা চেপে পালাচ্ছেন দেখে সন্দেহ থাকে না যে নবাব সিরাজদৌল্লা অশ্বারোহণে অশক্ত ছিলেন। সিরাজের বিলাসী রূপের চিত্রটি সম্পূর্ণ হল। দাদুর আদরের নাতি, দুর্বিনীত,

বদরাগী, অত্যাচারী, ক্ষমতার সুরা, পানীয়ের মতোই তাঁকে সর্বদা মদমত্ত করে রেখেছে। যুদ্ধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক ভোগীকেই বার বার দেখা যায় যিনি যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব গ্রহণ করেন কিন্তু যুদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করার সাহস রাখেন না। সে ভার থাকে সৈন্যাধ্যক্ষদের হাতে। বর্গীর সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে ক্লান্ত অশীতিপর নবাব আলিবর্দীর সম্পূর্ণ বিপরীত এই চরিত্র। বিপরীত কিন্তু নূতন নয়। বাংলার নবাবের এটাই স্বাভাবিক রূপ। আসঙ্গলিপ্সা, নর্তকী আর সুরায় তাদের জন্মগত অধিকার। দাদুর আদরের নাতি কখনই যুদ্ধবিদ্যা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি শিক্ষা করার অবকাশ পান নাই। রমণী-সম্ভোগেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত অবসিত। তাই জীবনের শেষ মুহূর্তেও দ্রুতগামী অশ্বারোহণে তিনি জীবনরক্ষা করতে পারলেন না। ২৪শে জুন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের রাত্রে তিনি পলাতক হলেন। এবং ৩০শে জুন ভগবানগোলায় তিনি বন্দী হলেন। গোশকট ও নৌকাযোগে পুরা পাঁচদিন সময় পাওয়া সত্ত্বেও পলাতক নবাব দশমাইল পথ অতিক্রম করতে পারেন নাই। এটা তার অপটুতার এক জাজ্বল্যমান নিদর্শন। পাশাপাশি তুলনা করা যাক ওয়াটস সাহেবদের পলায়ন। সময় ২৪শে জুনের জায়গায় ১২ই জুন, বার দিন আগে। গতি উত্তরে নয় দক্ষিণে। নবাবের হাত থেকে পালাবার জন্য ওয়াটস্, কোলেট, হেস্টিংস প্রভৃতি শিকারের নামে রাজধানী ত্যাগ করে রাত্রিকালে অশ্বারোহণে অগ্রদ্বীপ পৌছে তখুনি নৌকায় কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন। ১২০-১২৫ মাইল পথ তারা চারদিনে অতিক্রম করলেন।[৩১]

নাট্যকার লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী উমিচাঁদের জাল দলিল এবং তার উন্মাদ হয়ে যাবার ঘটনা নাটকে ব্যবহার করেছেন। এ নাটকেও মোহনলাল বাঙ্গালী বীর ও সিরাজের বিচক্ষণ পরামর্শদাতারূপেই চিত্রিত হয়েছেন। মোহনলালের এক বীর পুত্র প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী পলাশীতে সিরাজের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। ক্লাইভ চরিত্রকে কুশলী এবং কুটকে সরল যোদ্ধা করে নাট্যকার তার ইতিহাস জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। নামকরণে বিশেষত্ব আছে। মির্জামহম্মদ সিরাজদৌল্লাকে মামুদ সেরাজুদৌল্লা বলা হয়েছে, মীরমদন হয়েছে মীরমর্দ্দন; মেহমদি বেগ হবে মহম্মদী বেগ।

নাটকে এই প্রথম ও শেষ ঐতিহাসিক সিরাজদৌল্লা চরিত্র দেখা গেল।

পরবর্তী যুগে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত যেমন দেশকে কম্পিত করেছে নাটকেও তার প্রতিফলন হয়েছে। সিরাজদৌল্লা ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের নাটকে যে চরিত্র দেখতে পাওয়া যায় তাতে সিদ্ধান্ত করা সম্ভব যে বাংলার রাজনীতিতে তখনও দেশাত্মবোধের বন্যা আসেনি এবং নাটকে দেশের যে প্রতিবিম্ব দেখা যায় তা থেকে বোঝা সহজ যে ঐতিহাসিক ঘটনাকে তখনও বিকৃত করার কোন কারণ ঘটেনি। কেবলমাত্র মোহনলালের বীরত্বের এবং 'মোহনলালের ব্যাটার' সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সব দিক বিবেচনা করলে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীকে 'নবাব সেরাজুদৌল্লা' নাট্যরচনার জন্য সাধুবাদ জানাতে হয়। নবীনচন্দ্র সেন ও তিনি প্রমাণ করেছেন যে ইতিহাস পাঠ ও অনুসরণ করে নাটক রচনা করা সম্ভব। উনবিংশ শতাব্দীতে নাটক রচনায় তাই দেখা যায় ঐতিহাসিক ঘটনা সামান্য প্রক্ষিপ্ত। নাট্যরচনার দিক থেকে এই গুণ বিংশশতাব্দীতে সম্পূর্ণ অবসিত। তখন মনের টানে প্রাণের তাগিদে কল্পনার পাখায় ঐতিহাসিক নাটক বিচরণ করেছে।

ঐতিহাসিক নাটকে কল্পনা, বিবর্তনবাদের ধারা বয়ে প্রক্ষিপ্ততর থেকে প্রক্ষিপ্ততম হয়েছে। পরবর্তী নাটকে এই ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যাবে। ইতিহাস অবহেলার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনীতির প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকাররা সম্পূর্ণভাবে স্বকপোল পরিকল্পনাকে ইতিহাস বলে চালাতে চেষ্টা করেছেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : সিরাজদৌলা ১৯০৫

দীর্ঘ ৩১ বছর পর বাংলা নাটকে নবাব সিরাজদৌল্লাকে দেখা গেল। কিন্তু এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র। সিরাজ হয়ে গেলেন দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ এক মহান নেতা। পলাশীর পরাজয় জাতির জীবনের এক বিরাট কলঙ্করূপে দেখা দিল। নবীনচন্দ্র উনবিংশ বছরের এক বুদ্ধিহীন তরুনের অপরিণামদর্শিতা দেখিয়েছেন। লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর সিরাজও তারই অনুরূপ। (সিরাজের বয়স তখন ২৪ বৎসর।) গিরিশচন্দ্র ঘোষ যে সিরাজকে আঁকলেন তা এক অগ্নিবর্ষী বিপ্লবী, রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতায় তার কাছে সকলেই পরাভূত হয়েছে।

চরিত্রচিত্রণে এই বিরাট পরিবর্তনের কারণ দেশের সম্পূর্ণ ভিন্ন আবহাওয়া। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামনা স্পষ্টরূপ নিয়েছে। স্থাপিত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের চরমবাদে তখন শাসনযন্ত্র উদ্ব্যস্ত। দেশের জমিদারশ্রেণী গোপনে সন্ত্রাসবাদীদের অর্থসাহায্য করছেন। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ পাচ্ছে। জাতীযতাবাদেব এই মহাসন্ধিক্ষণে গিরিশচন্দ্র ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রচিত সিরাজদৌল্লা নাটক প্রকাশ করলেন। ভারতের রাজনীতিতে তখন বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় ও বিপিনচন্দ্র পাল দিকপাল। তাঁদের নরমপন্থী বা মডারেট বলার লোকেরা সবেমাত্র নেতা পর্যাযে মনোনীত হচ্ছেন। অরবিন্দ ঘোযের নাম সন্ত্রাসবাদীদের দলপতি হিসাবে সকলের মুখে মুখে। স্বদেশী জিনিষ কেনার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। স্বদেশী ব্যবসা স্থাপন এবং স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনে বহু বাঙ্গালী উৎসাহিত হয়ে কাজ সুরু করেছেন। বঙ্গীয় জাতীয় বণিকসভা কায়েমী আসন পেয়েছে। স্বদেশীয়দের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করার ডাক নিযমিত প্রচারিত হচ্ছে। বাঙ্গালী স্বদেশী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৩২] এই সময় দেশের মধ্যে এক জটিল অবস্থার উদ্ভব হল। বঙ্গভঙ্গের আলোচনা সুরু হোল পুরোদমে। বাংলাকে ভাগ করে দুই প্রদেশে বিভক্ত করার প্রস্তাবে বাঙ্গালী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সিরাজদৌল্লা' প্রকাশের মাসাধিককালের মধ্যেই বঙ্গভঙ্গের আদেশ প্রচারিত হল অক্টোবর মাসে। ৭ই আগষ্ট ১৯০৫ টাউন হলের বিরাট সভায় বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল। এই সভায় সভাপতিত্ব করলেন বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং দেশের এক সেরা জমিদার কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। গ্রামে শহরে বাঙ্গালীর মন শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে অধীর হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন রাখীবন্ধনের গান। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে নূতন করে বোঝাপড়ার প্রয়োজন রাজনৈতিক কারণেই বড় হয়ে দেখা দিল। এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের সিরাজদৌল্লা (২৪শে ভাদ্র ১৩১২) রাজনৈতিক নেতার মত সুসংযত ভাষায় পরিপক্ক বুদ্ধি চেতনা ও কর্মক্ষমতা নিয়ে দেখা দিলে আশ্চর্য্য হবার কোন কারন নাই। এই স্বাধী-

নতাকামী সিরাজ বাংলার জন্যে জীবন তুচ্ছ করে যুদ্ধ করবেন এটাই স্বাভাবিক। কেবলমাত্র হিন্দু মুসলমানে মিলনগ্রন্থী সৃষ্টির প্রয়াসের জন্য নয়, গিরিশচন্দ্রের রচনায় পরাধীন বাঙ্গালীর ক্ষোভ দুঃখ আর স্বাধীনতালাভের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে। এই নাটকে সিরাজদৌল্লাকে অবলম্বন করে জাতির শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়েছেন। সিরাজ তাই হয়েছেন বাঙ্গালীর প্রতিভূ। তাঁর পরাজয় বাঙ্গালীর মুখে পরাজয়ের কালিমা মাখিয়ে দিয়ে গেল। ঐতিহাসিক সিরাজ চরিত্র উপেক্ষা করে গিরিশচন্দ্র এক মহিমান্বিত সিরাজ চরিত্র রচনা করে জনসাধারণের বিক্ষোভকে মূর্ত করে তুললেন। নাটকের জনপ্রিয়তা ও সাফল্য এমন হল যে ইংরেজ সরকারকে নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিতে হল।

নবীনচন্দ্রের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পার্থক্য লক্ষণীয়। সিরাজের পতনের ছবি আঁকতে গিয়ে কবি এক সুন্দর কাব্য রচনা করেছেন। এই লম্পট ভীরু নবাবের জন্যে কবির অপূর্ব সমবেদনা। তিনি সিরাজের অপকীর্ত্তিকে নিন্দা করেছেন কিন্তু তাঁর পতনে, তাঁর অপঘাত মৃত্যুতে সমবেদনায় মনকে উদ্বেলিত করেছেন। এই সমবেদনা রাজনৈতিক নয়, দেশপ্রেমেরও নয়, শুধু এক বিপথগামী যুবকের শোচনীয় পরিনতিকে উপলক্ষ করা হয়েছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যে সিরাজ এক ব্যক্তি মাত্র। তাঁর জন্য শোক, ব্যক্তি-স্বত্বার নির্মম নিয়তির জন্য ব্যথাবোধ। অত্যন্ত কঠিনপথে সিরাজ-চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন নবীনচন্দ্র।

গিরিশচন্দ্রের রচনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থা দেখতে পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত যত্নে সিরাজদৌল্লার ইতিহাস পাঠ করেছেন দেখে অবাক হতে হয়। তিনি অতি সাবধানে ঐতিহাসিক তথ্য চয়ন করেছেন। তারপর সিরাজের কুকীর্তিগুলিকে তাঁর শত্রু প্রচারিত মিথ্যা বলে নাটকে উপস্থাপনা করেছেন। এজন্য ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে অনেকগুলি কাল্পনিক চরিত্রও তাকে আনতে হয়েছে। জহরা এমনি এক চরিত্র। তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে হোসেনকুলি খাঁর বিধবা। এই জহরা নবাবের অন্তঃপুরে কুৎসা প্রচার করে নবাবকে হেয় করেন কখন; কখনও বা বিশেষ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ তে কলকাতার যুদ্ধে ক্লাইভের হাত ধরে নবাব শিবিরের সামনে তাকে নিয়ে এসে গোলাবর্ষণ করতে সাহায্য করেন। কাজেই তখন ওই অপ্রস্তুত অবস্থায় রাত্রিকালে নবাবের পলায়ন

ছাড়া গতি কি? গিরিশচন্দ্র এইভাবে সিরাজকে রক্ষা করেছেন। তার পলায়ন তিনি অস্বীকার করেন নাই কিন্তু এমন এক নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। যাতে মনে হবে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া নবাবের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। এইভাবে গিরিশচন্দ্র সিরাজ চরিত্রে সঙ্গতি এনে তাকে জাতীয়তাবাদী দেশনায়কে রূপান্তরিত করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বিকৃত করা হয় নাই কিন্তু সিরাজ-চরিত্রের কলঙ্কিত দিকগুলি নাটকীয় ভাবে পূরণ করা হয়েছে, সময়ে সময়ে 'চূণকাম' করা হয়েছে। নাটকের বিশদ আলোচনার সময় এই বিষয়গুলি আরও স্পষ্ট করে দেখাবার সুযোগ পাওয়া যাবে। গিরিশের সিরাজ প্রথম রাজনৈতিক সিরাজ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের সিরাজদৌল্লা পাঁচ অঙ্কে ২০২ পাতায় শেষ হয়েছে। প্রথম অঙ্ক ১ থেকে ৬৪ পাতা, দ্বিতীয় অঙ্ক ৬৫ থেকে ১০০ পাতা, তৃতীয় অঙ্ক ১০১ থেকে ১৩৮ পাতা, চতুর্থ অঙ্ক ১৩৯ থেকে ১৭৭ পাতা ও পঞ্চম অঙ্ক ১৭৮ থেকে ২০২ পাতা। প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৩১২ সাল ২৮শে ভাদ্র, মিনার্ভা থিয়েটার। নাট্যকার স্বয়ং অধ্যক্ষ ও শিক্ষক, আধুনিক নামে পরিচালক। সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করেন দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ), করিম চাচা গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দানশা-অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী, সকতজঙ, ক্লাফটন ও মুঁসালা এই তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেন মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), জহরা ও আলিবর্দী বেগম-তারাসুন্দরী, লুৎফউন্নিসা-সুশীলাসুন্দরী। ক্লাইভের ভূমিকায় সুবিখ্যাত ক্ষেত্রমোহন মিত্র অভিনয় করেন। ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের মতে 'সেই সময় বাঙলার রঙ্গমঞ্চে সিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিতে দানীবাবু অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি কেহই ছিলেন না।'[৩৩] গোলমাল কিছু কম হয় নাই। অপরেশচন্দ্র লিখেছেন তাঁকে ওই সিরাজের ভূমিকা না দেওয়ায় তিনি মিনার্ভা ত্যাগ করেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মিনার্ভায় ম্যানেজার হয়ে এসে নিজে সিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ডঃ দাশগুপ্ত দানীবাবুর অভিনয় কৃতিত্ব সম্পর্কে যা লিখেছেন তা সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে সাহায্য করবে। 'সিরাজের ভূমিকায় দানীবাবুর প্রকৃষ্ট অভিনয় তৎকালীন যুবক সম্প্রদায়ের মনে এইরূপ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল যে সেই স্বদেশী যুগে প্রসঙ্গক্রমে কেহ যদি বলিতেন "এবার দেশ স্বাধীন হইলে নবাব হইবেন কে?"

অমনি উত্তর হইত—"নবাব হইতে পারেন একমাত্র দানীবাবু।" সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যকেও এই কথা একাধিকবার বলিতে শুনিয়াছি।'[৩৪] সুতরাং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ সিরাজদ্দৌল্লা নাটক পেয়েছিল এবং প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার জন্যই সম্ভবত অভিনয় বন্ধ ও পুস্তক বাজেয়াপ্ত করা হয়।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রবলপ্রতাপান্বিত ইংরেজ সরকার কেন বিচলিত হলেন এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বরে অভিনয় আরম্ভ হবার দিন থেকেই দর্শকের উত্তেজনা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সিরাজদ্দৌল্লার পতন যে বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থান্বেষী সভাসদ ও ইংরেজ বনিকদের হীন চক্রান্তের ফল একথা সবার মনে জেগেছিল। এই তারিখ থেকেই মীরজাফর, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও উমিচাঁদ অত্যন্ত হীন চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। বিশ্বাসঘাতকের আর এক নাম মীরজাফর হল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশ্বাসহন্তা ষড়যন্ত্রকারী মীরজাফর কায়েমী খল-চরিত্র হয়ে গেল। গিরিশচন্দ্র যে অতি যত্নে ঐতিহাসিক ঘটনা চয়ন করেছেন একথা আগে বলা হয়েছে। ঘটনা চয়নের সময় গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌল্লার পক্ষের সব কথাই সংগ্রহ করেছেন—বিরোধীপক্ষের কিছুই গ্রহণ করেন নি বা সত্যাসত্য বিচার করেন নি। তা সত্বেও সিরাজবিরুদ্ধ কথাকে নাটকীয় ভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। তাই মোটামুটি ঐতিহাসিক ঘটনার আঙ্গিনার মধ্যে রাজনৈতিক সিরাজের স্বদেশিকতা বাঙ্গালার দর্শক গ্রহণ করেছে। বঙ্গভঙ্গের মুহূর্ত বলেই বিনা বাধায় গিরিশচন্দ্রের সিরাজ শহীদের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তার ঐতিহাসিক চরিত্র চাপা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র লিখেছেন—'বিদেশী ইতিহাসে সিরাজ চরিত্র বিকৃতবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিক্ষিত সুধীগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদেশী ইতিহাস খণ্ডন করিয়া রাজনৈতিক ও প্রজাবৎসল সিরাজের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যত্নশীল হন। আমি ঐ সমস্ত লেখকগণের নিকট ঋণী। এস্থলে এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়……সিরাজদ্দৌল্লা সংক্রান্ত যত প্রকার ইংরেজী পুস্তক আছে বিশেষ অনুসন্ধানে, আমার সাহার্য্যার্থে প্রেরণ করেন।' (ভূমিকা—সিরাজদৌল্লা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ পাতা ।০) স্বদেশিকতার প্রথম যুগের অতি উৎসাহে, ইতিহাসের নামে এমন অনেক কথা প্রচার হয়েছিল যা পরবর্তীকালের স্বদেশীয় ঐতিহাসিকগণ যেমন যদুনাথ সরকার (History of Bengal Vol. II), আচার্য্য রমেশচন্দ্র মজুমদার (বাংলাদেশের ইতিহাস দুইখণ্ড) প্রভৃতিকে সংহত করে নিতে হয়েছে। এছাড়া স্বদেশীযুগের লেখকরা পরস্পর-বিরোধী উক্তিও করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে মূলত নিখিল-নাথ সেনের মুর্শিদাবাদ কাহিনীর লুৎফউন্নিসা প্রবন্ধ লুৎফউন্নিসা বেগমকে নবাব মহিষীর সম্মানে ভূষিত করেছে। গিরিশচন্দ্র ও তৎপরবর্তী সাহিত্যিক-গণ এমন কি কিছু পরবর্তী ঐতিহাসিক লুৎফউন্নিসাকে নবাব মহিষীর সম্মান দিয়েছেন। কিভাবে ভুল বোঝাবুঝি ঘটল তার বিশদ বিবরণ দেওয়া যাক। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সন্তর্পণে লিখেছেন—'প্রিয় সহচরী লুৎফউন্নিসা বেগমকে সঙ্গে করিয়া ·' (সিরাজদৌল্লা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—পাতা ৪৫। অন্যত্র লিখেছেন, 'একজন মাত্র পুরাতন প্রতিহারী এবং চিরসহচরী লুৎফউন্নিসা বেগম ছায়ার ন্যায় পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমন করিল।' (পাতা ৩৭৮)। দুই জায়গাতেই 'বেগম' শব্দ ভুল বোঝাবুঝির সূত্র হয়েছে। বেগম অর্থে ধরে নেওয়া হয়েছে—'নবাবের স্ত্রী।' এটা সম্পূর্ণ ভুল। ঘসেটি বেগম নবাবের কন্যা হয়েও বেগম শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের কন্যাদ্বয় জেবুন্নিসা বেগম ও জিন্নতউন্নিসা বেগম অবিবাহিত ছিলেন। বাদশাহ শাহজাহানের কন্যা জাহানারা বেগমও বিবাহ করেন নাই। সুতরাং বেগম শব্দ এখানে বাংলায় 'দেবী' বা 'দাসী' অর্থে ব্যবহৃত। অমুক দেবী বা অমুক দাসীর মতো অমুক বেগম ব্যবহার করা হয়েছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বেভারিজ সাহেবের মতামত ফুটনোটে উদ্ধৃত করেছেন—'He was accompained in his flight by his favourite concubine Latafunnissa.' এটা খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ। ১৩০৪ সালে অর্থাৎ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মৈত্রেয় মহাশয়ের পুস্তক প্রকাশিত হয়। ঐ বছর শ্রাবণ মাসে নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনীর মধ্যে লুৎফউন্নিসা প্রবন্ধে দেখা যায় '………এবং তিনিই (লুৎফউন্নিসা) সিরাজের প্রিয়তমা মহিষী বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখিত হইয়া

থাকেন।' (মুর্শিদাবাদ কাহিনী পাতা ১২৪) কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু রায় মহাশয় অন্য কথা বলেছেন—'প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলিয়া রাখি। লুৎফউন্নিসা অথবা ফৈজী কেহই সিরাজের বিবাহিত স্ত্রী নহেন। সিরাজের বিবাহিতা স্ত্রীর নাম ওমদাদউন্নিসা।' (পাতা ১৮৭)। এমনি নানা অসঙ্গতি স্বদেশী-যুগের লেখার মধ্যে দেখা যায়। লুৎফউন্নিসা বিষয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনি মোহনলালের ভগ্নী। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ তাকে অর্থমূল্যে ক্রয় করেন এবং লুৎফউন্নিসা নাম দেন। তদবধি আমৃত্যু লুৎফউন্নিসা নবাবের প্রিয় সহচরী কদাপি স্ত্রীর মর্য্যাদা পান নাই। সিরাজ চরিত্রের নানা অসঙ্গতির মধ্যে এটি অন্যতম।[৩৫]

গিরিশচন্দ্র যে ঐতিহাসিক ঘটনা চয়ন করেছেন তার মধ্যে সিরাজদৌল্লার সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা স্থান পায় নাই। দোষ গিরিশচন্দ্রের কিনা বলা কঠিন কারণ তখনও মুতাক্ষরীনের ইংরেজী অনুবাদ বা করম আলির মুজফরনামা বাংলা ভাষায় অনুদিত হয় নাই। মুতাক্ষরীনের ইংরেজী অনুবাদও সুবৃহৎ গ্রন্থ। মঁসিয়ে জঁালা (Jean Law) যে কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধিকর্তা ছিলেন তাও গিরিশচন্দ্র জানতেন না। তাই পরিচয়পত্রে দেখি—'মুঁসালা নবাবের আশ্রিত ফরাসী সেনাপতি।' মঁসিয়ে জঁালা সিরাজ শাসনের দৈনন্দিন ইতিহাস তঁার আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করেছেন। গিরিশচন্দ্র এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রচনাটি যে দেখেন নাই তার প্রমাণ যথেষ্ট। বিশেষ লা সাহেব ছিলেন ইংরেজ বিরোধী এবং সিরাজের প্রতি সহানুভূতিশীল। তঁার রচনায় সিরাজ-চরিত্রের স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। পলাশীর যুদ্ধ ঘিরে মঁসিয়ে লার ভূমিকা, ফরাসী সেনানায়ক সাঁফ্রকে প্রেরণ এবং নিজে সসৈন্যে সিরাজের সাহায্যে আগমন সবিস্তারে বলা হয়েছে। সিরাজ পলাইত হয়ে পাটনায় রাজা রামনারায়ণ ও লা সাহেবের কাছেই পৌছবার চেষ্টা করছিলেন। নবাবের পলায়নের খবর পেয়ে লা সাহেব সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বাংলার সীমান্তে অপেক্ষা করছিলেন। সিরাজ অশ্বারোহণে পটু হলে পাঁচদিনে (২৪শে জুন থেকে ২৯শে জুন ১৭৫৭ খ্রীঃ) সহজেই লা সাহেবের কাছে পৌছতে পারতেন। ভগবানগোলায় যখন সিরাজদৌল্লা ধরা পড়লেন তখন লা সাহেব মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে নবাবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাই স্বদেশী যুগের কাল্পনিক সিরাজচরিত্র প্রতিভাত

হয়েছে। চিত্রটি সুন্দর কিন্তু অলীক উপন্যাস মাত্র। এই নাটকের প্রথম অঙ্ক দ্বাদশ গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। প্রথম গর্ভাঙ্কেই সিরাজ মতিঝিল আক্রমণ করে ঘসেটি বেগমকে বন্দী করছেন। ষড়যন্ত্রকারীগণ প্রথম থেকেই স্পষ্ট। বলা হয়েছে ঘসেটি বেগমের পালিত পুত্র, মৃত এক্রামদৌল্লা শিশুপুত্র মুরাদ-দৌল্লাকে নবাব করার জন্য ষড়যন্ত্র হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রে ইংরেজ সাহায্য পাবার আশায় ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাসকে অর্থ ও ধনরত্ন দিয়ে কলকাতায় প্রেরণ করেছেন। এই দৃশ্যেই সিরাজদৌল্লা, রায়দুলভ ও মীরজাফরকে পদচ্যুত করে তাঁদের জায়গায় যথাক্রমে মোহনলাল্ ও মীরমদনকে মন্ত্রী ও সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। রাজবল্লভও পলায়ন করলেন। এই দৃশ্যেই নাট্যকার সিরাজ-বিরোধী চরিত্ররূপে জহরা চরিত্রকে উপস্থাপনা করেছেন। জহরা ঘসেটি বেগমকে প্রতিরোধ করতে নিষেধ করে গোপনে সিরাজ-ধ্বংসে আহ্বান জানাচ্ছেন। সভাসদগণ সকলেই যে নবাবের ভয়ে অত্যন্ত ভীত তা স্পষ্ট দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আলিবর্দী বেগম সিরাজকে সংযত হতে অনুরোধ করেছেন। উত্তরে সিরাজ জানাচ্ছেন অমাত্যরা শওকতজঙ্গকে নবাব করার ষড়যন্ত্র করছেন। তৃতীয় গর্ভাঙ্ক শওকতজঙ্গের পূর্ণিয়া প্রাসাদের দরবার। মাতাল ও অকর্মন্য শওকতজঙ্গকে সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নবাবী লাভের প্রয়াসী দেখান হয়েছে। মীরণ ষড়যন্ত্রের সংবাদ দিতে এসেছে। দানসা ফকির আর এক সিরাজ বিরোধী কাল্পনিক চরিত্র। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে ওয়াটস-পত্নী এসেছেন লুৎফউন্নিসার কাছে তাঁর স্বামীর মুক্তির জন্য। লুৎফউন্নিসার অনুরোধে সিরাজ ওয়াটস সাহেবকে মুক্তি দিলেন। ওয়াটস পত্নীকে সতীসাধ্বীরূপে দেখান হয়েছে। জহরা রাণী ভবানীর কন্যা তারাবাঈ এর (হওয়া উচিত তারাসুন্দরী) চিত্র নবাবের শয়নকক্ষে লুৎফউন্নিসাকে দিয়ে স্থাপনা করছেন। এই ঘটনাকে অবলম্বন করে নবাবের তারাবাঈএর প্রতি আকর্ষণের কুৎসা রটনা হবে একথা লুৎফউন্নিসা বুঝতে পারলেন না। এই দৃশ্যে ওয়াটস পত্নীর মুখে গিরিশচন্দ্র আধা বাঙ্গলা-আধা হিন্দী যে অদ্ভুত ভাষা ব্যবহার করছেন সেটা এই ধরনের ভাষা প্রয়োগের প্রথম দৃষ্টান্ত। পরে সব সাহেব চরিত্রের মুখে এই ভাষা দেওয়া হয়েছে। এই ভাষা পরবর্তীকালের সব ইউরোপীয় চরিত্রের মুখে দেখা যায়। পরবর্তী নাট্যকারগণ আজ পর্যন্ত সাহেব-মেমসাহেবের চরিত্র সৃষ্টি করলেই

এই ভাষাটা সর্বদা দিয়ে থাকেন। নীলদর্পন নাটকের রোগ সাহেবের ভাষা এইভাবে গিরিশচন্দ্র মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে সমধিক প্রচলিত হয়েছে। পঞ্চম গর্ভাঙ্ক মুর্শিদাবাদের নবাব দরবার। অমাত্যদের ষড়যন্ত্র স্পষ্ট। জগৎশেঠ স্বীকার করছেন যে শওকতজঙ্গের নামে ফারমান আনার জন্য দিল্লীতে অর্থ প্রেরণ করেছেন। কৃষ্ণদাসের পত্রপাঠ করে রাজবল্লভ শোনাচ্ছেন যে ইংরেজ মোরাদদৌল্লাকে নবাব করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সিরাজদৌল্লা এসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অভিরুচি ঘোষণা করছেন। জগৎশেঠকে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে অভিযোগ করছেন। বলেছেন কাশিম-বাজার কুঠি দখল করে ওয়াটস ও চেম্বার্স সাহেবদের বন্দী করা হয়েছে। 'কিন্তু এদের উদ্ধারার্থে দেখা যায়, কলিকাতার ইংরাজ ব্যগ্র নয়।' (পাতা ২৮) কলকাতা জয়ের সংকল্প ঘোষণা করে নবাব নিজের কথা বলছেন—

'স্বেচ্ছাচারে চালিত জীবন
হিতাহিত ছিলনা বিচার,
মদ্যপানে করিয়াছি শতশত দুর্নীত ব্যাভার!
কিন্তু কহি স্বরূপ বচন,
বসি বৃদ্ধ নবাবের মরণ-শয্যায়,
শেষ বাক্যে তাঁর—
জন্মিয়াছে ধারণা আমার
রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার;
নবাব রাজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে
প্রজার মঙ্গল কার্য সতত সাধন,
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে। (১/৫ পাতা ২৯-৩০)

বস্তুত এহ প্রজাপালক নবাব সিরাজদৌল্লা এই নাটকে প্রতিফলিত। ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম ব্যারাক। ড্রেক, হলওয়েল এর যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদকে কারাগারে প্রেরণ। সপ্তম গর্ভাঙ্কে নবাবের আগমন সংবাদে ভীত কলকাতাবাসীর পলায়ন। অষ্টম গর্ভাঙ্কে কারাগারে কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদের অনুশোচনা এবং নবাবের যুদ্ধজয়ের খবর। নবম গর্ভাঙ্কে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ড্রেক ও হলওয়েবের পলায়নের প্রচেষ্টা। দশম গর্ভাঙ্ক যুদ্ধজয়ের পর ফোর্ট উইলিয়মে নবাবের দরবার। হলওয়েলের বিচারের

পর নবাব মীরজাফরকে হলওয়েলের ভার দিচ্ছেন। তারপর কৃষ্ণদাস ও উমিচাঁদের বিচার করে উদার হৃদয় নবাব তাদের মুক্তি দিচ্ছেন। এই দৃশ্যে নবাবপক্ষীয় চরিত্রে কামিনীকান্ত ওরফে করিম চাচাকে প্রথম দেখা গেল। বিশেষ দৃষ্টি বলে যা ঘটবে বা ঘটতে চলেছে সবই তিনি বুঝতে পারছেন। সংলাপ—'এ ফোর্ট উইলিয়াম, এখানে অনেক ব্যাটাকে সেলাম দিতে হবে,— এখানে অনেক মুকুট গড়াগড়ি যাবে।' (পাতা ৫০) একাদশ গর্ভাঙ্কে দানশা ফকির নবাব ও নবাব মহিষীর নামে মুর্শিদাবাদে কুৎসা রটাচ্ছেন। সিরাজের স্ত্রীলোক সম্ভোগ, গর্ভিনীর উদর বিদারণ, জনপূর্ণ নৌকাকে নদীতে ডোবান এবং বাড়ী ভর্ত্তি লোককে অগ্নি সংযোগে বধ করে উল্লসিত হবার ঘটনাকে দানশা প্রচারিত কুৎসা বলে দেখান হয়েছে। অবশেষে মোহনলাল দানশাকে বন্দী করছেন। দ্বাদশ গর্ভাঙ্কে মুর্শিদাবাদের নবাব দরবার। নবাব হুকুম অমান্য করে হলওয়েল প্রভৃতিকে 'অন্ধকূপে' বন্দী রাখার জন্য সিরাজ রুষ্ট হয়েছেন। অন্ধকূপ হত্যার জন্য সিরাজ যে কোন রকমেই দায়ী নন এটাই প্রতিপাদ্য। জহরার কুৎসা রটনা নবাব বিবেচনা করে তাকে বন্দী করার আদেশ দিলেন। দানশা ফকিরের নাসা-কর্ণ ছেদ করার আদেশ ঘোষিত হল। জগৎশেঠ শওকতজঙ্গের জন্য নবাবী ফারমান সংগ্রহ করেছেন কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্রতার অজুহাতে সিরাজদৌল্লার নামে সেটি সংগ্রহের চেষ্টা করেন নি সে জন্য রুষ্ট হয়ে নবাব জগৎশেঠকে চপেটাঘাত করলেন। অমাত্যগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। অবশেষে আলিবর্দী মহিষী এসে নবাবেব সঙ্গে তার অমাত্যদের অসন্তোষের প্রতিবিধান করলেন। শওকতজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির আলোচনায় প্রথম অঙ্ক শেষ হল।

নাটকের প্রথম অঙ্কে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে আগষ্ট মাসের ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনা নাট্যচরিত্রের প্রয়োজনে সাজান হয়েছে। জগৎশেঠকে অপমানের মে মাসের ঘটনাকে শওকতজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্ববর্তী অর্থাৎ আগষ্ট মাসের ঘটনা করা হয়েছে। অমাত্যগণ সিরাজদৌল্লাকে চিরকাল ভয় করেছেন। ফৈজী ও হোসেনকুলি খাঁর নৃশংস হত্যা তাদের স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি। এখন সেই নৃশংস ব্যক্তি নবাব হওয়ায় চিন্তার অবধি ছিল না। বিলাস ব্যসনে, চরিত্রহীনতায়, নৃশংসতায়, ধর্ষণে অত্যাচারে তখন তাঁর সমকক্ষ ছিল না। তরলমতি অল্প বয়সে ক্ষমতার

অহংকার এবং কুসঙ্গ সিরাজদৌল্লার নামে বিভীষিকার সৃষ্টি করত। বাংলার নিত্য নৈমিত্তিক জীবনে নবাবের নাম ছিল দুঃস্বপ্ন, নবাবের কীর্তি ছিল লজ্জাকর।[৩৬] কিন্তু সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তিনি নবাব হবার আগে সুরু হয়েছিল এবং মৃত এক্রামাদৌল্লার শিশুপুত্র মোরাদদৌল্লাকে নবাব করার চেষ্টা হয়েছিল বা ইংরেজ রাজা রাজবল্লভকে এই কাজে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিল প্রভৃতি ঘটনাবলীর কোন ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া যায় না। সিরাজ নবাব হবার পর রায়দুর্লভ ও মীরজাফরকে পদচ্যুত করলেন। ঘসেটি বেগমের সম্পত্তি অপহরণ করলেন এবং জগৎশেঠকে অপমান করলেন। রাজবল্লভও কারারুদ্ধ হন। তখন থেকেই নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হল। কলকাতা জয়ের আগে ইংরেজ সক্রিয় ভাবে সভাসদগণের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এমন প্রমাণ নাই। বরঞ্চ জগৎশেঠ বারবার চেষ্টা করেও ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি দখল (২রা ৩রা জুন ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) বা কলকাতা জয়ের আগে (২০শে জুন ১৭৫৬ খ্রীঃ) ষড়যন্ত্রের মধ্যে টানতে পারেন নাই। নবাবের কলকাতা জয়ে ভীত হয়ে ইংরেজ ষড়যন্ত্রে যোগ দিল। কলকাতায় ইংরেজ প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠার পর (জানুয়ারী ১৭৫৭ খ্রীঃ) ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজ বণিকদের সম্পূর্ণ অন্য চেহারা দেখতে পাই। কাশিমবাজার কুঠির পতনে ওয়াটস্ সাহেব সিরাজের হাতির পদতলে নতজানু হয়ে বসে, রুমাল দিয়ে নিজের হাত বেঁধে 'তুমহারা গোলাম' 'তুমহারা গোলাম' বলে চীৎকার করেছেন। ফেব্রুয়ারী যুদ্ধে জয়ী হবার পর সেই ওয়াটস নবাবের দরবারে এমন চীৎকার করেছেন যে ওয়াটস আসামাত্র নবাব সর্বদা ভীত ও ত্রস্ত হয়ে থেকেছেন।[৩৭] নবাবের ইংরেজদের প্রতি অসন্তোষ দীর্ঘদিনের। ইংরেজ নবাবের ভয় কাটিয়ে ওঠার পরই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য প্রস্তুত হয়। ক্লাইভের উপস্থিতিই ইংরেজদের নীতি নির্দ্ধারণে সাহায্য করে।

নাটক পাঠ করে এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে অমাত্যদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সিরাজ প্রথমাবধি অবহিত ছিলেন। লা সাহেবের আত্মজীবনীতে সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্যই পাওয়া যায়। লা সাহেব জানিয়েছেন যে নবাবকে কিছুতেই বিশ্বাস করান যায় নাই যে তাঁর বিরুদ্ধে অমাত্যরা ষড়যন্ত্র করছেন। তিনি নিজে বারবার নবাবকে বলেও তার বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারেন নাই। গভীর ক্ষোভে লা সাহেব লিখেছেন, 'হায় ভগবান আমি এখন কি

করব। সহরের সবাই জানে, দেশের সবাই জানে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। শুধু যার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তিনি তা বিশ্বাস করতে চাননা।' পলাশী যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে মঁসিয়ে সাঁফ্র নবাবকে বারবার অনুরোধ করেন যে তিনি যেন আর চোখ বন্ধ করে না থাকেন। ষড়যন্ত্র তাঁর বিরুদ্ধে হয়েছে এবং অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করেছে। তিনি অবিলম্বে ষড়যন্ত্রের নেতাদের বন্দী করার আদেশ প্রদান করুন এবং পদচ্যুত সিপাহশালার মন্ত্রী বা দেওয়ানদের সঙ্গে করে যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখুন। সিরাজদৌল্লা ষড়যন্ত্রের খবর বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে জানান যে তার অমাত্যদের কেউ বিশ্বাস-ঘাতক নন।[৩৮] সুতরাং যে কর্মচঞ্চল নবাব গিরিশচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন তা একান্তই কবি কল্পনা। ঐতিহাসিক সিরাজদৌল্লার কর্মক্লীবত্ব তাঁর অবিমৃষ্যকারিতার সমতুল্য ছিল। শওকতজঙ্গকে নবাব করার জন্য জগৎশেঠ অর্থ ব্যয় করেছেন এ খবরও ভুল। শওকতজঙ্গ দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ করে সনদ নিজের অর্থবলে সংগ্রহ করেন। জগৎশেঠ শওকতজঙ্গকে অর্থ সাহায্য করে, এক অসম্ভব পরিকল্পনায় অর্থ নষ্ট করবেন এমন অসম্ভব ঘটনা কল্পনা করা যায় না। বস্তুত দেশে শান্তি থাকলে এবং নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পারলে জগৎশেঠ রাজনীতির চক্রে যোগ দিতেন না। দেশের অশান্ত আবহাওয়া ও ব্যবসার ক্ষতি তাঁকে সিরাজদৌল্লাকে সরাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া জগৎশেঠ না থাকলে ইংরেজ বণিকগণ, মীরজাফর, রায়দুর্লভ বা রাজবল্লভের ভরসায় নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে রাজী হতেন না। ব্যবসার প্রসারের জন্য তারাও দেশে শান্তি চেয়েছেন। তাদের প্রয়োজন ও জগৎশেঠের প্রয়োজন এক হয়ে দেখা দিল। সুতরাং লা সাহেব জগৎশেঠকে ষড়যন্ত্রের প্রধান ব্যক্তির যে আসন দিয়েছেন তা যথার্থ এবং সত্য। নবাব দেশে শান্তি স্থাপনে অপারগ না হলে জগৎশেঠের নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করবার কোন কারণ ছিল না। জগৎশেঠ তখন ভারতবর্ষের সব থেকে বড ব্যাঙ্কার। পশ্চিমে আফগানিস্থান থেকে পূর্বে যবদ্বীপ পর্য্যন্ত জগৎশেঠের মুচলেকা ও হুণ্ডির প্রসার হয়েছিল। তাই দেশের অভ্যন্তরে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া তাঁর ব্যবসার সব থেকে বড় প্রয়োজন হয়ে দেখা দিল। জগৎশেঠের ভূমিকা না বোঝার জন্য নাট্যকারগণ দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেন নাই।

এইখানে আরেকটা কথা বলা দরকার। ইংরেজ বণিকরা কিন্তু মানদণ্ড

ছেড়ে রাজদণ্ড ধরতে চায়নি। মীরজাফরের অকর্মন্যতা তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করল। মীরকাশিমের রাজচ্যুতির পর ইংরেজ রাজদণ্ড হাতে তুলে নেবার কথা চিন্তা করেছে তার আগে নয়। ইংরেজদের মতলব জানা থাকলে তাদের কর্মধারা বোঝা সহজ হবে।

ওয়াটস পত্নী পরবর্তী জীবনে বেগম জনসন নামে পরিচিত হন। তার সম্বন্ধে নানা মুখরোচক খবর নানা বইএ ছড়িয়ে আছে। ৮৭ বছর বয়সে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন। লা সাহেব লিখেছেন ওয়াটস ও তার সহকারী কোলেটের (চেম্বার্স নয়) বন্দী হবার পর তিনি ওয়াটস পত্নীকে ফরাসী কুঠিতে নিয়ে যান। এখানে ওয়াটস পত্নীর লুৎফউন্নিসার কাছে যাওয়া গল্পমাত্র তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। বেগম জনসন বৃদ্ধবয়সে তার প্রতি সিরাজের আকর্ষণ সম্পর্কে নানা অভব্য ও অসভ্য কীর্ত্তিকলাপের যে অশ্লীল গল্প সকলকে শোনাতেন তা সত্য হলেও এই ঘটনা অলীক কল্পনা মাত্র। মনে রাখতে হবে যে ৩রা জুন বন্দী ওয়াটস ও কোলেটকে সঙ্গে নিয়ে সিরাজ কলকাতা অভিমুখে রওনা হন।[৩৯] মাঝে এক বা দুইরাত্রি কাশিমবাজারে কোলেট সাহেবের সুন্দর বাড়ীতে অবস্থান করেন। এখান থেকেই কলকাতা যাত্রা শুরু হয়। কাজেই তাঁদের বন্দীত্ব অবসানের কোন চেষ্টা কলকাতার ইংরেজ করেনাই একথা নেহাৎ ভিত্তিহীন। ওয়ারেন হেষ্টিংস ৯ই জুন কারারুদ্ধ হন। তাঁর বেনিয়ান কান্তবাবু কাশিমবাজারের ওলন্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ ভেরনেট সাহেবের কাছ থেকে ৩০০০ টাকা সংগ্রহ করে সেই অর্থে হেষ্টিংসের মুক্তি ক্রয় করেন। সিরাজদৌল্লা যখন কলকাতা বিজয় করে বন্দী ইংরেজদের নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরলেন হেষ্টিংস তখন কাশিমবাজার কুঠিতেই অবস্থান করছেন।[৪০] ঐতিহাসিক বিচারে প্রথম অঙ্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিরাজদৌল্লার রাজত্বের প্রথম চারমাসের ঘটনা বলা হয়েছে। ইতিহাস মোটামুটিভাবে মেনে চলা সত্বেও সিরাজচরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার সম্পূর্ণভাবে নিজকল্পনা অনুসরণ করেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের প্রাসাদ। শওকতজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে সিরাজ জয়ী হয়েছেন। স্বরূপচাঁদ ঘোষণা করছেন, "শওকতজঙ্গের যুদ্ধের পর নবাবের যেন সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। বিনয়ী, নম্র সকলকে যথাযোগ্য উচ্চ সম্মানে সম্মানিত করেছেন।" (৬৬ পাতা) নবাব প্রবেশ

করছেন এবং সকলের প্রতি যথাযোগ্য সম্ভাষণ করছেন। সিরাজ যে সত্যই বিনয়ী ও নম্র হয়েছেন তার প্রকাশ। মীরমদন এসে সংবাদ দেয় ইংরেজ কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধসাজে প্রস্তুত হচ্ছে। সিরাজ দুঃখ করে বলছেন যে মোহনলাল ও মীরমদন নিযুক্ত কর্মচারীরা ছাড়া আর কেউ বিশ্বাসযোগ্য নন। ইংরেজের যুদ্ধ প্রস্তুতির খবর তার কাছে আসেনি। এমন সময় মানিকচাঁদ এসে খবর দিল কলকাতা ইংরেজ অধিকার করেছে। কর্নেল ক্লাইভ তাদের অধিনায়ক। নবাব মীরমদনের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন দেখে মীরজাফর প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারী তাঁদের প্রাণবধের আশঙ্কা করছেন। এমন সময় জহরা এসে মীরজাফর খাঁকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি বলে অভিবাদন জানিযে তাঁর রাজ্যলিপ্সায় ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন। তাঁকে অর্থলোভী ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হবার উৎসাহ দিচ্ছেন। ঘসেটি বেগমেব ধনরত্ন ষডযন্ত্রকারীদের সাহায্য করবে এমন আশ্বাসও দেওযা হচ্ছে। নবাবের কাছে লিখিত পূর্বপত্র চাপা দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের ভুল বোঝাবুঝি পাকা হল; সভাসদগণ ঠিক করলেন সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করতে পারলে মীরজাফর খাঁকে নবাব করা হবে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে জহরা ও ঘসেটি বেগমের কুমন্ত্রণা। নবাবের পাঞ্জা বা মোহর সংগ্রহের জন্য জহরা পরামর্শ দিল। তদনুযায়ী তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ঘসেটি লুৎফউন্নিসাকে জানালেন যে ফকিরের নাসাকর্ণ ছেদ করায় সিরাজ তার অভিশাপে দগ্ধ হবে সেজন্য শান্তিস্বস্ত্যয়ন করা প্রযোজন। এজন্য একখানা নবাবের মোহরাঙ্কিত কাগজ প্রযোজন। ঘসেটি সমস্ত ঘটনা গোপন রাখতে বললেন এবং কোথায় মোহর থাকে জেনে রাখলেন। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে উমিচাঁদের উদ্যানস্থ কক্ষ। নবাব আগমনে ভীত ইংরেজগণ সন্ধি করতে উন্মুখ। ষড়যন্ত্রী অমাত্যবর্গ তাই মিথ্যা বললেন যে ইংরেজ-দূতদের বন্দী করার ব্যবস্থা হয়েছে। তাই শোনমাত্র দূতদ্বয় ওয়ালস ও স্ক্রাফটন ইংরেজ শিবিরে পলায়ন করলেন। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে ফোর্ট উইলিয়াম মধ্যস্থ কক্ষে ক্লাইভ, ওয়ালস প্রভৃতি যুদ্ধপ্রণালী আলোচনা করছেন এমন সময় জহরা উপস্থিত হয়ে ক্লাইভকে তখনি আক্রমণের পরামর্শ দিলেন এবং নিজে নবাবের শিবিরের পথ প্রদর্শন করলেন। ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে গড়ের মাঠে বায়ু-সেবনে ব্যস্ত করিমচাচা জহরাকে দেখলেন ক্লাইভকে নবাব শিবিরের দিকে নিয়ে চলেছে। ক্লাইভের গোলাবর্ষনে সিরাজ এই গড়ের মাঠেই দৌড়ে

এলেন। নিশীথ আক্রমণে তিনি অত্যন্ত বিচলিত। ফিরিঙ্গি নামে তার দেহ কম্পিত হচ্ছে। কেন কম্পিত হয় তাও তিনি জানালেন। শিখগুরু তেগবাহাদুরের শিরশ্ছেদের সময় তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'শ্বেতকায় অর্ণবজানে এসে মোগলবংশ উচ্ছেদ করবে।' (৯৮ পাতা) ইংরেজ মোগল-বংশকে নির্মূল করতে ভারতে এসেছে। সিরাজ পলায়নের জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় বললেন—'যেদিন ইংরাজের জলতরী, বাংলার বন্দরে উপস্থিত হয়েছে। সেইদিন আশা-ভরসা বিলুপ্ত।' (৯৯ পাতা) শেষ সংলাপ-'জন্মভূমির আশা বিলুপ্ত। যদি কখনও সুদিন হয়, যদি কখন জন্ম-ভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে পরস্পরের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হয় · · যদি ঈর্ষা, বিদ্বেষ, নীচ প্রবৃত্তি দলিত করে স্বদেশবাসীর অপমান আপনার অপমান জ্ঞান করে ···· তবে এই দুর্দম ফিরিঙ্গি দমন সম্ভব; নচেৎ অভাগিনী বঙ্গমাতার পরাধীনতা অনিবার্য্য।' (১০০ পাতা)

প্রথম অঙ্কের মতো দ্বিতীয় অঙ্কে মূলত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত সিরাজ-দৌল্লার প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। অক্ষয়কুমার সিরাজ-চরিত্র চিত্রণে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষিত যুবকের মনোভাব আরোপ করেছেন। ইংরেজী শিক্ষা পূর্ণবিকাশের আগে দেশ বা জাতি সম্পর্কে বাঙ্গালীর কোন সুস্পষ্ট মতামত ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস পাঠ করে শেখা হল যে, রাজা, প্রজা ও জনসাধারণের ভৃত্য মাত্র। রাষ্ট্রদর্শনের নানা চিন্তা ইংরেজী ভাষায় পাঠ করার সুযোগ হল। এইসব ঘটেছে সিরাজের পরবর্তীকালে সুতরাং সিরাজের মধ্যে যে দেশপ্রেম কল্পনা করা হয়েছে তা অক্ষয়কুমারের দেশপ্রেম, ইংরেজী শিক্ষিত পরাধীন জাতির এক মনীষীর দেশপ্রেম। সিরাজের সময় এসব ছিলনা। সিরাজদৌল্লা বাঙ্গালী ছিলেন না, বাংলাভাষা জানতেন না, বাঙ্গালীর প্রতি কোন দরদ ছিলনা। নিজ স্বার্থ ও রাজ্যরক্ষা ছাড়া তাঁর কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। এটাই যে একান্ত স্বাভাবিক তা বলাই বাহুল্য। ভারতবর্ষে তখন ক্ষমতালিপ্সার যুগ। মোগল-বাদশাহর সঙ্গে মারাঠাদের ক্ষমতার জন্য দ্বন্দ্ব হল। মোগল প্রথমে বিজয়ী হলেও পরে ধীরে ধীরে পরাজিত হল। মারাঠা শক্তি উত্তরে দিল্লী থেকে দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ এবং পশ্চিমে আরব সাগরের পার হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হল। সুতরাং সিরাজের দেশভক্তি সম্পূর্ণভাবেই আরোপিত

ও প্রক্ষিপ্ত ঘটনা, অক্ষয়কুমারের মতই গিরিশচন্দ্র এই নাটকে বিস্তারিত করেছেন।

এই অঙ্কের ঘটনার সময় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী (ক্লাইভের কলকাতা পুনরাধিকার)র পর থেকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত (সিরাজের পলায়ন) ঘটনা এই অঙ্কে বলা হয়েছে। মাঝের চারমাসের উল্লেখ করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে শওকতজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ও ডিসেম্বরে ফলতায় সমরায়োজন সুরু। ভূগোল সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কিছুতেই স্বীকার করেননি যে ফলতা বলে কোন জায়গা আছে। বলেছেন ইংরেজরা ভুল করে ফলতা লিখেছেন ওটা আসলে হবে পলতা। গিরিশচন্দ্র এই ভুল অনুকরণ করেছেন (৮ পাতা)। বস্তুত পলতা কলকাতার উত্তরে এবং ফলতা কলকাতার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কাছে। এখনও ফলতায় ইংরেজদের মাটির কেল্লা দৃশ্যমান। ফলতাকে পলতা বলা হলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই অঙ্কে এই রকমের আরো ভুল গিরিশচন্দ্র করেছেন। তিনি সিরাজের সময় উল্লিখিত ফোর্ট উইলিয়ামকে বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম মনে করেছেন। উমিচাঁদের বাড়ী সম্ভবত চৌরঙ্গীতে কল্পিত হয়েছে। তাই নবাবশিবির থেকে বেরিয়ে করিমচাচা গড়ের মাঠে বায়ু সেবন করেন, পথ দেখিয়ে ক্লাইভকে নবাব শিবিরে নিয়ে যাবার সময় করিমচাচার সঙ্গে জহরার সংলাপ হয়। শিবির আক্রমণের পর নবাব সিরাজও এই গড়ের মাঠে ছুটে আসেন। বর্তমান গড়ের মাঠ ও ফোর্ট উইলিয়াম সৃষ্টি হয়েছে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর। সুতরাং গড়ের মাঠ বলে কোন জায়গা ১৭৫৭ তে ছিল না। পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম ছিল যেখানে প্রধান ডাকঘর বা G.P.O. অবস্থিত। দুর্গের লাল ইঁটের ছায়া জলে পড়ত বলেই নাকি লালদিঘী নামের উৎপত্তি। প্রথমে এই অঞ্চলের পরিচয় হল Tank Square এবং পরে ডালহৌসী স্কোয়ার নামেই সমধিক পরিচিত হয়। উমিচাঁদের বাগানবাড়ী ছিল হালসীবাগানে যেখানে বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অবস্থিত। কলকাতার তৎকালীন ভূগোল না জানার জন্য এক হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এই সঙ্গে আরেকটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দী উড়িষ্যা মারাঠাদের ছেড়ে দেন। সুতরাং সিরাজদৌল্লা বা মীরজাফর কেউ উড়িষ্যার অধিপতি ছিলেন না।

লুৎফউন্নিসা চরিত্র কল্পনাতেও নাট্যকার ভুল করেছেন। বাঙ্গালী ঘরের লক্ষ্মী ভাল মানুষ বোকাসোকা বউ লুৎফউন্নিসা কখন ছিলেন না। পলায়নের সময়ও তিনি সিরাজের সঙ্গ ছাড়েন নি। সিরাজের মৃত্যুর পর মীরণের লালসা তাঁর কাছে ঘেঁসতে পারেনি। ঢাকায় একক জীবন যাপন করার সময় তিনি প্রয়োজন হলে ইংরেজ শাসনকর্তাদের পত্র দিয়ে তাঁর অধিকার রক্ষা করতে কুণ্ঠিত হন নি। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লুৎফউন্নিসা রচিত একখানি পত্র ইতিহাস পত্রিকায় আলোচিত হয়েছে। (ইতিহাস পত্রিকা ৫ম খণ্ড ২য় সংখ্যা। সিরাজদৌল্লার মহিষী।) মুসলমান সমাজ সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের মতো খ্যাতনামা নাট্যকার কিরকম অজ্ঞ ছিলেন দেখে সত্যি আশ্চর্য্য হতে হয়। মুসলমান সমাজ সম্পর্কে তাঁর একাধিক নাটক আছে। তবু তিনি হিন্দু সমাজের মতো সাধু ফকির, শান্তিস্বস্ত্যয়ন, ভূত পেত্নী অভিশাপ প্রভৃতিকে নাটকের মধ্যে পুরোপুরি ব্যবহার করেছেন। তেগবাহাদুরের অভিশাপের গল্প সুন্দর কল্পনা সন্দেহ নাই—তবে সিরাজদৌল্লা নাটকে বাতুলতার প্রতিকল্প মাত্র। এতদিন এত বীরত্ব ও উষ্মা প্রকাশ করার পর হঠাৎ নবাব সিরাজদৌল্লা ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিরিঙ্গিদের ভয়ে ভীত হয়ে উঠলেন তেগ-বাহাদুরের অভিশাপের কথা স্মরণ করে এটা কেবল ঘটনার দিক থেকে নয়—নাট্যকারের ভাবনাচিন্তার দিক থেকেও আশ্চর্য্য লাগে। বস্তুত গিরিশচন্দ্র সিরাজদৌল্লার প্রচণ্ড কাপুরুষতার কাছে দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে যে পরাভূত হলেন এটাই প্রতিভাত হল। পরবর্তী অঙ্কগুলিতে কল্পিত চরিত্রগুলি অর্থাৎ করিমচাচা ও জহরা প্রধান নাট্যচরিত্র হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসের আঙ্গিনা ছেড়ে নাটক কল্পনার চোরাবালিতে ভাল করে নিমজ্জিত হয়। চার মাস অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ থেকে জুন মাসের ঘটনার বিবরণে আরো তিন অঙ্কের প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

মীরজাফর খাঁ যেমন সহজে সিরাজ-পতনে নবাব হবেন স্থির হল এটাও ঠিক নয়। জগৎশেঠ আফিং সেবী মীরজাফর নবাব হলে দেশে শান্তিস্থাপনের ভরসা করতেন না। কিন্তু নবাব মনোনীত হবার প্রতিশ্রুতি ছাড়া মীরজাফর ষড়যন্ত্রে যোগদান করতে অস্বীকার করলে জগৎশেঠ তা মানতে বাধ্য হলেন এবং তলে তলে ইংরেজদের রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব থেকেই কাশিমবাজার কুঠির প্রধান হলেন

ওয়ারেন হেস্টিংস। এই বিষয়ে তিনিও যে জগৎশেঠের সঙ্গে একমত ছিলেন তা তাঁর ক্লাইভকে লেখা একাধিক পত্রে স্পষ্ট বোঝা যায়। গিরিশচন্দ্রের রচনায় সব থেকে অবিচার করা হয়েছে মীরজাফর চরিত্রকে। মীরজাফরের ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে তিনি এক প্রকাণ্ড বিশ্বাসঘাতকে স্থায়ী ভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। অকর্মণ্য সরফরাজ খাঁকে সরাবার জন্য যেমন আলিবর্দী মনোনীত হয়েছিলেন তেমনি অকর্মণ্য নবাব সিরাজদৌল্লাকে অপসারিত করার জন্য মীরজাফর মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তখন পদচ্যুত। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাব সত্ত্বেও সৈন্যদের ওপর তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল বলেই তাঁকে ইংরেজদের প্রয়োজন হল। ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পারেনি যে যুদ্ধ জিতিয়ে ইংরেজ চলে যাবে না। তাদের সেই লৌহমুষ্টির চাপে কেবল নবাব নয়, স্বয়ং জগৎশেঠ এবং অন্য ষড়যন্ত্রকারীগণ বিহ্বল হয়ে যাবেন। পলাশীর বিজয়ে প্রথমে বাংলা তারপর বিহার ক্রমে বাদশাহ, মারাঠা এবং শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষ তাদের পদানত হবে। এতবড় রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি বাঙ্গলায় কারও ছিল না। একমাত্র জগৎশেঠের ধারণা ছিল কি ঘটতে চলেছে তাই ক্ষমতা দখলের পর জগৎশেঠ হলেন ইংরেজদের প্রথম বলি। তাঁর টাকা বানাবার অধিকার কেড়ে নিয়ে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে টাঁকশাল কলকাতায় স্থানান্তর করা হল।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক মুর্শিদাবাদের দরবার। সিরাজ ওয়াটস সাহেবের ওপর উষ্মা প্রকাশ করছেন। বলছেন—'এই ফরাসী মুঁসালা আমার আশ্রিত। তোমরা বিনা অনুমতিতে চন্দননগর অধিকার করবার পর এরা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।' একটু পরে বলছেন—'নবাবের অনুমতি ব্যতীত চন্দননগর আক্রমণ করেছ এখন নবাবকে যুদ্ধভয় প্রদর্শন করছ। ভেবেছ আফগান আহম্মদ সাহ আবদালিকে দমন করতে আমাকে বেহার প্রদেশে যাত্রা করতে হবে, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নই—তাই ক্লাইভ দম্ভ করে পত্র লিখেছে। ক্লাইভকে লিখো—বিনা যুদ্ধে আফগান ভঙ্গ দিয়েছে আমরা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।' এরপর প্রায় বিনাযুদ্ধে কলকাতা প্রত্যর্পনের জন্য রাজা মানিকচাঁদ ১০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছেন। মুঁসালার ভাষণে বলা হয়েছে—'নবাবী ফৌজকে যুদ্ধ শিখাইল, নবাবের পক্ষে লড়িলে, ইংরেজ হারিয়া যাইত—সেইজন্য হামাদিগকে তাড়াইতে চায়।' করিমচাচা নবাবের উপদেষ্টা

তিনি রঙ্গ করে বলেছেন যে মদ ছেড়ে সিরাজের দুরবস্থা হয়েছে এমন, যে মনস্থির করতে পারেন না। মুঁসালার মুখে গৈরিশী সংলাপ—'মদ খাইলে বিবেচনাশূন্য হইতে হয়।' (১০৭ পাতা)। করিমচাচা মুঁসালাকে সিরাজের মারাঠা যুদ্ধের বীরত্বের কথা শোনাচ্ছেন—(সিরাজ) 'দু পেয়ালা মদ টেনে, ঘোড়ায় চড়ে ধাঁ করে লড়ায়ে লেগে গেলেন, মারহাট্টাগুলো, পালাবার পথ পেলে না।' (১৭৭ পাতা) ফরাসীরা অত্যন্ত সরল তাই ইংরেজ কূটনীতির কাছে পরাভূত হবেন এটাই বক্তব্য। তাই নবাব তাদের কয়েক দিনের জন্য আজিমাবাদে প্রেরণ করলেন। তারপর ইংরেজদের ডেকে দুর্ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। এবার বিশ্বাসঘাতকদের বন্দী করতে সিরাজ বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু আলিবর্দীবেগম বাধ সাধলেন। নবাব মোহনলালকে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছেন তাই তার অভাব বোধ করছেন। জগৎশেঠ ইংরেজদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং অন্য সভাসদরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত জেনেও নবাব মাতামহী এবং মহিষী লুৎফউন্নিসার অনুরোধে কিছু করা থেকে বিরত হলেন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক জগৎশেঠের বৈঠকখানা তার দৌহিত্রের পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সব ষড়যন্ত্রকারীরা সমবেত হয়েছেন। করিমচাচা এসে সবাইকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে বিফল হলেন। এমন সময় মোহনলাল এলেন। সবাই বন্দী হবার ভয়ে ভীত কিন্তু মোহনলালও তাঁদের দেশাত্মবোধক ভাল ভাল কথা বলে সবাইকে মার্জনা করতে অনুরোধ করলেন তারপর নিজের পদ দিয়ে দিতে রাজী হলেন (নবাবের বিনা অনুমতিতেই)। তাতে কোন কাজ হল না বুঝে বললেন তাঁরা যথেষ্ট শক্তিমান। যতই ষড়যন্ত্র করুন মীরমদন ও মোহনলাল নবাবকে রক্ষা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ঘসেটি ও জহরার ষড়যন্ত্র। জহরা জানাচ্ছেন যে সিরাজের নামাঙ্কিত মোহর দিয়ে সিরাজের নামে রাণী ভবানীর কন্যা তারাবাঈ এর কাছে প্রেমপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—তাতে রাণী ভবানী সিরাজ পক্ষ পরিত্যাগ করেছেন। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে ওয়াটস ও আমীর বেগ জাল সন্ধি তৈরী করছেন। এই সন্ধিপত্র মীরজাফর সই করবেন। উমিচাঁদকে ধোঁকা দেবার জন্য জাল সন্ধিপত্র প্রস্তুত হচ্ছে। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে মীরজাফরের বাটি। প্রাণভয়ে চিন্তিত মীরজাফরের কাছে জহরা ওয়াটসকে স্ত্রীলোকের বেশে নিয়ে এলেন। চুক্তিপত্র সাক্ষরিত হল। এটাই ষড়যন্ত্রের

পাকা দলিল। এদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং নবাব এসে মীরজাফরের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে বিজাতীয় শত্রুদের দম্ভ চূর্ণ করবার জন্য আহ্বান করলেন। নবাবের সনির্বন্ধ অনুরোধে মীরজাফর যথাসাধ্য যুদ্ধ করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এই অঙ্কে ২৩শে মার্চ এর পর থেকে ৫ই জুন (১৭৫৭ খ্রীঃ) তারিখের ঘটনাবলী দেখান হয়েছে। ২৩শে মার্চ ক্লাইভ চন্দননগর জয় করেন। মুসাঁলার মুখে বলান হয়েছে—'নন্দকুমারকে আমাদের চন্দননগর রক্ষার্থে হুকুম দেন, মানিকচাঁদকে বি পাঠান কিন্তু উমিচাঁদ ইংরাজপক্ষ হইতে আসিয়া সব খারাপি করিয়া দিল, কেউ আমাদের ওয়াস্তে অঙ্গুলি তুলল না।' (১০৫ পাতা) নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। চন্দননগর আক্রমণে ইংরেজদের বাধা দেওয়া তার কর্তব্য ছিল। কিন্তু ইংরেজ উৎকোচে বশীভূত নন্দকুমার, কিছুই করলেন না। লক্ষ্য করার বিষয় যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমার সম্পর্কে ঐতিহাসিক মনোভাব বজায় আছে। কিছুদিন পরেই নন্দকুমারকে শহীদের সম্মান দেওয়া স্থির হল এবং এই নাটকের সিরাজদৌল্লার মতো, নন্দকুমার চরিত্রও 'চূণকাম' করা শুরু হল। কয়েক বছরেই নন্দকুমার শহীদ হলেন। যথাসময়ে এ প্রসঙ্গ আবার উত্থাপন করা হবে। এই অঙ্কের নাটকও নাট্যকারকে পরাভূত করেছে তাই নবাবের অনুমতি নিয়ে বা না নিয়ে ইংরেজদের চন্দননগর আক্রমণ করা সম্ভব ভাবা হয়েছে। এর থেকে হাস্যকর আর কিছুই হতে পারেনা। কলকাতা যেমন ইংরেজদের চন্দননগর তেমনি ফরাসীদের। নবাব ইচ্ছা করলে বিদ্রোহীকে শাস্তি দিতে পারেন কিন্তু ইংরেজ নবাবের অনুমতি নিয়ে চন্দননগর আক্রমণ করতে পারবে এ যুক্তি অসম্ভব।

নবাবের ফরাসীদের সম্পর্কে সংলাপে বহু ভুল তথ্য পরিবেশিত। যেমন মুঁসালা বা মঁসিয়ে জাঁলা চন্দননগরের পতনের পর নবাবের আশ্রয়ে আসেন নি। তিনি নবাব আলীবর্দীর সময় থেকেই কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ। চন্দননগরের ফরাসীগণ কাশিমবাজারে জাঁলা সাহেবের আশ্রয়ে এসেছেন চন্দননগর ইংরেজ দখলে আসার পর। ইংরেজ কোম্পানী ফরাসীদের ত্যাগ করার জন্য নবাবকে চাপ দিতে থাকেন। এই চাপের কাছে সিরাজ নতি স্বীকার করে ফরাসীদের কাশিমবাজার তথা বাংলা

ত্যাগ করার হুকুম দেন। তদনুযায়ী ১৬ই এপ্রিল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লা সাহেব ফরাসী কুঠি তুলে দিয়ে পাটনা যাত্রা করেন। ইংরেজদের চাপে নবাবের এই কীর্ত্তি তাঁর কাপুরুষতার আর এক দৃষ্টান্ত মাত্র। পথে লা সাহেব কাশিমবাজারে ফিরে যাবার আদেশ পেয়েছেন এবং তার পরেই ফিরে না আশার আদেশও পেয়েছেন। সিরাজের অস্থির মতির এর থেকে সুদৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। লা সাহেব লিখেছেন নবাবের আদেশ অমান্য করে তিনি কাশিমবাজারে জোর করে থাকলে নবাবেরই উপকার হত সন্দেহ নাই—কিন্তু নবাবের আদেশ অমান্য করে তাকে হীণ প্রতিপন্ন করা হত। ফিরে যাবার আদেশ পাবার আশায় লা সাহেব অত্যন্ত ধীরে পাটনা যাত্রা করলেন কিন্তু নবাবের সৎবুদ্ধি জাগরিত হলনা।

আফগান দিগ্বিজয়ী আহমদশাহ আবদালীর ভয়ে সিরাজদৌল্লা যে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন একথা ঐতিহাসিক। ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই বছর (১৭৫৭ খ্রীঃ) ২৮শে জানুয়ারী আবদালী দিল্লী প্রবেশ করলেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী হোলির দিন সুরু হল দিল্লীবাসী হত্যা। দেশ ভয়ে স্তম্ভিত হযে গেল। ১লা মার্চ থেকে ১৫ই মার্চ মথুরা ও গোকুল অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হল। গোকুলের নাগা সন্ন্যাসীরা প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন। যমুনা রক্তে লাল হয়ে গেল। ২১শে মার্চ আবদালী আগ্রা দখল করলেন। ৩০শে মার্চ আবদালী ফরিদাবাদে উপনীত হলেন। সকলেই মনে করছিল এবার আবদালীর গতি সুজলা-সুফলা সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ প্রদেশ বাংলার দিকে। তাই চন্দননগর অধিকারের পর অর্থাৎ ২৩শে মার্চএর পরবর্তী সময় সিরাজের পক্ষে খুবই উদ্বেগপূর্ণ সন্দেহ নাই। গিরিশচন্দ্র সময়ের হিসাবে গোলমাল করে সিরাজের মুখে সংলাপ দিয়েছেন—'বিনাযুদ্ধে আফগান ভঙ্গ দিয়েছে—আমরা এখন যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।' (৩/১ পাতা ১০২)। ঐতিহাসিকগণের মতে আফগান আক্রমণের ভয় না পেলে সিরাজ ইংরেজদের তুষ্ট করার জন্য ফরাসীদের তাড়িয়ে দিতেন কিনা সন্দেহ। আবদালীর আক্রমণ আশঙ্কাতেই সিরাজ কোম্পানীর ঔদ্ধত্য নীরবে সহ্য করেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। লা সাহেব সিরাজদৌল্লার জীবনযাপনের যে দৈনিক কর্মপন্থা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে নবাব দরবারে যতক্ষণ থাকতেন তার থেকে অনেক বেশী সময় হারেমে অতিবাহিত করতেন। তাঁর হারেমে

গমন দরবার করার থেকেও নিযমিত ছিল। তাই শত্রু মিত্র সকলেই নবাবকে সুন্দরী স্ত্রীলোক উপঢৌকন দিতেন। এই সব কামিনীগণের দৈনিক কাজ ছিল নবাবের মনের কথা নিজ নিজ পৃষ্ঠপোষকদের জানান। এই ধরণের জীবনযাত্রায নবাব মগ্ন না থাকলে সহজেই জানতে পারতেন এপ্রিল মাসেই আবদালী ভারত ত্যাগ করেছেন। অত্যন্ত অনিয়মিত দরবারে তিনি কোন খবর রাখতেন না তাই পলাশীর যুদ্ধে যাবার আগে পর্য্যন্ত নবাব আবদালীর ভয়ে কম্পিত হযেছেন। ইংরেজদের সব রকম অন্যায় আবদারের আস্কারা দিযেছেন।

২৮শে এপ্রিল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্ক্রাফটন সাহেব কাশিমবাজার কুঠি থেকে ক্লাইভ সাহেবকে এক পত্রে লেখেন যে 'নবাবকে দমন করার এই শ্রেষ্ঠ অবকাশ। ফরাসীরা চলে গেছে। রাজা মানিকচাঁদের ওপর দশ লক্ষ টাকার জরিমানায় অন্যান্য সভাসদগণ অত্যন্ত চিন্তিত। মথুরামল ও নন্দকুমার নিয়মিত ইংরেজ বিক্রমের যে সব খবরাখবর পাঠাচ্ছেন তাতে নবাবের শঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নবাব ওয়াটস সাহেবের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করছেন এবং সব আবদার মেনে নিচ্ছেন। কাশিমবাজার কুঠির প্রাকারে একটি বৃহৎ কামান বসাবার অনুমতিও পাওয়া গেছে। জগৎশেঠ ও উমিচাঁদ নিয়মিত সকল অমাত্যদের উত্তেজিত রাখছেন। একমুহূর্ত সময়ক্ষেপ আর যুক্তিসঙ্গত নয়। জগৎশেঠ শেষ পর্য্যন্ত কি করবে এখনও বোঝা যাচ্ছে না।'[৪১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এই ঐতিহাসিক যুগসন্ধির দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মাস এপ্রিল ও মে নাট্যকার মোটেই উপলব্ধি করতে পারেন নাই। সব থেকে সেরা ও প্রধান নবাব-বিরুদ্ধ ষড়যন্ত্র এই সময়ে সংঘটিত হয়।

করিমচাচাকে আফিংখোর করা হয়েছে। কাজেই তিনি যদি আফিংএর ঝোঁকে সিরাজের মারাঠা যুদ্ধের বীরত্ব বলে থাকেন তাহলে বলার কিছু নাই। তা না হলে বলা যেত যে মারাঠা আক্রমণ সুরু হয় ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে। তখন সিরাজের বয়স নয় বছর। শেষ হয় ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে তখন তাঁর বয়স ১৭। বঙ্গে বর্গী নাটক প্রসঙ্গে এই ঘটনা আলোচিত হয়েছে। মারাঠাযুদ্ধ দূরে থাকুক সিরাজদৌল্লা কোন যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। কলকাতায় ৫ই ফেব্রুয়ারী যুদ্ধে আর পলাশীতে ২৩শে জুনের যুদ্ধে তাঁর ভূমিকা যুদ্ধ শেষ হবার আগেই পলায়ন করার।

করিমচাচার আফিং খাওয়া আরেক সংলাপে বলা হয়েছে যে ফরাসীরা সরল ও ইংরেজরা কূট। সমগ্র ভারতের ইতিহাস আলোচনা করলেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবেনা। মনে রাখতে হবে যে ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দেও ইংরেজ কোম্পানী অত্যন্ত হীনবল। নবাবী হুকুমে তাদের আরকটে ও মাদ্রাজে তৈরী টাকার দাম কমিয়ে দেওয়া হল। এই খোঁড়া টাকায় বাংলায় ব্যবসা করে তাদের ক্ষতি কম হয় নাই।[৪২] ফরাসীদের তখন প্রবল প্রতিপত্তি। কুড়ি বছরের মধ্যে রাজনীতির চালে ফরাসীরা ইংরেজদের কাছে যে হেরে গেল সেটা তাদের সরলতার জন্য নয়, অকর্মন্যতার জন্য। তাছাড়া ইংরেজ কোম্পানীর পেছনে ইংলণ্ডের লোকের ও সরকারের সমর্থন ছিল। ফরাসী কোম্পানী দেশে হেয় হন বলেই বিদেশে অসফল হলেন।

এই অঙ্কের অন্যান্য ঘটনাও অলীক। বিশ্বাসঘাতকদের হাতের মুঠোয় পেলে তাদের ছেড়ে দেবার পাত্র মোহনলাল ছিলেন না। মোহনলাল সম্পর্কে আলোচনার সময় এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেওয়া হবে। তবে মোহনলাল চরিত্রকে সব নাট্যকারই অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখেছেন। এই সময়কার ইতিহাস সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র প্রথম দুই অঙ্কের মতো সম্ভবত ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাই তাকে পদে পদে ভুল করতে দেখি। উর্মিচাঁদের সঙ্গে ক্লাইভের চুক্তিপত্র আসল ও জাল এবং মীরজাফরের সঙ্গে ওয়াটসের চুক্তিপত্র দুটি দলিল। তাই নাট্যকার বিভ্রমে পড়েছেন ওয়াটসকে দিয়ে জাল দলিলও সম্পাদন করিয়েছেন। মীরজাফর-ওয়াটসের মধ্যে যে চুক্তিপত্র ৫ই জুন সাক্ষরিত হয় তা একটাই এবং জাল নয়। এ বিষয়ে নাট্যকার লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী উর্মিচাঁদের সঙ্গে সাক্ষরিত আসল ও জাল চুক্তিপত্র তাঁর নাটকে সহজভাবেই প্রকাশ করেছেন। এই অঙ্কে জহরা সর্বত্র বিরাজ করছেন। এইমাত্র ঘসেটির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন রানী ভবানীর কন্যার কাছে নবাবের নামাঙ্কিত প্রেমপত্র পাঠাচ্ছেন; আবার ওয়াটস সাহেবকে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশ পরিয়ে তাকে মীরজাফরের বাসায় নিয়ে যাচ্ছেন। তারপর ঘসেটি বেগমের অর্থ মীরজাফরকে দিয়ে তাকে চুক্তিপত্র সই করায় উৎসাহিত করছেন। মনে হয় জহরাই যেন সব অপকর্মের নায়িকা। তৃতীয় অঙ্কে জহরা ও করিমচাচার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি নাট্যকারের দুর্বলতার প্রকৃষ্ট লক্ষণ। পরবর্তী দুই অঙ্কেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যাবে। এই অঙ্কের শেষ ঘটনা

সিরাজের মীরজাফরের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করা ইতিহাস সম্মত ঘটনা। যদিও তার সময় পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিত আগে। ৫ই জুনের দৃশ্যে সিরাজ-দৌল্লাকে নিয়ে আসাতে নাটকীয়তা হয়েছে বটে, এমনকি মীরজাফরের চরিত্রের হীনতাও প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সত্য ঘটনা প্রকাশ হয়নি। বিশেষ আলিবর্দী বেগমকে মীরজাফরের আবাসে নিয়ে এসে এক অসম্ভব পরিস্থিতি অহেতুক সৃষ্টি করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে এই সময়ে মীরজাফর পদচ্যুত। সৈন্যবাহিনীর ভার মীরমদনের ওপর। তা সত্ত্বেও নবাব কেন মীরজাফরকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করলেন কেনই বা তাঁর ওপর সৈন্য-বাহিনীর দায়িত্ব দিলেন। মোহনলাল মীরমদনের ওপর পুরাপুরি নির্ভর না করে কেন পদচ্যুত সিপাহশালারকে নিয়ে পলাশীতে উপস্থিত হলেন? এর কোন কাজটাই সিরাজের রাজনৈতিক প্রাজ্ঞতার পরিচয় দেয় না।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক পলাশীর ইংরেজ শিবির। ফরাসী সিনফ্রের গোলাবর্ষণে ক্লাইভের ধারণা হয়েছে যে মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে অর্থাৎ যুদ্ধ করবে না বলে ঘোর যুদ্ধ সুরু করেছে। ক্লাইভের এই ঘোর সংকট সময়ে জহরা উপস্থিত হয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করল। জহরা জানাচ্ছেন যে বাঙ্গালীর মনে কোনরকম স্বদেশ অনুরাগ বা জাতীয়তা নাই। মাতৃ-ভূমির ভালমন্দ কেউ চিন্তা করেনা। সুতরাং তাঁর ভয় পাবার কোন কারণ নাই (১৪২ পাতা)। দেড় পাতা সংলাপের পর জহরা ক্লাইভকে ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে মীরমদন মোহনলাল ও সিনফ্রের সৈন্য একযোগে আক্রমণ করলেও ক্লাইভের জয় হবে। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নবাব শিবিরে সিরাজদৌল্লা বিপক্ষের তোপধ্বনীতে ভীত হচ্ছেন। খবর এল হঠাৎ বৃষ্টিতে নবাবের সমস্ত বারুদ ভীজে গেছে। একটু পরেই আহত মীরমদনকে বহন করে নিয়ে এল। নবাবের সামনে মীরমদনের মৃত্যু হল। মীরমদনের শেষ উপদেশ মতো নবাব নিজে হস্তীপৃষ্ঠে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার জন্য হাতি সাজাবার হুকুম দিলেন। কিন্তু বালকবেশী জহরা বলে গেল নবাবকে রণক্ষেত্রে দেখলে মোহনলাল ইংরেজদের আক্রমণ করা বন্ধ রেখে নবাবের সাহায্যে আসবেন এবং তাহলেই যুদ্ধ পণ্ড হবে। সেকথা শুনে নবাব যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা স্থগিত রেখে মীরজাফরকে ডেকে পাঠালেন। রায়দুর্লভ এসে উপদেশ দিলেন যে বারুদ সব বৃষ্টিতে নষ্ট হয়েছে। যুদ্ধ অবিলম্বে স্থগিত রাখা কর্তব্য। পরদিন নবাবী

বাহিনীর বিপুলতায় ইংরেজদের অবশ্যই পতন হবে। মীরজাফর এসে সেই উপদেশের পুনরাবৃত্তি করলে নবাব মোহনলালকে ক্ষান্ত হবার আদেশ দিলেন। মীরজাফর উপদেশ দিলেন নবাবের মুর্শিদাবাদে যাওয়া কর্তব্য উষ্ট্র প্রস্তুত আছে কারণ নিশাকালে ক্লাইভ শিবির আক্রমণ করলে মহাসমস্যা সৃষ্টি হবে। সকলে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, বুঝেও নবাব মুর্শিদাবাদে যেতে সম্মত হলেন। আবার জহরা এসে নিজের পরিচয় দিয়ে এবং প্রতিহিংসার কারণ জানিয়ে বলছে নবাব যদি এখন পলায়ন না করেন তাহলে সেই রাত্রে ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে হত্যা করবে, প্রচার করা হবে ইংরেজ হত্যা করেছে। সিরাজ মীরমদনের মৃতদেহ সঙ্গে করে মুর্শিদাবাদ রওনা হলেন। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রণস্থল। মোহনলাল ও সিনফ্রে প্রচণ্ড যুদ্ধে ব্যস্ত। ইংরেজরা বিপদ-গ্রস্ত। এমন সময় আবার জহরা এসে মোহনলালকে জানালেন যে বিদ্রোহীরা নবাব শিবির আক্রমণ করেছে, নবাব মোহনলাল, মোহনলাল বলে আর্তনাদ করছেন। এই কথা শুনে নবাবকে রক্ষা করার জন্য তিনি দৌড়ে চলে গেলেন। আর জহরা সৈন্যদের বললেন :—'মীরমদন মৃত, মোহনলাল পলাতক, অকারণ ইংরেজ হাতে কেন প্রাণ দাও? পালাও, পালাও। ঐ দেখ ইংরাজ আসছে।' সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধ জয় করে জয়ধ্বনি করলেন। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে নবাবের অন্তঃপুর। নবাব মহিষী ও কন্যাকে ঘিরে এক করুন দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। নবাবের অর্থ নিয়েও কেউ যুদ্ধ করতে সম্মত হল না। নবাব মহিষী লুৎফউন্নিসার সংলাপ—'চলো যাই—দূর বনে যাই, যথায় নর সমাগম নাই তথায় অবস্থান করি। ব্যাঘ্র, ভল্লুকও রাজঅমাত্য অপেক্ষা বিদ্বেষহীন। চলো, বনবাসে কুটিরে রাজ্যস্থাপন করি, আমি তোমার প্রজা, আমি তোমার দাসদাসী, আমার সেবায় তুমি নিপুণ ভৃত্যের সেবা বিস্মৃত হবে।' (১৫৭ পাতা) অবশেষে নবাব মহিষী ও নবাব কন্যা উম্মৎ জহরৎকে সঙ্গে নিয়ে নবাবের পলায়ণ। এখানেও নাটকীয়তার শেষ নয়। করিমচাচা নবাবের সঙ্গে বেশবাস পালটে নবাব সাজলেন কিন্তু জুতা বদল করতে ভুল হয়ে গেল। পরবর্তী দৃশ্যে করিমচাচার আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত করে জুতার জন্য নবাব ধরা পড়লেন। নবাবের পলায়ন উষ্ট্রে চেপে হয়েছিল বলে নাট্যকার জানিয়েছেন। (১৬০ পাতা)। একটু পরেই মোহন-লাল নবাবের খোঁজে এসে আলিবর্দী বেগম ও ঘসেটি বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ

পেলেন। সিরাজের প্রতি ঘসেটির প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলন্ত বক্তব্য শেষ হবার আগেই মীরণ প্রবেশ করে ঘসেটি বেগমকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে করিমচাচা নবাবী সাজে চলে সৈন্যদের দৃষ্টি নবাবের দিক থেকে নিজের দিকে আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক ভগবানগোলায দানশা ফকিরের পীরের দরগা। জহরা এসে দানশার প্রতি-হিংসাকে পুনরুজ্জীবন করছেন, নবাবকে ধরিয়ে দেবার জন্যে উৎসাহিত করছেন। নবাব স্ত্রী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে পীরের দরগায় আশ্রয় নিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় নবাব কন্যা অত্যন্ত কাতর। জুতা দেখে দানশা ফকির নবাবকে চিনিয়ে দেয় এবং মীরকাশিম ও মীরদাউদ সকলকে বন্দী করে। তৃষ্ণায় উন্মৎজহরতের মৃত্যু হল। নবাব ও নবাবমহিষীকে নিয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করা হল। উন্মৎজহরতের মৃত্যু ও নবাবের দুর্ভাগ্য নিয়ে এক অত্যন্ত করুণ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। সিরাজের মুখে কাব্য দেওয়া হয়েছে—'কয়জন বিদেশী বণিক, কাড়ি নিল সিংহাসন, ধূমকেতু উদি অকস্মাৎ শুষিল সাগরনীর। বঙ্গসিংহাসন না জানি কি কুহকে গঠন, অধিকারী বর্ত্তন তাহার—কুহক প্রভাবে যেন।·· ·রণস্থলে সশস্ত্র দাঁড়ায়ে, অভিনয় নেহরিল বিপুল বাহিনী। পুত্রের মমতা নাহি বঙ্গ মাতা হৃদে।' (১৭১ পাতা)

চতুর্থ অঙ্কে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন থেকে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত আট দিনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম তিনটি গর্ভাঙ্ক পলাশীর যুদ্ধ অর্থাৎ ২৩শে জুনের ঘটনা। নবাব বাহিনীর আক্রমণে ক্লাইভকে অত্যন্ত কাতর দেখান হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে নিহত হন ২৩ জন সৈন্য ও আহত হন ৪৯ জন। নবাব পক্ষে কেবল মৃতের সংখ্যাই ৫০০এর অধিক।[৪৩] স্যার আয়ার কুটের রোজনামচায় পলাশীর যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আছে। তিনি নিজে ইংরেজ পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর বক্তব্যের কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। তিনি লিখেছেন কযেকদিন আগে চন্দননগর জয় করতে ইংরেজদের যে সৈন্য ক্ষয় হয়েছে পলাশীতে তার অর্ধেকও হয় নাই। কারণ তিনি বলেছেন যে ইংরেজ সৈন্য পলাশীতে মাটির এক উঁচু প্রাচীরের পেছনে আশ্রয় নিয়েছিল এবং যুদ্ধ সুরু হবার দিকে বৃষ্টিতে নবাবের গোলা ভিজে যাওয়ায় কামানের তেজ তাদের বেশ কমে যায়। আয়ার কুটের আরেকটি লাইন

প্রায়ই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তিনি বলেছেন নবাব তার কোন সৈন্যাধ্যক্ষের ওপর আস্থা রাখতেন না তাই কোন সৈন্যাধ্যক্ষও নবাবকে বিশ্বাস করতেন না।[৪৪] একথা নবাবের কীর্তি দেখলে সত্য মনে হয়। মোহনলাল, মীরমদন সিনক্রে থাকা সত্বেও তিনি যে ভাবে অনুনয় বিনয় করে মীরজাফর খাঁকে পলাশীতে এনেছিলেন তা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সম্ভবত মোহনলাল এবং তাঁর সহকর্মীদের ওপর নবাবের সম্পূর্ণ আস্থা ছিল না। মীরজাফরের চরিত্র বুঝতে হলেও এই ঘটনাটা আদ্যপান্ত জানা প্রয়োজন। তাই আচার্য্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের রচিত ইতিহাস উদ্ধৃত করছি। আশা করি যে পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা এতে স্পষ্ট হবে।

'বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীরা নবাবকে মীরজাফরের সহিত মিটমাট করিবার উপদেশ দিল। মোহনলাল মীরমদন প্রভৃতি বিশ্বস্ত অনুচরেরা পরামর্শ দিল যে মীরজাফরকে অবিলম্বে হত্যা করা হউক। এই বিষম সংকটের সময় সিরাজ তাঁহার অস্থিরমতিত্ব, কূট রাজনীতিজ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাব এবং লোকচরিত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। মীরজাফরের বাড়ী ঘেরাও করিয়া তিনি তাঁহাকে পরম শত্রুতে পরিণত করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তিনি ভাবিলেন যে অনুনয় বিনয় করিয়া মীরজাফরকে নিজের পক্ষে আনিতে পারা যাইবে। নবাব সমস্ত মান মর্য্যাদা বিসর্জন দিয়া স্বয়ং মীরজাফরের বাটীতে গমন করিলেন। মীরজাফর কোরাণ স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত তিনটি শর্তে নবাবের পক্ষে থাকিতে রাজী হইলেন।

(১) সমূহ বিপদ কাটিয়া গেলে মীরজাফর নবাবের অধীনে চাকুরী করিবেন না।

(২) তিনি দরবারে যাইবেন না।

(৩) আসন্ন যুদ্ধে তিনি কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সিরাজ এই সমুদয় শর্ত মানিয়া লইলেন এবং তৃতীয় শর্তটি সত্বেও মীরজাফরকেই সেনাপতি করিয়া তাহার অধীনে এক বিপুল সৈন্যদল সহ যুদ্ধে চলিলেন।'[৪৫] সুতরাং স্যার আয়ার কুটের মন্তব্য সত্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ফরাসী সাঁফ্রের গোলা বৃষ্টিতে ভিজলনা অথচ ভরিতীয়দের ভিজে গেল এটা আশ্চর্য্য ঘটনা। ইংরেজপক্ষে মোষের গাড়ীর উপর নবাবী কামানের বর্ণনা আছে। বিকাল চারটা নাগাদ প্রাণভয়ে ভীত

নবাবের পলায়নের বর্ণনা পাওয়া যায়। পলাশীর যুদ্ধে প্রাণ হারালেন সেনাপতি মীরমদন, মোহনলালের জামাতা বাহাদুর আলি খাঁ, ইনি বাহালিয়া বন্দুকধারীদের দলপতি ছিলেন এবং কামান বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন নউএ সিং হাজারী।[৪৬] মুতাক্ষরীণে গোলাম হোসেন খাঁ লিখেছেন যে মীরজাফর যখন নবাবকে যুদ্ধ থামাবার জন্য উপদেশ দিলেন তখন মোহনলাল সে নবাবী হুকুম উপেক্ষা করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। মীরজাফর নবাবকে মোহনলালকে সংযত করার নির্দেশ দিয়ে নবাবী তাঁবু ত্যাগ করলেন।[৪৭] মুতাক্ষরীণ পাঠকের মনে রাখা প্রযোজন যে, তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। মোহনলালের বীরত্ব কতখানি সত্য আর কতটুকু কবি কল্পনা তাও জানবার বিশেষ উপায় নাই। মোটমাট জানা যায় সকাল আটটার পর যুদ্ধ সুরু হয়। ১১টা নাগাদ আষাঢ়ে বৃষ্টি আর প্রচণ্ড ঝড় যুদ্ধ ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। নবাব বাহিনী বৃষ্টি থামলে আবিষ্কার করল যে তাদের বারুদ ভিজে গেছে। ইংরেজ শিবিরে নিস্তব্ধতা দেখে সম্ভবত মীরমদনের ধারণা হল যে তাদের বারুদও সিক্ত। তাই অসম সাহসী একদল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মীরমদন ইংরেজ শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই ইংরেজ গোলার আঘাতে বীর মীরমদন আর তার সেনাদল ধূলিশয্যা গ্রহণ করলেন।[৪৮]

আশ্চর্য্যের বিষয় বীর মীরমদন সম্পর্কে প্রায় কোন খবরই পাওয়া যায় না। সেদিন লা সাহেবের জীবনস্মৃতিতে মীরমদনের সংবাদ পেয়ে ভাল লাগল। মদন নামে এক হিন্দু পালোয়ান শাহাজাদা সিরাজকে স্ত্রীলোক সংগ্রহ করে দিয়ে তার প্রিয়পাত্র হয়। অসম সাহস ও যুদ্ধ ক্ষমতার জন্য মদন অচিরে সিরাজের প্রিয়পাত্র হলেন এবং মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে মীরমদন নামে খ্যাত হন। যুদ্ধ প্রণালী রচনার সহজাত ক্ষমতা মীরমদনের ছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার যুদ্ধে রায়দুর্লভের হয়ে সৈন্য চালনা করেন মীরমদন। চন্দননগরে ফরাসীদের সাহায্য করবার জন্য রায়দুর্লভের সহকারী হয়ে মীরমদনকে পাঠাবার জন্য লা সাহেব অনুরোধ করেন এবং নবাব সে অনুরোধ রক্ষা করেন। কিন্তু নবাব সৈন্য মুর্শিদাবাদ থেকে বার হবার আগেই ক্লাইভ চন্দননগর জয় করে ফেললেন।[৪৯]

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ আরম্ভ ও শেষ। নবাবের ৫৩

খানা কামানের মধ্যে ৪১ টা থেকে কোনো গোলা ছোঁড়া হয়নি। নবাব সৈন্যের এক পঞ্চমাংশে যুদ্ধ লিপ্ত ছিল। যে অবস্থায় নবাব তাঁর অপমানিত অমাত্যদের কাছে আনুগত্য ও বিশ্বাস প্রত্যাশা করেছিলেন তাই তাঁকে বাতুল বা অনভিজ্ঞ মনে করার পক্ষে যথেষ্ট। যুদ্ধ শেষ হবার আগে পলায়ন (কলকাতার ৫ই ফেব্রুয়ারীর যুদ্ধেও তাই করেছেন) তাঁর যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতার লক্ষণ। সকলকে দেখিয়ে হাতিতে (মতান্তরে উটে) চেপে পলায়ন চরম অবিমৃষ্যকারিতা। সকলে দেখল ও জানল নবাব প্রাণভয়ে পলায়ন করলেন। এইসব ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র সিরাজের চরিত্র রক্ষার কোন উপায় না দেখে জহরাকে সর্বত্র ঘুরিয়েছেন। জহরার চক্রান্ত এবার সম্ভাব্যতার সীমা ছাড়িয়ে হাস্যকর হয়ে উঠেছে। নাট্যকার যে সম্পূর্ণভাবে নাটকের হাল হারিয়ে ফেলেছেন এটাই প্রকটতর হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধ তাই এই নাটকে জহরার যুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়।

যুদ্ধের সাধারণ নিয়ম সর্বদা একদল সৈন্যকে পৃষ্ঠরক্ষায় রাখতে হয়। যুদ্ধে পরে যোগদান করবার জন্য বিশেষ সংরক্ষিতবাহিনী (Reserve force) রাখা প্রয়োজন ও যুক্তিসঙ্গত। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদৌল্লা সেরকম কিছু করেছেন বলে জানা যায়না। পরাজিত নবাবের এই একাকীত্ব আর নিঃসঙ্গতা দেখে সত্যি আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। কোন বন্ধু ছিলনা তার মুর্শিদাবাদে! নবাব যুদ্ধ করার কোন চেষ্টা করলেন না। সৈন্য সংগ্রহের কোন চেষ্টা না করে সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করলেন। পলাশী থেকে মুর্শিদাবাদ ৩৫ মাইল। হাতি কখনই ঘণ্টায় ৫ থেকে ৭ মাইলের বেশী যেতে পারেনা। সুতরাং নবাবের রাজধানী পৌঁছতে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা লেগেছে। অর্থাৎ বিকাল ৪ টায় পলায়ণ করলে তিনি মুর্শিদাবাদে এসেছেন রাত্রি ৯ টার পর ও ১১ টার আগে। মাঝামাঝি সময় ধরা যাক রাত্রি ১০টায় পৌঁছলেন। তারপর মাত্র চারঘণ্টা তিনি মুর্শিদাবাদে ছিলেন কারণ ইংরেজী ২৪শে জুন রাত্রি দুটো নাগাদ তিনি গোশকটে রাজধানী ত্যাগ করেন। সঙ্গে ছিলেন লুৎফউন্নিসা আর এক বিশ্বস্ত ভৃত্য।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে নাট্যকার ভীত ত্রস্ত নবাব সৃষ্টি করেছেন এবং লুৎফউন্নিসার সঙ্গে তার গৃহত্যাগ দেখিয়েছেন। লুৎফউন্নিসাকে নবাব মহিষীর মর্য্যাদা দিয়ে নাট্যকার সিরাজ চরিত্রকে সুযশ দিয়েছেন। কন্যাকে সঙ্গে

নিয়ে যাওয়া উপলক্ষে করুণ রস সৃষ্টি করেছেন। করিমচাচার আত্মত্যাগ, মোহনলালের নবাব অন্বেষণ প্রভৃতি সমস্ত ঘটনাগুলি নাটকীয় কিন্তু ঐতিহাসিক নয়। সিরাজ কোন বিষয়েই তার পটুত্ব প্রমাণ করতে পারলেন না এমনকি প্রাণভয়ে পলায়নেও নয়। অবশেষে ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে সিরাজের বন্দীদশা। এখানে নাট্যকার প্রচলিত গল্পই ব্যবহার করেছেন। মীরকাশিম সিরাজ ও লুৎফউন্নিসাকে বন্দী করেন এবং লুৎফউন্নিসার জহরতের পেটিকা আত্মসাৎ করেন এইটুকু ইতিহাস সুতরাং নাট্যকার মনের আনন্দে কল্পনাকে বিস্তৃত করেছেন। সিরাজ কন্যা উম্মতজহরতের মৃত্যু নাটকীয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু উম্মত জহরতের মৃত্যু হয় নাই। তাঁর মৃত্যু হয় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় চারটি কন্যার জন্ম দেবার পর।[৫০] কাজেই চতুর্থ অঙ্কে ইতিহাস কমে গিয়েছে উপন্যাস স্পষ্ট হয়েছে। বাঙ্গালী দর্শকের কথা মনে রেখে নাট্যকার নবাব সিরাজদৌল্লার মুখে স্বদেশীকতার বানী দিয়েছেন। গিরিশের কাব্য দানীবাবুর অভিনয় শুনে বাঙ্গালী এই স্বদেশভক্ত দেশপ্রাণ নবাবের জন্য অশ্রু বিসর্জন না করে পারেনি। 'কয়জন বিদেশী বণিক' যাঁরা ১৭৫৭ তে নবাব সিরাজদৌল্লাকে পরাভূত করেছিল তারা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নাট্যমঞ্চে সিরাজদৌল্লাকে দেখে ভীত হয়েছিলেন এটাই সিরাজদৌল্লা নাটকের সব থেকে বড কৃতিত্ব। পলাশীর দুরপনেয় কলঙ্ক কালিমা বাঙ্গালী মুখে মাখল পলাশী যুদ্ধের প্রায় দেড়শত বছর পরে এটাই গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি। চতুর্থ অঙ্কেই নাটক শেষ বলা চলে। পঞ্চম অঙ্ক সবদিক থেকেই ক্ষীণ। নাটকের গতির সমাবর্তন অর্থাৎ সিরাজের হত্যা ছাড়া আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী বাকী নাই। সেটাই গিরিশচন্দ্র বলেছেন সাতটি গর্ভাঙ্কে পাতার সংখ্যা ২৪। গড়ে তিনপাতায় এক একটি দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। করিমচাচা ও জহরার চরিত্রগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মীরণ মহম্মদীবেগকে সিরাজ-হত্যায় প্ররোচিত করছেন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মীরণের বিলাসকক্ষে বন্দিনী লুৎফউন্নিসা। মীরণ লুৎফউন্নিসাকে সবলে উপভোগের জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছে তখন সহসা ওয়াটস পত্নী দৌড়ে এসে নবাব মহিষীকে রক্ষা করে পূর্ব উপকারের প্রতিদান করছেন। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে কারাগারে বন্দী সিরাজ ফৈজী

হত্যা করার দুঃখে অনুতপ্ত। ঘাতক মহম্মদী বেগ প্রবেশ করলে সিরাজ তাকে উন্মুক্ত জায়গায় হত্যা করার জন্য অনুরোধ করে জগদীশ্বরকে তার শেষ অনুতাপ নিবেদন করলেন। মহম্মদী বেগ আঘাত করল। হোসেন কুঁলি খাঁ ও ফৈজীর প্রেতাত্মার তৃপ্তি আকাঙ্খা করে সিরাজ মৃত্যুপথযাত্রী হলেন। পরক্ষণেই ওয়াটস পত্নী নবাবের মুক্তিপত্র ও লুৎফউন্নিসাকে সঙ্গে করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলেন সিরাজ মৃত। অবশেষে জহরা এসে সিরাজের রক্তে আপনার স্বামীর মৃত আত্মার তর্পণ করলেন। নবাবের মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে নগরভ্রমনের জন্য নিয়ে যাওয়া হল। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে নবাবী পোষাকে সজ্জিত করিমচাচা আর কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারলেন না কিন্তু মোহনলাল বিভ্রান্ত হলেন। অবশেষে করিমচাচার কাছে নবাবের পলায়ন সংবাদ শুনলেন। জহরা এসে মহানন্দে নবাবের শেষ সংবাদ শোনাল। 'নবাবের খণ্ড খণ্ড দেহ হস্তিপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করেছে। আমিনা বেগম রাস্তায় এসে বুক চাপড়ে কেঁদেছে, বৃদ্ধা নবাব মহিষী রাস্তায় লুটোপুটি খেয়েছে, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে' (১৯০ পাতা)। এই কথা শুনে মোহনলাল ও করিমচাচা রায়দুর্লভের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। এই নাটকে গল্পকে ইতিহাসের থেকে উঁচু সম্মান দেওয়া হয়েছে এটা স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অবহিত ছিলেন তাই এই দৃশ্যে করিমচাচার সংলাপে নাট্যকারের জবানবন্দী পাওয়া যায়। করিমচাচা জহরাকে বলছেন—'এত করেও ইতিহাসে স্থান পেলে না চাচী, নাটক আর গল্পের কেতাবে শোভা পাবে। বেইমান কালিতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরে যাবে তোমার আমার জায়গা হবে না। বাহাদুরী তো নিলে, কিন্তু যে নবাব হোসেনকুলিকে কেটেছিল তার কিছু করতে পারলে না। সে মাতাল নবাব—আর এ হচ্ছে প্রজাপালক নিরীহ নবাব' (১৯১-২ পাতা)। গিরিশচন্দ্র এই উক্তিতে নিজেই স্পষ্ট স্বীকার করেছেন যে তার রচিত সিরাজ চরিত্র অলীক কল্পনা প্রসূত। জহরার এক লম্বা বক্তৃতা তারপর পতন। মূর্চ্ছা না মৃত্যু অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে উমিচাঁদের গল্প শুরু। তার লোভ দেখান হয়েছে। পরের দৃশ্যে অর্থাৎ ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে জাল দলিল প্রকাশ হয়ে উমিচাঁদ ফাঁকি পড়েছেন। টাকার শোকে উন্মাদ হয়ে উমিচাঁদ পথে পথে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। এই দৃশ্যে নবাব মীরজাফর মোহনলাল ও করিমচাচার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন। অবশেষে ক্লাইভ সাহেব নবাবকে চুক্তি লিখিত অর্থের জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। নবাব যে ক্লাইভের অর্থদাস এমন ভাব করা হয়েছে। ক্লাইভ স্পষ্টই বলছেন মোহনলাল

ছাড়া আর কারু বাক্যে তাঁরা বিশ্বাসী নন। নবাব মীরজাফরের প্রতি সংলাপ—'গদী ছাড়িয়া উঠুন, আমার তাঁবুতে আসুন। আইসেন বিলম্ব করিতে পারিব না' (২০০ পাতা)। সপ্তম ও শেষ গর্ভাঙ্কে লুৎফউন্নিসা খোসবাগে সিরাজের কবরে পুষ্প অর্পণ করছেন। পুষ্প নিয়ে ওয়াটস পত্নী এলেন এবং সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। অবশেষে লুৎফউন্নিসার এক করুণ সঙ্গীতে নাটক ও দৃশ্যের ওপর যবনিকাপাত করা হয়েছে।

পঞ্চম অঙ্কে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১ম থেকে ৫ই জুলাইএর ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। নবাবের গুপ্ত হত্যা ২রা জুলাইএর ঘটনা সুতরাং মীরণ-মহম্মদী বেগ দৃশ্যটির কাল ১লা জুলাই হবার সম্ভাবনা। এই ঘটনা ৩০শে জুন নবাব ধৃত হয়ে মুর্শিদাবাদে আনীত হবার পর ঘটতে পারে কিন্তু সে ক্ষেত্রেও হবে অধিকরাত্রের ঘটনা অর্থাৎ ইংরেজী মতে ১লা জুলাই। নবাবের মৃতদেহের নগরভ্রমণ এবং ক্লাইভের নবাবের দেয় অর্থ নিয়ে 'সামরিক বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া প্রথম কিস্তির টাকা দুইশত নৌকায় বোঝাই করিয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা'[৫১] হওয়া দুইই ৩রা জুলাইএর ঘটনা। ৪ঠা জুলাই সিরাজ সমাধিস্থ হলেন সুতরাং কবরে ফুল দেবার ঘটনা ৫ই জুলাই বলে ধরা হয়েছে কারণ অনতিকাল পরেই সিরাজদৌল্লার আত্মীয় মহিলাদের ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে লুৎফউন্নিসা সম্ভবত অন্ততপক্ষে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে খোসবাগে সিরাজের সমাধির তত্ত্বাবধানে রত দেখা যায়। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় যে তিনি ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে কিন্তু ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের আগে খোসবাগে এসেছেন।[৫২]

এই অঙ্কে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও নিখিলনাথ রায়ের স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। মনে হয় শেষ দৃশ্যটি নিখিলনাথের আগ্রহে যুক্ত হয়েছে। এই অঙ্কে সিরাজের মহম্মদী বেগের হাতে গুপ্ত হত্যা, ক্লাইভের নূতন নবাবের কাছে অর্থ সংগ্রহ এবং খোসবাগে লুৎফউন্নিসার ফুল দেওয়া একমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু প্রত্যেক ঘটনাই নাট্যকারের রচনায় প্রক্ষিপ্ত। হত্যার পূর্বমুহূর্তে সিরাজের যে মহান রূপ আঁকা হয়েছে তা তার সত্যচরিত্র অনুযায়ী একেবারেই অসম্ভব। লুৎফউন্নিসাকে ৫ই জুলাই সিরাজের কবরে ফুল দিতে দেওয়া হয়েছিল এটাও অসম্ভব কারণ লুৎফউন্নিসা তখন বন্দী। বন্দী অবস্থাতেই তাঁকে এবং তার কন্যাকে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। সুতরাং এই দৃশ্যের ঘটনা অনেক পরের

অর্থাৎ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ের ঘটনা। ক্লাইভের হাত ধরে মীরজাফর গদীতে বসেন এজন্য তাকে ক্লাইভের গর্দভ বলা হত। প্রথম কিস্তির টাকা শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাবার সময় বাজনা জোরে বাজান হয়েছিল। ঐতিহাসিক ফীলিং লিখেছেন 'গতবছরের লজ্জা ঢাকবার জন্যে সামরিক বাদ্য একটু বেশী জোরেই বেজেছিল।' ক্লাইভের সঙ্গে মীরজাফরের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক মত প্রচলিত আছে। নাট্যকার দেখিয়েছেন তাদের সম্পর্ক ছিল প্রভু ভৃত্যের। এটা সম্ভবত ঠিক নয়। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর মীরজাফর মহিষীর ক্লাইভকে লেখা একখানি পত্র দিল্লীর মহাফেজখানার ফার্সী বিভাগে রক্ষিত আছে। সেটি পাঠ করলে মনে হয় ক্লাইভ ও মীরজাফরের সম্পর্ক ছিল সখ্যের। ক্লাইভ মীরজাফরকে ডাকতেন 'বাবা' মীরজাফর মহিষীকে ডাকতেন 'মা'। এই চিঠিখানি ক্লাইভের চরিত্রের এক নূতন দিকে আলোকপাত করে সন্দেহ নাই।

সিরাজের হত্যা দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইতিহাসের পাতায় নাটক রচনা করেছেন।[৫৩] বলাবাহুল্য উহাও প্রক্ষিপ্ত। গিরিশচন্দ্র সেই বর্ণনাই অনুসরণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সিরাজের মৃত্যুতে সেদিনের 'বাঙ্গালী দর্শকরা কোনরূপ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নাই।'[৫৪]

গিরিশচন্দ্র রচিত সিরাজদৌল্লা নাটক আলোচনার উপসংহারে বলা চলে গিরিশচন্দ্র এক নূতন সিরাজদৌল্লা সৃষ্টি করলেন। ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন রাজনৈতিক দেশহিতৈষী সিরাজ। নানা ঐতিহাসিক ঘটনা এই নূতন সিরাজের চারপাশে এমন করে সজ্জিত হল যাতে দর্শককুল সত্য সিরাজ বলে এই কল্পিত চরিত্রকে ভুল করে। গিরিশচন্দ্র এই কাজে সফল হয়েছিলেন। লোকমুখে সিরাজদৌল্লা হয়ে গেলেন দেশনায়ক নেতা। পরবর্তী নাটকগুলি ক্রমান্বয়ে এই কল্পিত সিরাজ চরিত্রকেই জনসমক্ষে বার বার প্রকাশ করেছে। সকলে মিলে সমস্বরে একটি মিথ্যাকে বারবার উচ্চারণ করলে সেই মিথ্যা যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় গিরিশচন্দ্র রচিত সিরাজদৌল্লা চরিত্র তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

জাতীয় নাট্যকার রূপে গিরিশ প্রতিভাও এই নাটকে উদ্ভাসিত হয়েছে। সিরাজদৌল্লার মতো এক কলঙ্কিত চরিত্রকে জাতীয়বাদীর রূপ দেওয়া নাট্যকারের কম কৃতিত্ব নয়। এই কাজ করতে গিয়ে নাট্যকার কেবল

নিজের কাছেই হার স্বীকার করেছেন। তাঁর রচিত কল্পিত চরিত্রদ্বয় জহরা ও করিমচাচা নাটকে প্রধান দুটি চরিত্র হয়ে গেছে। সেখানে সমস্ত ষড়যন্ত্রকারী এবং ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজপক্ষ জহরার কাছে ম্লান হয়ে গেছেন। নবাবহিতৈষী মোহনলাল, মীরমদন, মোহনলালের জামাতা বাহাদুর আলি খাঁ এমন কি লুৎফউন্নিসার তুলনায় করিমচাচা নবাবের শ্রেষ্ঠ বন্ধুরূপে চিত্রিত হয়েছেন। নবাবের বিশ্বস্ত আত্মোৎসর্গকারী ভৃত্য 'নাজির দালাল' নাটকে কোন স্থান পান নাই।[৫৫]

শচীন সেনগুপ্ত : সিরাজদ্দৌলা ১৯৩৮

১৯০৫ এ গিরিশচন্দ্রের সিরাজদৌল্লা নাটক অভিনয় হয়। মিনার্ভা থিয়েটারে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই এই নাটকের পুনরাভিনয় সুরু হয়। এবারে সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করেন অমরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং জহরা করেন কুসুম কুমারী। (গিরিশ রচনাবলী—প্রথম খণ্ড। একষট্টি পাতা। ভূমিকা) ২৭শে জুলাই গিরিশচন্দ্র দানীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে কোহিনুর থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী সরকারী আদেশে এই নাটকের অভিনয় ও প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা লাভের পর শিশিরকুমার ভাদুড়ী শ্রীরঙ্গমে এবং আধুনিক কালে লিটল থিয়েটার এই নাটকের অভিনয় করেন। প্রত্যেকবার সুঅভিনীত হলেও পুনরভিনয়ে নাটক জনপ্রিয় হতে পারেনি।

গৈরিশী সিরাজদৌল্লার চরিত্র চিত্রণে সেক্সপীয়রের দ্বিতীয় রিচার্ডের প্রভাব সম্পর্ক ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কিছু আলোচনা হয়। পরবর্তীকালে দেশাত্ম-বোধের বন্যায় সিরাজদৌল্লা নাটকের সমালোচনা কঠিন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় রিচার্ডের ছাঁচে যে সিরাজ-চরিত্র অঙ্কিত একথা বলাও অন্যায় মনে করা হত। সিরাজদৌল্লা সম্পর্কে এই অস্বাভাবিক বীরপূজার উজ্জ্বলতম মুহূর্তে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আর এক সিরাজদ্দৌলা নাটক রচনা করলেন (বানানের তফাৎ লক্ষণীয়)। প্রথম অভিনয় রজনী ৯শে জুন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ (১৩৪৫ সালের ৭ই শ্রাবণ)। তেত্রিশ বছরে সিরাজদৌল্লা সম্পর্কে জনচিত্ত এমনি বিভ্রান্ত যে নাট্যকার যা লিখলেন তাই সকলে অভ্রান্ত ইতিহাস রূপে গণ্য করলেন। মনে হল ইংরেজ কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে জনহিতৈষী নবাব যেন সকলের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। জনপ্রিয়তার সমস্ত পূর্ব ইতিহাস এই সিরাজদৌল্লার নাটকের কাছে মাথা নত করল।

কথা প্রসঙ্গে নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বলেন যে তিনি গিরিশচন্দ্রকে অনুগমন করে ঐতিহাসিক সিরাজদ্দৌল্লা চরিত্র সৃষ্টি করার কোন চেষ্টাই করেন নাই। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদৌল্লা হলেন বিপিনচন্দ্র পালের প্রতিরূপ এবং তাঁর সিরাজদৌল্লা—সুভাষচন্দ্র বসু। একথা যে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সুভাষচন্দ্র বাংলা দেশের অবিসংবাদিত নেতা। ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ হরিপুরা কংগ্রেসে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়ে। এ যেন যৌবনের জয়যাত্রা। নূতন পথে দেশকে চালিত করার সুবর্ণ অবসর। সুভাষচন্দ্র স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন যে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস পথের পাশে আর এক মতবাদের সহাবস্থানের সুযোগ আছে। ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের শুভ সূচনা সুভাষচন্দ্রের জয়ে সূচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইংরেজ অধীনস্থ দেশীয় সৈন্যদল যখন তাদের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বন্দুক তুলে দাঁড়াল, প্রমাণ করল দেশভক্তিতে তাদের রক্ত শ্রেষ্ঠ দেশনেতার মতোই উত্তপ্ত, তখন সুভাষচন্দ্রের কীর্তির গভীরতা প্রমাণিত হল। ১৯৩৮ এর ভারত মহাত্মা গান্ধীর ধীর শান্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল সুভাষচন্দ্রকে বরণ করে। সুভাষচন্দ্র সেদিন তরুণ সমাজের সামনে যৌবনের মূর্ত প্রতীক হয়ে দেখা দিলেন। হিন্দু-মুসলমানের একতাবদ্ধ এক ভারতবর্ষের রূপ মেলে ধরলেন দেশের সামনে। মুগ্ধ হল বালক যুবক বৃদ্ধ, মুগ্ধ হল মাতা কন্যা বধূ।

সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হলেন বাঙ্গালীর নয়নের মণি, তাঁর নেতৃত্বে মহাত্মা গান্ধী ও পুরাতন কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধে বাংলা জনসাধারণের অসন্তোষ সোচ্চার হয়ে উঠল। কবি লিখলেন কাব্য, গীতিকার গান, ঔপন্যাসিক উপন্যাস, নাট্যকার নাটক। তাই শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর ‘সিরাজদ্দৌলার’ সঙ্গে কেউ ইতিহাসের সম্পর্ক খুঁজবার চেষ্টা করলেন না। জাতির প্রয়োজনের কথা ভেবে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর সিরাজ বিনা দ্বিধায় ঐতিহাসিক সিরাজের সম্মান পেলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতিচ্ছবিতে আঁকা বলেই দেখা গেল সিরাজ রাজনীতিতে প্রবীন, বয়সে পক্ক, চিন্তায় প্রাচীন আর কণ্ঠে উত্তাল। বক্তৃতা করে জনসাধারণকে বিভোর করে দেবার সহজাত ক্ষমতায় তিনি অসাধারণ। অবাক দর্শক ভাববার অবকাশ পায় নাই যে, যাঁর নাট্যচরিত্র সমস্ত প্রেক্ষাগৃহকে উদ্বেল করে তুলল কেন তিনি নিজের

জীবনে একটি জনচিত্তকেও অনুপ্রাণিত করতে পারেন নাই। সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক হলেও শচীন সেনগুপ্তর সিরাজ সৃষ্টি হয়েছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। স্বাধীনতাকাঙ্খার অদম্য প্রয়াস এই নাটকের শ্রেষ্ঠ গুণ।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের নাটক বলেই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কথা খুব বড় ভূমিকা নিয়েছে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই প্রকট। সন্ত্রাশবাদীরা মুসলমান সমাজ বা নেতাদের কাছ থেকে কোন সহানুভূতি পায় নাই। গিরিশচন্দ্রের নাটকে তাই প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের। গিরিশচন্দ্র সিরাজকে দিয়ে বলছেন—'ওহে হিন্দু-মুসলমান—

এস করি পরস্পর মার্জনা এখন,
হই বিস্মরণ পূর্ব বিবরণ।'

গিরিশচন্দ্র ১৯০৫ এর মন নিয়ে পূর্ব বিবরণ বিস্মরণ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। শচীন্দ্রনাথ ১৯৩৮এ এই হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের অত্যন্ত গভীর রূপ দেখেছেন। তাই তাঁর সিরাজ হিন্দু মুসলমানকে মিলনের প্রয়াসে প্রচণ্ড ভাবুকতায় বক্তৃতা করেন—'বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়। মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা। (সিরাজদ্দৌলা ৭৭ পাতা) এই সেতুবন্ধনের ডাক সুভাষচন্দ্রের কর্মপদ্ধতির প্রতিধ্বনী। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক সহজ করতে সুভাষচন্দ্রের ব্যর্থতাকে সম্ভবত তাঁর সব থেকে বড় রাজনৈতিক বিফলতা বলে অভিহিত করা যায়। কারণ অবশ্যই ছিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পাকিস্থান স্থাপনের জন্য কেম্ব্রিজ গ্রুপ আন্দোলন সুরু করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ডঃ সৈয়দ আবদুল লতিফ মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অধিকার রক্ষার জন্য পুস্তিকা প্রচার করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারত মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য স্যার আবদুল্লা হারুণ মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য একটি খসড়া শাসনতন্ত্র সংগঠনের প্রস্তাব করেন। অবশেষে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ লাহোরে সারা ভারত মুসলীম লীগের প্রকাশ্য অধিবেশনে, বাঙালী ফজলুল হক পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৫৬]

সুতরাং ১৯৩৮তে বাংলার নেতাদের হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ডাক নাটকে প্রতিফলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ যেখানে নাট্যকার

জনমত অনুরনন করে নাট্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন সেখানে সমসাময়িক আব-হাওয়ার প্রকাশই স্বাভাবিক। সত্যিকারের পলাশীর যুদ্ধের সময় কিন্তু বাঙালী হিন্দু-মুসলমানে কোন বিরোধ ছিল না। উভয়ে নিজের ধর্ম ও সমাজ রক্ষা করে চলেছেন। হিন্দ্ রমনীর ওপর নবাবী অত্যাচার কখনই মুসলমানদের অত্যাচার বলে মনে করা হয় নাই। বর্গীর হাঙ্গামায় উপদ্রুত মুসলমানকন্যার নিগ্রহ, হিন্দুর অত্যাচার বলে মনে করা হয় নাই। চাকরী বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রধান উপ-জীবিকা হয় মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি হয় এই সময়ে। সরকারী চাকরীতে ব্যাপক ভাবেই হিন্দু নিয়োগ করা হত। এই ধরনের চাকুরে হিন্দু, মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজা খাঁ, সরফরাজ খাঁ, আলিবর্দী খাঁ ও সিরাজদৌল্লার শাসনকালে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।[৫৭]

পলাশীর যুদ্ধের সময় জমিদার, তালুকদার অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন, রাজ্যের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভাবে জগৎশেঠ নিয়ন্ত্রণ করতেন। এছাড়া নুনের কারবার, সুতো ও রেশমের বস্ত্র শিল্প প্রায় পরিপূর্ণ ভাবেই হিন্দুদের অধীন ছিল। কাজেই পলাশীর যুদ্ধ অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ তো দূরের কথা রীতিমত সদ্ভাব ছিল। এই ভালবাসার আরো কারণ ছিল। সিলেক্ট কমিটির সভায় মহম্মদ রেজা খাঁ ২৫শে ডিসেম্বর ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে জানা যায় যে নবাবী নিয়মে সব বিষয়ে মুসলমানদের যে শুল্ক দিতে হত হিন্দুর তার দ্বিগুণ শুল্ক দিতে হত। নুনের ব্যবসায় মুসলমান দিত শতকরা ২৷৷০ টাকা আর হিন্দু দিত শতকরা ৫ টাকা। এই নিয়ে বৃথা আন্দোলনে সময়ক্ষেপ না করে বুদ্ধিমান হিন্দু ব্যবসায়ীরা প্রায় সবাই একজন করে মুসলমান অংশীদার সঙ্গে রাখতেন। ফলে ৫ টাকা শুল্ক কখনই নবাবী দপ্তরে জমা পড়েনি।[৫৮]

হিন্দু-মুসলমানে ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মিল থাকার ফলে ছোট খাট বিরোধ কখনও সাম্প্রদায়িক সমস্যা হতে পারেনি। ব্যক্তিগত ভুল বোঝাবুঝি, অন্যায় বা হিংস্র আচরণ কখনই বৃহৎ আকার ধারণ করতে পারেনি। বাংলার অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা হিন্দু-মুসলমানের প্রীতিকে আরো নিবিড় করেছে। ১৭৬৭ থেকে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার গভর্নর ভেরেলেস্ট যে চিত্র এঁকেছেন তা অতি সুস্পষ্ট। তিনি লিখেছেন পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে 'the farmer was easy, the artisan encouraged, the merchant enriched and the Prince satisfied'. আচার্য্য নরেন্দ্রকৃষ্ণ

সিংহের মতে এই সুচিন্তিত অভিমতের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। বাংলার এই ছবি পরের যুগের কোনও বাঙ্গালীর আঁকা নয়। এমন একজন সমসাময়িক এই বর্ণনা করেছেন যিনি বিদেশী হলেও বাংলা দেশকে ভাল করেই জানার সুযোগ পেয়েছিলেন।[৫৯]

তাই নিঃসন্দেহে এবং নির্দ্বিধায় বলা চলে যে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। সিরাজদৌল্লার পতনে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ নবাবপক্ষ সমর্থন করেছেন। এই সময় বাংলাদেশে আর্থিক সমৃদ্ধি ছিল এবং বাংলাকে লুণ্ঠন করার লোভ ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে যোগদানের জন্য সব থেকে বেশী উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই বক্সারে মীরকাশিমের পরাজয়ের পরই ইংরেজরা সর্বপ্রথম জগৎশেঠের ক্ষমতা খর্ব করল। কারণ ইংরেজের সত্যিকারের প্রতিপক্ষ ছিলেন জগৎশেঠ।

শচীন্দ্রনাথের নাটক যে পলাশীর যুদ্ধ, বঙ্গে বর্গী ও সিরাজদৌল্লা নাটকত্রয় দ্বারা অনুপ্রাণিত তা সহজেই বোঝা যায়। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদৌল্লার বিশেষ প্রভাব শচীন্দ্রনাথের সিরাজদৌল্লায় দেখা যায়। যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে পরবর্তী সিরাজকে পরিপূর্ণ ভাবে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের সিরাজের উত্তর পুরুষ বলা চলে। গিরিশের করিমচাচা রূপান্তরিত হয়েছেন ক্লাউন গোলাম হোসেনে আর প্রতিহিংসাকামী জহরা হয়ে গেছেন দেশপ্রেমী আলেয়া। তাঁর পরিচয় দেওয়া হয়েছে মোহনলালের সমাজচ্যুতা ভগিনী। এখানে স্পষ্টই বঙ্গেবর্গীর মাধুরী চরিত্রের প্রভাব পড়েছে। বাঙ্গালী বীর মোহনলালও ক্রমে এক দেশনায়কে পরিণত হয়েছেন। এই দুইটি চরিত্র সৃষ্টিতেই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে নিশিকান্ত বসুরায়ের বঙ্গে বর্গীর অনুসরণ মনে হওয়া স্বাভাবিক। নবীনচন্দ্র সেন পলাশীর যুদ্ধে রাজা রাজবল্লভকে যে বৃহৎ ভূমিকা দিয়েছেন সেটা অনুসরণ করেই শচীন্দ্রনাথ রাজবল্লভকে এক মুখ্য চরিত্র করেছেন। নবীনচন্দ্র ২০ বছর বয়সে পলাশীর যুদ্ধ রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র সিরাজদৌল্লা রচনা করেন ৬০ বৎসর বয়সে। (গিরিশচন্দ্রের প্রতি নবীনচন্দ্রের পত্র। গিরিশ রচনাবলী। প্রথম খণ্ড। সাহিত্য সংসদ সংস্করণ। পাতা পঁয়ষট্টি।) শচীন সেনগুপ্ত ৪০ বৎসর বয়সে সিরাজদৌল্লা রচনা করেন। ইতিহাস অনুসারী গিরিশচন্দ্রের বিজ্ঞতা বা তরুণ নবীনচন্দ্রের সাবধানতা কোনটাই শচীন্দ্রনাথের রচনায় দেখা যায় না।

ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম বা চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে সংযম শচীন্দ্রনাথের রচনায় নাই। তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণ ভাবালুতা এবং ভাবালুতার পরাকাষ্ঠা তাঁর নাটকে আছে। এই নাটকের জনপ্রিয়তা এই ভাবালুতার বিজয় ঘোষণা করে। অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতার মতোই শচীন্দ্রনাথ তার নাটককে ইতিহাস অনুসারী বলেছেন। তার ভূমিকাতেই পরস্পর বিরোধী কথা আছে। প্রথমে তিনি বলছেন 'ইতিহাস ঘটনাপঞ্জি। নাটক তা নয়। ঐতিহাসিক লোকের জীবনের মাত্র একটি ঘটনা অবলম্বন করেও একাধিক নাটক রচনা করা যায়। যায় এই জন্যই যে, ঘটনা নয়, ঘটনাটি ঘটবার কারণই নাট্যকারের বিষয়বস্তু।' (ভূমিকা, সিরাজদ্দৌলা)। সুতরাং মনে হওয়া স্বাভাবিক যে শচীন্দ্রনাথ এই জবানবন্দী করেছেন তাঁর কল্পনার 'সিরাজ' সম্পর্কে নাটক রচনার জন্য। কিন্তু পরের কথাগুলো অন্য রকম। 'সিরাজদ্দৌলার জীবনের ঘটনা ঐতিহাসিকরা লিখে গিয়েছেন। যাঁরা স্বার্থের খাতিরে সিরাজ-চরিত্রে নানা কলঙ্ক আরোপ করে গেছেন, তাদের কুকীর্তি আজ ধরা পড়েছে সত্যাশ্রয়ী ঐতিহাসিকদের সত্যানুসন্ধানের ফলে। সিরাজদ্দৌলা নাটকে আমি শেষোক্ত ঐতিহাসিকদের নির্দেশ মত সিরাজকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি।' কাজেই শেষ পর্য্যন্ত তিনি সিরাজদৌল্লাকে ঐতিহাসিক চরিত্র বলে দাবী করেছেন। তাঁর নাটককে সত্যানুসন্ধানী ইতিহাস রচয়িতাদের অনুযায়ী বলে প্রচার করেছেন। সুতরাং এই নাটকে কতখানি ইতিহাস অনুসৃত হয়েছে তার বিচারের প্রয়োজন হচ্ছে। ভূমিকাতেই নাট্যকার তাঁর ইতিহাস জ্ঞানের যে প্রমাণ দিয়েছেন তাতেই আশ্চর্য্য হবার উপকরণ আছে। বাঙ্গালীর চরিত্র সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার পর শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'সিরাজ ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী। তাই তার পরাজয়ে বাংলারও পরাজয় হল। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীও হল পতিত।' নবাব আলিবর্দীর ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে জানান হয়েছে যে আলিবর্দীর পিতা ও পিতামহ জাতিতে ছিলেন আরব। আলীবর্দীর মাতা খুরাসানের আফসার বংশীয় তুর্কী। মায়ের সম্বন্ধ সূত্রেই মুর্শিদকুলি খাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তা ছিল। আলিবর্দীর জন্ম দাক্ষিণাত্যে, কর্ম মোগল দরবারে, জজোএর যুদ্ধের পর আলিবর্দী সপরিবারে পালিয়ে গেলেন উড়িষ্যার সুজাউদ্দিনের দরবারে। এখানেই কিছুদিন পর মক্কা পলাতক

জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহমদ (আলিবর্দীর থেকে দশ বছরের বড়) তাঁর তিনপুত্র নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সকলেই নবাব সরকারে নিযুক্ত হলেন। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে সুজাউদ্দিন বাংলার সুবেদার ও নবাব হলে আলিবর্দীকে প্রথমে রাজমহলের ফৌজদার ও পরে পাটনার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল। এরই মধ্যে হাজী আহমদের তিনপুত্রের সঙ্গে আলিবর্দীর তিন কন্যার বিবাহ হয়েছে। সিরাজের জন্ম ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায়। বাল্যকাল কেটেছে পাটনায়। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দী নবাব হবার পর সাত বছরের সিরাজকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। সুতরাং সিরাজের মুর্শিদাবাদে আসার সময় ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ। পরবৎসর ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বর্গীর হাঙ্গামা সুরু। সুতরাং সিরাজদৌল্লা বা তার উর্দ্ধতন চতুর্দশ পুরুষ যে বাঙ্গালী ছিলেন না একথা বলাই বাহুল্য। সিরাজদৌল্লা বাংলাভাষা জানতেন একথা মনে করবার কোন প্রমাণ নাই। রাজকার্য্য পরিচালিত হত ফারসীভাষায়। সে যুগের সেটাই ছিল সকলের কথ্য ভাষা। সিরাজ এবং তার পার্শ্বচররা মোহনলাল এবং তার ভগিনী লুৎফউন্নিসা সকলেই এই ভাষাতেই কথা বলতেন। বাঙ্গালীর স্ত্রীলোক অপহরণ করে এনে উপভোগ করা এবং সে সময় তাদের অনুনয় বিনয় শ্রবণ বাংলাভাষার সঙ্গে সিরাজদৌল্লার একমাত্র প্রমাণিত যোগাযোগ।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর সিরাজদ্দৌলা নাটক তিন অঙ্কে ১৫৪ পাতায় শেষ হয়েছে। এছাড়া ভূমিকা, উৎসর্গ ও চরিত্র লিপি প্রভৃতির জন্য আরও ৮ পাতা আছে। প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য ১ থেকে ৬৫ পাতা দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য ৬৬ থেকে ১১৮ পাতা ও তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য ১১৯ থেকে ১৫৪ পাতা। এছাড়া সাদা-কালোয় পাঁচখানি অভিনয়ের ছবি আর্ট পেপারের একদিকে মুদ্রিত হয়ে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রকাশকাল ১৩৪৫, মূল্য পাঁচসিকা। প্রথম অভিনয় রজনী ২৯শে জুন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। নাট্যনিকেতনে নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনা করেন প্রবোধচন্দ্র গুহ ও পরিচালনা করেন নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ও সতু সেন। বাণীবিনোদ নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীকে নাটক উৎসর্গীকৃত। ভূমিকা লিপিতে দেখা যায়, সিরাজ—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, গোলাম হোসেন—রবি রায়, ওয়াটস—ভূপেন চক্রবর্তী, আলেয়া—শ্রীমতী নীহারবালা, লুৎফা—শ্রীমতী সরযূবালা ও ঘসেটি বেগম—শ্রীমতী নিরুপমা।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য হিরাঝিলের দরবার কক্ষ। দ্বিতীয় দৃশ্য মতিঝিলে ঘসেটি বেগমের প্রাসাদ ও তৃতীয় দৃশ্য ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি। প্রথম দৃশ্যকে যদি আলিবর্দীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরের ঘটনা বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে প্রথম অঙ্কের তিনটি দৃশ্যে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল থেকে ওই বছরের ২রা-৩রা জুনের ঘটনাবলী বলা হয়েছে। নাটকের সুরুতেই হিরাঝিল দরবার কক্ষে রাত্রিকালে একাকী নবাবের কণ্ঠে অধুনা বিখ্যাত সংলাপ শোনা যায়—'বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান অধিপতি। তোমার শেষ উপদেশ আমি ভুলিনি জনাব। ইউরোপীয় বণিকদের উদ্ধত ব্যবহার আমি সহ্য করব না। তোমার রাজ্যে আমি তাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দেব না।' এই প্রথম কয়েক ছত্রেই নাট্যকার তাঁর নাটকের চরিত্র স্থির করে দিয়েছেন এবং সেইসঙ্গে ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা সুরু করেছেন। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে, স্বর্গত নবাবের সম্মানের জন্যেই বর্তমান নবাব তাকে উড়িষ্যার নবাব বলেও অভিহিত করেছেন, কারণ ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে উড়িষ্যা যে মারাঠা অধিকারে চলে গিয়েছে এটা তার অজানা থাকতে পারেনা। কিন্তু সব ইউরোপীয় বণিকদের উদ্ধত ব্যবহার কোথায় হল। ফরাসীরা নবাবের বন্ধু ছিল, ওলন্দাজদের সঙ্গেও অসদ্ভাব ছিল না। দিনেমার ও জার্মানীর বণিককুল সবরকম নবাবী আবদার সহ্য করতেন। একমাত্র ইংরেজদের নবাব আলীবর্দীর সময় পরাক্রান্ত হতে দেখা যায়। নবাবী আদেশে প্রথমে কলকাতায় ও পরে কাশিমবাজারের ইংরেজ বাসস্থান সুরক্ষিত করার সুযোগ পেল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। মারাঠা আক্রমণের ভয়েই নবাব ইংরেজদের আত্মরক্ষার আদেশ দিয়েছিলেন। একটু পেছনে তাকিয়ে নবাব আলিবর্দীর ইংরাজদের সঙ্গে ব্যবহারের নিদর্শনগুলি পরীক্ষা করা যাক। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এপ্রিল ইংরেজরা লণ্ডনের পরিচালকমণ্ডলী-কে খবর দিয়েছেন—আমরা কাশিমবাজারের স্যার ফ্রান্সিস রাসেলের কাছ থেকে গত ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল খবর পেয়েছি যে কাশিমবাজারে মারাঠা-আক্রমণ হতে পারে। বর্ধমান রাধানগর ও অন্যান্য জায়গা থেকে আমাদের ব্যবসায়ীরা এই খবরই এনেছে।' এই খবর পাওয়া মাত্র কলকাতা থেকে কুঠি রক্ষার জন্য একটি বড় শক্তিশালী সৈন্যদল কাশিমবাজারে পাঠান হল। মারাঠাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য কুঠির চারধারে উঁচু প্রাচীর ও

মাঝে কামান বসাবার গম্বুজ (Bastion) তৈরী করা হল। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে চারটি গম্বুজ তৈরী করে চারটি কামান বসানো হয়েছে। লণ্ডনে চিঠি লেখা হল যে কুঠি এখন দুর্ভেদ্য। তবে ভাবনা গেল না। আশঙ্কা হল যে নবাব প্রতি গম্বুজের জন্য আলাদা নজরানা দাবী করবেন। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত নবাবী সমন না পেয়ে ইংরেজ কোম্পানী অবাক হল। লণ্ডনের চিঠিতে লেখা হল যে সম্ভবত যুদ্ধের সময় বলেই নবাব প্রতিরক্ষার এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেছেন। ইংরেজ কোম্পানীকে কিন্তু দুর্গ তৈরী করার জন্য নবাব দোষারোপ করেননি বা কখনও নজরানা চাননি।[৬০] বরঞ্চ ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাদের ওপর অন্যরকম চাপ এল। নবাব জানালেন যে আগে ইংরেজ কোম্পানীর মাত্র চার পাঁচখানি জাহাজ ছিল, এখন তাদের চল্লিশ-পঞ্চাশখানা জাহাজ কাশিমবাজার বন্দরে যাওয়া আসা করে। তার ওপর নবাব তাদের কলকাতা শহরের রক্ষক সুতরাং যুদ্ধের আংশিক ব্যয়ভার স্বরূপ ইংরেজ কোম্পানীর কাছে ১৫ লক্ষ টাকা তার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত দাবী। অবশেষে কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ জন ফস্টার ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বরের চিঠিতে কলকাতা কাউন্সিলকে আশ্বস্ত করে জানাচ্ছেন যে নবাব শেষ পর্য্যন্ত সাড়ে তিন লক্ষ টাকা নিতে সম্মত হয়েছেন এবং বিনিময়ে এক পরোয়ানা জারি করে কোম্পানীর হুগলী, পাটনা, ঢাকা ও বিভিন্ন আড়ঙ্গের বাণিজ্য অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। নবাব এই অর্থ পেয়ে খুব খুসী হন এবং কলকাতা কাউন্সিলের প্রধানকে একটি হাতী ও শিরোপা উপহার দেন। কলকাতা কাউন্সিল তখন নবাবকে একটা আরবী ঘোড়া উপহার দেন। নবাব বহিঃশত্রুর আক্রমণে কোম্পানীর সৈন্যসাহায্যের প্রস্তাব করেন কিন্তু ইংরেজ কোম্পানী তাতে রাজী হলেন না।[৬১] কাজেই ১৭৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দের নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বেশ বোঝাপড়া ছিল এটা বোঝা কঠিন নয়। পরবর্তীকালে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের যে সদ্ভাব ছিল সেটা ইংরেজদের ব্যবসার প্রসার দেখলেই বোঝা যায়। মারাঠা সন্ধি হবার আগে পর্যন্ত ইংরেজদের জগৎশেঠের কাছে ঋণের পরিমাণ ছিল ৫১২৮২০ টাকা মাত্র।[৬২] অথচ পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী, ৩৩৬৬০৫০ টাকা বাংলার ব্যবসায়ে লগ্নী করেন, তার মধ্যে কেবল কাশিমবাজারেই ৫৬৮৪০০ টাকা ব্যবসায় প্রসারে লগ্নী করা হয়।[৬৩] নবাবের সঙ্গে

বিরোধের কোন অবকাশ থাকলে ব্যবসায়ের লেন-দেনে ইংরেজ কোম্পানী সাবধান হতেন। কিন্তু তা হয়নি। তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে ব্যবসায়ের প্রসার করেছেন। এমন কি তাঁদের আশ্রিত ব্যক্তিরাও এই শান্তির আবহাওয়ায় নিশ্চিন্তে সম্পত্তি সংগ্রহ করেছেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দী দেশের শান্ত পরিবেশেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আবার নাটকের প্রথম দৃশ্যে ফিরে যাওযা যাক। আলেয়া ও গোলাম হোসেন নামে দুইটি কল্পিত চরিত্র নাট্যকার উপস্থাপনা করেছেন। আগেই বলা হয়েছে এরা গিরিশচন্দ্রের করিমচাচা ও জহরার জায়গা নিয়েছে। গোলাম হোসেনও করিমচাচার মতো হিন্দু দেশপ্রেমী নাম পুরন্দর। নবাবকে ভালবেসেই তিনি নবাবের ভাড় ও বান্দা সেজে থাকেন। আলেয়ার পরিচয়ে বলা হয়েছে তিনি মোহনলালের ভগিনী। পর্তুগীজ দস্যু তাকে অপহরণ করায় সমাজে তার স্থান হয়না তাই তিনি নর্তকী বৃত্তি গ্রহণ করে নবাবের জন্য গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করেন। এই দুইটিই কাল্পনিক ও থিয়েটারী চরিত্র বটে তবে সেই সঙ্গে অসম্ভব চরিত্রও। অষ্টাদশ শতাব্দীর হিন্দু-সমাজের গঠন সম্পর্কে যাঁদের সামান্যতম জ্ঞান আছে তারাই বুঝতে পারবেন হিন্দু পুরন্দরের মুসলমান গৃহে থাকা কিরকম অসম্ভব কল্পনা—মুসলমান সেজে থাকার কথা বাদ দিলাম। ১৭৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সমাজে হিন্দু-মুসলমানে যেমন বিরোধ ছিলনা তেমনি মাথামাখি ছিলনা। উভয় সমাজই নিজগণ্ডীর মধ্যে বাস করতেন। মুসলমান বাবুর্চির হাতে চপ কাটলেট খাওয়া হিন্দু পেট্রিয়ট আধুনিক ঘটনা—অষ্টাদশ শতব্দীতে এমন হলে জাতিপাত ঘটত। যেমন হয়েছিল রাজা মোহনলালের জীবনে। তিনি কেবল নামেই হিন্দু ছিলেন। নবাবকে ভগ্নীদান করেই তিনি ক্ষান্ত থাকলেন না। মুসলমানকে কন্যাদানও করেছিলেন। সেজন্য তাকে কেউ দোষারোপ করেনি কেবল তার সম্পর্ক এড়িয়ে চলেছে। গোলাম হোসেনকে যদি এই রকম হিন্দু মনে করা হয় তাহলে তাকে ছদ্মবেশী হিন্দু দেখাবার কোন সার্থকতা থাকেনা। আলেয়ার নর্তকী চরিত্রও এমনি অসম্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুই রকম নর্তকী পাওয়া যায়। এক রকমের নর্তকী অর্থবানরা টাকা দিয়ে কিনে পুষতেন। যেমন নর্তকী ফৈজীকে সিরাজ কিনে পুষেছিলেন। আর এক রকমের নর্তকী ছিলেন যারা দলবদ্ধ হয়ে বিচরন করতেন বা কোন সহর অঞ্চলে বসবাস

করতেন। একক নর্তকীর প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় টিকে থাকার কোন সুযোগ ছিলনা। হয় তাকে যূথবদ্ধ হতে হবে নয় কোন রক্ষকের সম্পত্তিতে পরিণত হতে হবে। আলেযার পবিকল্পনা এসেছে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাঈজীদের দেখে। মনে রাখা দরকার যে এবা ইংরেজ পরবর্ত্তীযুগের সৃষ্টি। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সর্বোপারি আইনের শাসন প্রবর্তিত হবার পর যে কোন একক ব্যক্তির পক্ষে নিজের ইচ্ছামতো জীবনধারণ করা সম্ভব ছিল। কলকাতার বাঈজীরা এক বাবুর কাছ থেকে অন্য বাবুর কাছে গেলেও নিজেদের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পারতেন। নিজ ইচ্ছামত জীবন-যাপন করতেন। এই অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যতেও তাই কাশিমবাজার কুঠিতে আলেয়ার নৃত্যগীত যেমন অসম্ভব তেমনি অসম্ভব জগৎশেঠ বা রাজা রায়দুর্লভেব সেখানে বসে সেই গান-বাজনা উপভোগ করা। এই অপরাধে উভয় হিন্দুর জাতিপাত ঘটা সম্ভব ছিল। বাজীরাও-এর দৃষ্টান্ত দেখলেই বোঝা যাবে। সাম্রাজ্যের সব থেকে ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হলেও মুসলমান রক্ষিতা রাখার অপরাধে, (বাজীরাও প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) নিজের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের উপনয়ন ও বিবাহে তিনি উপস্থিত থাকার অধিকার হারিয়েছিলেন। ইংরেজ রাজত্বে এই প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ে, তার আগে নয়।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই নাট্যকারের আরেক কীর্তি অবাক করে দেয়। লুৎফউন্নিসার নাম ছেটে তিনিই তাকে লুৎফা করেছেন। লুৎফা কথার কোন মানে হয়না। ছোটবেলার গল্পের সেই মর্জ্জিনালির মতো নাট্যকাব কেন হঠাৎ লুৎফউন্নিসা বা লুৎফউন্নেসাকে একেবারে লুৎফা কবলেন বোঝা যায়না। লুৎফ মানে ভালবাসা এবং নেসা বা ন্নেসা মানে স্ত্রী। লুৎফউন্নিসা বা লুৎফউন্নেসা মানে প্রিয়তম রমণী বা প্রিয় স্ত্রীলোক। কিন্তু লুৎফা শব্দের কোন মানে নাই। এই নাটকেও গিরিশচন্দ্র অনুকরণে 'লুৎফা' বা লুৎফ-উন্নিসা নবাবের মহিষী। লুৎফার সংলাপ "এটি কি নবাবের নতুন আমদানী ?" (পাতা ৯) পড়ে সন্দেহ হয় যে নাট্যকার নবাবের বহু রমনীগমন ও রক্ষন সম্পর্কে ইঙ্গিত করছেন। একটু পরেই নবাব মহিষী বলছেন—'শুনিচি এ দরবারে বীর মীরজাফরের, বিচক্ষণ রাজবল্লভের, ধনকুবের জগৎশেঠের আসন টলে উঠেছে। নবাব কি এখন থেকে ওই নর্তকীর মতো নারীদের নিয়েই দরবারে বসাবেন ?' (পাতা ১০) যদি এই উক্তিকে মীরজাফর ও

রায়দুর্লভের পদচ্যুতির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করা যায় তাহলেও বেগমের অজ্ঞতা অসামান্য। রাজবল্লভ কখনই যে নবাব সরকারের চাকর নন এটা তাঁর জানা উচিত। রাজবল্লভ চিরকালই ঘসেটি বেগমের বেতনভোগী। এই নাটকে জগৎশেঠ ভ্রাতৃযুগল এক সঙ্গে মিলে একজন হয়ে গেছেন। তার হালচাল কথা শুনলে তিনি যে রাজত্বের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মনে হয়না— সন্দেহ হয় তিনি বুঝি নবাবের ধনাধ্যক্ষ। বেচারা রায়দুর্লভ এই নাটকে পার্শ্ব চরিত্র। বাংলায় সুবেদারের প্রধান কর্মচারী মহারাজা রায়দুর্লভের এই পরিণতি দুঃখের সন্দেহ নাই। এই সময়ে নবাবের সুনজরে আসার জন্য আসল রায়দুর্লভ দুইটি জরুরী কাজ করেন। প্রথম কাজ শওকতজঙ্গের বন্ধুত্ব সংগ্রহ তথা আনুগত্য লাভ। দুর্লভরাম একদল সৈন্য নিয়ে শওকতজঙ্গের ভীত মনের পূর্ণ সুযোগ নিলেন। যার ফলে কলকাতা জয়ে যাত্রা করবার সময় শওকতজঙ্গ সিরাজের অনুরোধে চার হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। এরা কলকাতার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। অবশ্য তাদের প্রতি গোপন নির্দেশ ছিল যে সিরাজদৌল্লা হারছে দেখলেই তারা নবাবের শিবির লুট করে পূর্ণিয়াতে প্রত্যাগমন করবে। কলকাতা জয়ের গৌরবও সবাই রায়দুর্লভ এবং তার সুযোগ্য সহকারী মীরমদনকে দিয়েছেন। দুটি ঘটনাই ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রায়দুর্লভের অন্য চেহারা। প্রচণ্ড সিরাজভীতি তাকে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান ব্যক্তিদের অন্যতম করেছে। এই বছরে তাই দেখা যায় রায়দুর্লভ দু'হাতে ঘুষ নিচ্ছেন। অর্থ সংগ্রহের যত গোপন পথ আছে সবই তিনি কাজে লাগিয়েছেন। এমনকি ল সাহেবের কাছ থেকে সোনা ও রোকড়ে ১৫০০০ টকা এবং ২৫০০০ হাজার টাকার হাতচিটা আদায় করেন চন্দননগর রক্ষায় যাবার জন্য।[৬৪] কথিত কর্ণেল ক্লাইভের কাছ থেকে উপঢৌকন পেয়ে তিনি মধ্যপথ থেকে ফিরে আসেন। এহেন চরিত্র রায় দুর্লভরাম নাটকের উপযুক্ত কিন্তু শচীন্দ্রনাথ তাঁকে মোটে ব্যবহার না করায় ইতিহাস ব্যাহত হয়েছে। আর এক বিষয়ে রায়দুর্লভ উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর পুত্র রাজা রাজবল্লভ পরে কলকাতার দেওয়ান নিযুক্ত হন। ইংরেজ রাজার সেবা করার সরাসরি সুযোগ রাজবল্লভ পেয়েছেন। যখনই কোন অসুবিধায় পড়েছেন তখনই এক দীর্ঘ আর্জির অবতারণা করে তার পিতা ইংরেজ কোম্পানীকে কতোরকম সাহায্য করেছেন তার উল্লেখ করা

হয়েছে। বলাবাহুল্য রায়দুর্লভ পুত্র, কায়স্থ রাজা রাজবল্লভ ও ঘসেটি বেগমের দেওয়ান বৈদ্য রাজা রাজবল্লভের মধ্যে প্রায়ই ভুল করা হয়। বৈদ্য রাজবল্লভ ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাসকে ১১৭০ সালে বা ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীর-কাশিমের আদেশে বধ করা হয়। রাজবল্লভের সপ্তপুত্র, রামদাস, কৃষ্ণদাস, রতনকৃষ্ণ, গোপালকৃষ্ণ, গঙ্গাদাস, কেবলকৃষ্ণ, ও রাধামোহন। রামদাসের মৃত্যু হয় ১১৫৫ সালে বা ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, রতনকৃষ্ণ মারা যান ১১৬৯ বা ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। রাজা গঙ্গাদাস ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারীর অধিকর্তা এবং কায়স্থ রাজা রাজবল্লভের সমসাময়িক ছিলেন।[৬৫]

সিরাজদৌল্লার প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নাটকীয়তা আছে কিন্তু ঐতিহাসিকতা নাই। নবাব গুপ্তচর সন্দেহে আলেয়াকে হত্যার আদেশ দিলেন। মোহনলালকে ডাকা হল। সে তার ভগ্নীকে চিনতে অস্বীকার করল। তখন নবাবের আদেশ এক ধমকে প্রতিপালন করা বন্ধ করে বান্দা গোলাম হোসেন মোহনলালকে সত্য কথা বলতে অনুরোধ করল। মোহনলাল জানাল আলেয়া তার ভগ্নী। নবাবের জন্য সংবাদ সংগ্রহ তার পেশা। অবশেষে কাশিমবাজার কুটিতে দেখা হবার প্রতিশ্রুতিতে আলেয়ার মুক্তি। দ্বিতীয় দৃশ্যে ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদ। রাজবল্লভ জানাচ্ছেন যে সিরাজ রাজ্য পরিচালনায় খুবই পারদর্শী। এটাও অসম্ভব ঘটনা। রাজত্ব পাবার কয়েকদিনের মধ্যে ঘসেটির সম্পত্তি অপহরণ করে তাকে বন্দী করা হয়। এই কয়দিনে সিরাজের রাজ্য পরিচালনায় দক্ষতা প্রমাণের কোন সুযোগই নাই। অবশেষে নবাব বেগম 'লুৎফা'কে পাঠিয়ে ঘসেটিকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। রাজবল্লভ খোজা দেহরক্ষীর অভিনয় করে প্রাণে বাঁচলেন। সবই নাটক। হিন্দু রাজা বা সম্ভ্রান্ত বংশীয়ের পক্ষে খোজা দেহরক্ষীর পোষাকাদি পরিধান করা যে কত কঠিন তা সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধ লোকের জানার কথা নয়। এই নাটকের ছত্রে ছত্রে প্রতি পদক্ষেপে অজ্ঞতার ছবি পাওয়া যায়।* ইংরেজ সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে

* দৃশ্যের শেষে সৈন্যবাহিনীর অধিকর্তা রায়দুর্লভ চিনতে পারেন রাজবল্লভকে। রাজবল্লভ বলেন—'প্রচুর পুরস্কার পাবেন।' রায়দুর্লভের সংলাপ—'সুদিনে এ অধীনকে স্মরণ রাখবেন।' (পাতা ৪৩)। স্পষ্ট বোঝা যায় যে রায়-দুর্লভের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে নাট্যকার সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

পালিত নাট্যকার গণতন্ত্রের পাঠ পড়েছেন, পড়েছেন মিল বেন্থাম রুশো। তাঁর সিরাজদৌল্লা ইংরেজী সংস্কৃতিব জারকে জীর্ণ এক নব যুবক, প্রাচীন নবাব-সুবেদারের সঙ্গে তাঁর কোন মিল নাই। এই বিংশ শতাব্দীর আব-হাওয়াই পাওয়া যায় প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে কাশিমবাজার কুঠির জলসায়।

কাশিমবাজার কুঠিতে নবাব সিরাজদৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ষড়যন্ত্রের নায়ক ইংরেজ ওয়াটস ও মীরজাফর, সঙ্গী রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, আমীরচাঁদ এছাড়া ডঃ ফোর্থ, পাদরী লং নামে দুটি চরিত্র রয়েছে। সকলে মিলে জলসার মাঝেই স্থির করে ফেললেন যে সিরাজের ঔদ্ধত্ত আর সহ্য করা হবেনা। তাকে পদচ্যুত করে মীরজাফর গদীলাভ করবেন। আলোচনা শেষ হওয়া মাত্র নবাবের কামানধ্বনি শোনা গেল। ইংরেজগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলেন কিন্তু রাজবল্লভ আত্মসমর্পণের উপদেশ দেওয়ায় ওয়াটস আত্মসমর্পণ করতে রাজী হলেন। নবাব এলেন এবং সিপাহশালার ও রাজবল্লভকে সঙ্গে করে কলকাতা যাবেন স্থির করলেন কারণ তাঁরা শেয়াল ও প্যাচার সামিল। নর্তকী আলেয়াকে গুপ্তচরবৃত্তিতে সাফল্যলাভের জন্য মুক্তার মালা গলা থেকে খুলে দিলেন নবাব। হিন্দু মতে বা হিন্দু দর্শকের চোখে সিরাজ আলেয়াকে স্বীকৃতি দিলেন। এখানেও রায়দুর্লভকে নবাবের বিশ্বাসী এক সৈন্যাধ্যক্ষ করা হয়েছে। গোলাম হোসেন হয়েছেন তাঁর রাজনৈতিক উপদেষ্টা।

এই দৃশ্যের কোথাও ইতিহাস নাই বললে কিছুই বলা হল না। কষ্ট কল্পনার এক সুবৃহৎ দৃষ্টান্ত রূপে এই দৃশ্যটি চিরকাল অঙ্কিত হবে। গিরিশচন্দ্রের প্রভাবের বিপুলতা ছাড়া আর কোন সারবস্তু এ দৃশ্যে নাই। তাঁর প্রভাবেই মীরজাফর এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারী হয়েছেন। ল সাহেব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে মীরজাফরের সাহায্য ছাড়া সিরাজদৌল্লা কখনই নবাব হতে পারতেন না। আলিবর্দী খাঁ মীরজাফরকে ভালবাসতেন! সিরাজদৌল্লাকে নবাব করার বিষয়ে আলিবর্দীর সন্দেহ হলে মীরজাফর তা নিরসন করেছেন। এই প্রভুভক্ত সাহসী সৈন্যাধ্যক্ষের জোরেই প্রথমে সিরাজ নির্বিঘ্নে নবাব হয়েছেন। অথচ নবাব হবার পর সর্বপ্রথম অপমানিত করেছেন এই মীরজাফরকে।[৬৬] মীরজাফর নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সব শেষে যোগ দেন। তিনি যোগ দেবার পরে ষড়যন্ত্রকারীরা আশ্বস্ত হন। মীরজাফর ছাড়া অন্য যে সব প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত মুসলমান নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে-

ছিলেন তাদের উল্লেখ কোন নাট্যকারই করেন নি—তাঁরা হলেন আমীর খোদাদদ খাঁ বা খোদা ইয়াব লতিফ খাঁ। ইনি দিল্লীর আমীর বলে নিজের পরিচয় দিতেন। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় তাকে নবাব করার জন্য সংগ্রহ করেন। পরে মীরজাফর এবং তার ভাই মীর দাউদ খাঁ ষড়যন্ত্রে যোগদান করলে মীরজাফরকেই নবাব করা স্থির হল। এরা ছাড়া নবাবের সভাসদ উমর বেগ, কটকের মুসলমান ফৌজদার এবং ভূতপূর্ব নবাব সরফরাজ খাঁর পুত্রদ্বয় ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে ল সাহেব লিখে গেছেন।

আলেয়ার নৃত্যগীতের মধ্যে ষড়যন্ত্র চলছে এমন হাস্যকর ঘটনা বাংলা থিয়েটার ছাড়া আর কোথাও সম্ভব নয়। ভুলের ফিরিস্তি করা যাক। কোন ষড়যন্ত্র কখনও কাশিমবাজার কুঠিতে হয় নাই। সিরাজ ইংরেজদের অপছন্দ করতেন সেজন্য তাদের দিকে কড়া নজর রাখতেন। কোন সুযোগ পেলে ইংরেজ কুঠি ধ্বংস করতে তিনি দ্বিধা করবেন না এটা সুবিদিত ছিল। স্পষ্ট ষড়যন্ত্রের কোন নাটকীয় চেষ্টা হয় নাই। একে একে লুকিয়ে লুকিয়ে আলোচনা চলেছে বলেই সিরাজদৌল্লা বুঝতে পারেন নাই। ষড়যন্ত্র করার প্রধান এক স্থান ছিল কাশিমবাজারে জগৎশেঠের গদী। ইংরেজ কুঠির প্রায় উল্টো দিকে তার অবস্থান ছিল। এই বাড়ীতে যাওয়া আসা টাকা ধার নেবার ছুতোয় সহজেই করা যেত। দ্বিতীয় ভুল, জলসা তখন এভাবে হত না। ২রা ৩রা জুনের কথা বাদ দিলাম—এই রকম জলসা সে বছর কোথাও হয়েছে কি না সন্দেহ। এ সম্পর্কে আগেও দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আমীর চাঁদ এ সময় কলকাতার ইংরেজ কারাগারে বন্দী সুতরাং তার পক্ষে জলসায় উপস্থিত থাকা অসম্ভব। রাজবল্লভ এ সময় হয় নবাব কারাগারে বন্দী নয় পলাতক। ইতিহাসে এ সময়ে তার কোন চিহ্ন নাই সুতরাং জলসায় তার পক্ষে প্রকাশ্যে এই রকম গলাবাজী করা অসম্ভব। মীরজাফর এ সময়ে ষড়যন্ত্রে যোগ দেননি সুতরাং তাঁর উপস্থিতি কষ্ট কল্পিত। পাদরী লং নামে কোন ব্যক্তি তখন কুঠিতে ছিলেন না। নবাবের আগমনে ওয়াটস যুদ্ধ করবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করেন নি। নিজের রুমালে হাত বেঁধে কুঠির বাইরে নবাব যেখানে হাতীর ওপর বসেছিলেন সেইখানে ছুটে গিয়ে হাতীর সামনে নতজানু হয়ে 'তোমার গোলাম, তোমার গোলাম,' বলে চীৎকার করে কেঁদেছেন। বস্তুত ক্লাইভ-ওয়াটসনের আসার আগের ইংরেজ এবং পরের

ইংরেজে আকাশ পাতাল প্রভেদ। বিনাযুদ্ধে কুঠি নবাবকে ছেড়ে দেবার জন্য ওয়াটস সাহেব লাঞ্ছনা ভোগ করেন এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য কি না বিচার করতে যথাযথ ব্যবস্থা হয়। ওয়াটসের আত্মসমর্পণে ক্ষুব্ধ হয়ে কাশিমবাজার কুঠির ইংরেজ সেন্যাধ্যক্ষ লেফটেন্যাণ্ট এলিয়ট নিজের মাথায় গুলি মেরে আত্মহত্যা করেন।[৬৭] নবাব, ওয়াটস এবং তার সহকারী কোলেট সাহেবকে সঙ্গে করে কলকাতায় যুদ্ধযাত্রা করেন নি। তাঁরা মুর্শিদাবাদে বন্দী হয়ে থাকেন। কলকাতা জয়ের পর জুলাই মাসে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। কাজেই এ দৃশ্যটি যে সম্পূর্ণ কল্পনা সে বিষয়ে সন্দেহের লেশমাত্র নাই।

দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্য কলকাতা জয়ের পর নবাবের দরবার। দ্বিতীয় দৃশ্য আলেয়ার দ্বিতলের কক্ষ এবং তৃতীয় দৃশ্য পলাশীর প্রান্তর। এই অঙ্কে নাট্যকার ইতিহাসকে কি ভাবে উপেক্ষা করা যায় তা দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে পরবর্তী নাট্যকারগণ তাঁকেই অনুসরণ করেছেন। গিরিশচন্দ্র কখন ইতিহাসের ওপর হামলা করেন নি—শচীন্দ্রনাথ করেছেন এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অন্যেরা অনুকরণ করেছেন। দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য সুরু হয়েছে কলকাতা জয় ও ওয়াটসের মুক্তির পর সুতরাং হওয়া উচিত ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই আগষ্ট মাস। এই দৃশ্যেই ক্লাইভ ওয়াটসন প্রসঙ্গ আছে। এঁরা ডিসেম্বর জানুয়ারী ১৭৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে বাংলার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন নাই। ক্লাইভ ভারতে আসেন ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে। এদিকে লা সাহেবের সাবধানবানী রয়েছে সুতরাং সময় সরে আসছে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ এপ্রিল মাসে। তাহলে ৫ই ফেব্রুয়ারীর কলকাতার যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় ও পলায়নের উল্লেখ নাই কেন? চন্দননগর জয়ের কথা আছে। পলাশীতে সৈন্য সমাবেশের কথা আছে। সময় এবার এক ধাক্কায় সরে যায় জুন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। এর মধ্যে সিরাজের বাদশাহী ফরমান পাবার কোন উল্লেখ নাই, উল্লেখ নাই সিরাজের আহমেদশাহ আবদালী ভীতি বা ১৭৫৭র ইংরেজ ভীতির। সিরাজের ১৪ মাসের রাজত্ব থেকে নাট্যকার পুরো এক বছর অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা বাদ দিয়ে বসে আছেন। তিনি সিরাজ চরিত্র নিজ ইচ্ছায় অঙ্কিত করেছেন। গ্রহণ করেছেন কেবল ১৭৫৬র এপ্রিল, মে ও জুনের ঘটনা এবং ১৭৫৭র জুনের ঘটনা। এই বারমাসের ঘটনা বাদ দিলেও নাট্যকার কিন্তু তাঁর রচনাকে

ঐতিহাসিক আখ্যা দিতে ছাড়েন নাই। ইতিহাস-অজ্ঞ সাধারণ দর্শকদের প্রতি নাট্যকারের এই ব্যবহার কেবল ক্ষমার অযোগ্য নয় সম্পূর্ণ ভাবে তাদের সরলতার হীন সুযোগ নেবার সামিল। ভারতবর্ষে জাতীয় ইতিহাস বিকৃত করা অপরাধ নয, জাতীয় ইতিহাসকে ক্ষুন্ন করলে কোন শাস্তি পেতে হয় না। তাই কিছু লোক ইতিহাসের নামে নিজ কপোল কল্পনাকে ইতিহাস বলে পরিবেশন করার সাহস পেয়েছেন। সুতরাং দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনায ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম জুন থেকে ২৩শে জুনের ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

প্রথম অঙ্ক থেকেই নবাবের গালবাদ্য চলেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের মন্ত্রে নবাবের চোখ সজল হয়েছে। সভাসদরা অর্থাৎ মীরজাফর জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ তাদের উষ্মা প্রকাশ করেছেন। মোহনলাল মীরমদন নবাবী পক্ষ সমর্থন করছেন। অবশেষে নবাব রায়দুর্লভ, ইযারলতিফ, মোহনলাল, মীরমদন ও সিনফ্রেকে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে পলাশীতে উপস্থিত থাকতে আদেশ করছেন। ঘসেটি বেগম অভিশাপ দিচ্ছেন। সুতরাং সিরাজ 'লুৎফা'কে বলছেন—'পলাশীতে শেষ যুদ্ধ।' (পাতা ৮৪) দ্বিতীয় দৃশ্যে আলেযার কক্ষে মীরণ পলাশীতে সিরাজের সমাধি ঘোষণা করছেন। তারপর নবাব আসছেন বক্তৃতা করতে এবং আলেযার গান শুনতে। সব দিক থেকে ঘটনাগুলি এতই অসম্ভব যে আলোচনার প্রয়োজন রাখে না। গোলাম হোসেনের স্বদেশ ভক্তি দেখে দর্শক মুগ্ধ হবেন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে, ইতিহাস পড়ে ঐতিহাসিক নাটক লেখার প্রচলন থাকলে শচীন্দ্রনাথ নবাব ভৃত্য এবং পার্শ্বচর নাজির দালালকে ব্যবহার করতে পারতেন। কষ্ট কল্পনার অবকাশে স্বদেশ ভক্তির বন্যা বহান যেত না বটে কিন্তু সম্ভ্রান্ত নবাবের অসংযম, ভয় ও মানসিক অবিবেচনার পাশে তাঁরই ভৃত্য ও পার্শ্বচর প্রভুভক্ত নাজির দালালের কীর্তি উজ্জ্বল প্রভায় বিরাজ করত। হয়তো নাটকের নাম তাহলে সিরাজদৌল্লা হত না, হত অন্য কিছু।

তৃতীয় দৃশ্যে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র দেখান হয়েছে। নানা অদ্ভুত যুক্তির মধ্যে নবাব শুনিয়েছেন যে মীরজাফরকে তিনি সহ্য করেন কারণ তাঁর অধীনে সমস্ত সৈন্য তা না হলে তাকে তিনি পছন্দ করেন না একথা সুবিদিত। গিরিশচন্দ্র সিরাজ চরিত্রের মধ্যে কোনরকমেই বীরত্ব সঞ্চার করতে না পেরে জহরাকে দিয়ে পলাশীর যুদ্ধ জিতিয়েছেন। প্রতিপক্ষে কোন কাল্পনিক

চরিত্র না থাকায় পলাশীর প্রান্তরে শচীন্দ্রনাথের তরণী ভেসে গেল। যুদ্ধক্ষেত্র বক্তৃতার অবকাশ নাই। তবু তারই মাঝে ছোটছোট বক্তৃতার মাধ্যমে প্রথম ও শেষবার নিজের অনিচ্ছাতে সিরাজের চরিত্র দেখিয়ে ফেলেছেন। এই দৃশ্যে সিরাজদৌল্লাকে এক মূর্খ আত্মম্ভরি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। মীরমদনের মৃত্যুর পর সিরাজ পলায়ন করলেন। ওয়াটস্ ক্লাইভকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। ক্লাইভ কারু পথ প্রদর্শন করা পছন্দ করতেন না এবং পলাশীর যুদ্ধের সময় ওয়াটস্ সাহেব কলকাতায় এ খবরটাও নাট্যকার রাখেন নি। সমগ্র দ্বিতীয় অঙ্কে ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে নাটক রচনাকালে তিনি কোন ইতিহাস পাঠ করেন নাই। এটা অপরাধ নয়। নাট্যকার প্রচণ্ড অপরাধ এবং চরম মিথ্যাচার করেছেন এই কল্পিত নাটককে ঐতিহাসিক নাটক বলে প্রচার করে। গিরিশচন্দ্র ছাড়া মণিলাল বন্দোপাধ্যায়ের বাজীরাও নাটকের স্পষ্ট প্রভাব সিরাজদৌল্লা নাটকে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় শচীন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে অনুসরণ করে ইতিহাস পাঠ করলেন না, মণিলালকে অনুকরণ করে ভাষার তরঙ্গ তুললেন, কল্পনার ফোয়ারা খুলে দিয়ে দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে দিলেন।

তৃতীয় অঙ্কে ২৪শে জুন থেকে ২রা জুলাই অর্থাৎ ৯ দিনের ঘটনা বলা হয়েছে। এই অঙ্কেও তিনটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্য হীরাঝিলের দরবার কক্ষ। বেগম 'লুৎফা'কে নিয়ে সিরাজের পলায়ন। দ্বিতীয় দৃশ্য কারাগার। গোলাম হোসেন ও আলেয়াকে নবাবের সন্ধানের জন্য উৎপীড়ন করা হচ্ছে। অতঃপর সেই কারাগারেই সিরাজকে নিক্ষেপ করা হল। তৃতীয় দৃশ্যে দরবার কক্ষে বক্তৃতারত অবস্থায় মহম্মদী বেগের ছুরিকাঘাতে নবাবের মৃত্যু। এগুলি যে সবই কষ্ট কল্পনা তা বলা বাহুল্য। দরবারে বক্তৃতা করতে করতে সিরাজের মৃত্যু যেমন নাটকীয় তেমনি অসম্ভব। যেখানে যেখানে ইতিহাসের উল্লেখ আছে সেখানেই ভুল দেখা যায়। সিরাজ পাটনায় রাজা জানকীরামের কাছে যাচ্ছিলেন বলা হয়েছে। কিন্তু জানকীরাম আলিবর্দীর জীবদ্দশাতেই গত হয়েছেন। এ সময়ে পাটনার শাসনকর্তা ছিলেন রাজা রামনারায়ণ। সিরাজ মুর্শিদাবাদে রাত্রিকালে মাত্র ৪।৫ ঘণ্টা ছিলেন সুতরাং তিনি যে সৈন্য সংগ্রহের জন্য কয়েকদিন মুর্শিদাবাদে থেকে চেষ্টা করেছেন একথা সর্বৈব

মিথ্যা। আর এক মজা দেখা যায়। লুৎফার পিতা ইরিচ খাঁ কন্যাকে নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখবেন বলে স্থির করে এসেছেন, কিন্তু 'সতীসাধ্বী' 'লুৎফা' স্বামীকে ছেড়ে কোথাও গেলেন না। চমৎকার কষ্ট কল্পনা। তারিফ না করে উপায় নাই। ইরিচ খাঁ বা ইরাজ খাঁ সত্যই সিরাজের শ্বশুর। তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যা উমদাৎউন্নিসা বা ওমদাৎউন্নিসা সিরাজের মহিষী। ইনি সিরাজের পলায়নের সময় পিতার কাছেই ছিলেন। পরে পিতার জায়গীর ইংরেজ কোম্পানী তাঁর ভরণ পোষণের জন্য লিখে দেন। সিরাজের সঙ্গে পলায়ন করেন তাঁর মহিষী নন, তাঁর চির এবং প্রিয় সহচরী 'লুৎফউন্নিসা' বেগম। ইরিচ খাঁর উল্লেখ দেখে সন্দেহ হয় যে শচীন্দনাথ ইতিহাস না জানার যে ভাণ করেছেন তা সত্য নয়। মনে হয় ইতিহাস জেনে তিনি স্বেচ্ছায় ঘটনাবলী অবজ্ঞা করছেন। নিজের কল্পনার রঙিন ফানুসে নাটক চাপিয়ে সত্যকে অবহেলা করেছেন, স্বেচ্ছায় মিথ্যাচার করেছেন। নাটক শেষ হয়েছে পুরাপুরি সুভাষচন্দ্রের ছায়ায়। শেষ দৃশ্যে দরবার কক্ষে সিংহাসনের সামনে বক্তৃতারত সিরাজ জনতাকে উত্তেজিত করলেন এবং সেই মুহূর্তে তার হত্যা চরম ট্রাজেডী সৃষ্টি করে দৃশ্যকে সজল করে তুলল। বক্তৃতা করাটা ইংরেজী গুণ নাট্যকার ভুলে গেছেন। কথার মালায় সকলকে বিভ্রান্ত করা আমরা ইংরেজদের কাছ থেকে শিখেছি। মুসলিম যুগে 'জনসাধারণ' ছিল না। সোজা কাজ চটপট শেষ করা হোত। তাই নিয়ে নাটকে হওয়া যেত না। এই নাটকে তাই যা ঘটেছে তা ইংরেজ আসার পরবর্তীকালের কল্পনা তার আগের কোন ঘটনা নয়।

চরিত্র সৃষ্টিতেও নাট্যকার সফল হন নাই। মীরমদন, সিনফ্রে বা মোহনলাল অতি ছোট পার্শ্ব চরিত্র। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ওয়াটস সাহেব ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের বৃটিশ সরকারের সর্বশক্তিমানতার নজীর হিসাবে এত বিরাট ভূমিকা নেন যে তাকে ক্লাইভ ও ওয়াটসনের থেকেও বড় ইংরেজ নেতা মনে হয়। ওয়াটস সাহেবের এই বিরাট ছবি আঁকতে গিয়ে ক্লাইভের জন্যে কোন জাঁয়গাই নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত রাখতে পারেন নি। রাজবল্লভকে প্রাধান্য দিয়ে রায়দুর্লভকে অবজ্ঞা করেছেন। 'সিরাজদৌল্লার' এই করুণ কাহিনী ইতিহাসের আশ্রয় ছেড়ে এতদূরে চলে গেছে যে দর্শকের ও শ্রোতাদের মনেও এ নাটক থিয়েটার ছাড়া আর কিছু হতে পারেনি।

সকলেই সিরাজের গালবাদ্যকে সমসাময়িক জনপ্রিয় অভিনয় মনে করেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাটক ইতিহাসের গণ্ডীর ভেতর সিরাজের রাজনৈতিক চরিত্র সৃষ্টি করে এক অগ্নিবর্ষী নাটকের রূপ নিয়েছে। তার ফলে গিরিশের সিরাজদৌল্লা রাজরোষে দীর্ঘকাল বাজেয়াপ্ত ছিল। বন্ধ ছিল তার অভিনয়, প্রচার বা মুদ্রণ। শচীন সেনগুপ্তর সিরাজদৌল্লার অভিনয় কোথাও কখন বন্ধ হয়নি। নাট্যকার এই নাটকে সবথেকে বেশী রযালটি সংগ্রহ করেছেন। সত্যকথা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। জনসাধারণের স্বাধীনতা-কাঙ্খার ইচ্ছাকে নাট্যকার নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। কল্পনাশ্রয়ী জনপ্রিয় নাটক সৃষ্টি করে তিনি দর্শকদের অজ্ঞতায় নিজের আর্থিক উন্নতির সুযোগ করে নিয়েছেন।

মোহনলাল

উডরাফ সাহেব পলাশীর পরবর্তীযুগে ক্লাইভের কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন—ক্লাইভ কলুষতার বাঁধ খুলে দিলেন। সেই দূষিত পূতিগন্ধময় বন্যার জলে ইংরেজ বণিকগণ মহানন্দে সন্তরণ ও অবগাহন করতে লাগলেন। এই কথার অনুরণন করে বলা চলে—শচীন্দ্রনাথ সিরাজদৌল্লা সম্পর্কে আজগুবি কল্পনার এবং অসম্ভব ঘটনার বাঁধ খুলে দিলেন। পরবর্তী নাট্য-কারগণ মহানন্দে যথেচ্ছ গঞ্জিকা-চর্চায় মগ্ন হলেন। শচীন্দ্রনাথ বাঙালীকে যে কতদূর প্রভাবিত করেছিলেন তার নিদর্শন দেখা যাবে পরবর্তীকালের সিরাজদৌল্লা মীরকাশিম ও নন্দকুমার সম্পর্কে নানা নাটকে। বর্তমান প্রবন্ধে দুই উচ্চশিক্ষিত নাট্যকার কিভাবে প্রভাবিত হয়েছেন আলোচনা করা হবে। যে দুইটি নাটক আলোচনা করা হবে তাতে মোহনলাল হলেন নায়ক এবং পলাশীর যুদ্ধ নাটকের মূল গল্প। প্রথম নাটক—'পলাশী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। স্টার থিয়েটারের পেশাদারী মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়, রচয়িতা ডঃ হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় নাটক মোহনলাল, প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, রচয়িতা ডঃ শীতাংশু মৈত্র। মুখোপাধ্যায় মহাশয় উচ্চ সরকারী চাকুরে (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) এবং কবি সুনামে অধিষ্ঠিত। তাঁর একাধিক কাব্য জনসমাজে আদৃত। মৈত্র মহাশয় ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক। এই দুই ব্যক্তি সাধারণত

নাটক রচনায় উৎসাহিত নন। যথাক্রমে কাব্য ও সাহিত্য চর্চাই এঁদের নেশা। এঁরা হটাৎ কেন মোহনলালকে নিয়ে নাটক রচনা করলেন তার একমাত্র সদুত্তর হল যে সিরাজদৌল্লা তাদের প্রভাবিত করেছে এবং শচীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে ঐতিহাসিক নাটক লিখতে হলে ইতিহাস চর্চার কোন প্রয়োজন নাই।

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (পরিশিষ্টে সাক্ষাৎকার) স্পষ্ট শচীন সেনগুপ্তর সিরাজদৌল্লা দেখে অনুপ্রাণিত। তাঁর নাটক 'পলাশী' লেখার সময় শচীন্দ্রনাথের মতামত এবং উপদেশ লাভ করেছেন। বঙ্গেবর্গীও নাট্যকারকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। এই দুই নাটকের ক্রমবিবর্তিত ঘটনাই যেন তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। মোহনলাল এই নাটকের প্রধান চরিত্র। দুঃখের বিষয় মোহনলাল সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান না করে এই নাটক রচিত হয়েছে। সম্ভবত মোহনলাল সম্পর্কে কোন উপন্যাস তিনি পাঠ করেছিলেন। অসম্ভ ব্যতা ঐতিহাসিক নাটক রচনায় কি বিকট বিভৎসতা সৃষ্টি করে, এ নাটকে তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। নাটক পাঠ করে বিনা পরিশ্রমে ইতিহাস শিখে ফেলবার দুষ্টগ্রহ কেবল সাধারণকে নয় শিক্ষিত বাঙ্গালীকেও গ্রাস করেছিল। তাই হীরেন্দ্রনাথ মোহনলালকে বর্গী বিতারণের প্রধান হোতা করেছেন, ভাস্কর পণ্ডিতের কন্যা লক্ষ্মীর সঙ্গে মোহনলালের রোমান্স রচনা করেছেন, মোহনলালকে ব্রাহ্মণ যুবক বলে পরিচয় দিয়ে তার নামকরণ করেছেন মোহনলাল ঠাকুর। আবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বৈদ্য রাজবল্লভের ভাবী জামাতাও বলা হয়েছে। উমিচাঁদ হয়েছেন নবাবের ওমরাহ (নাট্যকার ওমরাহ শব্দের মানে জানেন বলে মনে হয়না ওটি আমীর শব্দের বহুবচন মাত্র।) কলকাতা বিজয়ের কৃতিত্ব মোহনলালের হয়েছে। মোহনলালের ভগ্নী হয়েছেন নবাব মহিষীর সহচরী। বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা যে কতো সুদূরপ্রসারী হতে পারে 'পলাশী' নাটক তার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

'পলাশী' নাটক ৯৯ পৃষ্টায় তিন অঙ্কে শেষ হয়েছে। প্রথম অঙ্ক ১ থেকে ৪৪ পাতা এবং চারটি দৃশ্য। দ্বিতীয় অঙ্ক ৪৪ থেকে ৭৯ পাতা এবং চারটি দৃশ্য এবং তৃতীয় অঙ্ক ৮০ থেকে ৯৯ পাতা ও তিনটি দৃশ্য। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে ছায়াঘন বাংলার এক পল্লীতে মোহনলালের গৃহ আগুনে ভস্মীভূত

হচ্ছে দেখান হয়েছে। এটি বর্গাদের কীর্তি। তারা মোহনলালের আদরের ভগ্নী যুবতী করুণাকে অপহরণ করেছে। এই ঘটনা সম্পূর্ণ নিশিকান্ত বসু রাযের বঙ্গে বর্গী থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। বদলান হয়েছে ভগ্নীর নাম। মোহনলালের সহকারীগণ পুরন্দর ওরফে আলি হোসেন শচীন সেনগুপ্তর গোলাম হোসেনের চিত্র। বঙ্গে বর্গীর শাস্তি মোহনলাল সহকারী শান্তশীল হযেছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে বীর মোহনলাল মারাঠা শিবিরে একাকী উপস্থিত হয়ে যুদ্ধে সকলকে পরাজিত করে ভাস্কর পণ্ডিতের কন্যা লক্ষ্মীকে অপহরণে উদ্যোগী। পরে যখন শুনলেন যে মারাঠা নায়ক স্বয়ং তাঁর ভগ্নীকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে গিয়েছেন তখন ক্ষান্ত হয়ে ফিরে গেলেন। এই ঘটনাও বঙ্গে বর্গী অনুসারী। নূতন কথা লক্ষ্মীবাঈ মোহনলালের প্রেমে পড়লেন। বর্গীদের সম্পর্কেও নাট্যকার নূতন কথা শুনিয়েছেন · 'মারাঠারা লুণ্ঠনকারী দস্যু হলেও অত্যাচারী পশু নয়।' (পাতা ১৪) অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ওপর নির্যাতন বা অত্যাচার মারাঠারা তথা বর্গীরা ক্ষমা করে না। মোহনলাল এ কথায় সন্তুষ্ট হলেন। মোহনলাল বাঙালী ছিলেন না—বাংলাভাষা তাঁর জানার কথা নয়। কিন্তু নাট্যকার যখন বাংলাভাষায় নাটক রচনা করেছেন তাঁকে বঙ্গ ভাষাভাষী মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। তার ওপর তিনি উচ্চ শিক্ষিত। জনসাধারণকে জ্ঞান বিতরণের জন্য নাট্যরচনায় প্রয়াসী। বর্গীর হাঙ্গামা সম্পর্কে তাই এক সমসাময়িক কাব্য উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা গেল না। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গারাম ভট্টাচার্য্য তাঁর মহারাষ্ট্র পুরাণ পুঁথিতে বর্গীদের অকথ্য অত্যাচারের যে কাহিনী তুলে ধরেছেন তা উদ্ধৃত করা হল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বচক্ষে এইসব ঘটনা দেখেছেন।[৬৮]

'ছোট বড গ্রামে যত লোক ছিল।
বরগিব ভএ সব পলাইল॥
চাইর দিকে লোক পালাঞ ঠাঞি ঠাঞি।
ছত্তিস বর্ণের লোক পালএে তার অন্ত নাঞি॥
এইমতে সব লোক পালাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে॥
মাঠে ঘেরিযা বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা-রূপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া॥

কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
এক চোটে কারু বধএ পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ॥
একজন ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মত বরগি কত পাপ কর্ম কইরা।
সেইসব স্ত্রীলোক জত দেয় সব ছাইরা॥
তবে মাঠে লুঠিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণুমণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব।
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দিকে বরগি বেড়ায় লুটিয়া॥
কাহুকে বাঁধে বরগি দিয়া পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া॥
রুপি দেহ দেহ বোলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥
কাহুকে ধরিযা বরগী পথইরে ডুবাএ।
কাফর হইঞা তবে কারুপ্রাণ জাএ॥
এই মতে বরগী কত বিপরীত করে।
টাকাকড়ি না পাইলে তারে প্রাণে মারে॥
জার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে।
জার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে॥

বর্গীরা অনাচারী পশু ছিলেন না বলায় মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাস্য, আর কি করলে অনাচারী পশু বলা যায়?

অথ প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য নবাব আলিবর্দী খাঁ মৃত্যুশয্যায়। তাঁর পাশে তাঁর কন্যা মেহেরউন্নিসা ওরফে ঘসেটি বেগম। বৃদ্ধ নবাবের সংলাপে জানা গেল যে রাজা রাজবল্লভের ভাবী জামাতা মোহনলালের বাহুবলেই

বাংলা আজ মারাঠা উৎপীড়নের থেকে মুক্ত। ঘসেটি সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে এইরূপ বলশালী মোহনলাল, শেঠজী (সম্ভবত জগৎশেঠ) ও রাজা জানকীরামের সহায়তায় ও ভাবী শ্বশুরের আনুকূল্যে নিজেই বাংলার মসনদ দখল করে নেবেন। বেচারা মৃত্যুপথযাত্রীর বিস্মরণের সুযোগ নিলেন নাকি কুচক্রী ঘসেটি বেগম? না নাট্যকারের অজ্ঞতার আর এক নিদর্শন দেখা গেল। রাজা জানকীরাম গত হয়েছেন তখন এবং তার সুযোগ্য পুত্র রাজা দুলভরাম রায় বা প্রচলিত নামে রায়দুলভ নবাবের দেওয়ান অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী। নাট্যকার কিন্তু কিছু ইতিহাস দেখেছেন। সিরাজদৌল্লার মধ্যম ভ্রাতাকে ঘসেটি বেগম, এক্রামদৌল্লা নামে যে দত্তক নিয়েছিলেন সকলকে জানাতে পারছেন। বসন্তরোগে এবং রমণ বিলাসে তাঁর মৃত্যু হলে ঘসেটি তার শিশুপুত্র মুরাদদৌল্লাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। এগুলি সত্য ইতিহাস। নাট্যকারের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে এখানেও তিনি ভুলের হাত থেকে রক্ষা পেলেননা। অধ্যাপক কালীকিঙ্কর দত্ত আধুনিককালে প্রমাণ করে দিলেন যে সিরাজদৌল্লার মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম যথাক্রমে মির্জা কাজিম ও মির্জা মেহেদী। নাট্যকার লিখিত মীরজা ফজল কুলি নয়। আলিবর্দীর মৃত্যু আগিয়ে আসছে তাই ঘসেটি বেগমকে সিরাজকে ক্ষমা করার অনুরোধ করলেন বৃদ্ধ নবাব। অতঃপর সভাসদগণ সহ সিরাজদৌল্লা এলেন। ইনি সেই বঙ্গে বর্গীর সিরাজদৌল্লা। ভাজা মাছ উলটে খেতে না জানা অতি ভাল মানুষ দাদুর নাতি। মৃত্যুপথযাত্রী দাদুকে দেখে সংলাপ—'তুমি অমন করছ কেন দাদু?' আলিবর্দী সকলের হাতে আদরের নাতিকে সমর্পণ করলেন উপস্থিত জাফর আলি ওরফে মীরজাফর, মানিকচাঁদ, আলি হোসেন অর্থাৎ পুরন্দর, উমিচাঁদ ও মোহনলাল। মোহনলালকে বৃদ্ধ নবাব ফতেপুর পরগণার জায়গীর, পাঁচ হাজারী মনসবদারী ও রাজা খেতাব দিলেন। সিরাজদৌল্লার বয়স্য গোলাম হোসেন, ভুল হল আলি হোসেন অর্থাৎ পুরন্দরকে ডেকে বললেন সিরাজকে অসৎ পথ থেকে রক্ষা করতে। তারপরই আবার নাট্যকারের নিদারুন অজ্ঞতার সশব্দ বিস্ফোরণ—আলিবর্দী মোহনলালকে অনুরোধ করলেন ছলে বলে কৌশলে ভাস্কর পণ্ডিতকে দমন করতে, প্রয়োজন হলে গুপ্তহত্যা করতে। বীর মোহনলাল একথায় নিদারুন উষ্মা প্রকাশ করে ফেললেন। তাঁর অস্ত্র গুপ্তহত্যায় কলঙ্কিত হবেনা। বরঞ্চ প্রয়োজন হলে

ইংরেজ কোম্পানীর দুর্গ ধুলায় মিশিয়ে দিতে তিনি সক্ষম। সিরাজ জানাচ্ছেন বর্গী লাঞ্ছিতা মোহনলাল ভগ্নী এখন নবাব মহিষীর সঙ্গিনী নয় তার সেলিনা বেগম—সম্ভবত তাকে সিরাজের অন্যতম স্ত্রী কল্পনা করা হয়েছে। সিরাজের স্ত্রী শচীন সেনগুপ্ত অনুসরণে এ নাটকেও 'লুৎফা'। আলিবর্দীর মৃত্যু ও দৃশ্যের শেষ ঘনিয়ে আসায় নাট্যকার সেলিনার কণ্ঠে একখানি গান দিয়েছেন। বলা বাহুল্য সেলিনা শচীন সেনগুপ্তের আলেয়া চরিত্রের ছায়া। কষ্টকল্পিত হলেও নিজ চেষ্টায় ভেজাল প্রস্তুত কারক আর পরস্বাপহারী ভেজাল ব্যবসায়ীর মধ্যে তফাৎ আছে বৈকি।

প্রথম অঙ্কে ইতিহাস কোথাও নাই। সুতরাং আলোচনার প্রয়োজন দেখি না। ঐতিহাসিক নাটক লিখতে বসে যে নাট্যকার জানলেন না যে ১৭৪৪ খ্রীঃ ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল, ১৭৫১ খ্রীঃ বর্গীর হাঙ্গামা শেষ হয়ে গেল এবং ১৭৫৬ খ্রীঃ নবাব আলিবর্দীর মৃত্যু হল, তাঁর নাটক আলোচনার সম্পূর্ণ অযোগ্য একথা বলাই বাহুল্য। সেই নাটক পেশাদারী মঞ্চে অভিনয় হয় এবং নাট্যকার অর্থ রোজগার করেন। বাঙালী দর্শকের ইতিহাস বিমুখতার ও ঐতিহাসিক অজ্ঞানতার এমন নিদর্শন খুব বেশী পাওয়া যাবে না। মোহনলাল বর্গীর হাঙ্গামার সময় একটি আঙ্গুলও নাড়েন নাই একথা আগেও বলা হয়েছে।

প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নাট্যকার আলিবর্দীর মৃত্যু দেখিয়েছেন অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস। পরের দৃশ্য কলকাতা বিজয় অর্থাৎ ঐ বছর জুন মাসের ঘটনা। এখানেও মোহনলাল তার প্রচণ্ড বীরত্বের নিদর্শন দেখিয়ে কলকাতা জয় করলেন। মীরজাফর সাহেবের সব বাধা তুচ্ছ করে মোহনলাল, শান্তশীল ও আলি হোসেন কলকাতার যুদ্ধে জয়ী হলেন। ইতিহাস জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নাট্যকার রাজা দুর্লভরাম বা রায়দুর্লভ নামে কোন চরিত্র নাটকে রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। কলকাতার যুদ্ধে মীরমদনকেও দেখা যায় না। মোহনলাল হলওয়েল সাহেবকে নবাবের সামনে উপস্থিত করলেন। হলওয়েল জানালেন যে মানিকচাঁদের চক্রান্তে অন্ধকূপ হত্যা সংঘটিত হয়েছে। হলওয়েল তাঁর নিজের লেখা বইএ কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম লিখেছেন। নাটক লিখতে বসে হলওয়েল সাহেবের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই নাট্যকার। মানিকচাঁদ জানালেন এসব মিথ্যা

কথা, বন্দীরা জীবিত। সিরাজ হলওয়েলকে বন্দী করতে আদেশ দিলেন। সত্যাশ্রয়ী মোহনলাল জানালেন যে তিনি হলওয়েলকে মুক্তি দিয়েছেন। অগত্যা সিরাজ হলওয়েলকে মুক্তি দিলেন। রাজবল্লভ পুত্র কৃষ্ণদাসকে নবাব উলঙ্গ করে চাবুক মারার হুকুম দিলেন কিন্তু মোহনলালের কথায় সে দণ্ডাজ্ঞাও প্রত্যাহার করলেন। এমন সময় শান্তশীল খবর দিলেন যে ভাস্কর পণ্ডিত মানকরে গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছেন। ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যাকে বার বছর পেছিয়ে এনে নবাব আলিবর্দীকে কলঙ্কমুক্ত করতে এমন উর্বর কল্পনা আগে কোন নাট্যকার দেখাতে পারেন নাই। অবশেষে নবাব তাঁর স্বপ্নের কথা সভাসদদের বলছেন। পলাশী প্রান্তরে সূচিভেদ্য অন্ধকার দেখে ভীত হয়ে তার সুখনিদ্রা ব্যাহত হয়েছে জেনে সভাসদগণ চিন্তিত হলেন। অবশেষে শচীন সেনগুপ্ত অনুসরণে হিন্দু মুসলমানদের মিলনের আহ্বান হঠাৎ জানিয়ে নবাব এক বক্তৃতা দিয়ে ফেললেন। দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু হতে দেখা গেল ঘসেটি বেগম 'মসনদে' বেশ জমিয়ে বসে নৃত্যগীত শ্রবণ করছেন। মীরজাফর এলে উভয়ে ষড়যন্ত্রে মগ্ন হলেন। মোহনলাল জীবিত থাকতে নবাব যে সম্পূর্ণ নিরাপদ একথা আলোচনা করে উভয়ে বিষন্ন হয়ে পড়লেন। হতাশ হয়ে তারা ভাবলেন মোহনলাল থাকতে শওকতজঙ্গ বা ইংরেজ কেউ নবাবকে পরাভূত করতে পারবেন না। তাঁরা মোহনলালের মারণাস্ত্র বার করলেন। ভাস্কর পণ্ডিতের কন্যা মোহনলালের প্রণয়িনী সুতরাং তাকে হরণ করার ষড়যন্ত্র পাকা হল। নাট্যকারের যুক্তিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বাংলার দর্শকদের বয়স ১২ বছরের বেশী নয়। ঘসেটি শওকতজঙ্গের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছেন তাও জানা গেল। পরের দৃশ্যে ভাস্কর পণ্ডিতের কন্যা লক্ষ্মীবাঈ দয়ানগরের দয়ানন্দ দেবাংশির কাছে আশ্রয় চাইতে এলেন। দয়ানন্দ উমিচাঁদকে এই কন্যা বিক্রয় করলেন। উপভোগের জন্য উমিচাঁদ লক্ষ্মীবাঈকে নিয়ে চলে গেলেন। তৃতীয় দৃশ্যে মোহনলাল যখন শওকতজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন তখন মীরমদন পুত্র সোলেমান লক্ষ্মীবাঈ অপহরণের সংবাদ দিল। এমন সময় মোহনলাল ভগ্নী করুণা ওরফে সেলিনা বেগম 'পেশোয়ারী সওদাগর' 'ওমরাহ উমিচাঁদের' হাত থেকে 'মোহনলালের' প্রণয়িনী লক্ষ্মীবাঈকে উদ্ধার করার ভার গ্রহণ করলেন। মীরজাফর এসে জানালেন, 'কলকাতার ইংরেজরা মাদ্রাজের কোম্পানীর সঙ্গে যোগ দিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করেছেন।' তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করলেন। মোহনলাল তাতে আপত্তি করলেন। মীরজাফর খাঁ কথা প্রসঙ্গে জানিয়ে দিলেন যে লক্ষ্মীবাঈকে হরণ করেছেন স্বয়ং নবাব। সে কথা শুনে মোহনলাল 'অস্বাভাবিক ভাবে আৎকাইয়া উঠিলেন।' 'স্বপ্ন যেন সহসা প্রচণ্ড বেগে আহত হইল'। (৬৯ পাতা) চতুর্থ দৃশ্যে কাশিমবাজারে এক নির্জন গৃহে উমির্চাদ ও দয়ানন্দ যখন লক্ষ্মীবাঈ এর ওপর অত্যাচারের চেষ্টা করছেন তখন সেলিনা বেগম অর্থাৎ করুণা এলেন। উমির্চাদকে কটাক্ষে মোহিত করে তাকে মদ্যপানে বিভোর করে দিলেন তারপর দয়ানন্দর বুকে ছুরি ধরে লক্ষ্মীবাঈকে পলায়ন করতে সাহায্য করলেন। এমন সময় উদ্যত প্রহরী পলায়নপর মহিলাদ্বয়কে গুলি করতে চেষ্টা করল। ঠিক তখনই মোহনলাল ও সোলেমান উপস্থিত হয়ে তাদের পরাভূত করে সত্যের জয় ঘোষণা করলেন। দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হল।

এই অঙ্কের সবই কল্পনা। আমিরচাঁদ বা উমির্চাদ কলকাতার এক পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী। হালসে সাহেবের বাগানে তারই বাগানবাড়ীতে সিরাজদৌল্লা ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। ইংরেজরা তাকে দীর্ঘদিন বন্দী করে রেখেছিল। ইংরেজদের সঙ্গে মীরজাফরের চুক্তি তিনি নবাবকে ফাঁস করে দেবেন বলে ভয় দেখাবার ফলে ইংরেজ কোম্পানী তাকে টাকা দিতে স্বীকৃত হয়। তার সঙ্গে যে চুক্তি হয় সেটি জাল তাই পলাশীর যুদ্ধের পর উমিচাঁদ কোন অর্থই পান নাই। টাকার শোকে তিনি পাগলের মতো হয়ে যান এবং তীর্থ যাত্রা করেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কাজেই উমির্চাদ সম্পর্কে নেহাতই আষাঢ়ে গল্প নাট্যকার ফেঁদেছেন নিজের অজ্ঞতা ঢাকবার চেষ্টায়। মাদ্রাজ কোম্পানীর সঙ্গে ইংরেজদের যোগ দেবার কথা লেখায় সন্দেহ হয় যে নাট্যকার মনে করেছেন কলকাতার ইংরেজ হল ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আর মাদ্রাজ কোম্পানী কোন ব্যবসায়ী সংস্থা। উভয় সংগঠনই যে একই প্রতিষ্ঠানের একথা জানবার সুযোগ নাট্যকার পান নি। নিজের আত্মম্ভরিতা প্রেরণার উৎস হয়েছে। মোহনলালকে ব্রাহ্মণ কল্পনা করার একমাত্র কারণ তিনি নিজেকে মোহনলালের সঙ্গে একাত্ম করতে ইচ্ছা করেছেন। নাট্যকার রক্ষণশীল তাই মোহনলালের

প্রণায়নী সযত্নে নির্বাচন করেছেন সদ্‌ব্রাহ্মণ ভাস্কর পণ্ডিতের কন্যায়। বীরত্বও হল জাতিও বাঁচল।

তৃতীয় অঙ্ক পলাশীর প্রান্তর। মোহনলালের বীরত্বে সিরাজ মুগ্ধ। বলছেন—'কলকাতা ও পূর্ণিয়ার যুদ্ধে যে বিজয়লক্ষ্মী আপনার অঙ্কশায়িনী হয়েছে, আশাকরি পলাশীতে তার মর্য্যাদা উজ্জ্বল হবে।' এমন সময় সিপাহশালারের হুকুমে নবাব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তারপরই এল মীর-মদনের মৃত্যুর খবর। নবাব ফিরে গেলেন মুর্শিদাবাদে আর মীরজাফরের হুকুমে মোহনলাল যুদ্ধে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়ে গর্জে বললেন—'মোহনলাল জীবিত থাকতে বাংলার সিংহাসনে বেইমানের স্থান হবেনা।' দ্বিতীয় দৃশ্যে পলাতক সিরাজ ও 'লুৎফা' দানশা ফকিরের দরজায় উপনীত। গিরিশচন্দ্রের ব্যর্থ অনুকরণ এই দৃশ্যে হয়েছে। দানশা, নবাব ও নবাব পত্নীকে পাদুকা দেখে চিনে ফেললেন। শচীন সেনগুপ্তর অনুকরণে সিরাজ চলেছেন পাটনায় রাজা জানকীরামের কাছে। জানকীরাম যে আলিবর্দ্দীর জীবদ্দশাতেই ইহলোক ত্যাগ করেছেন তা শচীনবাবুর জানা ছিলনা আর শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় কোন ইতিহাস পাঠ না করে সেই ভুলেরই পুনরুক্তি করেছেন মাত্র। কল্পনার সরসতা প্রকাশ পেল—মীরণ স্বয়ং সিরাজ ও তার মহিষীকে বন্দী করলেন। তৃতীয় ও শেষ দৃশ্যে ঘসেটি বেগম ঘোষণা করেন—'এই ঘসেটি বেগমের চোখের আগুনে নবাব সরফরাজ পতঙ্গের মতো পুড়ে ছাই হয়েছে।' এই নাট্যকার প্রচুর নাটক পাঠ করেছেন বোঝা যায়। এই উক্তি ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাংলার মসনদ' নাটক পাঠ করার ফল। ঘসেটির সঙ্গে সরফরাজের মিলনের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায়না। আরও অদ্ভুত কথা ঘসেটি বেগমের মুখে বসান হয়েছে। যথা—'কূট রাজনীতিতে পূর্নিয়ার সিংহাসন বিধ্বস্ত হয়েছে। অর্ধবঙ্গের অধিষ্ঠাতা রাজা রাজবল্লভের অন্তর তীব্র বিষে জর্জরিত হয়েছে। এবার সিরাজের পালা।' ভাবালুতা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান কিন্তু বাতুলতা কখনই বাংলা সাহিত্য রচনার সহায়তা করে নাই। অবশেষে ঘসেটি বেগমের ষড়যন্ত্রে মোহনলাল বন্দী। সিরাজের দুর্ভাগ্যের খবর শুনে তিনি সম্পূর্ণ আশাহত। অবশেষে প্রণয়িনী 'লক্ষ্মী', ও ভগ্নী সেলিনার সম্মুখে মোহনলাল আত্মহত্যা করলেন। 'আপনবক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন' সংলাপ—'এ আত্মহত্যা আমি

কবিনি—সারা বাংলা আজ আত্মহত্যা করেছে।' শেষে 'পলাশী'—'পলাশী বলে মৃত্যু ও নাটকের সমাপ্তি। নাটকের শেষ লাইনেও নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ অনুকরণে 'রাক্ষসী পলাশী' বলে নাটক সমাপ্ত করেছেন।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কও প্রথম দুইটির অনুরূপ। ইতিহাস নাই শুধুই কল্পনা। নাটক দেখে ইতিহাস শেখার চেষ্টার ফল কি সাংঘাতিক হয় 'পলাশী' তার নিদর্শন। পরিশ্রম না করে সস্তায় ঐতিহাসিক নাটক রচনা করতে গেলে এইভাবেই মিথ্যাচার প্রকাশ হয়ে পড়ে। আজগুবি ঘটনায় নাটক সমাচ্ছন্ন হয়। কর্তব্য জ্ঞানতো নয়ই কাণ্ডজ্ঞানও লোপ পেয়ে যায়। সাক্ষাতকারে জীবেনবাবু বলেছেন যে দেশের মুক্তি সংগ্রামে সহায়তা করা এবং হিন্দু মসলমান সম্প্রীতি প্রচার করবার উদ্দেশ্যে তিনি এই নাটক রচনা করেন। তাঁর দুই উদ্দেশ্যই বিফল হয়েছে। মোহ এবং অজ্ঞানতা মনকে আচ্ছন্ন করে থাকলে কোন শুভ কাজেই সাফল্য লাভ করা যায় না। জীবেনবাবু ইতিহাস না জেনে বা ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে নাট্যরচনায় ব্রতী হওয়ায় তার পরিশ্রম বৃথা হল। অষ্টাদশ শতাব্দী সম্পর্কে নাটক 'পলাশী' এক হাস্যকর প্রহসন ছাড়া আর কিছু হতে পারে নাই।

মোহনলাল সম্পর্কে কতটুকু ইতিহাস পাওয়া যায় দেখা যাক। প্রথমেই মনে রাখা কর্তব্য যে মোহনলাল বাঙালী নন। সুতরাং তিনি কোন জেলার অধিবাসী তাই নিয়ে যে তর্ক চলেছে তা একেবারে অর্থহীন। কাশ্মীরের অধিবাসী বৃদ্ধ ব্যবসায়ী মোহনলাল ভগ্নীকে সঙ্গে নিয়ে বাংলার সুবেদার নবাব আলিবর্দীর রাজধানী মর্শিদাবাদে উপনীত হলেন। সমসাময়িক ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণে ১৭০৭ থেকে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বইটি 'মুতাক্ষরীণ' নামে খ্যাত। বিখ্যাত ফার্সী পণ্ডিত হাজী মুস্তাফা মুতাক্ষরীণ অনুবাদ করেন। অক্ষয়কুমার • মৈত্রেয় তাঁর সিরাজদ্দৌল্লা বইএ হাজী মুস্তাফা অনুসরণে লিখেছেন—'সিরাজদৌল্লা যখন যৌবনোন্মাদে মত্ত সেই সময় যে সকল লোক দলে দলে তাঁহার পার্শ্বচর হইয়াছিলেন, মোহনলাল তাঁহাদেরই একজন।• মোহনলালের একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী ভগিনী ছিলেন। · এই অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা সিরাজদৌল্লার নিকট অধিকদিন লুক্কায়িত রহিল না। তখন সেই

রূপরাশি সিরাজদৌল্লার অন্তপুরে আসিয়া উপনীত হইল।'৬৯ মোহনলালের উন্নতির মূলে যে এই ভগিনীদানের ইতিহাস অক্ষয়কুমার থেকে আচার্য্য যদুনাথ ও রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বীকার করেছেন। এই ভগিনী যে লুৎফউন্নিসা তা প্রায় সব ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন। মুতাক্ষরীণ লিখেছেন যে লুৎফউন্নিসাকে সিরাজদৌল্লা ক্রয় করেন তাই তিনি হলেন জারিয়া বা ক্রীতদাসী। পরবর্তীকালে নবাব যে কখনই লুৎফউন্নিসাকে বিবাহের ইচ্ছা করেন নাই তার প্রধান কারণ তৎকালীন সামাজিক ব্যবস্থায় জারিয়াকে বিবাহ করে সম্মানের আসন দেবার কল্পনাও ছিল স্বপ্নের অগোচর। সিরাজদৌল্লা রক্ষণশীল মুসলমান অভিজাত ছিলেন সুতরাং চিরসহচরী এবং প্রিয় সহচরী প্রেমাস্পদাকে সামাজিক স্বীকৃতি দেবার প্রযোজন অনুভব করেন নাই। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লুৎফউন্নিসাকে সঙ্গে করে সিরাজকে পাটনা যাত্রা করতে দেখা যায়। ইতিহাসে এটাই লুৎফউন্নিসার প্রথম উল্লেখ। এ সময় সিরাজদৌলার বয়স ১৫ বৎসর। কাজেই মোহনলালের বাংলায় আসা এবং ভগিনী বিক্রয় নিঃসন্দেহে ১৭৪৭ বা ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। পাটনা যাত্রা ১৭৪৮-এর ঘটনা। নূতন খেলনাই বালকরা সর্বদা চোখে চোখে রাখে।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মিরী রমনীর অপূর্ব দেহ সৌন্দর্য্যে সিরাজ যে মগ্ন হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এরপর আলিবর্দীর সময় মোহনলালের আর কোন উল্লেখ নাই। একেবারে সিরাজদৌল্লা নবাব হবার পর ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে দুর্লভরামের পদচ্যুতিতে রাজা মোহনলাল দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। আট বছরে এক সাধারণ সৈনিকের চরম উন্নতি যে নবাবের প্রিয় সহচরীর প্রভাবে হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই বছরে ফরাসী জঁালা সাহেবের আত্মজীবনীতে মোহনলাল সম্পর্কে কিছু খবর পাওয়া যায়। লা সাহেব মোহনলালকে পছন্দ করতেন এবং বহুবার স্বয়ং নবাবের সঙ্গে মোহনলালের বাড়ীতে গিয়েছেন। লা সাহেবের রচনায় মোহনলালের চরিত্র বেশ বোঝা যায় এবং পরবর্তী জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র টানা সহজ হয়। মোহনলালের সঙ্গে লা সাহেবের যোগাযোগ নবাব আলিবর্দীর আমল থেকে। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মোহনলালকে মাতব্বর করে লা সাহেব সিরাজদৌল্লার সঙ্গে পরিচিত হন। সেই বছর দিনেমার বণিক-কুলকে লা সাহেব বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি স্পষ্টই লিখেছেন যে

সিরাজদৌল্লার আনুকূল্য ছাড়া নবাব আলিবর্দীর কাছ থেকে দিনেমার বণিকদের জন্য ব্যবসার ফরমান আদায় করা যেত না। সে বছর সিরাজদৌল্লা দিনেমার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রচুর উপঢৌকন পেয়েছিলেন এবং সেজন্য লা সাহেবের উপর তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন।[৭০]

লা সাহেব এইসব কারণে মোহনলালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলতেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মোহনলাল দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলে লা সাহেবের সুবিধা হয়। এই নৈকট্য যে লোক দেখান ছিল না সেটা বোঝা যায় সিরাজদৌল্লার লা সাহেবকে সঙ্গে নিযে অসুস্থ মোহনলালকে দেখতে যাবার খবরে। লা সাহেব মোহনলাল সম্পর্কে অনেক কথাই লিখে গেছেন তারই অনুবাদ এবার দেওয়া হবে। মোহনলাল সম্পর্কে ল্যা লিখেছেন—'সিরাজদৌল্লার মন্ত্রী বা দেওযান মোহনলালের মতো সেরা বদমাযেস পৃথিবীতে আর ছিল না। যেমন প্রভু তার তেমনি উপযুক্ত মন্ত্রণাদাতা। তা সত্ত্বেও মোহনলাল ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি নবাবকে সত্যি ভালবাসতেন। তিনি স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে প্রভুর সর্বনাশ হলে তাঁরও সর্বনাশ হবে। দৃঢ়তা এবং বিচার বুদ্ধি মোহনলালের চরিত্রের প্রধান গুণ। সিরাজদৌল্লার মতোই মোহনলালও জনসাধারণের চোখে ঘৃণ্য ছিলেন। শেঠদের তিনি ছিলেন সবপ্রধান শত্রু। তাদের অপকীর্তি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। বুদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি ছিলেন শেঠদের যোগ্য প্রতিপক্ষ। মোহনলাল তাঁর নিজের ইচ্ছা অনুসারে ব্যবস্থা করতে পারলে শেঠরা ষড়যন্ত্র করার আগেই বিনষ্ট হত। নবাবের জন্যই মোহনলালের হাত পা বাঁধা ছিল। তাছাড়া সিরাজদৌল্লার সব থেকে সঙ্কটাপন্ন সময়ে মোহনলাল ছিলেন মরণাপন্ন অসুস্থ। এ সময় তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে বা বাড়ী থেকে বাইরে যেতে পারতেন না। আমি নবাব সিরাজদৌল্লার সঙ্গে এই সময় দুইবার তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। সে সময় তাঁর কথা বলার ক্ষমতাও ছিল না। অনেকে মনে করতেন যে তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টা হযেছিল। এ সম্পর্কে মোহনলাল কোন কথা বলেন নি। এই দুর্ঘটনায় সিরাজদৌল্লা নিজেকে খুবই অসহায় মনে করতেন।'[৭১]

শওকতজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ হবার পর অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মোহনলাল অসুস্থ হন পরবর্তী বছরের জুন মাসে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের সময়ও

তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সিরাজদৌল্লার কাছে ক্লাইভের লেখা চিঠিতে জানা যায় যে তিনি তাঁর আর্জি সাম্রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদের যথা জগৎশেঠ, মোহনলাল, মীরজাফর প্রভৃতির মধ্যস্থতায় সালিস নিষ্পত্তি করতে চান।[৭২]

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কলকাতা জয়ের সময় অথবা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারীর যুদ্ধে পরাজয় এবং পলায়নের সময় মোহনলালের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবত এই দুই সময়েই রাজধানী মুর্শিদাবাদ রক্ষার ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। রাজধানী রক্ষার গুরুদায়িত্বের বিনিময়ে মোহনলাল শওকতজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধের সমর কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন একথা ভাবা অস্বাভাবিক নয়। এই যুদ্ধে মোহনলালের চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধের দিক থেকে শওকতজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ অত্যন্ত সহজ যুদ্ধ হলেও মোহনলাল, মীরমদন বা অন্য কোন সেনানায়কের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই—সম্পূর্ণ নিজের বলবুদ্ধির ওপর নির্ভর করেছিলেন। একমাত্র পাটনার শাসনকর্তা তাঁর নিজের সৈন্যবাহিনী নিয়ে মোহনলালের সঙ্গে যোগ দেন। এই যুদ্ধে মোহনলাল জয়লাভ করায় সিরাজদৌল্লা অত্যন্ত আনন্দিত হন। রাজা মোহনলাল, মহারাজা খেতাবে ভূষিত হলেন, তাঁকে পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল। তিনি নিজে মুর্শিদাবাদে থাকতেন এবং তাঁর পুত্র তাঁর হয়ে ফৌজদারীর কাজ চালাতেন তাঁর বিশ্বাসী দেওয়ান অচল সিংহের সাহায্যে। নবাব এত উৎফুল্ল হয়েছিলেন শওকতজঙ্গের পরাজয়ে যে নবাব বংশের জন্য বিশেষ ভাবে রক্ষিত এক জায়গীর—রংপুর বা ফক্করকোণ্ডি জেলার বাহারবন্ধ পরগণা তাকে দান করেন। এই পরগণার প্রাক্তন মালিকদের নাম দেখলেই সিরাজের দানের গুরুত্ব বোঝা যাবে। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বাহারবন্দ ও ভিতরবন্ধ পরগণাদ্বয় ছিল সরফরাজ খাঁর সম্পত্তি। সরফরাজ খাঁর পুত্র মির্জা আমানীর জন্মের পর এই পরগণা তাঁর নামে বদল হয় এবং তাঁর মনসবদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। সরফরাজের মৃত্যুর পর (মির্জা আমানী যদিও তখন জীবিত) এই সম্পত্তি জায়গীর হিসাবে সৈয়দ আহমদ খাঁ প্রাপ্ত হন। তিনি ছিলেন নবাব আলিবর্দী খাঁর মধ্যম জামাতা। তাঁর মৃত্যু হলে তার পুত্র শওকতজঙ্গ বাহারবন্দের জায়গীরদার হলেন। শওকতজঙ্গের মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি হল মোহনলালের।[৭৩]

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই পূর্ণিয়া আক্রমণের তোড়জোড় সুরু হয়। অবশেষে ১৬ই অক্টোবর ১৭৫৬ খ্রীঃ মণিহারীর যুদ্ধে শওকতজঙ্গ পরাজিত ও নিহত হলেন। সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ লেখক গোলাম হোসেন পূর্ণিয়াতে শওকতজঙ্গের আশ্রয়ে ছিলেন। এই যুদ্ধের সময় তিনি পূর্ণিয়া ছেড়ে পাটনায় আশ্রয় নিলেন। গোলাম হোসেন মোহনলালকে পছন্দ করতেন না। সেই জন্যেই হয়তো পলাশীর যুদ্ধের পর রায়দুর্লভরামের আজ্ঞায় মোহনলালের নৃশংস হত্যা জনশ্রুতি অনুসারে লিখতে তাঁর আনন্দ হয়েছে। মুতাক্ষরীণ অনুসরণে কেবল নাট্যকার নয় বহু ঐতিহাসিকও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দেই মোহনলালের মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু এই সময় মোহন-লালের মৃত্যু হয় নি। সে কথায় যাবার আগে পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ২৬শে জুন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটস সাহেব কর্ণেল ক্লাইভের কাছে মোহন-লালকে যে কিনে যাবার প্রস্তাব করেছিলেন সেটা জানা আবশ্যক।[৭৪]

এই সাক্ষাৎকার হয়েছিল বলে মনে হয় না। এমন হতে পারে যে এই সময় মহারাজা মোহনলাল পলাতক হন। কারণ ২৬শে জুনের পর মোহন-লালের কোন খোঁজখবর এ পর্যন্ত জানা ছিল না। এতদিন সবাই মনে করতেন পলাশীর বীরত্বেই মোহনলালের সমাধি। মোহনলাল ও মীরমদনের অধীনে ছিল ৫০০০ অশ্বারোহী ও ৭০০০ হাজার পদাতিক সৈন্য। নবাবের ৫৩টা কামানের মধ্যে ৪১টা থেকে কোন গোলা ছোড়া হয় নি। যে বারটি সক্রিয় কামান ইংরেজ বাহিনীর ওপর গোলাবর্ষণ করেছে সেগুলি মোহনলাল, মীরমদন ও ফরাসী সিনফ্রে বা সাফ্রের অধীনে ছিল। পলাশীতে মোহনলাল সর্বাত্মক লড়াই করেছেন। নিজে অত্যন্ত আহত হয়েছেন এবং তাঁর জামাতা বাহাদুর আলি খাঁ নিহত হয়েছেন।[৭৫]

দেখা যাচ্ছে মোহনলাল মুসলমানকে কেবল ভগ্নি নয় কন্যাদানও করেছেন। কাশ্মিরী যুদ্ধ ব্যবসায়ীর পক্ষে এ ঘটনাগুলি যে একান্ত স্বাভাবিক ছিল তা আজকের ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় বাস করে উপলব্ধি করা দুষ্কর।

এযাবত মোহনলালের ইতিহাস এখানেই শেষ হত। সম্প্রতি রাজস্ব দপ্তরের কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে মোহনলাল সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য আবিষ্কার করেছি। ২৭শে জুন ১৭৫৭ থেকে ১১ই ডিসেম্বর ১৭৭১ দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর মহারাজা মোহনলাল কোন বনবাসে অজ্ঞাতবাস করেছেন জানা যায়

না। ১২ই ডিসেম্বর ১৭৭১ বাহারবন্দ জায়গীরের সূত্র ধরে মোহনলালের খোঁজ পাওয়া গেল। মুর্শিদাবাদের রাজস্ব দপ্তরে তাঁর একখানি আর্জি পাওয়া যায়। তাতে তিনি লিখেছেন যে নবাব সিরাজদৌল্লার আদেশমূলে তিনি বাহারবন্দ পরগণার জায়গীরদার হয়েছিলেন এবং ওই পদে পলাশীর যুদ্ধের দিন অর্থাৎ ২৩শে জুন ১৭৫৭ পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে ওই পরগণা দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। সুতরাং দিনাজপুরের রাজার কাছে তাঁর ২০,৪৯২ টাকা পাওনা হয়েছে। কিন্তু বারবার তাগিদ দিয়েও এই টাকা আদায় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। মাননীয় সরকার কোম্পানী বাহাদুর ওই টাকা আদায় করে পৌছে দিলে তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন। এ তরফে কোন উত্তর না দেবার ফলে মোহনলাল ২৩শে ডিসেম্বর আর এক আর্জিতে তাঁর বক্তব্যের পুনরুক্তি করেন।[৭৬] এই অর্থ তিনি পেয়েছিলেন কি না জানা যায় না। তবে রাজস্ব দপ্তরের কাগজ পত্রে ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব গভর্ণর হয়ে আসার পর পাটনার এক মোহনলালকে একশত টাকা মাসহারা মঞ্জুর করেন। এই ব্যক্তির রাজা মোহনলাল হবার একমাত্র কারণ যে ইংরেজ কোম্পানী বিশেষ সিরাজদৌল্লার পরিজনবর্গের জন্যই মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা মঞ্জুর করেছিলেন। সিরাজ পত্নী ওমদাৎউন্নিসা, সিরাজ কন্যা ও তার মাতা সিরাজের প্রিয় সহচরী লুৎফউন্নিসা, সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যিনি পরবর্তীযুগে মহবুল আলি খাঁ নাম গ্রহণ করেছিলেন, সিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মুরাদদৌল্লা এবং মোহনলাল সকলেই মাসহারা নিয়মিত আমৃত্যু পেয়ে এসেছেন। মাসহারা ব্যবস্থায় সন্দেহ থাকে না যে ইনি সিরাজের মোহনলাল। আর এক প্রমাণ হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব যিনি কাশিমবাজার কুঠিতে বিভিন্ন পদে একনাগাড়ে ১৭৫২ থেকে ১৭৬৩ পর্য্যন্ত ছিলেন। লা সাহেবের মতো সিরাজের পার্শ্বচরদের তিনি ভালভাবেই চিনতেন। গভর্ণর হয়ে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে আসার পর সিরাজদৌল্লার অন্যান্য পরিজনদের সঙ্গে মোহনলালের মাসহারার ব্যবস্থা করে দেওয়া তাঁর পক্ষে তাই একান্ত স্বাভাবিক হয়েছিল। এর পরও মোহনলালের খবর পাওয়া যায়। তিনি পাটনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং প্রথমে বস্ত্র ব্যবসায়ী হন। পরে রেশমের কাটা কাপড় ও আফিংএর ব্যবসাতে বেশ ভাল করেই মগ্ন হন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দেও তাঁর শরীর সবল এবং মন ব্যবসায় মশগুল। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় অন্ধ মোহনলাল আর এক ব্যক্তিকে

যষ্টি করে পূর্ণিয়াতে পঞ্চাশ বছর আগেকার বাকী খাজনা আদায়ের ব্যর্থ চেষ্টা করে লাঞ্ছিত হয়েছেন।

মোহনলালের শেষ জীবনের ইতিহাসের চর্চা গবেষকদের জন্য মুলতুবি রেখে নাটকের আলোচনায় ফিরে যাওয়া যাক। নাট্যকার হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মোহনলাল সম্পর্কে নাটক লেখায় উৎসুক হয়েছেন কিন্তু মোহনলাল সম্পর্কে ইতিহাস জানার কোন চেষ্টাই করেন নি। এমন কি প্রচলিত ঐতিহাসিক উপাদান এই নাটকে কয়েকটি নাম সংগ্রহেই শেষ হয়েছে। চরম অন্ধকারেও একটু আলোর রশ্মি রয়েছে। নাটকে অথবা ৫ই অগ্রাণ ১৭৭৮ এর সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেছেন যে ঐতিহাসিক নাটক লেখার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি। তাঁর কথায় নাটক 'ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য ভিত্তিক নয়'। (হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ৫ই অগ্রাণ ১৩৭৮) হীরেন্দ্রবাবুর এই মন্তব্যটি আলোচনা করে নাটক সম্পর্কে আলোচনা শেষ করা হবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতকোত্তর যিনি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দর্শনে এম, এ, পাশ করেন তাঁর পক্ষে ঐতিহাসিক তথ্যকে ভিত্তি না করে নিজ কল্পনাকে একমাত্র প্রেরণাদায়িনী করা কি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার নিদর্শন নয়? বিশেষ এই নাটক পঞ্চাশোর্ধ সন্ধ্যা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে হাজার হাজার দর্শককে অহেতুক বিভ্রান্ত করেছে। এই সৃষ্টি যে অন্যায়, জাতীয় ইতিহাসের অজ্ঞানতা যে পাপ এ ধারণা তাঁর মতো ব্যক্তির মনে না এসে থাকলে তার থেকে লজ্জার কথা আর কি হতে পারে?

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর নাটককে 'ইতিহাস' বলবার চেষ্টা করেন নি কিন্তু অধ্যাপক ডঃ শীতাংশু মৈত্র লিখেছেন—'মোহনলালের হত্যার ব্যাপারে স্থান পরিবর্তন করা ছাড়া আর কোন লক্ষনীয় অনৈতিহাসিকতা এই নাটকে নাই।' (দৃষ্টিকোণ। মোহনলাল—শীতাংশু মৈত্র।) অলক্ষনীয় অনৈতিহাসিকতা যা অধ্যাপক মৈত্র স্বীকার করেছেন তাহল 'মাধুরীর চরিত্রের কোন ঐতিহাসিকতা প্রায় নেই বললেই চলে। ··নামটি অন্য নাট্যকার গ্রহণ করেছেন বলেই আমিও নিয়েছি, নইলে ঐ নামের কোন ঐতিহাসিকতা নেই তবে মোহনলালের ভগ্নীর বর্গীদের হাতে লাঞ্ছনা থেকে আরম্ভ করে তিনি সিরাজের প্রণয়িনী ছিলেন এই সমস্ত জনশ্রুতির আমি

সুযোগ গ্রহণ করেছি। জগৎশেঠরা অবশ্য দুই ভাই ছিলেন কিন্তু নাটকীয় মূল্যের দিক থেকে দুজনেরই এক ও অভিন্ন ব্যক্তিত্ব। আচার্য্য গিরিশচন্দ্র দুটি চরিত্র নামে মাত্রই রেখেছেন। আমি চরিত্র ও ঘটনার পরিমিত প্রয়োগের খাতিরে একজন জগৎশেঠকেই এই নাটকে স্থান দিয়েছি।' (দৃষ্টিকোণ। মোহনলাল—শীঃ মৈঃ।) প্রথমে উপরোক্ত মতামত আলোচনা করা যাক।

অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্র 'বঙ্গেবর্গী' নাটক থেকে মাধুরী নামটি গ্রহণ করেছেন। মোহনলাল ভগ্নীর বর্গীদের হাতে লাঞ্ছনার কাহিনী সেখানেই প্রথম উল্লেখিত হয়। পরে হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় পলাশী নাটকে সেই ঘটনার পুনরুল্লেখ করেন এবং মোহনলাল নাটকে আবার সে কথা বলা হয়। মিথ্যাকে ক্রমাগত সত্য বলে প্রচার করলে দীর্ঘদিন পর সেটাই লোকে সত্য বিশ্বাস করে থাকেন। অধ্যাপক শীতাংশুবাবুর মতামত এই পুরাতন সত্যই প্রমাণ করছে। বর্গীর দ্বারা লাঞ্ছিতা সুতরাং মাধুরীর বাংলার গ্রামে বা সহরে বাসস্থান ছিল। মোহনলাল এবং তার ভগিনী বাংলার অধিবাসী হলে বর্গীর আক্রমণের কোন সময়ে তারা বাংলায় এসেছিলেন এ প্রশ্ন ওঠেনা। যে প্রশ্ন ওঠে সেটাও অধ্যাপক মৈত্র এড়িয়ে গেছেন। এই প্রশ্ন হোল মোহনলাল ভগিনী কবে লাঞ্ছিতা হলেন? এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার কিছু নাই, কাজেই তিনি অনুসন্ধান করেন নাই। কিন্তু মোহনলাল অবাঙালী হতে পারেন স্বীকার করে তিনি তাঁর ভগ্নীর অপহরণ কাহিনী অসত্য হবার সম্ভাবনাকে মনে স্থান দিলেন না কেন? তবে কি মনে করব তিনিও নাটক পড়ে ও দেখে ইতিহাস শিখে ফেলেছেন? নাটকের ঘটনাকেই ইতিহাসের অবিসম্বাদিত সত্য বলে ধরে নিয়েছেন? নাটককে ইতিহাসের মর্য্যাদা দিয়েছেন?

অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্র মোহনলাল সম্পর্কে যা লিখেছেন প্রথম বর্ষের কলেজের ইতিহাস বিভাগের কোন ছাত্র পরীক্ষার খাতায় তার পুনরাবৃত্তি করলে একটি নম্বরও পাবে না। এমন ঘটনা বহুবার ঘটেছে। নাটক পাঠ করে বা দেখে বহু ছাত্র ইতিহাসের পরীক্ষার খাতায় জ্ঞানপনা বিস্তার করেছেন এবং পরিণামে দুঃখ ভোগ করেছেন। অধ্যাপককে যখন দেখি

কল্পনাকে ইতিহাসের সঙ্গে তুলনীয় করতে—তখন সন্দেহ থাকে না ক্ষয়রোগ জাতীর জীবনে কি গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করেছে।

জগৎশেঠ দু'জন ছিলেন না একজনই ছিলেন। কিন্তু জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজা স্বরূপচাঁদ দুই সহোদর ভাই ছিলেন বলেই এঁরা জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত। অধ্যাপক মৈত্র সেজন্য বিভ্রমে পড়েছেন। নাটকীয় মূল্যে দুজনকে অভিন্ন বলে স্বীকার করা যায় না। জগৎশেঠ কেবল সুবেদার নবাবের মন্ত্রণা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন না তিনি ছিলেন সুবেদারীর অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। সুবেদারের পরেই ছিল তাঁর স্থান। শাসনব্যবস্থা পরিচালনাতে জগৎশেঠকে বাংলা শাসনের অংশীদার মনে করা হত। নূতন সুবেদার নির্বাচনের আগে জগৎশেঠের মতামতও কখন চাওয়া হয়েছে। জগৎশেঠ প্রথমে প্রত্যক্ষভাবে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন নাই। জগৎশেঠ নবাবের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ করলেন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের মাসখানেক আগে। এর মধ্যে তিনি পুরাপুরি প্রস্তুত হয়ে আঁটঘাট বেঁধে বসেছেন। কাগজে-কলমে জগৎশেঠ ষড়যন্ত্রে এসেছেন মীরজাফরের পরে। কিন্তু এটাও সত্য যে জগৎশেঠ পেছনে না দাঁড়ালে ইংরেজ ষড়যন্ত্রে যোগ দিতনা, সব পরিকল্পনা বিফল হতো। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় দ্বিমুখীনীতির চমৎকার প্রয়োগ করেছেন। জগৎশেঠ দরবারে নিয়মিত ইংরেজদের গাল দিয়েছেন, নবাবের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন, সর্বদা সুবেদারের পাশে থেকেছেন। অন্যদিকে মহারাজা স্বরূপচাঁদ তলে তলে ষড়যন্ত্রের কাজকর্ম চালিয়ে গেছেন। জগৎশেঠরা যে সিরাজদৌল্লাকে সরিয়ে তৎকালীন ঐতিহাসিক ও সংবাদপত্রের ভাষায়—'বাংলায় বিপ্লব' ঘটাবার প্রধান পাণ্ডা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জগৎশেঠ সিরাজদৌল্লার কাছে বসে এমন চমৎকার আনুগত্যের অভিনয় করেছেন যে নবাব, মঁসিয়ে জাঁলা সাহেবের সাবধান-বানীতে কর্ণপাত করেননি। গভীর উষ্মা ও প্রচণ্ড ক্রোধে মোহনলাল যখন জগৎশেঠদের ধ্বংস করতে উন্মুখ হয়েছেন তখন তাকে বিরত করেছেন। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে এক ভাবার কোন কারণ নাই। বরঞ্চ দুই ভাবলে তাদের সাফল্যমণ্ডিত দ্বিচারিণের হদিশ পাওয়া যায়। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় এক অপূর্ব নাটকীয় চরিত্র। নৃশংস নবাবকে দারুণ ভয় করতেন বলেই বাইরের মুখোসটা ঠিক রেখে ভেতরে ভেতরে কাজ করে গেছেন। বাংলার নাট্যকারেরা

এই চরিত্র দু'টির সুযোগ যে একশত বছরেও গ্রহণ করতে পারেননি তার কারণ বাংলার নাট্যকারগণ ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় এ সম্পর্কে কোন অনুসন্ধান করেন নাই। বিদেশী জগৎশেঠ আর তার বংধরগণকে অনুধাবন করে কত পাঞ্জাবী রাজস্থানী বাংলায় এল, বাংলার ব্যবসায় জাকিয়ে বসল। স্বাধীনতার পর বাংলার অর্থনৈতিক নেতৃত্ব তাদের হাতে চলে গেল। এসবের কারণ বুঝতে হলে যে মূলসূত্রে উপনীত হতে হবে সেখানে জগৎশেঠ আসীন।

অধ্যাপক মৈত্র 'দৃষ্টিকোণ' বা ভূমিকায় নাটকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন 'গিরিশচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধের নায়ক সিরাজের মধ্যে দেখেছেন নির্মীয়মান বাঙালী জাতির অকালে আকস্মিক রাহুগ্রাস। মোহনলাল এই জাতীয় বিপর্যয়ের উপনায়ক মাত্র। আমি শুধু উপনায়কটিকে নিয়ে ক্ষীণ প্রচেষ্টা সুরু করেছি মাত্র।' ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী জাতির 'নির্মীয়মান' সম্পূর্ণ অসত্য। তখন বাঙালী মৃতপ্রায় অন্যপ্রদেশের ক্ষমতাশালী ও অর্থবান ব্যক্তিরা বাঙলার বুকে চেপে বসে আছে। সিরাজ, জগৎশেঠ, মীরজাফর ও মোহনলাল, খোদাদদ ইয়ার লতিফ খাঁ, সিরাজদৌল্লা ও মীরজাফরের আত্মীয়পরিজন যায় মীরকাশিম প্রভৃতি সকলেই অবাঙালী। পূর্ব বাংলায় আধুনিককালে পশ্চিম পাকিস্থানীরা যে রকম প্রভুত্ব করেছেন প্রায় সেই রকমই অবস্থা ছিল ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বাঙালীর। তারই মাঝে বাঙালী কেরানী হয়েছেন, সেনাপতি হয়েছেন। খয়ের খাঁ বাঙালীরা হুজুরের মন জুগিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, অর্থ করেছেন, প্রতিপত্তি করেছেন যেমন রায়দুর্লভ ও নন্দকুমার। এই পদে উন্নীত হবার জন্য কোনরকম হীন কাজ করতে তাঁরা অপারগ হননি। পলাশীর যুদ্ধে মুসলমান রাজত্বের পতন বাঙালীর উন্নতির প্রথম সোপান। শিক্ষায়-দীক্ষায় বাঙালীর নবজাগরণের সময়। ইংরেজ আনুকুল্যে সেটা সম্ভব হয়েছে। পলাশীর পরেই নূতন সংস্কৃত শিক্ষার টোল বানানো সম্ভব হয়েছে। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় নূতন করে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়েছে, কলকাতা মাদ্রাসা ও উর্দু শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছে। পলাশী বাঙলার জীবনে অন্ধকার যুগের অবসান।

অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্রের মোহনলাল নাটক চার অঙ্কে ৭১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

দৃষ্টিকোণ বা ভূমিকা, কুশীলব, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য লিখিত ভূমিকা ও মুখ্য পত্রিকা নিয়ে আরো ছয় পাতা যুক্ত। প্রকাশ কাল ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে। প্রথম অভিনয় ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। অভিনয় করেছেন লোক সংস্কৃতি সংঘ নামে এক অপেশাদারী সংস্থা। প্রথম অঙ্ক ১ থেকে ২৯ পাতা দৃশ্য সংখ্যা তিন। দ্বিতীয় অঙ্ক ৩০ থেকে ৩৮ পাতা দুটি মাত্র দৃশ্যে সমাপ্ত। তৃতীয় অঙ্ক ২৯ থেকে ৪৮ পাতা দুটি মাত্র দৃশ্য ও চতুর্থ অঙ্ক ৪৯ থেকে ৭১ পাতা ও চারটি দৃশ্য। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য জগৎশেঠের মহিমাপুরের প্রাসাদ, দ্বিতীয় দৃশ্য মোহনলালের প্রাসাদ ও তৃতীয় দৃশ্য চন্দননগরের কক্ষে ইংরেজগণ। সুতরাং নাটক সুরুর সময় চন্দননগর যুদ্ধের পরে (মার্চ ১৭৫৭) এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতার যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের পরবর্তী সময়। ওয়াটসের সঙ্গে চুক্তির উল্লেখ নাটককে জুন মাসে নিয়ে গেছে। সুতরাং ধরা যাক ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস নাটকের সুরু। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সিরাজদোল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। উপস্থিত জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, মানিকচাঁদ, রাণী ভবানী পরে প্রবেশ করছেন নন্দকুমার ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। পরিচয় দেবার সময় কিছু নূতনত্ব চোখে পড়ে। রাজবল্লভের পরিচয় 'সেনানী মহারাজ, ঘসেটি বেগমের প্রণয়ী' রায়দুর্লভের পরিচয় 'সেনানী মহারাজ ; মোহনলালের প্রতিদ্বন্দ্বী' কৃষ্ণচন্দ্রও হলেন 'সেনানী মহারাজ নদীয়াধিপতি', মানিকচাঁদের পরিচয় 'সেনানী মহারাজ', উমিচাঁদ হয়েছেন বণিক প্রধান। এই মন্ত্রণাসভায় মানিকচাঁদ অন্যতম প্রধান বক্তা, মীরজাফর ও জগৎশেঠ ষড়যন্ত্রের নায়ক। নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ থেকে উঠে এসেছেন রাণী ভবানী বলছেন—আজ আপনারা কিসের আশায় ইংরেজের হাতে বাংলাদেশকে তুলে দিতে যাচ্ছেন? (৯ পাতা) 'ইংরেজ যদি শুধু বণিক হয় তাহলে কিসের দরকার কাশিমবাজারের আর কলকাতার দুর্গের?' 'কিসের দরকার ছিল তার নূতন দুর্গ নির্মাণ করবার পলতার কাছে? কিসের প্রয়োজন ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের এখান থেকে বিতাড়িত করবার?' (৯ পাতা) রাণী ভবানী সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার বিরোধী। অভিযোগ করছেন যে মেদিনীপুরে আতাউল্লার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মীরজাফর আলিবর্দীকেও সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টা করে বিফল হন। রাণী ভবানী বলেছেন—'সন্দেহ হয় আপনারা বাঙালী কি না?…

মোহনলাল কাশ্মীর থেকে এসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আপনাদের কাছে কতই না দুর্ণাম কিনছেন। আর আপনারা বাঙালী হয়ে বাংলার সর্বনাশ করছেন, ভারতের সর্বনাশ ডেকে আনছেন।' (১৩ পাতা) মীরজাফর জানাচ্ছেন যে ইংরেজদের সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হয়েছে। ওয়াটস স্ত্রীলোকের বেশে (১৩-১৪ পাতা) তাঁর বাড়ীতে এসে চুক্তি সই করিয়ে গেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ৫ই জুনের পরবর্তী সময়। নন্দকুমার এসে জানাচ্ছেন—'হুগলীর নূতন ফৌজদার আপনাদের কথামতই কাজ করবেন।' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মোহনলালের পরাক্রমে ভীত। জগৎশেঠ বুদ্ধি দিলেন যে মৌখিক আশ্বাস দিয়ে সৈনাপত্য মোহনলালের হাত থেকে নিয়ে জাফর আলি খাঁকে দিতে হবে। রায়দুর্লভ জানাচ্ছেন যে ভগিনী দান করে মোহনলাল সিরাজের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন। উমিচাঁদ তাঁর প্রাপ্য দশ লক্ষ্য টাকার কথা মীরজাফরকে স্মরণ করালেন। এরই মাঝে রাণী ভবানী শোনালেন 'মোহনলাল এমন মানুষ যে দেশের মাটিকে ভালবাসে।'

দ্বিতীয় দৃশ্যে মোহনলালের প্রাসাদে মোহনলাল ও তস্য ভগিনী মাধুরী আলাপরত। মাধুরীর মুখে অনেকগুলি তাৎপর্য্যপূর্ণ সংলাপ আছে—(ক) 'জগৎশেঠের বাড়ীতে দেশহন্তাদের সভা শেষ হয়েছে-ইংরেজের হাতে সোনার বাংলাকে তুলে দেবার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ।' (১৭ পাতা) (খ) 'সিনফ্রের গোলন্দাজেরা তোমার সঙ্গে লড়বে।' (১৭ পাতা) (গ) 'চন্দননগর দখল করে ইংরেজ মানুষের ঘর পুড়িয়ে, ক্ষেত খামার মাড়িয়ে, ন'দে বর্ধমান একেবারে শেষ করে দিয়েছে।' (১৮ পাতা) ইতিমধ্যে কাশিমবাজারের ইংরেজ দুর্গ থেকে হাল্কা কামানের ছাঁচ তৈরী করা সমাপ্ত হয়েছে সুনন্দা কর্মকার জানালেন। মোহনলাল জগৎশেঠ ও মীরজাফরকে দালাল নামে অভিহীত করলেন। মীরমদনের দেশপ্রেমে আপ্লুত হলেন। এমন সময় পাল্কিতে চড়ে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে এলেন স্বয়ং নবাব। 'তারপর তাকিয়ায় হেলান দিয়ে একান্ত অসহায়ের মত বসে পড়লেন।' খবর এসেছে ইংরেজ মর্শিদাবাদ অভিমুখে যুদ্ধ সজ্জা করছে। সেই খবর স্বয়ং নিয়ে এসে অসহায়ের মত নবাব মীরজাফর ও জগৎশেঠকে গ্রেপ্তার করতে হুকুম দিলেন। কিন্তু মোহনলাল বললেন 'ওদের গ্রেপ্তার করতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা হবে।' (২৩ পাতা) যুদ্ধ সাজে প্রস্তুতি সুরু হল। মাধুরী জানালেন তিনি রাজপুত কন্যা

কামান দাগতে পারেন সুতরাং তিনি যুদ্ধে যাবেনই। তৃতীয় দৃশ্যে চন্দননগর ফোর্ট দখল করে ক্লাইভ উমরবেগকে ষড়যন্ত্রের খবর জানাচ্ছেন। আরো জানাচ্ছেন জগৎশেঠ মীরজাফরের জামিন হয়েছেন। মীরজাফর অর্থ না দিলে জগৎশেঠের কাছ থেকে তা আদায় করা হবে। পলাশীতে ছাউনি ফেলার উদ্দেশ্যে ক্লাইভ চন্দননগর থেকে যাত্রা করলেন।

অধ্যাপক মৈত্র যে অন্য সকলের মতো নাটক পাঠ করেই ইতিহাস লিখেছেন এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর। নবীনচন্দ্র সেনকে অনুকরণ করেই রাণী ভবানীকে সিরাজের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন করা হয়েছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষ অংশ নেন নাই। একথা আগে বলা হয়েছে। পদাধিকার বলে এরা উভয়েই জগৎশেঠ, মীরজাফর ও রায়দুর্লভের থেকে অনেক নীচু। সেদিক থেকেও তাঁদের ষড়যন্ত্রে যোগদান অসঙ্গতিপূর্ণ। রাজা রাজবল্লভ এই ষড়যন্ত্রে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত ছিলেন না। মানিকচাঁদ ও নন্দকুমার পদে অনেক ধাপ নীচে ছিলেন। নন্দকুমার পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। পলাশীর পর তাঁর চাকরি গেলে তিনি রায়দুর্লভের স্কন্ধারূঢ় হন এবং ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রায়দুর্লভের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মীরজাফরের দেওয়ান বা প্রধানমন্ত্রী হয়ে বসেন। যখনই মীরজাফর নবাব হয়েছেন, নন্দকুমার তাঁর দেওয়ান হয়েছেন। রাণী ভবানীর সংলাপও ভুলে ভরপুর। কি অবস্থায় কাশিমবাজার ও কলকাতার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইংরেজদের হাতে এসে পড়ে তা আমরা আগে আলোচনা করেছি। বর্গীর আক্রমণের সাংঘাতিক পরিস্থিতি আলোচিত হয়েছে—সে খবর রাণী ভবানীর না জানা থাকতে পারে কিন্তু মোহনলাল সম্পর্কে নাটক যিনি লিখবেন তাঁর জানা কর্তব্য। ইতিহাস পাঠ না করার আর এক চরম নিদর্শন 'পলতায়' দুর্গ তৈরীর সংলাপ। ভূগোল না জানায় অক্ষয়কুমার মৈত্র ভুল করেছেন, গিরিশচন্দ্র ঐ বই পড়ে পলতা লিখেছেন। গিরিশচন্দ্র অনুসরণে শীতাংশুবাবুও 'পলতায়' লিখেছেন। আচার্য্য যদুনাথ বা রমেশচন্দ্রের বাংলার ইতিহাস বা সুখপাঠ্য তপনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পলাশীর যুদ্ধ প্রভৃতি বইএ ইংরেজদের কলকাতার দক্ষিণে পলায়ন উল্লেখিত হয়েছে। ডায়মণ্ডহারবারের কাছে কলকাতা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। সেটি মাটির কেল্লা নামে বিখ্যাত। আর কলকাতার উত্তরে ইছা পলতা। রাণীভবানীর মুখের এই অসংলগ্ন সংলাপে নাট্যকারের ইতিহাস

অজ্ঞানতা সূচিত হয়েছে। বণিক ইংরেজ কেন যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলেন? কেন সিরাজদৌল্লা কলকাতা দুর্গ জয় করলেন? কেন ক্লাইভকে মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় পাঠান হল তার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। অন্তত ১৭৫৭ তে ইংরেজ রাজত্ব করতে প্রস্তুত হন নি। নাট্যকার নদীয়া ও বর্ধমানে ইংরেজদের যে অত্যাচার বর্ণনা করেছেন তা মিথ্যা এবং কষ্টকল্পিত। ইংরেজ শাসনে সাধারণ লোক প্রথম স্বস্তি অনুভব করেছে। সম্পত্তি সংগ্রহ ও ব্যবসায় বৃত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করেছে। রাণী ভবানী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ষড়যন্ত্রকারীরা বাঙালী কি না। ওইখানে সমবেত ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে চুঁচড়োর রায়দুর্লভ আর ঢাকার রাজবল্লভ ছাড়া বাঙালী ছিলেন না কেউ। অবশ্য কৃষ্ণচন্দ্র ও নন্দকুমারের কথা বাদ দিয়ে বলছি। জগৎশেঠ, আমিরচাঁদ, মীরজাফর বা মানিকচাঁদ অন্য প্রদেশের লোক। নাট্যকার যে রকম রাজবল্লভের পরিচয়ে বলেছেন ঘসেটি বেগমের প্রণয়ী, রায়দুর্লভকে বলেছেন মোহনলালের প্রতিদ্বন্দ্বী, ইয়ার লতিফ খাঁকে বলেছেন জগৎশেঠের ব্যক্তিগত বাহিনীর অধ্যক্ষ, তাতে এই সময়কার ইতিহাস সম্পর্কে তার কোন প্রাথমিক ধারণা আছে বলে মনে হয় না। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে আলিবর্দী সিরাজকে মিরজাফরের হাতেই অর্পণ করেন। মীরজাফর পক্ষে থাকায় সিরাজের মসনদ পাওয়া সহজ হয়। নাট্যকার রাণী ভবানী মারফত ইংরেজদের কর ফাঁকি দেওয়ার কথাও বলেছেন। ইংরেজদের শুল্ক ফাঁকি দেওয়া মীরকাশিম নবাব হবার সময়ের ঘটনা, তাকে সিরাজদৌল্লার সময়ের ওপর আরোপ করা যায় কি?

দুইটি নূতন তথ্য নাট্যকার স্বীকার করেছেন। প্রথম মোহনলাল এক কাশ্মিরী যুবক আর দ্বিতীয় তিনি তার ভগিনী মাধুরীকে সিরাজদৌল্লাকে দান করেছেন। গোলমাল সুরু হল। কাশ্মিরী মহিলার নাম মাধুরী হয় কি না? কবে ভাই বোন মুর্শিদাবাদে এলেন? কেন এলেন, এসে কোথায় ছিলেন? কোথায় মাধুরী বর্গী দ্বারা উপক্রুতা হলেন, নবাব তাকে কেন গ্রহণ করলেন? মাধুরী বলছেন তিনি রাজপুত মহিলা। তবে কি তাঁরা কাশ্মিরী রাজপুত না কি মোহনলাল ও মাধুরী বৈমাত্রেয়। মোহনলাল নাটকের নাট্যকার এসব প্রশ্নের কোন জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। কল্পনার তরঙ্গে ভেসে তিনি দ্বিতীয় দৃশ্যে মোহনলাল মাধুরীর সংলাপ রচনা করেছেন। তাতে বিনা দ্বিধায় বলেছেন যে ইংরেজদের হাতে

সোনার বাংলাকে তুলে দেবার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ। বলাবাহুল্য ইতিহাস অজ্ঞতার এটি আর এক বিরাট নিদর্শন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কেবল ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্য করেছে। মীরকাশিমের সঙ্গে বিরোধের আগে শাসন ব্যবস্থার স্থায়ী ভার নেবার কোন চিন্তা এদেশে বা ওদেশের ইংরেজদের মনে ছিল না। সিনফ্রে সম্পর্কে উক্তিতে (খ) স্পষ্ট বোঝা যায় যে সিনফ্রে কে ? কি জন্যে এসেছিল এবং কোথায় গেল এ সম্বন্ধে নাট্যকারের বিন্দুমাত্র ধ্যান ধারণা নাই। আগে একবার সিনফ্রে বা সাঁফ্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি ছিলেন ফরাসীদের কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ জঁলা সাহেবের অধীনে এক সৈন্যাধ্যক্ষ। লা সাহেবের সঙ্গে সাঁফ্রও কাশিমবাজার ছেড়ে পাটনা চলেছিলেন। মধ্যপথে লা সাহেবের মনে হল যে নবাব একেবারেই অরক্ষিত তাই তিনি পঞ্চাশজন গোলন্দাজ সহ সাঁফ্রকে মুর্শিদাবাদে পাঠালেন, হুকুম থাকল কখনই যেন না সাঁফ্র নবাবের কাছ ছাড়া হন। পলাশীর যুদ্ধের যে আক্রমণ নীতি তৈরী হল তাতে মীরমদন ও সাঁফ্রর ওপর আক্রমণ রচনার ভার পড়ল। মোহনলাল থাকলেন মীরমদনের পেছনে। ইংরেজ বধ করতে পারবেন সম্ভাবনায় সাঁফ্র এই নবাবী আদেশ মেনে নিলেন। পলাশীর যুদ্ধে সবাধিক ইংরেজ সাঁফ্রর কামানের গোলাতেই নিহত হয়েছে। দুপুর ১টা নাগাদ মীরমদন নিহত হলে সেই বাহিনী মোহনলাল চালনা করতে লাগলেন। নবাবের পলায়নের সংবাদে আহত মোহনলাল নবাবের কাছে যেতে পারলেন না। অসুস্থ থাকায় তাঁর ক্লান্তিও চরম হয়েছিল। এই অবস্থায় মোহনলাল আত্মগোপন করলেন। কোথায় কি অবস্থায় তিনি ছিলেন আজও জানা যায় না। সাঁফ্র সন্ধ্যার সুযোগ নিয়ে ছত্রভঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। তিনিও নবাবের সাহায্যার্থে যেতে পারলেন না। ইতিমধ্যে পলাশীর যুদ্ধের শেষ নিষ্পত্তি হয়ে গেল। বিজয়ী ক্লাইভের জয়ডঙ্কায় আকাশ বাতাস মুখরিত হল। এই সুযোগে অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে সাঁফ্র পলায়ন করলেন। লা সাহেবের সঙ্গে মিলিত হবার পথ বন্ধ তাই প্রথমে আশ্রয় নিলেন বীরভূমের জঙ্গলে তারপর তিনি মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারামের কাছে উপনীত হলেন। রাজারাম আলিবর্দীর আমলের কর্মচারী এবং পাটনার রাজা রামনারায়ণের মতো সিরাজের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। রাজারামের বুঝতে একটুকুও দেরী হল না যে হাওয়া কোনদিকে বইছে। কয়েকদিন

লুকিয়ে রেখেই তিনি সাঁফ্রদের দাক্ষিণাত্যে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। তারই সাহায্যে সাঁফ্র দলবল নিয়ে বুশীর সঙ্গে মিলিত হলেন। বাংলায় তার ক্ষণিকের সঞ্চরণ শেষ হয়ে গেল। (Hill, ed. Bengal 1756-57 and Three Frenchmen in Bengal.)

মনে রাখতে হবে এই সব যুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্গে সাধারণ ব্যক্তির কোন যোগ ছিল না। সুতরাং ইংরেজ সৈন্যের নদীয়া বা বর্ধমানে অত্যাচার করার কোন কারণ নাই। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্ত্তী ঘটনাতেই ইংরেজ সেনাপতি ও সৈন্যদের চরিত্র বোঝা যাবে। 'নবাবের ছাউনিতে ঢুকে কি বিলিতি গোরা, কি দিশি লাল পলটন, কি তেলেঙ্গি সেপাই, কেউ একটা জিনিষে হাত দিলনা। অপূর্ব্ব তাদের ডিসিপ্লিন। ক্লাইভের সঙ্গে তারা সকলেই দাউদপুর পর্য্যন্ত এগিয়ে চলল।' (পলাশীর যুদ্ধ ১৭৬ পাতা)

দ্বিতীয় দৃশ্যে স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে সিরাজদৌল্লাকে মোহনলালের গৃহে উপস্থিত করে নাট্যকার এক অসম্ভব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন। সিরাজদৌল্লার চরিত্র তিনি যে কিছুই বোঝেননি এর থেকে প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর নাই। সিরাজ অহঙ্কারী ছিলেন। বহুবিধ কুগুণের তিনি অধিকারী ছিলেন। মাতার আসঙ্গ লিপ্সা ও প্রকাশ্য উন্মত্ত চরিত্রহীনতা সিরাজদৌল্লাকে প্রচণ্ডভাবেই আহত করে। স্ত্রীলোকের প্রতি এক প্রচণ্ড ঘৃণাই তাঁর বালকবয়সের চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়েছে। এই মাতার প্রতি বিক্ষোভ-আকর্ষণ অতি অল্প বয়সেই স্ত্রীলোক সম্ভোগে তাকে উদ্দিপীত করেছে। ফৈজীকে ক্রয় এবং ব্যভিচারিণী ফৈজীর নৃশংস হত্যা, হোসেন কুলি খাঁকে হত্যা (মাতার প্রণয়ী) বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে অসদ্ভাব, স্ত্রীলোকদের প্রতি অত্যাচার ও সম্ভোগ সবই একই কারণে ঘটেছে। লুৎফউন্নিসা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন বলে ক্রীতদাসী হয়েও সিরাজের সহচরী হতে পেরেছেন। এই মহিয়সী মহিলার চেষ্টায় ও যত্নে সিরাজ বংশধররা রক্ষা পায়। সুতরাং এহেন সিরাজদৌল্লাকে স্ত্রীলোকের বসনে সজ্জিত করা চরম বাতুলতা মাত্র। তৃতীয় দৃশ্যে চন্দননগরে ক্লাইভের সঙ্গী কারা ছিলেন এবং তাঁদের কি ভূমিকা ছিল নাট্যকার অনুসন্ধান না করে গুটিকতক নাম রচনা করেছেন। এদৃশ্যও সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত। চন্দননগর জয়ের পর পলাশী নয়—কাটোয়া। কাটোয়ার দুর্গ যে কি গুরুত্বপূর্ণ তা সিরাজদৌল্লা বোঝেন নাই। কিন্তু আলিবর্দী, মারাঠারা বা ক্লাইভ বুঝে-

ছিলেন। মুর্শিদাবাদ আক্রমণ বা রক্ষায় কাটোয়া দুর্গ হল প্রধান। ভূগোলের মানচিত্রের দিকে তাকালে একথা সর্বদাই বোঝা যায়। ইতিহাস জানা থাকলে নবীনচন্দ্র সেনের প্রাজ্ঞতা নাট্যকার উপলব্ধি করতে পারতেন।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আলিবর্দী বেগম ও লুৎফউন্নিসার সংলাপ। এই নাট্যকারও পূর্বসূরী শচীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনারায়ণ অনুসরণে 'লুৎফা' লিখেছেন। আলিবর্দী বেগম জানাচ্ছেন যে তিনি মীরজাফরের হাতে পলাশী যুদ্ধে সৈন্যাপত্য দিয়ে অন্যায় করেছেন। মোহনলালকে সেনাপতি করা উচিত ছিল। তিনি বলছেন—'মুসলমান আজ টাকা খেয়ে দেশ বেচে দিচ্ছে আর হিন্দু মোহনলাল রাখছে সিরাজের তাজ।' (৩১ পাতা)। খুবই আপত্তিকর উক্তি। মনে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের দেশবিভাগ নাট্যকারকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করেছে তাই কলমের ডগায় প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্য পুরোপুরি শচীন্দ্রনাথ অনুসরণে বক্তৃতার দৃশ্য, স্থান দরবার কক্ষ। নাট্যকার সিরাজকে দিয়ে বলিয়েছেন ইংরেজ নবাবী চায়। নন্দকুমারকে বিশ্বাসঘাতকার জন্য বরখাস্ত করিয়েছেন। দুটিই ভুল সংবাদ। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর নন্দকুমারকে বরখাস্ত করে হুগলীর ফৌজদারী দিলেন তার বন্ধু মীর্জা ওমরবেগকে। এরই মধ্যে নাট্যকার কোথা থেকে বর্গীদেরও টেনে এনেছেন। মীরজাফর, মোহনলাল ও ইয়ারলতিক নবাবের সামনেই তরোয়াল টরোযাল বার করে এ ওকে কাটতে গেলেন। নবাবী হুকুমে সকলে নিরস্ত্র হলেন। নবাব বললেন সকলকে নিয়েই তিনি যুদ্ধযাত্রা করবেন ইতিমধ্যে মোহনলালকে দরবারেই গুপ্ত হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হল। নবাব চললেন যুদ্ধে। সিনফ্রেকে করে দিলেন গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক। টিকা নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয় অঙ্কের সুরু হয়েছে কাটোয়াতে ইংরেজরা স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার করছে দেখিয়ে। কুট বলছেন—Let us seek peace. এমন সময় সৈন্যাবাসে মোহনলালের প্ররোচনায় আগুন লেগে গেল। বাধ্য হয়ে আবার নবীনচন্দ্রকে স্মরণ করতে হচ্ছে। অধ্যাপক শীতাংশুবাবুকেও আর একবার নবীনচন্দ্র সেন রচিত পলাশীর যুদ্ধ পাঠ করতে অনুরোধ করি। যদি সম্ভব হয় তাহলে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত কর্ণেল কুটের রোজনামচা যা কাটোয়ায় ইংরেজ ক্রিয়াকলাপের গুরুত্বপূর্ণ দলিল, পাঠ করলে তাঁর নিজের কল্পনা

বিলাসিতা সত্য থেকে যে কত দূরে সরে এসেছে অনুভব করতে পারবেন। মুতাক্ষরীণ লেখক গোলাম হোসেন অবাক হয়ে লিখে গেছেন—ইংরেজরা বড় মজার জাত। যুদ্ধের সময়ও তারা যেখান দিয়ে যায় সেখানে সৈন্যদের রসদ, ঘোড়ার দানা, সরঞ্জামী জিনিষপত্র সবই দাম দিয়ে কেনে লুঠপাট করে না।' দ্বিতীয় দৃশ্যও এইরূপ। অন্তঃপুরে লুৎফার সঙ্গে সিরাজ নৃত্যগীত উপভোগ করছেন। সিরাজ বলছেন, 'ইংরেজের কুত্তাকে শিক্ষা দিয়ে ফের ভালবাসব' (৪৭ পাতা)। লুৎফার সংলাপে জানা যায় যে এ পর্য্যন্ত সিরাজ কোন যুদ্ধে পরাজিত হননি। সবই কল্পনা। সুতরাং পরবর্তী অঙ্কে পলাশীর যুদ্ধ দেখা যাক। প্রথম দৃশ্য ২৩শে জুন সকাল আটটা অর্থাৎ তখন যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। এখানেও মজার শেষ নাই। মোহনলালও মীরমদনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেন যে ইংরেজদের ছত্রভঙ্গ করে মোহনলাল মীরজাফরকে আক্রমণ করবেন। মুতাক্ষরীণে সিরাজের পরাজয়ের কারণ লিখতে গিয়ে বলা হয়েছে সিরাজদৌল্লা কোন সৈন্যাধ্যক্ষকেই বিশ্বাস করতেন না, হোন না তিনি দুলভরাম বা মোহনলাল, মীরমদন বা মীরজাফর, ইয়ার লাতিফ খাঁ বা সিনফ্রে। সকাল আটটায় নবাব শিবিরে তাই এরকম আলোচনা অবাস্তব ও উদ্ভট। দ্বিতীয় দৃশ্যে সিরাজ মীরজাফরের সামনে নতজানু হলেন (৫১ পাতা) একটু পরে তার গালে চড় মারলেন (৫২ পাতা) তারপর 'বেতমিজ নিমকহারাম কুত্তা' বললেন। তারপর মাফ চাইলেন মীরজাফরের কাছে। মোহনলালকে যুদ্ধ থেকে বিরত হবার আদেশ দিয়ে মীরজাফরের উপদেশমত মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য যুদ্ধ ছেড়ে পলায়ণ করলেন।

এই পলাশীর যুদ্ধের দৃশ্য কেবল বাঙ্গালীর নয় বাঙ্গালী নাট্যকারদের পলাশী হয়ে দাঁড়ায়। অধ্যাপক শীতাংশুমৈত্র, গিরিশচন্দ্র ও শচীন সেনগুপ্তকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন এবং হাস্যকর নাট্যঘটনার অবতারণা করেছেন। মৈত্র মহাশয় একটু অনুধাবন করলে বুঝতে পারতেন যে গিরিশচন্দ্র এবং শচীন্দ্রনাথ কেন কল্পিত চরিত্রের ওপর নির্ভর করেছিলেন। পলাশীতে সিরাজদৌল্লার ব্যর্থতা এবং কাপুরুষতাকে কিছুতেই ঢেকে রাখা যায় না। পলাশীতে নবাবপক্ষীয়দের প্রচণ্ড বীরত্বের হিসাব হল ইংরেজপক্ষে মৃত সাতজন গোরা আর ষোলজন সেপাই এবং আহত তেরজন গোরা আর ছত্রিশজন সেপাই। অঙ্ক শেষ হল মোহনলাল ও মাধুরীর দীর্ঘ আলোচনায়। মাধুরী আরও যুদ্ধ করবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। তিনি

বলেছেন 'মুর্শিদাবাদের জনসাধারণকে অস্ত্র দাও ইংরেজকে তাড়াও মীরজাফর-দের শেষ কর।' সে আমলে যারা সৈন্য হতেন তারা যে ইংরেজী কায়দায় কুচকাওয়াজ করা সৈন্য হতেন না এটা জানা আবশ্যক। সাধারণ লোক পয়সা নিয়ে হাতে বন্দুক কোমরে তরোয়াল আর পিঠে ঢাল বেঁধে সৈন্য হতেন। সেজন্যই সুসজ্জিত সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে দলে দলে মরতেন, পলাশীতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মাধুরীর লাঠিবঁটিকাস্তে হাতে নিয়ে যুদ্ধ করতে যাবার উত্তেজনা যুদ্ধ অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকের যোগ্য কথা কিন্তু নাট্যকার সম্ভবত এই সংলাপে তাঁর রচনার অসাবধানতা প্রকাশ করেছেন। বলা হয়েছে মোহনলাল ও মাধুরী লা সাহেবের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ঘোড়ায় চেপে যাত্রা করেছেন। ইতিহাসে পলাশীর পর মোহনলালের কীর্তিকলাপের কোন হিসাব নাই। যদি এসময় তিনি পলায়ন করে থাকেন তাহলে কোন পথে তা করেছেন জানা যায় না। ২৬শে জুন ওয়াটস ক্লাইভকে একপত্রে মোহনলালকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করেন। মনে হয় মোহনলাল কোথায় ছিলেন ওয়াটস জানতেন। তারপরই চৌদ্দ বছরের অজ্ঞাতবাস। তৃতীয় দৃশ্যে মীরজাফর নবাব হলেন ক্লাইভের হাত ধরে। ক্লাইভের মুখে ভাষণ দেওয়া হয়েছে 'আর আধঘণ্টা গোলা চালালে ইংরেজ ফৌত হয়ে যেত।' টিকা নিষ্প্রয়োজন। সিরাজ পরিবারবর্গের অন্যত্র যাবার হুকুম দিলেন নূতন নবাব। ক্লাইভ, সিরাজ ও মোহনলালের গ্রেপ্তারের জন্য মীরজাফরকে তাগিদ দিলেন। অবশেষে সিরাজদৌল্লার গুপ্ত ধনাগার সকলে মিলে খুলে ফেলতে চললেন। নাটকের শেষ দৃশ্যের প্রথম লাইনেই বলা হয়েছে 'পাটনায় রাজা জানকীরাম সেই ত্রিশহাজার অশ্বারোহী আর গোলন্দাজ দিল কিন্তু এত দেরীই করল যে কোন কাজেই এল না।' শচীন সেনগুপ্তকে অনুসরণ করতে গিয়েই নাট্যকার চোরাবালিতে মগ্ন হয়েছেন। ইতিহাস পাঠ করলে জানতে পারতেন—(১) তখন জানকীরাম স্বর্গে আর জানকীরামের পুত্র দুর্লভরাম বা রায়দুর্লভ মীরজাফরের প্রিয়তম সহকারী। (২) পাটনার ডেপুটি গবর্ণর রাজা রামনারায়ণ। (৩) পলাশীর পরাজয়ের খবর পেয়ে লা সাহেবকে রামনারায়ণ নিজের কাছে রাখলেন। ক্লাইভ লা সাহেবের বিরুদ্ধে আয়ার-কুটকে পাঠালেন। লা সাহেব ছাপরা হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে মিলিত হলেন। (৪) রামনারায়ণ ক্লাইভের সঙ্গে বোঝাপড়া করে

ইংরেজ অনুগত হয়ে পড়লেন। (৫) সৈন্য পাঠানর খবর ভিত্তিহীন নাট্যকারের কল্পনা মাত্র। এই কল্পনার আরো কিছু উদাহরণ এই দৃশ্যে দেখা যাবে। এটাকেই নাট্যকার সম্ভবত তাঁর নাটকের নূতনত্ব বলেছেন। মাধুরী বলছে বর্গীদের ব্যতিব্যস্ত করে জনসাধারণ তাড়িয়েছে সুতরাং রাণী ভবানীর মতো নেত্রীদের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হোক। ঘরে ঘরে ডাক দিয়ে বলা হোক ওরে তোরা জেগে ওঠ। মোহনলাল চণ্ডী পাঠ করে শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করেন। মাধুরী জল আনেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আসেন রায়দুর্লভ যার পিতার কাছ থেকে মোহনলাল সৈন্য পেয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন। সিরাজের মৃত্যুসংবাদে মোহনলালের হাত থেকে অস্ত্র পড়ে গেল। কুৎসিত ব্যবহার সুরু করলেন রায়দুর্লভ। মাধুরী শ্লোগান দিলেন, 'ইংরেজ নিপাত যাক।' 'ধীরে ধীরে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল।' বনমাঠ কাঁপিয়ে বহু কণ্ঠে ধ্বনী হল 'ইংরেজ নিপাত যাক।' এই অবকাশে রায়দুর্লভ মোহনলালকে হত্যা করে পলায়ণ করলেন। মৃত্যুপথযাত্রী মোহনলালকে মাধুরী শোনালেন 'ঐ আসছে দাদা! দেশের বাহিনী আসছে! দলে দলে আসছে!' মোহনলালের মনে আশা জাগল বললেন—'তুলে ধর আমাকে মাধুরী' তারপর 'পলাশী' 'পলাশী' বলে মৃত্যু। নাটক শেষ। ইংরেজী শিক্ষা ও মানসিকতা, ইংরেজী ধরণের আওয়াজ ও সংগঠন সবই যে আধুনিক যুগের শিক্ষা, ১৭৫৭ তে তার যে কিছুই ছিল না নাট্যকার একথা ভেবে দেখেন নি! স্বপ্নরাজ্যে তাঁর নাটক শেষ হয়েছে। উদ্ভট নাটক হিসাবে বিবেচনা যোগ্য। ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে একেবারেই অচল। ভূমিকা লিখতে বসে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বলেছেন 'এক জাতিতে পরিনীয়মান হিন্দু ও মুসলমানের অসংগঠিত জাতীয় চেতনা এবং সেই চেতনার সূচিমুখ মোহনলাল ও মীরমদন। অন্যদিকে অনভিজ্ঞ তরুণ সিরাজের ভীতিবিহ্বল অব্যবস্থচিত্ততা......এই জটিল আবর্তের রূপদান করবার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার।' দুঃখের বিষয় এই প্রচেষ্টায় তিনি সম্পুর্ণ বিফল হয়েছেন। তাঁর নাটক জ্ঞানের ভাণ্ডারে কোন কিছু সংযোজন করবে না। পাঠক ও দর্শক মহলে শুধু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। এই ঘটনা নিতান্ত দুঃখের সন্দেহ নাই।

উপসংহার।

১৭৭৫ থেকে ১৯৫৩ পর্য্যন্ত নবাব সিরাজদৌল্লা ও আলিবর্দী সম্পর্কে নাটক আলোচনা করা হল। আলিবর্দী-সিরাজদৌল্লা সম্পর্কের আরো যে সব নাটক আছে সেগুলি এই নাটকগুলির ছায়ায় রচিত। ছোটদের জন্য রচিত বঙ্কিমচন্দ্র দাসগুপ্তর সিরাজের স্বপ্ন, শচীন সেনগুপ্তর অনুকরণ। এছাড়া কতকগুলি নাটকে সিরাজদ্দৌল্লা ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্ররূপে প্রকাশিত। রামপ্রসাদ ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এক ভক্তিমূলক নাটক। ইতিহাস বা রাজনীতি তার প্রতিপাদ্য নয়। সেখানে হঠাৎ এগারো নম্বর দৃশ্যে (বার নম্বরে নাটক শেষ) সিরাজদৌল্লা প্রবেশ করে রামপ্রসাদের গান শুনে খুব সাধুবাদ দিয়ে গেলেন। (রামপ্রসাদ ৯৮-৯৯ পাতা) তাই দেখে মফঃস্বল পত্রিকায় এক প্রবন্ধ বার হল যে সিরাজদৌল্লা বাংলাগানের একজন পৃষ্ট-পোষক ছিলেন। ইতিহাস অজ্ঞানতা এবং কল্পনাবিলাসিতার পরাকাষ্ঠা দেখা গেল। জাতীয় চেতনা জাগাবার জন্য যার সৃষ্টি হল, সে গরল কণ্ঠে থাকল না, উদরে গিয়ে মৃত্যু ঘটাল। পূজা করতে এসে পুরোহিত মশায় বিগ্রহের আসনে চেপে বসলেন।

কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। লক্ষনীয় নাট্যকারগণ সবাই হিন্দু কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় মুসলমানী কোন আচার ব্যবহার কোন নাটকে স্থান পায় নাই। তাঁরা হিন্দু চরিত্র সৃষ্টি করে তাকে মুসলমান নাম দিয়েছেন। ইওরোপীয় চরিত্র সৃষ্টিতেও এই একই দোষ দেখা যায়। তারা ডডড করে এক অদ্ভুত বাংলায় কথা বলে বটে কিন্তু তাদের মনের ভাব আর চিন্তাধারা বাঙালী হিন্দুর। এখানেও কোন নাট্যকারই একমাত্র নবীনচন্দ্র ছাড়া নিজের সামাজিক গণ্ডীকে অতিক্রম করতে পারেন নাই। কোন নাট্যকারই ১৭৫৭র সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। প্রত্যেকের নাটকে তাঁর নিজের সমসাময়িক কালই প্রকাশিত, অধ্যাপক শীতাংশু মৈত্রর ক্ষেত্রে তার ফল হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক নাট্যকার তাদের নাটকে নিজের সামাজিক দুর্বলতা যে ভাবে প্রকাশ করেছেন তাতে আশ্চর্য্য হতে হয়। উপ-সংহারে তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পলাশীর যুদ্ধ একটা সাংঘাতিক ঘটনা নয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও পলাশীর যুদ্ধের ফলাফলকে বড় কিছু ভাবেন নি। পলাশীর যুদ্ধকে বাঙ্গালী তার ভাবালুতা দিয়ে মস্ত রঙ্গীন ফানুস

বানিয়েছে। কল্পনাপ্রবণ জাতির ভাববিলাসিতা কি রকম ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে প্রথমে বাতুলতা এবং শেষে ক্ষিপ্ততার পর্য্যায়ে উপনীত হয়েছে তা সত্যই লক্ষনীয়। প্রাথমিক চিন্তা বিলাস ক্রমে কায়া গ্রহণ করেছে। গ্রহ নিয়েছে ক্রমে বিগ্রহের রূপ। শেষে উপগ্রহ হয়ে স্কন্ধে আরোহণ করে নিগ্রহ সুরু করেছে সিন্দাবাদ নাবিকের সেই অপগ্রহের মতো।

আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস মেনে নাটক রচনার ইচ্ছা ছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও নিখিলনাথ রায় প্রভাবিত জাতীয় নেতা সিরাজের সৃষ্টি হল গিরিশচন্দ্রের চিন্তায়। তারপর থেকে আর কেউ ইতিহাস পাঠ করলেন না। নাটক দেখে বা পড়ে অল্পস্বল্প দু'চারটে নাম জেনে ১৭৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা নিয়ে নাটক সৃষ্টির প্রয়াস করলেন। একমাত্র নবীনচন্দ্র সেন ও লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী চরিত্র চিত্রণে ঐতিহাসিক সিরাজের কাছাকাছি গেছেন। অন্য সাহিত্যিকগণ কাল্পনিক সিরাজ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী ও ষড়যন্ত্রকারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের নাটক ইতিহাসের কাছাকাছি গেছে কিন্তু জহরা ও করিমচাচা নামে দুই কাল্পনিক চরিত্র অবতারণা করায় ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম বিভ্রান্ত হয়েছে। সিরাজের চরিত্রের সঙ্গে সিরাজ মহিষীর চরিত্রও বিভ্রান্ত হয়েছে। নবীনচন্দ্র ও লক্ষ্মীনারায়ণ সিরাজদৌল্লার পত্নীর কোন নামোল্লেখ করেন নাই। গিরিশচন্দ্রই প্রথমে নাটকে 'লুৎফউন্নিসাকে' সিরাজের পত্নীর মর্য্যাদা দিয়েছেন। শচীন্দ্রনাথ তার নাটকে 'লুৎফা' নামের প্রচলন করেন। তদনু-যায়ী পরবর্ত্তী নাট্যকারগণ তাঁকে অনুসরণ করেছেন। পলাশীর যুদ্ধকে প্রত্যেক নাট্যকারই এক প্রচণ্ড রণাঙ্গন হিসাবে বিবৃত করেছেন। কিন্তু ওই বৎসরের মধ্যেই কলিকাতার যুদ্ধ (৫ই ফেব্রুয়ারী), চন্দননগরের যুদ্ধ (১৩ মার্চ থেকে ২৩শে মার্চ) বা কাটোয়ার যুদ্ধ (১৯শে জুন) যে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ একথা নাট্যকারগণ উপলব্ধি করেন নাই।

সিরাজদৌল্লার পত্নীর নাম ওমদাৎউন্নিসা। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৩ বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে সিরাজদৌল্লার বিবাহ হয়। এঁর পিতার নাম মীর্জা ইরাজ খাঁ ইনি যশোহরের জায়গীরদার ছিলেন। ওমদাৎউন্নিসা জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন তাঁর ভগ্নির নাম ইমারীখান্নম। বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ সবাই জানতেন যে লুৎফউন্নিসা সিরাজদৌল্লার স্ত্রী ছিলেন না তবু ভাবাবেগে

বিভ্রম সৃষ্টি করেছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এইভাবে লিখেছেন-'প্রিয় সহচরী লুৎফউন্নিসা বেগমকে করিয়া ‥' (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সিরাজদৌল্লা ৪৫ পাতা)। সিরাজদৌল্লার পলায়ন সংবাদে লিখেছেন—'একজন প্রতিহারী এবং চিরসহচরী লুৎফউন্নিসা বেগম ছায়ার ন্যায় পশ্চাতে পশ্চাতে অনুগমণ করিল।' (ঐ পাতা ৩৭৮) বেভেরিজ সাহেবের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাৎপর্য্যপূর্ণভাবে। 'He was accompained in his flight by his favourite concubine Latafunnissa. I am informed that this lady was originally a Hindu and none other than the sister of Mohanlall.'

নিখিলনাথ রায় চমৎকার লিখেছেন 'প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলিয়া রাখি, লুৎফউন্নিসা অথবা ফৈজী কেহই সিরাজের বিবাহিতা স্ত্রী নহেন। সিরাজের বিবাহিতা স্ত্রীর নাম ওমদাৎউন্নিসা।' (নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ১৯৪ পাতা)। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বই প্রকাশ হয় ১৩০৪ সালের আশ্বিন মাসে। এই বছরই শ্রাবণ মাসে নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনী প্রকাশিত হয়। ১৩১২ সালে ব্রজেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গ আবার উল্লেখ করলেন। সিরাজদৌল্লার পত্নীর তালিকায় তিনি পরপর সাজালেন— '১। তাঁহার বিবাহিতা পত্নী (ইরাজখাঁর কন্যা), ২। লুৎফউন্নিসা ; ৩। ফৈজী (মোহনলালের ভগ্নী)' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বাংলার বেগম, ৩ পাতা)। তিনজনের তালিকা দিলেও বিবাহিতা পত্নী যে একজন একথা তিনি স্বীকার করেছেন। বেভারিজ সাহেব লুৎফউন্নিসাকেই মোহনলালের ভগ্নী বলে স্বীকার করেছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এইমত গ্রহণ করেছেন। নিখিলনাথ রায় বলেছেন - 'মুর্শিদাবাদের পরলোকগত নবাব বাহাদুরের দেওয়ান ফজলে রব্বী খাঁ বাহাদুরও বিশ্বাস করতেন যে লুৎফউন্নিসাই মোহনলালের ভগিনী।' (মুর্শিদাবাদ কাহিনী ১৮৭ পাতা) মোহনলালের উন্নতিতেও এই কথাই প্রমাণিত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে গিরিশচন্দ্র অনুসরণ করে অনেক সাহিত্যিক সিরাজ কন্যার নাম উম্মত জহুরৎ বলেছেন এবং অনূঢ়া অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে ঘোষণা করেছেন। দুটি সংবাদই ভুল। এই কন্যা ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে

মাতা লুৎফউন্নিসা বেগমের সঙ্গে ঢাকায় স্থানান্তরিত হন। তাঁর নাম উম্মৎ সায়রা বেগম। সেখানে তাঁর বিবাহ হয় এবং চারটি কন্যার জন্ম হয়। এই শিশু কন্যা চারটিকে রেখে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে উম্মৎ সায়রা বেগম ঢাকায় পরলোকগমন করেন। কালক্ষেপ না করে লুৎফউন্নিসা, গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবকে এক আর্জি পাঠালেন তাতে লেখা হল—'আমি ও নবাব সিরাজদৌল্লার কন্যা এযাবত ঢাকার রাজস্ব বিভাগ থেকে মাসিক ছয়শত টাকা করে পাইতাম। সম্প্রতি চারমাস আগে মৃত নবাব সিরাজদৌল্লার কন্যা, চারিটি শিশুকন্যা রাখিযা মৃত্যুমুখে পতিত হইযাছেন। নূতন আদেশ না আসা পর্য্যন্ত মুৎসুদ্দিগণ মাসহারা দিতে অস্বীকার করিয়াছে। বিনীত নিবেদন অবিলম্বে ঢাকার রাজস্ব বিভাগের মুৎসুদ্দিগণকে নিয়মিত মাসহারা পূর্ণবহাল করিবাব আজ্ঞা হয।' হেষ্টিংস সাহেবেব হুকুমে অবিলম্বে মাসহারা নিয়মিত দেবার আদেশ পাঠান হয়।[৭৭]

এই সূত্রে জানাবার সুযোগ হচ্ছে যে ১৭৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মীরজাফর খোসবাগ দান করেন উম্মৎসায়রা বেগমকে। তাঁর মৃত্যুর পর এই সম্পত্তিতে লুৎফউন্নিসা বেগম বসবাস শুরু করলে বাৎসরিক ৩৬৬০ টাকা পেতেন। পাটনার বেগমপাড়ার দরুণ পেতেন বাৎসরিক ১৩০০ টাকা, ঢাকার পেনসন বাবদ মাসিক ১০০ টাকা আর কলকাতার পেনসন বাবদ মাসিক ৫০০ টাকা।

১৪ই জুন ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এই আর্জিতে পাটনায় দাদা মোহনলালের সঙ্গে যে যোগসূত্র আছে একথা অনুমান করা যায় কারণ লুৎফউন্নিসা হেষ্টিংস সাহেবের কাছে অভিযোগ করেছেন যে পাটনায় সিরাজদৌল্লার পিতা নবাব জৈনুদ্দিন আহমেদ খাঁর কবরের রক্ষণাবেক্ষনের খরচ চালাবার জন্য যে দুইটি গ্রাম দেওয়া হয়েছিল, কোম্পানীর মুৎসুদ্দিরা সেই গ্রাম দুটি কেড়ে নিয়েছে কাজেই সমাধিক্ষেত্রের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। বলা বাহুল্য হেষ্টিংস সাহেব তখুনি পাটনার ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষকে গ্রাম দুটি ফিরিয়ে দেবার আদেশ জারী করেন। এই ঘটনায় পাটনার মোহনলালই যে লুৎফউন্নিসার দাদা এবং পাটনা ও ঢাকার মধ্যে তাঁরা যে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখেছিলেন একথা প্রমাণ করা যায়। রাজা মোহনলালকে এই সূত্রে আবিষ্কার করলে তিনিই যে বস্ত্র-ব্যবসায়ী ও অহিফেন কারবারী মোহনলাল সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জীবিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঘসেটি বেগমের পালিত এক্রামাদৌল্লার পুত্র ও সিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্রকেও ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দেই মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। যদি আলিবর্দীর বংশে কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী জীবিত না থাকে তাহলে মীরণের অধিকার আইনসঙ্গত সাব্যস্ত হয়, তাই এই হত্যাগুলিকে মীরণের কীর্তি বলে বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাসের অনুসন্ধান অন্য কথা বলে। সিরাজের ছোট ভাই মীর্জা মেহেদীকে জীবিত থাকতে দেখা যায় ২৪ মে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি নাম পালটে নবাব মহবুল আলি খাঁ নামে পরিচিত ছিলেন। সিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র বা এক্রামাদৌল্লার পুত্র মুরাদদৌল্লা কিন্তু নিহত হন নাই। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁর বেঁচে থাকার প্রমাণও আছে। তিনিও ঢাকায় বসবাস করেছেন। সেখানে সম্ভবত তিনি বিবাহ করেন এবং সন্তানাদি জন্মায়। মুরাদদৌল্লা মাসিক ৪০০ টাকা করে পেতেন। সংসার যাত্রার জন্য অকুলান হওয়ায় তিনি মাসহারা বৃদ্ধি না করলে মাসহারা গ্রহণ করবেন না বলে হুমকি দেওয়ায় তার মাসহারা বন্ধ করে দেওয়া হয়। মুরাদ কিছুদিন ধারধোর করে চালালেন। কিন্তু ক্রমে পাওনাদারের সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। শেষে উপায়ন্তর না পেয়ে নবাব দরবারে ইংরেজ প্রতিনিধি স্যামুয়েল মিডলটন সাহেবকে সব জানিয়ে এক আকুতি ভরা আর্জি পাঠালেন। খাঁটি ইংরেজের মতো কালবিলম্ব না করে রেসিডেণ্ট সাহেব কলকাতায় গবর্ণর সাহেবকে চিঠি লিখে মুরাদদৌল্লার চারশ টাকার মাসহারা নিয়মিত পাবার আদেশ আনিয়ে দিলেন।[৭৮] রাজস্ব বিভাগের কাগজপত্র এবং পলাশীর যুগের সামনের পেছনের দলিল দস্তাবেজ দেখতে দেখতে এই কথাই মনে হয় যে মাত্র দুশো বছর আগেকার ঘটনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কত সীমিত অথচ কাগজপত্রের মধ্যে ঝুড়ি ঝুড়ি খবর ছড়িয়ে আছে। দলিল দস্তাবেজে সিরাজদৌল্লার যুগের অনিশ্চিত অবস্থা ফুটে উঠেছে। অথচ সিরাজদৌল্লার রাজত্বের আগে এবং পরে বিরাজ করছে স্বাভাবিক শান্তি।

॥ সিরাজ চরিত্র ॥

সিরাজ চরিত্র কেমন ছিল নাটক সমালোচনার সময় কিছু কিছু বলা হয়েছে। সিরাজদৌল্লার বিলাস বা স্ত্রী সম্ভোগ একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

সুজা খাঁ, সরফরাজ, এক্রামাদৌল্লা, শওকতজঙ্গ, সিরাজদৌল্লা, মীরণ এমন কি বৃদ্ধ মীরজাফর পর্য্যন্ত এই স্বাভাবিক নবাবী বিলাসে মগ্ন হয়েছেন। তবে এদের মধ্যে সিরাজ ছিলেন সব থেকে অল্প বয়স্ক (এক্রামাদৌল্লা বাদে), সব থেকে ক্ষমতাসম্পন্ন আর সব থেকে আদরে লালিত তাই তাঁর উগ্রতা একটু বেশী হবে বৈকি। স্ত্রীলোক সম্ভোগ, যুবতী ক্রীতদাসী ক্রয় বা সুন্দরী স্ত্রীলোক উপঢৌকন দেওয়া সেকালের সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গ বিশেষ ছিল একথা 'বাজীরাও' প্রবন্ধে বলার চেষ্টা হয়েছে। বলা হয়েছে নবাব সিরাজদৌল্লার হারেমের জন্য সমস্ত সভাসদ মায় ইংরেজ ও ফরাসী কোম্পানী স্ত্রীলোক উপহার দিয়েছিল। সাধারণ উপহারের সঙ্গে তফাৎ ছিল এই যে ওই স্ত্রীলোক গুলির উপহারকর্তা এদের গুপ্তচরবৃত্তি করতে শেখাতেন। হারেমের স্ফূর্ত্তির ঝোঁকে (যদি ধরে নেওয়া যায় যে আলিবর্দীর কাছে শপথ অনুযায়ী তিনি মদ্য স্পর্শ করেন নি আর জীবনে) যা বলতেন পরদিনই তা সকলের জানা হয়ে যেত। যে রকম নিয়মিত ভাবে নবাব হারেমে উপস্থিত হয়েছেন এবং হারেমের বিভিন্ন উক্তির মধ্যে তাঁর মেজাজের যে চড়া চেহারা পাওয়া যায় তাতে মাদক দ্রব্যের স্পর্শ নাই বিশ্বাস করা কঠিন। বিশেষ তার শাসনের প্রথম সাত মাসের সাফল্যকে পেছনে ফেলে দিয়ে পরবর্তী সাত মাসের কর্মহীন ব্যর্থতা তাঁর চিন্তার জড়তা প্রকাশ করে। অত্যধিক বিলাস ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের ফলে মনের ক্লীবতা একান্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ সিরাজদৌল্লার এই জঘন্য চরিত্র সম্পর্কে কোন দ্বিমত করেন নাই। আচার্য্য যদুনাথ সরকার তাঁর হিষ্টরী অব বেঙ্গলের দ্বিতীয়খণ্ডের ৪৬৮ থেকে ৪৭১ পৃষ্ঠায় সিরাজদৌল্লার চরিত্র আলোচনা করেছেন। আচার্য্য রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর রচিত বাংলাদেশের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭৪-৭৫ পাতায় সিরাজদৌল্লার চরিত্র আলোচনা করেছেন। নীচে উদ্ধৃতি দেওয়া হল। 'সিরাজের অস্থিরমতিত্ব, অদূরদর্শিতা, লোকচরিত্রে অনভিজ্ঞতা, প্রভৃতি ছাড়াও তাঁহার চরিত্রে আরো অনেক দোষ ছিল। ..... সমসাময়িক ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে সিরাজের চপলমতিত্ব, দুশ্চরিত্রতা, অপ্রিয়ভাষণ ও নিষ্ঠুরতার জন্য সভাসদেরা সকলেই তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এই বর্ণনা কতকটা পক্ষপাত দুষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে সিরাজের

যে কলঙ্কময় চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহাও যেমন অতিরঞ্জিত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও সিরাজদৌল্লাকে যে প্রকার স্বদেশবৎসল ও মহানুভব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও ঠিক তদ্রূপ।…… কিন্তু ফরাসী অধ্যক্ষ জাঁ ল সিরাজের বন্ধু ছিলেন। সুতরাং তিনি সিরাজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। তিনি এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই: "আলীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই সিরাজ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র বলিয়া কুখ্যাত ছিলেন। তিনি যেমন কামাশক্ত তেমনই নিষ্ঠুর ছিলেন। গঙ্গার ঘাটে যে সকল হিন্দুর মেয়েরা স্নান করিতে আসিত তাহাদের মধ্যে সুন্দরী কেহ থাকিলে সিরাজ তাঁহার অনুচর পাঠাইয়া ছোট ডিঙ্গিতে করিয়া তাহাদের ধরিয়া আনিতেন। লোক বোঝাই ফেরী নৌকা ডুবাইয়া দিয়া জলমগ্ন পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুদের অবস্থা দেখিয়া সিরাজ আনন্দ অনুভব করিতেন। কোন সম্রান্ত ব্যক্তিকে বধ করিবার প্রয়োজন হইলে আলিবর্দী একাকী সিরাজের হাতে ইহার ভার দিয়া নিজে দূরে থাকিতেন যাহাতে কোন আর্তনাদ তাঁহার কানে না যায়। সিরাজের ভয়ে সকলের অন্তরাত্মা কাঁপিত এবং তাহার জঘন্য চরিত্রের জন্য সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিত।" সুতরাং সিরাজের কলুষিত চরিত্রই যে তাঁহার প্রতি লোকের বিমুখতার অন্যতম কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

লা সাহেব আরো লিখেছেন—"বাংলার নবাবদের চরিত্রের কুখ্যাতি চিরকালের কিন্তু সিরাজদৌল্লার কুখ্যাতি সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।" লিখেছেন যে নবাব সিরাজদৌল্লা অন্যের মৃত্যু দেখতে ভালবাসতেন এবং পৈশাচিক আনন্দ পেতেন। জলে নৌকা উলটে গিয়ে সাঁতার না জানা শত শত স্ত্রী-পুরুষ শিশু এই বিশৃঙ্খলায় কিভাবে ডুবে মরে দেখতে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। এই বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলা চলে। নানারকম অমিতাচার ও লাম্পট্যে লা সাহেব নবাব সিরাজদৌল্লার পারদর্শিতা ঘোষণা করেছেন। সিরাজের এ চরিত্র এত সোচ্চার ছিল যে তিনি সুবেদার পদ পাবেন না বলেই সবাই বিশ্বাস করেছিল। বিশেষ সিরাজের প্রতিহিংসা-পরায়ণতা এমন সাংঘাতিক ছিল যে কবে কখন সিরাজের চোখে অপরাধী সাব্যস্ত হন সেই ভয়েই সবাই তটস্থ হয়ে থাকতেন। ইংরেজদের সিরাজ 'টুপিওয়ালা' বলতেন এবং মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন।[৭৯]

সিরাজদৌল্লা ৫০০০০ অশ্বারোহী আর পদাতিক সৈন্য নিয়ে কাশিমবাজার কুঠি অবরোধ করেন ২রা জুন ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। শওকতজঙ্গও তাঁর পরাক্রম দেখে বশ্যতা স্বীকার করেন এবং কলকাতা জয়ে ৪০০০ সৈন্য সাহায্য করেন। সিরাজের কলকাতা জয় এক বিরাট কীর্তি! রায়দুর্লভের নেতৃত্বে মীরমদন এই জয়ের প্রধান স্রষ্টা। সিরাজ কিন্তু কলকাতা জয়ের সময়ও মহিলা সংগ্রহের ব্যাপারটা ভোলেননি। লা সাহেব লিখেছেন যে তিনি পরে জেনেছেন সিরাজের হারেমে কলকাতা জয়ের পরে যে মহিলাকে আনা হয় তিনি ছিলেন গঙ্গানদীর এক ইংরেজ জাহাজ চালকের স্ত্রী। ঢাকার ইংরেজ কুঠিতে দুই তিনটি পরমাসুন্দরী রমনী আছেন খবর পেয়ে সিরাজ লুব্ধ হয়ে পড়েন এবং তাদের সংগ্রহে সৈন্য পাঠান। ঘটনাচক্রে সে দুষ্কর্ম ঘটেনি।[৮০]

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭র যুদ্ধে পরাজয় ও পলায়নের পর সিরাজের চরিত্রে লক্ষনীয় পরিবর্তন দেখে লা সাহেব আশ্চর্য্য হয়েছেন। ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা এবং তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার নবাবী সংকল্প অটুট থাকলেও তিনি তাদের ভয় করতে আরম্ভ করেছিলেন। এই ভয় এত স্পষ্ট যে নবাব দরবারে ওয়াটস সাহেব গলা ফাটিয়ে চীৎকারে করে সন্ধির পাওনা বারে বারে আদায় করতে লাগলেন। শান্তির প্রস্তাব নিয়ে যেদিন ক্লাইভের কোন চিঠি আসত নবাব রীতিমতো খুসী হয়ে উঠতেন। তার দুই চোখ আর মন ভরেছিল ইংরেজ কোম্পানী তাই তিনি সভাসদদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারলেন না। ইংরেজ যখন হুমকী দিল কাশিমবাজারের ফরাসীদের তাড়াও নইলে যুদ্ধ হবে! সিরাজ তার বহুদিনের সুহৃদ এবং ফরাসী শক্তির প্রতিনিধি লা সাহেবকেও বাংলা ছেড়ে চলে যাবার আদেশ দিতে বাধ্য হলেন।

লা সাহেব বলেছেন ভয় আর লোভ সিরাজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। যতদিন শক্তির অহঙ্কার ছিল ততদিন লোভই ছিল সিরাজের প্রভু কিন্তু যেদিন থেকে ভয় এসে লোভের জায়গায় বসল সিরাজের সমস্ত কাজ কর্মচিন্তা ভাবনা বিপথ-গামী হয়ে গেল। কলকাতার পরাজয়ে এই ভয়ের সুরু চন্দননগরের পতনে সহস্রগুণ বর্ধিত হল। লা সাহেবকে বিদায় দেবার সময় সিরাজদৌল্লা বিরক্তি প্রকাশ করে বলে ফেললেন—'আপনাদের জন্যেই এসব হচ্ছে। আপনাদের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলেই ইংরেজ যুদ্ধসজ্জা করেছে। আপনাদের জন্যে আমিতো আর সমস্ত দেশটাকে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত করতে পারিনা। তাছাড়া

আপনাদের আমি রক্ষা করব কেন। আপনারা নিজেদের রক্ষা করতে একেবারেই অক্ষম। আমি যখন সাহায্য চাই পাইনা। এখন আপনাদের আমার কাছে সাহায্য পাবার আশা করা উচিত নয়' (p 205)। কিন্তু লা সাহেবের সঙ্গে সিরাজের হৃদ্যতা শেষ মুহূর্তে প্রকাশিত হল। বন্ধুত্ব ও সখ্যতা প্রকাশক 'পানের খিলি' হাতে দিয়ে লা সাহেবকে নবাব বললেন— 'যে রাস্তা দিয়ে ইচ্ছা আপনি যাত্রা করুন। ঈশ্বর আপনার পথ প্রদর্শক হন' (p. 206)। লা সাহেবের বর্ণনায় এক অপরিনামদর্শী দুর্বিনীত যুবক ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মনে হয় নিজের দুশ্চরিত্রতা আর ভীরুতার কাছে পরাজিত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছেন। বন্ধুহীন একাকীত্ব তার কাণ্ড-জ্ঞানহীনতার সহায়ক হয়েছে। সকলের প্রতি অবিশ্বাস ও কাপুরুষতা, তাকে করে তুলেছে অত্যাচারী।

স্ক্রাফটন সাহেব দরবারে নবাবকে দেখে কাশিমবাজার কুঠি থেকে ক্লাইভকে চিঠি লিখলেন ২৮শে এপ্রিল ১৭৫৭। তিনি লিখেছেন যে 'মথুরামল আর নন্দকুমারের চিঠি পেয়ে নবাব আবার রেগে ফেটে পড়েছেন। এরা জানিয়েছেন যে ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ অভিমুখে সমরসজ্জা করছেন। সামনে বুড়ো উমিচাদকে পেয়ে নবাব তাকে যতপরোনাস্তি অপমান করলেন তারপর মীরজাফরকে ডেকে সৈন্য সাজাতে বললেন, এমনকি তার নিজের তাঁবুও বাইরে খাটান হল। লা সাহেবকে ফিরিয়ে আনার জন্য তখনি চর পাঠাতে বললেন। ইংরেজদের ধ্বংস করে ফেলবার আদেশ দিলেন। সন্ধ্যায় আপনার চিঠি পেয়ে নবাব খুবই খুসী হলেন। সমস্ত আদেশ নাকচ করে দেওয়া হল। ওয়াটসকে ডেকে শুনিয়ে দিলেন যে ইংরেজ এক পা আগালেই যুদ্ধ অনিবার্য্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়াটসের সঙ্গে নবাব আবার বন্ধুত্ব প্রকাশ করলেন। নবাব ইংরেজবাহিনীর অগ্রগতি বন্ধ করে দেবার প্রতিশ্রুতি চেয়ে চিঠি লিখবেন বললেন। এসব ঘটনাতেই সারাদিন কেটে গেল। তবে আপনার জেনে রাখা ভাল যে নবাবের সৈন্য প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।' (S. C. Hill, ed. Bengal 1756—57, p. 344—346)।

বদমেজাজ আর রাজনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা নবাব সিরাজদৌল্লার পতনকে ত্বরান্বিত করেছে। মীরজাফর তার ব্যবহারে গিয়েছে বিপক্ষে। এমনকি তার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মোহনলাল আর মীরমদনের ওপরেও আস্থা

রাখতে পারেননি। কোনরকম সদগুণ সিরাজদৌল্লার মধ্যে পাওয়া যায় না। জীবন তার অত্যন্ত অনিয়মিত। স্বেচ্ছাচার তার একমাত্র কীর্ত্তি, অনাচার, অবিচার আর অসংযম তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। এমন চরিত্রকে নাটকের প্রধান চরিত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব বলেই কল্পিত সিরাজ চরিত্রের সৃষ্টি।

ঐতিহাসিক নাটকে সিরাজদৌল্লার সত্যিকারের চরিত্র প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু সিরাজের মনোবিকলন নাটকের উপজীব্য হতে পারে যদি সে বিষয়ে কোন নাট্যকার সচেষ্ট হন। চরিত্রের একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা, স্বজনহীনতা, বান্ধব-হীনতা, ট্রাজেডি সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে। বিলাসে লালিত, ভোগে পালিত, মাতা, মাতৃস্বষা, স্ত্রীর ভালবাসা না পাওয়া এক জীবন। মোগল শাসনের সায়াহ্ন, চরিত্রের মধ্যে স্পষ্ট প্রকাশিত। মাতার আসঙ্গলিপ্সায় বাধা দেওয়া, মাতা ও মাতৃস্বষার প্রণয়ীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা, মাতামহের না বলা নির্দেশে সিরাজ চরিত্রকে ট্রাজিক বিভৎসতা দিয়েছে। তারপর নিজে সেই কামনা সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জমান। ভোগের চোরাবালিতে তার সমাধি। এরই মাঝে এক ক্রীতদাসীর প্রেম, নিষ্ঠা, শুভকামনা তার নিত্যকার সঙ্গী। অথচ নবাব ক্রীতদাসীকে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিতে পরান্মুখ হলেও সেই ক্রীতদাসীই ঘোষণা করল যে তার কন্যা নবাবের বীর্য্যসম্ভূতা। যে লুৎফউন্নিসাকে সিরাজ কোনদিন মর্য্যাদার আসন দিলেন না তিনি সযত্নে রক্ষা করলেন তার নাম। স্ত্রী না হয়েও স্ত্রীর কর্তব্য সম্পাদন করে গেলেন আমৃত্যু (সূত্র ২৯ দ্রষ্টব্য)। লুৎফউন্নিসা আর সিরাজ বিপরীত সংযোগ। কাশ্মিরী হিন্দু আর আরব-তুর্কী মুসলমান বাংলার নরম মাটিতে একত্র হলেন কিন্তু এক হলেন না। এই ট্রাজেডী চমৎকার নাটকীয় উপাদানে ভরপুর। সিরাজকে রাজনৈতিক ও দেশপ্রেমিক করে তুলবার তাগিদে এদিকে দৃষ্টি দেবার কারু অবকাশ হয় নাই। ভালবাসার কাঙাল এক তরুণ নিজের মনের বিহ্বলতার কাছে হেরে গেল। তার একান্ত ঈপ্সিত বস্তু তার হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে সে দেখতে পেল না। ঘটনাতরঙ্গ তাকে এক নারকীয় চরিত্রে রূপান্তরিত করল। এমন বিয়োগান্ত ঘটনা সহজে পাওয়া যায় না। চমৎকার নাটক সৃষ্টির উপাদান। কিন্তু ইতিহাসের পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে সিরাজদৌল্লা বাঙালীর জীবনে এক দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

একশ বছর ধরে সিরাজদৌল্লা সম্পর্কে নানা নাটক লিখে বাঙালী তাদের

ভাবালুতার পরিচয় দিলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের মহামুহূর্তে সিরাজ চরিত্রের ব্যর্থতা প্রকাশ করতে পারলেন না ; নাটকের ইতিহাসে এটা চরমতম বিয়োগান্ত ঘটনা। বাংলাদেশের নাট্যকাররা অষ্টাদশ শতাব্দীর সমসাময়িক যুগকে তাঁদের নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনাই তারা ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। হিন্দুমুসলমানের কলহের যুগে নাটক লিখতে বসে তাঁরা ধরে নিয়েছেন চিরকালই এমনি ছিল। তাই হিন্দুমুসলমান মিলন সঙ্গীত তাঁদের নাটককে মুখর করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর হিন্দু-মুসলমান সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। ইংরেজ শিক্ষিত হিন্দু নাট্যকার ইতিহাস পাঠ না করায এ বিষয়ে কোন হাল-হদিশই পান নাই। সে যুগে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ ছিল না। তার ওপর মুসলমান তখন রাজার জাত তাদের হালচালই অন্য রকম। সাধারণ হিন্দু খাওযা দাওয়া পোষাক পরিচ্ছদ চালচলনে পুরোপুরী হিন্দুযানী বজায় রাখতেন। নবাব কর্মচারী হয়ে যে সব হিন্দুদের মুসলমানী পোষাক এবং আদব কায়দা করতে হত তাঁরাও বাড়ী ফিরেই ধড়াচূড়া ছেড়ে স্বস্তি পেতেন। কোন হিন্দু তা সে যত উচ্চ কুলোদ্ভব বা নামী সরকারী কর্মচারী হোন না কেন মুসলমানের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করলে সমাজে ব্রাত্য হতেন। কাজেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কাঁচের প্রাচীর পরস্পরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলত। তখন মুসলমান বলতে দুইরকম জাতি বোঝাত। এক হলেন বাঙালী মুসলমান এরা সাধারণ লোক আর অন্য হলেন শাসক মুসলমান এরা সকলেই বিদেশী। আলিবর্দী, সিরাজদৌল্লা, মীরজাফর, ইয়ারলতিফ খাঁ এমনকি মীরকাশিম পর্য্যন্ত সকলেই এই বিদেশী শাসক মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত। বাংলার নবাবরা প্রায় সকলেই ছিলেন 'সিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত, দিল্লীর 'সুন্নী' সম্প্রাদায়ভুক্ত বাদশাহবংশ তাই কখনই বাংলার নবাবদের আপনজন ভাবতে পারেন নাই। আমাদের হিন্দু নাট্যকারগণ মুসলমান সমাজ বা তাদের আচার ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট অজ্ঞতাই দেখিয়েছেন। কলহের যুগে বাস করে তারা মুসলমান চরিত্র নিয়ে বহু নাটক রচনা করলেও তাদের সম্পর্কে একেবারেই অনুসন্ধান করেন নাই। আর এক মহৎ দোষ দেখা যায়। একবার কোন নাট্যকার কোন চরিত্র সৃষ্টি করলে পরবর্তি নাট্যকাররা তার জের টেনে চলেন। নাদির শাহ

সম্পর্কীয় নাটকেও এই ঘটনা দেখা গেছে। সিরাজ হতে হতে দেশহিতৈষী হয়ে গেলেন, মোহনলাল এক মস্ত বীর আর মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকের সেরা। বীর আলিবর্দীকে ভুলে সৃষ্টি হল এক জবুস্থবু বৃদ্ধের। জগৎশেঠ হলেন নীচ কুশীদজীবী, রায়দুর্লভ হীনবুদ্ধি কর্মচারী আর ওয়াটস এক কাণ্ডজ্ঞানহীন বীর ইংরেজ, সিনফ্রে সিরাজের ফরাসী সেনাপতি। নবীনচন্দ্র ছাড়া ক্লাইভের কোন স্পষ্ট ছবি নাট্যকারগণ আঁকতে পারেন নাই। অথচ প্রতি নাটকেই পলাশীর যুদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছে। ক্লাইভকে কথন সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে পলাশীর বিবরণ লিখে বাঙালী নাট্যকারগণ প্রমাণ করেছেন যে ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়েও হ্যামলেট নাটক করা সম্ভব। রাজা রাজবল্লভ নাটকে নাটকে লুকোচুরি খেলেছেন। কখন তিনি প্রধান চরিত্র কখনও একেবারেই অন্তর্ধান। নবাব মহিষীর মর্য্যাদা পেয়েছেন লুৎফউন্নিসা বেগম। তাকে বাঁঙালী হিন্দুর ঘরের এক পুতুল বৌ বানান হয়েছে। মহিষী হিসাবে সম্মানিত হলেও তাঁর কর্মচঞ্চল জীবনীর প্রতি অবিচার করা হয়েছে সব থেকে বেশী। ঘসেটি বেগমও একমুখী চিন্তাতরঙ্গে বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছেন। সিরাজদৌল্লার মাতা আমিনা বেগম, সিরাজের শিক্ষাগুরু হোসেন কুলিখাঁ বা সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর্জা মেহেদী কোন নাট্যকারের স্পর্শ পান নাই। সিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র মুরাদদৌল্লাকে কিছুদিন 'ছোটনবাব' বলে ডাকা হয়েছে, তাঁকেও কোন নাটকে দেখা যায়না। শওকতজঙ্গের পক্ষে বাঙালী বীর শ্যামসুন্দরের বীরত্ব কাহিনী কেবল ছোটদের নাটকটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে নন্দকুমার তখনও শহীদ হননি। তার বিশ্বাসঘাতক এবং উৎকোচ গ্রাহক রূপটাই বিভিন্ন নাটক মাধ্যমে প্রকাশিত। পরবর্তি খণ্ডে নন্দকুমারের শহীদ হবার ক্রমবিবর্ত্তন দেখা যাবে। মঁসিয়ে লা বা তার লেখনী সম্পর্কে সকলের অজ্ঞতাই ফুটে উঠেছে। সিরাজদৌল্লার অন্যান্য বন্ধু বা শত্রু সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ছাড়া কেউই কোনরকম অনুসন্ধান করেন নাই।

সমসাময়িক কালের সামাজিক ব্যবস্থা না জানা থাকায় সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এ সময়ের কোন প্রভাব পড়েছিল কিনা নাট্যকারগণ বুঝতে পারেন নাই। তাঁদের নাটক পড়ে সমসাময়িক কোন সাহিত্যের নাম জানা যায় না। রামপ্রসাদ নাটক একেবারেই অলীক ঘটনাপূর্ণ এবং আলোচনার অযোগ্য। সুতরাং সেই সময়কার বাংলায় প্রচুর খাদ্যসম্ভার এবং প্রাচুর্য্য কি ভাবে সাধা-

রণের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছিল নাটকে তার খোঁজ পাওয়া যায় না। যে মদমত্ত পারিপার্শ্বিকতা ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল তাতে কোন উচ্চভাব অঙ্কুরিত হতে পারে না। তাই সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতে এই সময় হতাশাব্যঞ্জক। অথচ মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও ইংরেজ-দের শাসন সুরু হওয়া মাত্র শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরম্ভ হল নবজাগরণের যুগ। সঙ্গীতে খেয়াল প্রতিষ্ঠিত হল স্বমর্য্যাদায়। শিল্পসৃষ্টি যেন বাঁধন কেটে প্রকাশিত হল প্রজাপতিব মত। নৃত্যে লক্ষ্ণৌএর নয়া ঘরাণা কত্থকের তালে নেচে চলল, সহজ হয়ে দেখা দিল মাদ্রাজে কেরালার কথাকলি। মুসলমান যুগের অন্তিম সময়ে বিলাসিতা ক্ষয়রোগের দুরারোগ্য প্রাবল্যে নেতৃস্থানীয়-দের গ্রাস করল। বাদশাহ শাহ আলম থেকে প্রধান উজীর সুজাউদৌল্লা সবাই এই রোগে ভুগেছেন। বৃদ্ধ মীরজাফর বাদ যাননি সিরাজ তো বালকমাত্র। তাই তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে সিরাজ অত্যন্ত আত্মসচেতন নবাব ছিলেন তাহলেও স্বীকাব করতে হবে যে নাগরীর কলহাস্যে, নর্তকীর নূপুর নিক্কনে, সুরার সঙ্গীতে সে সচেতনতা ভেসে গিয়ে গঙ্গায় বিলীন হয়েছিল। নবাবের নবাবী অন্তর্হিত; কলনাদিনী গঙ্গা আজও প্রবহমান।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বা ঐতিহাসিক চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারগণ যে অপারগ হয়েছেন তা প্রমাণ করা হয়েছে। দুঃখের বিষয় যে তাঁরা সমসাময়িক সাহিত্যকেও উপেক্ষা করেছেন তাই সামাজিক চিত্রও প্রকাশ করতে সক্ষম হতে পারেন নাই। সামাজিক রূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে সেই সময়কার অর্থ নৈতিক কাঠামো সম্পর্কে তাদের অজ্ঞানতা প্রকাশ পেয়েছে। অথচ কেবল সমসাময়িক সাহিত্য লক্ষ্য করলে এ বিষয়ে তাঁরা স্পষ্ট ধারণা করতে পারতেন এবং নাটকের আবহাওয়াতে সমসাময়িক কালকে নিয়ে আসতে পারতেন। এইসব বিষয়ে তাদের উৎসাহের অভাবে তাদের নাটকে বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ পড়েছে। কোন নাট্যকারই তাঁর নাটকে অষ্টাদশ শতাব্দীকে দেখাতে পারেন নাই। এই চরম ব্যর্থতা তাঁদের ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রয়াসকে উপহাসের সামগ্রী করে তুলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করা কঠিন হত না যদি অন্তত সেই যুগের বাংলা সাহিত্য অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা হত। কিছু না জেনে ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রয়াস সফলতার আশা করতে পারে না।

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে শুধুমাত্র কাশিমবাজারের জনসংখ্যা ছিল একলক্ষ। ব্যবসায়ী সহর হবার জন্য বহু বণিক, মহাজন, স্রফ ও গদীওয়ালা স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। গুজরাটি বণিকরা গঙ্গার ধারে এক উপনিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছেন। এই অঞ্চলের নাম হয়েছে মহাজনটুলি। অধিবাসী-দের বেশীর ভাগই হিন্দু। তাদের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভুর প্রভাব খুব বেশী। কেনাবেচার মাঝে প্রায়ই কীর্তন শোনা যায়, মৃদঙ্গ আর কর্তালের ধ্বনি ব্যবসায়ীদের উন্মনা করে দেয়। ইংরেজ বণিক ও স্থানীয় ব্যবসাযীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহু শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণ নদীয়াতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বে বসবাস করতে চলে গেলেন। তাঁদের জমি-জমা বাড়ী ঘর হিন্দু ব্যবসায়ীরা কিনে নিলেন। নদীয়া তখন শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্রভূমি। ন্যায় দর্শন ও স্মৃতি সব বিষয়েই নদীয়াতে চর্চা চলছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্র কাব্যরচনা করে চলেছেন। পলাশীর যুদ্ধের আগেই ভারতচন্দের পূর্ণ বিকাশ হয়, মৃত্যু হয় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে। গানিতিক শুভংকরও এই সময়কার মানুষ। রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাই পলাশী-পূর্ব যুগেই প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। এছাড়া মেদিনীপুরের রাজা রামসিংহের সভায় রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য শিবায়ণ রচনা করলেন। বিষ্ণুপুরে রঘুনাথ সিংহের সভায় শঙ্কর চক্রবর্তি রামায়ন ও মহাভারত বাংলা ভাষায় প্রকাশ করলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্রের সভায় ঘনরাম চক্রবর্তি ধর্মমঙ্গল রচনা করলেন। বীরভূমের আসাদ আল্লা খানের সভায় নৃসিংহ বসুও ধর্মমঙ্গল রচনা করলেন। এরা ছাড়া বহু বিখ্যাত সাহিত্যকীর্তি রচিত হল এই সময়। তাদের মধ্যে বিখ্যাত কবিচন্দ্রের রামায়ণ, বলরাম দাসের কৃষ্ণলীলামৃত, রামজীবনের মনসামঙ্গল ও সূর্য্যমঙ্গল, কবিরাজ ফকিরামের লঙ্কাকাণ্ড আর প্রেমদাসের চৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী। এই যুগের পাঁচালী গানের মধ্যেও আছে সমসাময়িককালের চিত্র। এ যুগের বহু হিন্দু যেমন বৈষ্ণব তেমনি বহু মুসলমান সুফী মতাবলম্বী। উভয় সম্প্রদায়ের বহু কবির বহু গাঁথা আজও পাওয়া যায়। সহজিয়া ও আউল বাউল সম্প্রদায় এই সময় বেশ সম্প্রসারিত হয়। বাঙালী হিন্দুর ন্যায় অম্বেষী মন হিন্দুধর্মের ফাটল দিয়ে প্রকাশিত হল।—

'তোমার পথ ঢাই গ্যাছে মন্দিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনি সাঁই, চলতে না পাই

রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে ॥'

আরো চমৎকার গান—'ও তোর কিসের ঠাকুর ঘব ?
(যাবে) ফাটকে তুই রাখলি আটক
তাবে আগে খালাস কব।'

অর্থ নৈতিক দিক থেকে মুর্শিদাবাদেব পাশ্ববর্তী অঞ্চলের উন্নতি লক্ষনীয়। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী বন্দবের পর্তুগীজ আধিপত্যের অবসান হয় এবং হুগলী বাদশাহী বন্দরে রূপান্তবিত হয়। তখন সাধাবণ ব্যবসায়ীরা বন্দর কাশিমবাজারে জমায়েত হলেন। কাশিমবাজারেব উন্নতি আরম্ভ হল। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হল। বাজধানীর তিনমাইলের মধ্যে অবস্থিত বলে বন্দর কাশিমবাজার খুবই উন্নতি লাভ করল।

বাংলাদেশ থেকে তখন নানা জিনিষ রপ্তানী হত। বাদশাহ ঔরঙ্গজীব বাংলাদেশকে তার সাম্রাজ্যের নন্দনকানন (Paradis› of my provinces) বলে সুখ্যাতি করতেন। প্রধান রপ্তানি ছিল চাল। প্রচুর পরিমাণে চাল বিভিন্ন দেশ গ্রহণ করত। এছাড়া সোরা, রেশমবস্ত্র, তাঁতবস্ত্র, ঘাসের তৈরী থান ও চাটাই জাতীয় জিনিষ, চিনি, নীল, ঘি, লঙ্কা বা মবিচ, মোম লাক্ষা ও মাটির পুতুল বাংলার অন্যতম রপ্তানী বলে গণ্য হত। জব চারণক যখন কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ তখন পাটনাব রেশম ব্যবসায়ে ৫০০০ পাউণ্ড আর কাশিমবাজারের রেশম ব্যবসাযে ৪০০০ পাউণ্ড লগ্নী করা হয়। রেশম ও তাঁতের কাপড়ের ব্যবসার প্রসারের জন্যই ওলন্দাজ, ফরাসী আর ইংরেজদের কুঠি কাশিমবাজারে স্থাপিত হয়। ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা রেশম ও সুতির কাটা কাপড বপ্তানি সুরু করল। প্রতিবছর ৬০০০ পেটি সেরা সিল্কের সুতো বা টানি ক্রয় হতে থাকল। সাদা গাড়া বা মোটা সুতি কাপড়ের থান প্রচুর পরিমাণে ফরাসী দেশে যেতে লাগল। ফরাসী সর্বাধ্যক্ষ ডুপ্লে ও ডুমার চেষ্টায় কাশিমবাজারে নূতন জিনিষের ব্যবসা সুরু হল। তাঁরা চীন থেকে ফটকিরি, কর্পূর, দস্তার তৈরী জিনিষ, পারদ, চীনামাটির সামগ্রী, চীনাসিন্দুর আর ঝুটা মুক্তা নিয়ে এসে বাংলার বাজারে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেন। ডুপ্লে ফরাসডাঙ্গায় রাজ্যের সেরা তাঁতীদের সমাবেশ করলেন। ফরাসডাঙ্গার তাঁতের জিনিষ পৃথিবী বিখ্যাত হয়ে গেল। ১৭৩৩

খ্রীষ্টাব্দে পাঁচখানা মালজাহাজ কাশিমবাজার থেকে মাল নিয়ে সোজা ফরাসী দেশে পৌঁছে গেল। রেশম ব্যবসায়ে কাড়াকাড়ি বেড়ে গেল। দাদনী ব্যবসাদারগণ কাঁচা রেশম সরবরাহ করার জামিন হলেন। ক্রমে রেশম ও তাঁত বস্ত্রের ব্যবসায় আকাশ ছুঁয়ে ফেলল। বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে ইংরেজ কোম্পানী ব্যবসাযেব ক্ষেত্রেও মুখ্য ভূমিকা নিলেন। যে সব দেশীয় ব্যবসায়ী তাদের সঙ্গে সহযোগিতা কবলেন না তারা ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। (Somendra Chandra Nandy, Life and Times of Cantoo Baboo, Vol. I, Chapter 1, 1978)

বিভিন্ন পর্য্যটকের রচনাতেও তৎকালীন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ জানা যায়। ভেনিসের নিকোলো মানুচী এই অঞ্চলে আসেন ১৬৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে, তার রচনায় দেশের সুন্দর ছবি পাওযা যায়। এছাড়া বাওরে (Bowrey, Countries round the Bay of Bengal) ১৬৬৯-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় আসেন। 'মসলিনের' বর্ণনায় তাঁর বৃত্তান্ত কাব্যসুষমা পেয়েছে। বেরনিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন সমৃদ্ধিপূর্ণ বাংলাদেশের। মানরিক বলেছেন পৃথিবীর সব থেকে সস্তা জায়গা এই বাংলাদেশ। এখানে দেড়টাকা মণ ভাল চাল আর দু টাকা মণ ঘি পাওয়া যায়। ২৫টা মুর্গীর দাম ছিল ২ টাকা, খাবার জন্য গরুর দাম ছিল ১ টাকা। তাছাড়া ভাত থেকে এক উৎকৃষ্ট মদ্য সস্তায় পাওয়া যেত। ট্যাভেরনিয়ারের রচনায় এক 'সতী' অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সব পর্যটকদের রচনা পাঠ করলে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝা যায। এই সময়কার হালচাল বোঝার এত সুযোগ থাকায় স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় যে এ সময়কে কেন্দ্র করে কোন রচনার অবতারণা করলে এই রচনাগুলির কয়েকটি বা অনেকগুলি পাঠ করা প্রয়োজন অথবা এ বিষয়ে যাঁরা ইতিহাস রচনা করেছেন সেগুলি অনুধাবন করা কর্ত্তব্য।

ঐতিহাসিক নাটক রচনায় ভূগোলের বোধ থাকা দরকার। ভূগোল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে নানা বিভ্রম সৃষ্টি হয়। এই সময়কার ভাগীরথী ছিলেন ক্ষীণকায়। নদীর দুইপাশে গড়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদ সহর। এপাড়ে ছিল 'নবাবী কেল্লা ওপাড়ে ছিল হীরাঝিল। স্থলপথে মুর্শিদাবাদ থেকে কাশিমবাজার ঘুরে আসতে হতো কিন্তু নদীপথ হয়ে সহজে আসা সম্ভব ছিল।

পরবর্ত্তীকালে নদীর একপারে চলে এসেছে মুর্শিদাবাদ শহর। হীরাঝিল গঙ্গাগর্ভে, নবাবী কেল্লা লুপ্ত। কাশিমবাজার এক বিস্মৃত প্রায় গণ্ড গ্রাম।

নিঃসন্দেহে বলা চলতে পারে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম সাতান্ন বছরের ইতিহাস নিয়ে যে সব নাটক লেখা হয়েছে তাতে এই সময়কার স্থান কাল বা পাত্র কিছুই প্রতিফলিত হয় নাই। ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে তাই এদের অভিহিত করা যায় না। ঐতিহাসিক নাটকের মর্য্যাদা এই রচনাগুলিতে রক্ষিত হয় নাই। উপরন্তু অধিকাংশ রচনা নাটক হিসাবেও ব্যর্থ হয়েছে। কেবল কল্পনার দ্বারা পরিচালিত পৌরানিক ও সামাজিক নাটকের মতো ঐতিহাসিক নাটকও একই পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক রচনার জন্য যে ইতিহাস জ্ঞানের প্রয়োজন তাও নাটকগুলিতে অনুপস্থিত। দুই চারটা ঘটনার সঙ্গে প্রচুর কল্পনার মিশ্রণে এই রচনাগুলি উৎপত্তি লাভ করেছে। ১৮৭৫ থেকে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ১০০ বছরকার নাট্যইতিহাসে এই ব্যর্থতা সত্যই করুণ এবং তাৎপর্য্যপূর্ণ। বাঙালী মনীষার এই ইতিহাস বিমুখতা নিঃসন্দেহে তাঁদের আত্মবিস্মৃতি প্রমাণ করে॥

॥ প্রথম খণ্ডের উপসংহার ॥

প্রথম খণ্ডের উপসংহার রচনা করতে গিয়ে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। (ক) পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকের মতো অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটক কল্পনা ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। ইতিহাসের কয়েকটি পাত্রপাত্রীর নাম গ্রহণ করা হলেও তাঁদের ঐতিহাসিক চরিত্র গ্রহণ করা হয় নাই। (খ) অনৈতিহাসিক নাটক হলেও জনসাধারণ এই নাটক দেখে প্রভাবিত হয়েছেন। নাট্যকারগণও অনেক সময়ে একে অন্যকে প্রভাবিত করেছেন। নাট্যবস্তুতে যে গল্প বলা হয়েছে তা শুধু নাটকের দর্শক নন তাদের উত্তরপুরুষগণ বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছেন। এই গালগল্প অবলম্বনেই পরবর্তীকালে উপন্যাস ছোট গল্প প্রভৃতি রচিত হয়েছে। নাটকের উদাহারণেই নাদিরশাহ এক অত্যাচারী দিগ্বিজয়ী, আহমেদ শাহ আবদালী এক কুৎসিত ও লম্পট লুণ্ঠক। জাহান্দার শাহ পাগল প্রেমিক, বাজীরাও প্রেমিক দেশপ্রেমী ও সদাশিব রাও ভাউ যুদ্ধানভিজ্ঞ কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ। বাংলার ইতিহাসের চরিত্রগুলির বিপরীত বিবরণ খুবই কৌতুহলদ্দীপক সন্দেহ নাই।

প্রথমেই সীতারাম মুসলমান শাসন থেকে মুক্ত হয়ে বাংলায় হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী আর মুর্শিদকুলি খাঁ এক নৃশংস ও অবিবেচক শাসক। তারপরেই দেশহিতৈষী সরফরাজ আর বিশ্বাসঘাতক হাজী আহমদ খাঁ, হিন্দু-গৌরব মহান ভাস্কর পণ্ডিত আর কুচক্রী অকর্মন্য স্থবির আলিবর্দী, অবশেষে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর এবং স্বদেশ প্রেমিক বীর মোহনলাল আর তাদের উভয়ের প্রভূ দেশের জন্য উৎসর্গিকৃতপ্রাণ স্বদেশবৎসল নবাব সিরাজদৌল্লা।

নাটক হিসাবে সব নাটকগুলি উচ্চপর্য্যায়ের না হলেও সাধারণ ব্যক্তির ওপর নাটকের যে ছায়া পড়েছে তা অনন্য সাধারণ। নাটকে প্রচারিত ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি সম্পর্কে এই বিপরীত উক্তিই ক্রমে এমন প্রচলিত হযেছে যে সকলে তাকেই সত্য বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। বর্তমানে ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশ করতে হলে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৮৭৬ পর্য্যন্ত যে এই অবস্থা ছিলনা তা নাটক মারফতই বোঝা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঐতিহাসিক নাটকের রচয়িতারা একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই এই নাটকগুলি রচনা করেছেন এবং তা হল (গ) দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা। এই মূল লক্ষ্যে দৃষ্টি রেখে নাট্যকারগণ যে বিষয় নির্বাচন করেছেন তার জন্য সাধুবাদ দিতে হয়। নাদিরশাহ অথবা আহমদ শাহ আবদালী; মহারাষ্ট্র ক্ষমতার পূর্ণ-বিকাশের অবকাশে বাজীরাওএর নেতৃত্বে তাদের উত্থান কিংবা বালাজী বাজীরাওএর ভুলের জন্য তাদের পতন; নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্দীপিত করার যথাযোগ্য বিষয়বস্তু। নাদিরশাহ বা আবদালীর অত্যাচার-কে ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের প্রতিভূ করার সুযোগ নাট্যকারগণ গ্রহণ করেছেন। নাটকের বিষয়বস্তু তথা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ওপর তাঁদের যদি আরো দখল থাকত তাহলে তাঁদের নাটকের সৌকর্য হত সন্দেহ নাই। আরো লক্ষ্য করার বিষয় যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের নাটকগুলিতে স্বাদেশিকতার আহ্বান যত স্পষ্ট, বিংশ শতাব্দীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেটা কমে যাচ্ছে। তখন স্বাদেশিকতার সঙ্গে হিন্দু মুসলমানের মিলনের বাণীও শোনান সুরু হয়েছে এবং ক্রমে হিন্দু-মুসলমানে মিলন স্বাধীনতা-কাঙ্ক্ষার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। সিরাজদৌল্লা সম্পর্কীত নাটকগুলি এ বিষয়ে চমৎকার উদাহরণ। নবীনচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র রচনা করেছেন

স্বদেশী নাটক, গিরিশচন্দ্রের রাজনৈতিক সিরাজ জনমানসে অগ্নিবর্ষী। তারপর বঙ্গেবর্গীর সময় থেকেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনবাণী এসে গেল। ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টায় সিরাজ ও মোহনলাল সচেষ্ট। শচীন্দ্রনাথের সিরাজের রাজনৈতিক ভূমিকা গৌণ, হিন্দু মুসলমানে মিলনই তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্য—বাংলা ও বাঙালীর ভাবপ্রবণতাকে ব্যবহার করা হয়েছে। পলাশী শচীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ, সিরাজের স্বপ্নও তাই। অবশেষে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে অধ্যাপক মৈত্র এক রূপকথা উপহার দিলেন 'মোহনলাল' নাম দিয়ে। (ঘ) লক্ষ্য করার বিষয় কি ভাবে বিভিন্ন নাট্যকার তাদের ব্যক্তিগত সাহস অনুসারে ইংরেজ বিরোধে নেমেছেন। লজ্জার কথা যে অধিকাংশ নাট্যকারই বিশেষ মনোবল দেখাতে পারেন নাই। বিষয়বস্তু নির্বাচনে যে প্রজ্ঞা, বিষয়বস্তুর ব্যবহারে সে প্রজ্ঞা পাওয়া যায় না। একমাত্র তারাশঙ্করের ইচ্ছা হয়েছিল যুগসন্ধির ইতিহাস ব্যক্ত করার। তাতে তিনি অপারগ হয়েছেন। অন্য সকলে কিন্তু ঐতি-হাসিক নাটকের আড়ালে শাসকগোষ্ঠীকে আহত করতে চেয়েছেন। সাহস ছিলনা বলেই তাঁদের রচনা ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ ক্ষীরোদপ্রসাদের ব্যর্থতায় অবাক হতে হয়। শচীন্দ্রনাথের অমন জনপ্রিয় নাটক লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে কিন্তু সে এক নির্বীষ সর্প। চক্র আছে কিন্তু তেজ নাই। ভাবালুতা আছে কিন্তু শক্তি নাই। এই নাটক দেখে সকলে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে ইংরেজের বিরুদ্ধে রেগে গর্জে ওঠে নাই।

আবার তাই গিরিশচন্দ্রে ফিরে আসতে হয়। বহু ত্রুটি সত্ত্বেও ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদ আর ধ্বনিত হয় নাই। (ঙ) এই খণ্ডে আলোচিত একশত বছরের এই ১৯টি নাটকের ঘটনা যেমন আজ গল্পে রূপান্তরিত তেমনি নানা গল্প, উপন্যাস ও প্রচলিত কথিকা থেকেই এক নাটকগুলির উৎপত্তি। এইসব নাটকের ঘটনাবলীকে ভ্রমক্রমে যেমন অনেকে ইতিহাসের মর্য্যাদা দিয়েছেন তেমনি এই নাটকগুলিও গল্প, উপন্যাস কথিকাকে ইতিহাস ভ্রমে নাটকে স্থান দিয়েছেন কোনরকম বিচার বিবেচনা না করে। (চ) সবশেষে লক্ষ্য করার বিষয় যে নাট্যোল্লিখিত প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে এক সীতারাম বাঙালী। সীতারামের চরিত্র নিয়ে নাটক লেখা প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের জন্যেই হয়েছে। সীতারাম সম্পর্কে

নাটক লেখার কথা বঙ্কিমের ওই উপন্যাস খানি না থাকলে কারু মনের মধ্যে বা চিন্তার জগতে জাগরূক হত বলে মনে হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গত একশ বছর ধরে বাঙালী নাট্যকারগণ বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু থেকে পলাশীর যুদ্ধ ও পাণিপথের যুদ্ধ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী নিয়ে যে নাটকগুলি রচনা করেছেন তাতে কোন বাঙালী নায়ক নাই। সরাসরি অবাঙালী চরিত্র সমধিক এবং ভুলক্রমে বাঙালী মনে করা চরিত্র কয়েকটি যেমন আলিবর্দী, সরফরাজ, সিরাজদৌল্লা বা মোহনলাল। বাঙালী এই সময়কার সমাজ-জীবনে পার্শ্বচরের ভূমিকা নিয়েছেন সত্য কিন্তু একটি নাটকেও কোন বাঙালী বীর বা রাজনৈতিক নায়ক হন নাই দেখে সন্দেহ থাকেনা যে বাঙলার ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান ও চর্চার অভাবই এই পরিস্থিতির কারণ। সেই সময়কার ইতিহাস জানা থাকলে কাল্পনিক বাঙালী চরিত্রকে নায়ক করেও ইতিহাস লেখা সম্ভব হত। যেমন পলাশীর যুগে বাঙালী গৃহস্থ বা মুর্শিদকুলির আমলের বাঙালী কর্মচারীগণের কাউকে মুখ্য চরিত্র করে সুন্দর ভাবেই রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ দেওয়া চলত। বাংলার ক্রমবর্দ্ধমান রেশম শিল্প বা মসলিনের কারুকার্য্য নিয়ে কোন নাটক যে রচিত হয় নাই এটা বাঙালী নাট্যকারের ইতিহাস অজ্ঞতার ফল। তৎকালীন কলকাতার জনসমাজ নিয়েও নাটক লেখার সুযোগ অবহেলা করা হয়েছে। এই সময়কার বিভিন্ন সহর যেমন চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ বা ঢাকা নিয়ে নাটক রচনা কেউ করেন নাই। এই সময়কার জীবন যাত্রা অনুসন্ধান করার কোন ইচ্ছা দেখতে পাওয়া যায় না। তাই আলোচ্য নাটকগুলিতে (ছ) মুখ্য এক রাজনৈতিক বা নবাব বাদশাহ চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। এই ভুলের স্বর্গে বিচরণ করে পেশোয়াগণ অর্থাৎ বাজীরাও ও তাঁর পুত্র মহারাষ্ট্রের একচ্ছত্র শাসনকর্তার মর্য্যাদা পেয়েছেন। পাশাপাশি যে সব মুখ্য বাঙালী চরিত্র আছে সেগুলিও অধিকাংশ সময় একান্ত অবজ্ঞাত। রাজা দুর্লভরাম যে কোন নাটকের প্রধান চরিত্র হবার যোগ্যতা রাখেন। তার পিতা ও পুত্র রাজা জানকীরাম এবং রাজা রাজবল্লভকে নিয়েও নাটক হওয়া সম্ভব। এমনকি জানকীরাম থেকে রাজবল্লভ পর্য্যন্ত তিনপুরুষ নিয়েও নাটক রচনা করা সম্ভব। নাটোরের রঘুনন্দন ও রামজীবনকে নিয়ে কোন নাটক তৈরী হয় নাই। দয়ারাম রায় বা কৃষ্ণকান্ত নন্দীও নাটকের প্রতিপাদ্য হতে

পারেন নাই। প্রচুর উপাদান মায় কবি ভারতচন্দ্র থাকা সত্বেও নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়ে কোন নাটক হয় নাই। নবকৃষ্ণ দেব বা গকুলচন্দ্র ঘোষাল সম্পূর্ণ অবজ্ঞাত। সব থেকে দুঃখের বিষয় যে, বাঙালী বীর কলকাতা জয়ী মীরমদন কোন নাটকের নায়ক হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারলেন না। ঢাকার রাজবল্লভ এবং তদীয় পুত্র কৃষ্ণদাসের উন্নতির ইতিহাস যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি রোমহর্ষক। এদের নিয়ে কোন নাটক রচিত হয় নাই। ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ বাঙালীর ইতিহাস সম্পর্কে এই আত্ম-বিস্মৃতি সত্যই জাতির চরিত্রের এক বিশিষ্ট দিক সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

সব শেষে বাঙালীর চরিত্রের এক বিশেষ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। বাঙালী থিয়েটার দেখতে ভালবাসে তা আমরা জানি কিন্তু থিয়েটারে দেখা ঘটনা যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তা প্রথম খণ্ডের প্রবন্ধ-গুলি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিশ্বাস এমন শক্ত ভাবে মনকে প্রভাবিত করে যে কোন রকম ঐতিহাসিক গবেষণা বা প্রমাণ তা থেকে সাধারণ বাঙালী মনকে বিচ্যুত করতে পারে না—সেই জন্য জাহান্দার শাহ এক প্রেমিক পাগল, অকর্মণ্য নৃশংস অত্যাচারী নন কিন্তু নাদির শাহ হয়েছেন নৃশংস অত্যাচারী এবং শয়তানের অনুচর, তাঁর ঐতিহাসিক চরিত্র বিস্মৃতির অতলতলে সমাহিত। বাজীরাও, বালাজীরাও এবং পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের বিকৃত ও প্রক্ষিপ্ত রূপই বিশ্বাসযোগ্য ও অনুকরণ যোগ্য হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সম্পর্কে এই অজ্ঞতা, চরমে উঠেছে। সত্য সম্পূর্ণ ভাবে কাল্পনিক ঘটনার কাছে পরাভূত হয়েছে। বাঙালীর বিশ্বাস থিয়েটারে অনুষ্ঠিত কাল্পনিক নাটককে অনুসরণ করে চলেছে।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। Dr. A. Karim, Murshid Quli Khan and his Times, p. 218

২। Calcutta Review, 1873, Vol. 56, Rajas of Rajshahi.

৩। দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বন্দর কাশিমবাজার (১৯৭৮), এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৭৪ বর্ষের ওই নামীয় প্রবন্ধ, এবং লেখকের Journal de l' Institut de Chandernagor পত্রিকার ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভল্যুমে প্রকাশিত 'Cossimbazar—The Queen that was', ৮৫ থেকে ১০১ পাতা।

৪। Jadunath Sarkar, ed. History of Bengal, Vol. II (Dacca Edition), See : Alivardi Khan.

৫। Ibid and নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস।

৬। নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস (প্রথম সংস্করণ), ৫৭৩ পাতা

৭। তদেব ৫৭৪ „

৮। তদেব ৫৭১, ৫৭৬, ৫৭১, ৬০৫ „

৯। তদেব ৬০৭ „

১০। Somendra Chandra Nandy, Rani Bhawani of Nator, Bengal Past and Present, Vol. XCIII, Serial No. 175, January—April, 1974

১১। C. R. Wilson, ed. Old Fort William, Vol. I, p. 156—166

১২। Ibid., p. 170—181

১৩। J. H. Little, House of Jagat Seth p. 119—122

১৪। Jadunath Sarkar, Op. Cit., p. 457—467

১৫। G. S. Sardesai, A New History of the Marathas, Vol. II (1948), p. 221—222

১৬। Jadunath Sarkar, op. Cit., p. 459—467

১৭। Ibid. p. 455—467

১৮। Seir-ul-Mutaqherin, tr. Haji Mustafa (Syed Golam Hussein Khan) Vol. I, p. 614

১৯। নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী ১৯১—১৯৪ পাতা

২০। Seir-ul-Mutaqherin, op. Cit., Vol. II, p. 17

২১। Calcutta Review 1892 p. 204 and
IOR. West Bengal District Records, New Series, 1789—1803, 6th January 1794, p. 148

২২। K. K. Datta, Early Career of Sirajuddowlah, Bengal Past and Present 1967, Vol. 162, July-December, p. 142—146

২৩। Seir-ul-Mutaqherin, Part I, p. 61, Part II, p. 614; নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ১৯৬ পাতা
এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সিরাজদৌল্লা, ৪৫ পাতা

২৪। K. K. Datta, op. Cit
Umdatunnissa Begum, the widow of Siraj, received the Jessore Jaigir of her father from the Company. She wrote to the Governor General on 21 July 1788, complaining that all sorts of people were bringing suits against her dead husband, claiming that he had borrowed money from them. Hastings issued an order to exempt her from the Jurisdiction of the Adwalats. (IOR. Bengal Revenue Miscl Consits, Range 51, Vol. 20 of 21 July 1788, p. 978—980)

২৫। Jadunath Sarkar, op. Cit, p 471 and
Cossimbazar Consultations, Vol. 12, p. 24.

২৬। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, বন্দর কাশিমবাজার।

২৭। J. H. Little, Op. Cit and Seir-ul-Mutaqherin, Vol. I, p. 270—273.

২৮। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সিরাজদৌল্লার মহিষী, ইতিহাস পত্রিকা ৫ম খণ্ড ২য় সংখ্যা, ১১৯—১৩৩ পাতা

২৯। তদেব। এবং 'Lutfunnissa Begum died in Murshidebad on 5th Aswin 1197, late September, 1790.' IOR Bengal

Revenue Miscl Consults, Range 52, Vol. 30, of 20, May 1791, p. 364—382. and
Persian Corrospondence Vol. IX 1790—91 Letter No. 735,, p. 175, also Vol. X, 1792—93, Letter No. 1488, p. 305.

৩০। সূত্র ২১ দেখুন।

৩১। S. C. Hill, ed, Bengal in 1756—57, Vol. III. Evidence regarding flight of Watts, 1757, p. 396—403

৩২। Platinum Jubilee Volume of the Bengal National Chamber of Commerce and Industry estd. 1887.

৩৩। হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু, ৭৫ পাতা।

৩৪। তদেব ৭৫—৭৬ পাতা।

৩৫। সূত্র ২৮ দেখুন।

৩৬। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৭৫ পাতা।

৩৭। S. C. Hill, op. Cit. A French Report of the Seige of Cossimbazar, p. 220—224 এবং Law's Memoirs p. 238—241

৩৮। Ibid.

৩৯। Ibid., p. 167.

৪০। Keith Feiling, Warren Hastings, p. 20—25

৪১। S. C. Hill. op. Cit., Luke Scrafton's letter, p. 344—346.

৪২। J. H. Little, op. Cit,, p. 81.

৪৩। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৮০ পাতা।

৪৪। S. C. Hill, op. Cit, Diary of Sir Eyre Coote, p. 321—323.

৪৫। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭৯ পাতা।

৪৬। Jadunath Sarkar, op. Cit., p. 491.

৪৭। Seir-ul-Mutaqherin p. 229.

৪৮। Jadunath Sarkar, op. Cit., p. 490—491

৪৯। Jean Law, hree Frenchmen in Bengal, p. 95—96.

৫০। Proceedings of the Revenue Board consisting of the whole Council of 14th June 1774, Entry No. RBP 5247—5248

৫১। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৮১ পাতা।

৫২। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সিরাজদৌল্লার মহিষী, সূত্র ২৮ দেখুন।

৫৩। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সিরাজদোল্লা, ৪০৭—৪০৯ পাতা।

৫৪। সূত্র ৫১ দেখুন। পাতা ১৮০।

৫৫। Jean Law, Three Frenchmen in Bengal, p. 97.

৫৬। অমলেন্দু দে, পাকিস্থান প্রস্তাব ও ফজলুল হক। ইতিহাস পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৮।

৫৭। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, পলাশী যুদ্ধের সময় বাংলার অবস্থা। ইতিহাস পত্রিকা, ৩য় খণ্ড চতুর্থ সংখ্যা ১৩৬০।

৫৮। Further Report of the Committee of Secrecy appointed to enquire into the East India Company, (1773), p. 10—17.

৫৯। সূত্র ৫৭ দেখুন।

৬০। C R. Wilson, ed Old Fort William, Vol. I p. 156, 166, 178 & 181

৬১। J. H. Little, op Cit, p. 128—134.

৬২। Ibid., p, 147 and Bengal Consultations of 18th November, 1851.

৬৩। N. K. Sinha, Economic History of Bengal, Vol. I, p. 6—10

৬৪। S. C. Hill, op. Cit., Law's Memoirs p. 164—197.

৬৫। Proceedings of the Revenue Board consisting of the whole Council of 3rd May 1774, p. 25.

৬৬। S. C. Hill, op. Cit., Law's Memoirs, p. 211—212.

৬৭। Keith Feiling op. Cit., p. 21.

৬৮। গঙ্গারাম ভট্টাচার্য্য, মহারাষ্ট্র পুরাণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪৩।

Journal of the Department of Letters, Calcutta University, Vol. XIX, 1929.

৬৯। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সিরাজদ্দৌল্লা, ৬৯—৭০ পাতা।

৭০। S. C. Hill, op. Cit., Law's Memoirs, p. 162.

৭১। Ibid. p. 190.

৭২। Ibid. Vol. II, Clive's letter to the Nabob of 13th June 1757, p. 405.

৭৩। Proceedings of the Revenue Board consisting of the whole Council of 12th July 1774 p. 5500—5503.

৭৪। S. C. Hill, op. Cit. Vol. II, Watt's letter to Clive of 26th June 1757, P. 433. and J. H. Little, op. Cit., p. 197.

৭৫। Jadunath Sarkar, op. Cit., p. 491.

৭৬। Proceedings of the Controlling Council of Revenue at Murshidabad of 12th and 23rd December 1771.

৭৭। সূত্র ৫০ দেখুন।

৭৮। Letter Copy Book of the Resident to the Durbar. Letter Nos. 80—81 of 10th and 13th June 1773 p. 168—170.

৭৯। S. C. Hill, op. Cit., Law's Memoirs, p. 161—162.

৮০। Ibid. p. 170—189

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ডের সময় পরিধি প্রথম খণ্ডের তুলনায় বৃহৎ। প্রথম খণ্ডে ১৭০৭ থেকে ১৭৫৭ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ বছরের ঘটনা নিয়ে রচিত ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৭৫৮ থেকে ১৮৫৮ পর্য্যন্ত একশ' বছরের ঘটনাবলী নিয়ে রচিত নাটকগুলি আলোচনা করা হবে। প্রথমখণ্ডের মতো দ্বিতীয় খণ্ডেও কতকগুলি প্রবন্ধের মাধ্যমেই নাটকগুলির বিচার হবে কারণ দেখা যাচ্ছে যে নাটক সৃষ্টি হয়েছে কয়েকটি প্রধান চরিত্রকে অবলম্বন করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াতে নাট্যসৃষ্টির নানা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মীরকাশিম, নন্দকুমার বা রাণী ভবানীকে ঘিরেই বাঙালী নাট্যকারগণ নাটক রচনা করেছেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মহিশূরের হায়দর আলি ও টিপু-সুলতানকে ঘিরে বেশ কয়েকটি নাটক রচিত হয়েছে, অযোধ্যার বেগম ও মারাঠা নায়ক মাধব রাও নাটকের উপজীব্য হয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দী নিয়ে নাটক লিখিতে অনীহার পরিচয় প্রকট হয়েছে। পাঞ্জাবের রণজিৎ সিং ও সিপাহীবিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোন ঘটনা বাঙালী নাট্যকারদের আকর্ষণ করে নাই বলা চলে। সিপাহী বিদ্রোহের নাটকেও ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর ভূমিকা প্রধান। বস্তুত সমগ্র বিদ্রোহের থেকেও লক্ষ্মীবাঈ-এর আত্মোৎসর্গ নাট্যকারদের বেশী প্রভাবিত করেছে। বিষয় নির্বাচন থেকেই বোঝা যায় যে জাতীয়তার মন্ত্রে উৎসাহিত হয়ে নাট্যকারগণ "হৃদয়াবেগ" রচনায় সুবিধা হবে এমন বিষয়বস্তুই চয়ন করেছেন। ভাবপ্রবণতার কাছে আবার বুদ্ধিবৃত্তির পরাজয় ঘোষণা করেছেন।

মীরকাশিম

পলাশীর পরাজয় নূতন যুগের সূচনা করল। বাংলার নবাবগণ দিল্লীর সুবেদার ছিলেন। এতদিন তাঁদের কেবল মোগল বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করতে হত আনুষ্ঠানিকভাবে কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর তাঁরা ইংরেজ কোম্পানীর বাহুবলের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লেন। নবাব মীরজাফর যখন রবার্ট ক্লাইভের হাত ধরে মুর্শিদাবাদের মসনদে ২৯শে জুলাই ১৭৫৭ উঠে বসলেন তখনও তিনি ইংরেজশক্তির সম্পূর্ণ বিক্রমের পরিচয় পান নাই। ভেলভেটের আস্তরণের তলায় লৌহবর্মের কোন ধারনাই তাঁর ছিল না। সিরাজদ্দৌল্লার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র-কারীদের মধ্যে জগৎশেঠ-ভ্রাতৃদ্বয় বাদে সবাই ভেবেছিলেন যে ইংরেজ যুদ্ধ জিতিয়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে যাবে এবং বশংবদ ভালছেলের মতো ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করবে। ব্যবসায়ী জগৎশেঠ ইংরেজদের মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন তাই দেশের শাসনভার নেবার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হলে যে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতি হতে পারে না একথা এদেশী জগৎশেঠদের মতো বিদেশী ইংরেজ কোম্পানীর বুঝতে একটুও দেরী হয় নাই।[১]

নবাব মীরজাফরও ক্লাইভের হালচাল দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। পলাশী জয়ের পরের সেই প্রভুভাব ক্লাইভ কিছুতেই পরিত্যাগ করছেন না। নবাব হয়েও যেন মীরজাফর ইংরেজদের গোলাম হয়ে আছেন। পিতার এই অস্বস্তি পুত্র সাদিক আলি খান যিনি মীরণ বা ছোটেনবাব নামেই সমধিক পরিচিত, বুঝতে পারলেন। অল্পবুদ্ধি বিলাসীর মতোই তিনি এই প্রশ্নের সহজ সমাধানও করে ফেললেন। তিনি ভাবলেন ক্লাইভকে গুপ্ত হত্যা করলেই বুঝি ইংরেজরা পালাবে। কিন্তু জগৎশেঠ বাদ সাধলেন। ক্লাইভ সেদিন রাজপথে বার হলেন না যখন এলেন তখন সঙ্গীসাথীসহ সশস্ত্র হয়ে। মীরণের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। গুপ্তহত্যা করা হল না। নবাব মীরজাফর ভয় পেয়ে আরো বেশী ক্লাইভের অনুগামী হয়ে পড়লেন। সম্ভবত ক্লাইভের সঙ্গে মীরজাফরের সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। পরবর্তীকালের চিঠিপত্র পাঠে জানা যায় যে ক্লাইভ মীরজাফর ও তাঁর প্রথম স্ত্রী বিবি শাহ খানুমকে 'বাবা' ও 'মা' বলে ডাকতেন।

মীরজাফর এবং তাঁর স্ত্রী তার সঙ্গে 'পুত্রের মতো' ব্যবহার করতেন।[২] একান্ত লজ্জার কথা যে নবাব মীরজাফরের নাটকীয় চরিত্র ও জীবন কোন নাটকের মুখ্য উপজীব্য হয়নি। ইতিহাস বিমুখতার এমন উদাহরণ বিরল।

দুই বছরের মধ্যে দেশের চেহারা পাল্টে গেল। ব্যবসা-বাণিজ্য আবার পুরোদমে চলতে শুরু করল। কাশিমবাজার হয়ে দাঁড়াল ব্যবসার কেন্দ্রভূমি। সুদূর গুজরাট থেকে ব্যবসায়ীর দল কাশিমবাজারের মহাজনটুলিতে বসবাস সুরু করলেন। খানিকটা জায়গা গুজরাটীটুলি নামে পরিচিত হল। এ যুগের সেরা পণ্য হল রেশম। কেবল ইংরেজ বা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির কোম্পানী নয়, বিদেশী ও স্বদেশী ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ স্বার্থপরভাবে বাণিজ্যে লিপ্ত হলেন। ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানীর কর্মচারীরাও ব্যক্তিগত ব্যবসা সুরু করলেন। কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ হেষ্টিংস ক্লাইভের জন্য দুশো মন রেশম গুজরাটে পাঠালেন। চীনে ক্লাইভ যে সিল্কের সম্ভার পাঠালেন তাতে হেষ্টিংসও অংশীদার ছিলেন। ক্লাইভ কেবল নিজের জন্যেই অর্থসংগ্রহ করলেন না। দুশো জাহাজে নবাবের দেওয়া ধনরত্ন দামামা বাজিয়ে কলকাতায় নিয়ে এসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তহবিল পূর্ণ করলেন। ইতিমধ্যে সাতলক্ষ টাকা ঋণের দায়ে জগৎশেঠ ফরাসী কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠির যাবতীয় সম্পত্তি মায় ঘরবাড়ি দুর্গ আর ফরাসডাঙ্গার দুশো তাঁত দখল করে নিলেন। মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে ফরাসী প্রভাব এইভাবে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়ে গেল।[৩]

ভারতের ইতিহাসেও ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ এক গুরুত্বপূর্ণ বছর। দিল্লীতে শাহ আলম বাদশাহ হলেন। আহমদ শা আবদালী দিগ্বিজয়ীর ভূমিকা ত্যাগ করে দিল্লীর বাদশাহের বন্ধু রূপে দেখা দিলেন। তাঁর বন্ধুত্বে আশ্বস্ত দিল্লীর বাদশাহ বাংলা সুবায় তাঁর অধিকার পুনর্স্থাপনের জন্য শাহজাদা আলি গৌহরকে অযোধ্যার নবাবের সহযোগীতায় পাটনা অভিমুখে যাত্রা করতে আদেশ দিলেন। এদিকে বাংলার নবাবের প্রধান অমাত্য রাজা দুর্লভরামকে মারাঠাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেখা যায়। অন্যদিকে নবাবের মন্ত্রী-মহারাজা নন্দকুমারও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করার জন্য মারাঠাদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে লাগলেন। এমন কি স্বয়ং মীরজাফরের পদচ্যুতির জন্য বাদশাহের সঙ্গে মহারাজ নন্দকুমারের পত্রালাপ প্রমাণিত হয়েছে। ইংরেজ

সন্দেহ করল যে মন্ত্রীমহাশয় ওলন্দাজদের কাছ থেকে অর্থ-গ্রহণ করেছেন ও ফরাসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সেই ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দেই নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ইংরেজ জালিয়াতির অভিযোগ করে এবং মীরজাফর ওই বছর নবাবী থেকে বিতাড়িত হলে নন্দকুমার কারারুদ্ধ হন।[৪] এই রাষ্ট্র বিপ্লবের মুহূর্তে সকলেই নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর। কোনরকম নিয়ম বা সত্য মেনে চলার রীতি ছিল না। আদর্শ বা স্বদেশ বাৎসল্যের কোন চিহ্নই দেখা যায় না এই সময়ে। ইতিমধ্যে রাজা রাজবল্লভ মীরণের দেওয়ান ও প্রধান মন্ত্রণাদাত হয়ে বসেছেন। ক্লাইভ ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন ফেব্রুয়ারী মাসে। যাবার আগে নবাব মীরজাফর তাঁকে কলকাতার চারপাশের পঞ্চান্নখানা গ্রাম জায়গীর দিয়ে দিলেন। ফলে ক্লাইভ কোম্পানীর কর্মচারী হয়েও তাদের জমিদার হয়ে বসলেন এবং দশ বছর ধরে এই জায়গীরের দরুন কোম্পানীর কাছ থেকে বছর বছর ত্রিশ হাজার পাউণ্ড বা বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা পেতে লাগলেন।

ক্লাইভ সাহেব জাহাজে চাপতে না চাপতে মারাঠারা বর্দ্ধমান আক্রমণ করে অধিকার করতে চাইল ১৭৬০-এর ফেব্রুয়ারী মাসে। জুলাই মাসে সাধারণ সৈন্যেরা বেতনের অভাবে নবাব মীরজাফরকে যার পর নাই অপমান করল। নবাব সাহেব তিনজন নিম্নশ্রেণীর লোকের মন্ত্রণায় নাচ গান ও স্ত্রীলোক চর্চ্চায় মশগুল হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে মীরণ প্রথমে রাজা দুর্লভরামের সঙ্গে বাপকে সরিয়ে নবাব হবার ষড়যন্ত্র করলেন। মীরজাফর সেকথা জানতে পেরে দুর্লভ-রামকে কলকাতায় তাড়িয়ে দিলেন। তখন মীরণ মহামান্য রাজা রাজবল্লভের মন্ত্রণায় মেতে উঠলেন। হঠাৎ ২রা জুলাই, সিরাজ হত্যার দিন, বজ্রপাতে গণ্ডক নদীর পারে মীরণের মৃত্যু হল। নবাব এই সংবাদে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।[৫] ছোট নবাব নাসির-উল-মুলুক সাদিক আলি খাঁ ওরফে মীরণের সঙ্গে তার পিতার ইদানীং প্রায়ই বিরোধ লেগে থাকত। বৃদ্ধ নবাব মৃত্যুপথযাত্রী না হয়ে যে তারই পাকা ধানে মই দিচ্ছেন একথা জানাতে ছোট নবাব মীরণ কসুর করেন নি। মীরণের মৃত্যুতে তাই সবকিছু পাল্টে গেল। 'নবাবের চণ্ডুর তৃষ্ণা ও নারীলালসা প্রচণ্ড বৃদ্ধি পেল এবং সেই সুযোগে কান্থুরাম, মণিলাল আর চিকন, তাঁর তিন অমাত্য, দু'হাতে অর্থ লুঠ করতে লাগল। বৃদ্ধ নবাবমহিষী নবাবের সঙ্গে থাকলেও প্রায়ই একান্ত জীবন যাপন

করছিলেন। তাঁর সম্মতি পেয়েই মীরজাফর-জামাতা মীরকাশিম যে রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে নেমেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

রাজনৈতিক ঘটনাতরঙ্গ পর্য্যালোচনা করলে আশ্চর্য্য না হয়ে থাকা যায় না। মীরণের মৃত্যুর পর মীরকাশিম রাজ্য শাসনের জন্য ইচ্ছুক হলেন। এই সময়ে তাঁর নবাব হবার বাসনা হয়েছিল বলা যায় না—সম্ভবত নবাবের হীন মন্ত্রণাদাতাদের সরিয়ে সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতা পেলেই তিনি খুশী হতেন। নবাবের অবিশ্বাস মীরকাশিমের চিন্তাকে ভিন্নপথে নিয়ে গেল। ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংরেজ কোম্পানীর সিলেক্ট কমিটির সঙ্গে মীরকাশিমের বোঝাপড়ার ফলস্বরূপ কলকাতায় একরারনামা সই হয়ে গেল। কয়েকদিন পর ১৫ই অক্টোবর থেকে নবাব মীরজাফরকে গদীচ্যুত করার প্রচেষ্টা সুরু হল এবং ২২শে অক্টোবর পদচ্যুত মীরজাফর কলকাতা অভিমুখে একাকী যাত্রা করলেন। বৃদ্ধা বেগম, কন্যা জামাতার কাছে থাকতেই মনস্থ করলেন। বৃদ্ধ মীরজাফরের সাথী হলেন এক তরুণী বাঈজী যিনি মণি বেগম নামে পরবর্তীকালে বিখ্যাত হয়েছেন। এবং তারই গর্ভজাত পুত্র এবং তাদের বংশধরগণই পরবর্তিকালে মুর্শিদাবাদের নবাব নামে পরিচিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মীরকাশিম নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হলেন ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর। একরারনামা অনুসারে তিনি বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা তিনটি ইংরেজ কোম্পানীর অধিকারে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিলেন। কোম্পানী এই তিন জেলার রাজস্ব আদায় ও উপভোগের সত্ব পেলেন। শ্রীহট্ট জেলার চুন ব্যবসার সমস্ত অধিকারও কোম্পানীকে দেওয়া। হল এ ছাড়া কোম্পানী এবং তার কর্মচারীদের প্রচুর অর্থও দিলেন নূতন নবাব।

নবাব মীরকাশিম ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর থেকে নবাবী সুরু করলেন এবং ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর বকসারের যুদ্ধে এই নবাবী শেষ হল। অবশ্য আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নবাবী শেষ হয়েছিল আরও কিছুদিন আগে। কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পরই বৃদ্ধ মীরজাফর আবার নবাব ঘোষিত হলেন। ২৪শে জুলাই ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মেজর অ্যাডামস নবাব মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে এসে নবাবী আসনে উপবেশন করালেন। দেখা যাচ্ছে নবাব মীরকাশিমের বাংলায় কর্মব্যস্ততার সময়, মাত্র চার বছরে সীমাবদ্ধ। তার

মধ্যে তিনি মাত্র দুইবছর নয়মাস পরিপূর্ণভাবে নবাবী করার সুযোগ পেয়েছেন।

॥ মীরকাশিমের ইতিহাস ॥

এবার নবাব মীরকাশিমের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি ক্রমিক নিয়মে সাজান যাক। মীরকাশিম বিহারের এক সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। তাঁর পূর্বপুরুষ দিল্লীর বাদশাহর কাছ থেকে বিহারে জায়গীর লাভ করেন। জাতিতে অবশ্য এরা ছিলেন পারস্যবাসী সুন্নী সম্প্রদায় ভুক্ত। মীরকাশিমের পিতামহ ইমতিয়াজ খাঁ কবি ছিলেন। 'খালিস' নাম নিয়ে তিনি বহু ফার্সী শ্লোক লিখে গেছেন। মীরকাশিমের পিতা রাজী খাঁ বুদ্ধিমান জায়গীরদার ছিলেন এবং প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। নবাব আলিবর্দী খাঁর আগ্রহে মীরজাফরের কন্যার সঙ্গে মীরকাশিমের বিবাহ হয়। নবাব আলিবর্দী তাকে দুইশত টাকা মাসহারায় নবাব সরকারে গ্রহণ করেন। ১৭৪· খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিতের মানকরে গুপ্তহত্যার সময় তরুণ মীরকাশিমের বলবীর্য্যের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর দ্বিতীয় কীর্তি নয় বছর পর। পলাতক সিরাজদৌল্লাকে মীরকাশিমের লোকজন ধরে ফেলল। লুৎফউন্নিসার ধনরত্ন ও অর্থসম্পদ যা কিছু এই পলাতক যুগলের কাছে ছিল মীরকাশিম সবই নিজে আত্মসাৎ করলেন। সিরাজদৌল্লা ও লুৎফউন্নিসাকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হল। স্বভাবতই শ্বশুর নবাব মীরজাফরের কাছ থেকে মীরকাশিম এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ কোন দায়িত্বপূর্ণ পদ আশা করেছিলেন কিন্তু ছোট নবাব সাদিক আলি খান নাসির-উল-মুলুক অর্থাৎ শ্রীমান মীরণের প্ররোচনায় সেটা ঘটল না। মীরজাফর তাঁর এই জামাতার প্রতি একান্ত উদাসীন রইলেন এমন কি নবাব মহিষীর শত অনুনয় তাঁর বধিরকর্ণে প্রবেশ করল না। মীরণ খোলাখুলি-ভাবেই মীরকাশিমকে অপছন্দ করতেন। রাজা রাজবল্লভ তাঁর দেওয়ান হবার পর এই বিতৃষ্ণা শতগুণ বৃদ্ধি পেল। পরবর্তীকালে মীরকাশিম নবাব হয়ে রাজা রাজবল্লভকে ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাসকে যে নৃশংসভাবে বধ করেছিলেন তার বীজ সেই ১৭৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে রোপিত হয়েছিল। মীরণের ঈর্ষাতেই মীরজাফর সম্পূর্ণ বশীভূত হয়ে জামাতা মীরকাশিমকে সুদূর রংপুরে ফৌজদার করে পাঠিয়ে দিলেন।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মীরজাফর প্রথম ও শেষবার মীরকাশিমের শরণাপন্ন হন। ঘটনায় ভবিতব্যের ইঙ্গিত দেখা যায়। মীরণ গেছেন পাটনায়, বাদশাহ বিহার আক্রমণে উদ্যত আর ঠিক সেই সময় একদল বর্গী নিয়ে মারাঠা শিব ভট্ট কাটোয়াতে এসে গেছেন। একান্ত বাধ্য হয়েই নবাব মীরজাফর মীরকাশিমকে স্মরণ করলেন। মীরকাশিম মুর্শিদাবাদে উপনীত হতে না হতেই নবাবী সৈন্য দীর্ঘদিন বেতন না পেয়ে বিদ্রোহ করল। মীরকাশিম তাদের নিজস্ব তিন লক্ষ টাকা দিয়ে তখনকার মতো শান্ত করলেন। অনেকের মতো নবাবও হয়তো মনে করেছিলেন যে মীরকাশিমের আগমন আর নবাবী সৈন্যের বিদ্রোহ ঠিক কাকতালীয় ঘটনা নয়। তাই মীরণের মৃত্যু সংবাদে অভিভূত নবাব কর্মক্ষম জামাতাকে পুত্রের শূণ্য পদগুলি দিলেন না। বিপদমুক্তির পুরস্কার স্বরূপ কেবল পূর্ণিয়ার ফৌজদারী তাকে দেওয়া হল। মীরজাফরের অবিশ্বাস, বৃদ্ধ বেগমের স্বামীর অপকীর্তি ও নারী লালসায় অসন্তোষ ও ইংরেজ কোম্পানীর গভর্ণর হলওয়েল সাহেবের প্রচণ্ড লোভ মীরকাশিমকে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা পাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করল। শ্বাশুরীর প্রতি আনুগত্যে কিন্তু মীরকাশিম নবাব হতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন আফিং চণ্ডু ও স্ত্রীলোক নিয়ে নবাব মীরজাফর মত্ত থাকুন কিন্তু নবাবীক্ষমতা মায় নবাবী শীলমোহর মীরকাশিম ব্যবহার করবেন। নবাব মীরজাফরের মনে গুপ্তহত্যার ভয় জাগিয়ে তাঁকে মীরকাশিমের আওতা থেকে কলকাতায় নিয়ে যাবার পেছনে একটি সুন্দরী তরুণী বাঈজীর প্রখরবুদ্ধির প্রভাব দেখা যায়। এই বাঈজীই পরবর্ত্তি কালে মণিবেগম নামে খ্যাত হয়েছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে সুরু হল নূতন নবাব মীরকাশিমের রাজত্বকাল। ইতিমধ্যে কোম্পানীর গভর্ণর হয়ে এসেছেন মাদ্রাজ থেকে ফার্সী ভাষায় পণ্ডিত ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেব। এমন চমৎকার ভাল মানুষ ভদ্রলোক আর কখনও কোম্পানীর প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছেন কিনা সন্দেহ—কিন্তু তা সত্বেও বিরোধ বাধতে দেরী হল না।

মীরকাশিম করিতকর্মা বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। দেশের প্রয়োজন এবং নিজের কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর বেশ স্পষ্ট ধারণা ছিল। সব থেকে আশ্চর্য্য কথা সেই সময়ে তিনি ইংরেজী ভাষাও বেশ খানিকটা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর চরিত্রে তিনটি প্রধান দোষ তাঁর গুণাবলীকে প্রকাশ হতে দিল না। প্রথম থেকেই তাঁর অর্থলোভ খুব বেশী। অবিশ্বাস ও নৃশংসতার সঙ্গে যুদ্ধের

অনভিজ্ঞতা মিশে তাঁর ইংরেজের বিরুদ্ধে শক্তিপরীক্ষার বিরাট আয়োজনকে বার বার ব্যর্থ করে দিয়েছে। অন্যদিকে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট নবাবের প্রতি একান্ত সহানুভূতিশীল হলেও তাঁর নিজের কাউন্সিলে সংখ্যালঘু। কর্তব্য-পরায়ণতা এবং নিয়মানুবর্তিতা তাঁকে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছে। নাটক রচনার এমন উপকরণ পাওয়া ভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। সেই সঙ্গে ওয়ারেন হেষ্টিংসের দৌত্যে এবং নবাব সম্পর্কে বিভিন্নপত্রে তাঁর যে সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যই শ্লাঘনীয়।

প্রথমে মীরকাশিমের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করা যাক।

১৭৬০ ॥ ২৭শে সেপ্টেম্বর। কলকাতায় ইংরেজ কোম্পানীর সিলেক্ট কমিটির সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর।

১৫ই অক্টোবর। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট মুর্শিদাবাদে গেলেন এবং মীরকাশিমকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করার জন্য নবাব মীরজাফরের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেন। বোঝালেন এই অনুরোধ আদেশের নামান্তর মাত্র। মীরজাফর নবাবী ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন।

২২শে অক্টোবর। (বিজয়া দশমী) মীরজাফর নৌকাযোগে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে চললেন নবাবী হারেমের ৬০ জন সুন্দরী যুবতী। তাঁদের মধ্যে নবাবের অতিপ্রিয় এক নর্তকী যিনি পরে মণিবেগম নামে বিখ্যাত হন। বৃদ্ধা-নবাব মহিষী বিবি শাহখানুম কন্যা জামাতার কাছে মুর্শিদাবাদে থাকলেন।[৬] মীরকাশিম নবাব ঘোষিত হলেন। তিনি বর্দ্ধমান, চট্টগ্রামের, সঙ্গে মেদিনীপুরের রাজস্ব ও শীলহট্টের (সিলেট) চূণ তৈরীর রাজস্ব কোম্পানীকে দিয়ে দিলেন। রাজস্বের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা। জনষ্টোন সাহেব মেদিনীপুরে ও ভেরেলষ্ট সাহেব চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। নূতন নবাব কলকাতার টাঁকশালে কলকাতা সিক্কার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ সিক্কা বানাবার অনুমতি দিলেন।[৭]

নভেম্বর মীরজাফরের তিন মন্ত্রণাদাতা কেনারাম (অথবা কাস্থরাম), মুন্নালাল (অথবা মণিলাল) ও চুণিলাল (অথবা চিকণ) কে কারারুদ্ধ করে তাদের সমস্ত সম্পত্তি মায় অলঙ্কারাদি এবং যা কিছু ছিল সমস্ত বাজেয়াপ্ত করলেন। শাসনকার্য্যে দ্রুত শৃঙ্খলা আনা হল। জমিদারদের কর আদায় ও সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া একই সঙ্গে সুরু হল। মীরজাফর পক্ষীয়দের সকলের এমন কি মীরণের উপপত্নি ও গণিকাদের সম্পদ ও সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হল। একমাসেই নূতন নবাবের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে কারু মনে সন্দেহ থাকল না।

ডিসেম্বর নবাব সব বাকী খাজনা ও ইংরেজ কোম্পানীকে দেয় অর্থ মিটিয়ে ফেললেন। এছাড়া পাটনার যুদ্ধের জন্য সৈন্য-বাহিনীর মাহিনাই পাঠালেন সাতলক্ষ টাকা। এছাড়া ডিসেম্বর, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে কাশিমবাজার কুঠির ব্যাটসন সাহেবকে প্রতি মাসে ছয় বা সাতলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এইসব সুবিধা পেয়ে গভর্ণর সাহেব দুইলক্ষ টাকা মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিলেন। এই অর্থ পণ্ডিচারীর যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়।

বীরভূমের বিদ্রোহী রাজা আসাদ জামানের বিরুদ্ধে নবাব স্বয়ং যাত্রা করলেন। মিলিত নবাবী ও কোম্পানীর ফৌজ পরিচালনা করলেন মেজর ইয়র্ক ও ক্যাপটেন হোয়াইট। আসাদ জামান পরাজিত হয়ে নবাবের বশ্যতা স্বীকার করলেন।[৮]

১৭৬১ ॥ ১৪ই জানুয়ারী। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আবদালীর হাতে মারাঠাদের পরাজয়ে কলকাতায় ইংরেজদের ক্ষমতাবৃদ্ধি হল।

কোম্পানীর গভর্ণর ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেবের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন প্রথমে অমিয়েট, এলিস ও কারনাক। কারনাক পাটনা চলে গেলে বিরুদ্ধ পক্ষে দাঁড়ালেন অমিয়েট, এলিস ও স্মাইথ। গভর্ণর ও তাঁর বন্ধু

ওয়ারেন হেস্টিংস সংখ্যালঘু হয়ে গেলেন। ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করায় নবাব আপত্তি করায় গোলমাল চরম হল। গভর্ণর ও হেস্টিংস বোঝালেন যে বিনা শুল্কে ব্যবসা করার কোন আইন সঙ্গত অধিকার কোম্পানীর নাই। সংখ্যাগুরুদল গায়ের জোরে বললেন আছে। বাদশাহী ফারমান তাঁদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার যে অধিকার দিয়েছে বাংলার কোন সুবাদারের সেটা নাকচ করে দেবার কোন অধিকার নাই। সংখ্যাভারীর সুযোগ নিয়ে তাঁরা নবাব মীরজাফরের পদচ্যুতির প্রতিবাদ করলেন।[৯]

১৫ই জানুয়ারী। পাটনার কাছে বাদশাহ শাহ্ আলম বিহার প্রদেশ ছিনিয়ে নিতে এসে নবাবী ও ইংরেজ কোম্পানীর অধিনায়ক মেজর কারনাকের কাছে সম্পূর্ণ পরাভূত হলেন। বাদশাহের ফরাসী বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন মঁসিয়ে ল (সিরাজদৌল্লার বন্ধু) তিনিও ইংরেজ-দের হাতে বন্দী হলেন। পরাজয়ের পর কারনাক বাদশাহকে সসম্মানে পাটনা নিয়ে এলেন। দিল্লীর মসনদ দখল করার জন্য বাদশাহ কারনাকের সাহায্য চাইলেন। নবাব মীরকাশিম সব খবর শুনে সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগলেন। তিনি ইউরোপীয় প্রথায় সৈন্যবাহিনীর গঠনের জন্য মনস্থির করলেন।

ফেব্রুয়ারী। নবাব পাটনা অভিমুখে যাত্রা করলেন। কলকাতার কাউন্সিল মীরকাশিমের জোর-জবরদস্তি করে অর্থ-সংগ্রহের তীব্র সমালোচনা করলেন। মীরকাশিমের চক্ষুশূল এবং ক্লাইভের বন্ধু বিহারের ডেপুটি সুবাদার রাজা রামনারায়ণকে রক্ষার জন্য কারনাকের কাছে বিশেষ বার্তা পাঠান হল।[১০]

মার্চ। নবাব বৈকুণ্ঠপুরে উপনীত। এইখানে (৬ই) মেজর কারনাকের সঙ্গে তাঁর চরম মতবিরোধ। ইংরেজ কোম্পানীর

সঙ্গে নবাবের এই প্রথম প্রকাশ্য মতদ্বৈধতা।[১১] মীরকাশিম বাদশাহ শাহ আলমের সঙ্গে সাক্ষ্যাত করতে অনিচ্ছুক হলেন। পাটনায় বসে তখন মহারাজা রামনারায়ণ আর মহারাজা রাজবল্লভ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সুরু করলেন।

ক্যাপ্টেন চ্যাম্পিয়ন গযার কাছে কামগার খাঁর নেতৃত্বে বাদশাহী বাহিনীকে পরাজিত করলেন। পাটনায় বাদশাহের দরবারে বাদশাহ শাহ আলমকে নবাব মীরকাশিম আনুগত্য জানালেন। মীরকাশিম সুবে বাংলার রাজস্ব বাবদ প্রতিবছর চব্বিশলক্ষ টাকা বাদশাহের দরবারে দাখিল করতে রাজী হলেন। বাদশাহ মৌখিক মীরকাশিমকে বাংলার সুবাদার বলে স্বীকার করলেন এবং তাঁকে সাম্রাজ্যের সাতহাজারী মনসবদার করলেন। নূতন উপাধি দিলেন 'নবাব আলীজা নশীল-উল-মুলুক ইমতিয়াজ-উ-দ্দৌলা মীর মহম্মদ কাশেম আলী খাঁ নশরৎজঙ্গ বাহাদুর'।[১২]

পাটনা ত্যাগের আগে বাদশাহ ইংরেজদের জানালেন যে প্রার্থনা করলে ইংরেজ কোম্পানীকে তিনি বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী ও বাণিজ্যের সুবিধা দানের ফারমান দিতে রাজী আছেন।[১৩] ইংরেজদের সঙ্গে বাদশাহর সখ্যতার স্পষ্ট আভাষ দেখা গেল।

এপ্রিল। আয়ার কুট প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়ে পাটনা যাত্রা করলেন ২২শে এপ্রিল। সঙ্গে চললেন তাঁর দেওয়ান হয়ে নন্দকুমার। সংখ্যাগুরু কাউন্সিলরগণ মহারাজা রামনারায়নকে নবাবের রোষবহ্নি থেকে রক্ষা করতে তাঁকে বিশেষ অনুরোধ করলেন। আয়ার কুট পাটনায় পৌছলে কারনাক সাহেব কলকাতা ফিরে এলেন।

মে। মীরকাশিমের সঙ্গে কর্নেল আয়ার কুট ও মহারাজা রামনারায়ণের বিরোধ সুরু হল।

১৬ই জুন। কর্নেল আয়ার কুট ষড়যন্ত্রের খবরে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দুইহাতে পিস্তল ধরে নবাবী তাঁবুতে হামলা করলেন।[১৪]
কর্নেল কুটকে বোঝান হয়েছিল যে বাদশাহর সঙ্গে ইংরেজদের হৃদ্যতায় নবাব অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং যে কোন সময় তাঁকে এবং তাঁর ইংরেজ সহকারীদের গ্রেপ্তার করতে পারেন। এই কুচক্রীদলে মহারাজা রামনারায়ণ, মহারাজা রাজবল্লভ ও রাজা নন্দকুমার বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কর্নেল কুট কলকাতায় জানালেন যে ওয়াটস সাহেব হুগলীর ফৌজদারী নন্দকুমারকে দেবার জন্য নবাবকে অনুরোধ করেছেন। এতে তার পূর্ব সম্মতি আছে কারণ একজন বন্ধু ভাবাপন্ন ব্যক্তি হুগলীতে ফৌজদার হলে ইংরেজদের সুবিধা হবে।[১৫]
নবাব রাজা রামনারায়ণকে শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন।

জুলাই। রাজা রামনারায়ণ পদচ্যুত ও রাজা রাজবল্লভ তাঁর হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন। নবাবের কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলবার প্রচেষ্টা সফল হল। নবাব রামনারায়ণের সম্মতি ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাকে কয়েদ করলেন। নবাব প্রতি-পক্ষীয়দের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন—রাজা মুরলীধর, বণিক মনসারাম সাহু, রাজা সুন্দরসিং তার কর্মচারী গঙ্গাবিষ্ণু, পাটনার কোতোয়াল মহম্মদ ইশাখ, মুস্তাফা কুলী খাঁ, শাহুল্লা খাঁ প্রভৃতি। এমনকি ঐতিহাসিক গোলামহোসেন (মুতাক্ষরীণ লেখক) ও তাঁর পৈতৃক জায়গীর হারালেন। সিতাব রায় বুদ্ধিবলে নবাবী ক্রোধ থেকে কোনক্রমে নিজেকে রক্ষা করে বাদশাহ শাহ আলমের কাছে পলায়ন করলেন।

আগষ্ট। নবাব মুঙ্গের দুর্গ সুসংস্কৃত করলেন এবং সৈন্য বাহিনীকে বিদেশী কায়দায় তৈরী করলেন। নবাবের সেনাপতি হলেন আর্মানী বণিক খোজা পিক্রসের ভাই খোজা গ্রেগরী

ইনি গুরগিণ খাঁ নামে প্রসিদ্ধ। আর্মানী মার্কার ও ফরাসী সমরু যার প্রকৃত নাম ওয়ালটার রাইনহার্ড সৈন্যাধ্যক্ষ পদে যোগ দিলেন। নবাবের সৈন্যদল অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ—এই তিনভাগে বিভক্ত হল। সমরুকে জার্মান বলেও কেউ কেউ অভিহিত করেছেন। তিনি জেবউন্নিসা নামে উত্তরপ্রদেশের এক মুসলমান নর্ত্তকীকে বিবাহ করেন। বেগম সমরু কলকাতার রাজনীতির এক অদ্ভুত চরিত্র। (সংবাদপত্রে সেকালের কথা দ্রষ্টব্য)।

সেপ্টেম্বর। গোলাম হোসেন লিখেছেন যে ব্যাপার স্যাপার এমন হয়ে দাঁড়াল যে নবাবের দরবারে কথা বলবার মতো কোন লোক থাকল না। যতই ঘনিষ্ঠ বা মান মর্য্যাদাবান সভাসদ হোন না কেন নবাবের বিরুদ্ধে কথা বলতে সবাই ভীত হতেন এমন কি রাজ বিদূষক মীর্জা সামসুদ্দীনের মতো মুখফোঁড় লোক—যিনি নবাব মীরজাফরের নাম রেখেছিলেন 'ক্লাইভের মদ্দাগাধা'—রকমসকম দেখে তার মুখেও আর কথা সরে না।

অক্টোবর। বিহারের জমিদারদের বিরুদ্ধে নবাবের সসৈন্যে অভিযান। ভোজপুরের জমিদাররা পরাজিত হলেন। নেপাল সীমান্তে বেতিয়া পর্য্যন্ত নবাবী প্রাধান্য প্রসারিত হল। দক্ষিণ বিহারে কামগড় খাঁ নবাবী সৈন্যের কাছে পরাজিত হলেন। বিহারের প্রায় সমস্ত কেল্লা নবাবী দখলে এসে গেল।

তারিখ-ই-মনসুরী লিখেছেন মীরকাশিম বিহারে সন্ত্রাশের রাজত্ব চালু করলেন।

নভেম্বর। কলকাতা কাউন্সিল মীরকাশিমের এই ক্ষমতাবৃদ্ধি অত্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। সংখ্যাগুরু কাউন্সিলরদের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল যে মীরকাশিম ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এবং

শক্তি-সংগ্রহ করছেন। বিহারে নবাবী প্রভাব হ্রাস করার জন্য এলিস সাহেব পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। সতেরশ একষট্টি খ্রীষ্টাব্দ অবসিত হল।

১৭৬২ ॥ জানুয়ারী। নবাবের সঙ্গে 'দস্তক' নিয়ে কোম্পানীর বিবাদ সুরু হল। নবাবের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য ঘোড়া কিনতে গিয়ে খোজা আণ্টুন পাটনার ইংরেজদের হাতে গ্রেপ্তার হলেন। রাজা রাজবল্লভ ইংরেজ অধিকার স্বীকার করে এলিস সাহেবের দয়ার প্রত্যাশী হলেন। রাজবল্লভ তখন পাটনার নায়েব নিযুক্ত হয়েছেন। আণ্টুনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কলকাতায় পাঠান হল। নবাব এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ করলেন।[১৬]

ফেব্রুয়ারী। এলিসের নবাব বিরোধী ব্যবহার সত্ত্বেও আণ্টুনকে গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্ট ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু সংখ্যাগুরুদল তাকে বড়বাজারের রাস্তার ওপর কশাঘাতের নির্দেশ দিলেন। অবশেষে হেস্টিংস সাহেব কাউন্সিলকে জানালেন যে আণ্টুন নবাবের প্রজা তার গায়ে হাত দেবার কোম্পানীর কোন অধিকার নাই। ভ্যান্সিট্টার্ট অতি নম্র ও ভদ্র চিঠিতে নবাবকে অনুরোধ করলেন যে তিনি যেন আণ্টুনকে শাস্তি দেন। আণ্টুন মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলে গবর্ণরের অনুরোধ রক্ষা করতে নবাব তাকে বরখাস্ত করলেন।[১৭]

মার্চ। মুঙ্গেরের নূতন কেল্লায় নূতন ফৌজ দেখা যেতে লাগল। এলিস মুঙ্গের দুর্গ খানাতল্লাসের জন্য একজন সার্জেন্ট আর সৈন্য পাঠালেন। কেল্লাদার সুজন সিংএর হুমকিতে তারা ভয় পেয়ে ফিরে এল। এলিস তাদের কেল্লার সামনে তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করতে বললেন। কলকাতার সংখ্যাগুরু কাউন্সিলরগণ ভ্যান্সিট্টার্ট ও হেস্টিংস সাহেবের সব যুক্তি উপেক্ষা করে কেল্লা খানাতল্লাসের জন্য জেদ ধরে থাকলেন। অবশেষে নবাব

জানালেন যে কাউন্সিলের কোন সদস্য এলে তাকে মুঙ্গের দুর্গে ঢুকে দেখতে দেবেন। নবাব আরো জানালেন যে কোম্পানীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখার জন্যই তিনি এই হীন প্রস্তাবে রাজী হচ্ছেন। তবে ভবিষ্যতে কোম্পানীর কর্মচারীদের উদ্ধত ব্যবহার সহ্য করা তার পক্ষে কঠিন হবে একথা কাউন্সিলরগণ যেন মনে রাখেন। লেফটানেণ্ট গিলবার্ট আয়রনসাইড ও ওয়ারেন হেস্টিংসকে কাউন্সিলের পক্ষ থেকে পাঠান হল। ওয়ারেন হেস্টিংসকে সংখ্যাগুরুর দল নবাবের কাছ থেকে ২৫লক্ষ সিক্কা টাকা দাবী করার নির্দেশ দিলেন। গবর্ণরের বহু চেষ্টা সত্বেও এই অন্যায় দাবী বজায় থাকল। গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্ট তাঁর কাউন্সিলের সংখ্যাগুরু সভ্যদের বোঝাতে পারলেন না যে এই ২৫ লক্ষ টাকা নবাবের কাছ থেকে দাবী করবার কোন অধিকার তাঁদের নাই।[১৮]

মে। সাসারাম হয়ে ২৪শে মে মুঙ্গেরে পৌছলেন হেস্টিংস ও আয়রন সাইড। আয়রনসাইড কেল্লা পরীক্ষা করে একজন খঞ্জ ইউরোপীয় সৈনিকের সাক্ষাৎ পেলেন বুঝলেন যে দলে দলে ইউরোপীয় সৈন্য মুঙ্গের দুর্গে রাখার খবর গুজব মাত্র। অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন নবাব এ ঘটনায়। তিনি হেস্টিংসকে স্পষ্ট জানালেন যে তাঁর নবাবী অধিকারে কোম্পানী হস্তক্ষেপ করলে তিনি সহ্য করবেন না। কোম্পানীর বড় ছোট কোন কর্ম-চারীই বাহুবলে নবাবী লোকের ওপর হামলা করতে পারবেন না—করলে নবাবী লোকেরাও উচিত শিক্ষা দেবে। আর কোম্পানীর নাম করে বিনা শুল্কে ব্যবসা করতে তিনি আর দেবেন না। এই খবরে এলিস ক্ষেপে গেলেন। হেস্টিংস এলিসকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হলেন। সাসারামে হেস্টিংসএর

সঙ্গে নবাবের সাক্ষ্যাত হল ১৩ই মে। হেস্টিংস পত্রে গবর্ণরকে জানালেন যে নবাবের সঙ্গে বোঝাপড়া করা কঠিন হবে না কারণ তিনি দ্বন্দ্ব চাননা। কিন্তু এলিসকে সামলান অত্যন্ত কঠিন। তাঁর নবাবের প্রতি দুর্মতি যে কোন সময় সংকটকে ত্বরান্বিত করবে। হেস্টিংস জানালেন যে অমিয়েট, এলিস ও কারনাক নবাবের পদচ্যুতির জন্য যে কোম্পানীর পরিচালকদের কাছে ইংল্যাণ্ডে পত্র লিখেছেন তা নবাব সম্পূর্ণ অবহিত।[১৯]

জুন-জুলাই। হেস্টিংস মুঙ্গেরে অবস্থান করছেন। ২৫শে এপ্রিল ভাগলপুর থেকে লিখলেন সেই বিখ্যাত চিঠি[২০] যাতে দেশের অবস্থার জাজ্বল্যমান ছবি আঁকা হয়েছে। হেস্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নবাব অভিযোগ করলেন প্রত্যেক পরগণায় ইংরেজের নামে যথেচ্ছাচার হয়। তারা নুন কেনাবেচা করে, সুপারি, ঘি, চাল, খড়, বাঁশ, মাছ, বস্তা, আদা, চিনি, তামাক, আফিং প্রভৃতি জিনিষেরও ব্যবসা করে। রায়ত ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে মাল কেড়ে নেয়।[২১] হেস্টিংসের দৌত্য বিফল হল।

সেপ্টেম্বর। নবাব তাঁর রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করে গবর্ণর সাহেবকে তাঁর নূতন রাজধানীতে আমন্ত্রণ করলেন।

১লা নভেম্বর। হেস্টিংস সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে গবর্ণর মুঙ্গেরে গিয়ে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে মনস্থ করলেন।

৯ই নভেম্বর। গবর্ণর ও হেস্টিংস কাশিমবাজার উপনীত।

১৫ই নভেম্বর। নবাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও পাটনায় ইংরেজদের ব্যবসায়ে বাধা সৃষ্টি করছেন।

৩০শে নভেম্বর। গবর্ণর সাথী সহ মুঙ্গেরে পৌছলেন। (মুর্শিদাবাদ ত্যাগ ১২ই নভেম্বর)।[২২]

১লা ডিসেম্বর। নবাবের সঙ্গে গবর্ণরের প্রথম সাক্ষ্যাতকার তারপর দৈনিক আলাপ।[২৩]

১৫ই ডিসেম্বর। নবাবের সঙ্গে সন্ধির সর্ত স্থির।[২৪] হেষ্টিংসের পত্র।[২৫] নবাবের সঙ্গে বিরোধের মূল কারণ 'Public inland trade'. গবর্ণর ও হেষ্টিংস উভয়েই কোম্পানী কর্মচারী হলেও তাঁদেব ও তাঁদের বন্ধুদের ব্যবহার নবাবের প্রতি সহানুভূতিশীল।

নবাব সুস্পষ্ট নির্দেশ জারী করলেন যে কোম্পানীর কোন কর্মচারী, তাদের অধীনস্থ কেউ বা গোমস্তা, দেশের কোথাও সরকারী পদ গ্রহণ করতে পারবেন না। স্বাধীন ব্যবসা করার অথবা জমি, বা বাজার কেনবার অধিকার তাদের নাই। জমিদারদের অথবা সরকারী কর্মচারীদের তাঁরা কোন অর্থ ধার হিসাবেও দিতে পারবেন না।[২৬]

১৭৬৩॥ ৯ই জানুয়ারী। গবর্ণর ও হেষ্টিংস মুঙ্গের ত্যাগ করে ১৪ই জানুয়ারী কাশিমবাজারে পৌছলেন।

জানুয়ারী (শেষের দিকে)। নবাবের নিজ সৈন্য নিযে যুদ্ধোদ্যম। গুরগিণ খাঁর অধীনে একদল সৈন্য নেপাল জয়ে প্রেরিত হল। মকবনপুরের যুদ্ধে নবাবী সৈন্য গুর্খাদের পরাজিত করল বটে কিন্তু রাত্রের গুর্খা আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।[২৭]

ফেব্রুয়ারী। গবর্ণরের নবাবের সঙ্গে চুক্তি কাউন্সিলে সংখ্যাগুরু সদস্যগণ নাকচ করে দিলেন। নবাবকে জানান হল যে বাদশাহী ফারমান বলে এবং ভূতপূর্ব নবাবের অনুমতি অনুসারে কোম্পানীর দস্তকের বলে বিনা শুল্কে আভ্যন্তরীণ ও বিদেশীয় বাণিজ্য করবার অধিকার ইংরেজ বণিকদের আছে। সুতরাং এই অধিকারে ইংরেজ বণিক বিনাশুল্কে ব্যবসা করতে পারে এবং করবে। কেবল নুন ও তামাকের ওপর কিছু শুল্ক দিতে কোম্পানী রাজী আছে।[২৮] নবাব কিন্তু ইতিমধ্যে গবর্ণরের পত্র সর্বত্র পাঠিয়ে বিনাশুল্কে বাণিজ্য বন্ধ করবার

এবং প্রয়োজন হলে জোর করে ইংরেজ বণিকদের এই বে-আইনী ব্যবসা রোধের হুকুম জানিয়ে দিয়েছেন। কলকাতা কাউন্সিলে গবর্ণর জানালেন যে তিনি নবাবকে বলেছেন যে তাঁর সঙ্গে আলোচনা শেষ কথা নয়। কাউন্সিলের মতামতই এ বিষয়ে চূড়ান্ত বিবেচিত হবে সুতরাং কলকাতার পত্র না পেলে তিনি যেন কোন আদেশজারী না করেন। গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্ট নবাবের ব্যবহারে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।[২৯]

মার্চ। গয়ার কাছে নবাবী ফৌজের সঙ্গে পাটনার এলিস সাহেবের ফৌজের সংঘর্ষ হল। বিহারের ডেপুটি গবর্ণরের পদে মীর মেহেদী খাঁ নিযুক্ত ও নহবত রায় কর্মচ্যুত হলেন। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় মহাতাপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ নবাবী হুকুমে মুঙ্গেরে আনীত হলেন। নবাব ইংরেজ কোম্পানীর কাছে নবাবীতে ইস্তফা দিয়ে পদত্যাগের প্রস্তাব করলেন।[৩০]

১৭ই মার্চ। নবাব সমস্ত জিনিষের উপর থেকে শুল্ক তুলে দিলেন। বাংলার রাজস্ব অর্ধেক হয়ে গেল।[৩১]

এপ্রিল। পাটনায় এলিস যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলেন। নবাবী কর্মচারী ও কোম্পানীর লোকদের মধ্যে বিরোধ এলিসের ক্রোধে ঘৃতাহুতি হল। কলকাতা হতে পাটনা যাবার পথে অস্ত্র বোঝাই ইংরেজদের নৌকা নবাব আটক করলেন।

১৪ই এপ্রিল। কলকাতার কাউন্সিল যুদ্ধের পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩২]

এপ্রিল (শেষ সপ্তাহ)—কাউন্সিলের প্রতিবাদের জবাবে মীরকাশিম জানালেন যে নবাবী হুকুমেই মহম্মদ তকী খাঁ জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে মীরাঝিলে বন্দী করেছেন। (নবাবের ২রা মে'র পত্র।) তিনি পরে তাদের মুঙ্গেরে প্রেরণ করেন।[৩৩]

১৫ই মে। কাউন্সিলের নূতন প্রস্তাব নিয়ে অমিয়েট ও হে মুঙ্গেরে নবাব সমীপে উপনীত হলেন (যাত্রা সুরু কলকাতায়, ৪ঠা এপ্রিল) নবাব বললেন 'ইংরেজরা বহু সন্ধি করিয়াছে

এবং তাহা অবিলম্বে ভঙ্গ করিয়াছে—আমি কোন সন্ধি ভঙ্গ করি নাই। সুতরাং নূতন সন্ধির কোন অর্থ হয় না'।[৩৪]

২২শে জুন। কাউন্সিলের প্রতিনিধিদের অনুরোধে নবাব অস্ত্র বোঝাই ইংরেজ নৌকাগুলি ছেড়ে দিলেন। সেগুলি পাটনা অভিমুখে যাত্রা করল।[৩৫]

২৪শে জুন। এলিস পাটনা আক্রমণ করলেন। দুর্গ জয় করতে না পারলেও শহর অধিকার করলেন। সংবাদ পেয়ে নবাব সেনাপতি মার্কারের নেতৃত্বে সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। মার্কাবের সৈন্যদল ইংরেজদের পাটনা কুঠি আক্রমণ করল। আর একদল সৈন্য নিযে সমরু বার হল। কয়েক দিন যুদ্ধের পর মাঞ্জীতে গঙ্গাতীরে এলিস সাঙ্গ-পাঙ্গসহ বন্দী হলেন। তাঁকে অন্যান্য ইংরেজ বন্দী সহ মুঙ্গেরে নিযে যাওয়া হল।

৩রা জুলাই। অমিয়েট কলকাতা বওনা হয়েছিলেন। পাটনা যুদ্ধের খবর পেয়ে নবাব তাঁব গতিরোধের আদেশ দিলেন। নবাবী সৈন্যকে নৌকার কাছে দেখে ভীতত্রস্ত ইংরেজরা গুলি-বর্ষণ করলেন। ক্ষিপ্ত নবাবী সৈন্য সমস্ত ইংরেজ সহ অমিয়েট সাহেবকে মুর্শিদাবাদ ও কাশিমবাজারের মধ্যবর্ত্তি জায়গায় বধ করলেন।

অমিয়েটের হত্যা সংবাদে কলকাতা কাউন্সিল একজোট হযে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাকে নবাবী থেকে সরিয়ে বৃদ্ধ মীরজাফরকে নবাব ঘোষণা করা হল। ইংরেজ নবাবের বন্ধু সেজে দেশের হিতার্থে বিদ্রোহীকে শাসনের সংকল্প ঘোষণা করলেন। নূতন নবাব মীরজাফর ১০ই জুলাই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করলেন।

১৯শে জুলাই। যুদ্ধ সুরু হল। কাটোয়ার যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ও তকীখাঁর মৃত্যু হল।

২৪শে জুলাই। মুর্শিদাবাদ ইংরেজ দখলে। মেজর অ্যাডামসের হাত ধরে

মীরজাফর আবার নবাবীতক্তে উপবেশন করলেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে মীরকাশিমের নবাবী এই দিনে সাঙ্গ হল।

২রা অগাষ্ট। গিরিয়ার যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ও বদরুদ্দীন ও আসাদুল্লার বীরত্ব। সমরু ও মার্কার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন না।

৫ই সেপ্টেম্বর। উধুয়ানালার যুদ্ধে নবাবের পরাজয়। আরাটুন, মার্কার ও গুরগিণ খাঁ প্রায় বিনা যুদ্ধে পলায়ন করলেন।

৯ই সেপ্টেম্বর। 'পুনঃপুনঃ পরাজয়ে ও সেনানায়কদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী শুনিয়া মীরকাশিম উন্মত্তবৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলেন। ইংরেজ সেনাপতিকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন তাঁহাদের সৈন্যদের অত্যাচারে তিন মাস যাবৎ বাংলাদেশ বিধ্বস্ত হইতেছে যদি তাহারা এখনও নিবৃত্ত না হন তাহা হইলে তিনি এলিস ও ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করিবেন॥'[৩৬]

ইংরেজ কোম্পানী সৈন্য সরান দূরে থাক আরো চাপ-সৃষ্টির পথ অবলম্বন করল। ফলে নবাবও প্রচণ্ড রাগান্বিত হলেন।

সেপ্টেম্বর। রাজা রামনারায়ণ ও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গঙ্গায় ডুবিয়ে হত্যা করা হল।[৩৭] রাজা রাজবল্লভ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাস বধ্য হলেন।[৩৮] কিংবদন্তি জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের এই সময় মৃত্যু নির্দেশ করে। চুনী নামক জগৎশেঠ ভৃত্যের প্রভুভক্তির গল্পও বহুল প্রচলিত। কিন্তু এ সময় জগৎশেঠরা জীবিত ছিলেন।

১লা অক্টোবর। মেজর অ্যাডামস মুঙ্গেরে পৌছলেন। ৩রা দুর্গ দখল করলেন। মীরকাশিম পাটনা অভিমুখে পলায়ন করলেন।[৩৯]

৫ই অক্টোবর। নবাবের আদেশে এলিস সহ সমস্ত ইংরেজবন্দী নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে নৃশংসভাবে নিহত হলেন। সাক্ষী হবার জন্য একমাত্র ডাক্তার ফুলারটন জীবিত

থাকলেন। গলষ্টোন ও হে সাহেবদ্বয়ও এই সময় নিহত হন।

১৪ই অক্টোবর। নবাব পাটনা ত্যাগ করে ফুলওয়ারির দিকে পলায়ন করলেন।[৩৯]

১৫ই অক্টোবর। মুঙ্গের দখল করে মেজর অ্যাডামস পাটনা যাত্রা করলেন।

১৮ই অক্টোবর। পাটনা থেকে সসৈন্যে পালিয়ে মীরকাশিম 'বারে' উপনীত হলেন। এইখানে প্রধান সেনাপতি গুরগিণ খাঁর গুপ্ত হত্যা নবাবী আদেশে সংঘটিত হল। পরদিন জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল তারপর শেঠবংশের বন্দীপুত্রদের বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বাদশাহ পরে তাদের মুক্তি দেন।[৪০]

২৮শে অক্টোবর। মেজর অ্যাডামস সসৈন্যে পাটনা পৌছলেন।

৬ই নভেম্বর। পাটনা ইংরেজ দখল করল। মীরকাশিম কর্মনাশা পার হয়ে পলায়ন করলেন। ইংরেজ কোম্পানী তাঁকে ধরে দেবার মূল্য ঘোষণা করল এক লক্ষ টাকা। সমরুর শিরের দাম দেওয়া হল চল্লিশ হাজার টাকা।[৪১]

ডিসেম্বর। মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

১৭৬৪ ॥ ১৬ই জানুয়ারী। অত্যধিক ক্লান্তিতে কলকাতায় মেজর অ্যাডামসের মৃত্যু হল। নক্স সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তার মৃত্যু হলে জেনিংস একটিং জেনারেল নিযুক্ত হলেন।

ফেব্রুয়ারী। সুজাউদ্দৌল্লার ইংরেজের সঙ্গে সংযোগ।

মার্চ। মীরকাশিমের সঙ্গে সুজাউদ্দৌল্লার এলাহাবাদে সাক্ষাতকার। সুজাউদ্দৌল্লা মীরকাশিমকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এপ্রিল। মীরজাফর বার্ষিক ২৮ লক্ষ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হলেন। বাদশাহী পরোয়ানা উজীর সুজাউদ্দৌল্লা মারফৎ জারী হল। সিতাব রায়ের বুদ্ধিতেই এ ঘটনা ঘটে। পুত্র কল্যাণ সিং-এর মারফৎ তিনি বাদশাহী

পরোয়ানা নবাব মীরজাফরের কাছে পাঠালেন। আনন্দে অধীর বৃদ্ধ নবাব সারা জীবনভোর বিহারের নায়েব নাজিমগিরি করার হুকুমনামা সিতাব রায়কে পাঠিয়ে দিলেন।[৪২] মীরকাশিমের সনির্বন্ধ অনুরোধে সুজাউ-দৌল্লা তাকে সাহায্য করতে রাজী হলেন। সুজাউদ্দৌল্লা ও বাদশাহের সঙ্গে মীরকাশিমের সন্ধি হল।

৩রা মে। মেজর কারন্যাকের অধীনস্থ ইংরেজবাহিনীর কাছে মীবকাশিম, সুজাউদ্দৌল্লা, বাদশাহ শাহ আলম ও তাঁর কর্মচারী বেণীবাহাদুরের সম্মিলিত বাহিনীর পাঁচপাহারির যুদ্ধে পরাজয়। একমাত্র সুজাউদ্দৌল্লার অধীনস্থ এনায়েত খাঁর নেতৃত্বে পাঠান বাহিনী আর অনুপগিরির নাগা-সন্ন্যাসীর দল যুদ্ধ করলেন। অন্য সবাই দর্শকের ভূমিকায়।

জুন। সুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে নবাব মীরজাফরের গোপন পত্রালাপ। কোম্পানীর হুকুমে কাবন্যাক বরখাস্ত। মীরজাফর পাটনায় এলেন। পাটনা থেকে নন্দকুমার সমভিব্যহারে মুর্শিদাবাদ হয়ে এলেন কলকাতায়। ছাপড়ায় ইংরেজ বাহিনীতে বিদ্রোহ। মেজর মনরো কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করলেন।

সেপ্টেম্বর। বক্সারে সৈন্য সমাবেশ। পাটনা অবরোধ। সুজাউদ্দৌল্লা মীরকাশিমকে বন্দী করলেন।

অক্টোবর। গুপ্তধনের সন্ধানে বন্দী মীরকাশিমের উপর পীড়ন করা হল। মুক্ত হলেন অবশেষে ২১শে অক্টোবর।

২২শে অক্টোবর। বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিম ও সুজাউদ্দৌল্লার সম্মিলিত বাহিনী মেজর হেকটর মনরো পরিচালিত ইংরেজ বাহিনীর কাছে পরাজিত হল। মীরকাশিম পলায়ন করলেন।

১৭৬৪॥ সুজাউদ্দৌল্লাকে শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর শত্রু রোহিলাদের সঙ্গে মীরকাশিম যোগাযোগ করলেন। সেখানে সুবিধা

করতে না পেরে ভরতপুরের তৎকালীন রাজা জাঠ জবাহির সিংএর শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু ভরতপুরের গৌরব তখন অস্তমিত।[৪৩]

১৭৬৫ ॥ মীরকাশিম তখন শিখদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন কিন্তু সাহায্য করবার জন্য তারা যে মূল্য চাইল তা দেওয়া মীরকাশিমের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। মীরকাশিম ফরাসী কোম্পানী এবং মহিশূরের হায়দার আলীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে বিফল হলেন।[৪৪]

১৭৬৬ ॥ মারাঠাদের সঙ্গে প্রথম থেকে কোন আলোচনা হয় নাই দেখে মীরকাশিম এ বিষয়েও চেষ্টা করলেন।[৪৫]

১৭৬৮ ॥ রোহিলাদের মধ্যে বসবাস করে মারাঠাদের বন্ধুত্ব চেয়ে হাত বাড়ান রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমৎ খাঁ একেবারেই পছন্দ করলেন না। মীরকাশিমের এ চেষ্টা রহিত করা হল।[৪৬]

১৭৭০ ॥ আগ্রা থেকে গোহাদের রাজার রাজত্বে মীরকাশিম এসে উপস্থিত হলেন। গোহাদের রাজা মীরকাশিমের বসবাসের জন্য নিজের একটি দুর্গ ছেড়ে দিলেন। এখান থেকেই মারাঠাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করলেন মীরকাশিম। এইসময় বেশ এক বড় বাহিনীর সম্ভাবনা দেখা গেল। মারাঠা নেতৃত্বে যোগদান করলেন শিখ সংঘ ও দিল্লীর ভূতপূর্ব উজীর গাজীউদ্দিন, হাফিজ রহমৎ খাঁ মনস্থির করতে না পারলেও তার পুত্র এনায়েৎ খাঁ মীরকাশিম পক্ষে সৈন্যদল নিয়ে যোগ দিতে স্বীকার করলেন। ফরক্কাবাদের আহমদ খাঁ বঙ্গস মীরকাশিমের সঙ্গে যোগ না দিলেও তাঁর রাজত্বে সৈন্য-সংগ্রহে আপত্তি করেন নাই। মীরকাশিমের বিশ্বাসঘাতক সৈন্যাধ্যক্ষরা সমরু আর মেডোক, গোহাদে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। সমরুর চেষ্টায় জাঠরা যোগদান করল এবং আগ্রা ফোর্ট

থেকে ভারী কামানগুলি এলাহাবাদ অভিমুখী করা হল। ইংরেজ এইসব খবর পেয়ে এলাহাবাদ পরিত্যাগ করে বাঁকীপুরে সৈন্য সমাবেশ করল।

আলিগড়ে ইংরেজ বিরোধী এই সর্বভারতীয় বিরাট বাহিনী মিলিত হলেন। মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছেদ সুরু হল। যে মুহূর্তে তারা বুঝতে পারলেন যে মীরকাশিমের ধনরত্নের গল্প মিথ্যা ও গুজব মাত্র তখনই সরে যাওয়া সুরু হল। শিখ ও জাঠদের প্রাচীন কলহ আবার দেখা দিল। দেখতে দেখতে সৈন্যদের বেতন দেবার সময় হল। মীরকাশিমের অর্থশূন্যতা প্রকাশ হয়ে পড়ামাত্র শিবিরগুলি দ্রুত খালি হয়ে যেতে লাগল। শেষে কপর্দক শূন্য বন্ধুহীন নিজেকে রক্ষা করতে অসমর্থ মীরকাশিম অত্যন্ত হীন অবস্থা প্রাপ্ত হলেন।[৪৭]

১৭৭৪ ॥ গবর্ণর হেস্টিংসের সঙ্গে বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের যোগাযোগ সুরু হলে বাদশাহ মীরকাশিমকে আজমীড়ে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর নামে সুবা বাংলা দাবী করলেন। মীরকাশিম এ সময় যোধপুরে বসবাস করছিলেন। অবশেষে অযোধ্যার নবাব আসফউদৌল্লার ষড়যন্ত্রে মীরকাশিমকে বাদশাহর সামনে উপস্থিত হতে দেওয়া হল না। মীরকাশিমএর পুরাতন বন্ধু মীর বক্সী নজাফ খাঁ স্বয়ং চেষ্টা করে বিফল হলেন।[৪৮]

১৭৭৫ ॥ মীরকাশিম রাজপুতানায় গেলেন এবং সেখান থেকে নেপালে যাবার চেষ্টাও করলেন। অবশেষে হেস্টিংস সাহেবকে এক পত্র লিখে তিনি জানান যে তার নাম দিয়ে যেসব ষড়যন্ত্র হচ্ছে তার সঙ্গে তিনি কোনভাবেই জড়িত নন অথচ সে সব বন্ধ করার তাঁর কোন ক্ষমতা নাই। হেস্টিংস যেন তাকে ক্ষমা করেন।[৪৯]

১৭৭৭ ॥ ৭ই জুন সাজাহানাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তাঁর দুইপুত্র গুলাম উরাইজ জাফারী ও মহম্মদ বাকির-উল-হুসাইনী

> ফরাসী গবর্ণর মঁসিয়ে শেভেলিয়রকে জানান যে তাঁদের পিতার শেষকৃত্য করার ক্ষমতা তাদের নাই।[৫০]
>
> সম্ভবত ফরাসী সাহায্যেই মীরকাশিমের শেষকৃত্যাদি সম্পন্ন হয়। মনে রাখতে হবে যে ১৭৬৪ থেকে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের নানা ষড়যন্ত্রের নায়ক কিন্তু মীরকাশিম ছিলেন না, বরঞ্চ বলা চলে এই সময়কার রাজনৈতিক শতরঞ্জ খেলায় তিনি হয়ে গিয়েছিলেন অন্যতম ঘুঁটি। তাই অর্থকষ্টে জীবনের শেষ কয়বছর অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন বাংলার এই ভূতপূর্ব নবাব। উদরী রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় স্ত্রী কাছে ছিলেন না সম্ভবত আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

মীরকাশিমের জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ইতিহাস বিশদভাবেই লিখিত হল যাতে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে বিচার করা সহজ হয়। ভাগ্যের পরিহাসে মীরকাশিমের বন্ধু হেস্টিংস সাহেব গবর্ণর হয়ে বাংলায় এলেন কিন্তু মীরকাশিম তখন বহু দূরে, মৃত্যুপথযাত্রী। আশ্চর্য জীবন মীরকাশিমের। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ ভাস্কর পণ্ডিতের অন্যতম হত্যাকারী হিসবে আলিবর্দীর সুনজরে এলেন। সিরাজদ্দৌলাকে ধরিয়ে দিলেন ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। নবাব হলেন ১৭৬০এ, বিতাড়িত হলেন ১৭৬৩তে, বক্সারে পরাজয় ১৭৬৪, যুদ্ধোদ্যম ১৭৭০ ও মৃত্যু ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

বঙ্কিমচন্দ্র : চন্দ্রশেখর ১৮৭৫ ॥

মীরকাশিমকে বাংলা সাহিত্যে প্রথম দেখা গেল ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চন্দ্রশেখর উপন্যাসে।[৫১] মীরকাশিম এই উপন্যাসে প্রধান চরিত্র নয়, পার্শ্বচরিত্র মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র ‘বিজ্ঞাপনে’ লিখেছেন ‘ইহাতে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে তাহার কোন কোন কথা সচরাচর প্রচলিত ভারতবর্ষীয় বা বাঙ্গলার ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সয়ের মতাক্ষরীণ নামক পারস্য গ্রন্থের একখানি ইংরেজি অনুবাদ আছে; ঐতিহাসিক বিষয়ে কোথাও কোথাও ঐ গ্রন্থের অনুবর্তী হইয়াছি। ঐ গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ, ঐ

গ্রন্থ পুনর্মুদ্রাঙ্কনের যোগ্য।' বঙ্কিমচন্দ্র মুতাক্ষরীণ পাঠ করে মীরকাশিম চরিত্র সৃষ্টিতে প্রয়াস পান। ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশিমের বিরোধের ঘটনা-গুলির যতটুকু উল্লেখ আছে তা সাধারণভাবে ইতিহাস অনুসারী। উপন্যাসের মধ্যেও ইতিহাস সুন্দর ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথমখণ্ডের প্রথম পরিচ্ছদে মুঙ্গের দুর্গপ্রাসাদে নবাব ও তাঁর মহিষীর কথোপকথনে মীরকাশিমের সংলাপ—: "(ইংরেজ) বলেন, 'রাজা আমরা কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।' কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব। আমি সিরাজদ্দৌলা নহি বা মীরজাফরও নহি" (পাতা ১৫)। এত অল্প কথায় মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজের বিরোধের মূল কথা তুলে ধরা কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিক উল্লেখ দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে। "কলিকাতার কৌন্সিল স্থির করিয়াছিলেন নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। সম্প্রতি আজিমাবাদ কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠান আবশ্যক। সেই জন্য এক নোকা অস্ত্র বোঝাই দিলেন। আজিমাবাদের অধ্যক্ষ ইলিস সাহেবকে কিছু গুপ্ত উপদেশ প্রেরণ আবশ্যক হইল। অমিয়ট সাহেব নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মুঙ্গেরে আছেন।" (পাতা ৪২)। সময় যে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পঞ্চম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছদে নবাবী সৈন্যের হাতে অমিয়টের হত্যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (পাতা ৯২-৯৫)। গলস্টন সাহেব অবশ্য এই সময় অর্থাৎ ৩রা জুলাই ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান নাই। বস্তুত তিনি নৌকাতে ছিলেন না। উধুয়ানালায় পরাজয়ের পর ৫ই অক্টোবর ১৭৬৩তে নবাবী আদেশে যখন অকস্মাৎ ইউরোপীয় বন্দীদের হত্যা করা হল তখনই ফার্সীবিদ গলস্টনের জীবন্ত সমাধি দেওয়া হয়। ষষ্ঠ খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছদে মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের কাটোয়া যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, (পাতা ১০৭) তৃতীয় পরিচ্ছদে গিরিয়া যুদ্ধের খবর (পাতা ১১০) ও অষ্টম পরিচ্ছদে উধুয়ানালার যুদ্ধে প্রতাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের সমাপ্তি (পাতা ১২২-১৩১)। ঐতিহাসিক চরিত্রগণের মধ্যে উল্লেখিত ব্যক্তিগন ছাড়া খোজা গ্রেগরী বা গুরগিণ খাঁ এবং তকী খাঁ বিশ্বাসঘাতক রূপে চিত্রিত। তকী খাঁ নবাব অনুগামী ছিলেন আমৃত্যু। এই বীর চরিত্রটি অহেতুক কলঙ্কিত।

জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় মুঙ্গেরে আমোদ আহ্লাদ করে গুরগিণ খাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন এটাও সঠিক নয়। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় মুঙ্গেরে বস্তুত নবাবের বন্দী হিসেবেই বাস করতেন। ইংরেজদের মধ্যে লরেন্স ফস্টর কল্পিত চরিত্র—তবে জনসন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে উপন্যাসে ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন তা সত্যই বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর দীর্ঘ ত্রিশ বছর পার হবার আগে বাংলা সাহিত্যে মীর-কাশিমকে না দেখে আশ্চর্য হতে হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত নিখিল নাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে 'উধুয়ানালা' প্রবন্ধে মীরকাশিম সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে। দুঃখের বিষয় তারিখের ভুলে প্রবন্ধটি আচ্ছন্ন সেজন্য মনে হয় যে যথেষ্ট যত্ন সহকারে প্রবন্ধটি সংশোধিত হয় নাই। বঙ্গভঙ্গ ও তৎ-কালীন রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের সাফল্য নবাব মীরকাশিমকে আবার সাহিত্য জগতে নিয়ে এল। তখন সকলের মনে পড়ে গেল যে বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাশিমকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব বলে উল্লেখ করেছেন। হঠাৎ মীরকাশিমকে নিয়ে বেজায় তাড়াহুড়া পড়ে গেল। এক বছরে তিনখানি নাটক রচিত হল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর প্রকাশিত হল মণীন্দ্রনাথ নাগ রচিত মীরকাসেম। মাসখানেকের মধ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর গিরিশচন্দ্র ঘোষের মীরকাসিম প্রকাশিত হল। আরো আশ্চর্য্য বিষয় দুইটি নাটকই ছাপা হয়েছে ৭নং শান্তিরাম ঘোষ ষ্ট্রীটে। মুদ্রাকর যথাক্রমে শ্রীনাথ রায়চৌধুরী ও শ্রীমন্ত রায়চৌধুরী। মণীন্দ্রনাথের প্রকাশক হরিদাস মিত্র এবং তাঁর নাটকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬+১৫৮। প্রকাশকের ঠিকানা নবকুমার রাহার লেন। গিরিশ-চন্দ্রের প্রকাশক অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলী এবং নাটকের পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০। উভয় নাটকের দাম প্রথম প্রকাশের সময় ছিল এক টাকা মাত্র।[৫২] ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের সুরু হতে না হতেই ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' প্রকাশিত হল। এই নাটকটিরও মূল্য এক টাকা মাত্র, প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৭।

গিরিশচন্দ্র রচিত নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হতে থাকে। জন-সাধারণের মনে মীরকাশিম এই নাটকের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের নাট্যরূপও এই সময় অভিনীত হতে থাকে।

অবশেষে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সরকারের নিদ্রাভঙ্গ হল তারা গিরিশচন্দ্রের মীরকাসিম, ক্ষীরোদপ্রসাদের পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের অভিনয় নিষিদ্ধ করলেন। মীরকাশিম ও পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত নাটক দুইটি রাজরোষে বাজেয়াপ্ত হল। আজ পর্য্যন্ত এই দুইটি নাটকের একক প্রকাশ আর হয় নাই। সাহিত্য সংসদের গিরিশ গ্রন্থাবলীতে 'মীরকাসিম' প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্য্যন্ত মীরকাশিম সম্পর্কে পাঁচখানা নাটক পাওয়া গেছে।

১। মীরকাসেম—মণীন্দ্র নাথ নাগ অক্টোবর ১৯০৬ হরিদাস মিত্র
২। মীরকাসিম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ নভেম্বর ১৯০৬ অবিনাশ চন্দ্র গাঙ্গলী
৩। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ১৯০৭ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
৪। মীরকাশিম—মন্মথ রায় ১৯৩৮ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
৫। মীরকাশেম—রেবতী মৈত্র ১৯৫৬ ?

মণীন্দ্রনাথ নাগ : মীরকাসেম॥

'মীরকাসেম' নামে মীরকাশিম সম্পর্কীয় প্রথম নাটক জাতীয় গ্রন্থাগার বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে না থাকায় সেটা পাঠের সুযোগ পাওয়া যায় নাই। পরবর্ত্তীকালের নাটকের চিন্তাধারার সঙ্গে এই নাটকের মিল অথবা অমিল এখন আর বোঝার সুযোগ পাওয়া গেল না। একমাসের মধ্যে একই ছাপাখানা থেকে একই নামে দুইটি নাটক প্রকাশের সম্পর্কে ঔৎসুক্য মেটান সম্ভব হত মণীন্দ্রনাথের নাটকখানি পাঠ করার সুযোগ পেলে। বর্তমানে এ বিষয়ে আর কোন খবর জানা যাবে না। সুতরাং মীরকাশিম সম্পর্কে প্রথম নাটক রচনার জন্য সাধুবাদ জানিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। মণীন্দ্রনাথ নাগ মীরকাশিম সম্পর্কে প্রথম নাটক লেখার কৃতিত্বের অধিকারী।

গিরিশচন্দ্র : মীরকাসিম॥

মণীন্দ্রনাথ নাগ প্রথম নাটক রচনা করলেও তাঁর নাটক কখন অভিনীত হয়েছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রথম অভিনীত মীরকাসিম নাটকের রচয়িতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অভিনয়ের সময় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ।[৫৩] হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখেছেন যে সিরাজদ্দৌলার অভিনয়ের কিছুদিন পরেই মীরকাসিমের

অভিনয় হয়। তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে জানা যায় যে মীরকাসিম নাটক প্রথম অভিনীত হয় ২রা আষাঢ় ১৩১৩ সাল অর্থাৎ ১৬ই জুন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ রাত্রি ৯ ঘটিকায়।[৫৪] প্রথম রজনীর অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেছিলেন :—মীরজাফর—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মীরকাসিম —সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), সুজাউদ্দৌলা ও লালসিংহ—মণীন্দ্রনাথ মণ্ডল (মণ্টুবাবু); সাহ আলম ও আমিয়েট—এন বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যামাচার), আলী ইব্রাহীম—বসন্ত রায়, সন্দেহ হয় বসন্ত রায় ছদ্মনামের আড়ালে ছিলেন স্বনামধন্য অভিনয শিক্ষক গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়। সামসেরউদ্দীন ও ডঃ ফুলারটন—মন্মথ নাথ পাল (হাঁদুবাবু), তকী খাঁ—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, মহম্মদ আমীন—উপেন্দ্রনাথ বসাক, হায়বতুল্লা ও আরাব আলী—জীবনকৃষ্ণ পাল, ফৌজদার দূত—ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জগৎশেঠ মহাতপ চাঁদ ও সমরু—পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, নন্দকুমার—সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়, ভ্যান্সিট্টার্ট—অটলচন্দ্র দাস, জগৎশেঠ স্বরূপ চাঁদ—নুটবিহারী মিত্র, রায়দুলভ, কৃষ্ণচন্দ্র ও সলিমান—জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায়, রাজবল্লভ ও মহম্মদ হসাথ—পান্নালাল সরকার, রামনারায়ণ ও আলম খাঁ—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, হলওয়েল, হে ও মেজর অ্যাডামস—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, হেস্টিংস—শ্রীমতী প্রকাশমণি, ইলিস, ব্যাটসন ও মনরো—ক্ষেত্রমোহন মিত্র; মাঝি—মন্মথনাথ বসু, কেলড্ ও জোনস্—ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জন কার্নাক—সত্যেন্দ্রনাথ দে, গুরগিন খাঁ—খগেন্দ্রনাথ সরকার, খোজা পিক্রু—হরিদাস দত্ত, খোজা বাজিদ ও জাফর খাঁ—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। মণিবেগম—সুধীরাবালা (পটল), বেগম—সুশীলা সুন্দরী, তারা—তিনকড়ি॥ শিক্ষক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। অভিনয়ের স্থান মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চ।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর সিরাজদ্দৌলা নাটকের অভিনয় সুরু হয়। সিরাজদ্দৌলা নাটকের সাফল্যই যে গিরিশচন্দ্রকে 'মীরকাসিম' নাটক রচনায় উৎসাহ দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং নাটকের প্রস্তাবনায় এই স্বীকারোক্তি করেছেন। ' "সিরাজদ্দৌলা" নাটক, সাধারণের প্রীতিকর হওয়ায়, আবার ঐতিহাসিক "মীরকাসিম," ঐতিহাসিক পটে চিত্রিত, করিবার সাহস পাইয়াছি।... ...নাটকাকারে ঐতিহাসিক দৃশ্যগুলি, সাধারণ দর্শক সম্মুখে প্রদর্শন—আমার প্রধান আকাঙ্ক্ষা। নাটকে ইতিহাস অক্ষুন্ন

রাখা আমার শক্তিতে যতদূর সম্ভব, তাহার চেষ্টা পাইয়াছি; এবং দিন দিন উৎসাহপূর্ণ দর্শকবৃন্দে রঙ্গালয় পরিপূর্ণ হওয়ায়, সে চেষ্টা কতক পরিমাণে সফল হইয়াছে, আমার ধারণা।' সিরাজদ্দৌলা রচনার সময় যেমন গিরিশচন্দ্র ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন তেমনি 'মীরকাসিম' রচনার আগে তিনি যে এই সময়কার অনেকগুলি ইতিহাসের বই পাঠ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রস্তাবনায় ম্যালেসন হতে উদ্ধৃত ছাড়া তিনি ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেবের আত্মজীবনীও পাঠ করেছেন বোঝা যায়। বস্তুত গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক নাটক রচনার আগে যে বিশেষভাবে ইতিহাস পাঠ করতেন এ প্রমাণ বারবার পাওয়া যাবে। বাঙ্গালী নাট্যকারদের মধ্যে সম্ভবত গিরিশচন্দ্র পুংখানুপুংখ ইতিহাসের অনুসন্ধানের দিক থেকেও অনন্য। অপরেশচন্দ্রের মন্তব্যটি চমৎকার। ঐতিহাসিক নাটক লেখায় গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে তার উক্তি 'তাঁহার লিখিবার একটা পদ্ধতি ছিল এই যে তিনি যে বিষয়ে লিখিতেন, সে বিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা পুংখানুপুংখরূপে না জানিয়া 'শ্রীদুর্গা' ফাঁদিতেন না।'[৫৫]

মীরকাসিম জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুনের 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় সাধুবাদ প্রকাশিত হয়। বসুমতীও পঞ্চমুখে প্রশংসা করেন।[৫৬] কবি নবীনচন্দ্র সেনকে গিরিশচন্দ্র ২০শে জুলাই ১৯০৬এ এক পত্রে লেখেন—'সত্যই খুব ব্যস্ত ছিলাম এখনো আছি। মীরকাসিম লইয়া ব্যস্ত ছিলাম, এখন আবার পরের কাজে পড়িয়াছি। মীরকাসিম সম্পর্কে বাজারে সুখ্যাতি শুনিতে পাইতেছি। আর যে কয় রাত্রি অভিনয় হইয়াছে, লোকেরও যথেষ্ট ভীড়। ব্রাহ্মরা পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট। এ আমার সামান্য ভাগ্য নহে। আমার ছেলে দানি, মীরকাসিমের অংশ লইয়াছিল, তাহার সুখ্যাতি একবাক্যে।'[৫৭] মীরকাসিমের এই জনপ্রিয়তার ফলেই তৎকালীন বৃটিশ সরকার এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেন এবং নাটক বাজেয়াপ্ত হয়। সুতরাং জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে এবং জনচিত্তকে উদ্বেল করতে মীরকাশিম যে সিরাজদ্দৌলার তুলনায় বেশী সফল হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেদিক থেকে বিচার করলে গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলার তুলনায় মীরকাসিমের নাট্য সফলতা অনেক বেশী।

এবার 'মীরকাসিম' নাটক সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া কর্ত্তব্য। মীর-কাসিম নাটক পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। প্রতি অঙ্ক গর্ভাঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে

সাতটি গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় অঙ্কে বারটি গর্ভাঙ্ক, চতুর্থ অঙ্কে নয়টি গর্ভাঙ্ক ও পঞ্চম অঙ্কে এগারটি গর্ভাঙ্ক। অর্থাৎ মোট ৪৫টি দৃশ্যে 'মীরকাসম' রচিত হয়েছে। প্রথম অঙ্কে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা, ২রা জুলাই মীরণের মাথায় বজ্রপাত হয় এবং ২২শে অক্টোবর মীরজাফর নবাবী ত্যাগ করে কলকাতা রওনা হলেন। দ্বিতীয় অঙ্ক ১৭৬১ থেকে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন পর্য্যন্ত ঘটনা। অর্থাৎ মীরকাসিমের নবাবীর সুরু থেকে এলিস সাহেবের পাটনা শহর দখল পর্য্যন্ত। তৃতীয় অঙ্কে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে নবাবের পাটনা জয় থেকে ১৯ জুলাই কাটোয়ার যুদ্ধে নবাবের পরাজয় পর্য্যন্ত ঘটনা সন্নিবেশিত। চতুর্থ অঙ্ক সুরু হচ্ছে গিরিয়া ও উধুয়ানালায় নবাবের পরাজয়ের পর ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ও শেষ হয়েছে এক বছর পর ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বক্সার যুদ্ধের আগে। পঞ্চম অঙ্ক সুরু ও শেষ ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বক্সারে। শেষদৃশ্য বা মীরকাশিমের মৃত্যুর দৃশ্যে নাটকের সমাপ্ত হয়েছে—ঐতিহাসিক কালে অবশ্য দীর্ঘদিন পর ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে।

গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক কালকে যে ভাবে নাটকে বিভক্ত করেছেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি মীরকাশিমের প্রজারঞ্জক রূপের ওপর জোর দেবেন এবং বারবার বৃটিশ শক্তির কাছে পরাজিত হওয়াটাই বিয়োগান্ত ঘটনার রূপ পরিগ্রহ করবে।

১॥ গিরিশচন্দ্র প্রথম অঙ্ক সুরু করেছেন মুর্শিদাবাদে মীরজাফরের অন্তঃপুরস্থ মন্ত্রণা কক্ষে। পুত্র মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যুর সংবাদে মীরজাফর হাহাকার করছেন। নবাব মহিষী মণিবেগম তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং তাঁকে আবার যথারীতি আহার নিদ্রা করে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে বলছেন। মীরজাফর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলছেন কুক্ষণে তিনি সিংহাসন প্রয়াস করে ইংরেজের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এখন ধনাগার অর্থশূন্য, সৈন্যগণ বেতন অভাবে বিদ্রোহী প্রায়, রাজকার্য্য অধ্যক্ষশূন্য ও চতুর্দিকে অসন্তোষ। মণিবেগম জানাচ্ছেন যে নবাবী শীলমোহর পেলে তিনি স্ত্রীলোক হলেও সাম্রাজ্য পরিচালনায় অপটু নন। মীরজাফর অপটু তাই তিনি মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিমকে আহ্বান করেছেন। 'তার ওপর সকল ভার দাও।' 'সে অতি কর্মক্ষম, সমস্তকার্য্য সুচারু রূপে নির্বাহ হবে।'

(১/১ পাতা ২৮৩) অবশেষে কাশিম আলির উপর রাজ্যের ভার দিতে মীরজাফর রাজী হলেন বটে কিন্তু কাশিমআলি উপস্থিত হলে তাকে শীল-মোহর ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। মীরজাফর জানালেন যে 'নন্দকুমার প্রভৃতি সুদক্ষ রাজকর্মচারীবর্গ কর আদায়ে অক্ষম। ইংরাজ কোম্পানীর দৌরাত্ম্যে শুল্ক আদায় হয় না, জমিদার মাত্রেই অবাধ রাজস্বের আদায় দেয় না' (১/১ পাতা ২৮৩)। আরো বললেন 'প্রধান প্রধান করপ্রদ প্রদেশ ইংরাজের নিকট আবদ্ধ। জমিদাররাও ইংরাজকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত রেখেছে' (১/১ পাতা ২৮৪)। মীরকাশিমের কাছে এগুলি কোন সমস্যাই নয়। জানালেন যে শাসন রজ্জুর রাশ টেনে ধরলেই এসব সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু মীরজাফর জামাতাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। অন্যদিকে মণিবেগম মীরকাশিমের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে উৎসুক—'আমি তোমায় সর্বোচ্চ পদ প্রদান কচ্ছি—তুমি আমার পুত্রকে যৌবরাজ্য দাও।' (১/১ পাতা ২৮৫) আরও বলছেন—'তোমারও উচ্চ আশা আছে, আমারও উচ্চ আশা তৃপ্তি হয় নাই। বলবে ছিলেম নর্তকী—বেগম হয়েছি। কিন্তু তাতে আমার আশা তৃপ্ত হয় নাই—প্রজ্বলিত অগ্নিতে ঘৃত প্রদান হযেছে' (১/১ পাতা ২৮৪)। মীরকাশিম কিন্তু মণিবেগমের প্রস্তাবে রাজী হবার নিদর্শন দিলেন না। ইতিমধ্যে বেতন অভাবে সৈন্যদল বিদ্রোহ করল এবং মীরকাশিম নিজ অর্থে তাদের শান্ত করলেন। মণিবেগম জানালেন যে অর্থ না থাকলেও তাঁর নিজস্ব গহনা দিয়ে তিনিও একাজ করতে পারতেন। অবশেষে নবাব মীরজাফরের হাত ধরে তাঁকে চণ্ডু খেতে নিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ইংরেজ বণিকের অত্যাচার দেখান হয়েছে। মুৎসুদ্দি, মহাজন, তাঁতী সকলেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েছেন। তামাকের মহাজন বলেছেন 'লবণ, সুপারী, ঘৃত, চাউল, খড়, বাঁশ, মৎস্য, চিনি, তামাক, পান, যে কাজে দেশীলোক দু' পয়সা পেতো, কুঠিওয়ালা ইংরাজ সকল ব্যবসা কেড়ে নিলে' (১/২ পাতা—২৮৭)। মীরকাশিম এই সব দেখে দুঃখিত হচ্ছেন এবং তাঁর বন্ধু আলি ইব্রাহীম বলছেন 'আমরা সকলে মিলে পছন্দ করে নবাব বেছে নিয়েছি' (১/২ পাতা—২৮৭)। এমন সময় 'তারা' প্রবেশ করলেন। পরিচয়ে বলা হয়েছে উন্মাদিনী এবং 'এ প্রদেশের রাণীর কন্যা।' তিনি ফকিরিণির ন্যায় বিচরণ করেন। যেখানে রোগ শোক দুঃখ সেখানেই তিনি

উপস্থিত হন। এক অতি অসামান্যা রমণী। নাট্যকার এই চরিত্রটিকে কাঙালিনী দেশমাতৃকার প্রতিভূরূপে ব্যবহার করছেন। প্রথম প্রবেশের সংলাপ—'বাবা, শুনছ চতুর্দিকে হাহাকার শব্দ শুনছ? অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, রোগ-শোক দৌরাত্মে বঙ্গভূমি জর্জরীভূতা।··· দুখিনী মাতৃভূমির দুর্দশা আর কতদিন দেখবে?' মীরকাশিমকে আদেশ করলেন—'বাবা তুমি বঙ্গবাসী · মুমূর্ষু বঙ্গমাতাকে পুনর্জীবিত করো।' আবার—'তুমি স্বদেশ বৎসল তোমারই কার্য্য—এ কার্য্য আর কার? যে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত, মাতৃসেবা যার ব্রত, যে মাতৃবৎসল—তারই কার্য্য—বীরের কার্য্য—তুমি বীর তোমার কার্য্য।' (১/২ পাতা—২৮৭)। তারার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মীরকাশিম সংকল্প করলেন—'এতে আমার সর্বনাশ হয়, জীবন নাশ হয়, কলঙ্ক হয়, লোকের নিকট ঘৃনিত হই, নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়, স্ত্রী পুত্র ত্যাগ করতে হয়, নরকগামী হতে হয়—তাতেও আমি প্রস্তুত;—নিশ্চেষ্ট হয়ে দীন প্রজার দুঃখ আমি সহ্য করবো না।' আলি ইব্রাহীম জানাচ্ছেন—'এ মহা-কার্য্যের মূল্য ·····আত্মবিসর্জন যদি দিতে প্রস্তুত থাকেন—অগ্রসর হোন' (১/২ পাতা—২৮৮)। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে খোজা পিক্র মীরকাশিমকে ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে বোঝাপড়া করে নবাবী কিনে নেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। জানাচ্ছেন যে মীরজাফরকে অনেকেই পছন্দ করে না কাজেই গবর্নর হলওয়েল সাহেবের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিলেই সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। শাহজাদা ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন কাজেই বাংলার মসনদে মীরজাফরের জায়গায় একজন সর্বজনমান্য কর্মক্ষম নবাব প্রয়োজন। খোজা পিক্র আরো জানালেন যে 'হলওয়েল সাহেব মীরজাফরের দোষের এমন এক লম্বা চওড়া ফিরিস্তি বানিয়ে রেখেছেন যে এক মজবুৎ নবাব পাইলেই ইংরেজ কোম্পানী তাহাকে গ্রহণ করবে।' পিক্র অভিযোগ করলেন যে সিরাজদ্দৌলার লুকান অর্থ মণিবেগম আত্মস্মাৎ করেছে (১/৩ পাতা—২৯০)। ইংরেজদের টাকা তৈরীর সনদ দেবার খবর পেয়ে বিচলিত জগৎশেঠ—মীরকাশিমের কাছে উপস্থিত হচ্ছেন। নানা প্রসঙ্গ উঠছে। তার মধ্যে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি আলোচিত হল। মণিবেগম এসে তাঁর বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করছেন—তাঁর পুত্র নজমদ্দৌলাকে যৌবরাজ্য দিতে হবে। মীরকাশিম রাজ্য পরিচালনা

করুন আর নবাব নর্তকী নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি বিদায় নিলে মীরকাশিমের সহধর্মিনী ফতিমা বিবি প্রবেশ করে আশঙ্কিত হচ্ছেন কারণ তাঁর মতে 'যে কার্য্যে মণিবেগম, সে অবশ্যই কোন গর্হিত কাজ।' (১/৩ পাতা —২৯৪)। অবশেষে মীরকাশিম তাঁর সংকল্প ঘোষণা করছেন—'আমি দেশ-বৈরীর সহিত সংগ্রাম করতে জন্মগ্রহণ করেছি।......যদি মাতৃভূমিকে করাল বিদেশীর কবল থেকে উদ্ধার করতে পারি তবেই জীবন সার্থক, নচেৎ জন্ম বৃথা, কর্ম বৃথা, জীবন বৃথা' (১/৩ পাতা ২৯৫)। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে তারাদেবী তকিখাঁকে রাজসাহীর একগঞ্জে দেশসেবায় রক্ত দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে কলকাতার কাউন্সিলে মীরকাশিমের সঙ্গে হলওয়েল, ভ্যান্সিটার্ট, কেলড প্রভৃতির আলোচনা। মনে হয় খোজা পিত্রুই এই সংযোগে দালালী করছেন। মীরকাশিম সৈন্যদলের ব্যয়ভার বহনের জন্য বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম ইংরেজ কোম্পানীকে অর্পণ করছেন। বলছেন 'লাভ-লোকসানের ভার কোম্পানীর—আমার ওপর কোন দাবী দাওয়া থাকবে না!' মীরকাশিম পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ ও বিশ লক্ষ টাকার হুণ্ডি দিতে রাজী হচ্ছেন। কিন্তু ভ্যান্সিটার্ট সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলছেন যে ওইরূপ বে-আইনী অর্থ তিনি নিতে পারেন না। তারপর সন্ধির অন্যান্য সর্ত ঠিক হয়ে গেল। হলওয়েল খোজা পিত্রুকে জানালেন যে তিনি বিলাতে চলে যাচ্ছেন (১/৫ পাতা ২৯৬—২৯৮)। ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক মুর্শিদাবাদের দীপমালা-শোভিত পথে ব্যাণ্ড বাজিয়ে ইংরেজ সৈন্য চলে গেল তার পেছনে গেলেন ভ্যান্সিটার্ট ও হেস্টিংস। দুর্গাপূজার দিন রাজপথে ইংরেজ সৈন্য দেখে তারাদেবী হাহাকার করতে লাগলেন। সপ্তম গর্ভাঙ্কে গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট আর খোজা পিত্রু নবাব মীরজাফরের ওপর অনাদায়ী অর্থের জন্য চাপ সৃষ্টি করলেন। উত্তরে মীরজাফর বলছেন 'নাও নাও সাহেব নবাবী নাও—এই আমি তক্তা ছেড়ে উঠলাম। কাসিম, এসো বসো। সাহেব আমায় মক্কায় পাঠিয়ে দাও, নয় ক্লাইভ সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দাও' (১/৭ পাতা—২৯৯)। একটু পরে বলছেন—'বুঝেছি-বুঝেছি-তোমার মনের ভাব বুঝেছি। এই নাও রাজমুকুট আমি পরিয়ে দিচ্ছি।......তোমরা যেয়ো না আমায় কলিকাতায় নিয়ে যাও। কাসিম আমায় খুন করবে' (১/৭ পাতা—২৯৯)।

অবশেষে মীরকাশিম নবাব হলেন। নকীব নাম ফোকরাল। মণিবেগম

প্রবেশ করে উষ্মা প্রকাশ করলেন। কাশিম আলিকে বিশ্বাসঘাতক বললেন। তীব্র কষাঘাতের মতো মীরকাশিম শুনলেন মণিবেগমের সংলাপ—'এ সন্ধিপত্র শেষ সন্ধিপত্র নয়; আবার সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবে, আবার নবাবী তক্তা নিলাম হবে। ব'সো, ব'সো—দুদিন সিংহাসনে ব'সো।' (১/৭ পাতা—৩০০)। অতঃপর মীরজাফর মণিবেগমের হাত ধরে সিংহাসনচ্যুত সিরাজের কথা বলতে বলতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। প্রথম অঙ্ক শেষ হল।

আলোচনা ॥

'মীরকাসিম' নাটকের প্রথম অঙ্ক রচনায় গিরিশচন্দ্র যে অপূর্ব মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন তার জন্য তাঁকে ভূয়সী সাধুবাদ দেওয়া কর্তব্য। সিরাজদ্দৌলার চরিত্র নিয়ে তিনি যে সব অসুবিধা ভোগ করেছেন এই নাটকে তার কোন চিহ্ন নাই। মীরকাশিম প্রভূত গুণের অধিকারী ছিলেন। রাজ্য শাসনে তাঁর ক্ষমতাও ছিল সুবিদিত তাই গিরিশচন্দ্রের পক্ষে এই চরিত্রের নায়কোচিত গুণাবলী ব্যবহার করা সহজ হয়েছে। মীরকাশিম সহজেই দেশহিতৈষীর ভূমিকায় থাপ খেয়ে গেছেন। তাঁর কীর্তি ও কর্মকে নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গিরিশচন্দ্র বিশেষ অসুবিধা বোধ করেন নাই। তাছাড়া 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের মতো মীরকাসিম রচনাতেও গিরিশচন্দ্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের ওই নামের প্রবন্ধ পুস্তকটির ওপর নির্ভর করেছেন। অক্ষয়কুমারের মীরকাসিম অতিশয় সুলিখিত প্রবন্ধ ১৩১১ সালে অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। অন্য প্রবন্ধের ত্রুটিগুলি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই অক্ষয়কুমার অনুসরণে গিরিশচন্দ্র বিপদে পড়েন নাই। মীরকাশিমের তিন বছরের নবাবী ও এক বছরের যুদ্ধ প্রস্তুতি একান্ত ঘটনাবহুল। প্রয়োজন মতো ঘটনা চয়ন করতে তাই গিরিশচন্দ্র অসুবিধা বোধ করেন নাই। ইংরেজদের লিখিত ইতিহাস যে গিরিশচন্দ্র পাঠ করেছেন নাটকের সংলাপ রচনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে 'মীরকাসিম' নাটকে যে জাতীয়তাবাদ মীরকাশিমের মধ্যে দেখান হয়েছে তা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার জাতীয়তাবাদ তার সঙ্গে আসল মীরকাশিম বা তার যুগের কোন মিল নাই। বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে উদ্বেলিত বাঙালীর জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধ প্রকাশ পেয়েছে মীরকাসিম নাটকে। ১৭৬০ থেকে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই মনোবৃত্তির কোন চিহ্ন ছিল না। নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ ছিল ব্যক্তিগত ঘটনার সামিল। অর্থ দিয়ে মসনদ কিনেছিলেন নবাব মীরকাশিম, বাদশাহর

কাছ থেকে কিনেছিলেন সুবাদারের স্বীকৃতি। তিনি চেয়েছিলেন নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ক্ষমতা মতো নবাবী করতে। দেশকে সুশাসনে চালাবার ক্ষমতাও তার ছিল কিন্তু ইংরেজ বণিকদের স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষ হল। নবাব তখন নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ইউরোপীয় প্রথায় গঠন করতে চেষ্টা করলেন, কামানবন্দুক গোলাবারুদ তৈরী করতে চেষ্টা করলেন। ইংরেজরা প্রমাদ গণলেন। ক্ষমতা-শালী শাসক তাঁদের বাণিজ্যের উপরিলাভ বন্ধ করবে। তারা নবাবকে সরিয়ে দিতে উৎসুক হলেন। গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট আর তাঁর বন্ধু হেষ্টিংস কিছুতেই লোভী ইংরেজদের বাধা দিতে পারলেন না। এই গোলমালের মাঝে কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য অমিয়েটের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল। দোষী করা হল নবাবকে। তাকে নবাবী থেকে খারিজ করে দিয়ে নিয়ম-তান্ত্রিক ইংরেজ মীরজাফরকে নবাব ঘোষণা করে তার নামে বিদ্রোহী শাসনে চললেন। তাই মীরকাশিমের বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদের প্রকাশ বললে ইতিহাস মানা হয় না। অবশ্য তখন সেটাই নাটক লেখার উদ্দেশ্য ছিল। মীরকাশিমকে জাতীয় নায়ক করে দাঁড় করালে তবে তো বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহটা জোড়াল রূপ নেবে। সেই জন্য গিরিশচন্দ্র যা করেছেন তা একান্ত যোগ্য কাজ হয়েছে। তবে ইতিহাস আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে যে বাংলায় দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ, দেশকে তার সাহিত্য ইতিহাসের মাধ্যমে বোঝবার চেষ্টা এসবই হয়েছে ইংরেজদের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে, ইংরেজী শিক্ষা ও দর্শনের প্রসারের সঙ্গে, এদেশে ইংরেজী শাসন কায়েমী হবার পর। তাই বাংলা ছাপাখানা থেকে ব্যাকরণ, শকুন্তলা থেকে ভগবদ্গীতা আর সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষা সবারই সুরুতে ইংরেজ জ্ঞানীদের নামের তিলক শোভা পাচ্ছে। ইংরেজদের কাছ থেকেই আমরা ইংরেজ তাড়াবার শিক্ষা পেয়েছি। কেবল আন্দোলন করে শোভাযাত্রা ও সভা করে ইংরেজ বিতাড়ণ নয়, পত্র পত্রিকার মাধ্যমে প্রবন্ধ লিখে, সাহিত্য ও নাটকে ইংরেজের কলঙ্ক তুলে ধরে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। 'মীরকাসিম' নাটক সেইরকম এক চমৎকার প্রচেষ্টা এটা মনে রাখলেই চলবে।

নাটক শুরু হয়েছে মীরণের মৃত্যুর কিছু পরে। কিন্তু প্রথম গর্ভাঙ্কেই নাট্যকার প্রমাদে পড়েছেন। মীরজাফর মহিষীর নাম দিয়েছেন মণিবেগম। বলাবাহুল্য এই সময় প্রধানা বেগম বিবি শাহ খানুম মীরজাফরের কাছেই

থাকতেন। ২২শে অক্টোবর মীরজাফর যখন কলকাতা যাত্রা করলেন তখন প্রধানা বেগম কন্যা জামাতার কাছেই থেকে গেলেন। মণিবেগম যে প্রধানা মহিষীর রাগের অন্যতম কারণ এবং সেই কারণেই মীরকাশিম যে নবাবী কিনতে রাজী হলেন তা আমরা কিছু আগে আলোচনা করেছি। বস্তুত কলকাতায় আসার পর মীরজাফর সম্পূর্ণভাবে মণিবেগমের অধীন হন। মণিবেগমের মীরকাশিমের সঙ্গে তাঁর পুত্র নাজামদ্দৌলাকে যুবরাজ করবার যে ষড়যন্ত্র এও প্রক্ষিপ্ত কারণ মীরণের দুইটি পুত্র তখন বর্তমান। দ্বিতীয়বার নবাব হবার সময় থেকেই মণিবেগমের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায় এবং তার পুত্রকে নবাব করতে ইংরেজ অঙ্গীকার করে। লর্ড ক্লাইভ যখন ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার বাংলাব গবর্ণর হয়ে এলেন তখন বৃদ্ধা নবাব মহিষীর করুণ পত্রে মণি-বেগমের সাঙ্গপাঙ্গদের তাঁর ওপর ও মীরণের পুত্র কন্যাদের উপর অত্যাচারের বিবরণ জানতে পারা যায়। বৃদ্ধা প্রধানা বেগমের কথা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অপ্রয়োজন ভেবে লেখেন নাই স্বভাবতই গিবিশচন্দ্র ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মণি-বেগমকেই নবাব মহিষী বলে ভ্রম করেছেন।

মীবজাফরের রাজ্যচ্যুতি নানা আলোচনার মাধ্যমে হয় বটে কিন্তু কোন সমযেই তিনি মীরকাশিমকে বিশ্বাস করেন নাই। গিরিশচন্দ্র মীরজাফরের এই ভাব নাটকের সুরু থেকেই বজায় রেখেছেন। এমনকি সৈন্যদের বিদ্রোহের জন্য মীরজাফর যে তাঁর জামাতবাবাজীকেই দায়ী মনে করতেন এটাও অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহে মীরকাশিমের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ প্রমাণিত না হলেও নবাবী সৈন্যদের ক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে মীরকাশিমের হস্তক্ষেপ অসম্ভব নয়। গিরিশচন্দ্র তাই মীরজাফরের মনে এই সন্দেহ দেখিয়েছেন কিন্তু মীরকাশিমের সঙ্গে বিদ্রোহের যোগাযোগ অস্বীকার করেছেন। মীরকাশিম যে মীরজাফরের প্রধানা বেগমের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে-ছিলেন তার সব থেকে বড় প্রমাণ মীরজাফর কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলে বেগম কন্যাজামাতার কাছেই থাকলেন। মীরজাফর গবর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে স্পষ্টই লিখে জানিয়েছেন যে মীরকাশিম ক্ষমতাশীল হলে তাকে বধ করবে তাই একমুহূর্ত বিলম্ব না করে তিনি মণিবেগম প্রভৃতিকে সঙ্গে করে কলকাতা যাত্রা করলেন। সেটা ছিল বিজয়া দশমীর দিন। মীরজাফরের মীরকাশিমকে অবিশ্বাস খুব স্পষ্টভাবেই নাটকে দেখান হয়েছে এবং তা ইতিহাস অনুসারী।

যেটা ইতিহাস পরিপন্থী তা আগেই বলা হয়েছে—মীরকাশিমের চরিত্র। তাঁকে অমন ধর্মপ্রাণ, সৎ, সরল এবং উদারচেতা নাটকের প্রয়োজনে দেখান হয়েছে। সুতরাং প্রথম গর্ভাঙ্ক ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের ঘটনা। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দেখান হয়েছে যে দেশের অরাজকতাই মীরকাশিমকে নবাব হতে উদ্বুদ্ধ করল। এই গর্ভাঙ্ক রচনায় সম্পূর্ণ ভাবে ভ্যাসিট্টার্টকে লেখা হেষ্টিংসের চিঠি অবলম্বন করা হয়েছে। যদিও হেষ্টিংসের এই সুবিখ্যাত পত্র ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দের জুন-জুলাই মাসের ঘটনা তাহলেও নাটকের অনুরোধে কল্পনা করা চলতে পারে যে এই অবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছিল। হেষ্টিংস লিখেছেন—'যে সব লোক মাথায় টুপি পরে তারা কলিকাতার আওতা ছাড়িয়ে আসামাত্র স্বাধীন রাজার মতো ব্যবহার করতে সুরু করে।' আরো লিখলেন, 'আমি যদি নবাবের স্থলাভিষিক্ত হতাম, তাহলে আমার প্রজাদের রক্ষার জন্য নবাব যা যা করেছেন তাই করতাম।'[৫৮] কাশিমবাজারে পৌঁছে হেষ্টিংস লিখলেন—'যাওয়া আসার পথে এমন একখানিও নৌকা দেখলাম না যাতে আমাদের পতাকা উড়ছে না। আমাদের সিপাহী ও লোকজন স্থানীয় লোকের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করে যে দোকানপাট পরিত্যক্ত হয়। আমাদের আমদানিকারক ও ভৃত্যরা ইংরেজ জাতির কলঙ্ক।'[৫৯] এই ঘটনাগুলিকে আগে ব্যবহার করায় নাট্যকার নবাবের কীর্তিকাণ্ডের অনুমোদন হিসাবে ঘটনাগুলিকে ব্যবহার করতে পারেন নাই। মনে হয় হেষ্টিংসের দৌত্যের ঘটনার বিশদ বিবরণ নাটকে রচিত হলে নবাবের কাজের যৌক্তিকতা প্রমাণের অপেক্ষা রাখত না।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে 'তারা' নামে এক পাগলিনী চরিত্রের অবতারণা করা হয়েছে। নাট্যকার এই চরিত্রটিকে 'বঙ্গজননী'র প্রতিভূরূপে ব্যবহার করেছেন। পরিচয়ে বলা হয়েছে—'এ প্রদেশের রাণীর কন্যা। শুনেছিলাম যে, সেই রাণীর কন্যা সাত বৎসরের সময় বিধবা হয়। কোন কারণে রাণী তার মৃত্যু হয়েছে প্রচার করেন। সেই অবধি এই কন্যা ফকিরণীর ন্যায় ভ্রমণ করে' (১/২ পাতা ২৮৮)। গিরিশচন্দ্র রাণী ভবানীর কন্যা 'তারাসুন্দরী'কে বঙ্গজননী রূপে কল্পনা করেছেন। তারার বৈধব্য এবং মুর্শিদাবাদের বরানগরে বসবাস ঐতিহাসিক সত্য। নবযৌবনা তারার প্রতি সিরাজদ্দৌলার কামনার ইতিহাস প্রথমখণ্ডে আলোচিত হয়েছে। 'তারা'কে ধরে নিয়ে আসার জন্য সিরাজ সৈন্য প্রেরণ করলে রাণী ভবানী বিধবা কন্যার মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা

করেন এবং নবাবী সৈন্যের সামনে এক মৃত তারাকে চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত করা হয়। কন্যাকে নিয়ে রাণী কাশীধামে গমন করেন এবং তখন থেকেই 'তারা' কাশীতে বসবাস করেন। রাণী ভবানীর মতো বাংলার সব থেকে অর্থশালী জমিদারের কন্যার পথে পথে 'ফকিরণী'র ন্যায় ঘুরে বেড়ান শুধু অকল্পনীয় নয় অসম্ভব। মীরকাশিমের সময় রাণী ভবানী জমিদারী চালাচ্ছেন। মীরকাশিমের অর্থলোভ রাণীকেও নিষ্কৃতি দেয় নাই। অনাদায়ী রাজস্ব দেবার জন্য বারবার সময় চেয়ে রাণী বিফল হলেন। অবশেষে তৎকালীন রাণীর দেওয়ানকে ধরে নিয়ে এসে মীরকাশিম সকলের সামনে রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতি আদায় করবার জন্য বেত্রাঘাত করেন।[৬০] রাণী ভবানীর দেওয়ানের অবস্থা দেখে অন্য জমিদাররা রাজস্ব দিতে আর দেরী করলেন না। 'তারা'র পক্ষে তাই মীরকাশিমের পক্ষ অবলম্বন করা বা বঙ্গজননী হওয়া একান্ত অসম্ভব কারণ তিনি কাশিবাসী হিন্দুর অভিজাত ঘরের ব্রাহ্মণ বিধবা, তাঁর পক্ষে ফকিরণী হওয়া কেবল বাতুলতার নামান্তর মাত্র।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আরেকটি ভুল, আলী ইব্রাহীমকে মীরকাশিমের বাল্যবন্ধু ও বয়স্যরূপে কল্পনা করা হয়েছে। বস্তুত এই পদাধিকারীর নাম হবে মীর্জা শামসুদ্দিন ইনিই মীরজাফরের নামকরণ করেন—'ক্লাইভের মদ্দাগাধা'। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে খোজা পিত্রু মীরকাশিমকে নবাব হবার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে উদ্বুদ্ধ করছেন দেখান হয়েছে। মনে হতে পারে যে নবাবীতে মীরকাশিমের কোন লোভই ছিল না কেবলমাত্র খোজা পিত্রু কর্তৃক উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশের সেবা করার জন্যই মীরকাশিম নবাবী কিনে নিতে রাজী হলেন। বলা বাহুল্য ইহা প্রক্ষিপ্ত। মীরকাশিম নবাবী লাভের জন্য ইংরেজদের বিশেষ হলওয়েল সাহেবকে অর্থলোভ দেখিয়েছেন এবং সেই লাভের লোভেই ইংরেজরা তাকে নবাবী দিয়েছেন। এখানে খোজা পিত্রু বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রভাবের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মীরকাশিম 'প্রভাবিত' হবার মতো লোক ছিলেন না। সেটাই ছিল তাঁর প্রধান গুণ ও প্রধান দোষ। এই গর্ভাঙ্কের খোজা বাজিদ ও জগৎশেঠের সংলাপে হিন্দু মুসলমান দুই দলের খবর দেওয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে এই খবর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের খবর যখন শতাব্দীর সাধনায় হিন্দু মুসলমান দুইটি আলাদা দলে রূপান্তরিত। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যেমন গভীর প্রেমের

নিদর্শন নাই, তেমনি নিয়ত দ্বেষেরও চিহ্ন নাই। হিন্দু ছিল সংখ্যাগুরু, মুসলমানরা শাসক জাতি। উভয়ে নিজ গণ্ডী রক্ষা করে উভয়কে সহ্য করেছে। জাতিগত প্রশ্ন তুলে পারস্পরিক সম্পর্ককে ভারী করেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার কোন খবর নাই এটা পরবর্তী কালের পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্য্য ঘটনা সন্দেহ নাই কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীর জীবনে এটাই ছিল একান্ত স্বাভাবিক। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে জগৎশেঠ প্রভৃতির উপদেশ—'এখন উপস্থিত কৌশল ক'রে তো নবাবী নেন' মীরকাশিম গ্রহণ করলেন। অবশেষে মণিবেগম এলেন ষড়যন্ত্রের হিসাবনিকাশ করতে এবং মীরকাশিম তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন; 'রাজমুকুট আমায় উপাসনা করছে, গদী দিতে ইংরাজ আমায় আবাহন করছে।' মণিবেগমের সঙ্গে মীরকাশিমের কোন যোগাযোগ ইতিহাস পরিপন্থী ঘটনা। দৃশ্যের শেষে মীরকাশিমের স্ত্রীকে পতিগত প্রাণ দেখান হয়েছে। ইতিহাস মীরকাশিম-পত্নী সম্পর্কে প্রায় কোন খবরই দেয় না। সুতরাং নাট্যকার যে তাকে পতিঅনুগামী দেখিয়েছেন তাতে কোন ক্ষতি হয় নাই। গিরিশচন্দ্র যে কতো নিবিষ্ট ভাবে ইতিহাস পাঠ করেছেন তা বোঝা যায় জগৎশেঠের কলকাতার টাঁকশালে মুর্শিদাবাদী টাকা তৈরী হবার সংলাপে এবং দেশের উন্নতি কল্পে মীরকাশিমের দৃশ্যশেষ সংকল্পে। লক্ষণীয় যে মীরকাশিমের পত্নীর চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। পরবর্তী দৃশ্যেও দেখা যাবে ঐতিহাসিক তকি খাঁর চরিত্র অঙ্কণ করেছেন গিরিশচন্দ্র, বঙ্কিমের অনৈতিহাসিক তকির চরিত্র উপেক্ষা করে এবং সে কাজে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র মীরকাসিম প্রবন্ধ তাঁর প্রধান সহায়।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে দেশের জন্য রক্তদান করার জন্য তারা তকি খাঁকে উদ্বুদ্ধ করলেন। তারা চরিত্র প্রক্ষিপ্ত আগেই আলোচিত হয়েছে। অনুরূপ অন্য কোন চরিত্র থাকাও অসম্ভব কারণ বাংলা দেশের স্বাদেশিকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর দান—অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা ছাড়া দেশ জাতি প্রভৃতির সম্পর্কে চিন্তাভাবনার কোন প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ঐতিহাসিক কালানুযায়ী এই সকল ভাব ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এদেশে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং তারার চরিত্রের মতো তকি খাঁর

সঙ্গে তারার সংলাপ এক অসম্ভব কল্পনা। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে মীরকাশিমের সঙ্গে কলকাতা কাউন্সিলের ইংরেজদের আলোচনা দেখান হয়েছে। খোজা পিক্রকে এই আলোচনার দালা মীরকাশিম স্বয়ং কলকাতা কাউন্সিলের ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। অন্যান্য ঘটনা গবর্ণর ভ্যান্সিট্টাট লিখিত বিবরণ অনুসারী। এই সময়ে যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় সেটাই ২৭শে সেপ্টেম্বরের সন্ধিপত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই সন্ধিপত্র সই হবার পর ইংরেজ কোম্পানী নবাব মীরজাফরকে গদীচ্যুত করার জন্য গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্টকে প্রেরণ করে। মনে রাখা দরকার যে এই গর্ভাঙ্কের বিবরণে মীরকাশিমের সঙ্গে কলকাতা কাউন্সিলের চুক্তির যে রূপ প্রকাশ করা হয়েছে তা মোটেই ইতিহাস অনুসারী নয়। এই দিনের ঘটনার পূর্ণ বিবরণ কোম্পানীর ওই দিনের কন্সালটেসনে লিপিবদ্ধ আছে। মোটামুটি ভাবে সেদিনের ঘটনার সহজ থিয়েটারি সমাধান করা হয়েছে। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে মুর্শিদাবাদের পথে ইংরেজ সৈন্যের পেছনে গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্ট ও হেস্টিংসকে দেখে তারাদেবীর আর্তনাদ সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনা। গিরিশচন্দ্র যতো সহজে মীরজাফরকে গদীচ্যুত করেছেন প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা তত সহজে ঘটে নাই। গিরিশচন্দ্র দুর্গাপূজার সপ্তমীতে সৈন্য দেখিয়ে বিজয়াদশমীর দিন মীরজাফরকে কলকাতা অভিমুখে পাঠিয়েছেন। গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্ট নবাবের সঙ্গে আলোচনা সুরু করেন ১৫ই অক্টোবর এবং ২২শে অক্টোবর মীরজাফর নবাবী ত্যাগ করেন। এছাড়া গবর্ণর ও হেস্টিংস সাহেবের সৈন্যবাহিনীর পেছনে সৈন্যাধ্যক্ষের মতো কুচকাওয়াজ করে যাবারও কোন কারণ নাই। কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠিতে গবর্ণর উঠতেন। হেস্টিংস কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। পরবৎসর তাকে রেসিডেন্টের পদও গ্রহণ করতে হয়। কুঠিতে ব্যবসা বাণিজ্যের অধ্যক্ষতা করতে করতে নবাব দরবারের রাজনীতির সঙ্গে যোগ রাখা সহজ কাজ ছিল না। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস কুঠির অধ্যক্ষ ও নবাব দরবারে কোম্পানীর প্রতিনিধি এই দ্বৈত পদে সমাসীন। সুতরাং গবর্ণর ও ইংরেজ প্রতিনিধিকে কুচকাওয়াজ করার ঘটনা সম্পূর্ণ থিয়েটারি কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। ইংরেজ কোম্পানীর গবর্ণর তখন এদেশে নবাবের পৃষ্ঠপোষকের সম্মানে সম্মানিত। তাঁর কদর নবাবের কদরের থেকে কিছুমাত্র কম ছিল না।

সপ্তম গর্ভাঙ্কে মীরজাফরের রাজ্যচ্যুতি দেখান হয়েছে। পঞ্চম গর্ভাঙ্কের মতো মোটামুটি ঘটনাগুলি ঘটলেও যেভাবে দেখান হয়েছে সে ভাবে ঘটে নাই। যেমন এই সময় মীরকাশিম তাঁর শ্বশুরমহাশয়ের ধারে কাছেও ছিলেন না। হেস্টিংস মীরজাফরের পদচ্যুতির সময় উপস্থিত ছিলেন না। বরঞ্চ সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ মেজর কাইলোড বা কেলড ও লাসিংটন নামে এক ছোকরা কর্মচারী মীরজাফর বিসর্জনে বড় ভূমিকায় ছিলেন। লাসিংটন ভাল ফারসী জানতেন তাই শেষ পর্য্যন্ত মীরজাফর তাকে সঙ্গে নিয়েই কলকাতায় স্থানান্তরিত হবার সর্তে গবর্ণর সাহেবকে রাজী করান। মীরজাফর এই লাসিংটন মারফৎ ক্লাইভ সাহেবকে এক পত্র লিখেছিলেন তা যেমন করুণ তেমনি বেদনাময়। লাসিংটন সম্পর্কে দুইচার কথা এই সুযোগে বলে রাখা যাক। এই ছোকরা কর্মচারিটি কলকাতায় আসার কিছুদিনের মধ্যে কলকাতার যুদ্ধে বন্দী হয়ে হলওয়েলের সঙ্গে অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হন। পলাশীর যুদ্ধের কয়েকদিন আগে উমিচাঁদকে ঠকাবার জন্য ক্লাইভ যে জাল-দলিল তৈরী করলেন তাতে এ্যাডমিরাল ওয়াটসন সাক্ষর করতে অস্বীকার করায় শ্রীমান লাসিংটনই এ্যাডমিরাল ওয়াটসনের নাম সই করে দেন। লাসিংটন, মীরজাফর বিদায়ের সময় কাশিমবাজার কুঠির কর্মচারী। অবশেষে অনেক টালবাহানা করে মীরজাফর পঁচিশ হাজার টাকা মাসহারার বিনিময়ে নবাবী ত্যাগ করলেন। বিজয়া দশমীর দিনই তাঁর বজরা ছাড়ল বটে কিন্তু সঙ্গে ছিল ৬০ জন সুন্দরী যুবতী। আফিঙের নেশায়, চণ্ডুর ঘোরে আর নাগরীর কলহাস্যে মীরজাফর সিরাজদৌল্লার কথা ভেবে দুঃখিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। মীরজাফরের মন থেকে তখন সিরাজ বা মিরণ মুছে গিয়েছিল, ছিল কেবল প্রচণ্ড সম্ভোগ লিপ্সা আর আসমুদ্র আসঙ্গ পিপাসা। মণিবেগমের অভিশাপ বাণীও কল্পনা মাত্র। কলকাতায় মীরজাফরকে না পেলে মণিবেগম কখন তাঁর মহিষীর সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন কিনা বলা কঠিন। তবে প্রধানা মহিষীর মর্শিদাবাদে অবস্থিত মণিবেগমের হাতে মীরজাফরকে পুত্তলিকা করতে সাহায্য করেছে।

প্রথম অঙ্কে তাই ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই থেকে অক্টোবর মাসের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছে। স্বাদেশিকতার কথা ছাড়া মোটামুটি ভাবে

মীরকাশিমের কাহিনী ইতিহাস থেকে খুব দূরে সরে যায়নি বলা চলে।

২॥ দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হচ্ছে মুঙ্গেরে। নবাব মীরকাশিম ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের অগাষ্ট মাস নাগাদ মুঙ্গের দুর্গ সংস্কারের কাজ শেষ করেন সুতরাং দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হচ্ছে অগাষ্ট ১৭৬১র পরবর্তী কোন সময়ে। প্রথম গর্ভাঙ্কে বেগম মীরকাশিমের কীর্তির সপ্রশংস ব্যাখ্যা করছে এখানে মীরকাশিমের শত্রুরূপেই চিত্রিত। বেগম বলছেন—'তোমার প্রবল সহায় ইংরাজের সাহায্যে সকল শত্রু দমিত, সাজাদা তোমাকেই বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সুবেদারী দিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছে, তোমার দুর্দান্ত পরাক্রমে সকলে কম্পমান, তুমি অঋণী, তোমার রাজকোষ অর্থপূর্ণ, তোমার সুশিক্ষিত অসংখ্য সেনা, সুযোগ্য সেনানায়ক চালিত—তবে কেন তুমি চিন্তামগ্ন থাকো' (২/১ পাতা ৩০০)। মীরকাশিম চমৎকার ইতিহাস অনুগ উত্তর দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, 'নিজ শ্বশুরকে বঞ্চিত করে সিংহাসনে আরোহণ করেছি, রাজ্যের জমীদারবর্গকে শোষণ করে অর্থসঞ্চয় করেছি, শত শত নরহত্যার আদেশ দিয়েছি, মমতা শূন্য হয়ে আমীর ওমরাও, রাজা-প্রজা দরিদ্র-ধনীর নিকট হতে কোটি কোটি অর্থ সঞ্চয় করেছি।' (২/১ পাতা-৩০১)। কেন এইসব করেছেন তার কারণ দিচ্ছেন নবাব, 'আমি স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমির নিমিত্ত কাতর। পারি বাঙ্গলার উদ্ধার সাধন করবো, মুমূর্ষু মোগল-গৌরব পুনর্জ্জীবিত করবো, বিদেশী দাম্ভিক মাতৃশোণিত শোষক ইংরাজকে বিতাড়িত করবো।' (২/১ পাতা ৩০১)। তারপর নবাব ধীরেসুস্থে নবাবী পাবার পরে কি কি ঘটেছে গত এক বছরে তা বেগমকে শোনালেন। জানা গেল 'রামনারায়ণের কুচক্রে চালিত হয়ে পিস্তল হস্তে ইংরাজ সেনানী কুট উপস্থিত হয়েছিল, সে অপমান কি তুমি বিস্মৃত হয়েছ?' (২/১ পাতা ৩০১) অবশেষে নবাব ঘোষণা করছেন 'কুচক্রী হিন্দু-মুসলমান নিয়ত কুচক্রে রত······সে সকল কুচক্রীকে নির্মমরূপে বধ করেছি, দীন প্রজার • পীড়ক জমিদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ·· ·তাদের তাড়না করেছি। অসাধু ব্যক্তি মাত্রেই আমার কলঙ্ক রটনা কচ্ছে—আমায় নির্দয় বলে ঘোষণা করছে। অর্থ পিশাচ বলে ঘোষণা করছে।' (২/১ পাতা ৩০২)। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে হেস্টিংসের সঙ্গে তারার কথোপকথন। তারা

হেস্টিংসকে ইংরেজদের কলঙ্কিত কীর্তিকলাপ প্রদর্শন করছেন এবং তাই দেখে হেস্টিংস, একজন অত্যন্ত ভাল ইংরেজের মতো লজ্জায় অধোবদন হচ্ছেন। তারা হেস্টিংসকে দেখাচ্ছেন 'ক্ষেত্র দেখ—শস্যশূণ্য, গঞ্জ পণ্যদ্রব্য শূন্য, জনশূন্য হাট সমাধি ভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ। নদীর বক্ষে পতাকাশ্রেণী দেখ! ঐ সমস্ত পতাকা ইংরাজ বণিকের; প্রত্যেক নৌকা বলপূর্বক সিকি-মূল্যে গৃহীত পণ্যদ্রব্যে ভারাক্রান্ত, পাঁচগুণ মূল্যে বিক্রীত হবার জন্যে স্থানান্তরে যাচ্ছে। দেখ দেখ, ঐ সকল তন্তুবায়েদের গৃহে, শৃগাল কুকুর প্রবেশ কচ্ছে, শিল্পীরা স্থানত্যাগ করেছে।' (২/২ পাতা ৩০৩)। তৃতীয় গর্ভাঙ্ক মুঙ্গের দরবারে মীরকাশিম ও ভ্যান্সিট্টার্ট আলোচনারত। এইখানেই নবাবের সঙ্গে ইংরেজের বিরোধের প্রধাণ কারণ বিবৃত হয়েছে। নবাব বলছেন, 'ন্যায়-পরায়ন হেস্টিংস সাহেব, সমস্ত অবস্থা অবগত হয়ে আপনাকে পত্র লিখেছিলেন, আমিও সমস্ত অবস্থা পত্রে আপনাকে জ্ঞাপন করেছি।……কোম্পানীর কর্মচারীরা সকলেই বিনা শুল্কে স্বাধীন বাণিজ্য কচ্ছেন। এতদ্ব্যতীত যে ইংরাজ বাঙ্গলায় পদার্পণ কচ্ছেন, তিনিই দেশের লোকের সাহায্যে অর্থসংগ্রহ করে, দেশী অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য হস্তগত কচ্ছেন। কোম্পানীর কর্ম-চারীদের নিকট হতে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের দস্তক খরিদ করেন, কেউ কেউ জাল দস্তক প্রস্তুত করেন। অর্থ পেয়ে কোম্পানীর কর্মচারীরা দস্তক লিখে দেন, আমার কর্মচারীরা সে দস্তক মঞ্জুর না করলে বিরোধ; আমার রাজ্যে আমার দস্তক চলন নয়, কোম্পানীর কর্মচারীদের দস্তক চলন— এ সামান্য অত্যাচার নয়' (২/৩ পাতা ৩০৩)। কোম্পানীর সঙ্গে নবাবের বিরোধের অর্থনৈতিক কারণগুলি গিরিশচন্দ্রের মুন্সীয়ানায় অতি সহজ সরলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নবাবের উষ্মার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানান হচ্ছে, 'যে সকল কার্য্যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী কখনও নিযুক্ত ছিলেন না, সমস্তই তাঁরা করছেন, সামান্য ব্যবসাও বলপূর্বক হস্তক্ষেপ কচ্ছেন,—ঘৃত, চাউল, লবণ, সুপারি, খড়, বাঁশ, পান, তামাক, চিনি প্রভৃতি দেশীয় লোকের সামান্য ব্যবসা পর্য্যন্ত আর দেশীয় লোকের নাই।……কুঠীয়াল সাহেবরা আমার কর্মচারীদের গ্রাহ্য করেন না। আমার কর্মচারীদের বলপূর্বক বন্দী কারে, সিপাহী দ্বারা কলিকাতায় চালান দেন। খোজা আণ্টুনকে, ইলিশ সাহেব, নায়েব-নবাব রাজবল্লভের অনুরোধ উপেক্ষা করে কলিকাতায়

চালান দেন—কাউন্সিলে জনস্টোন সাহেব তার কর্ণচ্ছেদের ব্যবস্থা করেন; মহাশয়ের অনুগ্রহে নিস্তার পায়' (২/৩ পাতা-৩০৬)। অবশেষে ভ্যান্সিটার্ট সাহেব শতকরা ৯ টাকা হারে শুল্ক দিতে রাজী হলেন এবং সেইসঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়া স্থির হল। হেস্টিংস সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে কাউন্সিল গবর্ণরের এই প্রস্তাব সমর্থন করবে না। অবশেষে ইউরোপীয় সৈন্যর পরাক্রমের কথা শুনিয়ে গবর্ণর নবাবকে অনুরোধ করছেন 'দুষ্টলোকের পরামর্শে আমাদের সহিত বিবাদ করিবেন না' (২/৩ পাতা ৩০৫)। ভ্যান্সিটার্ট ও হেস্টিংস বিদায় হলে নবাব তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু আলি ইব্রাহীমের সঙ্গে নিজের সৈন্যবাহিনীর বলবীর্য্য সম্পর্কে আলোচনা করছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে তিনিও ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষদের দিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করছেন সমরু, মার্কার প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষদের নিয়োগ এবং গুরগিণখাঁকে প্রধান সেনাপতি করা হয়েছে নবাবের সংলাপে জানা গেল। আলি ইব্রাহীম বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে নবাবকে সতর্ক করছেন। বলছেন 'এ বাঙ্গলায় হিন্দু-মুসলমানদের ভিতর কয়জন আছে, যে কায়মনোবাক্যে ইংরাজের দাসত্ব না প্রার্থনা করে। ইংরাজের সামান্য বেতনের নিমিত্ত পিতাপুত্র স্বদেশীকে হত্যা করতে সহস্র সহস্র লোক উদ্যত' (২/৩ পাতা ৩০৬)। বিহ্বল নবাব প্রশ্ন করছেন—'কাকে বিশ্বাস করবো? এ বাঙ্গলায় কি বিশ্বাসপাত্র একজনও নাই? প্রভুভক্তি, স্বদেশভক্তি কি একজনের হৃদয়েও নাই?' · 'আলী এই বিপদ সমুদ্রে আমার দুই ভরসা বাল্যবন্ধু তুমি আর প্রভুভক্ত তকী খাঁ' (২/৩ পাতা ৩০৬-৭)। চতুর্থ গর্ভাঙ্ক কলকাতায় মীরজাফরের চীৎপুরস্থ দাওয়ানখানায় মীরজাফরের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী রাজা নন্দকুমার, অমিয়েট, হে ও ইলিস সাহেবের সঙ্গে মীরকাশিমকে নবাবী থেকে নামাবার ষড়যন্ত্র করছেন। নন্দকুমার প্রথমেই জানাচ্ছেন তাঁর কারারুদ্ধ থাকার খবর। ভ্যান্সিটার্ট নবাবকে শুল্ক দিতে রাজী হয়েছেন সুতরাং কাউন্সিলে ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের এই প্রতিশ্রুতি নাকচ করে দিতে হবে এটাই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। অমিয়েটের মুখে ভাষণ দেওয়া হয়েছে—'কাশিম আলীকে গদী হইতে নামাইয়া, মীরজাফরকে ফের গদী দিব।' উত্তরে নন্দকুমার বলছেন 'আপনাদের অনুগ্রহ থাকলে সবই হয়' (২/৪ পাতা ৩০৭)। মীরজাফর জগৎশেঠের সঙ্গে প্রবেশ করলে হের মুখে নাট্যকার এক অদ্ভুত সম্ভাষণ

দিয়েছেন। মহাকবি সেক্সপীয়র রচিত ম্যাকবেথ নাটকে ম্যাকবেথকে বিভৎস ডাইনীরা যে ভাষায় সম্ভাষণ করছেন সে ভাষা হের মুখে, 'আইসেন, Nawab that was and Nawab that shall be' জগৎশেঠ জানাচ্ছেন যে বিভিন্ন অর্থবান ব্যক্তি ও জমিদারগণ মীরকাশিমের অত্যাচারে উৎপীড়ত সুতরাং সবাই তার অপসারণে আনন্দিত হবে। রায়দুর্লভ কলকাতায় সুতরাং সেও তাঁদের পক্ষই অবলম্বন করবে। অমিয়েট বলছেন 'ওকে কিছু জানাইবেন না। ও দাওয়ানীর জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে। আমরা রাজা নন্দকুমারকে দাওয়ানী দিব!' ২/৪ পাতা ৩০৮)। ইলিশ সাহেব যুদ্ধের সরঞ্জামভার্ত্তি নৌকাগুলি পাটনায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে স্বয়ং পাটনা যাত্রা করলেন। ইচ্ছা নবাবের সঙ্গে ঝগড়া বাধলেই তিনি পাটনা আক্রমণ করে আধকার করে নেবেন। মণিবেগম এই সময় প্রবেশ করছেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে মীরজাফরের সন্ধি পত্র রচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করছেন। মণি-বেগমের দীর্ঘসংলাপ মাধ্যমেই জানা যায় যে মীরকাশিম মুঙ্গের কেল্লার সংস্কার সাধন করে সেখানেই আছেন। দেখা গেল সাহেবদের তুলনায় মণিবেগম কিছু কম জোরদার নন। বলেছেন মীরজাফরকে 'তুমি আমায় বেগম করেছিলে আমি তোমাকে মীরকাসিমের বৃত্তিভোগী করেছি, এ মর্মপীড় পুনরায় তোমায় সিংহাসনে স্থাপিত দেখেও দূর হবে না।' অবশেষে বেগম বলছেন 'তুমি নবাব হও। রাজ্যের ভার আমার উপর দিযো, আমার নজামদ্দৌলাকে যুবরাজ করো, তোমার কোন চিন্তার কারণ থাকবে না।' (২/৪ পাতা ৩০৯)। তারপর বেগম আরো সাংঘাতিক কথা বলছেন—'তুমি বিলাসপ্রিয়, অন্দরে থেকে সুরূপ যুবতী লয়ে বিলাস করো, আমি নানা দেশ হতে সুন্দরী স্ত্রীলোক এনে তোমায় দেবো; তোমার বিলাস উপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করবো, তুমি নবাব হয়ে ভোগ ক'রো।' (২/৪ পাতা ৩০৯)। তারপর আবার 'যে দিল্লীর বাদশার নামে সমস্ত ভারত একপ্রাণ হয়ে অস্ত্র ধরতো, সে দিল্লীর বাদাশই গরব কোথায়? · · প্রত্যক্ষ দেখেছিলে দিল্লীর বাদশা আলী গোহর ইংরাজের হাতে বন্দী হয়েছিলো।' (২/৪ পাতা ৩১০)। অবশেষে মীরজাফর সন্ধি পত্র স্বাক্ষর করলেন। নবাব বয়স্য সামসেরউদ্দিন তামাসা করে বললেন এরপর মুসলমানের ছেলেদের ভিস্তি হয়ে মশক বয়ে খেতে হবে আর হিন্দুদের ইংরাজের কেরানীগিরি করতে হবে। তার উত্তরে

রাজা নন্দকুমারের জবাব 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' (২/৪ পাতা ৩১১) পঞ্চম গর্ভাঙ্কে মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের মন্ত্রণাগারে রাজবল্লভ, রামনারায়ণ, কৃষ্ণচন্দ্র ও জগৎশেঠ স্বরূপচাঁদ। মুসলমান নবাবের খাজনাবৃদ্ধি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এটা যেন হিন্দু প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র। এমন সময় জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ এসে জানালেন যে মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। অমিয়েট ও হে নবাবকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করতে মুঙ্গেরে গেছেন। তাঁরা কলকাতায় ফিরলেই ইলিস সাহেব পাটনা আক্রমণ করবেন। ইতিমধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই কতকগুলি নৌকা পাটনার পথে যাত্রা করেছে। রাজবল্লভের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে জগৎশেঠ বললেন—'সন্ধি আর কি—এক প্রকার রাজ্য ইংরাজেরই হলো—নাম মাত্র নবাব মুর্শিদাবাদে থাকবে।' (২/৫ পাতা ৩১২)। এমন সময় 'তারা'র প্রবেশ এবং এই রাজন্যবর্গকে দেশভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা। পরিচয় দিচ্ছেন রাজনারায়ণ—'রাণীর পাগলী মেয়ে। ওকে সকলে ভয় করে, কেউ কিছু বলে না, ও যেখানে সেখানে যায়।' (২/৫ পাতা ৩১২)। অবশেষে নবাবকে হিন্দুদ্বেষী আখ্যা দেওয়ায় তারা প্রচণ্ড ক্রোধে বলছেন এক চমৎকার সংলাপ—'হিন্দুর পরামর্শ, কুটিল মন্ত্রণা, সমস্তই হিন্দুর। হিন্দুর মন্ত্রণায় পলাশীর যুদ্ধ, হিন্দুর কুচক্রে হিন্দু মুসলমানে ভেদ, স্বদেশবাসীকে পরিত্যাগ করে, বিদেশীর আনুগত্য হিন্দুরাই কচ্ছে।' (২/৫ পাতা ৩১৩)। দেশের প্রতি আনুগত্য জাগাতে না পেরে 'তারা' বলছেন 'ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করো, নিজ সন্তানের প্রতি লক্ষ্য করো—গলায় প্রস্তর বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ো না।' (২/৫ পাতা ৩১৩)। তারাকে আটকে রাখার চেষ্টা ব্যর্থ করে পাগলিনী চলে গেলেন এমন সময় তকি খাঁ এসে অসীম সম্মানে তারাকে শ্রদ্ধা জানালেন। তারা শেষবার জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁর বন্ধুদের মীরকাশিমের পতাকাতলে সমবেত করার চেষ্টা করলেন। 'বিদেশীর ভেদমন্ত্রে হিন্দু-মুসলমানে প্রভেদ…… ইংরাজের অস্ত্রপূর্ণ সজ্জিত তরণী পাটনা অভিমুখে গমন কচ্ছে বুঝতে পাচ্ছ না? ইংরাজ অধ্যক্ষেরা রণপ্রতীক্ষায় অধীর।' (২/৫ পাতা ৩১৪) নিদ্রা ভাঙল না। তকি খাঁ নবাবী হুকুম জানালেন যে তাঁদের সবাইকে মুঙ্গেরে যেতে হবে কাল বিলম্ব না করে। তকি খাঁ সৈন্যসামন্ত নিয়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। সকলকে বন্দী করে তিনি মুঙ্গেরে নিয়ে গেলেন। ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে

মুঙ্গের দরবারে অমিয়ট ও হে নবাবের দরবারে শুল্ক তুলে দেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। ইংরেজদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করতে না পেরে নবাব দেশের সমস্ত শুল্ক তুলে দিলেন। সকলেই বিদেশীদের মতো বিনা শুল্কে ব্যবসা করতে লাগলেন। রাজকোষের আয় এতে অনেক কমে গেল। অমিয়েটের মুখে ভাষণ দেওয়া হয়েছে যে নবাব জোর করে যে তিনটি জেলা অর্থাৎ মেদিনীপুর চট্টগ্রাম ও বর্দ্ধমান ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর খরচের জন্য 'চাপাইয়া' (২/৬ পাতা ৩১৫) দিয়াছেন তাতে আয় অত্যন্ত কম। অমিয়েট সাহেবকে দিয়ে অনেক তর্জন গর্জন করিয়েছেন নাট্যকার। অস্ত্রশস্ত্র পূর্ণ নৌকা নবাব ছেড়ে দেবেন কিনা তিনি জানতে চান। নবাব উত্তরে বলেন যে ওই অস্ত্রশস্ত্র পূর্ণ নৌকাগুলি যদি কলকাতায় ফিরে যায় তিনি ছেড়ে দিতে রাজী কিন্তু পাটনায় যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ইলিস সাহেবের কাছে তিনি কিছুতেই নৌকাগুলি যেতে দেবেন না। নবাব এবার গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট-স্বীকৃত শতকরা নয়টাকা হারে শুল্ক দেবার প্রতিশ্রুতি ইংরেজ প্রতিনিধিদের কাছে দাবী করেন। নবাবের আবেদন গিরিশচন্দ্রের ভাষায় অপূর্ব রূপ পেয়েছে। 'এ কি উদারচেতা খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বী ইংরাজের কর্তব্য? সাহেব ক্ষান্ত হোন। ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করুন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেন, নিরীহ বঙ্গ-সন্তানের সর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হবেন না। স্বর্ণপ্রসূ ক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত করবেন না। সাহেব, ন্যায়ের প্রতি, ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করুন দীন বঙ্গবাসীর উপর কৃপাবান হয়ে যুদ্ধ থেকে ক্ষান্ত থাকুন।' (২/৬ পাতা ৩১৬) অমিয়েট নবাবের কথায় কর্ণপাত করলেন না। উপরন্তু অভিযোগ করলেন যে নবাব ইংরেজদের সঙ্গে আলোচনা না করেই রাজধানী, মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেছেন। তিনি দুর্গসংস্কার করেছেন, সৈন্যবাহিনী বৃদ্ধি করেছেন। ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষ রেখে বাহিনীকে ইউরোপীয় কায়দায় শিক্ষিত করেছেন। তিনি গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছেন এবং কামান তৈরী সুরু করেছেন। নবাব জানালেন যে সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা চালনার জন্যে যা করবার প্রয়োজন তিনি মনে করেছেন তাই করেছেন কারণ তিনি দেশের শাসক। ইতিমধ্যে পাটনা আক্রমণের খবর এল। নবাব সঙ্গে সঙ্গে জানালেন যে তাঁর উকিল ও কর্মচারী কলকাতা হতে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন না করা পর্য্যন্ত হে ও গলষ্টন মুঙ্গেরে বন্দী থাকবেন। তবে অমিয়েট কলকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারবেন। গুরগিণ

খাঁকে ডেকে নবাব জানাচ্ছেন যে প্রজার দুঃখে তিনি দিবারাত্র ব্যাকুল। গুরগিণ যেন এই প্রজাদের নিয়ত রক্ষা করেন। এমন সময় তকি খাঁ খবর আনলেন 'ইলিস রজনীযোগে পাটনা অধিকার করেছে। ইংরাজ সেপাই পাটনা লুঠ করেছে।' (২/৬ পাতা ৩১৮)। নবাব এই খবর পাওয়া মাত্র সমরু ও মার্কারকে পাটনা অভিমুখে পাঠাবার জন্য গুরগিণ খাঁকে আদেশ করলেন। অমিয়েটের কলকাতা যাবার আদেশ রদ করে তাঁকে মুঙ্গেরে ফিরিয়ে আনার হুকুমজারী করা হল। মীরকাশিম তকি খাঁকে দেশভক্তির বাণী শোনালেন এবং আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করলেন। জানালেন 'ভারতে বীরত্বের অভাব নাই, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাই আমাদের অধঃপতনের কারণ।......বাংলার দীন প্রজা একমাত্র আমাদের লক্ষ্য, বিদেশীর করাল কবল হতে তাদের রক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য।' (২/৬ পাতা ৩১৮) অবশেষে—'কিরূপে বিদেশীর পীড়ন হতে বঙ্গমাতাকে রক্ষা করবো, কিরূপে দীন প্রজার দুঃখ নিবারণ করবো, কিরূপে স্বাধীনতার ধ্বজা আবার বঙ্গে উড্ডীন হবে, এই চিন্তায় আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান—শত্রুদমন বা প্রাণ বিসর্জন।' (২/৬ পাতা ৩১৯)

॥ আলোচনা ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। মীরকাশিমের নবাবীর অধিকাংশ সময় এই অঙ্কের প্রতিপাদ্য। দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্ক সুরু হচ্ছে রাজধানী মুঙ্গেরে সরাবার খবর জানিয়ে সুতরাং ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসের পরবর্তী সময়। কিন্তু নবাবের মুখে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ কুটের নবাব শিবিরে পিস্তল হাতে ঢোকার ঘটনা দেওয়ায় সময় আগিয়ে যাচ্ছে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুনের পরবর্তী কোন সময়ে। ধরা যাক এই সময় জুলাই মাস। দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হচ্ছে এলিসের পাটনা দখলের খবরে অর্থাৎ ২৪শে জুন ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পাটনা দুর্গ দখলে অক্ষম হয়ে এলিস পাটনা শহর দখল করার ঘটনার পর। ধরা যাক জুনের শেষ। তাহলে দ্বিতীয় অঙ্কের বিস্তার ১৭৬১র জুলাই থেকে ১৭৬৩র জুন পর্য্যন্ত অর্থাৎ ঠিক দু' বছর। মীরকাশিম দেশ শাসন করেছেন ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর থেকে তেত্রিশ মাস অর্থাৎ জুলাই ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। মীরকাশিমের নবাবী খারিজ করে মীরজাফরের সঙ্গে

ইংরেজের চুক্তি হল ১০ই জুলাই ১৭৬৩, কাটোয়ার যুদ্ধের তারিখ ১৯শে জুলাই ১৭৬৩। বক্সারের যুদ্ধ পর্য্যন্ত মীরকাশিম নিজেকে নবাব বলেছেন। বক্সারের যুদ্ধ হয় ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে অক্টোবর (প্রকৃতির কি চমৎকার রসিকতাবোধ) অর্থাৎ ঠিক ৪৮ মাস। মীরকাশিমের শাসনকালের ৩৩ মাসের মধ্যে গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ২৪ মাসের কাহিনী শুনিয়েছেন। তাছাড়া ১৭৬০ এর অক্টোবর থেকে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুন পর্য্যন্ত অর্থাৎ আরো আট মাসের কাহিনী প্রথম গর্ভাঙ্কের অন্তর্গত করেছেন। সুতরাং মীরকাশিমের ৩৩ মাস শাসনকালের ৩২ মাসের ঘটনা দুই অঙ্কের উপজীব্য। একথা নির্দিধায় বলা চলে যে মীরকাশিমের শাসনকাল নাট্যকার দ্বিতীয় অঙ্কে বিবৃত করেছেন। ইংরেজ সহযোগীতায় নবাবী পাওয়া থেকে ইংরেজের সঙ্গে বিরোধের কারণগুলি প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে এবং গিরিশচন্দ্র ইতিহাস অনুসরণ করেই এই বিরোধের কারণ বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এক অঙ্কের মধ্যে মীরকাশিমের শাসন সময়ের কথা বলতে গিয়ে খুবই সংক্ষেপ করতে হয়েছে। তাছাড়া নাটকীয় মীরকাশিমকে প্রজাবৎসল স্বাধীনতাকামী স্বাধীন নৃপতি হিসাবে বর্ণনা করতে গিয়েও নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং বলা চলে যে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক ইতিহাস আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও ইতিহাসানুগ হয় নাই। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে মীরকাশিম ইংরেজের সঙ্গে চুক্তি করে অর্থের বিনিময়ে যেমন নবাবী কিনেছিলেন তেমনি বাদশাহকে উপঢৌকন ও রাজস্ব দেবার অঙ্গীকার করে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সুবেদারী ক্রয় করেছিলেন। উড়িষ্যা ছিল মারাঠাদের দখলে। নামে উড়িষ্যার সুবেদার হলেও উড়িষ্যা থেকে কোন রকম রাজস্ব আদায় করা বা সেখানে শাসন ক্ষমতা বিস্তার করা নবাবের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। উড়িষ্যা থেকেই মারাঠারা মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানে প্রায় নিয়মিত লুণ্ঠন চালিয়ে এসেছে। এতে মীরকাশিমের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই কারণ ওই দুইটি জেলাই ইংরেজ দখলে দেওয়া হয়েছিল। স্বভাবতই মীরমাশিম তাই পশ্চিমে বীরভূমে ও উত্তরে নেপালে তাঁর অধিকার কায়েমী করার চেষ্টা করেন। ইংরেজ সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষর সাহায্যে তিনি বীরভূমে তাঁর অধিকার রক্ষায় সফল হন কিন্তু কেবল নিজ সৈন্যের নির্ভরতায় নেপাল দখলের চেষ্টা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়। এই দুইটি ঘটনাতেই মীরকাশিম চরিত্রের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ

পাচ্ছে। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের মনোমালিন্যে সুরু হয়। এই মতোবিরোধের প্রধান কারণ যে পাটনার শাসনকর্তা মহারাজা রামনারায়ণ একথা গিরিশচন্দ্র কোথাও স্পষ্টভাবে বলেন নাই। মহারাজা রামনারায়ণের ঘটনা আলোচনা করতে গেলেই মীরকাশিমের 'প্রজাবৎসল' রূপ নষ্ট হয়ে যায়। ইতিহাসের অনুসরণে দেখা যায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের মূল কারণ। এই স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার জন্যই তিনি রামনারায়ণকে বরখাস্ত করতে চেষ্টা করেন। ইংরেজরা তাতে বাধা সৃষ্টি করলে তিনি রাজা রাজবল্লভকে মহারাজা রামনারায়ণের হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। রাজা রাজবল্লভ এই সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন এবং নবাবকে খুসী করে শেষ পর্য্যন্ত তিনি বিহারের শাসনকর্তা হন। কিন্তু রাজবল্লভ মীরকাশিমের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন না। আত্মসর্বস্বতা এই সময়কার হিন্দুমুসলমান প্রধানব্যক্তিদের মূল চরিত্র তাই রাজা রাজবল্লভকে ইংরেজের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে দেখে আশ্চর্য্য হবার কারণ নাই। মীরকাশিম বিরোধী এলিস পাটনায় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলে বিরোধের পথ প্রশস্ত হল। এবার ইংরেজবাহিনীর অধ্যক্ষ হয়ে কর্নেল আয়ার কুট পাটনায় এলেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল আয়ার কুটের সঙ্গে তাঁর দেওয়ান হয়ে এলেন রাজা নন্দকুমার। সমসাময়িক ইতিহাসে নন্দকুমারের মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি বুঝি আর কোন স্বদেশীয়ের ছিল না। নন্দকুমার, রামনারায়ণ ও এলিসের ষড়যন্ত্রের ফল দেখা গেল যখন নবাবী সৈন্যের আক্রমণের মিথ্যা খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন কুট সাহেব পিস্তল হাতে নবাবী শিবিরে চড়াও হলেন ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন রাত্রে। নবাব তখন নিদ্রামগ্ন, যুদ্ধচিন্তা দূরে থাকুক নবাব শিবিরে দ্বাররক্ষার জন্য বিশেষ সৈন্যদলও ছিল না। এই ঘটনার পরে নবাব ও আয়ার কুট নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে গবর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে লিখে জানালেন। ইংরেজের সঙ্গে মীরকাশিমের আনুষ্ঠানিক বিরোধ পাটনায় এই ১৬ই জুনের ঘটনা থেকে সুরু হয়েছে বলা চলে। গিরিশচন্দ্র এই ঘটনাগুলিকে নবাবের মুখে দিয়েছেন বটে কিন্তু তার গভীরে প্রবেশ না করায় কার্য্য কারণের যোগসূত্র স্পষ্ট হয় নাই।

মীরকাশিম স্বাধীন অথবা প্রজাবৎসল ছিলেন না। তিনি দেশের শাসনযন্ত্রকে সুষ্ঠুরূপে চালনা করতে চেষ্টা করেন এবং সেই জন্যই বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণের অপসারণ প্রয়োজন হয়। গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট এবং তাঁর সুযোগ্য

সহকারী হেস্টিংস এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেন নাই কারণ তাঁরা নবাব-কেই দেশের শাসক বলে স্বীকার করেন কিন্তু অন্য ইংরেজ কাউন্সিলারগণ এতে প্রমাদ গণলেন এবং মীরকাশিমের ক্ষমতা বৃদ্ধিকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখলেন। এই সময়ে পলাতক দিল্লীর বাদশাহর সঙ্গে ইংরেজদের যোগাযোগ হল। পাটনা দখল করতে এসে বাদশাহ ইংরেজ বাহিনীর কাছে পরাজিত হলেন বটে কিন্তু ইংরেজ সসম্মানে তাঁর দরবারে অভিবাদন জানাল। বাদশাহের চিন্তা ইংরেজদের কাছে স্পষ্ট ভাবেই এল। তিনি ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী দেবার প্রস্তাব করলেন। এই সব আলোচনার মধ্যে বাদশাহ ও মীরকাশিমের পাটনার দরবারে যে সাক্ষাৎ হল তাতে সুবা বাংলার সুবেদারী লাভ করলেও মীরকাশিমের বুঝতে বাকী রইল না যে বাদশাহ এই বিদেশী যুদ্ধ ব্যবসায়ীদের বেশ পছন্দ করছেন এবং তাদের সাহায্য নিয়ে দিল্লী ফিরে পাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। স্বভাবতই এই ঘটনার পর থেকে মীরকাশিম ইংরেজদের অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন এবং সুযোগ পেলেই তাদের ক্ষমতা হ্রাস করার কথা ভাবতে লাগলেন।

মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের মূল রূপটি তাই নাটকের মধ্যে অবজ্ঞাত থেকে গিয়েছে। যা প্রকাশিত হয়েছে তা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের বাঙ্গালীর মনোভাব। দীর্ঘ ইংরেজ শাসনে জর্জরিত বঙ্গবাসীর ক্ষোভ ও উষ্মা। ইংরেজদের ক্ষমতা কমাবার জন্যই রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত হল। সেখানে ইংরেজ দৃষ্টির বাইরে ইউরোপীয় রীতিতে সৈন্যবাহিনী গঠন সুরু হল। প্রধান সেনাপতি হলেন গুরগিন খাঁ সহকারী তার সমরু, মার্কার প্রভৃতি।

সহজেই বলা চলে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় আয়ারের কুটের হটকারিতা এবং বাদশাহের ইংরেজ প্রীতি, ইংরেজ সম্পর্কে মীরকাশিমের মনে গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে রামনারায়ণের পদচ্যুতি, মুঙ্গেরে রাজধানীর স্থানান্তর এবং নবাবের সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন নবাব সম্পর্কে ইংরেজদের মনে গভীর সন্দেহ জাগায়। বিরোধের প্রকাশ হল ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্যের চেষ্টায়, এলিসের পাটনা শহর আক্রমণ ও দখলে এবং কলকাতা-গামী অমিয়েট সাহেবের হত্যায়।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে কিছু সবই ঐতিহাসিক তথ্য বলা হয়েছে।

এই সময় ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের বিরোধ যে পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড অবিশ্বাসের রূপ নিয়েছে একথা কোথাও বলা হয় নাই। এই বৃহৎ ত্রুটি অস্বীকার করলে দৃশ্যটি চমৎকারভাবে রচিত। মীরকাশিম যে নৃশংসভাবে অর্থ সংগ্রহ করেছেন এমনকি প্রয়োজন হলে তার জন্য হত্যা ও কারারুদ্ধ করতে কুণ্ঠিত হন নাই—একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। এই দৃশ্যের সংগঠনের একমাত্র ত্রুটি মীরকাশিমকে প্রজাবৎসলরূপে দেখান। এটা প্রক্ষিপ্ত। শাসনকার্য্যের অংশীদার হিসাবে প্রজার অধিকার স্বীকার করা ইংরেজ শাসনের যুগের ঘটনা। মোগল আমলে কোন সম্পত্তিতে প্রজার কোন অধিকার ছিল না। প্রজার সঙ্গে সাধারণত জমির সনওয়ারি বা বাৎসরিক বন্দোবস্ত হত। কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকলে অধিকারীর মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তির ওয়ারিশ হতেন বাদশাহ ওরফে সরকার। প্রায়ই ছোটখাট সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় সরকারী আগ্রহ দেখা যেত না ফলে সেই সম্পত্তি স্থানীয় সরকারী কর্মচারী কুক্ষিগত করতেন। সুতরাং শাসনযন্ত্রের যে রূপ মোগল আমলে দেখা যেত তা 'প্রজাবৎসল' প্রভৃতি সংজ্ঞার একান্তভাবেই পরিপন্থী। এই দৃশ্যে নবাব মহিষী বেগম নামে পরিচিত। ইতিহাস মীরজাফরের কন্যা সম্পর্কে নীরব। মুতাক্ষরীণ পর্য্যন্ত মীরকাশিম মহিষী সম্পর্কে কোন সংবাদ দিতে পারেন নাই। নাট্যকারের তাই 'বেগম' নাম গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের অন্যতম বড় ত্রুটি মহারাজা রামনারায়ণ সম্পর্কে সব কথা না বলা। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসেই যে নবাব রামনারায়ণের সম্পত্তি ও সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে কয়েদ করলেন এ খবর কোথাও জানান হয় নাই। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নবাব যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন তাঁদের কোন পরিচয় দেওয়া হয় নাই। মুতাক্ষরীণ রচয়িতা লিখেছেন যে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের মধ্যে নবাবের দরবারে কথা বলার মতো কেউ থাকল না। উচ্চ মর্য্যাদার সভাসদ, আত্মীয় বা বন্ধু নবাবের অসন্তোষের ভয়ে ভীত হয়ে কখনই তাঁর শ্রুতি সুখকর কথা ছাড়া আর কিছু বলতেন না। এমন কি রাজ বিদূষক মীর্জা শামসুদ্দিন, যিনি মীরজাফরের নামকরণ করেছিলেন 'ক্লাইভের মদ্দাগাধা'—নবাবকে ভয় করে চলতেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কের সঙ্গে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের মধ্যে তফাৎ প্রায় নয় বা দশমাসের। ইতিমধ্যে মীরকাশিম ভোজপুরের জমিদারদের পরাজিত করে নেপাল সীমান্তে বেতিয়া পর্য্যন্ত নবাবী প্রভাবকে প্রসার করেন। বাদশাহর অন্যতম সুহৃদ কামগড় খাঁ নবাবী সৈন্যের কাছে পরাস্ত হলেন। বিহারের প্রায় সমস্ত কেল্লা নবাবী দখলে এসে গেল। বিহারকে বশে আনতে মীরকাশিমকে কঠোর হতে হয়েছিল তাই তারিখ-ই-মনসুরী লিখেছেন যে মীরকাশিম বিহারে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেন।

১৭৬২ সুরু হতে হতেই 'দস্তক' নিয়ে নবাবের সঙ্গে কলকাতা কাউন্সিলের বিরোধ সুরু হল। ভ্যান্সিট্টার্ট ও হেস্টিংস সংখ্যালঘু হওয়ায় তাঁরা নবাবের কাজের যৌক্তিকতা সমর্থন করতে গিয়ে বারবার পরাজিত হতে লাগলেন। অবশেষে লেফটেনাণ্ট আয়রনসাইড ও ওয়ারেন হেস্টিংসকে নবাবের কাছে দূত করে পাঠান হল। হেস্টিংস বয়ে নিয়ে চললেন কাউন্সিলের সংখ্যা-গুরুর মুসাবিদায় গবর্ণরের সহীযুক্ত ২৫ লক্ষ টাকার এক অন্যায্য দাবী। এইখানে দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সুরু হচ্ছে। মুঙ্গেরে আসবার পথে দেশের যে চরম দুর্গত অবস্থা দেখে ব্যথিত হয়ে হেস্টিংস গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্টকে পত্র দিয়েছেন সেগুলি কেন্দ্র করেই এই দৃশ্য গঠিত। নাট্যকার হেস্টিংসের প্রতি সুবিচার করেন নি কারণ হেস্টিংসের লেখা চিঠির বিষয় 'তারা'র মুখে সংলাপ হয়েছে। ভারতপ্রেমী হেস্টিংস যে প্রথম ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেবকে ইংরেজ কোম্পানীর অত্যাচারের প্রকৃতরূপ জানিয়েছিলেন তা এই নাটকের দর্শক জানতে পারবেন না, মনে করবেন এই কল্পিত চরিত্র তারাই বুঝি হেস্টিংস লিখিত এই চিঠিগুলির উৎস। এই দৃশ্যে তারার সঙ্গে হেস্টিংসের কথোপকথন এবং ইংরেজ কোম্পানীর মুৎসুদ্দির অত্যাচার দেখান হয়েছে। তারা হেস্টিংসকে দেশের দুরবস্থা সম্পর্কে অবহিত করছেন এবং তা শুনে হেস্টিংস দুঃখিত হচ্ছেন। কল্পিত তারা চরিত্র এই দৃশ্যে গিরিশচন্দ্রকে মিথ্যাচার করিয়েছে। সিরাজদ্দৌলা নাটকে হোসেনকুলীর স্ত্রীর মতো তারা চরিত্র প্রক্ষিপ্ত ও কাল্পনিক। এই চরিত্র জহরার মতো নাটকের মধ্যে যে পরিমাণ অসুবিধা সৃষ্টি করেছে তা বলার নয়। এই কাল্পনিক চরিত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে নাট্যকার বার বার কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন এবং 'তারার' পার্শ্বচরিত্রগুলি সেই কল্পনার রঙীন রঙে অনৈতিহাসিক হয়ে গেছেন। এই দৃশ্যটিকেই

উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক। হেস্টিংস স্বয়ং দীর্ঘদিন কাশিমবাজারে কুঠিয়াল ছিলেন, ভাল ফারসী জানতেন, কুলকারণি সাহেবের গবেষণা অনুযায়ী নাকি বাংলাও বলতে পারতেন, বুঝতে পারতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁর পক্ষে 'তারা'র কাছে কি হচ্ছে জানতে চাওয়াটাই প্রচণ্ড অনৈতিহাসিকতা। কাশিমবাজারে ১৭৫২ থেকে ১৭৬২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত যিনি এক নাগারে বাস করে ধাপে ধাপে উচ্চ পদে উন্নীত হয়েছেন কোম্পানীর অত্যাচারের রূপ যে তাঁর অজানা নয় এটা বলাই বাহুল্য। হেস্টিংসের মুঙ্গের আসার পথে লেখা পত্রগুলি ইংরেজদের অত্যাচারের জ্বলন্ত সাক্ষী।

পরবর্তী দৃশ্যে অর্থাৎ তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মুঙ্গেরে নবাব ও ভ্যান্সিট্টার্টের সাক্ষ্যাতকার দেখান হয়েছে। গবর্নরের সঙ্গে হেস্টিংস থাকাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে হেস্টিংস ও ভ্যান্সিট্টার্ট যেন একই সঙ্গে এসেছেন। প্রকৃত অবস্থা তা নয়। হেস্টিংস জুন মাসে (১৭৬২ খ্রীঃ) মুঙ্গেরে এলেন কিন্তু দৌত্য বিফল হল। দৌত্যের বিফলতা সম্পর্কে হেস্টিংসের নিজের মনে কোন সন্দেহই ছিল না। তিনি জানতেন, যে অসম্ভব কাজের ভার তাকে দেওয়া হয়েছে নবাব তাতে রাজী হতে পারেন না। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর কাজে ইস্তফা দিয়ে ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দপ্তরে যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাতে লিখেছেন—'নবাবের মতো এমন শান্ত ও ভদ্রলোক আমি কখন দেখি নাই। শান্তি, যুক্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁর যতখানি ইচ্ছা ততখানি ইচ্ছা যদি আমাদের থাকত তাহলে কখনই মতদ্বৈধের কোন কারণ ঘটত না। নবাবের প্রতি আমরা যে ব্যবহার করেছি তাতে কেঁচোর থেকে একটু বেশী ব্যক্তিত্বপূর্ণ হলেই ক্ষেপে ওঠার কথা।'[৬১]

নবাব বুঝেছিলেন যে হেষ্টিংসের দৌত্য ব্যর্থ হলেও ইংরেজ চুপ করে বসে থাকবে না। তাই হেষ্টিংস ফিরে যাবার পর তিনি রাজধানীকে আনুষ্ঠানিক ভাবে মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করলেন এবং গবর্নর ভ্যান্সিট্টার্টকে তাঁর নূতন রাজধানী দেখতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ভ্যান্সিট্টার্টের শরীর ভাল যাচ্ছিল না মনের তো কথাই নাই। তাই নবাবের সঙ্গে একটা বোঝা পড়ার সুযোগ তিনি গ্রহণ করলেন। হেষ্টিংসকে সঙ্গে করে ১লা

নভেম্বর ১৭৬২ কলকাতা থেকে নৌকাযোগে যাত্রা করলেন। ৯ই নভেম্বর কাশিমবাজারে উপনীত হয়ে তিনদিন বিশ্রাম করলেন। শীতকাল কাশিমবাজারের নদীতে জল কম তাই ঘোড়ায় চড়ে মুর্শিদাবাদে পৌছে সেখান থেকেই নৌকায় উঠলেন ১২ই নভেম্বর। ৩০শে নভেম্বর মুঙ্গের পৌছলেন। ১লা ডিসেম্বর নবাবের সঙ্গে প্রথম বৈঠক বসল, ১৫ই ডিসেম্বর নবাব ও গবর্ণর চুক্তিপত্র সই করলেন। নাট্যোলিখিত তৃতীয় গর্ভাঙ্ক এই ১৫ই ডিসেম্বরের ঘটনা বলা চলে।

দস্তক নিয়ে বিরোধের ঘটনাগুলি জটিল। গিরিশচন্দ্র অপূর্ব মুন্সিয়ানায় 'দস্তক' নিয়ে বিরোধের রূপ মোটামুটি ভাবে সুন্দর প্রকাশ করেছেন। সাধারণ দর্শকের পক্ষে ইতিহাসের এই পাঠ গ্রহণযোগ্য বলা চলে। নবাবের সঙ্গে ভ্যান্সিট্টার্টের চুক্তির মূল কথাটা নাট্যকার চমৎকার বলেছেন। সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্য যেগুলি নিয়ে ইংরেজ বাণিজ্যের অধিকারী শতকরা ৯ টাকা হারে তাদের ওপর শুল্ক দিতে ভ্যান্সিট্টার্ট রাজী হলেন। নাট্যকার যে কথা জানাতে ভুলে গেছেন তা হল গবর্ণর নবাবকে অনুরোধ করেছিলেন যে এই চুক্তি কাউন্সিল অনুমোদন না করলে কার্যকরী হবেনা সুতরাং নবাব যেন গবর্ণরের পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত চুক্তির কথা প্রকাশ না করেন। বলাবাহুল্য নবাব তা করেন নাই ফলে ভ্যান্সিট্টার্ট কলকাতা কাউন্সিলে চুক্তি অনুমোদন করাতে পারলেন না। নবাব কিন্তু দিকে দিকে চুক্তির কথা জানিয়ে তাঁর কর্মচারীদের সেই মতো কাজ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। হেষ্টিংস এই চুক্তি অনুমোদন করতে কাউন্সিল রাজী হবেন না বলে যে সংলাপ দেওয়া হয়েছে তাও প্রক্ষিপ্ত কারণ গবর্ণর এবং তার সহকর্মী এই আপোষ চুক্তি কাউন্সিলের সদস্যদের বোঝাবার আশা করেছিলেন এবং সেইজন্যেই এটার নাম 'খসড়া চুক্তি, বলা হয়েছে। নবাব এটাকে পূর্ণ চুক্তির মর্য্যাদা দেওয়ায় গবর্ণরের অসুবিধাই বেশী হয়েছিল। যাবার আগে ইংরেজদের শৌর্য্যবীর্য্য সম্বন্ধে ভ্যান্সিট্টার্টের যে ভাষণ দেওয়া হয়েছে তা কাল্পনিক। নবাবকে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত করার পরেও গবর্নর লিখেছেন: 'আমরাই নবাবকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি তার ছিল না।'[৩২]

ইংরেজরা চলে যাবার পর মীরকাশিম নিজের বলবীর্য্য সম্পর্কে আলি ইব্রাহীমকে অবগত করেছেন। এখানেও হিন্দু মুসলমানের ইংরেজ দাসত্বের

আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ইংরেজ প্রীতি সম্পর্কে নবাবী ভাষণ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের রাজনৈতিক প্রয়োজনে সংযোজিত হয়েছে এবং এই কারণেই 'মীরকাশিম' নাটক সর্বাগ্রে ইংরেজ শাসকদের ভীত করেছে। নাটক বাজেয়াপ্ত হয়ে অভিনয় বন্ধ হয়েছে। ইতিহাসের অঙ্গনে মীরকাশিমের এই দেশপ্রেমের কথা, বিশ্বাসঘাতকদের ইংরেজ ছত্রচ্ছায়ায় আত্মপরিপোষণের ছবি অনৈতিহাসিক, কিন্তু সুন্দর। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ পোষণের চমৎকার উদাহরণ দেখিয়েছে, ১৭৬২ তে সেগুলি তখনও সৃষ্টি হয় নাই। নবাবীতে মীরজাফরকে বসান ছাড়া দেশের ধনী ব্যক্তিগণ ইংরেজ শাসনে তখনও বিশেষ সুবিধা অর্জন করতে পারেন নাই। ইংরেজ শাসনের স্বরূপ সম্পর্কে তখন তারা যেমন অজ্ঞ ছিলেন, ইংরেজ চরিত্রের সাম্রাজ্য বাসনা সম্পর্কেও তাদের কোন ধারণা ছিল না। কি প্রচণ্ড শৃঙ্খলে ইংরেজ তাদের পরাধীনতার নাগপাশে বেঁধে ফেলবে তারপর বুটজুতোর ঠোকরে সাম্রাজ্য চালনা করবে জানা থাকলে ষড়যন্ত্রকারীরা আর একবার ভেবে দেখতেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে টুপিওয়ালারা মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিদেশী বণিক সুতরাং শক্ত নবাব মীরকাশিমকে সরিয়ে দিতে পারলে তারা নিজ নিজ স্বার্থ অন্বেষণ বিনা বাধায় করে যেতে পারবেন। গিরিশচন্দ্র ১৯০৬ এর বাঙালীর চিন্তাকে এত স্পষ্টরূপ দিলেন 'মীরকাসিম' নাটকে যে ইংরেজ সরকার বিচলিত হলেন। মনে রাখা দরকার যে সর্বপ্রথম 'মীরকাসিমে'র অভিনয় বন্ধ হয় ও নাটক বাজেয়াপ্ত হয়। তারপর 'সিরাজদ্দৌলা' ও পলাশীর প্রায়শ্চিত্তকে বাজেয়াপ্ত ও অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়। ওই টানে বঙ্কিমের চন্দ্রশেখরের অভিনয়ও বন্ধ করে দেওয়া হয়। 'মীরকাসিম' নাটক জনচিত্তকে কি পরিমাণে যে উদ্বেলিত করেছিল তার এর থেকে ভাল প্রমাণ প্রয়োজনহীন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে মীরজাফরের চৌৎপুরস্থ দাওয়ানখানায় রাজা নন্দকুমার, অমিয়েট, হে.ও এলিস সাহেব ত্রয়কে দেখান হয়েছে। এ দৃশ্যটি কাল্পনিক এবং কোন ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর রচিত নয়। নবাবের সঙ্গে গবর্নরের খসড়া চুক্তি কাউন্সিল নাকচ করে দিয়েছেন বলে অমিয়েট জানাচ্ছেন সুতরাং সময় কিছুতেই ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীর আগে নয়। যদি ধরা যায় মার্চ বা এপ্রিল মাসের ঘটনা তাহলে এলিসের উপস্থিতি অসম্ভব কারণ এই সময় তিনি পাটনায় ছিলেন। মীরজাফরকে পুনরায় নবাবী দেবার চিন্তা কখন

ইংরেজের মনে এসেছিল সঠিক জানা যায় না। অবশ্য মীরজাফরকে নবাবী থেকে সরাবার ইচ্ছা কাউন্সিলের অনেক সদস্যরই ছিল না। যদি ধরা যায় যে মার্চ বা এপ্রিল মাসেই আমিয়েট ও হে সাহেবদ্বয় মীরজাফরকে নবাব করতে মনস্থ করেছিলেন তাহলে সেটা অসম্ভব ঘটনা নয়। আর একটা জিনিষ লক্ষণীয়। নন্দকুমার মীরজাফরের বন্ধু রূপেই চিত্রিত এবং মীরজাফরকে পুনরায় নবাবী দেবার পক্ষের একজন প্রধান সওয়ালকারী। কৃতজ্ঞ মীরজাফর নবাবী পেলে রাজা নন্দকুমারকে তাঁর রাজ্যের প্রধান ব্যক্তি করতে প্রতিশ্রুত হন এবং তদনুযায়ী 'মহারাজা' উপাধি দিয়ে নন্দকুমারকে তাঁর মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এ ঘটনাগুলি ইতিহাস অনুসারী। পরবর্তী কালে নন্দকুমার কি করে কুচক্রী মীরজাফরের বন্ধুর ভূমিকা থেকে দেশহিতৈষী শহীদ হয়ে গেলেন তা অন্য প্রবন্ধে (নন্দকুমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) আলোচনা করা হবে। দেখা যাচ্ছে গিরিশচন্দ্র ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমারের হীন রূপই অব্যাহত রেখেছেন এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিখিলনাথ রায় তাঁর মুর্শিদাবাদে কাহিনীতে 'নন্দকুমার'কে শহীদ রূপে চিত্রিত করলেও গিরিশচন্দ্র মুতাক্ষরীণের নির্দেশকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। এই গর্ভাঙ্কের শেষে মীরজাফর ও মণিবেগমের প্রবেশ। মীরজাফর দ্বিধাগ্রস্ত হলেও বেগমই যেন তাকে ইংরেজের সঙ্গে নূতন চুক্তিপত্র সই করতে ইঙ্গিত করছেন এবং নিজে ইংরেজের মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এই দৃশ্যের ঘটনা ও বিষয়বস্তু অত্যন্ত নাটকীয় ও সম্ভবনাপূর্ণ। এরকম ঘটনা ঘটা যেমন সম্ভব, আলোচনায় ষড়যন্ত্রের যে চিত্র প্রকাশ পায় তাও তেমনি বিশ্বাসযোগ্য। সহজেই মনে করা যেতে পারে যে ১০ই জুলাই ১৭৬৩ তে মীরজাফর ও কোম্পানীর মধ্যে যে চুক্তি হয় এটা তার প্রস্তুতি পর্ব।

পঞ্চম গর্ভাঙ্কে মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠের মন্ত্রণাগারে ধনী হিন্দুদের মিলিত হবার দৃশ্য এবং এখান থেকেই জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়, রাজবল্লভ, রামনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দী করার ঘটনা কিংবদন্তির উপর রচিত। জগৎশেঠ মহাতপচাঁদের সংলাপ যে কলকাতায় চুক্তিপত্র সই হয়েছে তাও ভুল। কারণ জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় বন্দী হন এপ্রিলের শেষে। (নবাব ২রা মে ভ্যান্সিটার্ট সাহেবকে এ সংবাদ পত্রে জানাচ্ছেন) মীরজাফর চুক্তি স্বাক্ষর করেন ১০ই জুলাই। রাজবল্লভের সংলাপ, 'দেশটা এক প্রকার ইংরাজেরই হল' উক্তিও ঠিক নয় কারণ

গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ভেবেছিলেন যে মীরকাশিমের পতন হলে দেশটা তাদেরই হবে। একমুঠো টুপিওয়ালার পরাক্রম সম্পর্কে তাঁদের কোন ধারণাই ছিল না। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে আটক করার পর রামনারায়ণ বন্দী হন। রাজবল্লভ আর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণদাস আর কিছুদিন পরে মুঙ্গেরে আনীত হলেন। কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়া ছেড়ে কখন যান নি। দেশের রাজনৈতিক ঘটনায় তাকে এই সময় প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যায় না। সম্ভবত এই কারণেই কোম্পানীর রাজত্ব কায়েমী হলে তিনি মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হন। কৃষ্ণচন্দ্র নানা কারণে সরকারী খাজনা ঠিক সময় দিতে পারতেন না। সেজন্য আলিবর্দী খাঁ থেকে সুরু করে হেস্টিংস সাহেব পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত রাজস্ব আদায়কারীর দ্বারাই লাঞ্ছিত হয়েছেন। বাংলার হিন্দু সমাজের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃত হলেও ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা বা কয়েদ হওয়া থেকেও তিনি নিষ্কৃতি পান নাই। একমাত্র মীরজাফরের নবাবী কালে নদীয়ারাজ স্বস্তিতে বসবাস করেছেন। তার একমাত্র কারণ মীরজাফরের দেওয়ান বা মন্ত্রী মহারাজা নন্দকুমার নদীয়া রাজের পৃষ্ঠপোষকতা আশা করতেন। তাই কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে অংশ নেবেন বলে মনে হয় না। যদিও রাণী ভবানী মীরকাশিমের কাছে যে লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করেছেন তাতে তাঁর পক্ষে বিপক্ষাচরণ করা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নাই কারণ স্বাভাবিক ভাবেই নবাবী আমলে কোন জমিদারের পক্ষে নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করলে জমিদারী হারাবার সম্ভাবনা ছিল। তখন নবাবী খুশীতে জমিদারের থাকা বা না থাকা নির্ভর করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তখনও ত্রিশ বছর দূরে। তাই সব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এ দৃশ্যটিকে উদ্ভট বিবেচনা করা সঙ্গত। নবাব সিরাজদ্দৌলার অপটু শাসনে যে ষড়যন্ত্র গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল মীরকাশিমের সময় তা সম্ভব ছিল না। সিরাজদ্দৌলার অধিকতম সময় কাটত হারেমে—মীরকাশিমের দরবারে। মীরকাশিমের পতনের প্রয়োজন হয় ইংরেজ স্বার্থে। দেশের শাসন ক্ষমতা পেতে তারা তখন কি পরিমাণ আগ্রহী হয়েছিলেন তা যথাসময়ে আলোচনা করা হবে। এই গর্ভাঙ্কের আলোচনার শেষে সংগত ভাবেই বলা চলে যে জগৎশেঠদের নেতৃত্বে এমন প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রের কোন সুযোগ মীরকাশিমের রাজত্ব কালে ছিল না বা এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ভারতীয় পক্ষে বৃদ্ধ মীরজাফর এবং

তাঁর সহৃদয় সুহৃদ রাজা নন্দকুমার ছাড়া মীরকাশিমের বিরুদ্ধে আর কেউ প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইংরেজ মীরকাশিমকে সরিয়ে দেবার জন্য যখন প্রস্তুত হল তখন একজন নবাব চাই। এই পোষা নবাব হতে মীরজাফর রাজী হলেন এবং মীরজাফর তাঁর মন্ত্রণাদাতা রাজা নন্দকুমারের জন্য দেওয়ানীর পদ ইংরেজদের কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। একাধারে ক্রূরতা এবং দাক্ষিণ্য দেখিয়ে মীরকাশিম শাসন ক্ষমতা এত তাড়াতাড়ি করায়ত্ত করেছিলেন যে কর্‌িৎকর্মা লোকছাড়া অন্যের পক্ষে তা করা অসম্ভব ছিল।

'তারা'র অংশ যে সম্পূর্ণ কষ্ট কল্পনা আগেও আলোচনা করা হয়েছে। রাণী ভবানীর মীরকাশিমকে লেখা পত্রগুলি পাঠ করলে এই ঘটনার অসম্ভাব্যতার প্রতি সন্দেহ থাকে না। এখানে আর একটি ভুল প্রণিধান-যোগ্য। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমজমাট আওতায় বসে নাট্যকার নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বা নাটোরের রাণী ভবানীকে সেই রকম ক্ষমতাশালী এক জমিদার ভেবেছেন। এই ভুল অনেকেই করেছেন। রাণীর ক্ষমতা তথা বাংলার সব থেকে বড় আয়ের জমিদারের ক্ষমতা কতো অল্প ছিল প্রমাণ হয়ে যায় যখন দেখি নবাব আলিবর্দীর আমলে দু' বার ১৭৪১ ও ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জমিদারী কেড়ে নেওয়া হয়েছে। রাণীকে মুর্শিদাবাদে এসে (প্রথমবার স্বামী রাজা রামকান্ত সহ) বহু রকম ভাবে বহু ব্যক্তিকে নানা উপঢৌকন দিয়ে এবং নবাবকে অধিক রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জমিদারীর অধিকার ফিরে পেতে হয়েছে। নবাব সিরাজদ্দৌলা রাণী ভবানীর কন্যাকে জোর করে তাঁর প্রমোদ ভবনে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। রাণীর রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হওয়ায় নবাব মীরকাশিম রাণীর দেওয়ানকে মুঙ্গেরে ধরে নিয়ে এসে সামান্য অপরাধীর মতো বেত্রাঘাত করেন। এই সব ঘটনায় নবাবী আমলের জমিদার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা হবে। সুতরাং 'তারা'র ঘটনা কাল্পনিক। এই সময় 'রাণীর মেয়ে' কাশীতে বসবাস করছেন। সেখানে তিনি কি করছিলেন সেটা অন্য ইতিহাস এই আলোচনার সঙ্গে কোনরকমে সংশ্লিষ্ট নয়। হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ ভাবে মীরকাশিমের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ বিরোধ ছিল না বা বিরোধের অর্থনৈতিক কারণগুলি সৃষ্টি হয়নি। কাজেই হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ-

সম্পর্কিত উক্তি সম্পূর্ণ ভাবে ১৯০৬ এর মানসিকতার ফল এবং বঙ্গভঙ্গের পূর্ব-মুহূর্তে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের সেতু রচনার প্রয়াস।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে অমিয়েট ও হের দৌত্য ঐতিহাসিক। ঘটনাতরঙ্গ লক্ষ্য করার মতো। গবর্নরের সঙ্গে নবাবী চুক্তি কাউন্সিল নামঞ্জুর করে দিলেন ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে। মীরকাশিম মার্চ মাসে গবর্নরকে এক পত্র লিখে নবাবীতে ইস্তফা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু ইস্তফা না দিয়ে ১৭ই মার্চ নবাব সমস্ত ব্যবসার দ্রব্য থেকে শুল্ক তুলে নিলেন। বাংলার রাজস্ব তার ফলে অর্ধেক হয়ে গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ এপ্রিল মাসে কলকাতা থেকে পাটনাগামী ৬ খানা অস্ত্র বোঝাই নৌকা নবাব আটক করলেন। কলকাতা কাউন্সিল যে কি পরিমাণ ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন বোঝা যায় যখন দেখি ১৪ই এপ্রিল তাঁরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা অনুমোদন করাবার চেষ্টা করেছেন। ভ্যান্সিটার্ট ও হেস্টিংসের প্রচণ্ড বিরোধিতা না থাকলে হয়তো তখনি যুদ্ধ সুরু হত।[৬৩] ১৫ই মে অমিয়েট ও হে নবাবের সঙ্গে মিটমাটের জন্য কলকাতা থেকে মুঙ্গের যাত্রা করেন। সুতরাং অমিয়েট ও হের সাক্ষ্যাতকার কাউন্সিলের সংখ্যাগুরু সদস্যদের চরমপত্র বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অমিয়েটের মুখে নবাবের সঙ্গে আলোচনায় নাট্যকার অনেক তর্জন গর্জন সৃষ্টি করেছেন—এটা হয়েছে ১৯০৬ এর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের পরিকল্পনায়, ১৭৬৩ র ইংরেজ, দেশের নবাবের সামনে গলা তোলবার সাহস রাখতেন না। অতি কঠিন কথাও ভদ্রতার খোলসে মুড়ে ধরলে নবাবকে অপমানের জন্য 'কোতল' হবার সম্ভাবনা ছিল। মীরকাশিম জানিয়েছেন যে বর্দ্ধমান মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম থেকে ইংরেজরা বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা খাজনা পেতেন সুতরাং অমিয়েটের মুখে বর্গীর হাঙ্গামার যে অজুহাত দেওয়া হয়েছে তা অচল। তাছাড়া পাণিপথের যুদ্ধের পর মারাঠা শক্তিও হতবল হয়ে গিয়েছিল। নবাবের সব থেকে বড় বক্তব্য গিরিশচন্দ্রের চোখ এড়িয়ে গেছে। নবাব বলেছেন এবং পরে লিখেছেন যে তিনি প্রত্যেক সন্ধির প্রতিটি ধারা মেনে চলছেন কিন্তু ইংরেজ কোন সন্ধির কোন ধারা মানছে না যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। লক্ষণীয় যে অমিয়েট ও হের দৌত্যের ফলে নবাব ২২শে জুন, আটক নৌকাগুলি ছেড়ে দিলেন। দু' দিন পর অর্থাৎ নৌকাগুলি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই খবর পাবার পর এলিস ২৪শে জুন পাটনা

আক্রমণ করলেন। দুর্গ জয় করতে না পারলেও শহর অধিকার করলেন। এলিসের নবাবের প্রতি আনুগত্যহীনতা মীরকাশিমকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সব থেকে বেশী ক্রুদ্ধ করেছিল। একাধিক পত্রে মীরকাশিম গবর্ণরকে লিখেছেন পাটনা থেকে এলিসকে সরিয়ে সেই পদে হেস্টিংস বা মারিয়ট বা অন্য কোন স্থিতধী লোককে নিযুক্ত করতে। কাউন্সিল নবাবের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করেছে। এইসব ঘটনায় নবাবের মনে এমন তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল যে কলকাতাগামী অমিয়েটকে গতিরোধ করতে গিয়ে নবাবী বাহিনী তাকে হত্যা করতে পারে এ সম্ভাবনা তাঁর মনে ঠাঁই পায় নাই। তাই তিনি হুকুম জারী করেছেন অমিয়েটকে মুঙ্গেরে ফিরিয়ে আনবার—জীবিত কি মৃত বলেন নাই। নবাবী সৈন্যকে সশস্ত্র বাধা দিয়ে অমিয়েট নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছেন। গিরিশচন্দ্র এই গর্ভাঙ্কে দর্শকদের মনে ধারণা জন্মান যে ইংরেজের অন্যায় ব্যবহারে ও পাটনা দখলে এবং এলিস সাহেবের কীর্তিতে নবাব ক্ষুণ্ণ হয়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হলেন। এই বক্তব্যকে মোটামুটি ভাবে ঐতিহাসিক বলা চলে। নবাব মীরকাশিম যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হচ্ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে। ইংরেজ ছাড়া আর কোন প্রতিপক্ষ ছিল না সুতরাং ইংরেজের বিরুদ্ধাচারণের জন্যই তিনি প্রস্তুত হচ্ছিলেন—তবে তাঁর মনে এই ধারণা ছিল যে গবর্ণর ও হেস্টিংস সাহেব সম্ভবত সন্ধির সূত্র খুঁজে বার করবেন। এলিসের পাটনা আক্রমণে ও দখলে সে সম্ভাবনা লুপ্ত হল। তাই অমিয়েটকে আটক করার সোজা কথাটা অমিয়েট হত্যায় রূপান্তরিত হল। নাট্যকারের কল্পনা মতো দেশপ্রেম যদি মীরকাশিমের চরিত্রের এক দিক হত তাহলে তাঁর সফলতার সম্ভাবনা অনেক বেশী ছিল। জনসাধারণ ধনী বা দরিদ্র—নবাবের সঙ্গে ইংরেজের এই বিরোধ শুধু দেখেছে পক্ষগ্রহণ করে নাই। নবাব বা কোম্পানী দুইই তাদের কাছে সমান বিদেশী।

৩॥ অতি নাটকীয় ভাবে তৃতীয় অঙ্ক সুরু হল মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে। অমিয়টকে মুঙ্গেরে ফিরে যাবার জন্য নবাবী হুকুম এল কিন্তু তিনি ফিরতে অস্বীকার করলেন এবং নবাব সৈন্যর ওপর তাঁর সিপাহীদের গুলি চালাবার হুকুম দিলেন। ফলে নবাব সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধে অমিয়েট নিহত হলেন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পাটনার যুদ্ধ দেখান হয়েছে। দুর্গপ্রাকারে লালসিং অতিকষ্টে পাটনা দুর্গে ইংরেজ আক্রমণ বার বার প্রতিহত করছেন এমন সময় সমরু

এসে গেল। ইংরেজরা পলায়ন করলেন। তখন মহম্মদ আমিনের পরামর্শে নবাবী সৈন্য পাটনার ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করতে চলল। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে গঙ্গাতীরে মাঞ্জীতে ইংরেজ রমণী শিশু ও বালক বালিকা সমেত পলায়নপর এলিস। ইতিমধ্যে সমরু এলে, এলিস অস্ত্র পরিত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করলেন। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে মুঙ্গেরে নবাবের অন্তঃপুরে নবাব ও তাঁর বেগমের মধ্যে সংলাপে মীরকাশিমের চরিত্রের কলঙ্ক স্পষ্ট হয়—'নবাব, তোমার নিকট জানু পেতে আমার মিনতি, যে বিশ্বাসপাত্র, তারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করো। যে অবিশ্বাসী সে চিরদিনই অবিশ্বাসী—তারে বর্জন করো।' (৩/৪ পাতা ৩২৩) তকি খাঁ এলে তাঁকে বেগম এক 'ইরাণী তরবারি' দিয়ে বলছেন তুমি এই অস্ত্রে 'নবাব-শত্রু দমন কর' (৩/৪ পাতা ৩২৪)। যুদ্ধে জয় কিংবা মৃত্যু প্রতিজ্ঞা করে তকি খাঁ ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে চললেন। নবাব বেগমকে জানালেন যে মুর্শিদাবাদে ইংরেজের গতিরোধ করবার জন্য তকি খাঁকে পাঠান হচ্ছে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক অত্যন্ত সুরচিত। একাধিক দিনের ঘটনাকে একটি দৃশ্যে প্রকাশিত করা হয়েছে। নন্দকুমারের কুচক্রীরূপ গিরিশচন্দ্র বজায় রেখে প্রথমেই দেখাচ্ছেন যে নন্দকুমার নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজ-উষ্মায় ইন্ধন যোগাচ্ছেন—তাতে উৎসাহিত হয়ে ব্যাটসন, গবর্ণর ও হেস্টিংস উভয়ের পদত্যাগ দাবী করছেন এবং বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়ে হেস্টিংস ও ব্যাটসন 'পরস্পর ঘুসোঘুসি' করছেন। হেস্টিংস ব্যাটসনকে ডুয়েলে বা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছেন। এমন সময় অমিয়েট হত্যার খবর এল। ইংরেজগণ সব বিরোধ ভুলে 'war-war-war' বলে চিৎকার করে উঠলেন। ব্যাটসন ক্ষমা প্রার্থনা করলে হেস্টিংস তা গ্রহণ করলেন। সংকটের সময় ইংরেজ একাগ্রতার সুন্দর ছবি এঁকেছেন নাট্যকার। ভ্যান্সিট্টার্ট সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে কাউন্সিল মীরকাশিমকে নবাবী পদ থেকে খারিজ করলেন এবং মীরজাফরকে' নবাব ঘোষণা করা হল। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের জন্য সদলে মীরজাফর নিবাসে গমন করলেন। নন্দকুমার ও মুন্সির সংলাপে কাউন্সিলের সমগ্র ঘটনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে মুঙ্গের দরবারে নবাব বন্দী এলিস সাহেবের সঙ্গে তর্জন গর্জন করছেন। নবাব বলছেন—'তোমার ন্যায় অনেকেই বন্দী হয়েছেন; আর

তোমার ন্যায় হটকারিতায় অনেকেই প্রাণত্যাগ করেছেন।' (৩/৬ পাতা-৩২৭) এলিস সমানে বলছেন—'একটা লড়াই নবাব জিতিয়াছ, তাই লম্বা লম্বা কথা কহিতেছ। ইংরাজ সাজিয়া আসুক তখন বুঝিবে যে পাটনায় এক মুঠি ইংরাজ জিতে war শেষ হয় নাই।' .. .. 'আমি লড়াই করিয়াছি আমাকে দণ্ড দাও কিন্তু আর আর গোরালোক, মেমলোক, বাচ্চালোক তাদের কিছু বলিও না। ...লড়াই হারিবে। ইংরাজ এই কথা মনে রাখিয়া তোমার প্রতি নরম ব্যবহার করিবে।' (৩/৬ পাতা ৩২৭)

পাটনা রক্ষার জন্য নবাব লাল সিং ও মহম্মদ আমিনকে প্রশংসা করলেন। এলিস ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের বন্দী করে রাখার আদেশ হল। লালসিং কাটোয়াতে মহম্মদ তকি খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেতে চাইলে সে প্রার্থনা নবাব মঞ্জুর করলেন। মহম্মদ আমিনকে 'নবাবের শরীররক্ষক' নিযুক্ত করা হল। নবাব গুরগিণ খাঁকে কাটোয়াতে সৈন্য প্রেরণ করবার হুকুম দিলেন। নবাব বয়স্য আলী ইব্রাহীম এদেশীয়দের গোলাম হবার বাসনাকে ব্যঙ্গ করলেন।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক 'মীরজাফরের চিৎপুরের দাওয়ানখানা'। সামসেরউদ্দীন তাঁর প্রভু মীরজাফর আর মণিবেগমকে বলছেন—'কেন গর্দভের গর্দভ হব? নচেৎ কেন স্বদেশ বিক্রয় হচ্ছে, স্বজাতি বিক্রয় হচ্ছে, ধন-মান গৌরব—ঐশ্বর্য্য বিক্রয় হচ্ছে, কলিকাতায় বসে ইংরাজ এ সমস্ত নিলাম কচ্ছে—এই নূতন ব্যবসায় কেন সহায় হব? বেগম সাহেব রুষ্ট হবেন না—নবাব নামে আর নবাবী নাই, গোলামের হীন গোলামী।' (৩/৭ পাতা ৩৩০) মণিবেগম এসব কথা উপেক্ষা করে জানালেন যে পোড়া বাড়ীতে যা পাওয়া যায় তাই লাভ। তারপর কাউন্সিলের সদস্যগণ এলেন। কার্নাক মীরজাফরকে নবাব ঘোষণা করলেন অন্য সকলে অভিবাদন জানালেন। ভ্যান্সিটার্ট সন্ধিপত্র পড়ে শোনাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু মণিবেগম অধীর আগ্রহে চুক্তিপত্র গ্রহণ করে মীরজাফরকে দিয়ে দস্তখত করালেন। অ্যাডামস্ মুর্শিদাবাদে যাবার জন্যে মীরজাফরকে প্রস্তুত হতে বললেন। মণিবেগম কার্নাকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেন যে খোজা পিক্রর সাহায্যে তার ভাই গুরগিণ খাঁকে ক্রয় করার চেষ্টা করতে হবে। সাহেবগণ বিদায় নিলে মণিবেগম মীরজাফরকে জানালেন যে তিনি এত কষ্ট স্বীকার করে মীরজাফরকে নবাব করলেন—সুতরাং তার পুত্র

নজামদ্দৌলাকে যুবরাজ করতে হবে। নবাব স্বীকৃত হলে গুরগিণ খাঁকে বিশ্বাসহন্তারক করবার জন্য বেগম প্রস্থান করলেন। সামসেরউদ্দিনের ভাষণ—'কেউ অন্ন পাবে না, দুর্ভিক্ষে সব মারা যাবে, বাঙ্গলা মরুভূমি হবে। প্রজার সত্ত্ব থাকলে তো নবাবী করবেন? .....ইংরাজের বিনাশুল্কে বাণিজ্যে, কেউ দু'বেলা অন্ন পাবে না।'......'বাঙ্গলায় কৃষি থাকবে না, শিল্পী থাকবে না, তন্তুবায় নাম উঠে যাবে, বাণিজ্য লোকে ভুলে যাবে, জনকতক লোকের দাসত্ব করে জীবিকা নির্বাহ হবে, আর কোটি কোটি লোক, বৎসর বৎসর দুর্ভিক্ষে প্রাণ দেবে।' (৩/৭ পাতা ৩৩৩)।

অষ্টম গর্ভাঙ্কে মুঙ্গেরে জগৎশেঠের শয়নকক্ষে জগৎশেঠ মহাতপচাদ, স্বরূপ-চাদ, রাজবল্লভ, রামনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র মিলিত হয়ে আলোচনা করছেন যে পাটনা আবার ইংরেজ হস্তগত হয়েছে। মীরজাফর আবার নবাব হয়েছেন এটাও এক মুখ্য সংবাদ। গুরগিণ খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করবেন কিনা তাই নিয়ে জল্পনা হল। নবাবের চর সংবাদ নিয়ে গেল। জগৎশেঠ জানালেন যে ইংরেজদের দেবেন বলে পঁচিশ লক্ষ টাকা প্রস্তুত করে রেখেছেন।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ গর্ভাঙ্কে কাটোয়ার যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। নবম গর্ভাঙ্কেই হায়বতুল্লা, আলম খাঁ ও জাফর খার বিশ্বাসঘাতকতা দেখান হয়েছে। লালসিং এর শত অনুরোধ স্বত্বেও তারা তকি খাঁর সাহায্যে আগিয়ে গেলেন না। তখন বাধ্য হয়ে লালসিং ঘোষণা করলেন—'দারুণ ঈর্ষাই ভারতের সর্বনাশের কারণ!' (৩/৯ পাতা ৩৩৫) তারপর নিজে একা তকি খাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর হলেন। দশম গর্ভাঙ্কে তকি খাঁ লালসিংকে যুদ্ধ অবস্থা বর্ণনা করলেন। বললেন অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষরা যোগদান করলে ইংরেজ সৈন্যকে তিনি পরাভূত করতে সক্ষম। হঠাৎ 'তারা' প্রবেশ করে সকলকে যুদ্ধ করবার জন্য দেশের নামে উৎসাহ দিলেন। একাদশ গর্ভাঙ্কে অ্যাডামস সাহেবের যুদ্ধোদ্যম ও ইংরেজ বাহিনী ও সেনাপতির নিয়মানু-বর্ত্তিতা, নবাবী তরফের বিশৃঙ্খলা স্পষ্ট করার জন্যই দেখান হয়েছে। ভীত রায়দুর্লভ তকি খাঁর পরাক্রমে বিহ্বল। অ্যাডামসের ভাষণ—'Oh you Bengali if you have only the courage to carry on the plans of your head, you can work wonders.' (৩/১১ পাতা ৩৩৬) দ্বাদশ গর্ভাঙ্কে তকি খাঁর মৃত্যু। মৃত্যুপথযাত্রী তকি খাঁর সঙ্গে বঙ্গমাতা-

রূপী তারার দীর্ঘ সংলাপ। অবশেষে—'যাও, যাও, মাতৃবৎসল, স্বদেশবৎসল, ভ্রাতৃবৎসল যথায় বাস করে তথায় গমন করো! যাও—যাও—কীর্ত্তিপুরে গমন করো, যথায় আত্মত্যাগী সপুত্র ভীমসিংহ, গোরা, বাদল, হামির বাস করে, যথায় বীরকেশরী রাণা প্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত তথায় গমন করো। যথায় হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থ বিদলিত, যথা কর্ম কর্মে পুরস্কৃত, যথা গৌরব চিরাশ্রিত, সেই ঈশ্বর কৃপালোকিত মহা লোকে গমন করো। যাও বৎস! ঐ দেখ মীরমদন, মোহনলাল তোমার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান' (৩/১২ পাতা ৩৩৮)। তারার সংলাপে বঙ্কিমচন্দ্র তকি খাঁকে বিশ্বাসঘাতকরূপে চিত্রিত করে যে বীর অবমাননা করেছেন গিরিশচন্দ্র 'সুদে আসলে' সেই 'অপরাধে'র প্রায়শ্চিত্ত করলেন। বীর তকি খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় অঙ্ক অবসিত হল।

আলোচনা ॥

তৃতীয় অঙ্কের কাল নির্দ্ধারণ প্রথম ও দ্বাদশ গর্ভাঙ্কের ঘটনায় সহজ হয়েছে। ৩রা জুলাই ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অমিয়েটের হত্যার সঙ্গে সুরু হয়ে ১৯শে জুলাই ঐ বছর কাটোয়ার পরাজয় ও তকি খাঁর মৃত্যুতে শেষ হয়েছে। এই অঙ্কের বিস্তার তাই মাত্র ১৭ দিন। এরই মাঝে ১০ই জুলাই মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয়েছে। গিরিশচন্দ্র কি সুন্দরভাবে ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তা এই অঙ্কে লক্ষ্য করবার মতো। বিশেষ ঐতিহাসিক নাটক যারা লিখবার ইচ্ছা করেন এই অঙ্কটি তাঁদের কাছে প্রণিধানযোগ্য। অমিয়েটের মৃত্যু বা হত্যা দৃশ্য দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সন্নিবেশিত না করে তৃতীয় অঙ্কের প্রথমে সন্নিবেশিত করা গিরিশচন্দ্রের মতো এক অতি প্রাজ্ঞ প্রযোজকের পক্ষেই সম্ভব। হত্যার মধ্যে দিয়ে অঙ্ক সুরু করে তকি খাঁর প্রাণ বিসর্জনে শেষ করায় সমস্ত অঙ্ক জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ইতিহাসকে বিকৃত না করে ঐতিহাসিক ঘটনার কাঠামোর মধ্যে যে কত সুন্দর নাট্য রচনা করা যায় এবং কল্পনাকে বিস্তার করে ইতিহাসকে যে কত চমৎকারভাবে প্রকাশ করা যায় গিরিশচন্দ্র এই অঙ্কে তা দেখিয়েছেন।

প্রথম গর্ভাঙ্কে গঙ্গাতীরে অমিয়েট হত্যার কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়

না, নাট্যকার এমন চমৎকার ভাবে অমিয়েট হত্যার ঘটনাকে দেখিয়েছেন যে তাকে ইতিহাস পরিপন্থী বলা যায় না। মৃত্যুর সময় অমিয়েটের মুখে ভাষণ দেওয়া হয়েছে—'দেখো মুসলমান, ইংরাজ-রক্ত বাঙ্গলায় পড়িল, বাঙ্গলা জ্বলিয়া যাইবে।' (৩/১ পাতা ৩২০) আত্মম্ভরী অমিয়েটের মুখে এ উক্তি মানিয়েছে কারণ ইংরেজ রক্ত আগেও পড়েছে পরেও পড়েছে—বাঙ্গলা পুড়ে যায় নাই। পাটনা দুর্গ রক্ষায় লালসিংএর উদ্যম ও মহম্মদ আমিনের সাহস সিয়ার মুতাক্ষরীণ অবলম্বনে রচিত। সংলাপে নাট্য ঘটনার অপূর্ব পরিস্ফুটন হয়েছে। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মাঞ্জী গঙ্গাতীরে মার্কার ও সমরুর বেড়াজালে এলিস সাহেব, তার সাঙ্গ পাঙ্গ এবং ইংরেজ শিশু রমনী ও বৃদ্ধদের ধরা পড়ে যাবার দৃশ্য দেখান হয় নাই। সমরুর হাতে শিশু নারীদল সহ এলিসের পরাজয় ও বন্দীত্ব বরণ দেখান হয়েছে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে মীরকাশিম ও বেগমের আলোচনার মধ্যে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া চমৎকার ফুটে উঠেছে। মীরকাশিম তকি খাঁকে যুদ্ধে পাঠালেন। এই ঘটনাটি কিছু প্রক্ষিপ্ত। মীরকাশিমের চরিত্রের প্রধান দোষ ছিল অবিশ্বাস। তাই তকি খাঁর উপর নির্ভর করলেও তাকে যুদ্ধ পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা বিশ্বাস করে দিতে পারেন নাই। তার ফলে তকি খাঁ একাই প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন অন্যেরা সম্ভবত গুরগিণ খাঁর আদেশে যুদ্ধ থেকে সরে থাকলেন। অন্তঃপুরে তকি খাঁকে নিয়ে এলে তাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে বিশ্বাস না করতে পারা অসম্ভব মনে হয়। তাই নবাব অন্তঃপুরে তকি খাঁ এলেন এটা না দেখালে ভাল হত। পঞ্চম গর্ভাঙ্ক গিরিশচন্দ্রের মুন্সীয়ানার আর এক নিদর্শন। অনেক দিনের নানা ঘটনাকে একসঙ্গে একদিনের ঘটনারূপে প্রকাশিত হয়েছে। সদা বিবদমান ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজ চরিত্রের তফাৎ দেখাবার জন্যই হেষ্টিংস ও ব্যাটসনের বিবাদ এবং পরে ক্ষমা প্রার্থনা দেখান হয়েছে। বিপদের সময় ইংরেজরা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভুলে যায় সম্ভবত এটাই নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন। দৃশ্যটি নাটকীয় বটে কিন্তু সত্য নয়। হেষ্টিংস ও ব্যাটসনে ঘুষোঘুষি হয় নাই। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুনের কাউন্সিলের সভায় হেষ্টিংস দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে নবাব যদি অস্ত্র পূর্ণ নৌকা ছেড়ে দেন তাহলে ইংরেজের তাঁকে অযথা ও অন্যায় ভাবে উত্যক্ত করা উচিত হবে না। সেক্ষেত্রে অমিয়েট এবং হে সাহেব নবাবের সঙ্গে আলোচনা যেন চালিয়ে যান এবং সন্ধির সর্তাবলী ছকে নিয়ে আসেন।

ব্যাটসন রাগে অন্ধ হয়ে আর স্থির থাকতে পারলেন না। হেষ্টিংসের মুখে চপেটাঘাত করে তাকে ও গর্বর্ণরকে 'নবাবের ভাড়া করা দালাল' বলে গালি-গালাজ করেন। এই ঘটনার প্রায় একমাস পর অমিয়েট হত হলেন। হেষ্টিংসের মুখে ঐতিহাসিক ম্যালেসনের বক্তব্য বসিয়ে গিরিশচন্দ্র এই ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তবে ব্যাটসন ক্ষমা চান নাই আর হেষ্টিংসও ক্ষমা করেন নাই। হেষ্টিংস শেষ পর্যন্ত নবাবের সঙ্গে যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন। বলেছেন—Whatever be the event of a war with the Nabob, which I yet hope may be avoided, as I have ever declared against all measures that have led to it. [৬৪] মীরজাফরকে নবাব করা বিষয়ে সন্ধিপত্র রচনার সময় হেস্টিংস আবার বিরোধিতা করে বললেন — I declare my dissent from the treaty proposed to Meer Jafier and think that if his restoration to his just rights be the point aimed at in it, there is a manifest injustice and inconstancy in exacting his compliance with new terms.' [৬৫] ৬ই জুলাই এর বিখ্যাত কাউন্সিল সভায় মীরকাশিমকে বরখাস্ত করা হল। এই সভাতেই মীরজাফরের কাতর ও সনির্বন্ধ অনুরোধে নন্দকুমারকে তাঁর দেওয়ান বা মন্ত্রী এবং মুৎসুদ্দী বা প্রাইভেট সেক্রেটারী হতে দিতে কাউন্সিল রাজী হলেন। নন্দকুমার প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে। নন্দকুমার কলকাতায় নজরবন্দী হয়ে ছিলেন। তার আগে তাকে কয়েদও করা হয়েছিল। এখন তাকে মুক্তি দেওয়া হল। কাউন্সিলের সভায় তাই নন্দকুমারের উপস্থিতি অসম্ভব। গবর্নর বা হেস্টিংস নন্দকুমারকে অবিশ্বাস করতেন। অন্যেরা তাকে বিশ্বাস না করলেও তার কর্মক্ষমতাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই সব ত্রুটি বাদে এই গর্ভাঙ্কে নাট্য ঘটনা সুরচিত। ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে নবাব ও এলিসের আলোচনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক হলেও এই কল্পনার প্রসারে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। সেদিক থেকে এ দৃশ্য সার্থক। আলসিং ও মহম্মদ আমিন পাটনা দুর্গ ছেড়ে এসে তকি খাঁকে সাহায্য করেছেন এমন বিবরণ পাওয়া যায় না। তাদের পক্ষে পাটনা দুর্গ ত্যাগ করে আসা অসম্ভব মনে হয়। নাটকের গতিবেগের জন্যেই এই কাল্পনিক ঘটনা যুক্ত হয়েছে।

আলী ইব্রাহীমের সঙ্গে আলোচনাও কাল্পনিক। বস্তুত বন্ধুহীনতা মীরকাশিমের নবাবী জীবনের অন্যতম অভিশাপ এবং তার জন্য পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর নিজের। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গিরিশচন্দ্র ইতিহাসের সঙ্গে পা মিলিয়ে না চলেও ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। সাহেব চরিত্রগুলির সংলাপে গিরিশচন্দ্র তাদের ভেতরকার বিরোধ, স্বার্থ এবং চরিত্রের বিভিন্নতা সার্থকভাবেই প্রকাশ করেছেন বিশেষ গবর্নর ভ্যান্সিট্টার্ট ও হেস্টিংস তাদের স্বমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক মীরজাফরের চীৎপুরস্থ দাওয়ানখানায় মণিবেগমের সংলাপে সুরু হয়েছে। অতি আনন্দিত বেগম বলছেন— 'নবাব, নবাব আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। আবার তুমি সিংহাসনে বসবে, আবার হিন্দু-মুসলমান তোমায় নবাব বলে সেলাম করবে।' মীরজাফরের সঠিক বাসস্থান কোথায় ছিল তা ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্লেচিনডেন সাহেব তাঁর ক্যালকাটা পাস্ট এ্যাণ্ড প্রেসেণ্টএ দেখিয়েছেন। (Calcutta Past and Present—K Blechynden)। এই গবেষণায় দেখান হয়েছে যে মীরজাফর কলকাতায় আসার সামান্য কিছুদিন পরেই কলকাতার দক্ষিণে একটা বাড়ী কিনে সেখানেই বসবাস সুরু করেন। দ্বিতীয়বার নবাব হবার পর নিজনাম অনুসারে মীরজাফর আলি খাঁ সাহেব এই জায়গার নাম রাখলেন আলিপুর। আজ পর্য্যন্ত সেই নামই প্রচলিত আছে। কিছুকাল আগে যে ভগ্নপ্রায় বিরাট প্রাসাদ 'আলিপুরের নবাববাড়ী' নামে খ্যাত ছিল সেই বাড়ীতেই পলাতক মীরজাফর ও পরে নবাব মীরজাফর ও তার বংশধরগণ বসবাস করতেন। আলিপুর আজও আছে যদিও নবাব প্রাসাদ আর নাই। নাটক লেখার সময় গিরিশচন্দ্রের পক্ষে এ তথ্য সম্ভবত জানা ছিল না তাই তিনি প্রচলিত কথিকা অনুযায়ী চিৎপুরের দাওয়ানখানা তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছেন। নবাব বয়স্যর ব্যঙ্গ ক্রমে গম্ভীর কথায় রূপান্তরিত হয় তিনি বলেন—'স্বদেশ বিক্রয় হচ্ছে, স্বজাতি বিক্রয় হচ্ছে, ধনমান গৌরব ঐশ্বর্য্য বিক্রয় হচ্ছে—কলিকাতায় বসে ইংরাজ এ সমস্ত নিলাম কচ্ছে।' বলাবাহুল্য এ সমস্তই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। গিরিশচন্দ্র দর্শকের ইংরেজ বিরাগকে সুকৌশলে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনায় স্থানান্তরিত করেছেন। নাট্যকার হিসাবে এই কাজের যেমন যৌক্তিকতা পাওয়া যায় তেমনি

নাটকের গুরুত্ব শতগুণ বৃদ্ধি পায়। সুপরিণত মনে গিরিশচন্দ্র সবদিক বিবেচনা করেই নাটকের এই ধরণের সংলাপের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা ও স্বদেশ বৎসলতা প্রকাশ করেছেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের আবহাওয়ার মধ্যে বসে তাঁর পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব ছিল যে পরবর্ত্তীকালের বিচার বিবেচনাহীন মূর্খেরা তাঁর নাটককেই ইতিহাস মনে করবে। ইতিহাস পাঠ না করে নাটকে দেখা দৃশ্য ও ঘটনাকেই ইতিহাস বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করবে না। অলসতার প্রচণ্ড মোহে নাটক ইতিহাসের স্থানাধিকারী হয়ে দাঁড়াবে। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের ক্ষেত্রেও যেমন মীরকাশিমের বেলাতেও তেমনি বিভ্রম সৃষ্টি হবে। যাইহোক সপ্তম গর্ভাঙ্কে সাহেবরা তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে এলেন এবং মীরজাফরকে নবাব বলে অভিবাদন করলেন। এ দৃশ্যে মণিবেগম স্বভাবতই প্রধান চরিত্র। যদি এটিকে সন্ধি স্বাক্ষরের দিন বলে ধরা হয় তাহলে সময় ১০ই জুলাই। মণিবেগম কিন্তু মীরজাফরের জীবিতকালে অন্তঃপুরচারিণীই ছিলেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর যখন নাবালক নাজামদ্দৌলাকে নবাব নির্বাচনের কথা হল তখনই মণিবেগমকে প্রথম রাজনৈতিক আলোচনায় অংশ নিতে দেখা যায়। প্রশ্ন তোলা হয়েছিল মণিবেগমের পুত্র নাজামদ্দৌলা, মীরজাফরের ঔরসজাত কিনা। এই দৃশ্যে মণিবেগম ও সাহেবদের আলোচনার মাধ্যমে সন্ধির সর্তগুলি দর্শকরা জানতে পারলেন। নাট্যকার দেখালেন যেন মণিবেগমের বুদ্ধিতেই খোজা পিত্রুকে তার সহোদর গুরগিণ খাঁকে অর্থের লোভ দেখাবার কাজে লাগান হল। নাটকে যদিও দেখান হয়েছে যে নাজামদ্দৌলাকে যুবরাজ করার স্বীকৃতি দিলে মণিবেগম তাঁর অর্থের ঝাঁপির তালা খুললেন প্রকৃত অবস্থা অন্য রূপ। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকার স্থির হয় এবং তখনই মণিবেগমের অর্থ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ইংরেজের কুশাসনের যে ভবিষ্যৎবাণী সামসেরের মুখে দেওয়া হয়েছে তা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সত্য মনে হলেও ১৭৬৩তে সত্য ছিল না। ইংরেজ শাসন যে নবযুগের সূচনা করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিল্প বাণিজ্য প্রভৃত উন্নতি লাভ করে। সামগ্রিক ভাবে দেশে সুশাসন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হল। শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে।

অষ্টম গর্ভাঙ্কে মুঙ্গেরে জগৎশেঠের শয়নকক্ষে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়, রাজবল্লভ

রামনারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্রের আলোচনা অলীক কল্পনা মাত্র। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দী হন নাই। অন্যেরা অবশ্য মুঙ্গেরে বন্দীজীবন যাপন করছেন কিন্তু তাদের মধ্যে আলাপ আলোচনার সুযোগ না থাকাই স্বাভাবিক। তাঁদের হত্যাকাণ্ডও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন কারণে হয়। দেশের সে সময়কার অবস্থা এবং মীরকাশিমের বিরোধী পক্ষীয়দের বক্তব্য এই দৃশ্য মাধ্যমে সুষ্ঠু ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। যদিও জগৎশেঠ মীরকাশিমের পতনে অর্থ বা বুদ্ধি দিয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। মীরকাশিম তাদের অবিশ্বাস করতেন ও সন্দেহের চোখে দেখতেন তাই প্রথম সুযোগেই তাদের বন্দী করেন এবং হত্যা করেন। এই অবস্থায় জগৎশেঠ ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে ইংরেজকে সাহায্য করবেন এটা একান্ত অবিশ্বাস্য ঘটনা।

নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ গর্ভাঙ্কে কাটোয়ার যুদ্ধের বর্ণনা ও তকি খাঁর যুদ্ধে নিহত হওয়া দেখান হয়েছে। দৃশ্যগুলি সুরচিত এবং দুই পক্ষের আচরণ সুন্দর ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। এই চার দৃশ্য রচনায় গিরিশচন্দ্র পরিপূর্ণভাবে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র মীরকাসিম প্রবন্ধের অষ্টাদশ পরিচ্ছদ 'কাটোয়ার যুদ্ধ' দ্বারা অনুপ্রাণিত হযেছেন। নাটকীয়তার জন্যই পাটনা দুর্গের লালসিংকে কাটোযায় দেখা গেছে। এই সময় লালসিং পাটনাদুর্গ রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। কাটোয়ার যুদ্ধের ঘটনাবলী চমৎকার নাটকীয়তায় প্রকাশিত হয়েছে একমাত্র তারাসুন্দরীর যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ ছাড়া ইতিহাস মোটামুটি ভাবে অনুসৃত হয়েছে। তকি খাঁর বীরত্ব প্রকাশে এবং কাটোয়ার যুদ্ধকে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র ভাষায় হলদিঘাটের যুদ্ধের সমকক্ষতা দিতে নাট্যকার অশেষ যত্ন করেছেন। তাই কাটোয়ার যুদ্ধের চারটি দৃশ্য বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের যুদ্ধ দৃশ্য বর্ণনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। দ্বাদশ গর্ভাঙ্কে মৃত্যুপথযাত্রী তকি খাঁকে 'তারা' শিবজী গুরুগোবিন্দ এবং রাণা প্রতাপের সঙ্গে তুলনা করে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছেন বটে কিন্তু সেটা অনৈতিহাসিক। তকি খাঁ কেবল তাঁর বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন, সমগ্র নবাবী বাহিনীর অধ্যক্ষতা তাঁর ছিল না। যুদ্ধ পরিকল্পনা রচনাতেও তাঁর কোন কৃতিত্ব নাই। তিনি কেবল ব্যক্তিগত বীরত্বের দাবীদার। সুতরাং রাণা প্রতাপ অথবা শিবজীর সঙ্গে তাঁর তুলনা অসঙ্গত। এদিক থেকে একমাত্র মীরমদনের সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। মোহনলাল পলাশীতে প্রাণ দেন নাই।

৪॥ চতুর্থ অঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতার প্রসঙ্গ দিয়ে সুরু, মুঙ্গেরের গঙ্গাতীরে খোজা পিক্রু তার ভাই ও নবাবের প্রধান সেনাপতি গুরগিণ খাঁকে অর্থের বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকতায় প্রলুব্ধ করছেন এবং মণিবেগমের উপঢৌকন এক বৃহৎ হীরক খণ্ড উপহার দিচ্ছেন। তিন লক্ষ টাকা মূল্যের হীরা পেয়ে গুরগিন খুবই খুশী হয়ে উঠলেন। এর পরই জগৎশেঠ প্রভৃতি গুরগিণ খাঁকে উদয়নালায় পরাজয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করায় গুরগিণ খাঁ স্বীকার করলেন যে সৈন্যরা 'নবাবের তরফ হয়ে লড়বে তো আপনাদের টাকা হামি খাচ্ছে কেন?' (৪/১ পাতা ৩৩৯) অর্থাৎ গুরগিণ খাঁ একদিকে জগৎশেঠ প্রভৃতির কাছ থেকে অন্য দিকে খোজা পিক্রু মারফৎ মণিবেগমের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করে নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। ইতিমধ্যে মীরকাশিম এসে জগৎশেঠদের গঙ্গাতীরে সমবেত হবার কারণ জিজ্ঞাসা করছেন। জগৎশেঠ প্রভৃতি সকলের বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পেয়ে এবং সিরাজদ্দৌলার প্রতি এদের আচরণ স্মরণ করে মীরকাশিম বালুকাপূর্ণ বস্তা কণ্ঠলগ্ন করে এদের সকলকেই গঙ্গায় ডুবিয়ে মারবার আদেশ দিলেন। 'তারা' এসে উদয়নালায় নবাবের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করে বললেন 'যদি উদয়-নালায় সমস্ত সামন্ত একতায় চালিত হত, যদি পরস্পর পরস্পরকে উপেক্ষা করে অসতর্ক ভাবে অবস্থান না করতো, তাহলে একজন নবাব পক্ষীয় ইংরাজ সৈন্যের বিশ্বাসঘাতকতায়, উদয়নালা শত্রুর হস্তগত হত না—পঞ্চদশ সহস্র নবাব সৈন্য বিনাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করতো না।' (৪/১ পাতা ৩৪১) নবাব তারার কথাতেও মনস্থির করতে পারছেন না। যুদ্ধে যোগদান করলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবার ভয় সুন্দর ভাবে নাট্যকার প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে গুরগিণ খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। নবাব আরাব আলির আনুগত্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে মুঙ্গের দুর্গ রক্ষার ভার অর্পণ করলেন। পরমুহূর্তে গুরগিণ খাঁকে লেখা খোজা পিক্রুর পত্র নবাবের হাতে পড়ল। গুরগিন ওদিকে মণিবেগমকে তার রূপমুগ্ধ মনে করে কল্পনার রঙিন স্বপ্নে মশগুল। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মীরজাফর শিবিরে অ্যাডমস, পিক্রু ও মণিবেগম। মীরকাশিম পাছে ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করে তাই অ্যাডামস মুঙ্গের আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করছেন। মণিবেগম তাকে উদ্বুদ্ধ করছেন

বলছেন গুরগিণ খাঁ তাঁর অর্থগ্রহণ করে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন সুতরাং বিনা দ্বিধায় মুঙ্গের আক্রমণ করা উচিত। অবশেষে অ্যাডামস মীরজাফরকে সঙ্গে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা করলেন। নবাব মীরজাফরকে নিয়ে এলেন হেস্টিংস ও সামসেরউদ্দীন। 'তারা' মণিবেগমকে 'বঙ্গরমনী' বলে সম্বোধন করে তাকে রাজ্য লালসা ত্যাগ করে স্বদেশীকে পরাধীনতা থেকে রক্ষা করতে অনুরোধ করলেন। মণিবেগম বললেন যে তাঁর ব্যথা সংসারত্যাগী ফকিরের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। মণিবেগম জানালেন, 'তুমি স্বামী-পুত্রের হাত ধরে সিংহাসন হতে এনে পর-পদ-প্রান্তে স্থাপন করো নাই। যে স্বামী হীন নর্তকীকে বেগম পদে স্থাপন করেছিলো, রাজ্য লোলুপ জামাতার সঙ্গে পরামর্শ করে, সে স্বামীকে পদচ্যুত করো নাই।' (৪/২ পাতা ৩৪৫) মণি-বেগমের তীব্র ভাষায় তারাও বিভ্রান্ত হলেন। বেগম বললেন—'দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করো—যদি একজন স্বার্থত্যাগী পাও, যদি একজনকে বঙ্গভূমির জন্য কাতর দেখো, যদি এমন কাকেও দেখতে পাও যে আত্মোন্নতি পরিত্যাগ করে দেশের উন্নতির জন্য ব্যাকুল তারে আমার কাছে নিয়ে এসো। যদি সত্যি কেউ এমন মহাপুরুষ থাকে, যদি আমার হৃদয়ে প্রতীতি জন্মায়, যে সত্যই সে স্বার্থত্যাগী, সত্যই সে স্বদেশের উন্নতি কামনা করে, আমি সকল লালসা বর্জন করবো।......পরাধীনতা ভিন্ন রক্তস্রোত নিবারণ হবে না। নচেৎ দিন দিন পিতা পুত্রের শত্রু, ভ্রাতা ভ্রাতার শত্রু—আত্মীয় আত্মীয়ের শত্রু পরস্পর পরস্পরের রুধির মোক্ষণ করবে।......বাঙ্গলায় শান্তিস্থাপনের জন্য, ঈশ্বর প্রেরিত ইংরাজ উদয় হয়েছে।' (৪/২ পাতা ৩৪৬)।

এই দৃশ্যের অন্যত্র দেখান হয়েছে যে 'তারা' হেস্টিংসকে বলছেন—'সাহেব, তুমি না বাঙ্গলার দুর্গতি দেখে, বাঙ্গলায় শান্তিস্থাপন করবে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে?..... শান্তির পরিবর্তে সমরানল প্রজ্বলিত করেছ।' (৪/২ পাতা ৩৪৫) ইরেজ খাঁ নামে এক চরিত্র (একজন ইরাজ খাঁ ছিলেন সিরাজদ্দৌলার শ্বশুর। ইনি কে?) 'তারা'কে বন্দী করার প্রস্তাব করলে তারা প্রস্থান করছেন। হেস্টিংস জানাচ্ছেন—'She should have been born in Europe. (৪/২ পাতা ৩৪৬)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে গুরগিণ খাঁ মণিবেগমের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ে গেছেন তাই গুপ্তঘাতকদের বাধা দেবার চেষ্টাও করলেন না, তাদের দ্বারা

খণ্ডিত হলেন। ঘাতকরা জানালেন—'যে তকী খাঁ তোমার কৌশলে শত্রু যুদ্ধে হত হয়েছেন—আমরা তাঁর শিক্ষায় নিমক হালাল।' (৪/৩ পাতা ৩৪৭) চতুর্থ গর্ভাঙ্কের সুরুতেই আলী ইব্রাহীম জানালেন যে আরাব আলী খাঁ মুঙ্গের দুর্গ ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করেছেন এবং লালসিং মুমূর্ষু অবস্থায় বন্দী। ক্রমান্বয় পরাজয়ে বিভ্রান্ত ও ক্ষিপ্ত নবাব সমরুকে ডেকে সমস্ত ইংরেজ বন্দীদের হত্যার আদেশ দিলেন। আলী ইব্রাহীম ঘোর প্রতিবাদ করলেন। মীরকাশিম বললেন—'আমার জয় আশা বিলুপ্ত। কিন্তু নির্বিরোধী প্রজার পক্ষে কেবল আমি·· ·· তাদের হয়ে আমি প্রতিহিংসা গ্রহণ করবো। কলঙ্ক হবে—হোক। নিরীহ প্রজার প্রতিহিংসা তৃপ্ত হবে' (৪/৪ পাতা ৩৪৮)। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে মীরকাশিমের বেগম ইংরেজবন্দীদের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। বহু সংলাপের পর বেগমের প্রতিও মীরকাশিম রুষ্ট হলেন। 'ইংরাজ বন্দীর প্রতি তোমার যে মমতা সে মমতা তোমার প্রজার প্রতি নাই, তোমার স্বামীর প্রতি নাই—তোমাব মমতা তোমার স্বামীর শত্রুর প্রতি। তুমি আমার অবাধ্য হয়ো না রোটাসে যাও—নচেৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোমায় তথায় প্রেরণ করবো। আর আমি সে মীরকাসিম নই।' (৪/৫ পাতা ৩৪৯) বেগম অবশেষে মহম্মদ ইসাখের করুণায় ছদ্মবেশে নবাবের কাছেই ভৃত্য হয়ে থাকলেন। ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে নবাব সমরুকে বালক ও স্ত্রীলোকদের বধ করাব জন্য ভৎসনা করছেন। এই সময়ে নবাব জানাচ্ছেন—'গণ্যমাণ্য বৃদ্ধ জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে বধ করেছি, রাজা রামনারায়ণকে বধ করেছি, ইংরেজ স্থাপক কৃষ্ণদাসের পিতা—রাজা রাজবল্লভকে বধ করেছি · গুরগিণকে বধ করেছি।' (৪/৬ পাতা ৩৫০) একমাত্র জীবিত ইংরেজ বন্দী ডাক্তার ফুলারটনের সঙ্গে মীরকাশিমের অবশেষে দীর্ঘ সংলাপ। ফুলারটন জানালেন যে বন্দীদের হত্যার ফলে ইংরেজের সঙ্গে মীরকাশিমের সন্ধির সমস্ত সম্ভাবনা অন্তর্হিত হল। ফুলারটন দেশের মধ্যেকার চরম অরাজকতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে হিন্দুমুসলমানে বিদ্বেষ এবং বড়লোক ও গরীবের মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য ইংরেজের জয়ে সাহায্য করছে। তিনি প্রস্থান করবার আগে জানালেন যে নবাব বিশ্বাস যেমন দিতে পারেন নাই তেমনি নিজেও অবিশ্বাসী হয়েছেন। তাঁর পতন অবশ্যম্ভাবী। ফুলারটন চলে গেলে নবাব আলী ইব্রাহীমকে জানালেন যে তিনি তাকেও বিশ্বাস করেন না। অবশেষে

অযোধ্যার নবাবের শরণাপন্ন হতে স্থির করলেন মীরকাশিম। ইব্রাহীমকে আদেশ করলেন 'আজই সসৈন্যে রোটাস দুর্গ হতে ধনরত্ন ও পরিবারবর্গ লয়ে সুজাউদ্দৌলার রাজ্যাভিমুখে গমন কর' (৪/৬ পাতা ৩৫৩)।

সপ্তম গর্ভাঙ্কে কলিকাতা ভ্যাম্সিট্টার্টের কক্ষ। ইংরেজ বন্দী হত্যার খবর পেয়ে গবর্ণর, হেস্টিংস ও কাউন্সিলরগণ 'Revenge' 'Revenge' বলে চিৎকার করলেন। গবর্ণর মীরকাশিম ও সমরুকে ধরে দেবার জন্য লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। কেল্লা থেকে 'Mourning-gun' ছোঁড়বার নির্দ্দেশ দেওয়া হল। সকল নেটিভ কর্মচারীদের নগ্নপদে থাকার আদেশ জারী হল। গঙ্গাগোবিন্দবাবু নামে এক কর্মচারী জুতা পরে আসায় তিরস্কৃত হলেন। চৌদ্দদিন অশৌচ পালনের নির্দেশ দেওয়া হল।

অষ্টম গর্ভাঙ্কে প্রান্তরে আলী ইব্রাহীম ও বালকরূপী বেগম। অদ্ভুত রাজনীতিজ্ঞান পোষাক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বেগমের মধ্যে প্রকাশ পেতে দেখা যাচ্ছে। তিনি জানাচ্ছেন যে দিল্লীর শাহজাদা বর্তমানে মীরকাশিমকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও তাঁর আসল লক্ষ্য ইংরেজ সাহায্যে দিল্লীর হারান মসনদ ফিরে পাওয়া। ইংরেজরা বাদশাহকে সে প্রতিশ্রুতি দিলে বাদশাহ মীরকাশিমকে ত্যাগ করবেন। তিনি জানালেন যে মুসলমান হলেও অযোধ্যার নবাব বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং একমাত্র ভরসাস্থল মহারাষ্ট্রীয়রা। 'তারা দস্যু বটে তথাপি তাদের হৃদয় এখনও কলঙ্কিত নয়' (৪/৮ পাতা ৩৫৫)। আলী ইব্রাহীম অবশ্য বালকের কথার গুরুত্ব দিলেন না। পরবর্তী নবম গর্ভাঙ্কে সুজাউদ্দৌলার শিবিরে সুজাউদ্দৌলা, মীরকাশিম ও শাহ আলম্ বক্সার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এমন সময় 'তারা' এসে সতর্কবানী শোনালেন 'কপটতায় ভারতের সর্বনাশ হবে। স্বার্থ-কপটতা পরিহার কর বীরকীর্ত্তি জগতে স্থাপিত করো।' (৪/৯ পাতা ৩৫৫) দিল্লীশ্বর শাহ আলম্ অযোধ্যাপতি সুজাউদ্দৌলা ও বঙ্গেশ্বর মীরকাশিম জয়ধ্বনীর মধ্যে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। চতুর্থ অঙ্ক অবসিত হল।

আলোচনা ॥

তৃতীয় অঙ্ক গিরিয়ার যুদ্ধে শেষ হয়েছে আর চতুর্থ অঙ্ক উধুয়ানালায় পরাজয়ের পর সুরু হয়েছে। ১৯শে জুলাই ১৭৬৩তে গিরিয়ার

পরাজয়ের পরে ২৪শে জুলাই মীরজাফরের দ্বিতীয়বার নবাবী আরম্ভ হল মুর্শিদাবাদে। আবার নন্দকুমার তাঁর প্রধানমন্ত্রী হলেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই দিন থেকে মীরকাশিম আর নবাব থাকলেন না। মাত্র কয়েকদিন পরে ২রা অগাষ্ট গিরিয়ার যুদ্ধে মীরকাশিমের সৈন্যদল পরাজিত হল। বিরাট সমর সজ্জা ও দুর্ভেদ্য দুর্গ থাকা সত্ত্বেও ৫ই সেপ্টেম্বর উধুয়ানালার যুদ্ধে মীরকাশিম আবার পরাজিত হলেন। সুতরাং চতুর্থ অঙ্ক সুরু হবার সময় ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। শেষ দৃশ্যে নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণের দৃশ্য দেখান হয়েছে সুতরাং ওই বছরের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। এই অঙ্কের বিস্তার তাই ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ চার মাস ধরা যেতে পারে। ক্রমান্বয়ে পরাজয়ে মীর-কাশিমের মানসিক বিপর্যয়ে যে নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে গিরিশচন্দ্র তার অপূর্ব সদ্ব্যবহার করেছেন। সমগ্র অঙ্কটি অতি উত্তেজনাপূর্ণ। নাটকের গতি অতি দ্রুত।

গুরগিণ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে নাট্যকার স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। অর্থ ও রূপের মোহকে এই কীর্তির নিয়ামক বলা হয়েছে। খোজা পিক্রকে ইংরেজেরা তথা মীরজাফর ব্যবহার করেছিলেন তার ভাই গুরগিণের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে। দুই ভাইএ দেখা হয়েছিল গুপ্তভাবে। খোজা পিক্রু গুরগিণকে পত্র লিখেছিলেন লোভ দেখিয়ে এবং তা নবাবের হাতে পড়েছিল এ সবই সত্য ঘটনা। কিন্তু গুরগিণের বিশ্বাসঘাতকতার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বারবার যুদ্ধে পরাজয় হবার ফলে মীরকাশিম গুরগিণ খাঁর ওপর বিশ্বাস হারালেন তারপর গুরগিণ যখন প্রস্তাব করলেন যে সুষ্ঠু প্রস্তুতির জন্য ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করা প্রয়োজন তখনই ক্রোধে ক্ষিপ্ত মীরকাশিম গুরাগণকে বিশ্বাসঘাতক বলে ভুল করলেন। খোজা পিক্রুর পত্র নবাবের হাতে এলে তার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হল—তিনি তখন গুরগিণকে গুপ্তহত্যার আদেশ দিলেন। খোজা পিক্রুর ভাইকে লেখা চিঠি জাল হওয়া সম্ভব। কারণ বিশ্বাসঘাতকতা করলে কি কি পুরস্কার পাওয়া যাবে তা চিঠিতে লিখে পাঠান খুবই অসম্ভব মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র গুরগিণকে বিশ্বাসঘাতক রূপেই চিত্রিত করেছেন। গিরিশচন্দ্র তাঁকে অনুসরণ করেছেন। এ বিষয়ে প্রমাণের অভাবে ঐতিহাসিকগণ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক গুরগিণকে নিরপরাধ

সাব্যস্ত করেছেন এবং মীরকাশিমকে অব্যবস্থচিত্ততায় বন্ধু হত্যার পাপে কলঙ্কিত করেছেন। এ বিষয়ে আলোচনাকে ব্যাপ্ত না করেও একটি অনৈতিহাসিকতা লক্ষণীয়। গুরগিণ খাঁ নাটক অনুসারে মুঙ্গেরে সেপ্টেম্বর মাসে নিহত হলেন। কিন্তু ঘটনার বিস্তার ভিন্ন। মেজর অ্যাডামসের মুঙ্গের আসার খবর পেয়ে মীরকাশিম সসৈন্যে মুঙ্গেব ত্যাগ করে পাটনা চলে গেলেন অক্টোবরের সুরুতে। ৩রা অক্টোবর মুঙ্গেব দুর্গ দখল করে অ্যাডমস পাটনা অভিমুখে ধাবিত হযেছেন খবব পেযে ৫ই অক্টোবর মীরকাশিমের আদেশে পাটনায যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করা হল। ১৪ই অক্টোবর মীরকাশিম পাটনা পরিত্যাগ কবে ফুলওযাবির দিকে পলায়ন করলেন। (গবর্ণরকে লেখা ডাক্তার ফুলারটনের পত্র। Vansittart's Narrative vol. III page 378) ১৫ই অক্টোবর অ্যাডামস পাটনা অভিমুখী যাত্রা করলেন। ১৮ই অক্টোবর 'বার' নামে বিহারের এক গ্রামে মীরকাশিম ছাউনি ফেলেন। এখানে ঐ রাত্রেই গুরগিণ খাঁ ও পরদিন জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করা হয়। (House of Jagat Seth, J H. Little, pp 221-223) সহজেই প্রমাণ করা যায় যে মুঙ্গের থেকে পলায়নের সময় থেকে বারে পৌছান পর্য্যন্ত গুরগিণ খাঁ ও জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় নবাবের সঙ্গে ছিলেন। জগৎশেঠরা বন্দী অবস্থায় ছিলেন কিন্তু গুরগিণ খাঁ নবাবের সহযাত্রী ছিলেন তাই গুপ্ত-ঘাতক দিয়ে তাঁর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করতে হয়। এই পরিস্থিতি দেখে সহজেই মনে হয় যে একমাত্র নবাব ছাড়া গুরগিণ খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করবেন একথা কেউ বিশ্বাস করতেন না। পাছে গুরগিণকে প্রকাশ্যভাবে হত্যা করলে সৈন্যবাহিনীতে বিক্ষোভ হয় তাই গুপ্তভাবে নবাব তাকে হত্যা করলেন। মুতাক্ষরীণ রচয়িতা জানিয়েছেন যে গুরগিণ খাঁর হত্যাকাণ্ডের পর মীরকাশিম আনুষ্ঠানিকভাবে শোক প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু সেই শোক প্রকাশে আন্তরিকতার এতই অভাব ছিল যে কারু বুঝতে কষ্ট হয় নাই যে কার আদেশে গুরগিণ খাঁ নিহত হয়েছেন।

এবার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের নিহত হওয়ার বিষয় আলোচনা করা যাক। প্রথম গর্ভাঙ্কের ঘটনা অনুসরণ করলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্রকেও মীরকাশিম জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন। অবশ্য ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে গিরিশচন্দ্র এই ত্রুটি সংশোধন করেছেন। মীরকাশিম যে সব গণ্যমাণ্য

ব্যক্তিদের হত্যা করেছেন বলে দাবী করছেন তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের নাম করেন নাই। গণ্যমাণ্য ব্যাক্তিদের হত্যাকাণ্ড ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুঙ্গের পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে ঘটে। রাজা রামনারায়ণ ও রাজবল্লভ পুত্র কৃষ্ণদাস সহ হত হন। রাজা রামনারায়ণকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। ওইদিনই রাজা রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাসকে গুলি করে হত্যা করা হয়। (Bengal Revenue consultations of 3rd May 1774) দীর্ঘদিন ধরে মনে করা হত যে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। কিংবদন্তি জগৎশেঠদের এক ভৃত্যের অপূর্ব সাহসিকতার কথাও প্রচার করে। চুণীনামে এই ভৃত্য স্বেচ্ছায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করে। প্রভুভক্তির এই আজগুবি গল্প জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু কাহিনীকে বহুল প্রচারিত করে। এই শতাব্দীর সুরুতে এই বিষয়ে আলোকপাত হল এবং জানা গেল যে ১৮ই অক্টোবর 'বারে' পোছে মীরকাশিমের আদেশে গুরগিণ খাঁর হত্যাকাণ্ডের পরে শেঠ ভ্রাতৃদ্বয় নৃশংসভাবে দ্বিখণ্ডিত হন। (House of Jagat Seth pp. 221)। শেঠদের দুই পুত্র শেঠ গুলাব চাঁদ ও বাবু মহীর চাঁদ প্রথমে সুজাউদ্দৌলার কাছে ও পরে বাদশাহর কাছে প্রেরিত হয়ে বন্দী থাকেন। পরে ইংরেজরা তাদের উদ্ধার করে স্বজনবর্গের হাতে তাদের ফিরিয়ে দেন।[৬৬]

বলা বাহুল্য যে গুরগিণ খাঁ সম্পর্কে এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের হত্যা করা বিষয়ে গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ ভাবে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র মীরকাসিম প্রবন্ধ অনুসরণ করেছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের মতামত এবং ভুল তাই গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে। উধুয়ানালার যুদ্ধে যে মীরকাশিমের শক্তি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেল একথা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় স্বীকার করেন নাই।[৬৭] তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে এই যুদ্ধেই মীরকাশিমের সর্বনাশ সুসম্পন্ন হয়। অক্ষয়কুমারকে অনুসরণ করে গিরিশচন্দ্রও উধুয়ানালার যুদ্ধের নাটকীয় ঘটনাকে প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। গিরিশচন্দ্র যে সময়ে সময়ে প্রায় অন্ধভাবে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে অনুসরণ করেছেন তার একটি মজার উদাহরণ দেওয়া যাক। পাটনার হত্যাকাণ্ডের পর কলকাতার কাঁউন্সিল প্রস্তাব করলেন—It is therefore agreed and ordered that a general deep mourning shall be observed in the settlement

for the space of fourteen days to commence next week Wednesday, the 2nd November.

That the morning of the day shall be set apart and observed as a public fast and humiliation and that intimations be accordingly given to the chaplains to be prepared with a sermon and forms of prayer suitable to the occassion.[৬৮] অক্ষয় কুমার মৈত্র কৃত বঙ্গানুবাদ—'সে মধ্যাহ্নে কেহ জলবিন্দু স্পর্শ করিবেন না, সকলে সায়ংকালে ধর্মমন্দিরে সমবেত হইবেন ; দুর্গপ্রাকারে রণতরীতে, ভাগীরথীর তীরে সর্বত্র শোকসূচক কামানধ্বনী হইবে। চতুর্দশ দিবস ইংরাজ মাত্রেই শোকচিহ্ন ধারণ করিবেন।'[৬৯] বলাবাহুল্য অক্ষয়কুমারের অনুবাদে নানা কাল্পনিক কথা প্রবেশ করেছে। গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকের সপ্তম গর্ভাঙ্কে গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্টের মুখে ভাষণ দিয়েছেন—'অদ্য আমরা খানা খাইব না, একপক্ষ আমরা পাটনায় হত্যাকাণ্ডের জন্য শোকপ্রকাশ করিব—কেল্লা হইতে mourning—gun ছুড়িব, সারা শহরে কালানিশান উড়িবে।' (৪/৭ পাতা ৩৫৩) সুতরাং এই উদাহরণ গিরিশচন্দ্রের অক্ষয়কুমারের প্রতি আনুগত্য অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে।

সাধারণভাবে চতুর্থ অঙ্ককে ইতিহাস অনুসারী বলা চলে। প্রথম গর্ভাঙ্কে উধুয়ানালার পরাজয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তারপর দেখান হয়েছে খোজা পিত্রু গুরগিণকে প্রলুব্ধ করছেন। গুরগিণ থাঁর মণিমাণিক্য গ্রহণ করার সম্ভাব্যতা তিনি বিশ্বাসঘাতক কিনা তার ওপর নির্ভর করে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অনুসারে গুরগিণ বিশ্বাসহন্তা সুতরাং এই দৃশ্যও সম্ভব। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মুঙ্গের গঙ্গাতীরে ভ্রমণ একান্ত অসম্ভব ঘটনা। কৃষ্ণচন্দ্র তখন নদীয়াতে এবং অন্যেরা বন্দী। এই বন্দী অবস্থা থেকেই রাজা রামনারায়ণকে জলে ডুবিয়ে এবং রাজবল্লভ ও তার পুত্র কৃষ্ণদাসকে গুলি করে হত্যা করা হয়। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্র প্রচলিত কিংবদন্তি ও অক্ষয়কুমারকে অনুসরণ করেছেন। 'চুনীর [illegible] এবং আনুষঙ্গিক ভাবাসুতা প্রকাশ করে নাটকের কলেবর তিনি [illegible] [illegible] বৃদ্ধি করেন [illegible] নাট্য রচনায় তাঁর সংযমের প্রমাণ [illegible]

যায়। 'তারা' চরিত্র কাল্পনিক তা আলোচনা করা হয়েছে এখানে তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। তবে তারার সঙ্গে কথোপকথনে মীরকাশিমের যুদ্ধে মৃত্যুর ভয় নাট্যকার চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছেন। এই দৃশ্যের শেষে মীরকাশিমের পাটনাযাত্রা একান্তভাবে ইতিহাস অনুসারী।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক কল্পিত ঘটনার সমষ্টি হলেও মেজর অ্যাডামসের মুঙ্গের যাত্রা ইতিহাস সম্মত। মীরজাফর এসময় মুর্শিদাবাদে সুতরাং মীরজাফর ও মণি-বেগমের পক্ষে অ্যাডামসের শিবিরে অবস্থান অথবা খোজা পিক্রর সঙ্গে সংলাপ কাল্পনিক। হেষ্টিংস এসময় কলকাতায় সুতরাং তাঁর সঙ্গে তারার সংলাপ অসম্ভব। তারা ও মণিবেগমের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার দুটি চরিত্রের বিপরীত ধর্মী মনোভাব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। এ সবই নাটকীয় ঘটনা ঐতিহাসিক নয়। তবে এই দৃশ্যের কোন সংলাপে ইতি-হাসের বিরুদ্ধাচারণ করা হয় নাই। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে গুরগিণ খাঁর হত্যা দৃশ্য কাল্পনিক হলেও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কৃত ঘটনাক্রম অনুসারী। পরবর্তীকালে জানা গেছে যে গুরগিণ খাঁ পাটনা ত্যাগ করবার পর নিহত হন। গিরিশচন্দ্র গুরগিণ খাঁকে আগাগোড়া বিশ্বাসঘাতক রূপেই চিত্রিত করেছেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম গর্ভাঙ্কে ক্রোধে উন্মত্ত মীরকাশিমকে দেখা যাচ্ছে। নিরস্ত্র বন্দীদের হত্যায় তিনি কৃত সংকল্প। আরাব আলীর মুঙ্গের দুর্গ ইংরেজদের সমর্পণ এবং ক্রমান্বয়ে যুদ্ধে পরাজয় মীরকাশিমকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তুলেছে। পাটনার দুর্গে বসে মীরকাশিমের এই সংকল্প আলী ইব্রাহীম বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। আলী ইব্রাহীম চরিত্রটিকে অক্ষয়কুমার অনুসরণে গিরিশচন্দ্র চমৎকার ভাবে ব্যবহার করেছেন। হৃতসর্বস্ব নবাবের একমাত্র বন্ধু ও হিতৈষীরূপে তাঁর চরিত্র ফুটে উঠেছে। বন্দী হত্যার জঘন্য কাজে মীরকাশিমের পক্ষে কিছু সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। বলেছেন প্রজাদের প্রতি ইংরেজদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছেন মীরকাশিম। মুতাক্ষরীণ কিন্তু এই মত সমর্থন করেন না। স্পষ্ট লিখেছেন যে যুদ্ধের সময় ইংরেজসৈন্য জনসাধারণের ওপর এতটুকু অত্যাচার করে নাই। বরঞ্চ নবাব সৈন্যের চলার পথ লুঠের আগুনে প্রজ্বলিত থাকত। জনসাধারণ তাই ইংরেজের বিজয় কামনা করেছে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যে মনোভাব ছিল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তখন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের

মন বিক্ষুব্ধ। জনসাধারণ তখন স্বাদেশিকতায় মেতে উঠেছে। তাই মীর-কাশিমের মুখে নাট্যকার সংলাপ দিয়েছেন—'হতভাগ্য আমি, হতভাগ্য বঙ্গভূমি, হতভাগ্য দীন প্রজাগণে! দেখ দেখ কঠিন নয়নে, অদ্যাপিও নহে শুষ্ক বারি! কাহার মমতা—কার হেতু এই কোমলতা—পাষাণ, পাষাণ আমি!' (৪/৪ পাতা ৩৯৭)। বন্দীহত্যায় নাটকের দর্শক মীরকাশিমের ওপর বিরূপ হওয়া দূরে থাকুক তাকে সমর্থন করেছে। নিরস্ত্র ইংরেজ বন্দীদের হত্যায় তারা শতাব্দী অধিককালের ইংরেজ শাসনে নিরস্ত্র ভারত-বাসীদের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। মীরকাশিমের কর্মকে সমর্থন জানিয়েছে। গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্টের বক্তব্য পাঠ করলে তাই আশ্চর্য্য হতে হয়। এই উদারচেতা বৃটিশ রাজনৈতিক যে কতো মহান ছিলেন বোঝা যায় যখন পড়ি—The reproach which Meer Cossim has brought upon himself by the cruelty exercised on the unhappy prisnors at Patna, puts it in a manner out of my power to do justice to the former part of his conduct, since how strictly so ever he may have adhered to his engagements with the English, this will always recur as an argument to vindicate every injury done him before this period ; and repeated violations of treaty on our part, whilst we were on terms of friendship with him. ...That we were the first aggressors by the assault of the city of Patna will not be disputed...Meer Cossim had not to this time shewn any instance of vicious or a violent disposition ; he could not be taxed with any act of cruelty to his own subjects, nor treachery to us. He had sense enough to know, that the English friendship would be his greatest security and to dread their power if ever they should come to be his enemies. ......Fallen as Meer Cossim was to this state of desperation, it is no wonder that his temper broke all his former restraints and gave a loose to the spirit of revenge, so common amongst his countrymen and inculcated by their religion and education. In effect the hoar-

ded resentment of all the injuries which he had sustained in continual exertion of patience during the three years of his Government, from this time took entire possession of his mind, now rendered frantic by his natural timidity, and the frightful prospect before him and drove from thence every other principle, till it has glutted itself with the blood of all within his reach who had either contributed to his misfortunes or by real or fancied connections with his enemies became obnoxious to his revenge.[৭০]

ভ্যান্সিট্টার্ট এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের পরেও মীরকাশিমকে কটুক্তি করছেন না বরঞ্চ যে দুঃসহ জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মীরকাশিম এই অপরাধ করলেন তাকে বিশ্লেষণ করছেন। কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যে এই অপরাধের আসল অংশীদার একথা স্বীকার করতে গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্ট দ্বিধা করেন নাই। তবু নিরস্ত্র নারী ও শিশু সহ বন্দী হত্যা অন্যায় তাই প্রথমে আলী ইব্রাহীম ও পরে বেগম মীরকাশিমকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। বেগম বাধা দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হলেন। ৪র্থ ও ৫ম এই দুই গর্ভাঙ্কই কল্পিত। কিন্তু এমন সুষ্ঠু নিয়মানুগ কল্পনা সত্য ঘটনা বলেই বিভ্রম হয়। এই দুইটি দৃশ্য রচনায় গিরিশ-চন্দ্র যেন ইতিহাসের অলিখিত পাতাগুলি দর্শকের সামনে মেলে ধরেছেন। কল্পনা বাস্তবের রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। ইতিহাসের গণ্ডীর বাইরে না গিয়েও যে কল্পনার বিস্তার করা সম্ভব এই দৃশ্য দুটি তার প্রকৃষ্টতম উদাহারণ। মীর-কাশিমের চরিত্রের দুর্বল মুহূর্ত এই দৃশ্য দুটিতে চমৎকারভাবে প্রকাশিত। ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেবের মীরকাশিম চরিত্র বিশ্লেষণ যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। বেগম সম্পর্কে ইতিহাস নীরব তাই মীরকাশিমের জীবনের চরমতম সময়ে বেগমের ব্যবহার উভয় চরিত্রকেই মহত্ব দিয়েছে।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে বন্দীহত্যার পরবর্ত্তী ঘটনা। নারী ও শিশুদের হত্যা করার জন্য মীরকাশিম সমরুকে ভৎসনা করছেন। নাট্যকার বলতে চেয়েছেন যে মীরকাশিম নারী ও শিশুদের হত্যার জন্য দায়ী নন সমরুই দায়ী। বলাবাহুল্য মীরকাশিমের কলঙ্ক স্খালনের জন্য এই চেষ্টা করা হয়েছে। তবে একথা নিশ্চয় বলা চলে যে নারী ও শিশু হত্যা সম্পর্কে মীরকাশিম কোন স্পষ্ট নির্দেশ দেন

নাই। ডাক্তার ফুলারটনের সঙ্গে মীরকাশিমের সংলাপ বহুলাংশে কলকাতায় লেখা ডাক্তার ফুলারটনের পত্র থেকে সংগৃহীত। ডাক্তার ফুলারটন লেখেন যে এলিস, হে ও লুসিংটন ৫ই অক্টোবর নৃশংস ভাবে প্রথমে নিহত হন। তারপর অন্যান্য ইংরেজ বন্দীদের নারী শিশু নির্বিশেষে বেপরোয়া ভাবে হত্যা করা হয়। সেই সময় গলষ্টোন নিহত হন। ৭ই অক্টোবর নবাব ডাক্তার ফুলারটনকে কলকাতায় যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। তাকে জানান যে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে বলে ইংরেজরা যেন তাকে শক্তিহীন না মনে করে। প্রয়োজন হলে তিনি দিল্লীর বাদশাহ, মারাঠা ও আব-দাল্লাদের (?) সাহায্যে ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়ন করবেন। পরে নবাব মত পালটে জানালেন যে তিনি পাটনায় যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পারেন তবে যেন শহর ছেড়ে না চলে যান। ডাক্তার ফুলারটন ওলন্দাজ কুঠিতে যাবার প্রার্থনা জানালে তা মঞ্জুর হয়। সেলটনের সাতজন ইংরেজ তখনও জীবিত। আলী ইব্রাহীম খাঁ বার বার নবাবের কাছে এদের জীবন ভিক্ষা করে বিফল হলেন। ১১ই অক্টোবর সমরু সেলটনের সাতজন সাহেবকে সপরিবারে হত্যা করে। ইংরেজ সৈন্যর আগমন সংবাদে বিচলিত হয়ে মীরকাশিম ১৪ই অক্টোবর শহর ছেড়ে ফুলওয়ারী অভিমুখে চলে যান। এ পর্য্যন্ত ওলন্দাজ কুঠিতে থেকে ২৫শে অক্টোবর ডাক্তার ফুলারটন কলকাতা অভিমুখে পলায়নে মনস্থ করেন। সেই দিনই রাত্রি ১১ টায় মেজর অ্যাডামস সসৈন্যে পাটনায় উপস্থিত হন।[৭১] ডাক্তার ফুলারটনের পত্রে সহজেই বোঝা যায় যে আলো-চনার মনোভাব তখন মীরকাশিমের ছিল না। ৫ই অক্টোবর এবং পরে ১১ই অক্টোবরের হত্যাকাণ্ড এবং আলী ইব্রাহীম খাঁর বিফল আবেদনের কথা শুনে মীরকাশিমের প্রতিহিংসা পরায়ণ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। ভয় ও অবিশ্বাস তার চিন্তাকে যে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই দৃশ্য অবাস্তব। তবে গিরিশচন্দ্র মীরকাশিমের যে বীর চরিত্র জনসাধারণের সামনে অঙ্কিত করেছেন তাতে ভীত মীরকাশিমের ঠাঁই নাই। তাই আলী ইব্রাহীম খাঁকে অবিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার তার অপ্রকৃতিস্থ মনের সামান্য পরিচয় দিয়েছেন মাত্র। ভ্যান্সিটার্ট কি অপূর্ব বিশ্লেষণ করেছেন মীরকাশিমের জিঘাংসার……now rendered frantic by his natural timidity and the frightful prospect before him,

and drove from thence every other principle till it glutted itself with the blood of all within his reach. মীরকাশিমের চরিত্রের এই পরিণতি হয়ত খুব নাটকীয় হত কিন্তু ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের দর্শক যাঁরা জাতীয়তাবাদী স্বদেশ বৎসল প্রজারঞ্জক মীরকাশিমের জন্য মনের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন এই পরিণতিতে সন্তুষ্ট হতেন না। তাই জাতির শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র জাতীয়তাবাদের মহামন্ত্রে দেশকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য মীরকাশিমের এই কলঙ্ককাহিনীকে হাল্কা করে দিয়ে অন্যায় করেন নাই। বস্তুত যে কারণে এই নাটক রচনা মীরকাশিম চরিত্রের এই অনৈতিহাসিক প্রকাশে তা সফলতা লাভ করেছে। মীরকাশিম সসম্মানে দেশবরেণ্য নরপতি রূপেই প্রতিভাত হয়েছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ও মীরকাশিমের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমর্থন করতে পারেন নাই। তিনি লিখেছেন—'আমিয়েটের হত্যাকাণ্ডে সহসা যুদ্ধানল প্রজ্বলিত না হইলে, পাটনার হত্যাকাণ্ডে মীরকাশিমের নৃশংস স্বভাব পরিব্যক্ত না হইলে, ভ্যান্সিটার্টের ন্যায় শুভানুধ্যায়ী ইংরেজ গভর্ণরের কল্যাণে মীরকাশিমের সকল আশাই পূর্ণ হইতে পারিত।'[৭২] গিরিশচন্দ্র নাটকের অনুরোধে এই দৃশ্যে অক্ষয়কুমারকেও লঙ্ঘন করেছেন।

সপ্তম গর্ভাঙ্কে পাটনার খবরে কলকাতার ইংরেজ শিবিরের প্রতিক্রিয়া দেখান হয়েছে। এ দৃশ্য সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কাউন্সিলের প্রস্তাবের ভুল অনুবাদ এই দৃশ্যের সংলাপে প্রকাশিত হয়েছে কি ভাবে তা একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে। সেইদিন কেউ উপবাসী থাকেন নাই বরঞ্চ ২রা নভেম্বর উপবাসের সংকল্প ঘোষিত হয়। এই দিনই মীরকাশিমের মাথার দাম একলক্ষ টাকা ও সমরুর চল্লিশ হাজার টাকা ঘোষিত হয়। এই দৃশ্যে জনৈক গঙ্গাগোবিন্দবাবুকে দেখান হয়েছে। ইনি যদি সুবিখ্যাত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হন তাহলে তাঁর উপস্থিতি কাল্পনিক। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কমপক্ষে দশ বছর পর কোম্পানীর চাকুরীতে যোগদান করেন। তাঁকে এই দৃশ্যে উপস্থিত করা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক।

অষ্টম গর্ভাঙ্কে বালকরূপী বেগমের সহসা রাজনীতি জ্ঞান এবং আলী ইব্রাহীমের সঙ্গে সংলাপ সম্পূর্ণ কাল্পনিক। এখানে কিন্তু একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় আলোচনা না করলে অন্যায় হবে। গিরিশচন্দ্র বেগমের মুখে ভাষণ দিয়েছেন যে হিন্দু হলেও মারাঠারাই প্রকৃত বন্ধু। এই উক্তি বিশেষ

প্রণিধানযোগ্য কারণ রাজ্যচ্যুত মীরকাশিম জাঠ, রোহিলা ও মারাঠাদের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যোগাযোগ করেন ১৭৬৪ থেকে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা, শিখ, জাঠ ও মুসলমানদের এক সর্বভারতীয় বিশাল-বাহিনী আলিগড়ে সম্মিলিত হল। ইংরেজ কোম্পানী এই বিরাট বাহিনীর মোকাবিলা করতে এলাহাবাদ পরিত্যাগ করে বাঁকীপুরে সৈন্য সমাবেশ করল। এইখানেই এই পরিচ্ছেদ শেষ। যে মুহূর্তে সকলে বুঝলেন যে মীরকাশিমের ধনরত্নের গল্প মিথ্যা এবং এই সৈন্যবাহিনীর এক সপ্তাহের বেতন দেবার ক্ষমতাও তাঁর নাই তখনই সকলে নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্থান করলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিমের সম্পর্কে এই খবর আবিষ্কৃত হয় নাই। গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ কল্পনার ভিত্তিতে মারাঠা সাহায্যের যে সংলাপ দিয়েছেন তা পরবর্তীকালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আশ্চর্য্যভাবে সত্য হয়ে উঠেছে। বক্সার যুদ্ধের পর মীরকাশিমের ভিখারীর মতো কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় মৃত্যুর খবরই প্রচলিত। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর প্রবন্ধে (প্রকাশকাল ১৯০৫ খ্রীঃ) এবং তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (পলাশীর পর বক্সার প্রকাশকাল ১৯৬৩ খ্রীঃ) তার পুস্তকে এই প্রচলিত কাহিনীই লিপিবদ্ধ করেছেন। বক্সার যুদ্ধের পর থেকে মীরকাশিমের আমৃত্যু কাহিনী অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ প্রকাশ করেছেন।[৭৩] অভিনয়ের সময় এই দৃশ্যটি বর্জিত হত। কাজেই গিরিশচন্দ্রের মণিষার এই অপরূপ পরিচয় জনসমক্ষে অপরিচিত হয়ে আছে।

নবম গর্ভাঙ্কে মীরকাশিমের সুজাউদ্দৌলার আশ্রয়লাভ এবং শাহাজাদার সঙ্গে যোগাযোগ দেখান হয়েছে। মীরকাশিমের অর্থ ও মণিমাণিক্যের উপর শাহাজাদার লোভ প্রকাশ করা হয়েছে। মীরকাশিমের মণি-মাণিক্যের লোভেই যে শাহাজাদা ও সুজাউদ্দৌলা তার পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন ও পরে তাকে পীড়নও করেছিলেন এটা এখন সর্বজন স্বীকৃত। এই দৃশ্য নাটকীয় কিন্তু ঐতিহাসিক নয়। বলা চলে অনেকদিনের অনেক ঘটনার সংক্ষিপ্তসার এই দৃশ্যে প্রকাশিত। স্বচ্ছন্দে দৃশ্যটিকে তাই ইতিহাস অনুসারী বলা চলে। তবে সব থেকে অনৈতিহাসিক বিষয় মেজর অ্যাডামসের পত্র। পাটনা জয়ের পরেই মেজর অ্যাডামস অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কলকাতায় ফিরে যান। নক্স তাঁর জায়গায় সেনাপতি নিযুক্ত হন।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী কলকাতায় অ্যাডামসের মৃত্যু হয়। অল্প কিছুদিন পরে নক্সও মারা যান তখন জেনিংস এ্যাকটিং জেনারেল নিযুক্ত হলেন এবং পরে মেজর কারন্যাক ইংরেজবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং মেজর অ্যাডামসের পক্ষে ডিসেম্বরে পত্র দেওয়া একান্ত অসম্ভব কারণ তিনি তখন কলকাতামুখী। বাদশাহ ও মীরকাশিমের সকাশে 'তারা'র প্রবেশ ও সাবধানবানী আর এক অসম্ভব ঘটনা। সর্বশেষ অসম্ভব ঘটনা ইংরেজ দূতকে ডেকে শাহাজাদার ইংরেজ বিদ্বেষ প্রকাশ। আসলে শাহজাদা সর্বদা ইংরেজের বন্ধুত্বই কামনা করতেন। এইখানেই চতুর্থ অঙ্কের সমাপ্তি।

৫॥ পঞ্চম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্ক গান। সময় ও ক্রীড়াসঙ্গিনীগণ 'আসমানে' গান গাইছেন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মীরজাফরের শিবিরে নবাব মীরজাফর, মণিবেগম ও মন্ত্রী নন্দকুমারের সঙ্গে আলোচনারত। মীরকাশিমের সাহায্যে অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীর শাহাজাদা আগিয়ে আসাতে মীরজাফর চিন্তিত। এই সংযোগ নষ্ট করার আবশ্যকতা অত্যন্ত জরুরী রূপ ধারণ করেছে। নন্দকুমার পরামর্শ দিচ্ছেন যে মীরকাশিমের কোষাধ্যক্ষ মীর সলিমানকে বশীভূত করে মীরকাশিমের সমস্ত গচ্ছিত ধন সুজাউদ্দৌলাকে পাইয়ে দেওয়া। এ বিষয়ে সুজাউদ্দৌলার লোভকে জাগিয়ে দিতে হবে। তাছাড়া মীরকাশিম সমরুকে সুজাউদ্দৌলাকে হত্যার আদেশ করেছিলেন একথা জানিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে মীরকাশিমের বিরোধ ঘটাতে হবে। ইতিমধ্যে দূত এসে খবর দিল যে নন্দকুমারের আর এক ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে। শাহাজাদা মীরজাফরকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবাদার বলে স্বীকার করেছেন। তিনি আসন্ন যুদ্ধে কোন পক্ষে যোগদান না করতে সিদ্ধান্ত করেছেন এবং সময় হলেই ইংরেজ আশ্রয় গ্রহণ করবেন। দূত আরও খবর এনেছে যে মীরকাশিম ও সুজাউদ্দৌলার মধ্যে বিরোধের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। মীরজাফর ও নন্দকুমার এই সব খবরে উৎফুল্ল হলেন। মণিবেগম জানালেন নন্দকুমার ইংরেজকে যুদ্ধে অগ্রসর হতে সম্মত করুন। তিনি অর্থবলে যেমন মীরকাশিমের সেনানায়কদের বশীভূত করেছেন তেমনি সুজাউদ্দৌলার সৈন্যদেরও বশীভূত করবেন। মীরকাশিমের কোষাধ্যক্ষ মীর সলিমানকে অর্থ দিয়ে বশীভূত করার জন্য নন্দকুমারকে আদেশ দিলেন। নন্দ-

কুমার ক্রটিহীন কাজের অঙ্গীকার করে মীরকাশিমের সর্বনাশ করতে চলে গেলেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মীর সলিমান জানালেন যে অধিকাংশ ধনরত্ন মহম্মদ ইশাখের কাছে। তবে তাঁর কাছে যা আছে তিনি তা সুজাউদ্দৌলার হাতে তুলে দিতে রাজী হলেন। ইতিমধ্যে শাহাজাদা স্বয়ং ছদ্মবেশে উপস্থিত হলেন। তিনি মীরজাফরকে দেওয়ানী সনন্দ দিতে এবং বকসারের যুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকতে রাজী হলেন। ইংরেজরা তাঁকে আবার দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করবে এই আশ্বাসে তিনি তখন অত্যন্ত আনন্দিত।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে সুজাউদ্দৌলা ও সমরু মীরকাশিমের সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে তার ধনরত্ন লুণ্ঠনের ষড়যন্ত্র করছেন। ইতিমধ্যে মীর সলিমান মীরকাশিমের ধনরত্ন সুজাউদ্দৌলাকে সমর্পণ করলেন। মীরকাশিম অভিযোগ করলে সুজাউদ্দৌলা সে অভিযোগ কর্ণপাত করলেন না উপরন্তু পাটনার যুদ্ধে সাহায্য না করার জন্য মীরকাশিমকে অভিযুক্ত কবলেন। সেনাবাহিনীর বেতন দেবার জন্যও মীরকাশিমকে তাগাদা দেওয়া হল। ক্ষুণ্ণ মনে মীরকাশিম প্রস্থান করলে সমরুকে মীরকাশিমের শিবির লুণ্ঠন করার আদেশ দেওয়া হল। রটনা করা হল যে মীরকাশিম সুজাউদ্দৌলাকে হত্যার সংকল্প করেছেন। পঞ্চম গর্ভাঙ্কে ফকিরবেশী মীবকাশিম অযোধ্যা ত্যাগে কৃতসংকল্প। অবশেষে আলী ইব্রাহীন-খাঁর মধ্যস্থতায় সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে মীরকাশিমের মিলন হল। নবাবী পরিচ্ছদ ও মুকুটে মীরকাশিমকে সজ্জিত করে সুজাউদ্দৌলা তাকে 'ধর্মভ্রাতা' বলে আলিঙ্গন করলেন। এই বন্ধুত্ব কপট বুঝেও মীরকাশিম বলছেন—'আশা নারি করিতে বর্জন, ইংরাজ বিদ্বেষ অগ্নিসম জ্বলে হৃদে।' মীরজাফরের বন্ধু সামসেরউদ্দীন মীরকাশিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রায়শ্চিত্ত করলেন সমুদয় সংবাদ আলী ইব্রাহীম খাঁকে জানিয়ে। সমরু মীরকাশিমের শিবির আক্রমণ করবে একথা আলী ইব্রাহীম বিশ্বাস না করায় তাকে মীরকাশিমের শিবিরে প্রেরণ করলেন। ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে সমরুর শিবির আক্রমণ, আলী ইব্রাহীমের বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা এবং মীরকাশিমের বন্দী হওয়া দেখান হয়েছে। পটপরিবর্তনে মীরকাশিম সমরুকে বলছেন যে তাকে তিনি যেরূপ বিশ্বাস করেছেন স্বদেশীয়দের তেমন করেন নাই তাই যোগ্য প্রতিফল পেলেন। •সপ্তম গর্ভাঙ্কে আহত আলী ইব্রাহীম ও বালকরূপী বেগম। বেগমের পরামর্শে আলী

ইব্রাহীম সমরুর সঙ্গে বন্দী মীরকাশিমকে মুক্ত করার এবং যুদ্ধের সময় সুজাউ-দ্দৌলার শিবির লুণ্ঠন করবার পরামর্শ করছেন। সমরুকে লুব্ধ করার জন্য আলী ইব্রাহীম বললেন যে মীরকাশিমের অধিকাংশ ধনরত্ন মহম্মদ ইসাখের কাছে। সুতরাং মীরকাশিম মুক্ত হলেই মহম্মদ ইসাখের কাছে যাবেন তখন সমরু তার পশ্চাৎধাবন করে ইসাখের গুপ্তস্থানের সন্ধান পাবেন এবং ধনরত্নও হস্তগত করতে পারবেন। সুতরাং মীরকাশিমকে মুক্তি দেবার জন্য সুজাউ-দ্দৌলাকে জানাতে হবে যে তার সৈন্যরা মীরকাশিম বন্দী থাকলে যুদ্ধ করতে রাজী নয়। বালকরূপী বেগম এই খবর অযোধ্যার নবাবকে জানালে তিনি এসে খবর দিলেন যে মীরকাশিমকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন আর একটা খঞ্জ হস্তী বাহন দিয়ে তাকে শিবির ত্যাগের অনুমতি দিয়েছেন। এইসব কথা শুনে আলী ইব্রাহীম সুজাউদ্দৌলাকে প্রতারণার পরিণাম সম্পর্কে কিছু ভাষণ দিয়ে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সুজাউদ্দৌলা এই ধার্মিক মুসলমানের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলেন।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক বক্সার যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা। ফকিরবেশী মীরকাশিম বনপথে পালিয়ে যাচ্ছেন পেছনে চলেছেন বালকবেশী বেগম। নবম গর্ভাঙ্কে বাদশাহ শাহ আলম ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী ও অযোধ্যার উজিরী প্রদান করতে মনস্থ করলেন। মেজর মন্‌রো এই প্রস্তাব কলকাতায় লিখে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মীরকাশিম সম্পর্কে মেজর মন্‌রো সাধুবাদ দিয়ে বললেন—'তিনি ইংরেজদের একজন উপযুক্ত শত্রু।' এমন সময়ে 'তারা' এসে শাহাজাদাকে ভারতের দুর্গতি দূর করতে না পারার জন্য দোষারোপ করলেন। মন্‌রো ন্যায়বান ইংরেজ জাতির গুণ-গান করে খোজা পিত্রুকে সাবধান করে দিয়ে বললেন কেউ যেন এই মহান ফকিরণীর উপর অত্যাচার না করে তাহলে পার্লামেন্টে তার ইমপিচমেন্ট হবে।

দশম গর্ভাঙ্ক অত্যন্ত নাটকীয়। কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ মীরজাফর ডাক্তার ফুলার-টনের চিকিৎসাধীন। মণিবেগম সতীসাধ্বীর মতো স্বামী সেবা করছেন। গভীর যন্ত্রণায় মীরজাফর বলছেন যে মণিবেগম যেন এই অভিশপ্ত সিংহাসনে তাঁর বালক পুত্র নজামউদ্দৌলাকে উপবেশন না করান। করলে তার জীবনও বিষময় হবে। ডাক্তার ফুলারটন সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথের ডাক্তারের মতো

মন্তব্য করছেন— unishment of sin may begin here but not end here.

একাদশ ও শেষ গর্ভাঙ্কে পর্ণকুটিরে বিকৃত মস্তিস্ক ভূপতিত মীরকাশিম জাগ্রত স্বপ্নে বাঙ্গলায় রামনারায়ণ ও জগৎশেঠের ষড়যন্ত্রকে প্রত্যক্ষ করে উত্তেজিত হচ্ছেন। এমন সময় 'তারা' এসে স্বান্ত্বনা প্রদান করছেন। অবশেষে তারার উপস্থিতি উপলব্ধি করে মীরকাশিম হতভাগ্য জন্মভূমির জন্য বার বার ক্ষোভ প্রকাশ করে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তারপর বেগম এসে স্বামীর মৃত্যুতে হাহুতাশ করে নিজেও মৃত্যুবরণ করলেন। কুটিরের মধ্যে একখানি ছিন্ন শাল পেয়ে 'তারা' সেইটি বিক্রয় করে সমাধির অর্থ সঞ্চয়ের সংকল্প ঘোষণা করলেন। এই দীন অবস্থায় মৃত্যু মীরকাশিম নাটকের সমাপ্তি ঘোষণা করল। চরমতম দুঃখের মধ্যে 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের' কাহিনী পরিসমাপ্ত হল।

আলোচনা ॥

পঞ্চম অঙ্কের বিস্তার অতি দীর্ঘ। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন পর্য্যন্ত। পাটনা ত্যাগের পর থেকে মীরকাশিমের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই অঙ্কের প্রতিপাদ্য। মীরকাশিমের জীবনের শেষ দিকে তার জীবনের গতি ভিন্ন পথ নিয়েছে। যুদ্ধের পর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যে ক্ষিপ্ত নবাব অসহায় বন্দীদের হত্যা করলেন, বকসারের যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে স্বয়ং দিল্লীর বাদশাহ ও অযোধ্যার পরাক্রান্ত নবাব যাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন সেই লোকটি যেন হঠাৎ হারিয়ে গেল। মহাজোট, কাগজের ফানুসের মতো উড়ে গেল। অযোধ্যার নবাব অর্থলোভে মীরকাশিমকে বন্দী করলেন। বাদশাহ দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত বকসারের যুদ্ধ হল সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর। নাটকের নায়ক মীরকাশিম তখন আগ্রা অভিমুখে পলাতক। চতুর্থ অঙ্ক পর্য্যন্ত নাটক একটা নির্দিষ্ট গতিপথে আগিয়ে গিয়েছে পঞ্চম অঙ্কে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে ঘটনার ঘূর্ণিতে বিভ্রান্ত হবার উপক্রম হয়েছে। এই অসুবিধা গিরিশচন্দ্র উপলব্ধি করেছেন এবং নাটকের হাল শক্ত হাতে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তবু অস্বীকার করা যায় না পঞ্চম অঙ্কে নাটক আদর্শচ্যুত। এই ত্রুটির জন্য গিরিশচন্দ্র যে একেবারেই দায়ী

নন একথা বলা বাহুল্য। নায়কের চরিত্রচ্যুতি নাটককে পানসে করেছে। মীরকাশিমের চরিত্রের এই দুর্বলতা নাট্যকার প্রাণপণে ঢাকা দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা তরঙ্গ আর একবার অনুসরণ করা যাক। ফেব্রুয়ারী মাসে সুজাউদ্দৌলা ইংরেজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন কবলেন। মার্চ্চ মাসে মীরকাশিমকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এপ্রিল মাসেই মীরজাফর বার্ষিক ২৮ লক্ষ টাকা রাজস্বের বিনিময়ে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হলেন। বাদশাহী পরোয়ানা উজীর সুজাউদ্দৌলা মারফৎ জারী হল। আবাব ওই মাসেই সুজাউদ্দৌলা ও বাদশাহব সঙ্গে মীরকাশিমের সন্ধি হল। ঘটনাক্রম যে কি রকম উল্টে পাল্টে চলেছে তা সহজেই বোঝা যায়।

মে মাসে সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধ সুরু হল। পাঁচ পাহারির যুদ্ধে মেজর কারন্যাকের হাতে মীরকাশিম, সুজাউদ্দৌলা, বাদশাহ শাহ আলম ও তাঁর কর্মচারী বেণী বাহাদুরের সম্মিলিত বাহিনীব পরাজয ঘটল। সম্মিলিত জোটের সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর এটাই প্রথম ও শেষ যুদ্ধ। জুন মাসেই মীরজাফরের পত্র নিয়ে নন্দকুমারের চর সুজাউদ্দৌলার শিবিবে। সেপ্টেম্বর পডতে না পডতেই সুজাউদ্দৌলা মীরকাশিমকে বন্দী করলেন। গুপ্ত-ধনের সন্ধানে প্রচুর পীডন করে ২১শে অক্টোবর তাকে মুক্তি দিলেন। মীর-কাশিম পলায়ন করলেন। পরদিন ২২শে অক্টোবর দুই বাহিনীর অধিনায়কতা করলেন সুজাউদ্দৌলা। বকসার যুদ্ধে হল প্রচণ্ড পরাজয়। ৭ই জুন ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সাহজাহানাবাদে উদরী রোগে মীরকাশিমের মৃত্যু হয়। মোটামুটি এই ঘটনার উপর ভিত্তি করেই পঞ্চম অঙ্ক রচিত।

এই অঙ্ক রচনাতেও গিবিশচন্দ্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত মীরকাসিম প্রবন্ধের ওপর নির্ভর করেছেন ফলে অক্ষয়কুমারের ভুলগুলিও প্রতিফলিত হয়েছে। একটি বড ভুল বাদশাহ শাহ আলমকে বার বার 'সাজাদা' বা শাহজাদা বলে ভ্রম করা। অক্ষয়কুমার কোথাও বাদশাহ কোথাও শাহজাদা লিখেছেন। গিরিশচন্দ্র কি হবে স্থির করতে না পেরে প্রবন্ধের ২০৭ পাতা অনুসারে সর্বত্র 'সাজাদা' ব্যবহার করেছেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মীরকাশিমের পতনের জন্য মীরজাফর, মণিবেগম ও নন্দ-কুমারের কুমন্ত্রণা দেখান হয়েছে। ইতিহাস এই ধরণের ঘটনার সাক্ষ্য রাখে

নাই তবে এ ধরণের ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। মীরজাফরের পত্রাদি যে নন্দকুমার রচনা করতেন এমন প্রমাণ বিরল নয়। সুতরাং মীরকাশিমের পতনের ষড়যন্ত্র আসলে মীরজাফর মারফৎ নন্দকুমারের ষড়যন্ত্র মনে করলে কোন ক্ষতি হয় না। মণিবেগমের কি অংশ জানা না গেলেও মীরকাশিমের পতনে তাঁর সৌভাগ্য সূর্য উদয় হল। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে মীর সোলেমনের বিশ্বাসঘাতকতাও অক্ষয়কুমার অনুসারী ঘটনা। অন্য কোথাও এ বিষয়ে কোন রকম উল্লেখ দেখার সৌভাগ্য হয়নি। (মীরকাসিম পাতা ২০৮) বক্সারের যুদ্ধের পর দীর্ঘ দশবৎসর মীরকাশিম নানা রকম রাজনৈতিক খেলা করেছেন। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বেশ কিছু অর্থ নিয়ে তিনি পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তার ভৃত্য সেখ মহম্মদ অসুর বিশ্বাসঘাতকতার মরুভূমিতে বিশ্বস্তার এক সজল উদাহরণ স্থাপন করেন। এই দৃশ্যে দিল্লীর বাদশাহকে বড হীনমান করা হয়েছে। নাট্যকার তাঁকে ছদ্মবেশে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধিতে উৎসুক দেখিয়েছেন। এই সব বিবেচনায় এই দৃশ্যটিকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা যেতে পারে। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সমরু ষডযন্ত্র করছেন। উদ্দেশ্য মীরকাশিমের ধনরত্ন অপহরণ। সমরুর বিশ্বাসঘাতকতা ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত। সুজাউদ্দৌলা যখন মীরকাশিমের শিবির লুণ্ঠন করান তখন জেনানাদেরও বাদ দেন নাই। মীরকাশিমকে বন্দী করা হল এবং গুপ্তধনের সন্ধানে অসহ্য পীড়ন করা হয়। কথিত আছে যে একদিন এক কড়াই ফুটন্ত গরম জলের ওপর মীরকাশিমকে বসিয়ে দেওয়া হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় মীরকাশিম চিৎকার করে তাকে বধ করবার অনুরোধ জানান। মীরকাশিমকে বন্দী করে রাখলে অসুবিধা হতে পারে মনে করে সুজাউদ্দৌলা তাকে বিদায় দেন। তাঁকে আর তার পরিবারবর্গকে বহন করার জন্য একটা খোঁড়া হাতিও তাঁকে দেওয়া হল। তাতে চড়েই মীরকাশিম আগ্রা অভিমুখে প্রস্থান করেন। এই দৃশ্যে আলী ইব্রাহীম ও বালকরূপী বেগমের ঘটনা গল্প। নাটকের রঙ লাগিয়ে অজানা বেগম চরিত্রের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি আনার জন্যই উপস্থাপিত। আলী ইব্রাহীমের মহত্ব ও ত্যাগ মীরকাশিমের জন্য দরদ প্রকাশের জন্যই আনা হয়েছে। এই সময় আলী ইব্রাহীমের কোন খবর ইতিহাসে পাওয়া যায় না এমনকি তিনি পাটনা ত্যাগ করেছিলেন এমন প্রমাণ নাই।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম গর্ভাঙ্কে মীরকাশিমের লাঞ্ছনা দর্শক সমক্ষে উপস্থাপিত। পঞ্চম অঙ্কে সুজাউদ্দৌলার কপটতা দেখান হয়েছে। তিনি মীরকাশিমকে ধর্মভ্রাতা বলে কোরাণ স্পর্শ করে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং পরে মীরকাশিম তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছেন বলে তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। এই দৃশ্যে তিনি হত্যার ষড়যন্ত্র মিথ্যা বলে বিশ্বাস করে মীরকাশিমকে আবার ধর্মভ্রাতা বলে আলিঙ্গন করছেন। ফকিরী পোষাক ফেলে দিয়ে নবাবী পোষাকে তাকে সজ্জিত করছেন। খুবই নাটকীয় দৃশ্য বটে। কিন্তু ঘটনাক্রমে গোলমাল থাকায় একটু বিভ্রান্ত হতে হয়। সমস্ত ঘটনাটি ঘটেছিল কয়েক-মাস আগে অর্থাৎ ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। উপলক্ষ্য মীরজাফরের সুবেদারী লাভ। তখনই সুজাউদ্দৌলা মীরকাশিমকে ধর্মভ্রাতা বলে আলিঙ্গন করেন ও তাঁকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হন। সমরুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ওই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের আগে ঘটে নাই। মীরকাশিমের কাছে প্রচুর ধনরত্ন আছে এবং তাকে পীড়ন করলেই সুজাউদ্দৌলা সেগুলি হস্তগত করতে পারবেন এই খবর মীরজাফর গোপনে সুজাউদ্দৌলাকে জানিয়ে দেন বলেই সন্দেহ করা হয়। মীরজাফরের এই পত্র রচনা করেন তাঁর মন্ত্রী মহারাজ নন্দকুমার। আপাতদৃষ্টিতে কেবল মীরকাশিম বিরোধী হলেও এই পত্র রচনার আর এক গভীর উদ্দেশ্য ছিল। নন্দকুমার বুঝেছিলেন যে মীরকাশিমকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করতে হলে সুজাউদ্দৌলার পরাজয় প্রয়োজন। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সুজাউদ্দৌলার প্রচণ্ড লোভ জাগিয়ে দিতে পারলে তিনি মীরকাশিমকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন বক্সারে ইংরেজ সৈন্য সমাবেশ লক্ষ্য করবেন না। তাই সেপ্টেম্বর মাসে সুজাউদ্দৌলা মীরকাশিমের ওপর অত্যাচার করতে লাগলেন। অক্টোবর মাসে বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হলেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম গর্ভাঙ্কে মীরকাশিমের প্রতি অত্যাচারের শেষে আলী ইব্রাহীম সমরুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মীরকাশিমের মুক্তি দাবী করলেন। মীরকাশিমকে সুজাউদ্দৌলা মুক্তি দিলেন এবং তাকে বহন করার জন্য একটা খোঁড়া হাতি দিলেন। নাটকের প্রয়োজনে এই দৃশ্য দুইটি এসেছে। বেগম ও আলী ইব্রাহীমের ঘটনার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। একমাত্র খোঁড়া হাতি ছাড়া অন্য ঘটনাগুলি কাল্পনিক।

নাটক নিয়েও গিরিশচন্দ্র অসুবিধায় পড়েছেন। বক্সারে মীরকাশিম শেষ যুদ্ধ করলে নাটকের সুষ্ঠু সমাপন হতে পারত। বক্সার যুদ্ধের আগের দিন মীরকাশিমকে সরিয়ে দেওয়া হল। তিনিও ভবিষ্যৎ লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য পলায়ন করলেন। চরিত্রচিত্রণে এই অসুবিধা ঢাকবার জন্যেই মীরকাশিমের লাঞ্ছনাকে বিশেষভাবে দেখান হয়েছে। এই কষ্টভোগের মধ্যে দিয়েই মীরকাশিমের জীবনের চরমতম ট্র্যাজেডী সৃষ্টির প্রয়াস হয়েছে। ফলে নাটকের কেন্দ্রচ্যুতি সম্পূর্ণ হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে প্রথম চার অঙ্কে মীরকাশিম ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার প্রজাদের রক্ষা করবার সংকল্প নিয়ে যুদ্ধ করেছেন, হত্যা করেছেন নিরস্ত্র বন্দীদের এমন কি বেগমকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নাই। পঞ্চম অঙ্কে আর সে সব কথা নাই। সুজাউদ্দৌলা এই অঙ্কের নায়ক তিনি মীরকাশিমের ধনরত্নগুলি পাবার আকাঙ্খায় কোন অন্যায় কাজকেই অবাঞ্ছনীয় মনে করেন না। স্বীকার করতে হবে যে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে থাকতে চেয়েছেন বলেই পঞ্চম অঙ্কে এই অসুবিধার সন্মুখীন হয়েছেন। পরবর্তী নাট্যকারদের মতো কল্পনার রঙিন পাখায় উড়ে গেলে তিনি সহজেই অপূর্ব ঘাত প্রতিঘাত পূর্ণ এক পঞ্চম অঙ্ক সৃষ্টি করতে পারতেন। গিরিশচন্দ্র তা করেন নাই বলেই আমাদের নমস্য। নানা অসুবিধা সত্বেও তিনি ঐতিহাসিক ঘটনা অনুসারেই নাটক রচনা করেছেন। সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি বা চরিত্র চিত্রণে স্বাধীন মতামত পোষণ করলেও ঐতিহাসিক নাটক রচনার সমস্ত নিয়ম তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করে ঐতিহাসিক নাটক রচনার দিগ্‌দর্শন করে গেছেন।

অষ্টম গর্ভাঙ্কে বক্সার যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা। বন পথে ফকিরবেশী মীরকাশিম পলায়ন করছেন এবং বালকরূপী বেগম তার পেছনে পেছনে চলেছেন। টিকা নিষ্প্রয়োজন। নবম গর্ভাঙ্কে শাহ আলম বক্সার যুদ্ধ জয়ে ইংরেজদের সাধুবাদ দিচ্ছেন ও বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী ও অযোধ্যায় উজিরি দেবার প্রস্তাব করছেন। বক্সার যুদ্ধের প্রায় একবছর পরে ১২ আগষ্ট ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ শাহআলম বাংলা বিহার উড়িষ্যায় দেওয়ানী সনন্দ ইংরেজ কোম্পানীকে প্রদান করেন। অযোধ্যায় উজিরি দেবার কোন প্রস্তাব হয়েছিল বলে জানা যায় না। অযোধ্যা আর কয়েক বছর স্বাধীন

ছিল এবং ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যায় ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপন করা হয়। তবে বিহারের প্রত্যন্ত সীমা বারাণসী পর্যন্ত টেনে দেওয়া হয় এবং তদনুযায়ী কাশীরাজ বলবন্ত সিংহ ইংরেজ কোম্পানীর অধীনস্থ জমিদারে রূপান্তরিত হন। দশম গর্ভাঙ্কে মীরজাফরের কুষ্ঠরোগ ইতিহাস সম্মত ঘটনা তবে এই দৃশ্যটি কাল্পনিক। ডাক্তার ফুলারটন কখনও মীরজাফরের চিকিৎসা করেন নাই এবং মণিবেগমকে কেউ সতীসাধ্বীরূপে বা মীরজাফরের সেবারতা মহিষী ভাবেন নাই। বরঞ্চ উল্টোটাই শোনা গেছে। মণিবেগম অত্যন্ত দুশ্চরিত্র মহিলারূপেই আখ্যাত হয়েছেন। বলা হয়েছে নবাবী আবাসকে তিনি দেহ বিলাসীর ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত করেন এমনকি পরবর্তী নবাব নাজামদ্দৌলা মীরজাফরের ঔরসজাত পুত্র নন এ অভিযোগ করা হয়। অতিবৃদ্ধ অসুস্থ অহিফেনসেবী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মীরজাফর সন্তান উৎপাদনে অক্ষম একথাও বারবার বলা হয়েছে। কাজেই এই কাল্পনিক দৃশ্য অবতারণায় মণিবেগমকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে তা আদৌ তাঁর প্রাপ্য কিনা সে বিষয়ে গবেষণার অবকাশ আছে। মীরজাফর-মণিবেগম সংলাপও কাল্পনিক।

শেষ দৃশ্যে মীরকাশিমের পর্ণকুটিরে মৃত্যু সত্য। উন্মাদ অবস্থায় মৃত্যু সত্য নয়। 'তারা' বা বেগমের সেখানে উপস্থিতিও কাল্পনিক। 'তারা' যে সম্পূর্ণ নাটকীয় চরিত্র তা বহুবার আলোচনা করা হয়েছে। বেগম মীরকাশিমের মৃত্যুর কিছুদিন আগে মারা যান সুতরাং তার উপস্থিতি অসম্ভব।

১৭৬৫ থেকে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ মীরকাশিম ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয়েছেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিম রাজপুতানায় অবস্থান করেন এবং নেপাল যাবার চেষ্টা করে বিফল হন। এই সময় গবর্ণর জেনারেল ও তাঁর পুরাতন বন্ধু ওয়ারেন হেস্টিংসকে এক পত্র লিখে জানান যে তাঁকে কেন্দ্র করে এবং তার নাম ব্যবহার করে যে সব ষড়যন্ত্র হচ্ছে তার সঙ্গে তিনি কোনভাবেই যুক্ত নন। অথচ এগুলিকে বন্ধ করবার তাঁর কোন ক্ষমতা নাই। তারপর ৭ই জুন ১৭৭৭ তাঁর মৃত্যু হলে তার দুই পুত্র গুলাম উরাইজ জাফারি ও মহম্মদ ওয়াকিরুল হুসেণী ফরাসী গবর্ণর মঁসিয়ে শেভেলিয়রকে জানান যে তাদের পিতার শেষকৃত্য করার ক্ষমতা তাদের নাই। সম্ভবত ফরাসী সাহায্যেই মীরকাশিম কবরস্থ হন। সাজাহানাবাদে (দিল্লীর নিকট) তাঁর মৃত্যু হয়। সুতরাং নাটকের শেষ দৃশ্য কাল্পনিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাংলার ভূতপূর্ব নবাব ভারতের রাজনৈতিক শতরঞ্চ খেলার ঘুঁটিতে রূপান্তরিত হলেন এবং দীনদরিদ্র অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হল এর থেকে বিয়োগান্ত ঘটনা আর কি হতে পারে। নাটকের নায়ককে সুষ্ঠুভাবে গিরিশচন্দ্র যে পরিণতি দিয়েছেন তা কাল্পনিক হলেও ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপন্থী নয়। পঞ্চম অঙ্কের ঘটনাগুলিকে বিয়োগান্ত নাটক সৃষ্টির কাজে গিরিশচন্দ্র যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা সত্যিই লক্ষণীয়। তার কল্পনাও কখনও নিয়মিত ঘটনাবলীকে লঙ্ঘন করে অসম্ভবের পর্য্যায়ে পড়ে নাই।

নানা ঐতিহাসিক ঘটনায় কণ্টকিত হয়ে নাটকের গতি মাঝে মাঝে ব্যাহত হযেছে সত্য তবু সমগ্রভাবে বিচার করলে স্বীকার করতে হবে যে 'মীরকাসিম' এক সার্থক ঐতিহাসিক নাটক। নাটক হিসাবে বিভিন্ন ঘটনা তরঙ্গ থাকা সত্ত্বেও রচনার মনোহারিত্ব ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের দর্শকের মতো আজও স্বীকার না করে পারা যায় না।

মীরকাসিম নাটকে গিরিশচন্দ্র পরাধীন জাতির বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এক দেশভক্ত প্রজাবৎসল নবাব সৃষ্টি করে তিনি ইংরেজ শাসক-গোষ্ঠিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেছেন। ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে স্পষ্ট দেশাত্ম-বোধক এই নাটক জনসাধারণের মনকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল। তাই সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ গর্ভনমেণ্ট ভয় পেয়ে এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেন ও নাটক বাজেয়াপ্ত করেন। সময় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী। মীরকাশিম নাটক অভিনয় চলাকালীনই গিরিশচন্দ্রের সিরাজদৌল্লার অভিনয় নিষিদ্ধ হয় ও বই হয় বাজেয়াপ্ত। 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাসিমের' জন-প্রিয়তা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল যে মীরকাশিমের নাম শুনলেই ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে উঠতেন। মীরকাশিম নাটকের এক প্রধান চরিত্র হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' মীরকাশিমকে ঘিরে থাকার জন্যই নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত হয় বলা চলে। তা না হলে এমন ব্যর্থ নাটককে বন্ধ করার কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। গিরিশচন্দ্র দুইটি নাটক মারফৎ দেখিয়ে-ছেন যে সার্থক ঐতিহাসিক নাটক কিভাবে লেখা উচিত। মীরকাশিম চরিত্র আলোচনার সময় দেখা যাবে যে পরবর্তী লেখক বিশেষ নাট্যকারগণ কেমন ইতিহাস পাঠ না করেই মীরকাশিমকে নিয়ে নাটক লেখার চেষ্টা করেছেন।

সেইসব ব্যর্থ প্রচেষ্টার হাস্যকর কীর্তিকলাপ আলোচনা করার আগে আরেক বিষয় আলোচনার প্রয়োজন। দুইটি নাটকের মধ্যে দিয়ে গিরিশচন্দ্র মীরজাফরকে এক চরম বিশ্বাসঘাতক চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অতি সাবধানী ঐতিহাসিক ভিন্ন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী যুগের বহু ইতিহাস রচয়িতা নির্দ্বিধায় মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুত বাংলাভাষায় বিশ্বাসঘাতকতার আর এক নাম হয়েছে মীরজাফর। রাজনীতি ও সংবাদ-পত্র মারফৎ প্রসারিত ও প্রচারিত হয়ে মীরজাফর সর্বকালের এক প্রচণ্ড বিশ্বাসঘাতকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। পরবর্তীকালের সাহিত্যিক ও নাট্যকার-গণ উৎসাহের প্রাবল্যে মীরজাফরকে সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে এমনকি আলিবর্দী খাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত দেখিয়েছেন। থিয়েটারে যাত্রায় বা সিনেমায় মীরজাফর খাঁর খলচরিত্র সুঅভিনয়ে পরিস্ফুট করা হয়েছে। আজ মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না বলা প্রায় গঙ্গায় জল নাই বলার মতো অসম্ভব কথা। কিন্তু দুই কথাই সত্য। একমাত্র বর্ষার কয়েকমাস ছাড়া রাজমহলের গঙ্গার একফোঁটা জলও ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের কলকাতার গঙ্গার আসত না (ফরাক্কা হবার আগে)। অর্থাৎ গঙ্গানদীতে গঙ্গার জল নাই। তেমনি ইতিহাস বিচারে মীরজাফর খাঁকে বিশ্বাসঘাতক ছিলেন বলার আগে একটু ভাবতে হবে। তিনি লোভী ছিলেন, বিলাসী ছিলেন, দুশ্চরিত্র ছিলেন সত্য কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করার কোন প্রমাণ নাই। সিরাজদ্দৌলার ঐতিহাসিকতা আলোচনার সময় বলা হয়েছে যে মীরজাফর খাঁ নবাব আলিবর্দীর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যায় মীরজাফর একজন প্রধান উদ্যোক্তা। বর্গীর হাঙ্গামার সময় মীরজাফরের সাহসীকতার পরিচয় পেয়েই আলিবর্দী খাঁ তাকে প্রধান সেনাপতির পদ দেন। সৈন্য-বাহিনীতে মীরজাফর অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন বলেই সিরাজদ্দৌলা যুদ্ধের সময় বার বার তার শরণাপন্ন হয়েছেন। দৌহিত্রের হাবভাব দেখে ভীত হয়েছিলেন বলেই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে নবাব আলিবর্দী খাঁ মহবৎজঙ্গ মীরজাফরের হাতেই তার দুর্বিনীত নাতিকে সমর্পণ করেন। পরবর্ত্তী ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। নবাবী পাবার একমাসের মধ্যে মীরজাফর পদচ্যুত হলেন। নবাবের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র সুরু হল তাতে মীরজাফর যোগদান করেন সবশেষে। একথা নিশ্চিত ভাবেই বলা চলে মীরজাফর ষড়যন্ত্রে যোগদান না করলে ইংরেজ কোম্পানী

কদাচ নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহসী হতেন কিনা সন্দেহ। তখনকার কলম পেশা ইংরেজ কেরানী স্বেচ্ছায় মসী ছেড়ে অসি ধরতেন না। পলাশীতে মীরজাফর উপস্থিত ছিলেন সিরাজদ্দোলার সনির্বন্ধ অনুরোধে। যুদ্ধ না করার কতকগুলি সর্ত সাপেক্ষে। বরঞ্চ যুদ্ধ ক্ষেত্রে মীরজাফরকে দেখে স্বয়ং ক্লাইভ প্রমুখ ইংরেজ কর্তারা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ক্লাইভ স্পষ্টই লিখে গেছেন যে ওয়াটসের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করলেও মীরজাফর যে মত পালটে নবাব পক্ষে যুদ্ধ করতে আসেন নাই এটা বুঝতে তার সময় লেগেছিল। পলাশীর পর মীরজাফর নবাব হলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর উপাধিটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিজেকে মহবৎজঙ্গ বললেন তারপর অন্য নবাবদের মতো সুরা সম্ভোগ আর বিলাসে মত্ত হয়ে উঠলেন। নাটক লেখার চরিত্র বটে। কঠিন সৈনিক-জীবনের পর বিলাসিতা প্রায় বাতুলতার পর্য্যায়ে এসে গেল। মদ্য নারী আফিঙ কোকেন প্রভৃতি নেশার কোন উপকরণ বাদ গেল না। ফলে দেশে নৈরাজ্য অবশেষে নবাবী গেল। এই সময় থেকেই মীরজাফর নন্দকুমারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। পরবর্তীকালে কলকাতা প্রবাসে বা নবাবীতে পুনরায় নিযুক্তির সময় নন্দকুমার তাঁর সব থেকে বিশ্বাসী ও নিকটতম সুহৃদ। এই সময় থেকেই মণিবেগমের প্রভাব বৃদ্ধি ও শেষজীবনে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যু। রোগের যন্ত্রণায় নন্দকুমারই তাঁর চিকিৎসক। তার কথায় হিন্দুর কালীমন্দিরের চরণামৃত পান করেছেন। কোথাও একজন কঠোর বিশ্বাস-হন্তাকে পাওয়া যায় না বরঞ্চ কর্ত্তব্য বিমুখ এক লুব্ধ কামুকের ছবি বার বার ভেসে ওঠে। গিরিশচন্দ্র মীরজাফরকে এমন রঙে বিশ্বাসঘাতক সাজিয়েছেন যে এখন সে রঙ তুলে ফেলা মুস্কিল। এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য গিরিশ-চন্দ্রকে যোগ্য মর্য্যাদা দেওয়া হয় নাই। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মীরজাফর চরিত্রমাত্র কিন্তু পরে কার সাধ্য বিশ্বাসঘাতক বলে কটুবাক্য না বলে মীরজাফর চরিত্র সৃষ্টি করে।

ক্ষীরোদ প্রসাদ : পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত

মীরকাশিম সম্পর্কীয় তৃতীয় নাটকের রচয়িতা ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ। নাটকের নাম 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' প্রকাশ কাল গিরিশচন্দ্রের মীরকাশিমের মাত্র একবছর পর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। যতদূর খোঁজ পাওয়া গেছে

তাতে মনে হয় এই নাটকটি কখনও অভিনয় হয় নাই তারপর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পর সরকারী আদেশে বাজেয়াপ্ত হয়। দুইটি প্রশ্ন স্বভাবত জাগে। প্রথম গিরিশচন্দ্রের মীরকাশিমের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা সত্বেও কেন এক বছরের মধ্যে মীরকাশিম সম্পর্কে আর এক নাটক সৃষ্টি হল আর হল যদি তাহলে অভিনয় হল না কেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অন্যের সৃষ্ট জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়েছেন বার বার। সীতারাম দেখে তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রতাপাদিত্য নাটক। গিরিশের সিরাজদ্দৌলার ছাপ পড়েছে ক্ষীরোদপ্রসাদেব 'বাংলার মসনদে'র সরফরাজ খাঁর ওপব আর মীরকাসিমের অপূর্ব আলোয়, বাঙালীব মনের ভাবালুতাকে নিঙরে গিরিশচন্দ্রের মেধার পূর্ণ সুযোগ কেবল অর্থকরী-রূপে ব্যবহার করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত। এই নাটক বচনাব পেছনে সমসাময়িক কালের উত্তেজনার উত্তাপ আছে। ক্ষীরোদপ্রসাদেব এই নাটক বচনা এবং তা অভিনয় না হবার পেছনে বঙ্গ রঙ্গালযেব যে লজ্জাকর ইতিহাস আছে তা না জানলে এই নাটকের সৃষ্টি রহস্য বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে।

একটু বিশদভাবে বলা যাক। ১৯০৫ ৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের দুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তির মধ্যে চলেছিল ঘোব মনোমালিন্য। কেবল ব্যবসায়ী পর্য্যায়ে এই বিদ্বেষ সীমিত না থেকে ব্যক্তিগত গালিগালাজে রূপান্তরিত হল। নাটকের মাধ্যমেও বিদ্বেষের প্রসার বেড়ে চলল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'সীতারাম' অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমরেন্দ্র নাথ দত্তর যে বিরোধ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সেটা প্রকট আকার ধারণ করল। সিরাজদ্দৌলা অভিনয়েব সময় অদ্ভুত এক কাণ্ড হল। যে রাত্রে অর্থাৎ ২৭শে জানুয়ারী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা মঞ্চে তাঁর নাটকের উদ্বোধন করলেন সেই রাত্রেই ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথও গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলার অভিনয় সুরু করলেন। ভূমিকা লিপিতে: সিরাজ—অমরেন্দ্র নাথ দত্ত, মির্জাফর—নটবর চৌধুরী করিমচাচা—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, দানসা ফকির—নৃপেন্দ্র চন্দ্র বসু, ক্লাইভ—মনোমোহন গোস্বামী, মোহনলাল—হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, ঘেসেটী—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী), জহরা—কুসুমকুমারী, লুৎফউন্নিসা—বিনোদিনী।[৭৪]

বলাবাহুল্য দুই মঞ্চে একই নাটকের অভিনয় দর্শকদের বিভাগ করে দিল। মিনার্ভায় সিরাজের ভূমিকায় দানীবাবুর অপূর্ব অভিনয় সত্বেও ক্ল্যাসিকের সঙ্গে

প্রতিযোগীতা করে মিনার্ভায় সিরাজদ্দৌলা বেশীদিন চালান সম্ভব হল না। গিরিশচন্দ্র কালক্ষেপ না করে 'মীরকাসিম' লিখলেন এবং মহলার সময় এই নূতন নাটকের কপি যাতে অমরেন্দ্রনাথ না পেতে পারেন তার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। গিরিশচন্দ্র নূতন নাটক মহলায় ফেলেছেন এবং সে নাটকে মীরকাসিম চরিত্রে দানীবাবু অভিনয় করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এ খবর অমরেন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ অমরেন্দ্রনাথের অনুরোধে অথবা নিজে ইচ্ছা করে মীরকাশিমকে প্রধান চরিত্র করে 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' রচনা করেছিলেন তা জানবার আজ আর কোন উপায় নাই। তবে গিরিশ-অমরেন্দ্রের মঞ্চ মন্থনেই এই নাটকের উৎপত্তি হয়েছে স বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। দুঃখের বিষয় ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটক রচনা শেষ হতে না হতেই অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ক্ল্যাসিক থিয়েটার ছেড়ে চলে গেলেন।

পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত থিয়েটার মহলে 'অপয়া' অপবাদ কিনল। কয়েক-মাসের মধ্যেই অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নিদারুণ অসুস্থ হয়ে মঞ্চ জগৎ থেকে অবসর নিলেন (অগাষ্ট ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ)। ফলে কেউ আর এই নাটক অভিনয় করবার কথা ভাবতে পারলেন না। পরবর্তীকালেও অর্থাৎ ১৯০৭ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, বাজেয়াপ্ত হবার আগে, অভিনয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

গিরিশচন্দ্রের ইতিহাস নির্ভর 'মীরকাসিম' নাটকের পর ক্ষীরোদপ্রসাদের এই ইতিহাস গন্ধী রূপকথা বাংলা নাটকের বিবর্তনের ইতিহাসে এক অদ্ভুত প্রলাপ মনে হয়। পলাশীর পরবর্তীকালের ঘটনা নিয়ে নাটক লিখতে বসে ক্ষীরোদপ্রসাদ কোন ইতিহাস পাঠ করেছিলেন এমন সন্দেহ করা চলে না। তিনি গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা দেখে কল্পনার কড়াইএ জাল চড়ালেন তারপর কয়েকটা ঐতিহাসিক নামের ফোড়ন দিয়ে সেই গ্যাঁজলা বঙ্গনাট্য পিপাসুদের কাছে 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' নামে প্রকাশ করলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের পক্ষে বলা চলে যে তিনি এই নাটককে কোথাও 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দেন নাই। নাট্য চরিত্রে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের প্রাচুর্য্য থাকায় জনসাধারণের পক্ষে এই রচনাকে শুধুমাত্র এক 'কাল্পনিক কথকথা' বলে মনে করা সম্ভব হবে না একথা তাঁর মনে রাখা উচিত ছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভীত বৃটিশ সরকার অন্য

নাটকের সঙ্গে এটিকে বাজেয়াপ্ত করে এই প্রক্ষিপ্ত রচনাকে আশাতীত সম্মানে ভূষিত করলেন।

পলাশীর প্রায়শ্চিত্তর গল্পাংশ বিবেচনা করলেই নাটকের বাতুলতা প্রমাণিত হবে। নাটক পঞ্চাঙ্কে সমাপ্ত পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৭, এছাড়া মুখপত্র ও নাট্যচরিত্র বর্ণনা আরও ৪ পৃষ্ঠা. প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। প্রথম অঙ্ক ১ থেকে ৬২ পাতা ছয়টি দৃশ্যে সমাপ্ত, দ্বিতীয় অঙ্ক ৬৩ থেকে ১০৩ পাতা দৃশ্য সংখ্যা সাত, তৃতীয় অঙ্ক ১০৪ থেকে ১৪৪ পাতা দৃশ্য সংখ্যা ছয়, চতুর্থ অঙ্ক ৪৫ থেকে ১৮৩ পাতা দৃশ্য সংখ্যা ছয়, পঞ্চম অঙ্ক ১৮৩ থেকে ২১৭ পাতা দৃশ্য সংখ্যা সাত।

গোড়া থেকেই আষাঢে গল্প। পলাশীর পর মীরজাফর নবাবী করছেন। তাঁর মন্ত্রী হলেন রাজা রাজবল্লভ আর সেনাপতি হলেন তকী খাঁ। নবাব তকী খাঁকে জানাচ্ছেন যে তাঁর নিজের জামাতা মীরকাশিমকে বঞ্চিত করে ওই পদ তাকে দিয়েছেন (পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত পাতা ৩)। সৈন্যরা নবাবীমহল দীর্ঘ দিনের বেতন বাকী থাকার জন্য বেরোযা করেছে একথা নবাব বিশ্বাস করছেন না উপরন্তু তকী খাঁকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ করছেন। জানা গেল যে নবাব বিহারের শাসনকর্তা রাজা রামনারায়ণের কাছে হিসাব চেয়েছেন। নবাবপুত্র মীরণ এসে অভয়বানী শোনাচ্ছেন। বলছেন তিনি এই মাত্র ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে কথা বলে এলেন। ক্লাইভ বলেছেন কাউকে কোন টাকা পয়সা না দিয়ে আগে কোম্পানীর দেনাটা শোধ করে ফেলুন (পঃ পঃ পাতা ৭)। মীরণের ঘসেটি ও আমিনা বেগমকে ঢাকা পাঠানর প্রস্তাব নবাব সমর্থন করলেন কিন্তু 'বাঁদী বেগম' (পঃ পঃ পাতা ৮) লুৎফউন্নিসাকে মুর্শিদাবাদেই রাখতে বললেন। তখন মীরণ মীরকাশিমকে বর্তমানে রংপুরের ফৌজদারীর সঙ্গে পূর্ণিয়ার ফৌজদারী দেবার সুপারিশ করলেন এবং নবাব রাজী হলে স্বাগত ভাষণে স্থির করলেন যে রংপুর থেকে পূর্ণিয়া আসার পথে মীরকাশিমকে হত্যা করাবেন। (প. পঃ পাতা ১১) মোহনলালকে হত্যা করার সংকল্পও মীরণের ভাষণে পাওয়া গেল। এছাড়া নূতন ইতিহাসও কিছু জানা গেল যে ফৈজী মোহনলালের ভগ্নি আর মোহনলালের অপূর্ব সুন্দরী কন্যা মতিবিবির প্রতি স্বয়ং নবাব মীরজাফর আসক্ত (পঃ পঃ পাতা ১২)। রাজা রাজবল্লভ নবাবের কাছে এলে মীরণ অত্যন্ত

উষ্মা প্রকাশ করলেন। রাজা রামনারায়ণের মতো অবিশ্বাসীকে গৃহে আশ্রয় দিয়েছেন বলে রাজবল্লভকে ভর্ৎসনা করলেন। রাজবল্লভ মীরণের ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। জানালেন তিনি ও বর্তমান নবাব একই সময় নবাব সিরাজদ্দৌলার বেতনভোগী ছিলেন। এখন নবাব হয়েও মীরজাফর তাঁর যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে থাকেন। নবাবজাদা যদি তাঁর প্রতি বিরূপ-ভাবাপন্ন হন তাহলে খুবই দুঃখের বিষয়। মীরণের তর্জনগর্জন প্রশমিত না হওয়ায় রাজবল্লভ জানালেন যে রাজা রামনারায়ণ স্বেচ্ছায় তাঁর বাড়ী থেকে বিদায় না নিলে তিনি তাকে চলে যেতে বলবেন না এবং তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য নবাবী বাহিনী প্রেরিত হলেও তিনি তাদের বিরোধিতা করবেন। প্রথম দৃশ্যের নবাবী প্রসাদ ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যে মোহনলালের উদ্যানে যেতে হবে। মোহনলাল কন্যা মতিবিবির সঙ্গে আলোচনারত। তিনি পলাশীর যুদ্ধে নিজের অসতর্কতার জন্য সদা মুহ্যমান। বলছেন মীরজাফরের কথা শুনে তিনি যদি অস্ত্র সংবরণ না করতেন তাহলে লড়াই জিতে তারপর পরাজিত হতে হতনা (পঃ পঃ পাতা ১৭)। মোহনলাল কন্যার মর্য্যাদার জন্য চিন্তিত হচ্ছেন। কন্যা জানাচ্ছেন যে 'আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবো, তবু গোলাম মীরজাফরের ঘরে কখন যাবো না।······আমরা নাচওয়ালীর জাত, আমাদের অনেকেরই বিবাহ হয় না' (পঃ পঃ পাতা ১৭)। মোহনলালের চিন্তা যে তাঁর ভগিনী ফৈজীর কলঙ্ক উচ্চবংশীয়দের ঘরে কন্যার বিবাহ অসম্ভব করে দিয়েছে অথচ তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলার একজন 'প্রধান ওমরাও' সুতরাং সামান্য ঘরেও কন্যা সমর্পণ করতে পারবেন না। পলাশীর পরাজয় ও বাংলার গ্লানি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করে মোহনলাল প্রস্থানের আগে কন্যাকে উপদেশ দিলেন যে যদি সে কখনও আত্মরক্ষায় অসমর্থ হয় তবুও যেন কখনও কোন গৃহস্থের ঘরে আশ্রয় নিয়ে সেই পরিবারকে বিপদগ্রস্থ না করে। ফৈজীর শিক্ষায় শিক্ষিত মতিবিবির সংলাপ—'আমরা নটীর জাত পিসি বলত মানুষকে ভোলাবে, ভুলবে না। প্রাণ ঢেলে দেবে কিন্তু ছেড়ে দেবে না। কাশ্মীরে থাকলে পিসির মতন বাইজী হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হত।·· ··ওমরাও পুত্রীর ধর্ম রাখবো বলেছি রাখবো। তাহলে বংশানুগত সম্পদ বাইজীর প্রাণ—কঠোরতা ছেড়ে দেব কেন?' (পঃ পঃ পাতা ২১) এমন সময় বহু সৈন্য মোহনলালের বাড়ী আক্রমণ করল। পেছনের দরজা

দিয়ে কয়েকজন মতিবিবির সামনে এলে তিনি তাদের পরাস্ত করলেন। ইতিমধ্যে মীরকাশিম ও ফাকর এসে সৈন্যদের পরাজিত করলেন। মতিবিবিকে দেখামাত্র মীরকাশিম মোহিত হলেন। ফাকর তাঁর স্ত্রীলোক আসক্তিকে তিরস্কার করে রাজা রামনারায়ণকে সাহায্য করতে বললেন। অবশেষে এক ফকিরের পোশাক মীরকাশিমকে পরিধান করিয়ে হুকুম করলেন 'কার্য্য সিদ্ধ হলে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কর না—রংপুরে ফিরে যেযো' (পঃ পঃ পাতা ২৪)। তৃতীয় দৃশ্যে রাজা রাজবল্লভের গৃহে বসে রাজবল্লভ ও রামনারায়ণ মীরণের আক্রমণ আশঙ্কা করছেন এমন সময় মীরকাশিম ক্লাইভের কাছ থেকে রামনারায়ণকে রক্ষা করার পত্র সংগ্রহ করে সামসেরউদ্দিনের হাত দিয়ে সেটা রামনারায়ণকে পাঠিয়ে দিলেন। মাতাবিবি সৈন্য তাড়িত হয়ে রাজবল্লভের গৃহে আশ্রয় নিলেন। মীরণের সৈন্যগণ মোহনলাল এবং তার গৃহের সকলকে হত্যা করেছেন জানা গেল। রামনারায়ণ মতিবিবিকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং তাকে রক্ষা করতে কৃতসংকল্প হলেন। তিনি মতিবিবিকে তাঁর বড়নগরের বাড়ীতে রেখে আসার নির্দ্দেশ দিলেন। মতিবিবির খোঁজ করতে এসে প্রতিহত হয়ে মহম্মদীবেগ রামনারায়ণকে হত্যা করতে কৃতসংকল্প হলেন। মীরণ এসে মতিবিবির পলায়নে সাহায্য করার জন্য রামনারায়ণকে তিরস্কার করতে লাগলেন। রামনারায়ণের বিপদাসঙ্কায় মতিবিবি ও লাহোরী ফিরে এলেন এবং রামনারায়ণের কোন সাহায্য প্রয়োজন নাই শুনে চলে গেলেন। মীরণের আস্ফালন শুনে রামনারায়ণ বললেন—'একি নিরীহ নবাব সিরাজদ্দৌলা পেয়েছিস, যে একা নিরস্ত্র দেখে হত্যা করতে আসছিস। আমি তোদের এত ঘৃণিত মনে করি, এত নীচ মনে করি, এত অপদার্থ কাপুরুষ মনে করি যে তোদের কাছে আত্মরক্ষার জন্য আমি অস্ত্র পর্য্যন্ত হাতে করিনি' (প. প পাতা ৩২)। মীরণ ও তাঁর সহকর্মী মহম্মদীবেগ ভীত হয়ে পলায়ন করল। লাহোরী ও মতিবিবি ফিরে এলেন। রামনারায়ণ মতিবিবিকে পাটনায় নিয়ে যাবার সংকল্প করলেন কারণ সেখানেই তিনি নিরাপদ। লাহোরী প্রস্তাব করলেন যে বজরায় মোহনলাল কন্যার গমন বিপদসঙ্কুল হবে তাই জেলেডিঙিতে তাঁকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেন। রামনারায়ণ সম্মতি দিয়ে মতিবিবির অতুলনীয় রূপসাগরে নিমজ্জিত হয়ে

গেলেন। চতুর্থ দৃশ্যে মীরণ নবাবের কক্ষে নবাবকে রাজা রামনারায়নের অপকীর্তির কথা সবিস্তারে জানালেন। মতিবিবিকে নিয়ে পলায়নে নবাবও বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়ে তকী খাঁকে ডাকতে পাঠালেন। ইচ্ছা রামনারায়ণকে পদচ্যুত করে হত্যা করা। এমন সময় গবর্ণর ক্লাইভের পত্র নিয়ে অমিয়েট সাহেব এলেন। রামনারায়ণকে নবাবের কোন শাস্তি দেওয়া হল না। এই দৃশ্যের শেষে বলা হয়েছে যে মীরজাফর অক্ষরহীন মূর্খ। (প প পাতা ৪৩-৪৪)। পঞ্চম দৃশ্যে কাশিমবাজারের রাজপথে মীরকাশিম ও ফকির ইতিকর্ত্তব্য বিবেচনা করছেন। ক্লাইভ চলে যাচ্ছেন এবং অমিয়েট তাঁর জায়গায় গবর্ণর হবেন বলতে গিয়ে ফকির জানাচ্ছেন যে—'আজও এ বণিক জাতিকে চিনতে পারলে না। তোমাদের ভাব আর ওদের ভাবে কিছু পার্থক্য আছে! স্বজাতির যাতে অপকার হয় ওরা সে কার্য্য কখনও করে না। ·বাঙ্গালীর স্বভাবজাত মমতা ত্যাগ করতে পারিনি। তোমার ভালবাসায় কতকটা আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। বুঝতে পারছি বাঙলার দুঃখে কাতর হযে তুমি একটা নিজশক্তির অতিরিক্ত কার্য্য করেছ' (প প. পাতা-৪৬-৪৭)। ইতিমধ্যে গুরগিণ খাঁ অমিয়েটের সঙ্গে প্রবেশ করলেন। তিনি মীরকাশিমকে নবাবী দেবার জন্য তাকে দুইলক্ষ টাকা ঘুষ দিতে রাজী হলেন। জামীন স্বরূপ ইংরেজ গুদামে তার দুইলাখ টাকার মলমল রেখে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। অমিয়েট কিন্তু নিজের মর্য্যাদা রাখতে পারলেন না ফলে মীরকাশিমের ঘুষি খেবে ধরাশায়ী হতে হল। মীরকাশিম অমিয়েটের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা করতে রাজী হলেন না। মীরকাশিম দেশের কথা ভেবে চিন্তান্বিত 'মীরজাফরের হাতে আর দশবৎসর বাঙলা থাকলে বাঙলার অবস্থা হবে কি! শুধু কি এই দেখতে নবাব আলীবর্দ্দীর বংশে জন্মগ্রহণ করলুম!' (প. প. পাতা-৫১) ষষ্ঠ দৃশ্যে সিরাজদ্দৌলার সমাধিস্থলে লুৎফউন্নিসা ও সিরাজ-কন্যা গুলফনের সংগীত ও সংলাপ। ফকিরের বেশে মীরকাশিম এসে সিরাজদ্দৌলাকে ধরিয়ে দেবার অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। জানালেন যে বেগম লুৎফউন্নিসার নয়লক্ষ টাকার অলঙ্কার অপহরণের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল। অন্যের হাতে এই মহামূল্য অলঙ্কার যাতে বিনষ্ট না হয় তাই তিনি আগেই সেগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। লুৎফউন্নিসা মীরকাশিমকে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা করলেন

এবং নবাব সিরাজদ্দৌলার শেষ স্মৃতি চিহ্ন তার হাতের অঙ্গুরীয় মীরকাশিমকে দিয়ে তার কন্যাকে রক্ষা করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। মীরকাশিম সিরাজ-কন্যাকে নিয়ে প্রস্থান করামাত্র, মীরণ, মহম্মদীবেগকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হলেন। উদ্দেশ্য ঘসেটি ও আমিনা বেগমের সঙ্গে লুৎফউন্নিসাকেও ঢাকায় প্রেরণ করা। সিরাজ-কন্যাকে খুঁজে না পেয়ে তারা লুৎফউন্নিসাকে নিয়েই প্রস্থান করলেন। সিরাজ-কন্যা মীরকাশিমের হেফাজতে অবস্থান করতে লাগলেন। যাবার সময় মীরকাশিম বলে গেলেন 'এই ভার যদি স্কন্ধচ্যুত হয় তখন জানবেন মীরকাশিম জীবিত নাই।' (প. প. পাতা-৬১) অবশেষে প্রথম অঙ্ক অবশিত হল। এই অঙ্কের শেষে মীরকাশিম নায়ক, মতিবিবি নায়িকা ও মীরণ খল-নায়ক রূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

॥ আলোচনা ॥

বাঙ্গালী দর্শকের চিন্তা ও বুদ্ধিকে যে সব নাট্যকার হেয় মনে করেছেন তাঁদের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের স্থান বেশ উঁচুতে। আলিবাবা, দৌলতে দুনিয়া, ভূতের বেগার, আহেরিয়া বা খাঁজাহান প্রভৃতি নাটকে তাঁর কল্পনা বিলাসের পরিচয় পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক নাটক লেখার সময় তিনি একই পথ অবলম্বন করেছেন অর্থাৎ ইতিহাস অনুসন্ধান না করেই কেবল কল্পনার ওপর নির্ভর করে নাটক রচনা করেছেন। মনে করেছেন যে বাঙালী দর্শকের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা তাঁকে নাটক নিয়ে যা খুসী করবার অধিকার দিয়েছে। যেমন বর্তমান নাটকে তেমনি ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'বাংলার মসনদ' নাটকে (সিরাজদ্দৌলা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত প্রতাপাদিত্য নাটকে এই কল্পনা বিলাসের রাশি রাশি উদাহরণ সঞ্চিত হয়ে আছে। পলাশীর প্রায়শ্চিত্তের অসংখ্য ও অগন্য ভুলের না আছে কোন প্রযোজন বা কারণ। এগুলি নাট্যকারের ইতিহাস অজ্ঞতার এবং ঐতিহাসিক ঘটনা অবমাননার জাজল্যমান উদাহরণ মাত্র।

প্রথম অঙ্কের নাটকে মীরজাফর নবাব, রাজবল্লভ মন্ত্রী, তকি খাঁ সেনাপতি এবং মীরণের দাপাদাপিতে সবাই অতিষ্ঠ, ফকিরের বেশে মীরকাশিম মুর্শিদাবাদের পথে পথে ভাল লোকদের বিপদ থেকে উদ্ধার করছেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফর নবাব হলে, মীরকাশিমকে করলেন

রংপুরের শাসনকর্তা। মন্ত্রীপদে বসলেন রায় দুর্লভরাম কিছুদিন পর তিনি কলকাতায় গেলে (১৭৫৯) ওইপদ পেলেন নন্দকুমার। রাজবল্লভ মীরণের দেওয়ান হলেন এবং তারই প্রচেষ্টায় মীরণ বা ছোট নবাব নাসির-উল-মুলুক মীরকাশিমের নামও সহ্য করতে পারতেন না। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগে মীরকাশিমের মুর্শিদাবাদে আসবার কোন সুযোগ হয় নাই। এই বছর নবাব মীরজাফর প্রথম ও শেষবারের জন্য জামাতার শরণাপন্ন হলেন। দিল্লীর বাদশাহ পাটনা আক্রমণ করতে আসছেন শুনে মীরজাফর মীরণকে সৈন্য দিয়ে পাঠালেন বাদশাহ আটকাতে। ঠিক সেই সময় একদল বর্গী নিয়ে মারাঠা শিবভট্ট কাটোয়ায় পৌঁছে গেলেন। নবাব বাধ্য হলেন জামাতাকে ডেকে পাঠাতে। মীরকাশিম মুর্শিদাবাদে এসে পৌছানমাত্র দীর্ঘদিন বেতন না পেয়ে সৈন্যদল বিদ্রোহ করল। মীরকাশিম নিজস্ব তিনলক্ষ টাকা দিয়ে তাদের তখনকার মতো স্বকর্মে ফিরে পাঠিয়ে দিলেন। এইখানে গিরিশচন্দ্র চমৎকারভাবে নাটক সুরু করেছেন। মীরজাফরের সময় কোথায় তকি খাঁ বা গুরগিণ খাঁ। মীরণের পাটনা যাত্রার পর সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ হয় এবং বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যুর খবর আসার পর সবাই যখন আশা করছে জামাই মীরকাশিমের ওপর মীরজাফর রাজ্য শাসনের কিছু ভার দেবেন তখন তিনি কেবল পূর্ণিয়ার ফৌজদারী পাওয়ায় নবাবের মনের কি ভাব বয়ে চলেছে তার নিদর্শন পাওয়া গেল। এই নিদর্শন পাওয়ার পরই মীরকাশিম কলকাতার সাহেবদের টাকা দিয়ে নবাবী কেনার কথা ভাবতে আরম্ভ করলেন। এই নাটকে মোহনলালের কন্যা এক প্রধান চরিত্র হয়ে গেছে। নাট্যকার জানতেন না যে ফৈজী নয় স্বয়ং লুৎফউন্নিসা বেগমই মোহনলালের ভগিনী। মোহনলালের জামাতার পলাশীতে মৃত্যু হয়। সিরাজদ্দৌলা প্রবন্ধে মোহনলাল প্রসঙ্গ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক আরো আজগুবি ঘটনার সমাবেশ। প্রথম দৃশ্যে দেখান হয়েছে যে মোহনলালের কন্যা মতিবিবি মাছ ধরা নৌকায় চেপে পাটনায় পালিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে রাজা রামনারায়ণের দেহরক্ষী লাহোরী বেগ।

এক সময় রামনারায়ণের সঙ্গে মতিবিবির বিবাহের প্রস্তাবও করা হয়েছে। মনে হয় রামনারায়ণের রূপে গুণে মতিবিবি আকৃষ্ট। এমন সময় সমসের এসে খবর দিল যে মতিবিবির পলায়ন সংবাদ পেয়ে মহম্মদীবেগ দলবল নিয়ে আসছে কাজেই পথের মধ্যে মতিবিবি নৌকা ছেড়ে এক চটিতে আশ্রয় নিলেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে এই সংবাদ মীরকাশিমকে দিয়ে সমসের তার প্রভু মীরণের কাছে চলে গেল। সংলাপে মনে হয় যে সমসের মতিবিবিকে সিরাজ মহিষী লুৎফউন্নিসা বলে ভুল করেছে। মতিবিবি মীরকাশিমের কাছে আশ্রয় চাইতে এলে মীরকাশিম তাঁর রূপ দেখে বিমোহিত হলেন। চতুর মতিবিবি কিন্তু মীরকাশিমকে দেখেই তাঁকে জিন্নতমহলের স্বামী বলে চিনতে পারলেন। ইতিমধ্যে মহম্মদীবেগ ও তার দলবল আক্রমণ করলে মীরকাশিমের পরাক্রমে মহম্মদীবেগের পতন হল এবং অন্যেরা পলায়ন করল। মতিবিবি মীরকাশিমের কাছ থেকে তাঁর ফকিরের পোষাক চেয়ে নিলেন। মীরকাশিমের মতিবিবিকে দেখে মুগ্ধ হবার নিদর্শন রয়েছে সংলাপে—'যদি কেউ বাঙলায় নবাবী করতে চায়, সে যেন তোমার ন্যায় শক্তিশালিনীকে মসনদের অংশভাগিনী করে।'

তৃতীয় দৃশ্যে মীরণের অনুচররা তাদের পরাজয়ের কাহিনী বর্ণনা করছেন। তাই শুনে মীরণ অগ্নিশর্মা। মীরকাশিমকে হত্যা করতে না দিয়ে তার পিতা যে কি অন্যায় করেছেন তা উচ্চৈশ্বরে ঘোষণা করতে থাকেন। সমসের ফিরলে মীরণ বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। এমন সময় মীরকাশিম এসে অভিযোগ করলেন যে মীরণ তার স্ত্রী পুত্রকে রংপুর থেকে অপহরণ করেছেন। কাপুরুষ মীরণকে বলতে হল যে পিতা নবাব মীরজাফরের আদেশে এই কর্ম করা হয়েছে। মীরকাশিম তখন সমসেরকে পাঠালেন তাঁর স্ত্রী পুত্রকে রক্ষা করতে। এমন সময় হটাৎ ভ্যান্সিটার্ট সাহেব উপস্থিত। মীরণ তাড়াতাড়ি জানালেন যে তাঁরা ঝগড়া করছিলেন না বরঞ্চ রাষ্ট্রের উন্নতি কি করে হয় তারই আলোচনা করছিলেন। চতুর্থ দৃশ্যে নবাবের কক্ষে রাজবল্লভ আর গুরগিণ খাঁ। গুরগিণ খাঁ রাজবল্লভকে মীরকাশিমের স্ত্রী পুত্রকে নবাবের কাছে নিয়ে আসার জন্য সাধুবাদ দিলেন। তাঁরা রংপুরে থাকলে মীরণের প্ররোচনায় অবশ্যই নিহত হতেন এমন আশঙ্কা গুরগিণ প্রকাশ করলেন। তিনি আরো জানালেন যে তিনি গোপন খবর

পেয়েছেন কলকাতার গবর্ণরপদে ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেব বসছেন। নবাব এসে উপস্থিত হলে গুরগিণ অভিযোগ করলেন যে কোম্পানীর দাদন অসহ্য হয়ে উঠেছে। বললেন—'সবাই কৌন্সিলে অভিযোগ করতে পারে না এভাবে চললে দেশের কারিকররা বাঁচবে না তাই তাঁতীরা সবাই বুড়ো আঙুল কেটে ফেলছে।' এখানেও সহসা ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেব হাতিব হয়ে নবাবকে কোম্পানীর কাছে তাঁর দেনার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। রাজবল্লভকে জানালেন যে তিনি ক্লাইভের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন ফেরার পথে নবাবের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। পঞ্চম দৃশ্যে গৌড়পথ। মীরকাশিম ও ফকির অতীত গৌড়ের গৌরবে মোহিত। ফকির শোনালেন সপ্তদশ অশ্বারোহী লক্ষ্মণসেনের সময় বাঙলা জয় করেছিল। পলাশীতে মুষ্টিমেয় পরাজিত করল অসংখ্যকে। সুতরাং আত্মশক্তিতে নির্ভর করতে হবে। এই আত্মশক্তি তাঁকে সর্বদা পথের নিশান বলে দেবে। ষষ্ঠ দৃশ্যে লাহোরীবেগ ভেলায় করে মতিবিবিকে নিয়ে পদ্মা পার হল। মতিবিবির এই অসম সাহসের তারিফ করতে মীরকাশিম পদ্মাপারে উপস্থিত। মনে হয় মতিবিবি মীরকাশিমকে প্রচণ্ডভাবেই আকর্ষণ করেছিলেন। কারণ মীরকাশিম নবাব হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মতিবিবি লুব্ধ না হয়ে বলছেন 'জিন্নত মহল নবাব মহিষী হবার উপযুক্ত।' এমন সময় স্ত্রীলোকের আর্ত চিৎকারে দৃশ্যান্তর। সপ্তম দৃশ্যে দেখা গেল লুৎফউন্নিসাকে জলে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা হচ্ছে। মীরকাশিম আর লাহোরীবেগ দৌড়ে গিয়ে তাকে রক্ষা করলেন। কিন্তু এই সুযোগে আমিনা বেগম আর ঘসেটি বেগমকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হল। তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মতিবিবি চললেন। পিতৃহন্তা মীরণকে খুঁজে বার করে প্রতিশোধ নিতে। যে বজরায় লুৎফউন্নিসাকে আনা হয়েছিল মীরণের সেই বজরায় চেপেই মীরণের উদ্দেশে মতিবিবি চলে গেলেন।

॥ আলোচনা ॥

দ্বিতীয় অঙ্কের সবটাই আষাঢ়ে উপকথা। ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি ও সামাজিক পরিবেশ উপেক্ষা করে মনের আনন্দে মিথ্যার বেসাতী কিভাবে জমান যায় এই অঙ্ক তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমস্ত অঙ্ক অনৈতিহাসিক

সুতরাং নস্যাৎ যোগ্য। এই অঙ্কে মীরণকে নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটেছে। পলাশীর পর মীরণ মাত্র তিন বছর জীবিত ছিলেন। এই সময় তিনি যে খেলা সুরু করেছিলেন তা সত্যই নাটকীয়। নবাব হবার ইচ্ছা তার হয়েছিল কিন্তু সেজন্য তিনি পিতার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চান নাই। এবারেও ষড়যন্ত্র হল রাজা দুর্লভরামের নেতৃত্বে। উদ্দেশ্য অকর্মণ্য মীরজাফরকে সরিয়ে তার পুত্র মীরণকে নবাব করা। সিরাজদ্দৌলার পতনের ষড়যন্ত্রের সময়ও প্রধানচক্রী রাজা দুর্লভরাম, যিনি রায়দুর্লভ নামে বেশী পরিচিত, একথা ক্লাইভ স্বয়ং একাধিকবার লণ্ডনে কোম্পানীর পরিচালকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। পলাশীর পর মীরজাফর পেলেন নবাবী কিন্তু দুর্লভরামের বিশেষ কিছু হল না, উপরন্তু মন্ত্রীত্বতে ভাগ বসালেন তাঁরই আশ্রিত নন্দকুমার আর নবাবও রায়দুর্লভকে ছেড়ে নন্দকুমারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়লেন। অসহ্য হবারই কথা। তাই রায়দুর্লভ নূতন জাল বুনলেন। এবার তার প্রধান সহায় মীরণের দেওয়ান তীক্ষ্ণধী রাজবল্লভ। কিন্তু গোলমাল হল মীরণকে নিয়ে। তার ধারণা হল যে তিনি নবাব হয়ে গেছেন তাই একেবারে প্রকাশ্যভাবেই আলিবর্দীর দুই কন্যা আমিনা আর ঘসেটিকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করালেন। মীরজাফর প্রমাদ গণলেন। কাশিমবাজার কুঠির প্রধান হেস্টিংস সাহেবকে ডেকে এনে শোনালেন তাঁর প্রতি মীরণের দুর্ব্যবহারের ইতিহাস। মোগল নবাব-পুত্রদের পিতৃহত্যার বহুকাহিনী শুনিয়ে মীরণের ক্ষমতা হ্রাসের প্রস্তাব করলেন। সেই সঙ্গে এই কথা শোনাতে ভুললেন না যে মুর্শিদাবাদে থাকলে রায়দুর্লভের জীবন বড়ই বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়বে। রায়দুর্লভ নিজেও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন তাই দ্বিধা না করে চটপট মন্ত্রিত্ব থেকে ছুটি নিয়ে কলকাতায় পলায়ন করলেন। মীরণ এটাকে ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্ব মনে করে তার বিরাট নারীবাহিনী নিয়ে মদ্য ও লাম্পট্যের বন্যা বহিয়ে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। রায়দুর্লভ তখন চুপসে একেবারে চামসী। নন্দকুমারের পরামর্শে নবাব মীরজাফর ওলন্দাজদের সঙ্গে আলোচনা চালালেন ইংরেজদের বিতাড়ণ করবার ইচ্ছায়। এর আগেই ফরাসীদের নাড়াচাড়া করতে গিয়ে নবাব বিফলকাম হয়েছেন এবার ওলন্দাজদের সঙ্গেও হলেন। ক্লাইভ থাকতে ইংরেজদের সঙ্গে শস্ত্র পরীক্ষায় কেউ রাজী হলেন না। এইসব কথাই হেস্টিংস ক্লাইভ সাহেবকে লিখে জানালেন।[৭৫] অবশেষে ক্লাইভ স্বয়ং

নবাব সকাশে উপস্থিত হতে সব মেঘ কেটে গেল। মীরজাফর ক্লাইভের আজীবন আনুগত্যের অঙ্গীকার করলেন। এই সময় থেকেই নন্দকুমার ক্লাইভের নজরে পড়লেন। ক্লাইভ নন্দকুমারকে নানা কাজের ভার দিতে সুরু করলেন। বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে খাজনা সংগ্রহের ভার দেওয়াতে গোলমাল বেধে গেল কারণ এই কাজের ভার হেস্টিংস সাহেবের ওপর ন্যস্ত ছিল। বলাচলে হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের এই সময় থেকেই বিরোধ সুরু হল। মীরণের কলকাতা থেকে ফিরে ধারণা হল যে তিনি একজন মস্ত যোদ্ধা এটা প্রমাণ করতে পারলে ইংরেজরাও তাকেই নবাব করবে। তবে ওই রগচটা রাশভারি ক্লাইভ সাহেবটাকে তার পছন্দ নয়। কলকাতায় শুনে এসেছেন ক্লাইভ দেশে ফিরছে কাজেই সৈন্যবাহিনীকে হাত করার এই চমৎকার অবকাশ। যুদ্ধ করতে গেলেন মীরণ সাহেব, ছোটে নবাব বলেই যিনি সমধিক খ্যাত। সঙ্গে দেওয়ান রাজবল্লভ। সৈন্যসামন্ত প্রয়োজনের অতিরিক্তই সঙ্গে চলল। তারপর বিনামেঘে বজ্রপাত—বজ্রপাতে মীরণের মৃত্যু ২রা জুলাই ১৭৬০—ঠিক সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করার দিন। মৃত্যুর খবর চাপা রেখে মৃতদেহকে হাওদায় বেঁধে মুর্শিদাবাদে আনবার চেষ্টা করলেন রাজবল্লভ। সুবিধা হল না। দুর্গন্ধ সত্য প্রকাশ করে দিল। মৃতদেহ নামিয়ে রাজমহলে কবরস্থ করা হল। সিরাজদ্দৌল্লার মামা মীরণ এক নাটকীয় চরিত্র। দুঃখের বিষয় সে বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকায় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ কেবল কল্পনার রাজত্বেই উড্ডান হয়েছেন। মাটিতে নামবার ভরসা করেন নাই। কিন্তু পাখীও চিরকাল উড়তে পারে না তাই ক্ষীরোদ-প্রসাদকেও নামতে হয়েছে আর নামামাত্র ঘটেছে সাংঘাতিক হাস্যকর দুর্ঘটনা। তৃতীয় অঙ্কে এই অনাবিল অসত্যের অনর্গল প্রকাশ দেখে আশ্চর্য্য হওয়া যায় না।

তৃতীয় অঙ্ক ॥

সুরু থেকেই কাল্পনিক ঘটনার প্রাচুর্য্য। তৃতীয় অঙ্কের প্রথমেই হলওয়েল, এলিস ও ভ্যান্সিট্টার্ট মীরজাফরের পদচ্যুতি আলোচনা করছেন। জগৎশেঠ মহাতপচাঁদের কাছে হলওয়েল টাকা চাইলেন কেন না তিনি কোম্পানীর তহবিল ভেঙে রেখেছেন টাকা পেলে পূরণ করবেন। জগৎশেঠ এখানে

'মাতাব' নামে আখ্যাত, টাকা দিলেন না। গুরগিণ খাঁ বুদ্ধি দিলেন যে এখন টাকা দেবার সময় নয় কারণ ওই টাকা অন্য কাজে লাগান হবে। অবশেষে মীরকাশিম টাকা দিতে রাজী হলে সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন যে এমন ভাল লোককে নবাব করা উচিত। ভ্যান্সিট্টার্টও মীরকাশিমকে জানালেন যে ক্লাইভ সাহেবও বিলেতে ফিরে যাবার সময় তাঁর কানে কানে বলে গেছেন যে মীরণকে নবাব না করে যেন মীরকাশিমকে নবাব করা হয়। (পঃ পঃ পাতা ১১০) এতে মীরকাশিম খুব সন্তুষ্ট হলেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে মীরণের শিবিরেও প্রচণ্ড দুর্যোগ। মতিবিবি মীরণকে হত্যা করতে এলেন। মীরণ তাঁর সেই সংহারমূর্তিতে ভীত হয়ে ক্ষমা চাইল। মতিবিবি তখন ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমের জলে ডুবে মৃত্যুর দৃশ্য বর্ণনা করে তাদের অভিশাপ বানী মীরণকে শোনালেন। মীরণ এই সব শুনে প্রচণ্ড ভীত হলে মতিবিবি তাঁর যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে বিবেচনা করে যেই প্রস্থান করলেন অমনি অভিশাপ সফল করে বজ্রপাতে মীরণের মৃত্যু হল। মতিবিবিও জ্ঞান হারালেন। রামনারায়ণ ছুটে এসে মতিবিবির জ্ঞান সঞ্চার করলেন বটে কিন্তু তাকে চিনতে পারলেন না। ঘোর দুর্যোগের মধ্যে এই দৃশ্য শেষ হল। তৃতীয় দৃশ্য অতি অভিনব। পুত্রের মৃত্যুর খবরে শোকাচ্ছন্ন নবাব মীরজাফর নিজ কক্ষে বসে মদ্যপান করছেন এবং ইংরেজীতে মাতলামি করছেন বা ইংরেজী ভাষায় কপচাচ্ছেন। মণিবেগম এসে জানালেন যে মীরণের বজ্রপাতে মৃত্যু মীরকাশিমের ষড়যন্ত্র। এ বিষয়ে নবাব একমত হলেন। ইতিমধ্যে রাজপথে ইংরেজ সৈন্যের উপস্থিতির খবর পাওয়া গেল। মীরকাশিমের স্ত্রী ও পুত্র এলেন নবাবকে সমবেদনা জানাতে। তাঁরা মণিবেগমের পুত্র নাজামাদ্দৌলাকে তাঁর পরবর্তী নবাব মনোনীত করতে অনুরোধ করলেন। নবাব রাজী হলেন না। বললেন নাজামাদ্দৌলা বালকমাত্র। তিনি মীরকাশিমকে ওই পদ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর কন্যা ও দৌহিত্র আনন্দিত হয়ে বলে ফেললেন যে মীরকাশিম অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি। আর যায় কোথা নবাব বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র একসঙ্গে আবিষ্কার করে, কন্যা ও দৌহিত্রকে রংপুরে নির্বাসিত করলেন। মন্ত্রী রাজবল্লভ বল্লেন 'তা হতেই পারে না' এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজের আবাসে আশ্রয় দিলেন। (সুকুমার রায় মহাশয় হ য ব র ল লেখার সময়ও এমন উদ্ভট কল্পনা করতে পারেন নাই।) সেনাপতি তকী খাঁ খবর

দিল যে চকের রাস্তা কোম্পানীর সেপাইএ ভরে গেছে। সঙ্গে সেনাপতি কেলড। নবাব তকী খাঁকে তলে তলে তৈরী থাকতে বললেন। সমসের এই সুযোগে স্মরণ করিয়ে দিলেন পলাশীর প্রান্তরে কেমনভাবে সিরাজ তাঁর পদতলে পড়ে ক্রন্দন করেছিলেন। আরো বললেন 'সোনার বাংলা শুধু আপনি ও আপনার পুত্রের নীচাশয়তায় চিরকালের মতো বিদেশীর হাতে চলে গেল।' এমন সময় হটাৎ ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেব প্রবেশ করলেন। (পৌরাণিক নাটক লিখে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা চরিত্রকে যখন তখন যেখানে সেখানে প্রবেশ করিয়ে নাট্যকার এমন বদঅভ্যাস করেছেন যে ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেবকে শ্রীকৃষ্ণের আসন দিয়েছেন।) ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেব মীরকাশিমকে সহকারী নবাব করার প্রস্তাব দিলেন। সে প্রস্তাব নবাব উপেক্ষা করলে নাজামাদ্দৌলাকে সহকারী নিযুক্ত করতে চাইলেন। নবাব এ প্রস্তাবেও আপত্তি জানালে গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেব মীরজাফরকে নবাবী থেকে অপসৃত করলেন এবং তাঁকে অবিলম্বে কলকাতা যাবার হুকুম করলেন। চতুর্থ দৃশ্য আরো অদ্ভুত কাহিনীর সমাবেশ। মন্ত্রী রাজা রাজবল্লভ স্বীকার করে ফেললেন যে মীরজাফরকে নবাবী থেকে সরাবার চক্রান্তটি তাঁরই। রাজবল্লভ সবাইকে জানালেন যে ক্রমান্বয়ে চক্রান্ত করে তিনি ক্লান্ত। তবে এবারকার কর্ম সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত কারণ তিনি বাঙলার সামান্যতম অংশ রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন। তকী খাঁ তাঁকে সাধুবাদ জানিয়ে মীরকাশিমের পাশে দাঁড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এমন সময় মীরকাশিম এলে সবাই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করল। লঙ্কাভাগের খবর পাওয়া গেল অর্থাৎ মীরকাশিমের নবাবীতে রাজবল্লভ দেওয়ান, আলি ইব্রাহীম উজীর, গুরগিণ খাঁ গোলন্দাজ। তকী খাঁ পায়জাপের সেনানায়ক আর লালসিং রেসেলদার। পঞ্চম দৃশ্যে মীরকাশিম নবাবী নিয়ে ব্যস্ত স্ত্রীপুত্র কোথায় খোঁজ নেবার সময় নাই। রাজবল্লভের বাড়ীতে জিন্নতমহল ও বাহার স্বামী ও পিতার ঔদাসিন্যে দুঃখিত। অবশেষে নবাব সংবাদ পেয়ে তাদের ডেকে পাঠালেন। এতে স্ত্রীর অভিমান বৃদ্ধি পেল তিনি কলকাতায় পিতার কাছে যাত্রা করলেন। এদিকে ষষ্ঠ দৃশ্যে কলকাতা অভিমুখী নবাবের নৌকা সিরাজের সমাধিস্থলে আটকে গেছে। সেখানে লুৎফউন্নিসা মীরজাফর ও মণিবেগমকে আশ্রয় দিলেন। এমন সময় স্বামীর প্রতি অভিমান করে জিন্নত এসে হাজির

হলেন। মীরজাফর এইসব নূতন ষড়যন্ত্র মনে করে মণিবেগমকে নিয়ে পলায়ন করলেন। তখন জিন্নত ও বাহার আত্মহত্যার সংকল্প গ্রহণ করলেন। কিন্তু লুৎফউন্নিসা বাধা দিলেন। এমন সময় নবাব মীরকাশিম এসে স্ত্রী পুত্রের অভিমান দূর করলেন। সঙ্গে নিয়ে চললেন সিরাজ-কন্যা গুলফনকে উদ্দেশ্য নিজ-পুত্র বাহারের সঙ্গে তার বিবাহ। বেশ মধুর মিষ্টি মিষ্টি আবহাওয়া। এই প্রস্তাবে লুৎফউন্নিসা মোহিত। তিনি গুলফনকে তার ভাবী প্রভুর হাত ধরে যেতে বললেন। মীরকাশিম মহানন্দে নবাবী ও স্ত্রী পুত্র ভাবী পুত্রবধূ সকলকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন।

আলোচনা ॥

তৃতীয় অঙ্কও অনৈতিহাসিক। মীরকাশিমের অর্থ দিয়ে নবাবী কেনার ঘটনা ঘটে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর (মীরকাশিমের জীবনের প্রধান ঘটনার তালিকা দ্রষ্টব্য।) সেই আসরে জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ বা গুরগিণ খাঁ উপস্থিতির কারণ বোঝা গেল না। মীরকাশিম জগৎশেঠদের অবিশ্বাস করতেন সুতরাং তাঁরা সামনা সামনি ইংরেজকে সাহায্য করবে ভাবা অসম্ভব। এই সূত্রে বলা প্রয়োজন যে বাঙালী নাট্যকারদের হাতে জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় হয় কুশীদজীবি নইলে নবাবের কর্মচারী রূপে চিত্রিত। তাঁরা যে তখন ভারতবর্ষের সব থেকে বড় ব্যাঙ্কার এটা অনেকেই বুঝতে পারেন নাই। পরবর্তী দৃশ্য কিন্তু সময়কে পিছু হাঁটিয়ে চলে গেল ২রা / ৩রা জুলাই। তৃতীয় দৃশ্য এক লাফে অক্টোবর মাসের বাইশ দিনের ঘটনাকে এক দৃশ্যে সীমাবদ্ধ করল। গিরিশচন্দ্রকে অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁর গুণগুলি বুঝতে পারেন নাই কিন্তু দোষটা উঠে এসেছে। এ সময় মণি বাঈজী বেগম হননি বাঈজীমাত্র আর কোথায় তখন নাজামাদ্দৌলা! খুব কাছাকাছি হলেও মাতৃজঠরে। মীরজাফরের কন্যা বা দৌহিত্র কোন নামই ঠিক নাই। লুৎফউন্নিসা এবং তাঁর কন্যা উম্মৎসায়রা বেগম ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দেই ঢাকা চলে যান। সেখানেই কন্যার বিবাহ হয়। চারটি কন্যা রেখে উম্মৎসায়রা বেগম ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধে ঢাকায় পরলোক গমন করেন। এই চারটি শিশু কন্যাকেই লুৎফউন্নিসা বেগম গভীর স্নেহে পালন করে বিবাহ দেন।[৭৬] নাতজামাইগণ সকলেই ঢাকার প্রতিষ্ঠিত অভিজাত বংশের সন্তান। প্রৌঢ়ত্বের শেষে

লুৎফউন্নিসা মুর্শিদাবাদে ফিরে আসার আবেদন করেন তদনুযায়ী তাঁকে মুর্শিদাবাদে ফিরে তাঁর প্রভুর কবরের রক্ষণাবেক্ষণের সুযোগ দেওয়া হয়। ফরেস্টার বলেছেন এই সময় ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ[৭৭], মুতাক্ষরীণের মতে এই সময় ১৭৮৯।[৭৮] এরপর লুৎফউন্নিসা মাত্র বছর খানেক বেঁচে ছিলেন ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে তাঁর মৃত্যু হয়। মীরকাশিমের সিরাজকন্যার সঙ্গে নিজের পুত্রের বিবাহ প্রস্তাব একান্ত অসম্ভব ঘটনা কারণ মীরকাশিম লুৎফউন্নিসার কন্যাকে দাসীকন্যা ছাড়া আর কিছু ভাবতেন না।

রাজা রাজবল্লভ যে মীরকাশিমের বিপক্ষীয় দলের লোক ছিলেন সেটা নাট্যকার ভুলে গেছেন। বস্ত্রব্যবসায়ী গুরগিণ খাঁ বা খোজা গ্রেগরী ও অন্যান্য আর্মেনীয় যুদ্ধব্যবসায়ীগণ ১৭৬১র জুলাই-অগাষ্টের আগে মীরকাশিমের সঙ্গে যোগদান করেন নাই। অর্থাৎ নাট্য ঘটনার একবছর পরে। ভ্যান্সিটার্ট-মীরজাফর ও নবাবচ্যুতি প্রসঙ্গ গিরিশচন্দ্রের আলোচনার সময় বিস্তারিত ভাবেই করা হয়েছে তাই এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। অনুসন্ধিৎসা জাগলে মীরকাশিমের জীবনের প্রধান ঘটনার তালিকা দ্রষ্টব্য।

এই অঙ্কের কোথাও ইতিহাস জ্ঞানের মতো নাট্যজ্ঞানেরও পরিচয় নাই। আসা যাওয়া কথাবার্ত্তা, সন্দেহ, দুঃখ, বীরত্ব, দয়া, করুণা, অভিমান সবই প্রাণহীন কেবল পুতুলের হাতনাড়া, বিচরণ, আসা যাওয়া। মনের কোথাও কোন ছাপ রাখে না।

চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রাজবল্লভ আর গুরগিণ। নূতন কায়দায় সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষিত করা হচ্ছে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য। মীরকাশিম এসে জানালেন যে কোম্পানীর অত্যাচারে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ ক্ষীরোদপ্রসাদের নব ইতিহাসে অমিয়েট সাহেবের মৃত্যুর আগেই মীরকাশিমই যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। হা হতোস্মি। তারপর দেখালেন যে অমিয়েটের প্ররোচনায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় দেশভক্ত রামনারায়ণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। মীরকাশিম সমসেরকে রামনারায়ণকে বন্দী করার অনুরোধ জানালেন। হ্যাঁ অনুরোধ। সংলাপ—'রামনারায়ণকে গ্রেপ্তার

করে আনতে পার ?' (পঃ পাঃ পাতা ১১৯) অবশেষে রাগ চড়ল, তখন বেঁধে আনবার আদেশ দিলেন রামনারায়ণ বেইমানকে। দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজা রামনারায়ণ বাড়ীতে বসে বসে জমিদারদের ওপর মীরকাশিমের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করছেন। জানাচ্ছেন যে রাজস্ব জমা করতে নায়েব গোমস্তা সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। তবে কেউ মীরকাশিমকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। এলিস সাহেব রামনারায়ণকে বিদ্রোহ করতে ভরসা দিচ্ছেন—বলছেন ক্লাইভ জোর করে ভ্যান্সিটার্টকে গবর্ণর করেছে। অমিয়েট সাহেব বিলেতে পরিচালকদের আদালতে* আবেদন করেছে ভ্যান্সিট্টার্টের গবর্ণরী টিকবে না। ইতিমধ্যে ম্যাকগোয়ার জানালেন যে তার প্রতি পাটনার ভার অর্পণ করা হয়েছে এলিস সাহেব অবসর নিতে পারেন। এলিস ভ্যান্সিট্টাটের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। মতিবিবি এসে যখন সব শুনলেন তখন মীরকাশিমের ব্যবহারে দুঃখিত হলেন। রামনারায়ণ মতিবিবিকে কামনা করলেন। তারপর ভালবাসার উদাত্ততায় বলে ফেললেন যে আসলে তিনিও একজন দেশভক্ত। মীরকাশিমের প্রতি অভিমানে বিরুদ্ধ পক্ষ নিয়েছেন। মীরকাশিম নাকি তার অধীনে একদিন কর্মচারী ছিলেন। নবাব হবার পর রামনারায়ণকে যথেষ্ট খাতির না করার জন্যেই রামনারায়ণ তাকে একটু শিক্ষা দিতে মনস্থ করেছেন। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে একমাত্র মীরকাশিমই বাঙালীকে মুক্ত করতে পারবেন। সমসের এসে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখালে সুবোধ বালকের মতো রামনারায়ণ বন্দীত্ব স্বীকার করলেন। তৃতীয় দৃশ্যে ভ্যান্সি-ট্টার্ট ও নহবৎ রায় দেশের অবস্থা আলোচনা করছেন। ভ্যান্সিট্টার্ট বলছেন—নবাবের কাজে কোন দোষ নাই। নহবৎ খাঁ স্বীকার করছেন সব দোষই কোম্পানীর। তাদের গোমস্তাদের অত্যাচারে রাজসাহী শ্মশান হয়ে গেল। অমিয়েট ও হে সাহেবদ্বয় প্রবেশ করলে ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেব বলছেন যে নবাব বে-আইনী ব্যবসা বন্ধ করে ভাল কাজ করেছেন। অমিয়েট ও হে একথায় যথেষ্ট ঊষ্মা প্রকাশ করছেন। অমিয়েট গবর্ণরকে 'Traitor' বলে 'Duel'এ আহ্বান জানালেন। এমন সময় কর্মচারী এসে খবর দিল 'দেশী মহাজনের

---

* ক্ষীরোদপ্রসাদ জানতেন না যে কোম্পানীর পরিচালক সভার নাম ছিল—'Court of Directors' উহা কোন আদালত নয়।

গুণ্ডা পাটনার বাজারের সমস্ত কোম্পানীর মাল গুদাম থেকে ফেলে দিয়েছে। এলিস সাহেব কতকগুলি সেপাই নিয়ে বিরোধিতা করতে গিয়েছিলেন নবাবের ফৌজ তাইতে চড়াও হয়ে এলিস সাহেবের সব সেপাইদের মেরে ফেলে তাকে কয়েদ করে নিয়ে গিয়েছে।' (পঃ পাঃ পাতা ১৬১) এই কথা শুনেই সাহেবরা 'খুনকর' ফাঁসী দাও' প্রভৃতি ধ্বনী দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন। ভ্যান্সিটার্ট 'Let me know the facts' বলায় অমিয়েট 'Damn your fact' বলে চলে গেলেন। (পঃ পাঃ পাতা ১৬১) চতুর্থ দৃশ্যে রায়দুর্লভ ও মাতাবচাঁদ নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর যুদ্ধ বাধায় চিন্তিত। অমিয়েট এসে বললেন যে রামনারায়ণকে বাঁচাতে তিনি নরকে যেতেও প্রস্তুত। হে এসে জানালেন যে নবাবের আসল মতলব তাঁরা ধরে ফেলেছেন এবং সেটা হল কোম্পানীর ব্যবসা বন্ধ করা। এই জন্যেই জাল দস্তকের মিথ্যা খবর চারিদিকে রটনা হচ্ছে। রায়দুর্লভ হে সাহেবের হুকুমে এলিসকে পত্র দিতে রাজী হলেন যে তিনি যেন নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত থাকেন। পঞ্চম দৃশ্যে কলকাতায় মীরজাফরের বাড়ীতে মীরজাফর ও মণিবেগম। মীরজাফর ভাড়ামী করছেন। রায়দুর্লভ খবর দিলেন যে নবাব পোষাক পরে প্রস্তুত থাকুন কারণ তিনি আবার নবাব হতে চলেছেন। মণিবেগম এই নবাবীর নরকে স্বামীকে ফিরে যেতে দিতে আপত্তি করলেন। জানালেন যে মীরকাশিম তাঁর সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছেন সেজন্য তিনি তাকে ঘৃণা করেন কিন্তু নবাবী আর নয়। মীরজাফর নবাব হতে রাজী হলেন না। তখন এলেন ভ্যান্সিটার্ট, অমিয়েট ও হে তাঁদের বহু উপরোধে মীরজাফর শেষ পর্যন্ত নবাব হতে রাজী হলেন। মীমাংসার কথা বলে সময়ক্ষেপ করবার জন্য অমিয়েট আর হে মুঙ্গের যাত্রা করলেন। ষষ্ঠ দৃশ্যে মীরকাশিম মাতাবচাঁদকে ঘনঘন কলকাতায় যেতে দেখে সন্দেহ করছেন এবং তাঁকে মুঙ্গেরে নজরবন্দী করে রাখছেন। অমিয়েট ও হে এলে কেবল অমিয়েটের সঙ্গে নবাব সাক্ষাৎ করছেন। তাঁদের কথোপকথনে এলিসের পাটনা আক্রমণের সংবাদ, বাণিজ্যের ওপর সব সরকারী মাশুল তুলে দেবার সংবাদ এবং ইংরেজের পাটনা অভিমুখী মাত্র এক বজরা অস্ত্র শস্ত্র আটক করার সংবাদ জানান হচ্ছে। অবশেষে হেকে জামিন রেখে নবাব অমিয়েটকে ফেরার অনুমতি দিলেন। এই অঙ্কের শেষ ও সপ্তম দৃশ্যে সিরাজ-কন্যা গুলফনের সঙ্গে মীরকাশিম-পুত্র

বাহারের প্রেম। সহসা বেগমমহলে অমিয়েট সাহেব প্রবেশ করলে বাহার আপত্তি জানাচ্ছে। বাহারের পরিচয় পেয়ে অমিয়েট সাহেব তাকে চুরি করে নিয়ে পালাবার সংকল্প করছেন। এমন সময় মতিবিবি এসে গেলেন। বাহার নিষ্কৃতি পেলেন। অমিয়েট বলছেন—আমার কাছে পিস্তল আছে জান। মতিবিবি অসি আস্ফালন করে বলছেন 'এইখানা তোমার পেটের ভেতর ঢুকে যেতে পারে জান!' চমৎকৃত অমিয়েট হার স্বীকার করলেন (প: পা: পাতা ১৮৩)। পলায়নের সময় মতিবিবির রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে সেলাম করতে করতে অমিয়েটের হঠাৎ সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটক মনে পড়ে গেল, আউড়ে দিলেন এক লাইন 'Bring forth men children only ! For thy undaunted mettle should compose of nothing but males' (প: পা: পাতা ১৮৩)। এইসব বাতুলতার মধ্যে চতুর্থ অঙ্ক অবসিত হল।

আলোচনা ॥

সমস্তই নাটকই যেখানে কাল্পনিক সেখানে ইতিহাস খোঁজার অবকাশ কোথায়। তবু তারিখের হিসাব নেওয়া যাক। রাজা রামনারায়ণ ১৭৬১র জুলাই মাসে বন্দী হন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও সম্পদ নবাব বাজেয়াপ্ত করেন। তার দুই বছর পর ১৭৬৩র ১৭ই মার্চ নবাব সমস্ত শুল্ক আদায় রহিত করলেন। ওই বছর ১৫ই মে অমিয়েট ও হে মুঙ্গের যাত্রা করলেন। তাদের অনুরোধে ইংরেজদের অস্ত্র বোঝাই নৌকা নবাব ছেড়ে দিলেন ২২শে জুন। তার দু'দিন পরে এলিস পাটনা আক্রমণ করলেন। কলকাতায় ফিরে আসার পথে অমিয়েট হত হলেন ৩রা জুলাই। তারপর নবাবের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ বাধল। ২৪শে জুলাই মীরজাফরকে আবার নবাব করা হল। নাটকের ঘটনা সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত। মনে হয় ক্ষীরোদপ্রসাদ কেবলমাত্র গিরিশচন্দ্রের নাটক দেখেই পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতেন না যে গিরিশচন্দ্র ইতিহাস পাঠ করে নাটক লিখতে বসেছেন। মনে করেছেন গিরিশচন্দ্রও কল্পনার দম চড়িয়েছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ নির্দ্বিধায় ডবল দম চাপাতে তাই একটুও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। অমিয়েটের হত্যা ও এলিসের পাটনা আক্রমণের বিস্ফোরক চেহারা তাই তার অজানা রয়ে গেছে। এটাই যে নবাবের সঙ্গে

কোম্পানীর যুদ্ধ বাধবার তাৎক্ষণিক কারণ এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নাই বলেই না অমিয়েট-মতিবিবির ভাঁড়ামীর দৃশ্য কলমে এসেছে। তারপর নবাবী করতে মীরজাফরকে অনুরোধ করতে কোথায় হে, কোথায় অমিয়েট। একজন মীরকাশিমের কারাগারে বন্দী আর একজন পরলোকে। মীরজাফরকে মন্ত্রণা দিতে নাট্যকার নিয়ে এসেছেন কায়স্থ রায়দুর্লভকে। ইতিহাস অনুসারে এই সময়ে ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের বিশ্বাসঘাতক চেহারা সৃষ্টি করতে গিরিশচন্দ্র কার্পণ্য করেন নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদের এটা পছন্দ হয় নাই তাই তাঁর নাটকে নন্দকুমারের অপকীর্তিগুলির কোন চিহ্ন নাই। সম্ভবত এই সময়েই ক্ষীরোদপ্রসাদ নন্দকুমারকে 'দেশভক্ত শহীদ' বানিয়ে নাটক লেখার সংকল্প মনে মনে স্থির করেছেন। তাই নন্দকুমারকে সযত্নে মীরজাফরের কাছ থেকে সরিয়ে রেখে তার কলঙ্কিত কর্মগুলি লোকচক্ষের আড়ালে নিয়ে যাবার প্রয়াস পেয়েছেন।

নাটক নিয়েও বিপদে পড়েছেন নাট্যকার। সুরুতে মতিবিবির যুগল প্রেমিক সৃষ্টি করেছেন রাজা রামনারায়ণ আর মীরকাশেমের মধ্যে। গিরিশচন্দ্রের নাটকের জনপ্রিয়তা হৃদয়ঙ্গম না করলে একখানি ত্রিভুজ প্রেমের নাটক হয়তো সৃষ্টি হত এবং মীরকাশিম কর্তৃক রামনারায়ণের হত্যায় এই প্রেমের গল্পের সমাপ্তি ঘটত। বৃদ্ধ রামনারায়ণের বয়সের হিসাব না করে তাকে মতিবিবির প্রেমিক করার পেছনে এমনি একটা চিন্তা দেখা যায়। দ্বিতীয় অঙ্কে মীরণের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই দিকেই নাটক গেছে। গিরিশচন্দ্রের মীরকাশিমের জনপ্রিয়তায় তৃতীয় অঙ্কে নাটক অন্য পথ ধরল। ভেসে গেল মতিবিবি আর রামনারায়ণ। চতুর্থ অঙ্কে তাই চটপট প্রেমের গল্পের ছেদ-টানার চেষ্টা হয়েছে। রাজনীতির ভুয়া গন্ধে তখন নাটক জমাবার প্রয়াস দেখা যায়। মীরকাশিম আর অমিয়েটকে প্রতিপক্ষ খাড়া করে নাটক বাঁচাবার ব্যর্থ প্রয়াস একাধারে বাতুলতা আর কাণ্ডজ্ঞানহীনতার নামান্তর হয়েই দেখা দিল। ফলে প্রথম দুই অঙ্কের নাটকের ধারা পরের দুটি অঙ্কে আর দেখা যায় না। ইতিহাস না জেনে ঐতিহাসিক নাটক রচনার প্রয়াস কিরকম ব্যর্থ ও হাস্যকর হতে পারে ক্ষীরোদপ্রসাদ তার সম্যক উদাহরণ দিয়েছেন। নাটক পাঠ করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে নাট্যকার ইতিহাসের কার্য্য কারণ কিছুই বুঝতে পারেন নাই।

পঞ্চম অঙ্ক ॥

পঞ্চম অঙ্কে নাট্যকার নাটক বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। প্রথম দৃশ্যে সমরু, গুরগিণ, তকী খাঁ ও রাজবল্লভ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হচ্ছেন। (রাজবল্লভ ও তার পুত্র কৃষ্ণদাসকে নবাব যে বধ করেছিলেন এটা নাট্যকারের অজানা মনে হয়।) তকী খাঁর উপর দেওয়া হল কাটোয়ার ভার। সমরু ও মার্কার পেলেন গিরিয়ার আর গুরগিণ খাঁ উধুয়ানালার ভার। গুরগিণ আরো কিছুদিন অপেক্ষা করে যুদ্ধ ঘোষণার উপদেশ দিলেন। মীরকাশিম পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এসে বললেন যে তার পুত্রকে অপহরণ করতে চাওয়ায় ইংরেজ মনোভাব স্পষ্ট বোঝা গেছে। সুতরাং আর দেরী না করে এখনই যুদ্ধ ঘোষণা করা হবে। রামনারায়ণকে আনা হলে তাঁর বক্তব্য হল, ঈশ্বরের নাম নিয়ে তিনি অমিয়েটকে সাহায্য করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সুতরাং সে প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙতে পারবেন না। যদিও এখন তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারছেন যে অমিয়েটকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে। ই র জীবনের এই নিদারুণ দ্বন্দ্ব মেটাতে নবাবের কাছে তিনি প্রাণদণ্ড যাচনা করেন। মতিবিবি এসে রামনারায়ণের জীবনভিক্ষা চাইলেন তাকে নিয়ে অন্যত্র চলে যাবার সংকল্প ঘোষণা করলেন। ফকির এসে বললেন যে মতিবিবির প্রতি মোহবশত মীরকাশিম যেন দেশের সর্বনাশ না করেন। নবাব কিছু স্থির করার আগেই গুরগিণ খাঁ খবর দিলেন যে ইংরেজ মীরজাফরের নামে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই। কাজেই দ্বিতীয় দৃশ্য থেকেই যুদ্ধ বেধে গেল। দৃশ্য রণস্থল।

কাটোয়ার যুদ্ধে এ্যাডামসের বিক্রম দেখা গেল। অবশেষে গোলা লেগে তকী খাঁর মৃত্যু ও ইংরেজের জয়। মতিবিবি এসে খুব কান্নাকাটি করলেন। তৃতীয় দৃশ্যে মীরকাশিম লুৎফউন্নিসাকে এসে খবর দিলেন যে গিরিয়াতেও তাঁর পরাজয় হয়েছে। শুনে মাতাকন্যা কান্নাকাটি করলেন। নবাব গিরিয়ার যুদ্ধের বর্ণনা দিলেন। বাঁশুলী নদীতে স্টুয়ার্ট সাহেব এবং তার সৈন্যদের মৃত্যু সংবাদ খুব জমিয়ে বললেন। এখানেই নবাব মীরকাশিম লুৎফউন্নিসাকে জানিয়ে দিলেন যে উধুয়ানালায় তাঁর জয়ের কোন সম্ভাবনাই নাই। চতুর্থ দৃশ্যে উধুয়ানালায় পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে এক ভৃত্য এল।

এইসব খবর শুনে গুরগিণ খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করবেন স্থির করে ফেললেন। কিন্তু নবাবের কাছ থেকে এই মতলব লুকিয়ে রাখতে পারলেন না। নবাব তাকে 'কোতল' করবার হুকুম দিলেন। এরপরই নবাব আত্মহারা হয়ে গেলেন এবং পাটনায় সমস্ত ইংরেজ বন্দীদের হত্যার সংকল্প ঘোষণা করলেন। সমসের নবাবকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। পঞ্চম দৃশ্যে নবাব রণস্থল। ইংরেজ দুর্গের ফটক ভেঙে ফেলেছে। (তবু রণস্থল ?) নবাব যুদ্ধ থেকে একচক্কর ঘুরে এসে সমসেরকে রোটাসে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন; তারপর যুদ্ধে যোগ দিতে চলে গেলেন। একটু পরে সমসের খবর দিলেন যে বেগম শত্রুর কবলে (প. প. পাতা-১০৯) এই কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে নবাব বন্দীদের হত্যা করতে নির্দেশ দিলেন তাঁর রোষবহ্নি লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠল।

ষষ্ঠ দৃশ্যে রামনারায়ণ ও মতিবিবি এই বন্দী হত্যার জন্য নবাবের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। কিন্তু যুদ্ধ চলছে সুতরাং উভয়েই যুদ্ধ করতে গেলেন। মতিবিবি ফটক রক্ষা (আবার ফটক এল কোথা থেকে!) করতে করতে অসীম বীরত্ব দেখিয়ে ইংরেজের হাতে বন্দী হলেন। স্থির হল যে যুদ্ধকালীন নিয়ম অনুযায়ী তার বিচার ও শাস্তি হবে। সপ্তম ও শেষ দৃশ্য একেবারেই আকস্মিক। বনপথে ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত, পরাজিত, ব্যাধিতাবিত নবাব মীরকাশিম মৃত্যুবরণ করলেন। সমরু এসে তাঁর রত্নালঙ্কার লুণ্ঠন করে নিল। অবশেষে ফকির এসে উপস্থিত হলেন। হৃতসর্বস্ব মীরকাশিমকে তিনি বহু সদুপদেশ দিলেন এবং মীরকাশিমের তুষ্টির জন্য কিছু যাদুবিদ্যার প্রদর্শন করলেন। এই যাদুবিদ্যায় তিনি বঙ্গনারী পূজিত বঙ্গমাতার আবির্ভাব তিনি মীরকাশিমকে দেখিয়ে তার জীবন সার্থক করলেন। মীরকাশিমের মন থেকে সব ক্ষোভ দুঃখ মুছে গেল তাঁর আত্মা পরিতুষ্টি লাভ করল। এইভাবে তাঁর কীর্তির সফলতা দেখে মীরকাশিম নির্দ্বিধায় মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। কল্পনাশ্রয়ী এই উদ্ভট নাটক চরমতম এক অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করে সমাপ্ত হল। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত মীরকাশিমকে এইভাবেই শেষ করতে হল। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মীরকাশিমের অসাফল্যের মাঝে এক মানসিক সফলতার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে নিদারুণ আত্মশ্লাঘা অনুভব করলেন।

আলোচনা ॥

পঞ্চম ও শেষ অঙ্ক একাধারে ইতিহাস বিরোধী ও নাটক হিসাবে প্রক্ষিপ্ত। ৩রা জুলাই ১৭৬৩ অমিয়েটের মৃত্যুর পর কোম্পানীর যুদ্ধসাজ সুরু হল মীরজাফরের সঙ্গে ১০ই জুলাই চুক্তিপত্র সাক্ষরিত হবার পর। কাটোয়ার যুদ্ধে তকি খাঁর পরাক্রম ও অন্যান্য নবাবী সেনাপতিদের বিশ্বাস-ঘাতকতা গিরিশচন্দ্রের নাটকে চমৎকার প্রকাশিত হয়েছে। কাটোয়ার যুদ্ধ ১৯শে জুলাই। গিরিয়ার পরাজয় ২রা অগাষ্ট। তারপরে মুর্শিদাবাদে মীরকাশিম আর ফিরে যেতে পারেন নাই। তাই লুৎফউন্নিসা বেগম মর্শিদাবাদের খোসবাগে থাকলেও মীরকাশিমের সেখানে যাবার উপায় ছিল না কারণ মুর্শিদাবাদ তখন ইংরেজ দখলে। আসলে লুৎফউন্নিসা কন্যা সহ তখন ঢাকায়। তাঁকে মাসিক ১০০০ টাকা ও তাঁর কন্যাকে মাসিক ৪০০ টাকা দেবার ব্যবস্থা কোম্পানী করেছেন। তাছাড়া লুৎফউন্নিসা মীরকাশিমকে জীবনে ক্ষমা করতে পারেন নাই। তার পতনে উল্লসিত হয়েছেন। ভুলে গেলে চলবে না যে পলায়নপর সিরাজদ্দৌলা ও লুৎফউন্নিসা বেগমকে মীরকাশিমই ধরেছিলেন এবং লুৎফউন্নিসার ব্যক্তিগত হীরা, মুক্তা জহরৎ, প্রভৃতি গহনাদি সেই সময়েই তিনি অপহরণ করে নেন। এই ঘটনার ফলেই সিরাজের হত্যা এবং লুৎফউন্নিসার অশেষ লাঞ্ছনা—একথা বাঙালী দর্শক ভুলে গেলেও কাশ্মীরের এই রূপবতী সিরাজের প্রিয়সখীর ভুলে যাবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। নাট্যকার কপোলকল্পনায় গিরিয়ার পরা-জয়েই মীরকাশিমকে হতোদ্যম দেখিয়েছেন। সেটা সত্য হলে উধুয়ানালার যুদ্ধ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হত্যা, বক্সারের যুদ্ধ এবং ক্রমান্বয়ে মীরকাশিমের নবাবী ফিরে পাবার প্রচেষ্টা মিথ্যায় পর্য্যবসিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরে উধুয়ানালার যুদ্ধের যে সুন্দর চিত্র এঁকেছেন সেটা জানা থাকলে নাট্যকার ভৃত্যের মুখে উধুয়ানালার পরাজয় বৃত্তান্ত প্রেরণ করতেন না। ৫ই সেপ্টেম্বর উধুয়ানালায় পরাজয় হল। এরপরই মীরকাশিম ক্ষিপ্ত হয়ে রাজা রামনারায়ণকে জলে ডুবিয়ে এবং রাজা রাজবল্লভ ও তার পুত্রকে গুলি করে হত্যা করেন। তারপরই মীরকাশিম জগৎশেঠদের সঙ্গে করে মুঙ্গের ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। ১লা অক্টোবর মেজর অ্যাডামস মুঙ্গের পৌঁছলেন ৩রা অক্টোবর দুর্গ দখল করলেন। পাটনায় মীরকাশিম নারী পুরুষ শিশু নির্বিচারে সমস্ত

ইংরেজ বন্দীদের নিহত করলেন। এই কলঙ্কের একমাত্র সাক্ষী হলেন ডাক্তার ফুলারটন। ১৪ই অক্টোবর মীরকাশিম পাটনা ছেড়ে পালালেন। ১৮ই অক্টোবর গুরগিণ খাঁর গুপ্তহত্যা ঘটে গেল। সকলে সন্দেহ করলেন যে এটা নবাবের প্ররোচনায় ঘটেছে। পরদিন ১৯শে অক্টোবর জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। ৬ই নভেম্বর ইংরেজ পাটনা দখল করল। মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় পেলেন ডিসেম্বর মাসে। পরবর্ত্তি বছরে অর্থাৎ ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর বক্সারের যুদ্ধ। মীরকাশিম তখন একটা খোঁড়া হাতির পিঠে চেপে সপরিবারে দিল্লীর পথে পলায়ন করছেন। কাজেই তার বেগমকে ইংরেজ চুরি করেছে একথা একান্তভাবে অসত্য। শেষের আগের দৃশ্যের এই যুদ্ধই বা কোন যুদ্ধ নাট্যকার তার নির্দেশ দেন নাই। নাটকীয় করার জন্য নির্জন বনে তাঁর একাকী মৃত্যু সহ্য কয়া সম্ভব হলেও 'বঙ্গনারীপূজিত বঙ্গমাতার আবির্ভাব' অসহ্য। কেবলমাত্র স্বাধীনতাকাঙ্খী দর্শকদের মনকে নির্দয়ভাবে দোহন করা ছাড়া এই দৃশ্যের আর কোন মূল্য নাই। সমস্ত নাটকই অসঙ্গতির সমষ্টি মাত্র কোন উচ্চভাব বা আদর্শের বাহন নয়। মতিবিবির চরিত্র সৃষ্টি করে 'মোহনলাল' সম্পর্কে বাঙালীর দুর্বলতার চরম সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মোহনলালের কন্যা এক মুসলমান বীরকে বিবাহ করেন। এরপর মোহনলালের খোঁজ পাওয়া যায় কিন্তু মোহনলাল-কন্যা লুপ্ত।

পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত নাটক হিসাবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট এবং ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে সম্পূর্ণ বাতুলতাশ্রয়ী। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের রচনা না হলে এই নাটককে বিনালোচনায় বাতিল করে দিলেও কোন ক্ষতির কারণ ছিল না। কিন্তু একাধারে মীরকাশিমের নাটক এবং একজন জনপ্রিয় নাট্যকার সুতরাং নাটকের বিশদ আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের অনুকরণ করতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষীরোদপ্রসাদ একেবারেই তলিয়ে গেছেন—প্রমাণ করেছেন গিরিশের অনুকরণও সুকঠিন।

মন্মথ রায়: মীরকাশিম বা পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত

বাজেয়াপ্ত হবার পর মীরকাশিমকে নিয়ে দীর্ঘদিন কোন নাটক রচিত হয় নাই। কারণ অবশ্য ইংরেজের ভয়। বিদ্রোহী সাজবার

মতো নাট্যকার পাওয়া যেমন কঠিন হল—স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী নাটক অভিনয় করার মঞ্চ মালিক পাওয়া হল অসম্ভব। বৃটিশ সরকার দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করতে লাগলেন। পুরাতন নাট্যকারদের যুগ চলে গেল নূতন যুগের নাট্যকার নূতন অভিনেতৃকুল দেখা দিল। শিবজীর জীবনীকে কেন্দ্র করে শচীন সেনগুপ্ত গৈরিক পতাকায় আলগা করে দেশপ্রেমের ফোড়ন দিলেন। মন্মথ রায় আর এক ধাপ এগিয়ে কংস কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে নাটক রচনা করলেন। এবার একটু সাহস করে কংসের রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানান হল। সাপ হলেও জাতটা নির্বিষ। মুশকিল করল কাজী নজরুল ইসলামের কট্টর দেশপ্রেমী গানগুলো। অভিনয় বন্ধ হল। কিছুদিন পর গানগুলি ছেঁটে অভিনয় অনুমতি মিলল কিন্তু ততদিনে নাটক আলুনি হয়ে গেছে। ১৯৩৮-এ শচীন সেনগুপ্তর সিরাজদ্দৌলা জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে গেল। ভাবালুতায়—নাটকের প্রতিষ্ঠা যত হল—স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা তত প্রকট হল না। দর্শক কেঁদে কেঁদে প্রেক্ষাগৃহ ভাসিয়ে দিলেন। প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ সরকার নাটক চলতে দিলেন। সেই বছরই নাট্য নিকেতনের সত্বাধিকারী শ্রী প্রবোধচন্দ্র গুহর আগ্রহে মন্মথ রায় 'মীরকাশিম' নাটক লেখার ভার পেলেন। 'লেখকের কথা'য় এই সব মূল্যবান সংবাদ তিনি দিয়েছেন আর জানিয়েছেন তিনি ইতিহাসের কোন কোন বই পাঠ করে নাটক রচনায় উদ্যোগ করেন। তিনি লিখেছেন 'বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে মীরকাশিমের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়াছে এবং এ নাটকে ইতিহাস বিকৃত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।' মীরকাশিম সম্পর্কে নাটক লেখার সব থেকে বড় বিপদ যে কোন একখানি পুস্তকে মীরকাশিমের ইতিহাস লিপিবদ্ধ নাই। সেজন্য বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা বিভিন্ন পুস্তকের সাহায্য নিতে হয়। গিরিশচন্দ্রকে মীরকাশিম নাটক লিখতে যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। বাধ্য হয়েই অনেক বিষয়ে গিরিশচন্দ্রকে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের বৃহৎ মীরকাশিম প্রবন্ধের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। মন্মথ রায় যদি গিরিশচন্দ্রের নাটক ও অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধ, নাটক লেখার আগে পড়তে পেতেন তা হলে নিঃসন্দেহে তার নাটকের ত্রুটিগুলি শুদ্ধ করা সম্ভব হত। এই দুই পুস্তকই তখন 'নিষিদ্ধ' তালিকায় সুতরাং মন্মথবাবু যদি তা না পেয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে দোষী করা যায় না। তবে মীরকাশিম সম্পর্কে

সব থেকে প্রয়োজনীয় রচনা গিরিশচন্দ্র পাঠ করেছিলেন কিন্তু মন্মথ রায় করেন নাই—সেটি হল Vansittarts' Narrative of the Transactions of Bengal from 1760—1765. এই বইটিতে ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেবের বক্তব্য, তিনি মীরকাশিমের সঙ্গে যে চিঠি-পত্র আদান প্রদান করেছেন সেগুলি, হেস্টিংস, ডাক্তার ফুলারটন প্রভৃতির রিপোর্ট মায় কাউন্সিলের দৈনিক আলোচনার প্রতিলিপি অন্তর্ভুক্ত আছে। জগৎশেঠ ও মীরকাশিম সম্পর্কের প্রামাণ্য বই J. H. Little এর House of Jagatseth ও মন্মথবাবু পড়বার সুযোগ পান নাই। এই দুটি বই মীরকাশিম সম্পর্কে আলোচনার আকড় গ্রন্থ। এই বই দুইটি পাঠ করলে মীরকাশিমের চরিত্র ও কীর্তি আরো স্পষ্ট হত সন্দেহ নাই। যেসব গ্রন্থ পাঠ করে মন্মথবাবু মীরকাশিম নাটক রচনায় মনস্থ করেছিলেন, কোন গ্রন্থই নবাব মীরকাশিমকে দেশপ্রেমী বা শহীদ বা স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী বলে উল্লেখ করে নাই। সুতরাং দেশপ্রেমী নবাব সৃষ্টি করাটাই সত্যের অপলাপ বা ইতিহাস পরিপন্থী হয়েছে।

মন্মথ রায়ের মীরকাশিম নাটক নানা দিক থেকে বিশিষ্টতার দাবী রাখে। গিরিশচন্দ্র বহু ঘটনার সমাবেশ করেছেন, মন্মথবাবু কয়েকটি মাত্র ঘটনা মাধ্যমে সমগ্র মীরকাশিমের জীবন দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন। দুটি নাটকের রচনাশৈলীতে আকাশ পাতাল প্রভেদ। গিরিশচন্দ্রের ছোট ছোট নানা দৃশ্যে মীরকাশিমের জীবনের ঘটনা প্রকাশিত। মন্মথবাবুর পঞ্চাঙ্কে, দৃশ্য সংখ্যা মাত্র সাতটি। সম্ভবত শচীন সেনগুপ্তর সিরাজদ্দৌলা নাটকের ছায়ায় রচিত এবং অভিনয় মঞ্চে অনুবর্ত্তী হবার জন্যেই মীরকাশিম চরিত্রে প্রচণ্ড ভাবালুতার ছাপ লেগেছে আর মীরকাশিমের পতনের কারণেও জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ প্রভৃতির ষড়যন্ত্র বলা হয়েছে। এই ভাবে দুটি নাটককে এক গোত্রে ফেলা হয়েছে। মীরকাশিমের পতনের অন্যতম কারণ যে তাঁর ব্যক্তিগত লোভ, অর্থ আদায়ের জন্য সন্ত্রাশ সৃষ্টি এবং কাউকে বিশ্বাস না করা, ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের মতো এই নাটকেও অবহেলিত হয়েছে।

তবে ১৯৩৮ এর দর্শক ব্যর্থতার খবর নিতে আসেনি। তারা চটকদার নাটকের চমৎকার অভিনয় দেখে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছে। মন্মথ রায়ের মীরকাশিমের জনপ্রিয়তার সূত্র ধরে আবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' নাট্যরূপে অভিনীত হয়েছে। নাম ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের সংযত অভিনয় মাধুর্য্য

অভিনয় ইতিহাসে স্তম্ভ হয়ে থাকার যোগ্য। বস্তুত শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সংযোগে মীরকাশিম অভিনীত হয়। খোজা পিক্রশ ও গুরগিণ খাঁর ভূমিকায় যথাক্রমে নরেশ মিত্র ও অমল বন্দ্যোপাধ্যায় অপূর্ব অভিনয় করেন। এরা ছাড়া মীরজাফর-শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, নজাফ খাঁ—ভূপেন চক্রবর্ত্তী, নাজামাদ্দৌলা—সিধু গাঙ্গুলী, ফতেমা—নীহারবালা ও মণিবেগম—অপর্ণা। সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল পরিচালনায় সতু সেন। প্রথম অভিনয় রজনী ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৮ বা ১লা পৌষ ১৩৪৫ শনিবার রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকায়। স্থান—নাট্যনিকেতন মঞ্চ। মীরকাশিম অভিনয় হয় সিরাজদ্দৌলার পরেই সুতরাং দর্শক সাধারণের মনে দ্বিতীয় নাটক প্রথম নাটকের শেষাংশ বলে মনে হয়েছে। নিঃসন্দেহে প্রথম নাটকের প্রচণ্ড ভাবালুতা দর্শক মাধ্যমে দ্বিতীয় নাটককে আবৃত করেছে। অথচ একথা অনস্বীকার্য্য যে ঐতিহাসিক বিচারে মীরকাশিম সিরাজদ্দৌলার থেকে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সময়ের পুনরুক্তি হল না। মন্মথ রায়ের মীরকাশিম নাটক শচীন সেনগুপ্তর সিরাজদ্দৌলার থেকে জনপ্রিয় হতে পারল না। প্রধান কারণ নাটকের দৌর্বল্য। বলাবাহুল্য মীরকাশিম নাটকেও কম ত্রুটি নাই। রাজা রামনারায়ণ কি করে যেন চুঁচুড়ার রায়দুর্লভ হয়ে গেলেন। মীরকাশিম তাকে বধ করে ফেললেন। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয় আবার জুড়ে এক ব্যক্তি হয়ে গেলেন আর রাজবল্লভ তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাসকে হারিয়ে বসে পড়লেন। ছোটখাট ত্রুটি আছে যেমন ভ্যান্সিট্টার্ট যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই—কাউন্সিল করেছিল। কপর্দকহীন ভাবে মীরকাশিমের মৃত্যুও এক নাটকীয় মৃত্যু দিয়ে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

মন্মথ রায়ের মীরকাশিম নাটকে পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৪ আর বিজ্ঞাপন, লেখকের কথা, উৎসর্গ, কুশীলব প্রথম পাতা মিলে আরো ১৪ পাতা। নাটক পাচ অঙ্কের। তারমধ্যে প্রথম অঙ্ক ১-২০ পাতা, দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য ২১—৫৭ পাতা, তৃতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য ৫৮—৮৭ পাতা, চতুর্থ অঙ্কে একটি দৃশ্য ৮৮—১০০ পাতা ও পঞ্চম অঙ্কে একটি দৃশ্য ১০১—১১৪ পাতা। নাটক সুরু হচ্ছে একেবারে ঘোর দ্বন্দ্বের মধ্যে সময় ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ তারিখ ১৫ই মে নবাবের কাছে চরম পত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অমিয়েট আর হে সাহেব। নাটকের চতুর্থ অঙ্ক শেষ হচ্ছে উধুয়ানালায় পরাজয়ের পর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হত্যায় অর্থাৎ ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে। পঞ্চম অঙ্ক

অনৈতিহাসিক কাজেই যে কোন সময়ে হতে পারে। ধরা যাক মীরকাশিমের মৃত্যুর বছর অর্থাৎ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। মূল নাটককে অর্থাৎ প্রথম থেকে চতুর্থ অঙ্ক মাত্র পাঁচমাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে নাট্যকার প্রকৃষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

উৎসর্গ পত্রে নাট্যকার লিখেছেন 'মীরকাশিম বাঙলার অতীত স্বাধীনতার সন্ধ্যাদীপ!' বাক্যটির শেষে আশ্চয হয়ে যাবার চিহ্ন নাট্যকার অথবা মুদ্রাকর দেবার সময় নিশ্চয় ভাবেন নাই যে ওই চিহ্নটাই নাটকের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা হয়েছে। বিশদভাবে বলতে হলে—ওই চিহ্নটি আশ্চর্য হয়ে জনসমক্ষে প্রশ্ন তুলেছে—মীরকাশিমকে বাঙলার অতীত স্বাধীনতার সন্ধ্যাদীপ বলা যায় কি? উত্তর অত্যন্ত সহজ। মীরকাশিম স্বাধীন ছিলেন না তিনি দিল্লীর অধীনে বাঙলা বিহারের সুবেদার মাত্র ছিলেন। এই সুবেদারীর বাদশাহী ফারমান সংগ্রহ করতে তিনি কম অর্থ ব্যয় করেন নাই। তিনি নিজে বাঙালী ছিলেন না সুতরাং বাংলা সম্পর্কে তাঁর কোন মোহ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজ সাহায্যে নবাবী চালিয়ে ব্যক্তিগত আর্থিক প্রাচুর্য বৃদ্ধি করতে। সেখানেই বিরোধ বাধল। ইংরেজের সঙ্গে বিরোধ কেবলমাত্র অর্থনৈতিক কারণে। বাদশাহ ইংরেজকে ডেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী দিলেন শুধু সময়ে রাজস্বের টাকা ঠিকমত পাবার এবং প্রয়োজনে দিল্লীচ্যুত দিল্লীর বাদশাহকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে, ইংরেজের ক্ষমতা ও অর্থ সাহায্য লাভ করার জন্য। ঐতিহাসিকের চোখে মীরকাশিমের এই হতোদ্যম ক্রমবর্দ্ধমান ইংরেজ কোম্পানীর ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচেষ্টা একমাত্র নাটকীয় ঘটনা। মীরকাশিম সংযত হলে এ বিদ্রোহে সফলতার আশা ছিল বলেই মীরকাশিমের ইতিহাস নাটকের উপজীব্য হয়েছে।

প্রথম অঙ্ক॥

প্রথম অঙ্ক সুরু হচ্ছে নাটকীয়ভাবে। গুলিবিদ্ধ গুপ্তচর নবাবের সামনে এসে মৃত্যুবরণ করল। মীরকাশিম জানালেন বাংলায় বেইমানের অভাব নাই। তিনি নিজেও যে সিরাজকে বেইমানী করে ধরিয়ে দিয়েছিলেন সেকথা স্পষ্ট না বলেও প্রকাশ করলেন। 'নজাফ খাঁ' নামে এক সেনাপতি

নবাবের বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে চিত্রিত হয়েছেন। সভায় উপস্থিত জগৎশেঠ, রাজবল্লভ ও গুরগিণ খাঁ। স্থান মুঙ্গের দুর্গের মন্ত্রণাকক্ষ। গুপ্তচরের জুতোর মধ্যে এক লাল পাঞ্জা পাওয়া গেল ওটাই নাকি কোম্পানীর বিশ্বস্ততম লোকের চিহ্ন। ওই পাঞ্জা দেখিয়েই নাকি মীরকাশিম কর্নেল কলার্ডকে মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ দখল করতে সাহায্য করেন (মীঃ পাতা-৫)। কোম্পানী নাকি চায় ওই পাঞ্জা হাতে নিয়ে নবাব রাজ্যশাসন করবেন অর্থাৎ কোম্পানীর গোলামী করবেন। সিরাজদ্দৌলাকে এই সুযোগে নবাব মীরকাশিম 'সিংহশিশু' বলে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করছেন এবং পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত করবার সংকল্প ঘোষণা করছেন। মীরকাশিম পেছনের ইতিহাস বর্ণনা করে কি করে তিনি নবাবী লাভ করলেন সকলকে জানাচ্ছেন। বলছেন বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুরের রাজস্ব দিলেন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আর দিলেন তাদের দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের খরচ চালাতে পাঁচলক্ষ টাকা। গুরগিণ বললেন নবাব প্রজারঞ্জক। নবাব তখন এলিসের সঙ্গে গোলমালের কারণ এবং গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংসের দৌত্যের সন্ধিপত্রের কথা সকলকে জানাচ্ছেন। কলকাতার কাউন্সিল দলে ভারি হয়ে গবর্ণরের এই সন্ধিপত্র বাতিল করে দেন। তখন বাধ্য হয়ে নবাব সমস্ত জিনিষের ওপর শুল্ক আদায় রহিত করেন। ফলে সাধারণ ব্যবসায়ী আর কোম্পানীকে প্রতিযোগীতায় নামতে হল। তাই অমিয়েট ও হে আসছেন নবাবকে বোঝাতে যে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার কেবল কোম্পানীর। অন্য কেউ এই সুযোগের অধিকারী হতে পারেন না।

রাজা রায়দুর্লভ এই সময় বলে ফেললেন মুর্শিদাবাদে ফিরে যাবার কথা। শচীন সেনগুপ্ত অনুকরণে মন্মথ রায় দিয়েছেন মীরকাশিমের সংলাপ। 'রাজা রায়দুলভ, শ্রেষ্ঠী মহাতাপচাঁদ, বিচক্ষণ রাজবল্লভ, শুনে আশ্বস্ত হলাম— মুশিদাবাদের জন্য আপনাদের প্রাণ আজ কাঁদছে! কিন্তু মর্শিদাবাদকে শ্মশান করে সেই তমসাবৃত নগরীর পথে পথে সিরাজের শবদেহ নিয়ে আপনারা প্রেতের যে তাণ্ডব করেছিলেন, তাও আমি দেখেছি।' মীরকাশিমের মনোভাবের চমৎকার প্রকাশ হয়েছে এই আংশিক অনৈতিহাসিক সংলাপে। তেমনি হয়েছে আরেকটিতে যখন রায়দুর্লভ কালীঘাটে গঙ্গাতীরে বাস করবার

অনুমতি চাইছেন নবাবের কাছে। নবাব বলছেন—'অমিয়েট আর হে সাহেব আপনাকে বলে দিয়েছে আপনি হিন্দু, তবে না আপনার মনে পড়ে গেল আপনি হিন্দু, কি বলেন ?' (মীঃ পাতা ১১) যদিও এ সংলাপ সত্য হযেছে উনবিংশ শতাব্দীতে মীরকাশিমের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর, তবু জাতিয়তাবাদী নাযক সৃষ্টি করলে ইংরেজের এই বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াসেরও উল্লেখ থাকা প্রয়োজন সেদিক থেকে সংলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় তকী খাঁ খবর দিলেন যে কলকাতা থেকে কোম্পানীর ত্রিশখানা নৌকা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাটনা যাচ্ছিল। মুঙ্গেরে সেগুলিকে আটক করা হয়েছে। এর পরই অমিয়েট ও হে সাহেবের সঙ্গে নবাবের বিতণ্ডা। সাহেবরা নবাবের ওপর তাদের এগার দফা দাবী চাপিয়ে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকারী হতে চাইলেন। নবাব তাতে রাজী না হয়ে জানালেন যে তিনি বাণিজ্যের সমস্ত মাশুল তুলে দিয়েছেন। এর পরই পাটনাগামী নৌকায় অস্ত্রশস্ত্র পাওযা গিযেছে জানিয়ে নবাব হে সাহেবকে জামিন রেখে অমিয়েট সাহেবকে বিদায় দিলেন। আরাব খাঁ এসে খবর দিল যে এলিস সাহেব অতর্কিতে পাটনা আক্রমণ করে দুর্গ দখল করেছেন। তার অত্যাচারে, অবাধ হত্যায়, লুঠতরাজে, অগ্নিদাহে পাটনার ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠেছে। মীরকাশিম এই সংবাদে ক্ষিপ্ত হযে বলছেন যে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সবত্র কোম্পানীর অত্যাচারে এই বুক-ফাটা কান্না দেখা দিয়েছে। তারপর তিনি ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি সমরসজ্জার আহ্বান জানাচ্ছেন। বলছেন 'বাংলা-বিহারে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত সব কুঠি অবরোধ কর, সমগ্র ইংরেজ ব্যবসায়ীকে বন্দী করে শাঠ্যের সমুচিত শাস্তি দিযে পলাশীতে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর !' (মীঃ পাতা ২০)।

আলোচনা ॥

মীরকাশিমের চরিত্র যে প্রক্ষিপ্ত তা আমরা আলোচনা করেছি। জন সাধারণের সঙ্গে তার যোগ না থাকায় নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষের সর্বাত্মক সংগ্রামের ডাক সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক হয়ে গেছে। বস্তুত এমন জনচিত্তহারী ভাষণ দিতে পারলে মীরকাশিমের পতাকা তলে বহুলোক সমবেত হত এবং তাঁর ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেত শতগুণ। এইসব মৌলিক অসঙ্গতি সত্ত্বেও নাট্যকার

প্রথম অঙ্কে বিরোধের সূত্রগুলি চমৎকার বর্ণনা করেছেন। এলিসের পাটনা আক্রমণকে যুদ্ধ আরম্ভের কারণ হিসেবে বর্ণনা করা খুবই নাটকীয় হয়েছে সন্দেহ নাই। তবে একটা ভ্রান্তি রয়ে গেছে। নবাব অস্ত্র পূর্ণ নৌকাগুলি হে ও অমিয়েটের অনুরোধে ছেড়ে দেবার পরে এলিস পাটনা আক্রমণ করেন। সত্য ঘটনা বর্ণনা করলে এখানে নবাবের শান্তিপূর্ণ মনোভাব আরো স্পষ্ট হত। তবে এসময় ইংরেজ প্রতিনিধিদের (ক্লাইভ সাহেব বাদে) কোন নবাবের সামনে দাঁড়িয়ে তেজ বা বিক্রম দেখাবার সাহস ছিল না—তাতে কোতল হবার ভয় ছিল। নবাবদের সামনে ইংরেজ প্রতিনিধিরা সাধারণত (ওয়াটস সিরাজকে ভয় পাওয়াবার জন্যে ইচ্ছা করে অসভ্যের মতো দরবারে চিৎকার করতেন—কিন্তু তাও কলকাতা যুদ্ধে ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭তে নবাবের পরাজয়ের পর) খুবই শান্ত, শিষ্ট ও ভদ্র ব্যবহার করতেন। আর একটি ভুল খবর হল এলিস পাটনার দুর্গ জয় করতে পারেন নাই কেবল শহর দখল করেছিলেন। দুই দিন পরই মার্কার আর সমরু এলিসকে দলবলসহ যুদ্ধে হারিয়ে বন্দী করে। আর একটি ভুল মীরকাশিম যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই।

নাট্যকার ষড়যন্ত্রের আগুন জ্বালিয়ে রেখে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে যারা সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করেছে তারাই মীরকাশিমের পতনের প্রত্যাশী হয়েছেন। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অমিয়েট ও হে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল যখন মুঙ্গেরে এসে নামলেন তখন এই তথাকথিত ষড়যন্ত্রীরা কে কোথায় ছিলেন দেখা যাক। রায়দুর্লভ তখন মনের দুঃখে কলকাতায় অবসর যাপন করছেন মাঝে মাঝে পিতৃভূমি চুঁচুড়া যাতায়াত করছেন। জীবনে আর কখন রাজনীতি করবেন না এমন সংকল্পও করতে পারেন এ সময়। এদিক থেকে রায়দুর্লভ প্রথম বাঙালী রাজনৈতিকের সম্মান্ পাবার যোগ্য। আগেই জানান হয়েছে যে সিরাজের পতনের ষড়যন্ত্র এঁরই মস্তিষ্ক নিষ্কোষিত প্রজ্ঞার ফল। জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে তকি খাঁ নবাব আদেশে বন্দী করলেন এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে। তাঁদের সসম্মানে হিরাঝিল প্রাসাদে আটক রাখা হল।[৭৯] অমিয়েটকে হত্যার পর তাদের মুঙ্গেরে আনা হয়। বন্দী অবস্থায় তাঁদের পক্ষে কোন ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ অসম্ভব ছিল। এইসব ঘটনার কিছু আগে রাজবল্লভ রামনারায়ণের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের অভিযোগ করলে নবাব মীরকাশিম রাজা রামনারায়ণকে বন্দী করে মুঙ্গেরে নিয়ে

আসেন। সেই সময় গ্রেপ্তার হলেন ভোজপুরী জমিদারদ্বয় ফতে সিং আর বুনিয়াদ সিং। রাজা রাজবল্লভ এই সময় পাটনায় নায়েব নাজিম হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে আরাম করছেন। পাটনা দখলে রাজবল্লভের যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা থাকতে পারে ভাবামাত্র মীরকাশিম তাঁকে আর জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাসকে বন্দী করে মুঙ্গেরে নিয়ে আসেন। সুতরাং ১৫ই এপ্রিল এই তিন ব্যক্তির পক্ষে একত্র হয়ে মুঙ্গেরে কোনরকম ষড়যন্ত্র করা অসম্ভব। মীরকাশিম পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত করতে মনস্থ করেছিলেন এটা কবির কল্পনামাত্র। সিরাজের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। ঢাকায় লুৎফউন্নিসা কন্যা সহ এসময় অশেষ কষ্টে দিন যাপন করেছেন। পলাশী থেকে মীরকাশিম একটি মাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন সেটি হল কদাচ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত না থাকা এবং এই শিক্ষাই তাঁর পক্ষে মারাত্মক রূপ নিয়েছে। মীরকাশিম চরিত্রের দু'টি দোষ, লোভ এবং অবিশ্বাস তাঁর বহু সদগুণকে প্রকাশ হতে বাধা দিয়েছে। গবর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও হেস্টিংস সাহেবদ্বয়ের মীরকাশিম সম্পর্কে সাক্ষাতের বিবরণ না থাকলে—পরবর্তী ইতিহাস তাকে দানবরূপে কল্পনা করতে দ্বিধা করত না। মুতাক্ষরীণ লেখক সৈয়দ গোলাম হোসেনের সম্পত্তিও তিনি কেড়ে নেন। মুতাক্ষরীণ তাই কলমের ডগায় নবাব চরিত্রের নিন্দাই প্রকাশ করেছেন। এসব কথা বলেও নাট্যকারকে সাধুবাদ দিতে হবে কারণ প্রথম অঙ্ককে তিনি ঐতিহাসিক সাজে যেভাবে সাজিয়েছেন তাতে ইতিহাসের খুব বেশী ব্যতিক্রম হয় নাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ॥

দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি দৃশ্য। প্রথমে কলকাতায় ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের কুঠি। সেখানে সব ইংরেজ রাজপুরুষগণ সমবেত হয়েছেন। মীরজাফর ও মণিবেগম সেখানে উপস্থিত হয়েছেন সঙ্গে নন্দকুমার। মণিবেগম চান যে মীরজাফর পুনরায় নবাব হবেন, মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ হলে তার পতন হবে। এই কর্মের জন্য তিনি যথাসর্বস্ব ব্যয় করতে প্রস্তুত। মীরজাফর একটু দ্বিধা করতেই মণিবেগম বকে উঠলেন সাহেবরা যা বলবেন তাতেই তিনি সম্মত। তারপর মণিবেগমের উপদেশে খোজা পিক্রুসকে কয়েদখানা থেকে মুক্তি দেওয়া হল। কারণ পিক্রুস গুরগিণ খাঁর ভাই। মণিবেগম

তখন পিক্রসকে অর্থ দেবার প্রতিশ্রুতিতে গুরগিণ খাঁকে হস্তগত করার ভার নিলেন। তারপরেই অমিয়েট ও হের হত্যার খবর এল। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর সাহেবরা সমস্বরে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। পরমুহূর্তেই মীরজাফরকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব ঘোষণা করা হল এবং তিনিও বশংবদ ভৃত্যের মতো ইংরেজের সব সর্তে না দেখেই সাক্ষর করে দিলেন। শেষ সময়ে জানা গেল যে মণিবেগমের আসল রাগ মীরকাশিমের ওপর নয় তার স্ত্রী মীরজাফর কন্যার ওপর কারণ তিনি মণিবেগমকে তার পিতার বিবাহিতা পত্নী বলে স্বীকার না করে করেছেন চরমতম অপমান। ভ্যান্সিটার্ট সাহেব শেষে বলছেন 'শয়টান মীরকাশিমকে এমন সাজা ডিব সারা বাংলা দেশটা কাঁপিয়া উঠিবে' (মীঃ পাতা ৩৬)।

আলোচনা ॥

ঐতিহাসিক কাল সম্পর্কে ধারণা না থাকলে নাট্যকারের গম্ভীর কাজও হাসির উদ্রেক করে। এই দৃশ্য সেইরকম। ভ্যান্সিটার্টের কুঠিতে ইংরেজ রাজ-পুরুষের মাঝে মীরজাফর, বেগম ও নন্দকুমার সহ সমবেত হবেন এটা আশ্চয কথা। সাহেবরা কাউন্সিলে মিলিত হতেন। বেগমরা কখনই নিজেদের আবাস ত্যাগ করতেন না। বিংশ শতাব্দীর আবহাওয়ার কিছুই যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছিল না এটা না বোঝার ফলেই অধিকাংশ নাট্যকার বহু ভুলের সম্মুখীন হয়েছেন। পাটনায় ইংরেজ নরনারী হত্যার পর ভ্যান্সিটার্টের বক্তব্য উদ্ধৃত করে দেখান হয়েছে। সেই ব্যক্তির পক্ষে মীরকাশিমকে 'শয়টান' বলা যে একান্ত অসম্ভব তা বলাইবাহুল্য। মণিবেগমের খোজা পিক্রসের সাহায্য নিয়ে মীরকাশিমের পতন ঘটান আর এক অসম্ভব ঘটনা। নবাব রা নবাব-বেগম কেউ এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের ধারক বা বাহক ছিলেন না। তাই তাদের হাত থেকে ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে চলে গেল। তাঁরা কোম্পানীর হুকুমে মসনদে বসেছেন, সাহেবদের মন জুগিয়ে আত্মরক্ষা করেছেন এটাই বাংলার নবাবীকে নপুংসক করে দিল। মীরজাফর বিনাসর্তে নবাবী গ্রহণ করলেন এটাও ঠিক কথা নয়। মীরজাফর যে মুহূর্তে বুঝলেন যে কোম্পানীর কাছে তাঁর দাম কম নয় সঙ্গে সঙ্গে দরদাম সুরু করে দিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে নবাবীতে বসবার আগে সর্ত ঠিক করতে হবে কারণ এবার নবাবী গ্রহণ করলে সম্পূর্ণ-

ভাবে কোম্পানীর মুখাপেক্ষী হতে হবে নিজের কোন স্বাধীনতা থাকবে না। মীরজাফরের প্রধান সর্ত্ত তাই হল—রাজা নন্দকুমারকে তাঁর মন্ত্রী হতে দিতে হবে। আর তাঁর মৃত্যুর পর মণিবেগমের পুত্র নাজামদ্দৌলাকে নবাব করতে হবে। ইচ্ছা না থাকলেও দুটি সর্ত্তই ইংরেজকে বাধ্য হয়েই মানতে হয়। নন্দকুমারের কুচক্রী কর্ম কখন কি বিপদ আনে এই ছিল ইংরেজের ভয়। বিশেষ চিঠিপত্র জাল করতে নন্দকুমারের সিদ্ধহস্ততার প্রমাণ তাদের কাছে কম ছিল না। মণিবেগমের পুত্র নাজামাদ্দৌলাকে অনেকেই মীরজাফরের সন্তান বলে মনে করতেন না। কিন্তু দুইটি সর্ত্তই ইংরেজ কোম্পানী মানলেন। 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হয় নন্দকুমার মীরজাফরের দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। একমাত্র তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র সুরু করলেন। নাট্যকার মন্মথ রায় এইসব ঘটনা জানতেন না। তাছাড়া একালের 'শহীদ নন্দকুমার' সৃষ্টির জোয়ার দেখে তিনি একটু পাশ কাটাতে চেষ্টা করেছেন। তাই দৃশ্যে নন্দকুমার মীরজাফরের বন্ধু হিসাবে উপস্থিত থাকলেও বিশেষ কথাবার্তা বলেন নাই। নানা কারণে তাই মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাধার কারণগুলো অস্পষ্ট রয়ে গেছে। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে অমিয়েট ও হের হত্যা যুদ্ধ বাধার একমাত্র কারণ। এখানেও নাট্যকার অসাবধান। অমিয়েট হত হন কিন্তু হে বন্দী ছিলেন। উধুয়ানালার পরাজয়ের পরে পাটনায় ও মুঙ্গেরে ইংরেজ বন্দীদের হত্যার সময় হে মৃত্যুবরণ করেন। শচীন সেনগুপ্ত তাঁর সিরাজদ্দৌলা নাটকে যে 'বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব' সৃষ্টি করেছেন পরবর্তী নাট্যকারগণ তারই প্রতিধ্বনি করেছেন। সমস্ত আওয়াজটাই ভুল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওই রকম কোন শব্দ বা পদ ছিল না। ভারতবর্ষ মোগল সরকারের অধীনে কয়েকটি সুবায় বিভক্ত ছিল। ভৌগলিক বাংলা বিহার উড়িষ্যা 'বাংলা সুবা'র অন্তর্গত ছিল। মুর্শিদকুলি থেকে দ্বিতীয়বার নবাব মীরজাফর সবাই ছিলেন বাংলা সুবার সুবেদার। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত বাঙ্গলার ইতিহাসের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই লেখা '১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর, ইংরেজরা মীরকাশিমকে বাঙ্গলা ও বিহারের সুবাদার করিলেন।' (বিদ্যাসাগর রচনাবলী। প্রথম খণ্ড। পাতা ১৩২।) উড়িষ্যা বাংলা সুবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে এবং ইংরেজরা পুনরায় দখল করে না

নেওয়া পর্য্যন্ত মারাঠা-প্রদেশ হিসাবেই গণ্য হত। বাংলার নবাব বললে বাংলা সুবার নবাব বোঝাত যেমন অযোধ্যার নবাব বললে বিরাট অযোধ্যা সুবার নবাব বা সুবেদার বোঝাত। দুইশত বছরে বাংলা যে আমূল বদলে গেছে এটা না বোঝার জন্যই নাট্যকাররা অষ্টাদশ শতাব্দীর আবহাওয়া বুঝতে পারেন নাই এবং সেই জন্মেই তাঁদের নাটকে এত রকমের ভুল ও অসঙ্গতি দেখা গেছে। মন্মথ রায় প্রথম দৃশ্যের দুর্বলতা দ্বিতীয় দৃশ্যে ঢাকবার চেষ্টা করে এই একই কারণে ব্যর্থ হয়েছেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য সুরু হচ্ছে কাটোয়া ও গিরিয়া যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়ের পর। ষড়যন্ত্রকারীরা খুবই আনন্দিত। নাট্যকার দেখিয়েছেন যে রাজবল্লভ, জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভ, খোজা পিক্রসের কাছে সংবাদ সংগ্রহ করছেন। পিক্রস তার ভাই গুরগিণের সঙ্গে আলাপ করছে। গুরগিণ তাকে বলছেন যে বারবার হেরে গিয়ে তার মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে আছে। আরাব আলি খবর দিল যে মীরজাফর আবার 'বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাব' নবাব স্বীকৃত হয়েছেন। কোম্পানী এক অশিষ্ঠ ইস্তাহার বার করেছে তাতে মীরকাশিমের মস্তকের মূল্য এক লক্ষ টাকা ঘোষিত হয়েছে। নবাব মীরজাফর তাঁর প্রিয় প্রজাদের মীরকাশিমের ছত্রছায়া থেকে সরে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। আরাব ও গুরগিণ আগামী উধুয়ানালার যুদ্ধ আলোচনা করছেন। গত যুদ্ধ দুটিতে তারা যে কেবল বিশ্বাসঘাতকতার জন্মেই হেরে গেছেন একথা বলতে ভুলছেন না। নবাব মীরকাশিম এসে বলছেন 'উদয়নালায় আমাদের শেষ চেষ্টা' (মীঃ পাতা ৪৩)। ষড়যন্ত্রকারীরা নবাবকে আশ্বাস দিচ্ছেন যে তকি খাঁ মরলেও আর অনেক বীর আছে। নবাব এসব কথায় ভুলছেন না গুরগিণকে জানাচ্ছেন যে তাঁর ওপর নবাবের আস্থা আছে। গুরগিণ জানালেন উধুয়ানালার ভার তিনি নিলেন—এবং কর্মের দ্বারা নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবেন। আরাব আলিকে নবাব মুঙ্গের দুর্গের ভার দিলেন। নজাফ খাঁ মীরকাশিম পক্ষের একমাত্র নির্ভরযোগ্য লোক জানাচ্ছেন যে নবাবের ক্ষমতা ইংরেজের তুলনায় অনেক বেশী কিন্তু কেবল বেইমানী নবাবের বার বার সর্বনাশ করছে। এরপরই নাট্যকার কল্পনায়

সাগরে নৌকা ভাসালেন। নবাব মহিষী ফতেমা দরবারে উপস্থিত হয়ে তার পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। মীরকাশিমকে শ্বশুর মীরজাফরের বিরুদ্ধে দণ্ড ঘোষণা করতে বলছেন। এখানে মণিবেগমের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের সুযোগ কিন্তু নাট্যকার ফতেমাকে দেননি—মীরকাশিমের মুখেই হাল্কা সংলাপ সৃষ্টি করেছেন। কল্পনার বিপদ হল তার সীমা নির্দ্ধারণ করা। মন্মথ রায় প্রথম অঙ্কের চমৎকার ইতিহাসসম্মত বিবরণীকে দ্বিতীয় অঙ্কে ভাবাবেগে নষ্ট করে ফেললেন। ভাবালুতা চরমে উঠল যখন যুবক নাজামাদ্দৌলা দূত হয়ে তার ভগ্নি ফতেমার কাছে এলেন এবং মীরকাশিমের পক্ষ হয়ে তার পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অনেক দেশপ্রেমী সংলাপ আছে। একটি হল নাজামাদ্দৌলা জানাচ্ছেন যে তার মা মণিবেগম তাকে সিংহাসনে বসবার জন্যে এই যুদ্ধ চালাচ্ছেন সেই সিংহাসন তিনি চান না। মীরকাশিম তাকে বধ করুন তা হলেই এ যুদ্ধের অবসান হবে। দেশের স্বাধীনতা ও বাংলার মসনদ—তাই এই যুদ্ধ—'স্বাধীন বাংলার বাচ্চা আমি মসনদে পদাঘাত করি—স্বাধীনতার পতাকা দাও', এই সব অসংলগ্ন বাতুল কথায় দর্শক মনোরঞ্জন করে নাট্যকার মীরকাশিমকে দিয়ে সযতনে নাজামাদ্দৌলার প্রাণ বাঁচিয়ে তাকে স্বস্থানে পাঠিয়ে দিলেন। সংলাপ 'নাজামাদ্দৌলা বাঁচলে—এ দেশ জাগবে।' (মীঃ পাতা ৫৭)

আলোচনা ॥

এ দৃশ্য সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। মীরজাফরের ১৭৬৫তে মৃত্যু হলে নাজামাদ্দৌলা নাবালক অবস্থাতেই সুবেদার হলেন। মণিবেগম হলেন নবাবের রক্ষক। সুতরাং ১৭৬৩তে যুবক নাজামাদ্দৌলা এবং তার সমস্ত সংলাপই অসম্ভব এবং ইতিহাস বিরোধী সৃষ্টি। সেই হিরণ্যকশিপু আর প্রহ্লাদের গল্প শোনার পর থেকে বাঙালী দর্শক দুষ্কৃতকারী পিতার বিরুদ্ধে পুত্রের বিদ্রোহ দেখতে ভালবাসেন। যোগেশ চৌধুরীর 'পরিণীতা' নাটক কেবলমাত্র পিতা-পুত্রে ঝগড়া কেন্দ্র করে জনপ্রিয় হল ও বহুরাত্রি চলল [বলা যাক এটা হল প্রহ্লাদ—কমপ্লেক্স।] দর্শক ও নাট্যকার মন্মথ রায় এই প্রিয় মনোভাবটি বর্জন করতে পারেন নাই—বালক নাজামাদ্দৌলাকে দিলেন যুবক করে। একবার ভাবলেন না, যে বালকের মুখে মসনদে পদাঘাতের

ভাষণ দিলেন তাকে সেই মসনদে গুটিগুটি উঠে ঝিমুতে দেখলে তার প্রতি দর্শকদের কি ধারণা হবে। নাজামাদ্দৌলা যে প্রথম ইংরেজ পুষ্ট নবাব নাট্যকার ভুলে গেছেন।

এই দৃশ্যের দ্বিতীয় অনৈতিহাসিকতা ষড়যন্ত্রকারীদের যোগাযোগ। এ বিষয়ে প্রথম অঙ্কের শেষে বিশদ আলোচনা হয়েছে সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রোয়জন। এই দৃশ্যের সময় ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের ২রা অগাষ্টের পর ও ৫ই সেপ্টেম্বরের আগে।

তৃতীয় অনৈতিহাসিকতা 'উদয়নালা'। ওই নামে কোন দুর্গ বা নালা বা জায়গা ছিল না। কথাটা হচ্ছে 'উধুয়া' যেটা উদ্ধমুখী নালা কথাটার চলতি অপভ্রংশ। সব বই-এ উধুয়ানালা ব্যবহৃত হয়েছে। স্থানটি গঙ্গার ওপর। সামনে পেছনে নালা কেটে মাঝের উঁচু জায়গাটিকে দুর্গ স্থাপনের উপযোগী করা হয়েছে। নালাটির জল গঙ্গার গতির উল্টো দিকে বয়ে যেত বলেই এই স্থানটি উধুয়ানালা নামে প্রসিদ্ধ হয়।
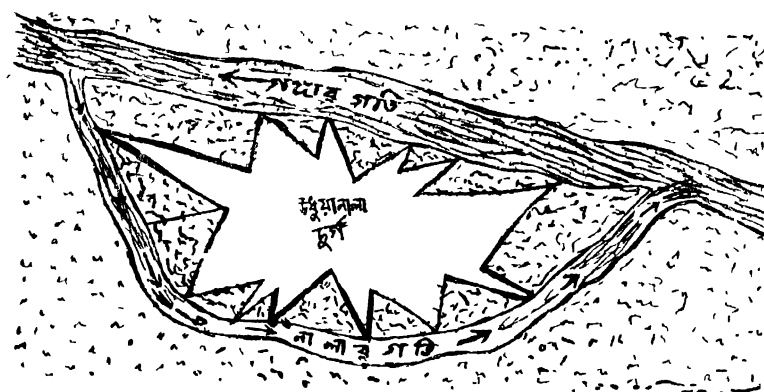
দ্বিতীয় অঙ্কে কয়েকটি ঘটনা জানান ছাড়া নাট্যকার নাটককে এতটুকু আগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন না। অনেক হাততালি পাওয়া কথা জুড়ে দিলেও নাটক হিসাবে এই অঙ্কটির দৌর্বল্য অনস্বীকার্য্য। পিজ্রুসের কাছে গুরগিণ যুদ্ধে হারার খবর দিচ্ছেন যেন গত ফুটবল ম্যাচ দুটিতে হেরে যাবার জন্ত দুঃখ করছেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের কোন গন্ধ এই সংলাপে তথা এই অঙ্কে পাওয়া যায় না। প্রথম অঙ্কে নাট্যকারের ঐতিহাসিক সচেতনতা

দেখার পর দ্বিতীয় অঙ্কের এই 'দিবা-নিদ্রা-সুখ' খুবই আশ্চর্য লাগে। অথচ ঘটনার অন্ত নাই। নাটকীয়তার শেষ নাই। কলকাতায় মুর্শিদাবাদে মুঙ্গেরে অথবা পাটনায় নাট্যবস্তু অঞ্জলী ভরে, ইতিহাস এই সময় উপহার দিয়েছে। দুর্ভাগ্য যে বাঙালী নাট্যকার এই অভূতপূর্ব ঘটনাসম্ভার ব্যবহার করবার সুযোগ নিলেন না। নিজের কপোলকল্পনাতেই মুগ্ধ হয়ে রইলেন।

তৃতীয় অঙ্ক ॥

তৃতীয় অঙ্কে দু'টি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্য ইংরেজ শিবিরের বহির্ভাগ ও দ্বিতীয় 'উদয়নালা'র দুর্গ। এই অঙ্কের উদ্দেশ্য উধুয়নালা দুর্গের পতন দেখান। প্রথম দৃশ্যে তাই নাট্যকার ষড়যন্ত্রকারীদের বৈঠক বসিয়েছেন আর মন্ত্রবলে মুঙ্গের বন্দীশালা থেকে হাজির করেছেন জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতিকে, কলকাতা থেকে নিয়ে গেছেন রায়দুর্লভকে আর মুর্শিদাবাদ থেকে এনেছেন নবাব মীরজাফর, তাঁর স্ত্রী মণিবেগম ও মন্ত্রী মহারাজা নন্দকুমারকে। ইতিহাস সম্পর্কে একান্ত ভাবে ভুল ধারণা পোষণ না করলে নাট্যকার এই রকম একটা ভুল করতেন না। প্রথমাবধি তিনি ধরে নিয়েছেন যে মণিবেগমের অর্থানুকুল্যে একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে এবং ইংরেজ ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্য করেছে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। পলাশীতে ইংরেজ ছিল এই ভূমিকায় অর্থাৎ সিরাজ পতনের সাহায্যকারী। কিন্তু কাটোয়া বা গিরিয়া বা উধুয়ানালায় ইংরেজ তাদের পছন্দমতো নবাবকে সিংহাসনে বসিয়ে তার নামে নিজেরাই দেশ শাসনে উৎসুক। তাই আকাশপাতাল প্রভেদ পলাশীর সঙ্গে উধুয়ানালার। দু'বছর পরে বক্সারের যুদ্ধে পরাজয়ের পর স্বয়ং দিল্লীর বাদশাহ নিজে ডেকে ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী দিয়েছেন। উড়িষ্যা মনে রাখতে হবে তখন মারাঠা অধিকারে। ইংরেজ কোম্পানীই বাদশাহর পক্ষে উড়িষ্যা দখল করে নামে মোগল শাসন চালু করে। আসলে উড়িষ্যা কোম্পানীর কব্জায় আসে।

সুতরাং নাট্যকার মন্মথ রায় উধুয়ানালার কাছে যে ষড়যন্ত্র শিবির দেখিয়েছেন তা অসম্ভব। তিনি দেখিয়েছেন যে জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, মীরজাফর, মণিবেগম ও নন্দকুমার ষড়যন্ত্র করছেন কি করে

উধুয়ানালা দখল করা যায়। নানা সংলাপের ভেতর দিয়ে নাট্যকার প্রচলিত ভুলগুলি পুনরাবৃত্তির প্রমাণ রাখেন। এক। জগৎশেঠ বলছেন যে তাঁরা হলেন 'বাংলার মসনদের দাস'। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা-মসনদ বলে কখন কিছু ছিল না। ওটা দিল্লীর মসনদের প্রতিভূ এক কল্পনা। দ্বিতীয় জগৎশেঠগণ কখনো বাংলার সুবাদারের দাস ছিলেন না। মুসলমান আমলে বিনয়ী ওসওয়ালী জৈন জগৎশেঠদের পাছে কেউ দাস ভাবে তাই বাংলার সুবাদারের দক্ষিণে সমান উচ্চ আসনে তাঁদের বসার স্থান নির্দিষ্ট ছিল এবং বাংলার নবাবের মতন পায়ে সোনার অলঙ্কার পরবার তাদের অধিকার ছিল। এসব কথাই সিরাজ-জগৎশেঠের ব্যবহারিক ঘটনা আলোচনার সময় বিশদ-ভাবেই জানান হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে পুনরুক্তি করা হল মাত্র।[৮০] দুই। মণিবেগম রায়দুর্লভকে বলছেন 'আপনারাই বাংলার প্রকৃত কর্ণধার'। এটা অসম্ভব। কারণ নন্দকুমার এক সময়ে ছিলেন রায়দুর্লভের আশ্রিত। কালের চক্রে আবর্তিত হয়ে এখন নন্দকুমার মীরজাফরের শুধু মন্ত্রী নয় একমাত্র মন্ত্রণাদাতা। তাঁর বিবেচনা অনুযায়ী মীরজাফর রায়দুর্লভকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ না করলে তাঁকে গুপ্ত হত্যা করা হবে তদবধি রায়দুর্লভ কলকাতায় বসেছেন সুতরাং উধুয়ানালার আগে তার এই উক্তি অসম্ভব। মীরজাফরের মৃত্যুর পর যখন লর্ড ক্লাইভ আবার বাংলার গবর্ণর হয় এলেন তিনি নন্দকুমারের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য আবার রায়দুর্লভকে সরকারী উপদেষ্টা করে মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু সেটা আর এক ইতিহাস। তিন। নন্দকুমারের মুখে ভাষণ যে ১৭৫৭তে নবাবী পাবার পর নবাব মীরজাফর হিন্দু মন্ত্রী সব সরিয়ে দেন এই বুদ্ধিটা নাকি তিনি কলকাতায় ইংরেজদের কাছে শিখেছিলেন—Divide and Rule (মী: পাতা ৬০)। ইহা অসত্য ভাষণ চতুর্দিক থেকে। প্রথম দিক—নবাব মীরজাফর হিন্দু মন্ত্রী সরান নাই। প্রথমে ছিলেন দেওয়ান রায়দুর্লভ পরে হলেন নন্দকুমার। দ্বিতীয়বার নবাব হবার একটা সর্ত ছিল নন্দকুমার দেওয়ান হবেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর নন্দকুমার-পুত্র গুরুদাস দেওয়ান হন। দ্বিতীয় দিক—একমাত্র নবাব মীরকাশিম হিন্দুমন্ত্রী বা দেওয়ান রাখেন নাই। তিনি কলকাতার সাহেবদের কাছে এই বুদ্ধি নিয়েছিলেন মনে করার কোন কারণ নাই। তৃতীয় দিক—এই সময়ে কোম্পানীর পক্ষে হিন্দু মুসলমান আলাদা নয়। কিছু হিন্দু মুসলমান

তাদের বন্ধু আবার কিছু হিন্দু মুসলমান তাদের শত্রু। তাঁরা বন্ধুদের সাহায্যে শত্রুদের পতন ঘটিয়েছে। ইংরেজ কখনও ভারতবর্ষে Divide and Rule Policy সরকারীভাবে চালিয়েছেন কিনা এ নিয়ে জনাব বদরুদ্দিন তায়েবজী গবেষণা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁর মতে হিন্দু মুসলমানে অবিশ্বাস ও বিরোধ বিদেশী শাসকদের সুযোগ দিয়েছে। তায়েবজী দেখিয়েছেন যে প্রতিটি সাম্প্রদায়িক অনুশাসন হিন্দু অথবা মুসলমানদের অনুরোধে করা হয়েছে। তায়েবজীর বক্তব্য হল যে নানা রাজনৈতিক কারণে হিন্দুমুসলমান নিজেদের মধ্যে বিরোধ জাগিয়ে রেখেছে কাজেই বৃটিশ সরকারকে বিভেদ সৃষ্টি করতে হয় নাই, বরঞ্চ বিভেদ সৃষ্টি হল বলেই শাসনযন্ত্র পরিচালন সহজ হয়েছে। এই মত ইতিহাসের আলোকে সমর্থনযোগ্য।[৮১] চতুর্থ দিক। অ্যাডামসের মুখে ভাষণ—'The Bengal is no place for Siraj or Mir Cosim'. সম্পূর্ণ ভুল। সিরাজের মতো চরিত্রহীন অসংযত অন্যায়কারী আর মীরকাশিমের মতো লোভী, ক্ষমতালিপ্সু অবিশ্বাসী অত্যাচারীতে পূর্ণ না হলে বাংলার এই দশা হয় না।

উদাহরণ আর না বাড়িয়ে নাট্য ঘটনায় ফিরে যাওয়া যাক। ষড়যন্ত্র চলাকালীন খোজা পিক্রস এসে বলেন যে গুরগিণ খাঁর সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছেন। সকলের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ইংরেজ নয় মণিবেগমই খোজা পিক্রসের সাহায্যে মীরকাশিমের পতনের প্রধান উদ্যোগী। পিক্রস জানায় গুরগিণ টাকা নিচ্ছে বটে কিন্তু আরো টাকা চাইছে। মণিবেগম দিচ্ছেন তাকে তাঁর হাতের অঙ্গুরি ও সর্বশেষ হীরক বলয়। এদিকে মুঙ্গের থেকে পলাতক বন্দীরা ভীত কি করে তাঁরা তাদের বন্দীশালায় ফিরে যাবেন! এমন সময় মীরকাশিম পক্ষে নজাফ খাঁ ইংরেজ শিবির আক্রমণ করলেন। তাদের ফিরে যাবার সময় খোজা পিক্রস কাল চাদর ঢাকা দিয়ে তাদের পেছনে পেছনে উধুয়ানালার গুপ্ত পথ দিয়ে দুর্গে ঢুকে পড়লেন।

দ্বিতীয় দৃশ্যে 'উদয়নালা' দুর্গে পানোন্মত উৎসব। যুদ্ধের আগের মুহূর্তে এমন সম্ভব কিনা নাট্যকার বিচার করেন নাই। ঐতিহাসিক লিখেছেন যে 'সৈন্যগণ সতর্কতার সহিত দুর্গ পাহারা দিত না নৃত্যগীতে চিত্ত বিনোদন করিত।'[৮২] এই নৃত্যগীত কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। নাট্যকার তাকে উৎসবের আকার দিয়েছেন! অবশেষে পিক্রস এসে

হাজির ভাইএর সামনে। ভাই একবারও প্রশ্ন করলেন না কি করে এই দুর্ভেদ্য দুর্গে পিক্রস প্রবেশ করলেন। তিনি আবার ম্যাজিকের কৌশলে 'আর্মেনিয়ান নর্তকী' সংগ্রহ করেছেন। নাচ দেখে আর মদ খেয়ে নবাব মীরকাশিমের প্রধান সেনাপতি এত উন্মত্ত হলেন যে পিক্রস যখন ইংরেজকে দুর্গ আক্রমণের সংকেত জানালেন তখন বাধা দিতে পারলেন না। নজাফ খাঁ এসে গুলি করে গুরগিণকে হত্যা করলেন। মরবার সময় তার সংলাপ—বাংলাদেশের মাটির দোষেই তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন।

আলোচনা ॥

অন্যান্য নাট্যকারের মতো মন্মথ রায় গুরগিণকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত করলেন। গুরগিণ কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে বা দুর্গে হত হন নাই। উধুয়ানালা যুদ্ধের দেড়মাস পর পলায়নপর মীরকাশিম যখন পাটনা থেকে বারে পৌছলেন তখন একদিন গুরগিণকে কেটে ফেলা হয়। তারিখ ১৮ই অক্টোবর ১৭৬৩। পরদিন অর্থাৎ ১৯শে অক্টোবর জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে মীরকাশিমের আদেশে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

অঙ্কের সুরুতেই এক অদ্ভুত ষড়যন্ত্র দেওয়া হয়েছে। শেষে দেওয়া হয়েছে ততোধিক অদ্ভুত এক যুদ্ধোদ্যম। বারবারই গিরিশচন্দ্রের গিরিয়ার যুদ্ধের নাট্যরূপ মনে পড়ে যায়। আশঙ্কিত হয়ে দেখা যায় যে ১৯০৬ এর জ্ঞানের সাধনা ১৯৩৮এ অবলুপ্ত। নাট্যকার কিভাবে নাট্যবস্তু ব্যবহার করবেন বুঝতে পারছেন না। এখানে কল্পনা প্রসারে সুযোগ ছিল কিন্তু তাও এখানে সুপ্ত। উধুয়ানালা পতনের এমন চমৎকার ঘটনা নাট্যকার ব্যবহার করতে পারলেন না। এই অপারগতায় নাটক নষ্ট হয়ে গেল। সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকায় নাট্যকার পদে পদে আশঙ্কিত হয়েছেন। অসম্ভব ঘটনার দিকেই তার মন চলে গিয়েছে সম্ভাব্য ঘটনার প্রসার তাঁর রচনায় দেখা গেল না বলেই ঐতিহাসিক নাট্যসৃষ্টির প্রয়াস তৃতীয় অঙ্কে পরিপূর্ণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে।

বাঙালী নাট্যকারদের আর এক চরিত্র এই নাটকে প্রতিফলিত। বাঙালী নাট্যকার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নিজের পরিবেশ কাটাতে পারেন নাই। 'তাই রাজা নবাব বাদশাহ মায় বিদেশী নরপতিও কেরাণী বাঙালীর

চালচলন কথাবার্তা ধরণধারণে বাঁধা। এ বিষয়ে বাংলার নাট্যকার এত রক্ষণশীল যে বাঙালী মুসলমান, বা বাঙালী খ্রীষ্টান সমাজ সম্পর্কে তাঁদের কোন রকম ঔৎসুক্যের প্রমাণ নজরে পড়ে না। এখানে আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ী সমাজ সম্পর্কে নাট্যকারের পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা প্রমাণিত হয়েছে।

মন্মথবাবু একবারও ভাবেন নাই যে খোজা পিক্রুস তৎকালীন মুর্শিদাবাদ ও কলকাতার একজন বিরাট ব্যবসায়ী হতে পারেন যিনি মীরকাশিম ও হেস্টিংস সাহেবকে বিভিন্ন সময়ে লক্ষাধিক টাকা কর্জ্জ দিয়েছেন। ইংরেজ বন্ধু হিসেবে তিনি তার ভাইকে বা অন্য ইউরোপীয় সেনাপতিদের পত্রে লোভ দেখিয়েছেন এবং মীরকাশিমকে ত্যাগ করবার জন্য অনুরোধ করেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কালো চাদরে নিজেকে মুড়ে খোজা পিক্রুস স্বয়ং গুপ্তচরবৃত্তি করবেন এটা অসম্ভব কল্পনা। মনে করা যাক শ্রীযুক্ত টাটা গত বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় রিক্সাচালক সেজে ভারতীয় সৈন্যদের ঢাকায় নিয়ে চলেছেন। সময় ও ব্যক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলে এমন হাস্যকর ভুল হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। খোজা পিক্রুস দীর্ঘদিন কলকাতায় ব্যবসা করেন। তাঁরা পুরা নাম আগা পেটরুশ অ্যারাটুন। তিনি ভ্রাতাদ্বয় আগা গ্রেগরী ও আগা বারসেগ সহ সৈদাবাদে ব্যবসা সুরু করেন পলাশীর আগে। পলাশীর পর তিনি কলকাতায় ব্যবসা নিয়ে যান। ছোট ভাই বারসেগ সৈদাবাদে থাকেন ও সেখানেই বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করেন। পেটরুশকে অবশ্য অর্থনৈতিক অপরাধে ইংরেজ কলকাতা ছাড়তে বাধ্য করে। তিনি তখন সপরিবারে মুঙ্গেরে গিয়ে গ্রেগরী বা গুরগিণ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার ভার গ্রহণ করেন এবং গুরগিণ খাঁর পরিবারভুক্ত হন। মুঙ্গেরেই তাঁর সমাধি রয়েছে। আর এক বিষয় স্মরণ রাখা কর্তব্য। মীরজাফরের নবাব হবার প্রথম সর্তে যেমন লিখিত আছে যে নন্দকুমার দেওয়ান হবেন তেমনি লিখিত আছে খোজা পিক্রুস সিপাহসালার হবেন। সুতরাং মণিবেগম পিক্রুসকে অর্থ ও গহনা দেবার থেকে খোজা পিক্রুসের মীরজাফরকে সৈন্য-বাহিনীর মাহিনার জন্য অর্থ সাহায্য করা অনেক বেশী স্বাভাবিক। ইংরেজরা নবাব পক্ষে যুদ্ধ করে মীরকাশিমকে বাংলা সুবা ত্যাগ করাল। এই যুদ্ধে ইংরেজদের যে খরচপত্র হল তা সবই ছিল নবাবের দেয়। তাই নবাব পক্ষে টাকা দেবার জামীন হলেন খোজা পিক্রুস। নবাবের জামিনদারকে কালোকাপড়ে

মুড়িয়ে হীন গুপ্তচরবৃত্তিতে করতে দেখিয়ে তাই হাস্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। তবে সুবিধা হল ১৯৩৮ এ বাঙালী দর্শক ইংরেজের বিরুদ্ধে কিছু উষ্মার উদ্গার পেলেই খুশী। বৃটিশ সরকারও সেটা বুঝে ফেলেছিলেন। তাই শচীন সেনগুপ্তর সিরাজদ্দৌলা বা মন্মথ রায়ের মীরকাশিম কিছুদিন একটু আওয়াজ-টাওয়াজ করে যাদুঘরে রক্ষিত হল। ইংরেজ সরকার অভিনয় বন্ধ বা নাটক বাজেয়াপ্ত করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাঁরা জানতেন এইরকম নির্বিষ ভুজঙ্গ তাঁদের সত্যিকারের বন্ধু।

চতুর্থ অঙ্ক ॥

এই অঙ্কটি সম্পর্কে একলাইন লিখলেই যথেষ্ট। মীরকাশিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ও মুঙ্গেরে বন্দী ইংরেজদের হত্যার আদেশ দিলেন। ৫ই সেপ্টেম্বর উধুয়ানালার পতন। ৯ই সেপ্টেম্বর ইংরেজদের কাছে মীরকাশিমের চরমপত্র। তারপরই এই হত্যার আদেশ। অ্যাডামস মুঙ্গের দুর্গ অধিকার করলেন ৩রা অক্টোবর। সুতরাং মুঙ্গেরের হত্যাগুলি এই সময়ের মধ্যে হয়। পাটনায় হত্যাকাণ্ডের তারিখ ৫ই অক্টোবর। নাট্যকার দেখিয়েছেন উধুয়ানালার খবর পাবার পর মীরকাশিমের আদেশে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বধ করলেন। বধ্য হলেন জগৎশেঠ (একজন) রায়দুর্লভ (তাহলে পরে বেঁচে উঠলেন কি করে), রাজবল্লভ, সৈয়দ মহম্মদ খাঁ ও মীর্জা ইরাজ খাঁ (সিরাজদ্দৌলার শ্বশুর। এঁর কবর আছে যশোরে। কি দুঃখে ইনি মুঙ্গেরে খুন হবেন ?)। নাট্যকার দৃশ্যটিকে সম্পূর্ণভাবে কল্পনায় রচনা করেছেন। নবাবের সঙ্গে তাঁর পত্নীর আলোচনার মধ্যেই যেন নবাব উধুয়ানালায় পরাজয় আশঙ্কা করছেন মনে হয়। ফতেমার সংলাপ 'নির্মূল কর বেইমানদের—নির্মূল কর বাংলার মীরজাফরদের।' মীরকাশিমের সংলাপ আরও অদ্ভুত। 'স্বাধীনতা রক্ষার সাধনা যদি ব্যর্থ হয়—পরাধীনতা দূর করবার সাধনা নিয়েই যাব ভারতের গ্রামে গ্রামে—ঘরে ঘরে।' (মীঃ পাতা ৯১)। তারপর বিজয় উৎসবের আয়োজনের মধ্যে মীরকাশিম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এলেন। তাদের আশা, আশঙ্কা বলাই ভাল, উধুয়ানালায় ইংরেজ পরাজিত হয়েছে। এই দৃশ্যে নাট্যকার ইতিহাস অজ্ঞতার ঝুরি ঝুরি প্রমাণ রেখেছেন। একটি—'মীরজাফরকে বধ করা হয়েছে তো ?' (মীঃ পাতা ৯২) নাট্যকার জানতেন

না যে বৃদ্ধ নবাবের দেহে জরার সঙ্গে তখন কুষ্ঠরোগ দেখা দিয়েছে। মণি-বেগমই নবাবী চালাচ্ছেন মহারাজা নন্দকুমারের সহযোগীতায ও বুদ্ধিতে। আর মীরজাফরের মৃত্যু হলেই যে মীরকাশিম নবাব হবেন তাও ঠিক নয়। বস্তুত ১৭৬৫তে মীরজাফরের যখন মৃত্যু হল তখন মীরকাশিম জীবিত কিন্তু কোম্পানী জারজ সন্দেহ থাকা সত্বেও নাবালক নাজামাদ্দৌলাকে নবাব মনোনীত করলেন। এই দৃশ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টির প্রয়াস চরিত্রগুলিকে ব্যাহত করেছে। বিশেষ করে মীরকাশিম চরিত্র বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তার কোন কোন সংলাপে তাকে উন্মাদ মনে হয়। অবশেষে যুদ্ধে পরাজয় সংবাদ পাওয়ামাত্র সমরুকে হত্যার আদেশ দিয়ে অট্টহাসি হাসতে হাসতে প্রস্থান বড়ই বিসদৃশ লাগে। নাট্যকার বুঝতে পারেন নাই যে রাগে উন্মাদ হয়ে অট্টহাসি হাসবার লোক মীরকাশিম ছিলেন না। যাদের হত্যা করলেন তারা প্রত্যেকেই পাটনার সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে জড়িত। রাজা রামনারায়ণ আলিবর্দীর সময় থেকে সেখানকার নবাব-নাজিম পরে রাজা রাজবল্লভ অল্পসময়ের জন্য হলেও ওই পদে অধিষ্ঠিত হন। অন্যরা বিহারের সম্রান্ত জমিদার সুতরাং পাটনায় তাদের যোগাযোগ থাকাই স্বাভাবিক। পাটনায় পালিয়ে যাবার অব্যবহিত পূর্বে নবাবের এদের হত্যা করা ছাড়া উপায় ছিল না। জগৎশেঠ ও গুরগিণ খাঁকে হত্যা করা হয় পাটনা থেকে পালিয়ে যাবার পথে। রায়দুর্লভ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ক্লাইভ দ্বিতীয়বার গবর্ণর হয়ে ফিরে এলে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বৃদ্ধ রায়দুর্লভ আবার শাসনকার্য্যের সঙ্গে যুক্ত হলেন। কিছুদিন পর তিনি বৃদ্ধত্বের অজুহাতে অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় এসে বসেন এবং তারই সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁর পুত্র রাজবল্লভ 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হয়ে কলকাতায় কোম্পানীর নায়েব দেওয়ান ও পরে দেওয়ান নিযুক্ত হন। এইপদে রাজা রাজবল্লভ দীর্ঘদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। উত্তর কলকাতার একটি রাস্তা ও পাড়া এই ভদ্রলোকের নামেই নামাঙ্কিত।

এই দৃশ্যে মীরকাশিমকে জানান হচ্ছে যে লক্ষ টাকার বিনময়ে গুরগিণ খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মুস্কিল হল গুরগিণ খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা আজও অনুমান নির্ভর কারণ প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এটা সত্য যে

নবাব তাকে সন্দেহ করতেন বলেই তাকেই গুপ্তহত্যা করেন। বার বার পরাজয়ে নবাবের মনে সন্দেহ এসেছে। বস্ত্রব্যবসায়ী গুরগিণ খাঁ তাঁর বিরাট বপু ও সামরিক নিয়মতান্ত্রিকতার জ্ঞানের জোরে শস্ত্রব্যবসায়ী হলেন। সৎ ও শ্রদ্ধাশীল লোক বলে পরিচিত হওয়ায় তিনি কিছুদিনের মধ্যেই প্রধান্ সেনাপতির পদ পান। কিন্তু জীবনে তিনি কখনও যুদ্ধ করেন নাই। যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত ইংরেজ জেনারেলদের কাছে তাঁর বারবার পরাজয় তাই অস্বাভাবিক নয়। হয়ত কোনদিন প্রমাণ পাওয়া যাবে যে গুরগিণ খাঁ অপটু ছিলেন কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না।

পঞ্চম অঙ্ক ॥

দিল্লীর জুম্মা মসজিদ সুবিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণীর নিম্নস্থ প্রাঙ্গণ। ফতেমা ও নজাফ খাঁ আলোচনারত। তাঁদের সংলাপে জানা যায় যে মীরকাশিম বাংলা থেকে পলায়ন করে দিল্লীতে এসেছেন বাদশাহর সাহায্য ভিক্ষা করবার জন্য। বাদশাহর সভাসদরা তাঁকে কিছুতেই দেখা করতে দিতে রাজী নয় তাই তিনি জুম্মা মসজিদের সামনে অপেক্ষা করছেন যাতে বাদশাহ নমাজ করতে এলে তাঁকে নিজের আবেদন জানাতে পারেন। মীরকাশিমকে ধরিয়ে দিতে পারলে লক্ষটাকা পুরস্কার দেওয়া হবে প্রচার করা হচ্ছে। বাদশাহী সভাসদগণের সংলাপে জানা গেল যে 'উদয়নালা'য় মীরকাশিমের শেষ যুদ্ধ। (বক্সার যুদ্ধের কোন কথা নাই যাতে বাদশাহ স্বয়ং যুদ্ধে নেমেছিলেন মীরকাশিমের পক্ষে!) বাদশাহ এখন মীরকাশিমকে সাহায্য করতে খুব উৎসুক তাই মীরকাশিম যাতে বাদশাহর সঙ্গে দেখা করতে না পারেন বিশেষভাবে দেখতে হবে। এমন সময় ভিক্ষুকের বেশে পাগলের মতো মীরকাশিম প্রবেশ করলেন। (এই একই কায়দা নাট্যকারের প্রথম সার্থক নাটক চাঁদ সদাগরে ব্যবহৃত হয়েছে।) সংলাপ—'শুনতে পাই সিরাজের আর্তনাদ, লুৎফার ক্রন্দন, বাংলার হাহাকার' (মীঃ পাতা ১০৭)। ফতেমা মীরকাশিমের দীনতা সহ্য করতে পারছেন না কিন্তু তিনি অপারগ। মীরজাফরের কন্যা বলে নবাব তার সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। অবশেষে বাদশাহ এলেন। তাঁর কাছে যাবার জন্য মীরকাশিম দৌড়ে গেলেন কিন্তু রক্ষীরা বাধা দিল এবং ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। মীরকাশিমের তাতেই পতন ও মৃত্যু

হল। স্ত্রী বুকফাটা কান্না কাঁদলেন। মীরকাশিমের শেষ সংলাপে 'সারা ভারত লালে লাল হয়ে গেল—লালে লাল—লালে লাল'। (মীঃ পাতা ১১৪)।

আলোচনা ॥

বলাবাহুল্য সমস্ত দৃশ্যই কাল্পনিক। মীরকাশিমকে নিয়ে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কি শতরঞ্জ খেলা চলেছিল তা নাট্যকারের পক্ষে জানা সম্ভব নয় তাই মীরকাশিমের মৃত্যু দৃশ্যে নাট্যকার যথেচ্ছ কল্পনাকে ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে ভেবে চিন্তে লিখলে যতই অনৈতিহাসিক হোক ভাল নাট্য-কল্পনার সুযোগ ছিল। সমস্ত দিক থেকেই তাঁর এই শেষদৃশ্য শচীন সেনগুপ্তর সিরাজদ্দৌলা নাটকের শেষ দৃশ্যের অনুকরণ। শচীনবাবুর বলার কথা ছিল যে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুকে সিরাজদ্দৌলার সজ্জায় জনসাধারণের সম্মুখে এনেছিলেন এবং কিছু পরিমাণে সফলও হয়েছিলেন। মন্মথ রায় মীরকাশিমে তার ব্যর্থ অনুকরণ করে সুযোগের অপব্যবহার করেছেন মাত্র। ইতিহাসকে এই দৃশ্যে অস্বীকার করার ইচ্ছা বোঝা যায়। বক্সারে দিল্লীর বাদশাহ, বাদশাহের মন্ত্রী অযোধ্যার নবাব ও মীরকাশিমের সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে প্রস্তুত হয়েছিল একথা তিনি অস্বীকার করলেন কি করে। সত্য মীরকাশিম স্বয়ং তখন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলাতক কিন্তু তাঁর জন্যেই যুদ্ধ বা তিনিই হলেন প্রধান নায়ক। সুরু থেকেই ভুলের সাম্রাজ্য। দিল্লীর বাদশাহগণ মোতি মসজিদে দুইবেলা নমাজ করতেন। কেবল বিশেষ দিনে জুম্মা বা অন্য মসজিদে যেতেন। দিল্লীর বাদশাহ নিজে থেকেই ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানীকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী দান করেন। বাদশাহকেও এই সময় ইংরেজ মুখাপেক্ষী দেখা যায়। পরবর্তীকালে বাদশাহের সঙ্গে কোম্পানীর গোলোযোগ ঘটে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। নাট্যকার সেই ঘটনাটিকে নাটকে ব্যবহার করেছেন। এমনকি বাদশাহের বন্ধু চিরকাল দিল্লীবাসী মীরকাশিম বন্ধু নজাফ খাঁকে তিনি নাটকের মধ্যে বঙ্গবাসী মীরকাশিমের সেনানায়ক করে দিয়েছেন। ঘটনার বিবরণ এই রকম। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ বাংলাসুবার রাজস্ব বৃদ্ধি করতে চাইলে তৎকালীন গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস বাধা দেন। তিনি জানান যে

বাংলা সুবার কোন দায়িত্ব বাদশাহ স্বীকার করেন নাই সুতরাং রাজস্ব বৃদ্ধি করার তাঁর কোন অধিকার নাই। উপরন্তু ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী সনদে বাদশাহর প্রাপ্য অর্থের উল্লেখ আছে কিন্তু বাদশাহের সে অর্থকে বৃদ্ধি করবার কোন ক্ষমতার কথা লেখা নাই। তখন বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম কপর্দকশূন্য বন্ধুহীন মীরকাশিমকে ধরে আজমীঢ়ে প্রতিষ্ঠিত করে তার নামে সুবা বাংলা দাবী করলেন ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত হল। অযোধ্যার নবাব প্রমাদ গণলেন। যদি বাদশাহ সুবা বাংলায় মীরকাশিমকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন তাহলে মীরকাশিম প্রথমেই অযোধ্যার নবাবের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেবে। তখন ষড়যন্ত্র করে মীরকাশিমের উন্মাদ হবার খবর রটনা করে মীরকাশিমের সঙ্গে বাদশাহর সাক্ষাৎকার বন্ধ করা হয়। মীরকাশিমের বন্ধু বাদশাহর বক্সী নজাফ খাঁ বহু চেষ্টা করেও বাদশাহর সঙ্গে মীরকাশিমের সাক্ষাৎ করাতে পারলেন না। নজাফ খাঁ আশা করেছিলেন যে তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির সর্বাপেক্ষা ধুরন্ধর ব্যক্তি মীরকাশিম বাদশাহকে অর্থ সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। মীরকাশিম নিজে কিন্তু এই সাক্ষাৎকার চাইছিলেন না। তাঁর ভয় ছিল বাদশাহ তাকে বন্দী করে রেখে দেবেন। তাই বাদশাহর অনুমতি পাওয়া মাত্র তিনি আজমীঢ় ত্যাগ করে আবার যোধপুরে আশ্রয় নেন। সেখান থেকেইতিনি তাঁর পুরাতন বন্ধু ওয়ারেন হেষ্টিংসকে পত্র লেখেন। জানান যে তাঁর নাম ব্যবহার করে যে সব ষড়যন্ত্র হচ্ছে তার সঙ্গে তিনি কোনভাবেই যুক্ত নন অথচ সে সব বন্ধ করবার তাঁর কোন ক্ষমতা নাই। অতি চমৎকার এই পত্র। একাধারে ঐকান্তিক, সুরুচি ও আভিজাত্যপূর্ণ। এই চিঠির সময় ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। রাজপুতানায় কিছুদিন ঘুরে মীরকাশিম নেপাল যাবার চেষ্টা করেন। অবশেষে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন দিল্লীর কাছে শাহজাহানাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়। হয়েছিল উদরীরোগ। স্ত্রী সম্ভবত আগেই গত হয়েছিলেন কাছে ছিলেন দুই পুত্র তাঁরা ফরাসী গবর্ণর মঁসিয়ে শেভেলিয়রের অর্থ সাহায্যে মীরকাশিমের শেষ কৃত্যাদি করেন। দেখা যাচ্ছে নাটকের শেষ অঙ্ক সম্পূর্ণভাবে প্রক্ষিপ্ত। ইতিহাসের সঙ্গে যেমন তার যোগ নাই—নাট্যধারার সঙ্গেও তা বিযুক্ত। সুতরাং ইতিহাস অবলম্বনে সুরু হলেও মীরকাশিম নাটক প্রতি অঙ্কে কপোল কল্পনা বৃদ্ধি করতে করতে চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে পূর্ণ কল্পনাশ্রয়ী হয়েছে। চতুর্থে

তবু ইতিহাসের ঘটনার সূত্র আছে কিন্তু পঞ্চমে তাও নেই। নাটকের চরিত্র বা ঘটনার উপর দখল না থাকার জন্য নাটকের সমস্ত সম্ভাবনাই নির্মূল হয়ে গিয়েছে। দলগত অভিনয় সৌকর্য ছাড়া মীরকাশিম নাটকে মনে রাখার মতো কিছুই থাকল না এটাই নাট্যকারের সব থেকে বড় ব্যর্থতা।

রেবতী মৈত্র : মীরকাশেম

মীরকাসেম নামে মণীন্দ্রনাথ দাসের রচিত প্রথম নাটক যেমন পাওয়া যায় না তেমনি রেবতী মৈত্রের মীরকাশের নামে এ বিষয়ে শেষ নাটকও আজ দুর্লভ। প্রথম নাটকের প্রকাশকাল ১৯০৬ আর শেষ নাটকের ১৯৫৬। এই নাটক দুটি পেলে মীরকাশিম সম্পর্কে পঞ্চাশ বছরের নাট্য পরিক্রমার ইতিহাস পূর্ণ হত। মন্মথ রায়ের 'জনপ্রিয়' মীরকাশিমের পর স্বাধীন ভারতের নাট্যকার কি ভাবে এই চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন জানতে পারলে ভাল লাগত। ইংরেজ শাসন অবসানের পর নাট্যকারের মনের ব্যথা প্রকাশ করায় কোন বাধা ছিল না। রাজরোষ বা সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে দ্বিধার আর কোন কারণ নাই। নাট্যকার সহজেই মীরকাশিমের ঐতিহাসিক চরিত্র জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে দেশহিতৈষণায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। এই নাটক কোন পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত হয় নাই। আদৌ অভিনীত হয়েছে এমন কোন প্রমাণ নাই। তাই এই নাটক সম্পর্কে কোন আলোচনা করার সুযোগ নাই। তবে আশা এই যে মাত্র সেদিনের ছাপা বলে হয়তো কোন অখ্যাত পুস্তকাগারের এক কোণায় নাটকটি ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হতে পারে। তখন জানা যাবে যে নাট্যকার তার নাটকের মাধ্যমে মীরকাশিমের চরিত্রের কোন কোন দিক জানাবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই সবমিলে পাঁচটি নাটক থাকলেও তিনটিকে আলোচনা করেই ছেদ টানতে হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত ॥

মীরকাশিম সম্পর্কে যে তিনখানি নাটক বিশদ ভাবে আলোচিত হল তার মধ্যে ঐতিহাসিকতার দিক থেকে গিরিশচন্দ্রের নাটকখানি শ্রেষ্ঠ। অভিনয়ের দিক থেকেও গিরিশচন্দ্রের নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য্য। অপূর্ব মননশীলতার পরিচয় দিয়েছে 'মহাকবি' এই নাটকে। ঐতিহাসিক নাটক রচনা

কি ভাবে করা উচিত, ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে কি ভাবে নাট্য উপযোগী করতে হবে, ইতিহাস ব্যাহত না করে নাট্য চরিত্রকে উপস্থাপিত করলে হলে কি ভাবে লিখতে হবে সবই তিনি নির্দেশিত করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গিরিশচন্দ্রের উদাহরণ অনুশীলন করা বাঙালী নাট্যকারদের সংস্কারে নাই। তাই তাঁরা গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারলেন না। নাট্যোলিখিত পুরুষদের সঙ্গে এই তিন নাট্যকারকে তুলনা করার লোভ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। গিরিশচন্দ্র যেন ক্লাইভ চিন্তায় কর্মে অধীত কর্তব্য সমাপনে নিপুণ, মন্মথ রায় যেন মীরকাশিম, সৎ ইচ্ছার অভাব ছিল না, চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু করতালির লোভ আর কল্পনাপ্রবণতা তাঁকে পথ ভ্রষ্ট করে লক্ষ্যচ্যুত করে দিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ যেন নন্দকুমার, সমস্ত অদ্ভুত কীর্তির মাঝে তার স্বার্থপরতা জাজ্বল্যমান।

আলিবর্দী-সিরাজদ্দৌলা-মোহনলাল সম্পর্কীয় নাটকগুলি আলোচনার সময় যে সব কথা বলা হয়েছে তারই পুনরুক্তি করতে হয় এখানে। গিরিশচন্দ একমাত্র ইতিহাস পাঠ করে নাটক লিখতে বসেছিলেন কিন্তু মুসলমান ও খ্রীষ্টান সামাজিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল না তাই নাটকের মুসলমানের চরিত্রের পেছনে 'হিন্দু' প্রতিচ্ছবি বার বার প্রকাশ পায়। এই তফাৎ যে কতো বৃহৎ তা বোঝা যাবে যখন মুসলমান নাট্যকাবের লেখা সিরাজদ্দৌলা বা মীরকাশিম চরিত্র দেখা যাবে। অন্য দুই নাট্যকার সামাজিক বিষয়ে অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। কোন নাট্যকারই যে মুঙ্গের বা উধুয়ানালার দুর্গ দেখেন নাই, কাটোয়া বা গিরিয়া প্রান্তর কোথায় জানেন না বা বক্সারের যুদ্ধে গঙ্গানদীর ভূমিকা বিষয়ে অজ্ঞ —তা নাটক পাঠে স্পষ্ট বোঝা যায়। গিরিশচন্দ্রে ঘটনাস্রোতে এসব ত্রুটী লক্ষণীয় নয় কিন্তু অন্য নাটক দুটিতে বিশ্রীভাবে প্রকাশিত। মন্মথ রায়ের নাটক উধুয়ানালার যুদ্ধের ঘটনার আগে ও পরে সীমাবদ্ধ। ওই দুর্গকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ নাট্যকার ওই দুর্গ দেখে যদি নাটক লিখতে বসতেন তাহলে ইতিহাস যতটুকু পাঠ করেছেন সেটা সম্পূর্ণ ভাবে ব্যবহারে লেগে যেত। অযথা কল্পনা বিস্তার সীমিত হত। মন্মথবাবু এই কাজ করলে আর এক ভাবে দেশ উপকৃত হত। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মন্মথবাবুর নাটক অভিনীত হবার আট বছর আগে থেকে ইংরেজ সরকারের আদেশে উধুয়ানালার দুর্গ থেকে

পাথর খুলে ভাঙা সুরু হয়। এই পাথরকুচি নানা কাজের মধ্যে রাস্তা তৈরীর কাজেও ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৩৬-৩৭ সালেও বিহারের ওই অঞ্চলে পাকা রাস্তা তৈরীর হুড়াহুড়ি পড়ে যায়নি কাজেই দুর্গের অনেকটাই তখন অক্ষত ছিল। মন্মথবাবু নাটক লেখার উদ্দেশ্যে 'উধুয়া'তে উপস্থিত হলে জনমত সৃষ্টি করে দুর্গটিকে রক্ষার প্রচেষ্টা করতে পারতেন। কিন্তু এসব হল না। লোকচক্ষুর অন্তরালে মীরকাশিমের দুর্ভেদ্য দুর্গকে গুড়ো করে রাস্তা তৈরী হল পিচ ও কংক্রীটের। এখন পড়ে আছে শুধু স্মৃতি আর বন্যায় তাড়িত এক উদ্বাস্তু গ্রাম। ওখানে মীরকাশিমের নামও জানে না কেউ। প্রধান প্রবেশ-দ্বারের বিরাট ধ্বংসাবশেষের দিকে অজ্ঞ বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকে নানা আজগুবি রূপকথার সৃষ্টি করে। অতি বৃদ্ধ স্থানীয় মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করলে ঠোঁটে আঙ্গুল চাপা দিয়ে বলে—'কোম্পানীর মানা আছে'। এই ভাবে লোক আর কীর্তি মুছে গেছে। ভবিষ্যতে স্মৃতিকে জাগরিত রাখতে কোন নাট্যকার আজগুবি রঙে সাজাবেন মীরকাশিমকে। গড়ে তুলবেন মস্ত এক কল্পনার ফানুস।

সূত্র নির্দেশ

১। সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, বন্দর কাশিমবাজার। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৭৪ বৎসর p 109-110

২। Persian Corrospondence (National Archives) Letter of Bibi Shah Khanum to Lord Clive dated 18 May 1765

৩। S. C. Hill, ed. Law's Memoirs, Bengal in 1756-57

৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ p 188

৫। তদেব p 190

৬। Vansittart, Transactions in Bengal 1760-1764 Vol I p 158

৭।	Ibid.	Vol I	p 168-169
৮।	Ibid.	Vol III	p 189-190
৯।	Ibid.	Vol I	p 178-179
১০।	Ibid	Vol I	p 182
১১।	Ibid	Vol I	p 185-188
১২।	রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ		p 196
১৩।	Vansittart, Transactions in Bengal, 1760-1764	Vol I	p 251
১৪।	Ibid.	Vol I	p 216-219
১৫।	Ibid	Vol I	p 243-247
১৬।	Ibid.		p 299-307
১৭।	Ibid		
১৮।	Ibid.	Vol II	p 22-42
১৯।	Ibid	Vol II	p 43-71
২০।	Ibid	Vol II	p 79-84
২১।	Ibid		p 71-99
২২।	Ibid		p 141
২৩।	Ibid		p 142-145
২৪।	Ibid.		p 145-147
২৫।	Ibid.		p 150-164
২৬।	Ibid.		p 160
২৭।	মজুমদার		p 201
২৮।	তদেব		p 202
২৯।	Vansittart, Op. Cit.	Vol II	p 234-274
৩০।	Ibid.	Vol III	p 6-15
৩১।	মজুমদার Op. Cit.		p 203
৩২।	Vansittart, Op. Cit.	Vol III	p 157-159
৩৩।	Ibid.		p 207
৩৪।	মজুমদার Op. Cit.		p 204
৩৫।	তদেব		p 204

৩৬। মজুমদার Op Cit. p 201

৩৭। তদেব p 208

৩৮। Bengal Revenue Consultations of 3rd May 1774

৩৯। Vansittart, Op. Cit. Vol III p 378

৪০। J. H. Little, House of Jagat Seth . p 221-223

৪১। মজুমদার Op. Cit. p 209

৪২। তদেব p 215

৪৩। N K Sinha, ed The History of Bengal (1757-1905) p 58-61

৪৪। Ibid

৪৫। Ibid.

৪৬। Ibid

৪৭। Ibid

৪৮। Ibid.

৪৯। Ibid.

৫০। Ibid

৫১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ)

৫২। Bengal Library Catalogue of 29 May 1907

৫৩। হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু p 72-78

৫৪। Amrita Bazar Patrika of 14 June 1903

৫৫। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর p 128

৫৬। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র p 547-548

৫৭। তদেব p 636

৫৮। Keith Feiling, Warren Hastings p 46

৫৯। Ibid.

৬০। Persian Corrospondance preserved in the National Archives from 1759 to 1767, Letters Nos 1164, 1165, 1179 & 2774

৬১। Keith Feilng, Warren Hastings p 42

৬২। Vansittart. Op. Cit. Vol III p 401-411

৬৩। Ibid. p 157-159

৬৪। Ibid. p 284

৬৫। Ibid. p 342-343

৬৬। J. H. Little, House of Jagat Seth p 221-223

৬৭। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মীরকাসেম p 176

৬৮। Long's Selections Vol II p 335-336

৬৯। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মীরকাসেম p 185

৭০। Vansittart, Op. Cit. Vol III p 380-399

৭১। Vansittart's Narrative, Dr. Fullerton's letter Vol III p 375-379

৭২। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, মীরকাসেম p 186

৭৩। N. K. Sinha, ed. History of Bengal (1757-1905) p 58-61

৭৪। রমাপতি দত্ত, রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ p 395

৭৫। India Office Records, Clive's Papers, G 37 Box 27. Letters of 24 Aug. 1758, 17 Aug. 17th & 18th Nov & 15 & 16 Septr 1759.

৭৬। India Office Records, Proceedings of Revenue Dept. of 20th May 1791. Range 52 Vol 30 p 364-382

৭৭। Forster, Journey from Bengal to England 1781 Vol I p 12
(Indian Record Series, Bengal, Vol 1, CCVIII)

৭৮। Seir-ul-Mutakharin (English) Vol I p 614

৭৯। Vansittart, Op. Cit. Vol III p 207

৮০। J, H. Little, House of Jagat Seth.

৮১। Badr-ud-Din Tyabji, The Communal Problem and the British Involvement or Complicity, Indo British Review No 1 Vol 5 p 29-37

৮২। মজুমদার, Op Cit. p 207

মহারাজা নন্দকুমার

এই রকম ঘটনা ঘটেছে মহারাজা নন্দকুমারের বেলায়। তিনি ছিলেন সিরাজদ্দৌলার বিপক্ষে, মীরকাশিমের শত্রু, ক্লাইভের আজ্ঞাবহ, রায়দুর্লভের সহকারী এবং মীরজাফরের মন্ত্রী ও মন্ত্রণাদাতা। কিন্তু বাংলার নাট্যকারগণ মিথ্যার বেসাতি এমনই সার্থকভাবে করেছেন যে নন্দকুমারকে বলা হয়েছে 'জাতির প্রথম শহীদ'। জনে জনে ঐতিহাসিকগণ নন্দকুমার সম্পর্কে লিখে গেছেন। মীরজাফরের সঙ্গে তার হৃদ্যতার কথা চুক্তিপত্রের প্রথম লাইনে স্থান পেয়েছে। মীরকাশিমকে নবাবীচ্যুত করার জন্য মীরজাফরের সঙ্গে কোম্পানীর যে চুক্তি হল তার প্রথম লাইনেই লেখা হল যে নন্দকুমারকে হাবুজখানা থেকে ছেড়ে দিতে হবে এবং তিনিই হবেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী বা দেওয়ান। এই সূত্র অনুযায়ী নন্দকুমার মীরজাফরের আমৃত্যু সুহৃদ, অসুস্থ হলে ডাক্তার এবং সমস্ত বিষয়ে তার প্রধান সহায়। মীরকাশিম যখন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে, মীরজাফর ভীত হলেন—গেল বুঝি তার নবাবী। নন্দকুমার পত্র লিখলেন সুজাউদ্দৌলাকে যে মীরকাশিমের সঙ্গে আছে বহু ধনরত্ন ও সম্পদ। তিনি ঠিক জানতেন যে লুব্ধ অযোধ্যার নবাব মীরকাশিমের সম্পদের লোভে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন। ঠিক তাই হল। লোভের বশবর্তী হয়ে সুজাউদ্দৌলা মীরকাশিমকে পীড়ন করলেন। বক্সারের যুদ্ধের সময় তাই বাধ্য হয়ে মীরকাশিমকে হতে হল পলাতক।

পলাশীর যুদ্ধের পর নন্দকুমার ক্লাইভ সাহেবের বশংবদ আদেশবহ। কয়েক-জন ভূম্যধিকারীর ওপর উৎপীড়ন করে অর্থ আদায়ের ইচ্ছা হল ক্লাইভ সাহেবের। হেস্টিংস সাহেব যথেষ্ট অত্যাচার করতে পারছেন না দেখে এই ভার নন্দকুমারকে দেওয়া হল। বর্দ্ধমান, নদীয়া প্রভৃতির জমিদারদের কাছ থেকে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করে ফেললেন। দলিল পত্র জাল করা যে নন্দকুমারের অন্যতম পটুত্ব ছিল একথা স্বয়ং মুতাক্ষরীণ রচয়িতা লিখে গেছেন। নন্দকুমারের মৃত্যুর পর তার বাড়ী থেকে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির জাল শীলমোহর পাওয়া যায়, সঙ্গে ছিল বাহান্ন লক্ষ টাকা। সবই নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে দেওয়া হয়।

আরো এক বিষয় প্রায়ই উল্লেখ করা হয় না। মীরকাশিমের রাজত্ব-

কালে নন্দকুমার হলেন কর্নেল কুটের অর্থাৎ কোম্পানীর প্রধান সেনাপতির ও ক্লাইভের বন্ধুর দেওয়ান। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে জুন মাসে পাটনায় মীরকাশিমের সঙ্গে কর্নেল কুটের যে প্রচণ্ড বিরোধ হল, যে বিরোধে কর্নেল কুট পিস্তল হাতে নবাবের খাস তাঁবুতে ছুটে গেলেন, তার প্রধান উদ্যোক্তা ও পরিচালক ছিলেন নন্দকুমার। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন বটে কিন্তু কোন দেশ হিতৈষণা তাঁর মনের কোণেও ছিল না। তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর রাজ্যে সব থেকে অর্থবান ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তি হওয়া। তার সব কর্ম এই উদ্দেশ্যে ধাবিত হয়েছে। একই ব্যক্তিকে তাই প্রযোজনে খোসামোদ করতে বা তার বিরুদ্ধাচারণ করতে দেখে তাই আশ্চর্য্য হবার কারণ নাই।

নন্দকুমারের চরিত্র অজানা ছিল না বলেই গিরিশচন্দ্র তাঁর মীরকাসিম নাটকে নন্দকুমারকে মীরজাফরের কুচক্রী বন্ধু রূপেই চিত্রিত করেছেন। আধুনিক কালেও তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পলাশীর পর বক্সার' বইএ 'কুচক্রীদের পালের গোদা নন্দকুমার রায়'[১] বলে তাকে অভিহিত করেছেন। কোন দিক দিয়েই নন্দকুমারের চরিত্রের কোন ভাল কীর্তির নিদর্শন নাই। অন্যের ক্ষতি করার বিষয় তাঁর পটুত্ব ছিল অসাধারণ। নন্দকুমারের চরিত্রের বিশেষত্ব হল স্বার্থপরভাবে অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ করা এবং অন্যের সর্বনাশ সাধন করে নিজেকে ক্ষমতার শিখরতম প্রদেশে সংস্থাপন। এই প্রস্তাবনার পর নন্দকুমারের জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির কালানুক্রমিক বর্ণনা দেওয়া যাক।

নন্দকুমারে জীবনী ॥

নন্দকুমারের প্রথম জীবন বা বংশপরিচয় সম্বন্ধে প্রায় কোনরকম ঐতিহাসিক নজির বা নিদর্শন নাই। নিজের বংশধর না থাকায় তাঁর কন্যার বংশ বিংশ শতাব্দীতে তার একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাদের কাছে শুনে ঐতিহাসিক নিখিল নাথ রায়[২] নন্দকুমারের আদি নিবাস বীরভূমে নির্দিষ্ট করেছেন।* নন্দকুমারের সমসাময়িক কালের মাত্র একখানা চিঠি পাওয়া যায় যাতে নন্দকুমারের প্রথম জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই পত্র কোম্পানীর

* জন্ম সম্ভবত ১৬৯৮ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য রিচার্ড বারওয়েলের লেখা। যেহেতু এই পত্র সামাজিক এবং বিদেশে লেখা হয়েছিল সেইহেতু এটির কোন রাজনৈতিক চরিত্র নাই বলেই মনে হয়। কোন রাজনৈতিক প্রয়োজন বা প্রচারের সঙ্গে যুক্ত নয় বলেই সম্ভবত পত্রের বক্তব্যকে সত্য বলে মানতে বাধা নাই। এই পত্রখানি বারওয়েল সাহেব কলকাতা থেকে লেখেন ইংল্যাণ্ডে তাঁর ভগিনীকে। এই পত্র লেখার প্রায় এক শতাব্দী পরে যখন বারওয়েলের পত্রগুলি প্রকাশিত হল তখন এটির অস্তিত্ব জনসাধারণের গোচরে এল। ইতিহাসে এই পত্র প্রথম ব্যবহার করেন স্যার জেমস ফিটস্ জেমস স্টিফেন সাহেব ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ'র এক প্রবন্ধে এবং পরবর্তীকালে তাঁর পুস্তকে।[৩] যে কোন কারণে ঐতিহাসিকদের নজর এড়িয়ে যাওয়ায় নন্দকুমারের জীবনের প্রথম দিক নিয়ে নানারকম গালগল্প প্রচলিত হয়েছে। দায়িত্বশীল ঐতিহাসিক এ সম্পর্কে নীরব থেকেছেন।

বারওয়েল তাঁর ভগিনীকে লেখেন যে নন্দকুমার তাঁর জীবনে প্রথম সরকারী কর্মচারীর চাকুরী পান নবাব আলিবর্দী খাঁর নির্দেশে। রাজা জানকীরামের পুত্র উদীয়মান নবনিযুক্ত দেওয়ান রায়দুর্লভের অনুকম্পায় নন্দকুমার হিজলী ও মহিষাদল পরগণার আমিন নিযুক্ত হলেন। বেশীদিন কিন্তু এই পদে তিনি টিকতে পারেন নাই। রায়রায়ান* চয়ন রায় অভিযোগ করেন যে প্রজা উৎপীড়ন ও উৎকোচ গ্রহণ ছাড়াও নন্দকুমার সরকারী টাকা আদায়ের হিসাব দেন নাই। হিসাব শেষ হলে দেখা গেল যে সম্যক টাকা যা আদায় হয়েছে তা নন্দকুমার খালসা কাছারীতে জমা দেন নাই। তখনই তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হল এবং জানান হল যে বাকী টাকা না দিলে মুক্তি দেওয়া হবে না। এই খবর পেয়ে নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভ রায় বাকী টাকা মিটিয়ে ছেলেকে মুক্ত করেন। এরপর নন্দকুমারকে মুস্তাফা খাঁর সাকরেদ হিসাবে দেখা গেল। মুস্তাফা খাঁর জমিদারী দেখাশোনার ভার নিলেন নন্দকুমার। কিন্তু টাকা পয়সা নিয়ে গোলমাল হতেই তিনি চটপট কলকাতায় চম্পট দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই চয়ন রায় ও মুস্তাফা খাঁ উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করলেন। কাজেই নন্দকুমার আবার মুর্শিদাবাদের

---

* রায়রায়ান পদের মানে হল রাজস্ব বিভাগের দেওয়ানের সহকারী।

নবাব দরবারে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন এবং পরগণা 'সুটসিটরা' (বারওয়েল বাংলা কোন নামের কি ইংরেজী করেছিলেন আর একশ বছর পর ছাপতে গিয়ে কি হয়েছে বলা সহজ নয়। তবে মনে হচ্ছে 'পরগণা সাত সিক্কা' হবে।) দেখাশোনার ভার পেলেন।

নন্দকুমার কেন এই চাকরি ছাড়লেন? কেনই বা হুগলীতে উপনীত হয়ে সেখানে বসবাস করলেন? কেনই বা হুগলীর খ্যাতনামা অধিবাসী মীর হুতবুল্লা তাকে পাঁচদিন কয়েদ করে রেখেছিলেন তা বারওয়েল সাহেব জানতেন না। তিনি সন্দেহ করেছিলেন যে যথাসময়ে ঋণের টাকা শোধ না হওয়ায় নন্দকুমারকে হাজত বাস করতে হয়। এই অপমান নন্দকুমার ভুলতে পারেন নাই। প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি মুর্শিদাবাদে ফিরে গিয়ে মুন্সী সাদেকউল্লাকে ধরলেন এবং তারই সুপারিশে হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ ইয়ারবেগ খানের দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই উৎকোচ গ্রহণের খবর নন্দকুমার প্রমাণসহ ফাঁস করে দেওয়ায় মহম্মদ ইয়ারবেগ খান পদচ্যুত হলেন ও নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত হলেন। এটাই ক্ষমতার উঁচু মহলে ওঠার ছিল সহজতম পথ। ঢাকায় রাজবল্লভের জীবনী আলোচনাতেও এই একই কর্মকাণ্ড দেখা গেছে। তিনিও ক্রমান্বয়ে তাঁর অন্নদাতাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে শেষ পর্যন্ত বিহারের নবাব—নাজিম হয়েছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইংরেজ কোম্পানী নন্দকুমারকে প্রচুর অর্থে বশীভূত করল। ফরাসী চন্দননগর অধিকার প্রায় শেষ হবার সময় নবাব-দরবার নন্দকুমারের সরকারী পত্র পেলেন। ফরাসী কুঠী মারফৎ খবর অবশ্য আগেই পৌঁছে গেছে। মঁসিয়ে জঁা লা নবাব সিরাজদ্দৌলার সাহায্য চেয়েছেন। নবাবও হুকুমনামা লিখে দিয়েছেন। কিন্তু রায়দুর্লভ মঁসিয়ে জঁা লা সাহেবকে জানালেন বাধা কোথায়। প্রথমে তাঁকে দশ হাজার টাকা ঘুষ দিলেন ফরাসী কোম্পানী—কিন্তু সাতদিনের মধ্যে নড়াচড়ার নিদর্শন নাই দেখে খোঁজ নিতে এসে জানলেন টাকায় কম পড়ে গেছে। আবার ১৫ হাজার টাকা রায়দুর্লভকে ঘুষ দিলেন মঁসিয়ে জঁা লা। তখন মীরমদনকে ডেকে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করাতে অনুরোধ করলেন দুর্লভরাম। নবাবী সৈন্য নদী পার হয়ে মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতে যেতেই চন্দননগর পলাতক দলে দলে ফরাসী স্ত্রী পুরুষ শিশু খবর দিল

যে চন্দননগরের যুদ্ধ শেষে ক্লাইভ দুর্গাধিকারী। মহানন্দে রায়দুর্লভ সৈন্য-বাহিনীকে ফেরবার আদেশ দিলেন। নন্দকুমারের সঙ্গে রায়দুর্লভের সখ্য দীর্ঘদিনের। তাই সন্দেহ হয় যে ইংরেজদের চন্দননগর জয় নন্দকুমারের ও রায়দুর্লভের অভিপ্রেতই ছিল। এ সময় বাংলার আকাশে ঘনঘটা। তাই এই রাষ্ট্রবিপ্লবের ক্ষণকে উপার্জনের প্রকৃষ্ট অবকাশ ভেবে নন্দকুমার, রায়দুর্লভ প্রভৃতি দুহাতে উৎকোচ গ্রহণ করে নিজ নিজ অবস্থার উন্নতি করেন। (স্টিফেন, II, ২৭৩-২৮৯ পাতা)

ভবিষ্যতের ঘটনা লক্ষ্য করলে রায়দুর্লভ ও নন্দকুমারের মধ্যে চরিত্রগত তফাৎ বিশেষ ঔৎসুক্যের সূচনা করে। রায়দুর্লভ নবাবের দেওয়ান তথা বাংলা সুবার উচ্চতম কর্মচারী হয়েছিলেন তা সত্বেও তিনি ছিলেন উৎকোচ গ্রহণে আগ্রহী। পরবর্তীকালে নবাব মীরজাফরের সঙ্গে মনোমালিন্য হলে তিনি ভেবেছেন যে মীরণকে নবাব করে তিনি ক্ষমতাশীল হবেন, সরিয়ে দেবেন মীরজাফরকে। রাজনৈতিক পরিবেশ কতটা বদলেছে বুঝতে পারেন নাই 'দুর্লভরাম'। বুঝতে পারেন নাই যে ইংরেজ বজ্রমুষ্টিতে বাংলার ব্যবসাকে ধরেছে। এই অজ্ঞানতা রাজা দুর্লভরামকে ধ্বংস করে দিল। তার পুত্র রাজা রাজবল্লভ কলকাতার কোম্পানীর কমিটির দেওয়ান হয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠিতে একই অভিযোগ করেছেন বার বার। বলেছেন মীরজাফর কিছুই করল না কিন্তু কোম্পানী তাকে নবাবী দিল তার বংশধরদের সুখে শান্তিতে বসবাস করবার ব্যবস্থা করে দিল। এমনকি কলকাতার এক প্রান্তিক অঞ্চল মীরজাফরের নামে 'আলিপুর' বলে চিহ্নিত হল। কিন্তু পলাশী-বিপ্লবের প্রধান হোতা তার পিতা রায়দুর্লভের জন্য কোম্পানী কিছুই করেন নাই। রায়দুর্লভ ছাড়া কোম্পানীর ক্ষমতা লাভ কখনই স্বার্থক হত না অথচ তাঁকে কোম্পানী সব বিষয়ে বঞ্চিত করেছেন। রাজবল্লভ আবেদন করলেন যে পিতামহ জানকীরাম বিহার ও বাংলার যে সব জায়গীর ভোগ করেছেন এবং পিতা দুর্লভরাম যে সব জমিদারী ও আর্থিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছেন সেগুলি সমুদয় তাকে দেওয়া হোক। কোম্পানী বলাবাহুল্য কোন কথাই শোনে নাই। তবে উত্তর কলকাতায় 'রাজবল্লভ পাড়া' তাঁর নামাঙ্কিত হয়ে আছে।

এ বিষয়ে নন্দকুমারের চালচলন সম্পূর্ণ বিপরীত। চন্দননগর পতনের

পর থেকেই ক্লাইভ সাহেবের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সখ্যতা। ক্লাইভের বাহিনীর পিছনে পিছনে এসে তিনি পলাশীর পরাজয় সংবাদ পাওয়া মাত্র মুর্শিদাবাদে উপনীত। ২৯শে জুলাই যখন ক্লাইভের হাত ধরে মীরজাফর সিংহাসনে বসলেন তখন নন্দকুমার সেখানে উপস্থিত। নন্দকুমার ক্লাইভ সাহেবের একজন বন্ধু বুঝে মীরজাফরের কাছে তার দাম বেশ একটু বেড়ে গেল বৈকী। একথা দুর্লভরাম বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি নিজের নায়েবের পদ দিলেন নন্দকুমারকে। বুদ্ধিমান নন্দকুমার পদ গ্রহণ করলেন বটে কিন্তু তিনি দুর্লভরামের কোন কাজ করতেন না। করতেন ক্লাইভ সাহেবের কাজ তাতে নবাব মীরজাফরের কাছে, মুর্শিদাবাদ দরবারে এবং কলকাতায় তাঁর যাতায়াত স্বচ্ছন্দ হল। খাতির বেড়ে গেল দারুণ। এই রাজনৈতিক গঠন বোঝবার বুদ্ধি নন্দকুমারকে সমসাময়িক বাঙালীদের থেকে পৃথক করেছে। এইখানে নন্দকুমারের চরিত্রগত মিল আছে সেইসব বাঙালীর সঙ্গে যাঁরা যুগসন্ধির সুযোগে নিজেদের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন যেমন নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ, কৃষ্ণকান্ত ও গোকুলকৃষ্ণ। নন্দকুমার তাঁর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিতে বুঝেছিলেন যে রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁকে সম্পদের উচ্চতম শিখরে নিয়ে যাবে। সেই শিখর ছোবার মুহূর্তে তাঁর পতন তাই এক আশ্চর্য্য কাহিনী। দুঃখের বিষয় সেই জীবন বোঝবার চেষ্টা না করে বাঙালী নাট্যকারগণ রূপকথা দিয়ে তাঁর জীবন মুড়িয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক আলো তার ওপর ফেলে মিথ্যাচার করে বলেছেন তিনি শহীদ। কোন নামাবলী চিহ্নিত করে নন্দকুমারকে বোঝা যাবে না। পদেপদে তার পথ পরিবর্তন বিভ্রম সৃষ্টি করবে শুধু। ভুলে গেলে চলবে না যে তার উন্নতির প্রথম সোপান ক্লাইভ সাহেবের খিদমৎগারী। সেইজন্যই সুরু হল হেস্টিংসের সঙ্গে মনোমালিন্য আর নবাব মীরজাফর আলি খাঁ মহবৎ জঙ্গ বাহাদুরের সঙ্গে প্রগাঢ় ও একান্ত বন্ধুত্ব।

মীরজাফরের সঙ্গে নন্দকুমারের বন্ধুত্ব যে প্রথমাবধি ইংরেজ কোম্পানীর ইচ্ছায় হয়েছে তার প্রমাণ আছে। ৩রা জানুয়ারী ১৭৫৮ স্ক্রাফটন সাহেব কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ ও অস্থায়ী রেসিডেণ্ট ওয়ারেন হেস্টিংসকে লিখে পাঠালেন, 'ওহে ওই কাশীনাথ নামে ব্যক্তিটি নবাব দরবারে বড়ই প্রভাবশালী হয়ে উঠছে এখুনি ওর পতন ঘটাও। মনে রেখ বিপ্লবের পর (পলাশীর যুদ্ধকে

'বাঙলার বিপ্লব' বলা হত।) এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে কোন দেশীয় লোক (লেখা হয়েছে—কালা লোক) আমাদের অনুমতি ছাড়া যেন নবাব দরবারে প্রতিপত্তি করতে না পারে। বাজারের জিনিষের মতো তাদের নিয়ে খালি কেনা বেচা করতে হবে।'[8]

হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের মনোমালিন্য শুরু হল। ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৮ ক্লাইভ হেস্টিংসকে এক পত্রে বর্দ্ধমানের রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। ৭ই সেপ্টেম্বর হেস্টিংস ক্লাইভকে এক পত্রে জানালেন যে বর্দ্ধমানের রাজা তাকে জানিয়েছেন যে নন্দকুমার তাঁর কাছে রাজস্ব আদায় করতে যাওয়ায় হেস্টিংসকে নূতন কিস্তির রাজস্বের যে টাকা তিনি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। নন্দকুমারকে রাজস্ব আদায়ের ভার দেওয়ায় হেস্টিংস আশ্চর্য্য হয়েছেন এবং বার বার প্রতিবাদ করেছেন। ক্লাইভ কিন্তু ১০ই সেপ্টেম্বর ১৭৫৮ হেস্টিংসকে জানালেন যে তিনি যেন বর্দ্ধমানের রাজাকে লিখে জানান যে এখন থেকে নন্দকুমারের হুকুম শুনতে হবে। ১২ই জানুয়ারী ১৭৫৯ স্ক্রাফটন হেস্টিংসকে খবর দিচ্ছেন যে নন্দকুমার ৪০ জন সিপাহী নিয়ে বীর বিক্রমে বর্দ্ধমানের রাজার কাছে টাকা আদায় করতে গেছেন।[৫]

স্ক্রাফটনের পত্রে ক্লাইভ সাহেবের ওপর নন্দকুমারের প্রভাবের কারণও পাওয়া যায়। স্ক্রাফটন বলেন যে নন্দকুমার টাকার লোভ দেখিয়ে ওয়াটস সাহেবকে বশীভূত করেছে এবং তারই সাহায্যে ক্লাইভ সাহেবকে ধোঁকা দিয়ে চলেছে। এটি ব্যক্তিগত পত্র বলেই বেশী প্রণিধানযোগ্য। স্ক্রাফটন লিখছেন হেস্টিংসকে ২রা অক্টোবর ১৭৫৮। তার নিজের জবানই শোনা যাক—'It is something amazing to see how Nuncoomar dupes the Colonel, there is not three laacks paid in yet, but as he is supported by Mr Watts it is probable that he will continue sometime longer in his employment'...[৬] তা সত্ত্বেও হেস্টিংস তীব্র প্রতিবাদ করলেন। 'জানালেন যে নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর যে চুক্তি হয়েছে তদনুযায়ী কোম্পানীর কর্মচারী বর্দ্ধমানের রাজার রাজস্ব আদায় করবেন। নন্দকুমারকে রাজস্ব দিতে আপত্তি করে বর্দ্ধমানরাজ কোন অন্যায় করেন নাই।

ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে রায়দুর্লভকে সরে যেতে হয়েছে কলকাতায়, ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। নবাব মীরজাফর প্রথমে একটু মনঃক্ষুন্ন হলেন যে তাঁর বন্ধু নন্দকুমার রায়দুর্লভকে সরাবার ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেন নাই। কিন্তু পরে তিনি বুঝলেন যে নন্দকুমার কলকাতায় বসে তাঁর অন্নদাতা রায়দুর্লভের বিরুদ্ধে যদি ক্লাইভ সাহেবের কান ভারি না করতেন তাহলে মীরজাফর কখনই দুর্লভরামকে মুর্শিদাবাদ থেকে সরাতে পারতেন না। মীরজাফর বুঝলেন যে এমন সুহৃদ তিনি আর পাবেন না। এদিকে দেওয়ানের পদও খালি পড়ে আছে। একাধারে তাঁর শুভাকাঙ্খী আর ক্লাইভ সাহেবের বন্ধু এমন লোক তিনি পাবেন কোথায়। ১৭৫৯ সালের ১৫ই জুলাই এর আগেই নন্দকুমার 'রাজা নন্দকুমার' নামে মীরজাফরের দেওয়ান হয়ে বসেছেন। মহামান্য ক্লাইভ সাহেব সানন্দে এই ব্যবস্থা অনুমোদন করলেন।[৭]

ঘটনাক্রম এই রকম। বছর শেষ হবার আগেই ক্লাইভ সাহেব জানালেন; ২৮শে নভেম্বর ১৭৫৮,' Nuncomar has (sic) now under the Nabob's own hand, offers of a title and jaggeer if he would bring the affair of Roy Doolub's letter to a good issue.[৮] বেচারা হেস্টিংস অত্যন্ত দুঃখিত হলেন। তাতে কি? ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৭৫৯ এর চিঠিতে, ক্লাইভ হেস্টিংসকে হুকুম দিয়েছেন যে নন্দকুমার যত দেহরক্ষী চাইবে যেন দেওয়া হয়।[৯] জুলাই মাস আসতে না আসতেই নন্দকুমার হলেন নবাব মীরজাফরের দেওয়ান। হেস্টিংস এই লোকটির সংশ্রব যত এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন ভাগ্যের পরিহাস তাঁদের তত কাছকাছি এনে ফেলেছে।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পড়তে না পড়তেই ক্লাইভ সাহেব দেশে ফেরবার যোগাড় করে ফেললেন। নন্দকুমার দেওয়ান হয়ে জমিয়ে বসলেও কিন্তু নবাবের দিকে তার নজর ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংগ্রহে প্রায়ই তিনি মুর্শিদাবাদের বাইরে থাকতেন। নবাব আফিং খেয়ে ঝিমুতেন আর বাঈজিদের নিয়ে বিভোর আর হয়ে যেতেন। রাজত্ব শাসন করতেন তিনটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক। ফল সহজেই ফলল। শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ যেন হারিয়ে গেছেন রাজা নন্দকুমার। কোথায় গেলেন খুঁজতে খুঁজতে সাপের গর্তে হাত পড়ে গেল। এই সময়েই জানা

গেল যে কোম্পানীর উচ্ছেদ সাধনের জন্যে তিনি প্রথমে ওলন্দাজদের সঙ্গে ও পরে ফরাসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করে বিফল হন (কোন আধুনিক বুদ্ধিমানের মতে এটাই তাঁর ইংরেজ বিদ্বেষ ও স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষার প্রকৃষ্ট প্রমাণ)। খবরটা যাবার আগে ক্লাইভই শুনলেন, প্রমাণ পেলেন চিঠিপত্রে। যাবার সময় ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেবের জন্য নিদেশ রেখে গেলেন যে তিনি এসেই যেন যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তদনুযায়ী গবর্ণরের পদে আসীন হয়েই ভ্যান্সিট্টার্ট রক্ষী বসালেন নন্দকুমারের ওপর। বাড়ী তল্লাসী করে বহু চিঠিপত্র পাওয়া গেল নানারকমের। নন্দকুমার সম্পর্কে সন্দিহান হলেন কাউন্সিল। তাঁকে জেলে বন্ধ করা হল। ইংরেজদের হাতে এটাই তাঁর প্রথম কারাবাস। তাঁর পূর্বকীর্তি স্মরণ করে চল্লিশদিন হাজত বাসের পর তাকে মুক্তি দেওয়া হল।[১০]

এরই মাঝে মীরজাফরের রাজত্ব গেল। বাংলার সুবাদার হলেন মীরকাশিম। নন্দকুমার কলকাতায় এসে মীরজাফরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। এই সময় নন্দকুমার খোলাখুলিভাবেই মীরকাশিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালালেন। কোম্পানীর কোন কোন সাহেব যেমন অমিয়েট নন্দকুমারকে বিশেষ স্নেহ করতেন। নবাবের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের ষড়যন্ত্রে তাঁরা ইন্ধন যোগাতেন। নবাব মীরকাশিমের বন্ধু গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্টের বই পড়লে এই সময়কার নন্দকুমারের খল মূর্তি স্পষ্ট দেখা যায়। ১৭৬৩তে কোম্পানীর প্রধান সেনাপতি হয়ে এলেন ক্লাইভের বন্ধু আর পলাশীর অন্যতম সেনাপতি আয়ার কুট। কর্ণেল কুট বীর, যোদ্ধা ও বদরাগীলোক বলেই প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। নাম কুট হলেও বুদ্ধিতে একটু ভোঁতা। নন্দকুমার চটপট কুট সাহেবের দেওয়ান হয়ে বসলেন এবং কুটের সঙ্গে পাটনায় উপস্থিত হলেন। নবাব মীরকাশিম তখন পাটনায় বসে রামনারায়ণকে তাড়াবার বন্দোবস্ত করছেন। কাউন্সিলের সংখ্যাগুরু দল সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন কুট সাহেবকে যেন তিনি রাজা রামনারায়ণকে রক্ষা করেন। পাটনায় পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই কর্ণেল আয়ার কুটের সঙ্গে নবাব মীরকাশিমের বিরোধ বেধে গেল। অবশেষে রাজা রামনারায়ণ, মহারাজা রাজবল্লভ ও রাজা নন্দকুমার কুটকে খবর দিলেন যে নবাব তাঁকে ও তাঁর বাহিনীকে বন্দী করবার ষড়যন্ত্র করছেন। ফলে পিস্তল হাতে কুট সাহেবের নবাব মীরকাশিমের

হারেম তাঁবুতে হামলা এক হাস্যকর ইতিহাস হয়ে আছে। কুট সাহেব কিন্তু ষড়যন্ত্রের খবরে বিশ্বাস করেছিলেন। তাই নন্দকুমারের ওপর তার বিশ্বাস আর ভালবাসা দৃঢ় হল। কর্ণেল কুট কলকাতায় চিঠি লিখে জানালেন যে ওয়াটস সাহেব নবাবকে অনুরোধ করেছেন যেন হুগলীর ফৌজদারী আবার নন্দকুমারকে দেওয়া হয়। কাউন্সিল যেন নন্দকুমারকে এই পদ দেবার জন্য নবাবের ওপর চাপ দেন।[১১] বলাবাহুল্য নবাব মীরকাশিম এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ১৭৬২ সম্পর্কে কাউন্সিলের সভাসদ হুইলার সাহেবের বক্তব্য স্পষ্ট' The Volume of Proceedings (from 27th April 1761 to 27th September 1762) on the early forgeries of Nuncomar is a curious record connected with the administration of Mr Vansittart '[১১] বস্তুত কোম্পানীর কাগজপত্রে নন্দকুমার সম্পর্কে সাবধানবাণী ধ্বনিত হয়েছে নিয়মিতভাবে। নবাব মীরকাশিমও নন্দকুমারের কীর্তিকলাপে চরম অসন্তুষ্ট। নন্দকুমার ইংরেজদের সঙ্গে নবাব মীরকাশিমের বিরোধের সুযোগে, ফরাসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ফরাসীরা চন্দনগরে নন্দকুমারকে চিনেছে তাই আলোচনা চালালেও কোন প্রস্তাবেই রাজী হলেন না। উপরন্তু ষড়যন্ত্রের কাগজপত্র যাতে ইংরেজদের হাতে পড়ে তার ব্যবস্থা করলেন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে নন্দকুমারকে আবার হাবুজখানায় ভরা হল। খবর গেল ইংল্যাণ্ডে, সেই সঙ্গে ষড়যন্ত্রের কাগজপত্র। সেগুলি পাঠ করে বিলাতের ব্যবসায়ী পরিচালক মণ্ডলী ভয়ে কেঁপে উঠলেন। তাড়াতাড়ি লিখে পাঠালেন নন্দকুমার যেন কোন রকমেই দক্ষিণে যেতে না পারেন। পণ্ডিচেরীর ফরাসীকর্তারা তাকে পেলে কি করবেন তার ঠিক নাই। এক বছর পরে যখন সে চিঠি এসে কলকাতায় পৌঁছল তখন নন্দকুমার শুধু মুক্ত নয় সাম্রাজ্যের সব থেকে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, নবাব মীরজাফরের দেওয়ান। চিঠি যাওয়া আসার মাঝে বাংলায় হয়েছে দৃশ্য পরিবর্তন।

দ্বিতীয়বার নবাব হবার প্রথম প্রস্তাবেই মীরজাফর চাইলেন নন্দকুমারের মুক্তি এবং তাকে মন্ত্রী করবার অনুমতি। এই পদের নাম হল নায়েব—সুবা অর্থাৎ সুবাদারের নায়েব বা প্রধান কর্মচারী। ইংরেজ বাধ্য হয়ে রাজী হলেন। ৯ই জুলাই ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমার জেলখানা থেকে ছাড়া পেলেন। এবার

আর আগের বারের ভুল করলেন না নন্দকুমার। সুবাদার হিসাবে যাতে নবাব মীরজাফর সনদ পান তার চেষ্টা শুরু হল। বাদশাহ দিল্লী থেকে পলাতক হয়ে অযোধ্যার নবাবের আশ্রিত। তাঁদের কাছেই ছুটে গেছেন মীরকাশিম। নন্দকুমার বাদশাহকেই চিঠি লিখলেন। মীরকাশিমের উপস্থিতি এবং আপত্তি সত্বেও ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ২৮ লক্ষ টাকার বিনিময়ে সুবাদারী সনদ মীরজাফরের হস্তগত হল আর সেই সঙ্গে নন্দকুমার 'মহারাজা' খেতাবে ভূষিত হলেন। জুন মাসেই নন্দকুমারের দূত অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে চুপি চুপি দেখা করলেন নবাব মীরজাফরের পক্ষে। খবর দিলেন যে মীরকাশিমের কাছে রয়েছে প্রচুর ধনরত্ন। অযোধ্যার নবাব মীরকাশিমকে প্রচণ্ড পীড়ন করলেন গুপ্তধনের খবর জানতে। বক্সার যুদ্ধে ইংরেজ জয়ী হল কিন্তু যুদ্ধ সুরু হবার আগেই মীরকাশিমকে হতে হল পলাতক। শত্রু বিনাশ হল। নবাব মীরজাফর মন্ত্রী নন্দকুমারকে নিয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন। সুখ সহ্য হলনা কারণ ইতিমধ্যে মীরজাফর কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হয়েছেন আর নন্দকুমারের উপদেশে হিন্দুর পীঠস্থান কালীবাড়ী থেকে চরণামৃত নিয়ে এসে ঔষধ জ্ঞানে তাই নিয়মিত পান করছেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী মীরজাফরের মৃত্যু। কিছুদিন পরেই লর্ড ক্লাইভ বাংলার গবর্ণর হয়ে কলকাতায় এলেন। মার্চ মাসেই কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের সঙ্গে নন্দকুমারের হীন ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ল। ১লা ও ৩রা এপ্রিলের পত্রে নবাবকে অনুরোধ করা হল নন্দকুমারকে যেন বন্দী করে কলকাতায় পাঠান হয় কারণ বলবন্ত সিংহের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার জন্য নন্দকুমারের বিচার হবে।[১৩] তদনুযায়ী ১৩ই জুন ক্লাইভ সাহেব সিলেক্ট কমিটির বিবরণীর খাতা টেনে জনস্টন সাহেবের অভিযোগের উত্তরে লিখলেন—'With regard to Mr. Johnstone's observations concerning Ramchurn, Petruse, Nundocomar and Nubkissen, the first was dismissed from my service, the second turned out of my house and the third put under confinement with a guard. All of them I look upon as villians.[১৪] সুতরাং এই সময় পর্য্যন্ত নন্দকুমার যে কয়েদখানায় বন্ধ ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সম্ভবত নন্দকুমারের সঙ্গে বলবন্ত সিংহের ষড়যন্ত্র প্রমাণ করার মতো

কাগজপত্র ইংরেজ কোম্পানীর হস্তগত হয় নাই। এমন হতে পারে যে মুর্শিদাবাদ থেকে নন্দকুমারকে সরিয়ে আনবার এটা এক ছল। মীরজাফরের মৃত্যুর পর নবাব হয়েছেন নাবালক নাজামাদ্দৌলা তাঁর প্রধান মন্ত্রী মুজাফ্ফর জঙ রেজা খাঁ হয়েছেন নায়েব সুবা, উপদেষ্টা নূতন জগৎশেঠ ও প্রাচীন দুলভরাম। এতগুলো পাকা মাথাই যে নন্দকুমারকে কলকাতায় এনেছে তা নিঃসন্দেহ। তবে এবার ক্লাইভ সাহেবের কান ভারি করেছিলেন সম্ভবত নবকৃষ্ণ। তিনি তখন তাঁর প্রিয়পাত্র। লর্ড ক্লাইভ চটলে রক্ষা ছিলনা। তিনি নন্দকুমারকে সপরিবারে চট্টগ্রামে নির্বাসন দণ্ড দিলেন। আবার নবকৃষ্ণের অনুরোধেই সেটা রদ করলেন। 'We, the members of tne Council in our previous meeting, formed a resolution for his banishment to Chittagong. But our well known friend, Nabokissen Moonshee, has lately given us a very sound advice He says that as an intriguing man, Nuncomar should not be send to Chittagong, at a considerable distance from Calcutta ; on the contrary he should be detained at Calcutta under strict surveillance as a state prisnor.'[১৫] সুতরাং নন্দকুমারের বন্দীদশা তখনও চলছে। এবার নন্দকুমার দীর্ঘদিন আবদ্ধ ছিলেন মনে হয় কারণ গোটা ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কোথাও তাকে দেখা যায় না। আর নন্দকুমার চুপ করে বসে থাকতে পারতেন না সেটা পরবর্তী ইতিহাসে দেখা যাবে। হয়তো ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময় নন্দকুমার মুক্তি পান। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ দেশে ফিরে গেলেন। একটুও দেরী না করে নন্দকুমার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করলেন নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে। কিন্তু সে কথায় যাবার আগে নন্দকুমার-নবকৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু বলা যাক তা না হলে সমসাময়িক রাজনীতি অকথিত থেকে যাবে। পলাশীর পর নন্দকুমার ও নবকৃষ্ণের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব দেখা যায়।

পলাশীর পর নবকৃষ্ণ ও নন্দকুমারের মধ্যে ভীষণ সখ্য হল। নবকৃষ্ণ ক্লাইভের বেনিয়ান সুতরাং নন্দকুমার তাকে হস্তগত করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুই বন্ধু পুরাতন জমিদারদের বহু সম্পত্তি নানা অছিলায় আত্মসাৎ করলেন। নদীয়া ও

বর্দ্ধমানের মহারাজাদের সম্পত্তিই এঁরা সব থেকে বেশী হরণ করলেন ১৭৬০ থেকে ১৭৬৩র মধ্যে কি কারণে দুই বন্ধুর মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হল স্পষ্ট জানা যায় না। সন্দেহ করা হয় যে দুই বন্ধুর মনোমালিন্যের ফলেই নবকৃষ্ণ নন্দকুমারের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন যার ফলে নন্দকুমারকে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের তিন মাস জেলে থাকতে হয়। মীরজাফরের মৃত্যু ও ক্লাইভের ফেরার পরই যে কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের সঙ্গে ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেল এতেও নবকৃষ্ণর হাত আছে মনে হয়। ক্লাইভ ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই নন্দকুমার নবকৃষ্ণের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। জনৈক হিন্দু ব্রাহ্মণের স্ত্রী নীবুর উপর জোর করে বলাৎকারের অভিযোগে নবকৃষ্ণ অভিযুক্ত হলেন। এই ঘটনাকে লোকের মুখে মুখে এমনভাবে প্রচার করা হল যে কারু মনে সন্দেহ থাকল না যে নবকৃষ্ণ সত্যই অপরাধী। দীর্ঘ দুইশত বছর পরে বহু শিক্ষিত বাঙালীর সঙ্গে আলোচনায় বোঝা গেছে যে তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে নবকৃষ্ণ এই অপরাধ সত্যই করেছিলেন। কোম্পানীর কাগজপত্রে এ বিষয়ে বিষদ বিবরণ পাওয়া যায়। নবকৃষ্ণের অনুরোধে ইংরেজ কোম্পানী এক অনুসন্ধান সমিতি নিয়োগ করেন। তাদের বিবরণ যেমন আছে তেমনি বলাৎকৃত বলে চিহ্নিত ব্রাহ্মণের স্ত্রীর বিবৃতি আছে। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের কাছে যাঁরা ষড়যন্ত্রের জন্য এসেছিলেন তারাও অনুসন্ধানীদের কাছে সব প্রকাশ করে দেন। জনৈক রামনাথ দাস অভিযোগ করেন যে নবকৃষ্ণ তাঁর কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করেছেন এবং রামশঙ্কর ঘোষ ও নীমু গাঙ্গুলী অভিযোগ করলেন যে নবকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করেন।[১৬] কমিটির সামনে ব্রাহ্মণ কানাই ঠাকুর যা বলেন তা লিপিবদ্ধ আছে। 'The Bramin, being asked if he had any matter of complaint against Nobkissen, replies no, that he has nothing himself to allege, but that he had been much pressed and solicited by Ramsancor Gose and Nemo Gongolee to accuse Nobkissen of violating his wife. That he had been sent for by Nundcomar, who desired he would complain of Nobkissen to the Board, and said he would assist him with money in the meantime, and when the affair was over, give him 25000 rupees to compensate him for losing caste. He

further declares that, wrought upon by Nundcomar's promises and the persuasions of Ramsancor Gose and Nemo Gongolee, he used his utmost endeavour to prevail on his wife to accuse Nobkissen ; but she would never give her consent to be the instrument of ruining an innocent man.'...'The Bramin's wife is called in She declares that she never was any way injured by Nobkissen ; but that Ramsancor Gose and Nemo Gongolee had used every endeavour to persuade her and her husband to accuse him. That Nemo Gongolee offered to give her 500 Rupees in jewels and 2000 Rupees in money if she would consent'... ..(They) 'had worked so much upon the mind of her husband by large promises and offers of money that he (the Bramin) even threatened her life if she refused to comply. However that she still persisted in declaring that she would never ruin an innocent person.'[১৭]

সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা না জানা থাকলে এই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারা যাবে না। তৎকালীন নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণপত্নীকে বলাৎকার প্রমাণিত হলে উভয়েরই জাতিপাত ঘটবে। ব্রাহ্মণদের জন্য নন্দকুমার ২৫০০০ টাকার ব্যবস্থা রেখেছিলেন যাতে জাতিতে ব্রাত্য হলেও তাদের জীবন কেটে যাবে। কিন্তু নবকৃষ্ণের পক্ষে জাতিপাত হওয়া এক সাংঘাতিক বিষয় কারণ তাতে তিনি সমাজে পতিত বলে গণ্য হবেন। সেই সঙ্গে তার রাজনৈতিক ক্ষমতার হ্রাস হবে ও অর্থকরী সুযোগ কমে আসবে। নন্দকুমার যে বুদ্ধি করেছিলেন তাতে এক ধাক্কায় নবকৃষ্ণকে পতিত করে নন্দকুমারের কলকাতার সামাজিক নেতৃত্ব করবার সুযোগ হত। এক মূর্খ ব্রাহ্মণী ইতিহাসের কত বড় ঘুঁটি তখনই বোঝা যায় যখন দেখা যায় যে দীর্ঘদিন পরে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত নন্দকুমারের মামলার ফারসী কাগজপত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করতে ফারসীবিদ মুন্সী নবকৃষ্ণকে ডাকা হচ্ছে।

নন্দকুমার, নবকৃষ্ণের পতন ঘটাতে না পেরে কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা

দিলেন। কেউ বলেন তীর্থ পর্যটনে সময় অতিবাহিত করেন। এ সময় সকলেই তাকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। মুতাক্ষরীণ তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন—: He was a man of wicked disposition and haughty temper, envious to a high degree, and on bad terms with the greater part of mankind, although he had conferred favours on two or three men and was firm in his attachments.'

কথিত আছে যে রাস্তা চলতে কোন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে নন্দকুমার হাসলে সেই ব্যক্তি বাড়ী ফিরে অনিদ্র রজনী যাপন করত। কারণ সাধারণের কাছে ওই হাসির বক্তব্য হল 'রও, এবার তোমার সর্বনাশ করিতেছি।'

১৭৬৮ থেকে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমারের বিশেষ কোন কাজকর্ম দেখা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন যে তাঁর প্রাণদণ্ডের পর অন্য অভিজাতদের যে সব জাল শীলমোহর তাঁর বাড়ী থেকে আবিষ্কৃত হয় সেগুলি এই সময় সংগৃহীত হয়ে থাকতে পারে। এ সময় নবকৃষ্ণও নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেন। প্রথমে গোকুলকৃষ্ণ ঘোষালের সঙ্গে ও পরে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সখ্য তাকে কলকাতার সামাজিক নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করল। নন্দকুমার তাঁকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। এই সময়ে নন্দকুমার মণিমাণিক্য বন্ধক রেখে টাকা ধার দিতেন মনে হয়। সেই সূত্রে বোলাকিদাস শেঠ সম্পর্কিত ঘটনাবলী এই সময় ঘটে যা পরে নন্দকুমারের জালিয়াতি মামলায় বিশদভাবে ব্যবহৃত ও আলোচিত হয়। অর্থলোভ ও অন্যের শীলমোহর জাল করে ব্যবহার করার অভ্যাস নন্দকুমারকে এমনভাবেই আচ্ছন্ন করেছিল যে এই সময়কার ঘটনাবলী ভাল করে অনুধাবন করলেই বোঝ যায় যে নন্দকুমারকে বিপদে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করা মোটেই কঠিন ছিল না। নন্দকুমার যে পথে ক্ষমতার ও অর্থের উচ্চতম শিখরে আরোহন করেছেন সেই পিছল পথ তার পতনকেও দ্রুততর করবে বোঝা কঠিন নয়।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ নূতন যুগের বার্তা বহন করে আনল। কোম্পানী ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেবকে গবর্ণর করে পাঠালেন। ফিলিপ উডরাফ সাহেব এই যুগ সম্পর্কে সুন্দর লিখেছেন :—'কোথাও কোন নূতন সাহেব

নিযুক্ত হলেই ভারতীয়গণ প্রথমে তাঁর গন্ধ নিতেন, কেমন লোক ব্যবহার করে দেখতেন তারপর খোসামোদ করে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতেন। ঘনিষ্ঠতা কতটা বা আদৌ আছে কিনা বোঝা যেত উপহারের নজির দেখে। উপহার গ্রহণ করলে, আরও খোসামোদ করে আরও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেই সঙ্গে নিজের অর্থ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু 'কড়া সাহেব' হলে এসব কিছুই হবে না। সুতরাং তখন ওপর মহলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাঠাতে হবে। তার শাসনকাজে অসুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। এই সব কাজের মুখ্য উদ্দেশ্য 'কড়া সাহেব'কে তাড়াতাড়ি তাড়ান আর যাতে 'নরম সাহেব' আসে তার চেষ্টা করা। কারণ 'নরমসাহেব' না হলে ব্যক্তিগত উন্নতির পথে নানা বাধা।' নন্দকুমার ও হেস্টিংস বিষয়ে উপরোক্ত গণনা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তা দেখা যাবে। নন্দকুমার এই গাণিতিক পথে নির্ভুল-ভাবে বিচরণ করেছেন। যখন বুঝেছেন 'কড়াসাহেব'কে তাড়ান প্রয়োজন তখনই অভিযোগ এনেছেন ও সংখ্যাগুরু কাউন্সিল সদস্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের প্রধান সহকারীতে নিজেকে রূপান্তরিত করেছেন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল হেস্টিংস গভর্ণর পদ গ্রহণ করলেন। ১৮ই জুন নন্দকুমার হেস্টিংসকে এক অতি সুমিষ্ট সম্ভাষণে পত্র দিলেন। পত্রে অনেক খবর ছিল। প্রথমেই জানালেন যে রাজা দুর্লভরামের পুত্র রাজা রাজবল্লভ মণিবেগমকে চাটুকারিতায় ভুলিয়েছেন। তিনি এখন নবাবের দেওয়ান হবার চেষ্টা করছেন। রাজবল্লভের ক্ষমতালিপ্সা আর অর্থ লোভ সম্পর্কে লিখে নন্দকুমার সাবধান করে দিচ্ছেন যে এই পদ পেলে রাজবল্লভ নিজের আত্মীয় আর বন্ধুতে নবাব সরকার ছেয়ে ফেলবেন। তার মতে এই পদের সব থেকে যোগ্য ব্যক্তি তাঁর পুত্র রাজা গুরুদাস। তিনি একাধারে সৎ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। গুরুদাস এই পদ পেলে নন্দকুমার চিরকাল হেস্টিংসের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন। পত্রের শেষটুকু বড়ই মধুর। 'I now beg leave to make a solemn protestation to your Honour, that I have no other Friend and Protector in the country save your Honour, I therefore entirely depend on your Honour's favour and countenance.'[১৮]

পাছে নানা কাজের মধ্যে ভুল হয় তাই ২৭শে জুন আর একখানা পত্রে

মনে করিয়ে দিয়েছেন হেস্টিংসকে, যে গুরুদাস দেওয়ান হলে তিনি আজীবন তার বশংবদ ভৃত্য হয়ে থাকবেন।[১৯] এইভাবে গন্ধ নেওযার কাজ শেষ হল। হেস্টিংস নন্দকুমারের চরিত্র জানলেও এই পত্র দুটি বিশ্বাস করেছিলেন বলে মনে হয়। নন্দকুমার পক্ষে থাকলে শাসনযন্ত্র নির্বিঘ্ন হবে এটা'ও তার মনে হতে পারে। এ বিষয়ে হেস্টিংস মিডলটনের মতামত চাইলেন। মিডলটন কাশিমবাজার থেকে ১১ই জুলাই লিখে পাঠালেন—'It is not pretended that these ends are to be obtained merely from the abilities of Rajah Goordas. His youth and inexperience render him although unexceptionable in other respects, inadequate to the real purpose of his appointment. But his father has all the abilities, perseverance and temper requisite for such ends in a degree perhaps exceeding any Man in Bengal !'[২০] সুতরাং দেখা যাচ্ছে রাজা গুরুদাসকে ওই পদ দেওযা যেন হেস্টিংসের নন্দকুমারের সঙ্গে সন্ধির প্রচেষ্টা। নন্দকুমারেব কর্মক্ষমতার ওপর নির্ভরতার স্পষ্ট প্রমাণ না থাকলেও নন্দকুমারের কার্যদক্ষতা পরিপূর্ণভাবে স্বীকৃত। হেস্টিংসের সমস্ত কাজকর্ম দ্রুতগতিতে সমাপিত হল তাই বিনা বাধায়। নন্দকুমার সম্পর্কে কিন্তু হেস্টিংসের ধারণা পালটায় নাই। মণিবেগম গুরুদাসকে দেওয়ান পদে স্থাপনা করতে অস্বীকৃত হওয়ায় হেস্টিংস বিশেষ কর্মচারী পাঠিয়ে তাঁকে শান্ত করেছেন এবং গুরুদাসের মনোনয়ন বৈধ করেছেন। বিলাতের কোর্ট অফ ডিরেক্টার্সদের হেস্টিংস যখন শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়নের বিষয় জানাচ্ছেন তখন নন্দকুমার সম্পর্কে তাঁর ভাষা দ্ব্যর্থহীন।

'Had I not been guarded by the caution which you have been pleased to enjoin me, yet my own knowledge of the character of Nundcomar would have restrained me from yielding him any further authority which could prove detrimental to the Company's interests. He himself has no trust or authority, but in the ascendency which he naturally (has) over his son. An attempt to abuse the favour which has been shewn him, cannot escape unnoticed, and if detected may ruin all his hopes. The son is of a disposition very

unlike his father ; placid, gentle and without disguise. From him there can be no Danger.'[২১] সুতরাং ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষে হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমার যে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নন্দকুমারেরর পূর্ব চরিত্র জানা থাকায় এবং তাঁর কীতিকলাপের ধরণ ধারণ সম্পর্কে অবহিত হেস্টিংসকে বিশেষ ক্ষমতায অধিষ্ঠিত করেছিল।

১৭৭৩এ ইংলণ্ডের পরিচালকমণ্ডলী হেস্টিংসের সব কাজ অনুমোদন করলেন। ১৬ই এপ্রিল খুশী হযে লিখলেন 'Your choice of the Begum for guardian to the Nabob we entirely approve, the use you intend making of Nundcoomar is very proper, and it affords us great satisfaction to find that you could at once determine to suppress all personal resentment when public wel fare seem to clash with your private sentiments, relative to Nundcoomer'[২২] বিলাতের অনুমোদন দেখলে মনে সন্দেহ থাকে না যে হেস্টিংস নন্দকুমারের বশ্যতায় খুশী হয়েছেন। এর পরই তিনি কোম্পানীর কর্মচারীদের এই সন্ধির বিষয় জানাতে সুরু করলেন। ৯ই জুলাই ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ স্যামুয়েল মিডিলটনকে জানালেন—'I know the Begum's objections to Goordass. They arise from the villanies of his father, and I am sorry to say are but too well founded. ... . The young man himself happily is without one of his father's bad qualities, is gentle, well tempered and free from every species of artifice. Left to himself there is no danger of his doing ill' অ্যালডারসেকে ১লা জুলাই বিশদ ভাবে জানালেন নন্দকুমারের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে।

'Nundcomar—Protect and countenance him, but distrust every thing he says and reject every application which he makes to you for Zeminders and Farmers. Give him leave to visit his taluk in Nuddea; but forbid him to go to Murshidabad.'[২৩] মিডিলটন সাধারণভাবে হেস্টিংসের মত পছন্দ করে জানালেন যে তাঁদের সর্বদা ওই 'বুড়ো শেয়াল' (old fox) সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে।

সাগর পার থেকে হেস্টিংসের পুরাতন বন্ধু সাইক্‌স সাহেব কিন্তু খুব খুশী হলেন না। লিখলেন 'ওই নারকী' (infernal) নন্দকুমারকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি ভাল কাজ করছেন না।[২৪]

সুতরাং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দেও হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের কোন বিসংবাদ সৃষ্টি হয় নাই। উভয়ে নিজ নিজ পরিধির মধ্যে কাজ করেছেন। এমনকি মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব-দেওয়ান পদে অর্থাৎ বাংলা বিভাগের প্রধান কর্মচারী হিসাবে নিয়োগও নন্দকুমার চুপ করেই সহ্য করেছেন। কিন্তু ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে এমন কতকগুলি নূতন ঘটনা ঘটল যে নন্দকুমারের জীবনের গতি ত্বরান্বিত হয়ে গেল। কোম্পানীর নূতন নিয়মে গবর্ণরের কাউন্সিলের পাঁচজন সদস্য মনোনীত হলেন। তাঁরা হলেন গবর্ণর হেস্টিংস, কোম্পানীর পুরাতন কর্মচারী রিচার্ড বারওয়েল (যার পত্রে নন্দকুমারের প্রথম জীবনের আভাষ পাওয়া যায়) আর, জেনারেল জন ক্লেভারিং, কর্ণেল মনসন ও ফিলিপ ফ্রান্সিস। শেষোক্ত তিনজন ভারতবর্ষে নূতন এবং বাংলার রাজনীতি, জনগণ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। কলকাতায় পৌছতেই তাঁরা অভিযোগ করলেন যে তাঁদের অভ্যর্থনার ঠিক ব্যবস্থা হয় নাই। যদিও অন্যের মতে তাঁদের জন্যে যে বিরাট আয়োজন হয়েছিল, যেমন সতের বার তোপধ্বনি হয়েছিল তা হেস্টিংস আসার সময়কার কথা দূরে থাক লর্ড ক্লাইভ বা ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেব গবর্ণর হয়ে আসার সময়ও হয় নাই। নন্দকুমারের বুঝতে একটুও কষ্ট হলনা যে এদের দিয়েই তাঁকে কায উদ্ধার করতে হবে। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝেছিলেন যে হেস্টিংস থাকলে তাঁর আশা ফলবতী হবে না। কিন্তু কোনরকমে যদি হেস্টিংসকে বিলেতে পাঠিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাঁর ক্ষমতাকে রুদ্ধ করার ক্ষমতা আর কারু থাকবে না। তিনিই হবেন আসল শাসক। সুতরাং নন্দকুমারের সামনে দুইটি কাজ। প্রথম এই তিন হেস্টিংস বিদ্বেষীর সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জমিয়ে তাঁদের ক্ষমতা-লোভে ইন্ধন জোগান আর দ্বিতীয় তাঁদের হেস্টিংস বিদ্বেষকে ব্যবহার করে এই তিনজনকে একদলভুক্ত রাখা, এবং সেটা করবার জন্য এদের দিয়ে গবর্ণরের কাউন্সিলে নিয়মিত তাঁর কীর্তির সমালোচনা করা এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠতার সুযোগে তাঁর কর্মপদ্ধতিতে অনুমোদন না করা। নিত্যনিয়ত কাজে বাধা সৃষ্টি করা। নন্দকুমার মনে করেছিলেন যে এইরকম কিছুদিন

চললেই হেস্টিংস পদত্যাগ করবেন। হেষ্টিংস চলে গেলে এই অনভিজ্ঞ সাহেবদের হাতে তাঁর ক্ষমতা অপ্রতিহত হবে। ২০ অক্টোবর ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কাউন্সিলের প্রথম সভাতেই চরম বিবাদ সুরু হল। রাজ্য শাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। নন্দকুমার মহানন্দে সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন এবং অচিরাৎ তাদের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হয়ে দাঁড়ালেন।

হেস্টিংস যেমন নন্দকুমারকে চিনতেন দেখা যাচ্ছে নন্দকুমার কিন্তু হেস্টিংসকে সেরকম চিনতেন না। ব্যাপার কি চলছে বুঝতে হেস্টিংসের দেরী হল না। তিনি সাবধান হলেন, প্রস্তুত হলেন। সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী গবর্ণরের বিরুদ্ধে একের পর এক যত অভিযোগ আনলেন হেস্টিংস প্রত্যেকটি যুক্তি তর্কে এবং আবশ্যকীয় কাগজ পত্র দেখিয়ে খণ্ডন করলেন। বস্তুত তাঁর লোকজন প্রত্যেক বিষয়ে সর্বদা স্পষ্ট কাগজপত্র রাখতেন যাতে প্রয়োজন হলেই কাউন্সিলের সভায় সেগুলি দেখান যায়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের গবর্ণরের কাউন্সিলের সভার বিবরণীগুলির মধ্যে এই বাকযুদ্ধ লিপিবদ্ধ আছে। কোন বিষয় প্রমাণ করতে না পেরে সংখ্যাগুরুর দল গালাগালি দিতে কসুর করতেন না। এইভাবে গোটা ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ নন্দকুমার রাবণতনয় ইন্দ্রজিতের মতো সংখ্যাগুরু সাহেবদের আড়াল থেকে হেস্টিংসকে বিতাড়ণের সব রকম চেষ্টা করলেন কিন্তু সফলকাম হলেন না।

হেস্টিংসের এই বছরের ব্যবহার লক্ষণীয়। তিনি সব বুঝেও নন্দকুমারের কোন বিরুদ্ধাচরণ করলেন না। এমনকি রাজা গুরুদাসের পদ নিয়েও কোন আলোচনা করলেন না। তিনি পরিষ্কার জানতেন যে নন্দকুমারের মতো লোক ক্ষমতার অপব্যবহার করবেই। তাছাড়া পূর্ব ইতিহাসে যাঁর নানা দোষ দেখা গেছে তিনি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবামাত্র অপকীর্তির পথে পা দেবেন এটাই স্বাভাবিক। হেস্টিংস এক ফাঁদ পাতলেন। নন্দকুমার হেস্টিংসের এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির আত্মীয়ের মুখে হেস্টিংসের নিন্দা শুনে তার মাধ্যমে হেস্টিংস সম্পর্কে আরো খবর পাবেন আশায় তাকে নিজের কর্মচারী নিযোগ করলেন। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবরের কাউন্সিলের সভার পর এই নিয়োগ নিঃসন্দেহে যোগাযোগ সৃষ্টি করছে। নন্দকুমার আবার হেস্টিংসের বুদ্ধির কাছে পরাজিত। সমস্ত ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমারের তৈরী অভিযোগ সংখ্যাগুরু দল কাউন্সিলে তুলে কখনই গবর্ণরকে আশ্চর্য্য

করতে পারেন নাই। হেস্টিংস সর্বদা প্রস্তুত থেকেছেন। এইভাবে সংখ্যা গুরু দলের মন্ত্রণাদাতা হয়ে নন্দকুমারের সম্মান খুবই বেড়ে গেল। বহু পাল্কী তাঁর বাড়ীর সামনে সর্বদা লেগে থাকত। সবাই তাকে বিশেষ সম্মান করতে লাগল এবং নিয়মিত তাঁকে উপঢৌকনে খুসী করত।

এ সময়ে অনেকেই মনে মনে বিশ্বাস করতেন যে এদেশে হেস্টিংস সাহেব আর বেশীদিন থাকতে পারবেন না সুতরাং নন্দকুমারের ভজনা করলে আখেরে কাজ হবে। শুধু বাইরের লোকেরা নয়—কাউন্সিলের সংখ্যাগুরু সদস্যদের মধ্যেও এই ধারণা এসেছিল। ক্লেভারিং সাহেব নন্দকুমারের পৃষ্টপোষক তাই তিনি গবর্ণরী পেলে কি হবে বুঝতে কারু বাকী ছিল না। এমন কি ফ্রান্সিস সাহেব একদিন কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলেন। হেস্টিংস গবর্ণর পদে ইস্তফা দিলে তাঁর লোকজন তাড়িয়ে কাকে কোন পদ দেবেন ফ্রান্সিস সাহেব লিখে ফেললেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর বিস্ময়কর এই দলিল কারণ ফ্রান্সিস প্রত্যেক পদে যাদের নিয়োগ করবেন স্থির করেছিলেন তারা প্রত্যেকে নন্দকুমারের লোক। এই কাগজগুলি অনুধাবন করলে[২৫] সংখ্যাগুরু সদস্যগণ অর্থাৎ ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিস কি পরিমাণ নন্দকুমার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বুঝতে কষ্ট হয় না। বর্দ্ধমানের রাজার দেওয়ান থেকে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ পদে নূতন লোক দেবার কথা চিন্তা করেছেন ফ্রান্সিস সাহেব। শুধু একজনকে তিনি সরাতে চান নাই সেই ব্যক্তি হলেন দেবী সিং কারণ ইতিমধ্যে নন্দকুমারের সঙ্গে দেবী সিংএর সমঝোতা হয়ে গেছে যদিও দেবী সিং সুরুতে ছিলেন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সহকারী।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা নিয়ে এত বহুলভাবে আলোচনা হয়েছে যে এই রচনায় সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে নন্দকুমার চরিত্র বোঝবার জন্য মূল ঘটনা অনুসরণ করা হবে।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংসএর সঙ্গে সংখ্যাগুরু সদস্যদের বিরোধ চরমে উঠল। এবার তাঁরা ঠিক করলেন আর পরোক্ষ অভিযোগ নয় প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা গবর্ণরকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান জানাবেন। তাঁদের উপদেশ মতো নন্দকুমার অভিযোগকারী মনোনীত হলেন। এইভাবে নন্দকুমার ক্ষমতার লোভে তাঁর জীবনের চরমতম রাজনৈতিক ভুল করে বসলেন।

তিনি বুঝতে পারলেন না যে সংখ্যাগুরু সদস্যগণ তাঁদের নিজের স্বার্থে তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং চরম বিপদের সময় তাঁকে ফেলে পালিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না।

১১ই মার্চ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ, কাউন্সিলের সভায় নন্দকুমারের ১১ পাতা হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র পড়া হল।[২৬] নন্দকুমার অভিযোগ করেছেন যে হেস্টিংস মণিবেগমের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা ঘুষ নিয়েছেন। বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে নিজপক্ষীয় লোক দিয়ে বহু অর্থসংগ্রহ করেছেন এবং তার বিনিময়ে তার অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিদের বহুসম্পত্তি অন্যায়ভাবে দিয়েছেন। সরকারী কর্মচারীও তাকে ও তাঁর বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের উৎকোচ দিয়েছে।

১৩ই মার্চ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমারকে কাউন্সিলে তার অভিযোগ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হল। গবর্ণর হেস্টিংস আপত্তি করলে সংখ্যাগুরুদল সে আপত্তি মানলেন না। তখন গবর্ণর ও বারওয়েল সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। নন্দকুমারের জবানবন্দী সংখ্যাগুরু দল লিপিবদ্ধ করলেন। এইখানে লক্ষণীয় যে নন্দকুমার এই জবানবন্দী ফারসী ভাষায় সই করেছেন যদিও তখনকার বাঙালীরা সবদা বাঙলাভাষায় সই করাই পছন্দ করতেন। তারপর চলল তুমুল সংঘর্ষ ২০শে মার্চের সভায়, ১৭ই এপ্রিলের সভায় আর ২২শে এপ্রিলের সভায়।

হেস্টিংস প্রমাণ করলেন যে মণিবেগমের চিঠি আর নবাব মীরজাফরের ভাই মীর দাউদ বা নবাব যেতের-আম উ-দ্দৌলার চিঠি যা নন্দকুমার কাউন্সিলের অভিযোগের সময় দেখিয়েছেন উভয়ই জাল। মণিবেগমও এই মর্মে হেস্টিংসকে পত্র দিয়ে জানিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধিমান নন্দকুমার সেই পত্র দুটি হাতছাড়া করেন নাই।[২৭] হেস্টিংস পাল্টা অভিযোগ করলেন যে নন্দকুমারের অতীত ইতিহাসের কলঙ্ক না জেনে তাকে বিশ্বাস করে সংখ্যাগুরু সদস্যগণ অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছেন। সংখ্যাগুরু সদস্যরা কিন্তু সমানে ঝগড়া করে চললেন। গবর্ণরের কোন কথা তাঁরা বিশ্বাস করতে রাজী হলেন না।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তাঁরা হেস্টিংস সাহেবের বিরুদ্ধে অন্যান্য অভিযোগ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সমস্ত মার্চ ও এপ্রিল মাস যখন

কাউন্সিলে প্রতি সভায় তুমুল বাগবিতণ্ডা হচ্ছে তখন কিন্তু গবর্ণরের কাছে নন্দকুমারের কীর্তিকলাপের বহু খবর গোপনে সংগৃহীত হচ্ছে। জর্জ ভ্যান্সিট্টার্ট ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংসকে ব্যক্তিগত পত্রে জানালেন, 'A few days ago Roopnarain was sent for by Goring and scolded for not having produced any charge against you. He then gave on account of 2.01200 Rs received by you, 1200 recd. by Mr Graham and 80,000 by Bovanny Metre. He was carried with it to the General's. The General threw it down in anger and scolded Roopnarain for its being so much less than was promised, but he took it up again and pocketed it, and I suppose it will form a part of the Majority's letter to the Court of Directors by these ships.'[২৮] ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেব তাঁর সহকর্মী গ্রেহাম সাহেবকে লিখিত পত্রে হেস্টিংসের প্রতি জেনারেল ক্লেভারিং কেন এত রেগে আছেন তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখছেন যে জেনারেল ক্লেভারিংএর একান্ত ইচ্ছা যে হেস্টিংস তাঁর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বারওয়েল সাহেব বুদ্ধিমানের মতো এক কন্যার সঙ্গে আসনাই করে চলেছেন। আরো লিখছেন যে গোরিং সাহেবকে ৫০ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি অন্যপক্ষ দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে খালসা বিভাগ থেকে প্রভুরামকে বিদায় দিয়ে ব্রজকিশোরকে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নিযুক্ত করেছেন। প্রভুরাম ছিল অন্যপক্ষের লোক।[২৯] ২৫শে মার্চ ১৭৭৫ ভ্যান্সিট্টার্ট হেস্টিংসের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু সদস্যদের ষড়যন্ত্রের খবর দিয়ে জানাচ্ছেন, 'The Rani got her Khellat from the Majority. The Burdwan group was clearly told to stick around the Majority whose only idea at this stage (March 1775) was to gather together enough evidence of misdemeanor for the dismissal of Hastings.'.........'To procure informations of presents having been received by any of the members of the late Council particularly the Governer or you or Barwell or me is now the great object of the Majority's labour for the

public good Monson, Goring and Nundcomar were the acting persons in this pursuit. Nund-dulol, the vakeel of the Ranny of Radshay, who has been some time in Calcutta complaining against Dulol Roy and endeavouring to recover the farm of that district was expressly told by Monson himself, as he and Gungagovind have assured me, that he shall not obtain his wishes unless he would lodge accusations. On the other hand he and Ramkissen the adopted son have been assured by Nundcomar that if they wiil lodge accusatios they shall obtain complete success'.........'The Nuddea Zeminder has also been required to lodge accusations'......... 'Nundcomar has met with Employers who allow full scope to his genius. He sends for all the Vakeels and everybody else whom he can get to come near him and distributes threats and promises all day long.'[৩০]

নন্দকুমারের চেষ্টা ক্রমেই ফলবতী হতে থাকল। ১০ই এপ্রিল ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ভ্যান্সিট্টার্ট গ্রেহামকে গোপনীয় খবরগুলি জানালেন। 'On 31st March the new talks produced at Council an information from Zein-ul-abdeen, the farmer of one of the divisions of Tumlook thet the Foujdar of Houghly holds his office in virtue of an agreement to pay 36000 Rs. a year to Mr Hastings and 4000 Rs to Cantoo ; and on the 1st of the month a petition was produced from Ramkissen representing that the English gentlemen had embezzeled a great deal of money from Radshay in the names of their Banians. The petition was accompanied by a separate list amounting to 15 Lacks of Rupees taken by Cantoo. Santyram, Raje Bullubh and Dullol Roy, about 5 lacks in ready money and 10 by the profits of the farms they held.

I know not if the new gentlemen expect to prove

these accusations or if they are produced only in hopes of raising a clamour. I suppose the influence thrown into the hands of Nundcomar and the distribution of promises, threats, rewards and punishments will procure many more accusations. In the meantime Nundcomar looks out for himself and perhaps for some of his employers. Bridge Kishour tells me that Ramcunt on the part of the Burdwan Ranny has actually paid him 3200 gold Mohurs * through the hands of Cheitun-naut and Jeideb Choby, two of his retained swearers, and Gourharry Sircar. Similar information has been given me by Ramlochan and Santyram and has also been written by Juggal Narrayan Meter from Burdwan'. . . . 'I myself believe it to be well founded.' . . . 'A report too is whispered about Neelmunny, Mr. Francis' Banian, having gone up to Houghly a few days ago and brought down with him a lack of Rs' . . . . . . 'Juggetchund tells me that Nundcomar. . .has commenced negotiations with the brother of Asoph-ul-Dowla and sent for their vakeels.'[৩১] ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেব গোয়েন্দা মারফৎ সমস্ত খবরাখবর সংগ্রহ করে সেগুলিকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সূত্র মারফৎ বার বার যাচাই করে অবশেষে 'গোপনীয় সংবাদ' শিরোনামায় তাঁর সংগৃহীত সংবাদ বিবরনী হেস্টিংস সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন ১০ই মে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ পত্রে যে সাংঘাতিক তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযান যে কতো ব্যাপক হয়েছে আর সংখ্যাগুরু সদস্যগণ কিভাবে নন্দকুমারের হাতে খেলার পুতুল হয়েছেন বুঝতে অসুবিধা হয় না।

'The Burdwan Ranny in consideration of the services rendered her agreed to make the following payments :—

* 3200 × 16=Rs. 51,200 Sicca=Current Rs. 55296 (@108/-)

To General Clavering, Col Monson and Mr Francis	—Rs 2,00 000
To Mr Fowke	— ,, 30,000
To Nundcomar	— ,, 30,000
To Radachurn	— ,, 5,000
	Rs 2,65,000

The end of March or beginning of April Neelmunny, Mr Francis' banian went to Chinsura to hasten the payment but returned without effect Two days afterwards Rs 15 000 arrived in Calcutta and about the 9th of April Rs. 10,000 and both the sums were deposited in Mr. F's house

On the 16th of April a bill was received by Roopnarayan Chowdhury enclosed in a letter from the Ranny for Rs. 3100 drawn on Mootychund's house at Chinsura. He showed it to Nundcomar, who said he would inform the General' . 'On the 4th of May a Bill arrived with 'N. C' for Nundcomar amounting to sonnaut Rs. 10000'. . .'The following agreement has been made with Ramkissen of Radshay :—

To Clavering, Monson and Francis—Rs. 200,000

To Fowke and Nundcomar —Rs. 40,000

The 27th (March or April ? ?) 21000 Rs. was received by Nundcomar.' ভ্যান্সিট্টার্ট আরো জানালেন :—

'Intelligence Report. Neelmunny Surma—Banyan to Francis Bisnuram Surma—Brother of above, an old dependent solely on Nundcomar. Samchurn Surma—Brother of the Banyan of Bristow. Becharam Surma-Dependent on Nundcomar. Ramkissen—The adopted son of the Ranny of Radshay. A man of no understanding. The Farm of Radshay has lately been granted to him by the interest of Nundcomar.'[৩২]

আবার ৫ই মে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিল সভা দেখা যাক। নন্দকুমারের ক্ষমতা এখন অপরিসীম। সমস্ত দেশ তাঁর পদভরে কম্পমান। ক্লেভারিং সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব। সংখ্যায় অধিক সদস্যরা তাঁদের ক্ষমতা প্রকাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নন্দকুমার তাদের প্রধান সহায়। শিখরে পৌঁছতে বাকী শুধু একটি পদক্ষেপ। ঠিক তখনই হল পদস্খলন। এমন নাটকীয় ঘটনার তুলনা সহজে পাওয়া যায় না। সুপ্রিমকোর্টে জালিয়াতির অভিযোগ আনল নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক বণিক। নন্দকুমার ৬ই মে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পুনরায় দীর্ঘদিন পর গ্রেপ্তার হয়ে কারা মধ্যে রুদ্ধ হলেন। শত্রু মিত্র নির্বিশেষে যারা নন্দকুমারের ক্ষমতার প্রচণ্ড দাপটে থরহরি অহর্নিশি কম্পমান হচ্ছিলেন সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। নন্দকুমারকে রক্ষা করার প্রচণ্ড অনীহা দেখে তাই অবাক হয়ে যেতে হয়। নন্দকুমারের নিজস্ব একান্ত ব্যক্তি কয়েকজন মাত্র ছাড়া তাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টা হল না। তিন মাসের মধ্যে বিচার শেষ হয়ে গেল। নন্দকুমার অপরাধী প্রমাণিত হয়ে চরমদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে প্রাণ হারালেন। এই বিচারের ব্যবস্থাকে প্রলম্বিত করার কোন চেষ্টা হল না। প্রমাণগুলিকে বিচার করার কোন চেষ্টা হলনা নন্দকুমারের পক্ষ থেকে। অদ্ভুত বিয়োগান্ত পরিণতি।

ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিসের ব্যবহার দেখলে সত্যই আশ্চর্য্য হতে হয়। ৮ই মে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের সভায় তাঁরা নন্দকুমার বন্দী হয়েছেন শুনে খুব চিৎকার চেঁচামেচি করলেন। তারপর সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মণিবেগমকে পদচ্যুত করে রাজা গুরুদাসকে সেই পদে বসালেন।[৩৩] সম্ভবত তারা মনে ভেবেছিলেন যে পদাধিকার বলে রাজা গুরুদাস তার পিতাকে বাঁচাবার জন্য যা করবার করবেন। সংখ্যাগুরু সদস্যগণ এই ভাবে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে গেলেন। মণিবেগমকে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বরখাস্ত না করে তাঁরা যদি নন্দকুমারের প্রাণ বাঁচানর জন্য গরিষ্ঠতার জোর ব্যবহার করতেন তাহলে অধিক ফলপ্রসূ হত। সে সব না করে তাঁরা ফালতু চিৎকার করলেন যে নন্দকুমার ব্রাহ্মণ সুতরাং তাকে সাধারণ কয়েদখানায় রাখা অন্যায় হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা ভুলে গেলেন যে নন্দকুমার এর আগেও কারারুদ্ধ হয়েছেন— এটাই প্রথমবার নয়। তখন যদি তাঁর জাতিপাত না হয়ে থাকে তাহলে এখন তাঁর জাতিপাতের কোন কারণ নাই। এই বিষয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই

সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির পত্র কাউন্সিলে পাঠ করা হল। স্যার ইলাইজা ইম্পে স্পষ্ট লিখেছেন যে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত জাতিপাতের কোন কারণ ঘটতে পারে না। 'I must observe that he says in case of confinement for crimes proved on the prisnor the caste will certainly be hurt, he does not say it will be lost. This is not the case of the Maharajah, no crime is proved upon him but he is positively charged with an offence which it will be incumbent on the prosecutors to prove at his Trial.'[৩৪] সংখ্যাগুরু সদস্যগণের ব্যবহার বাস্তবিক বিস্ময় উৎপাদন করে। মনে হয় যে তারাও যেন নন্দকুমারের মৃত্যুই চেয়েছেন। রাজা গুরুদাসের একাধিক পত্র ও স্বয়ং নন্দকুমারের পত্রগুলি বিষয়ে তাঁরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন নাই। ইংলণ্ডের রাজার কাছে পত্র দিয়ে মার্জনা ভিক্ষা অথবা জীবন ভিক্ষা করতেও দেখা যায় না সংখ্যাগরিষ্ঠ্য সদস্যদের। তাঁদের এই সময়কার শম্বুকবৃত্তি দেখে দু'টি সম্ভাবনার কথা মনে আসে। প্রথম, নন্দকুমারের মৃত্যুতে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন—যেমন পাওনাদারের মৃত্যুতে খাতক আনন্দিত হয়। দ্বিতীয়, নন্দকুমার কারারুদ্ধ থাকায় তাঁদের বুদ্ধি দেবার লোকের অভাব হয়েছে। ভয়ে তাঁরা হাত পা গুটিয়ে নির্বাক দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন।

নন্দকুমারের দণ্ডাদেশের পর বরঞ্চ একজন ইংরেজ জুরী দয়া পরবশ হয়ে মৃত্যুদণ্ড মকুবের জন্য সুপ্রিমকোর্টে দরখাস্ত দিয়েছেন কিন্তু ক্লেভারিং, মনসন, বা ফ্রান্সিস কিছু করেন নাই। নন্দকুমার ৩১শে জুলাই ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিসকে জেল থেকে চিঠি লিখে তার প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন করেন। ৪ঠা আগষ্ট ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ প্রাণদণ্ডের আগের দিন নন্দকুমার ক্লেভারিংকে আর একখানি পত্র লেখেন। ক্লেভারিং সেই পত্র নন্দকুমারের মৃত্যুর আগে খুলেও দেখলেন না। পরে কাউন্সিলের সভায় এই পত্র দু'খানি পঠিত হলে ফ্রান্সিসের প্রস্তাবক্রমে এই পত্র দুটি যিনি নন্দকুমারের ফাঁসী দিয়েছিলেন তাকে দিয়েই পোড়ান হল।[৩৫] এই সূত্রে A. D. Innes লিখেছেন :—
There was a sufficient reason for the Council to obtain a respite in order to refer the matter to England ; but when

the Triumvirate, the friends of Nuncomar refused to move, it was hardly to be expected that Hastings should go out of his way to protect his own enemy.'[৩৬] দোষ প্রমাণিত হয়েছে। দণ্ডাদেশকে আটকে রাখবার কোন চেষ্টা হল না। ৫ই অগাষ্ট ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমারের ফাঁসী হল।

নন্দকুমারের বিচার সম্পর্কে বহু পুস্তক রচিত হয়েছে। বহু আলোচনা, গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছে। বঙ্গভাষাভাষী মহলে কিন্তু আবছা একটা ধারণা হযে আছে যে হেস্টিংসেব প্ররোচনায তাঁর বন্ধু প্রধান বিচারপতি ইম্পে নন্দকুমারের ফাঁসী দিয়েছেন। এমনকি পণ্ডিত প্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গলার ইতিহাস রচনাকালে লিখেছেন—'নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন যথার্থ বটে, কিন্তু ইম্পি ও হেস্টিংস তাহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহার সন্দেহ নাই।'[৩৭] বলা বাহুল্য এই মত একেবারেই ভ্রান্ত। কেবল ঐতিহাসিক দৃষ্টি থেকে নয় আইনের দিক থেকেও নন্দকুমারের বিচার আলোচিত হয়েছে বার বার, এখনও হচ্ছে। এই বিচারের প্রত্যেকটি কাগজ সুন্দরভাবে সংরক্ষিত তাই এখনও এই বিষয়ে নূতন আলোকপাতের সম্ভাবনা আছে। মনে রাখতে হবে যে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা নিষেধ ছিল তাই নন্দকুমারের মতো বিখ্যাত ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডে বাঙালী হিন্দুসমাজ বিচলিত হযেছিলেন। বিদ্যাসাগরের রচনায় ব্রাহ্মণ বধে রোষ প্রকাশিত হয়েছে মাত্র। সমসাময়িক সমাজেও নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড আলোডন সৃষ্টি করেছিল বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজের নূতন সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হতে তখন কয়েক বছর বাকী তাই সেরকম আলোড়ন হয় নাই। ইংরেজ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিষ্ঠা বেড়েছে। দশ বছর পরে ব্রাহ্মণ সমাজ যখন সুপ্রতিষ্ঠিত তখন এই প্রাণদণ্ডাদেশ অনেক বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারত।

নন্দকুমারের মৃত্যুতে নিঃসন্দেহে হেস্টিংস লাভবান হয়েছেন। তাঁর সবথেকে বড় শত্রু অপসারিত হয়েছে একথা সত্য। কিন্তু বিচারের সুরু থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্য্যন্ত এমন একটি প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যাতে হেস্টিংসকে পরোক্ষভাবেও নন্দকুমারের বিচারের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। সুবিখ্যাত আইনজ্ঞ স্যার জেমস স্টিফেন বিচারের নথিপত্র ঘেটে রায় দিয়েছেন—

'Because Nandakumar's death may have removed a viper out of Hasting's path, 'post hoc' need not be translated 'propter hoc.' There is no valid evidence to support this view.'[৩৮] সুতরাং হেস্টিংস নন্দকুমারকে বিচারের প্রহসনে হত্যা করেছেন এমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, অমূলক, ভাবাবেগ প্রধান এবং প্রমাণ সিদ্ধ নয়। বস্তুত নন্দকুমারের বিচারের সময় হেস্টিংস যে ভাবে সরে থেকেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য।

এইবার অভিযোগ ও বিচার সম্পর্কে কিছু বলার সময় হয়েছে। মোহন প্রসাদ নামে উত্তর ভারতীয় এক ব্যবসায়ী নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ করে। এই জাল দলিলখানি নন্দকুমার মেয়রের আদালতে ব্যবহার করেছিলেন। মোহন প্রসাদ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই দলিল-খানি উদ্ধারের আবেদন করেন এবং ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই জাল দলিল হস্তগত হওয়া মাত্র নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। তাহলে এখন দুইটি প্রশ্ন আলোচনার প্রধান বিষয় হল। প্রথম, দলিলটি জাল কিনা এবং দ্বিতীয় দলিলটি জাল জেনেও নন্দকুমার সেটিকে ব্যবহার করে জেনেশুনে মিথ্যাচার ও জুয়াচুরি করেছেন কিনা। উভয় দিকেই অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ শোনা হল। বিচার যে কোনরকম স্বার্থদ্বেষশূন্যভাবে হয়েছিল তা আগেও স্বীকৃত হয়েছে এখনও যে কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রমাণাদি স্থিরভাবে পাঠ করেও একই সিদ্ধান্তে আসবেন। খুচরা প্রশ্ন করেছেন কেউ কেউ। অসুস্থতার জন্য যে সাক্ষী আসতে পারলেন না তিনি এলে বিচার ফল অন্যরকম হতে পারত কি না? অথবা রাজা নবকৃষ্ণকে না দিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে ফারসী থেকে অনুবাদ করলে নন্দকুমারের কোন সুবিধা হত কি না। এই সব চুলচেরা বিচারের মধ্যে না গিয়েও নন্দকুমারের বিচার যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত-ভাবে হয়েছিল তা সন্দেহ করবার কোন কারণ নাই।

চারজন বিচারপতির এজলাসে বিচার হয়। ১২ জন জুরী উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে যে আশাতীত সম্মান প্রতি মুহূর্তে নন্দকুমারকে দেখিয়েছেন তাতে দলিল দস্তাবেজে তাঁকে মাঝে মাঝে নন্দকুমারকে পক্ষপাত দেখাচ্ছেন বলে খাঁটি আইনজ্ঞ ভুল করতে পারেন। প্রথমে জুরীরা নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন একযোগে এবং তারপর বিচারপতিরা একমত হয়ে তাঁকে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন তৎকালীন আইন

অনুসারে। একটা কথা চালু করা হয়েছে যে এদেশী আইনে নন্দকুমারের দণ্ডাজ্ঞা হয় নাই। এ কথাটাও ভ্রান্ত কারণ ভারত-শাসন আইন অনুসারে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, যে সব ধারায় ভারতীয় আইন তৈরী নাই সে সব বিষয়ে দণ্ডাজ্ঞা ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে হবে। তদনুযায়ী নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডাদেশ হয় কারণ দেশী আইনে জাল দলিল জেনে শুনে ব্যবহার করে অন্যকে বঞ্চিত করার দণ্ড তখনও এদেশে তৈরী হয় নাই। একটা সুন্দর উদাহরণ নেওয়া যাক। লর্ড মেকলের সভাপতিত্বে ভারতীয় দণ্ডবিধি তৈরী হবার পূর্বেকার ঘটনা। সময় ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ। উইল বিষয়ে আইন তখনও এদেশে তৈরী হয় নাই তাই ভারতীয সুপ্রিম কোর্ট ইংরেজী পেনাল কোড অনুসারে বিচার করে এক মামলায় স্বয়ং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে হারিয়ে দেয়। এই রকম ঘটনা বিরল নয় (Swarnamoyee Dassi Vs East India Company)। সুপ্রিম কোর্টের পুরাতন রায়ের নথিপত্র ঘাটলে এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এখানে বক্তব্য হচ্ছে নন্দকুমারের বিচার বা দণ্ডাদেশ পক্ষপাতহীন ভাবে ঘটেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এবার প্রশ্ন আসবে যে এই অপরাধে নন্দকুমারের আগে যদি আর কারু মৃত্যুদণ্ড না হয়ে থাকে তাহলে নন্দকুমারের প্রতি এই দণ্ডাদেশ যুক্তিসঙ্গত হয়েছিল কি না? দশবছর আগে ঠিক এই রকমের এক ঘটনা ঘটেছিল। গোবিন্দরাম মিত্রের নাতি রাধাচরণ মিত্র জালিয়াতির জন্য প্রাণদণ্ডাদেশ পেয়েছিলেন। ঘটনা এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে 'The principal black inhabitants of the place send in the following petition in favour of Radachurn Metre under sentence of death for forgery, soliciting, we would defer the execution and recommend the delinquent to His Majesty for mercy.'[৩৯] এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে তৎকালীন কলকাতা শহরের প্রায় সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি রাধাচরণের জন্য জীবন ভিক্ষা চেয়েছেন। ৯৫ জন ব্যবসায়ী, বেনিয়ান ও সম্পদশালী নাগরিক রাজা নবকৃষ্ণর দলপতিত্বে এই আবেদনে স্বাক্ষর করেন এবং তারই ফলস্বরূপ রাধাচরণের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা মকুব হয়ে যায়। নন্দকুমারের বেলায় একজন মাত্র অনামা ইংরেজ জুরীর আবেদন ছাড়া নন্দকুমারের

প্রাণরক্ষার কোন চেষ্টাই হয় নাই। রাধাচরণের প্রাণদণ্ড মকুবের জন্য যারা লম্বা দরখাস্ত করেছেন, নন্দকুমারের বেলায় তাদের নীরবতা এইটাই সপ্রমাণ করে যে নন্দকুমারের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত লিপ্সাকে সকলেই হীনচক্ষে দেখেছেন। নন্দকুমারের মৃত্যু কলকাতার সমাজ তাই কামনা করেছেন। তর্কের খাতিরে কেউ যদি বলেন যে গবর্ণরের ভয়ে তাঁরা চুপ করেছিলেন তাহলে সেটা মিথ্যা কথা হবে কারণ সংখ্যাগুরু সদস্যরাই তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। বরঞ্চ এর থেকে স্বাভাবিক বিশ্লেষণ হবে যে সবাই ভেবেছেন যে নন্দকুমারের জীবন-রক্ষা করার জন্য তাঁর বন্ধু ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিস প্রভৃতি কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা রয়েছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই একলা বা একজোট হয়ে একটা সাংঘাতিক কিছু করবেন। কিন্তু তারাই যখন হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতো ঘরের কোণে চুপসে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন তখন অন্য কেউ কোন সাহসে আগিয়ে আসবে। কোন ভরসায় আবেদন পত্র লিখবে। দীর্ঘদিন পরে ইংলণ্ডে হেস্টিংসের ইমপীচমেণ্টের সময় এই বিষয়ে ফ্রান্সিস সাহেবকে ঠাট্টা করা হলে তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ সংজ্ঞান্তাভাবে বলেন যে জেনারেল ক্লেভারিংএর জন্যে তিনি কিছুই করতে পারেন নাই। ফ্রান্সিসের কথার সত্যতা যাচাই করার উপায় ছিল না কারণ জেনারেল ক্লেভারিং তখন পরপারে।

এইবার নন্দকুমারের জীবনের শেষ কয়দিনের ঘটনার বিবরণ দেওয়া যাক। মোহন প্রসাদ সুপ্রিমকোর্টে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল দলিল ব্যবহার করে তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগ করেন। সমস্ত কাগজপত্র পাঠ করে বিচারপতি লেমাসট্রে ও বিচারপতি হাইড নন্দকুমারকে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা জারী করেন। তদনুযায়ী নন্দকুমার ধৃত হয়ে কারাগারে বন্দী হন। বন্দীশালার ভেতরে জেলর সাহেবের বাড়ী। জেলর সাহেব সেখান থেকে তাঁর পরিবারবর্গকে সরিয়ে নেন এবং জেলর সাহেবের শোবার ঘরে মহারাজা নন্দকুমারকে বন্দী রাখা হয়। এই ঘরে তাঁকে একাই রাখা হয়েছিল। তৎকালিন কলকাতায় বিখ্যাত এটর্নী জারেট সাহেব নন্দকুমারের পক্ষে ছিলেন। ৮ই জুন ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ বিচার সুরু হয়। রাজা গুরুদাস কলকাতার দুই শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ব্যারিষ্টারকে নিযুক্ত করেন। আটদিন, সকাল থেকে বিকাল পর্য্যন্ত দুই পক্ষের উকিল ব্যারিষ্টাররা তাদের বক্তব্য বলেন। জুরীরা

একমত হয়ে 'দোষী' সাব্যস্ত করেন। তদনুযায়ী বিচারপতিগণ একমত হয়ে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডাদেশ ঘোষণা করেন ১৬ই জুন ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ বিকাল চারটায়। তারপর চৌদ্দদিন নন্দকুমার বেঁচেছিলেন। কেউ তাঁর প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে নাই। ৫ই অগাষ্ট তাঁর ফাঁসী হয়।

নন্দকুমারের ফাঁসীতে বিশেষ ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডে কলকাতা শহর থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু নন্দকুমারের বাড়ী থেকে যখন বহু জাল শীলমোহর বেরিয়ে পড়ল, তার মধ্যে মণিবেগম ও মীরজাফর ভ্রাতা মীরদাউদের শীল দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তখন নন্দকুমারের মৃত্যুতে যে ভাব সৃষ্টি হয়েছিল তা কেটে যেতে সময় লাগল না। নন্দকুমারের বাড়ী থেকে প্রায় ৫০/৫২ লক্ষ টাকাও পাওয়া গেল। এইসব সম্পত্তি রাজা গুরুদাসকে দেওয়া হয়। তিনি জাল শীলগুলি নষ্ট করে ফেলেন। পরবর্তী ঘটনায় সন্দেহ থাকে না যে পিতার মৃত্যুতে দুঃখের থেকে পিতার কীর্তিতে লজ্জাই গুরুদাসকে বিচলিত করেছে। নিজকর্ম তিনি অতি সুষ্ঠুভাবেই চিরকাল সম্পাদন করেছেন।

ইংরেজ মহলের আনন্দ অত্যন্ত স্পষ্ট। ম্যাকফারসেন তখন মাদ্রাজের গবর্ণর (হেস্টিংস বিদায় নিলে তিনি তাঁর পদাভিষিক্ত হন) হেস্টিংসকে লিখে পাঠালেন—'জেনারেল ক্লেভারিংএর প্রাণের বন্ধু নন্দকুমারকে গ্রেপ্তারের খবরে আনন্দিত হয়েছি'।[৪০] সাইকসএর চিঠি এল জানুয়ারী ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে, লিখেছেন হেস্টিংসকে 'তোমার প্রশ্রয়েই নন্দকুমার অত বেড়ে গিয়েছিল'।[৪১] ওই বছরে ৩রা এপ্রিল আবার লিখলেন 'ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাই নন্দকুমারের জালিয়াতি প্রমাণিত হল—এইসব দুরাচার উচিত শাস্তি না পাওয়া পর্য্যন্ত বাংলার উন্নতি অসম্ভব।'[৪২] ধীরে ধীরে দেড়বছরের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা যাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তারা ফিরে এলেন। মণিবেগম স্বপদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হলেন। রাজা গুরুদাসও নিজের আগের পদেই থাকলেন। রাজা রাজবল্লভ (ইনি রাজা রায়দুর্লভের পুত্র), দুলাল রায়, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নিজেদের পদে পুনর্নিযুক্ত হলেন। সংখ্যাগুরুরা অনেক সাহেবকেও গায়ের জোরে তাড়িয়েছিলেন। ইংলণ্ডের পরিচালকমণ্ডলীর হুকুমে তারা পূর্বপদ ফিরে পেলেন। এরা হলেন জন স্টুয়ার্ট, প্রেডেল, নাথানিয়াল মিডলটন, ক্রেড স্টুয়ার্ট প্রভৃতি।

আশ্চর্য্য হতে হয় মেজরিটির নপুংসকতা দেখে। নন্দকুমারের মৃত্যুতে

তারা দিশাহারা হয়ে গেলেন। কর্ণেল মনসন মারা গেলেন ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। জেনারেল ক্লেভারিং ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে অগাস্ট মাসে তনুত্যাগ করলেন। সংখ্যাগুরু সদস্যদের ক্ষমতা ভেঙে টুকরো হয়ে গেল। নন্দকুমারের মৃত্যুর সঙ্গে তাদের অকর্ম্মন্যতা জড়িত হয়ে গেছে। প্রমাণ করে দিয়েছে যে নন্দকুমারই ছিলেন তাঁদের বুদ্ধিদাতা, চালক ও প্রধান কর্মাধ্যক্ষ। বাংলার নানা জায়গা থেকে নানারকম অভিযোগ আসা বন্ধ হয়ে গেল। চক্রান্তের প্রধান চক্র নিঃসন্দেহে বাংলার রাজনীতি থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। আধুনিক ভারতের এক রাজনৈতিক অধ্যায় শেষ হল।

উপসংহারে বলতে হবে যে নন্দকুমার অত্যন্ত পরিশ্রমী লোক ছিলেন। পলাশীর পর তাঁর বয়স পঞ্চাশের ঘরে। মৃত্যুর সময় তিনি উর্দ্ধে সত্তর বছর বয়সী (জন্ম সম্ভবত ১৭০০ খ্রীঃ ঘিরে)। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে তিনি সম্যক কাজে লাগিয়েছেন পলাশীর পর—ইংরেজদের সান্নিধ্যে। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আত্মসুখ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি। প্রচণ্ড ক্ষমতার তিনি অধিকারী হয়েছিলেন কিন্তু সে ক্ষমতা তিনি কেবল অন্যের সর্বনাশেই ব্যবহার করেছেন দেশের বা দশের কোন উপকার করেন নাই। তাই সমসাময়িক মহলে তার নাম 'কুচক্রী', 'বুড়ো শেয়াল', 'দুষ্ট দুরাচার' প্রভৃতি। নন্দকুমারের চরিত্রের আর একদিক সাধারণতঃ দেখা হয় না সেটা হল তাঁর পারিবারিক দিক। রাজা গুরুদাসের কাছেই তাঁর মাতা থাকতেন। নন্দকুমার কলকাতায় একাই অবস্থান করতেন। নন্দকুমারের এই নিঃসঙ্গতা খুবই বিশেষত্বপূর্ণ।

বার বার মনে হয় নন্দকুমারের তীক্ষ্ণবুদ্ধি যদি হেস্টিংসের কর্মক্ষমতার সঙ্গে মিলিত হতে পারত তাহলে হেস্টিংস বাংলায় যা করেছেন তার থেকেও বেশী সৎকাজ করতে হয়তো সমর্থ হতেন। সব থেকে আশ্চর্য্য কথা হল যে কেবল আধুনিক ভাবালুতাকে বাহন করে নন্দকুমারকে কেউ কেউ শহীদ বলে গণ্য করছেন আর দেশের এত উপকার করেও হেস্টিংস তাঁর প্রাপ্য সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেন না।

মহারাজা নন্দকুমারের বিচার, কারাবরণ ও প্রাণদণ্ড সম্পর্কে প্রায় সমস্ত কাগজপত্র সযত্নে রক্ষিত আছে। এগুলি পড়ে এবং সমকালীন আইন জানলে মতামত গঠন করতে দেরী হয় না। বিচার ও দণ্ড তৎকালীন নিয়ম অনুসারে অপক্ষপাত ভাবে হয়েছিল। শেষ দিনের বিচারের দৃশ্য দেখা যাক। বিচার শেষ

হবার আগে বৃদ্ধ রাজার পক্ষে কলকাতার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যারিস্টার ফারার যেমন সওয়াল করলেন তাতে নন্দকুমারের মুক্তি সম্পর্কে অনেকেই আশান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু বিধিবাম। নন্দকুমার মনে করলেন যে সাক্ষ্যপ্রমাণ তাঁর বিপক্ষে যাচ্ছে তাই তিনি তাড়াতাড়ি কৃষ্ণজীবন দাসের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। এই ব্যক্তি কেবল মিথ্যা সাক্ষী প্রমাণিত হলেন না মহারাজ নন্দকুমারও সম্পূর্ণভাবে দোষী প্রমাণিত হয়ে মৃত্যুদণ্ড যোগ্য হলেন। কি নাটকীয় ঘটনাবলী! প্রচণ্ড জ্বর থাকা সত্ত্বেও ফারার অপূর্ব সওয়াল করলেন ১৫ই জুন নন্দকুমারের পক্ষে। প্রচণ্ড গরম দিন 92° ডিগ্রি টেম্পারেচার বাইরে, আকাশ মেঘলা থাকায় তেমনি গুমোট। সওয়াল শেষ করে ফারার আর আদালতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। এই মামলাতে নন্দকুমারের পক্ষে তাঁর জুনিয়র ব্যারিস্টার সি, এফ, ব্রিক্স সাহেবকে কোর্টে থাকতে বলে বাড়ী চলে গেলেন। বাড়ীতে বিছানা নেওয়া মাত্র জ্বরের ঘোরে প্রায় অচৈতন্য। ১৬ই জুন আদালত নন্দকুমারের বিচারের রায় দিতে সুরু করল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ফারারকে লেখা ব্রিক্সএর পত্র উদ্ধৃত করা হল। 'It is with infinite concern I communicate to you, what you may probably have already heard from Messers Jarret and Foxcroft (মহারাজা নন্দকুমারের এটর্নী) that the Rajah has not only been found guilty, but Mr. Durham, on behalf of the prosecutor, hast undertaken to prosecute Mir Asad Ali, Sheikh Yar Mahomed and Kissen Juan Dass, for perjury at the instance of the Court. How unlucky is the Raiah to have brought this misfortune upon himself by desiring the last examination of Juan Dass, which hath overset all the weight of his former evidence '[৪৩] অসুস্থ অবস্থাতেও ফারার পরদিন হাজির হলেন আদালতে। দণ্ড মকুবের চেষ্টা চলল। এল রাধাচরণ মিত্রের দশ বছর আগে ওই একই অপরাধে দণ্ড ও ক্ষমার নজির। কিন্তু কোথায় আবেদনকারী কলকাতার নাগরিকগণ, কোথায় নন্দকুমারের আত্মীয় বন্ধুগণ! ফারার এততেও দমলেন না। বললেন ইংলণ্ডের রাজার কাছ থেকে সহজে ক্ষমা পাওয়া যাবে। পূর্ব নজির আছে। কিন্তু আবার আত্মীয় স্বজনদের

ব্যর্থতা। নিয়মমতো দ্রুতগতিতে ব্যবস্থা করার বিষয়ে অনীহা। কি ঘটছে সম্ভবত নন্দকুমারের থেকে ভাল কেউ বোঝেন নাই তাই শেরিফের কাছে নিজের কপাল দেখিয়ে বলেছেন 'দোষ কারুর নয়—শুধু এই কপালের।' ফ্রান্সিস সাহেবকে লেখা ৩১শে জুলাই তারিখের শেষ চিঠি ধ্বংস করা হয়েছে কিন্তু ফ্রান্সিস সাহেবের কাগজপত্রের মধ্যে এই শেষ চিঠি খানির ইংরেজী অনুবাদ রক্ষিত আছে। এই অনুবাদে এত ব্যাকরণ ভুল যে মনে হয় ফ্রান্সিস সাহেব কোন নিকৃষ্ট লোককে দিয়ে অনুবাদ করিয়েছেন। 'Nundcomar's letter. A translate from the Bengal original date 31st July 1775'. 'I am now thinking that I have but a short time to live, for among the English gentry, Armenians, Moors and Gentoos, few there is who is not against me, but those that are not for me is continually devising all the mischief they can imagine against me'.[88] এ চিঠির মধ্যে দিয়ে নন্দকুমারের হতাশার প্রকাশ অত্যন্ত দুঃখের।

তাই নন্দকুমারের বিচার আর দণ্ড মেনে নিলেও এই সত্তর বছরের বৃদ্ধের ফাঁসী কিছুতেই সহ্য করা যায় না। সম্ভবত এই কারণেই কেউ হেস্টিংসকে কেউ ইম্পেকে দোষী সাজাবার চেষ্টা করেছেন। ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে এদের উভয়ের বিচার হয় বিভিন্ন সময়। নন্দকুমারের বিচারে হেস্টিংস অংশ নিয়েছেন বা ইম্পে পক্ষপাত দেখিয়েছেন প্রমাণিত হয় নাই কারণ সত্যই হেস্টিংসকে কোন রকমেই জড়ান যায় না বা ইম্পের পক্ষপাতিত্ব ছিল না। পার্লামেণ্ট যাদের কাটগড়ায় তুলতে পারে নাই তারা হলেন কলকাতার সেই নন্দকুমারের বন্ধুরা যাঁরা তাঁকে দিয়ে সমস্ত কাজ করিয়ে নিয়ে বিপদের সময় ফেলে পালিয়েছেন। দোষী সেই সব আত্মীয়স্বজন যারা ইংলণ্ডের রাজার কাছে আবেদন পাঠাতে গাফিলতি করেছেন—কলকাতার গণ্যমান্য মহলে ঘুরে বাঙালী সম্পন্ন নাগরিকদের দিয়ে আবেদন সই করাবার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

এই নিঃসঙ্গ একাকিত্ব মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মহারাজা নন্দকুমারকে এক অদ্ভুত মহিমায় ভূষিত করেছে। তাঁর সাহস, ভদ্রতা, কর্তব্যপরায়ণতা, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসীমের প্রতি আত্মসমর্পণ, তাঁর ঈশ্বর ভক্তি, তাঁর অন্তিম

প্রশাস্তি, তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তের বিবরণীকে বাঙলীর অবশ্য পাঠ্য করে তুলেছে। তাই নন্দকুমারের জীবন-মৃত্যু বাঙালীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় হয়েছে।

নন্দকুমারকে নিয়ে নাটক ॥

নন্দকুমারের এই সুদীর্ঘ ইতিহাস রচনার কারণ যে এই বিষয়ে শুধু অজ্ঞানতা নয় ভুল খবরের প্রাচুর্য্য রয়েছে। ভুল ইতিহাস প্রচার করার দায়িত্ব প্রধানত দুইজন নাট্যকারের যাঁরা সম্যক ইতিহাস জানবার কোন চেষ্টা না করে কেবল নিজেদের কপোলকল্পনার ওপর নির্ভর করেছেন। নন্দকুমারের ব্রাহ্মণত্বকে বিশেষ আভায় মণ্ডিত করতে গিয়ে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ ও অর্থনীতি সবই পদদলিত করেছেন। তাঁদের রচনায় নন্দকুমার শহীদের সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এমনকি স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে বহু মূর্খ শিক্ষক নাটকীয় ঘটনাকে সত্য আখ্যা দিয়ে সুকুমারমতি বালক ও কিশোর-দের শিক্ষা দেন, পুস্তকে ছাপিয়ে এই ভুল সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করেন। প্রতি বৎসর মিথ্যা সংবাদের বংশবৃদ্ধিতে সত্য ইতিহাসের ক্রমেই কণ্ঠরোধ হয়ে যাচ্ছে। মিথ্যা ইতিহাস তাই বিশেষ বলবান।

মহারাজা নন্দকুমার সম্পর্কীয় দুটি নাটক প্রচলিত আছে :—

১। নন্দকুমার--ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রকাশ ১৩১৪ প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

২। মহারাজা নন্দকুমার—মহেন্দ্র নাথ গুপ্ত প্রকাশ ১৯৪৩/১৩৫০ প্রকাশক শ্রীগুরু লাইব্রেরী। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নন্দকুমারের ফাঁসী নামে আরো দুটি নাটকের নাম পাওয়া যায়। একটির রচয়িতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (১২৯৩_বা ৯৬) এবং অন্যটির রচয়িতা অতুল কৃষ্ণ মিত্র (১৩১০?)। কিন্তু নাটকদুটি সম্পর্কে আর কোন খবর জানা যায় না।[৪৫]

নাটকের জগতে নন্দকুমারের গতি বড়ই বিচিত্র। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র তাঁর 'মীরকাসম' নাটকে নন্দকুমারের কূটনৈতিক, দুরাচারী ও লোভী চরিত্র প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নাই। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেও নন্দকুমার সম্পর্কীয় ঐতিহাসিক তথ্য লিখতে বাধা ছিল না। তিনি যে সমাজ-সংস্কারক বা দেশপ্রেমী ও স্বজাতি বৎসল ছিলেন না একথা সকলেই স্বীকার করতেন।

বস্তুত নন্দকুমারের হীন চরিত্র অঙ্কন করে গিরিশচন্দ্র মীরজাফরের প্রধান মন্ত্রণা দাতার প্রতি কোনরূপ অন্যায় করেছেন বলে মনে হয় না। বরঞ্চ ইতিহাস সম্মত চরিত্র রচনা করার জন্য তাঁকে আর একবার সাধুবাদ দিতে হয়। কিন্তু ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মীরকাশিমের নন্দকুমার অন্য প্রাণী। তিনি মীরজাফরের মন্ত্রী বটে কিন্তু বড় আলগোছে ছোওয়া বাঁচিয়ে কোন রকমে নিজের সম্মান রক্ষা করে চলেছেন। এই নাটকে তিনি কূট তো ননই এমনকি কূটনৈতিকও নন। (তাঁর কুটসাহেবের দেওয়ান হওয়া অবশ্য কোন নাট্যকারই দেখান নাই।) ৩১ বছরের মধ্যে নন্দকুমারের ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পূর্ণ মুছে ফেলে এক রূপকথার নন্দকুমার সৃষ্টি হল। ইনি এক দেশ-হিতৈষী, উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শহীদ। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করবার চেষ্টায় একে একে সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিম প্রথমে দেশ-ভক্তির বন্যা আনলেন এবং তাদের অনুসরণ করে সরফরাজ খাঁ ও নন্দকুমারকে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী বানান হল। সরফরাজের রং ধরল না। আসলে যে নাটকটা অত্যন্ত দুর্বল তা লুকিয়ে রাখা গেল না। তার ওপর গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাসিমের পাশে সরফরাজ বড় ফিকে। নন্দকুমারের রূপকথা কিন্তু জনসাধারণ বিশ্বাস করতে সুরু করলেন। একদিকে যেমন এটি এক নিরবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতার গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদ হল (সিরাজদ্দৌলা প্রথম ও মীরকাশিম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ) অন্যদিকে এই প্রথম বাঙালী দর্শক এক বাঙালী হিন্দু ব্রাহ্মণকে নাটকের নায়ক হিসাবে পেলেন। নন্দকুমার অতি সহজেই বাঙালীর কাছে শহীদের মর্য্যাদা পেয়ে গেলেন। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধ্বজাকে সুউচ্চে উড্ডীন করলেন। বলা হল মহারাজা নন্দকুমারের দেশ স্বাধীনের আকাঙ্ক্ষাকে কোন রকমে বাধা দিতে না পেরে ইংরেজ তাকে ফাঁসীর দড়িতে অন্যায়ভাবে বিচারের প্রহসন করে বধ করল। আরো বলা হল নন্দকুমার কেবল একজন মহারাজা নন তিনি তৎকালীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ভূম্যধিকারী—সবার ওপর তিনি ব্রাহ্মণ। দুষ্ট ইংরেজগণ তাঁর ধর্মাচরণকে পর্য্যন্ত কলুষিত করতে চেয়েছে। মেকলে থেকে উদ্ধৃত করে বলা হল যে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য গবর্ণর হেস্টিংস তাঁর বন্ধু প্রধান বিচারপতি ইলাইজা ইম্পের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে নন্দকুমারের ফাঁসী দেন। এই মত তখন বেশ চালু

হয়েছে। বেভারিজ সাহেব এই মত প্রকাশ করে একখানা বই লিখে ফেললেন। যথা সময়ে প্রতিবাদও প্রকাশিত হল। জেমস ষ্টিফেন সাহেব বেভারিজ সাহেবের মতামত খণ্ডন করলেন। বলা বাহুল্য বেভারিজের বই-এর খুবই প্রচার হল কিন্তু ষ্টিফেন সাহেব বা অন্যদের রচিত প্রতিবাদ কেউ পড়লেন না। স্বাধীনতাকাঙ্খী বাঙালীর মনে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সত্য যাচাই করার ধৈর্য্য নাই। তারা এক ইংরেজ রচিত কলঙ্কের ইতিহাসের প্রতি পাতা ধ্রুব সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করলেন। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তির আর এক উদাহরণ আছে। বার্কসাহেব ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচারে প্রধান অভিযোগ কর্তার ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি কি ভাষায় কি কি অভিযোগ এনেছিলেন তাও বহুল প্রচারিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ বিষয়ে খুব গভীর জ্ঞানী ব্যক্তি প্রচুর দেখা যায়। কিন্তু গত দুইশত বছর অতিক্রান্ত হবার পরও তাঁদের অধিকাংশ জানেন না যে হেস্টিংস সাহেবের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও প্রমাণিত হয় নাই। দীর্ঘদিন বিচারের পর তিনি বেকসুর খালাস পান। এই অপূর্ব কাজের জন্য দায়ী হেস্টিংসের পক্ষ সমর্থনকারী বক্তা যিনি অপূর্ব মুন্সিয়ানায় প্রত্যেক অভিযোগ খণ্ডন করেন, আশ্চর্য্যের বিষয় বহু বাঙালী এই ব্যক্তির নাম জানেন না। বললে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। লর্ড থারলো বলে যে কোন ব্যক্তি ইংলণ্ডে বিচরণ করেছেন এটা তাদের অজ্ঞাত। নন্দকুমারের বেলাতেও এই ঘটনার পুনরুক্তি দেখা যায়। বেভারিজ অনুসরণে তাই নাটক রচিত হয়ে নন্দকুমারের জীবনী-রূপকথার মূল উৎস হয়েছে। নন্দকুমারকে দেশনেতার সম্মান দিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক রক্ষণশীল বাঙালী হিন্দুর ক্ষমতার যুগ। বর্ণাশ্রমের প্রতি প্রচণ্ড আনুগত্য এই দুই দশককে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। তাই ব্রাহ্মণের প্রতি অবিচার, অনাচার ও প্রাণদণ্ড প্রচণ্ড পাপের রূপ নিয়েছে। বিচারের ছলে ব্রাহ্মণ হত্যা ইংরেজের অপকীর্তির চরম নিদর্শন হয়ে দেখা দিয়েছে। এই রূপকথার আবেদন এত গভীর হয়েছে যে প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশরাজ নাটক বাজেয়াপ্ত করে অভিনয় বন্ধ করতে বাধ্য হন। এখানে লক্ষনীয় যে ভারতীয় রাজনীতির আকাশে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পর থেকে 'ব্রাহ্মণ প্রভাব' কমতে আরম্ভ করে। ক্ষীরোদপ্রসাদ যদি পূর্ণ রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন নাট্যকার হতেন তাহলে

নন্দকুমারের ইতিহাস পাঠ করে তাঁকে তৎকালীন ভারতের অবিসংবাদিত নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রতিভূ করে দেখিয়ে গিরিশচন্দ্রের মতো এক অগ্নিবর্ষী কালজয়ী নাটক রচনা করতে পারতেন। তিনি তা পারেন নাই বলে তাঁর অন্যান্য 'ঐতিহাসিক' নাটকের মতো 'নন্দকুমার'ও এক ভাবাবেগ প্রধান, ইতিহাস আশ্রয়চ্যুত অশিষ্ট রচনায় পরিণত হয়েছে। সমসাময়িক বাঙালীর মনের ভাবাবেগ, বঙ্গভঙ্গকারী ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও ব্রাহ্মণের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ স্পৃহা জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। দীর্ঘ সাতষট্টি বছর পরে এই নাটক পাঠ করে কোন রকম উদ্দীপনা বা বিক্ষোভ পাঠকেব মনকে আলোড়িত করে না এটাই নাট্যকারের প্রচণ্ডতম ব্যর্থতা। আশ্চর্য্য হতে হয় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের বাঙালী মনের উত্তাপ দেখে। কি পরিমাণে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হলে এই বকম নাটককে জনসাধারণ বাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে গণ্য করে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। এখানে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব কাজ করেছে। সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিমের পর নন্দকুমার দেখে জনসাধারণ তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করে নাই। নন্দকুমারকে শহীদের সম্মানে ভূষিত করে তাঁকে দেশনেতার সম্মান দিতে দ্বিধা করে নাই।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : নন্দকুমার

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত নন্দকুমার ঐতিহাসিক নাটক নামে অভিহিত হয়েছে। এই নাটক স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। প্রকাশকাল ১৩১৪। মূল্য এক টাকা (যে পুস্তক ব্যবহৃত হযেছে সেটি ১২৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত অধুনালুপ্ত সিকদার বাগান বান্ধব পুস্তকালয়ের সম্পত্তি বর্তমানে এটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পাওয়া গেছে।) নাটকটি পাঁচ অঙ্কে ও ১৭৬ পাতায় সম্পূর্ণ। প্রথম অঙ্কে তিনটি দৃশ্য (পাতা ১ থেকে ৩২), দ্বিতীয় অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য (পাতা ৩৩ থেকে ৭০), তৃতীয় অঙ্কে ছয়টি দৃশ্য (পাতা ৭১ থেকে ১১০), চতুর্থ অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য (পাতা ১১১ থেকে ১৩৯), পঞ্চম অঙ্কে নয়টি দৃশ্য (পাতা ১৪০ থেকে ১৭৬)।

ক্ষীরোদপ্রসাদ যে কি দারুণ দায়িত্বজ্ঞানহীন নাট্যকার তার পরিচয় প্রতি অঙ্কের গল্পের মধ্যে পাওয়া যাবে। ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা থাকা দূরে থাক তিনি এ বিষয়ে একেবারেই দিক্‌বিদিকজ্ঞান শূন্য। ইতিহাসের কোন

বই তিনি দেখেছেন বলেও মনে হয় না। বিজ্ঞাপনে তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন যে 'মহারাজা নন্দকুমার সম্বন্ধে কতকগুলি কিম্বদন্তী·· আমার এই নাটকখানি প্রণযনে বিশেষ সাহায্য করিযাছে।'

প্রথম অঙ্ক ॥

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে মহারাজা নন্দকুমার তাঁর ছোট জামাতা রাধাচরণের সঙ্গে মীরকাশিম বিষয়ে তর্ক করেছেন। তাঁর বক্তব্য হল যে মীরকাশিম নন্দকুমারের বিরোধিতা না করলে বাংলা থেকে সহজেই ইংরেজদের বিতাড়িত কবা যেত। নন্দকুমারের মতে বিলাতের ডাইরেক্টররা অতি নিষ্ঠাবান ভদ্রলোক, তাদের কাছে কোম্পানীর কর্মচারীদের অপকীতি প্রকাশ করে দিলেই তাদের শাসন হবে। রাধাচরণকে নন্দকুমার জানালেন যে তিনি শাহজাদার সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন একথা ইংরেজ জানতে পেরে তাঁর ওপর রুষ্ট হয়েছে। তবে ইংরেজ সৈন্য, তাঁর মতে অতি সুশিক্ষিত, মীরকাশিমের সৈন্য যতই সুশিক্ষিত হোক ইংরেজের কাছে পরাজিত হবে। ইংরেজদেশের কড়া আইনের কথাও শোনাচ্ছেন 'চুরী ক'রলে ফাঁসী, জাল ক'রলে ফাঁসী—' নন্দকুমার জানাচ্ছেন মীরজাফর অতি গর্হিত চরিত্রের লোক। যখন শোভারাম বসাকের বাড়ীতে তিনি অর্থাভাবে কষ্টে ছিলেন তখন নন্দকুমার তাকে রক্ষা করেন। জানাচ্ছেন হুগলীর ফৌজদার হয়ে দেশশুদ্ধ লোককে চটিয়েছেন। কোম্পানীর দেওয়ানী করে বহু সাহেবের বিশেষ হেস্টিংসের বিষ নজরে পড়েছেন। এই রাগের কারণ নন্দকুমারের মতে তাঁর কর্মক্ষমতা যার ফলে হেস্টিংস, ক্লাইভের চোখে অপদস্থ ও হেয় প্রতিপন্ন হন। এইসব ইতিহাস-গন্ধী কথাব পর তিনি জানালেন যে তিনি জরুলগ্রামে পৈত্রিক গুরুকে দর্শন করতে চললেন কেননা চতুর্দশ বৎসর তিনি অদর্শনে আছেন। পথে যেতে তাঁর গুরু কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল। তিনি সহজেই রাজাকে চিনতে পারলেন যদিও রাজা তাঁর পরিচয় পেলেন না। তবে কন্যা গুরুগৃহের পথও দেখালেন না, রাজাকে খুঁজে নিতে বললেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে নন্দকুমারের গুরু বাপুদেব এবং তাঁর বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যার কথোপকথন। পিতার অনুমতি সত্ত্বেও লোকাপবাদের ভয়ে গুরুকন্যা নন্দকুমারের গৃহে অবস্থান করতে অস্বীকার করলেন। তীর্থযাত্রা অভিলাষী পিতার মনে তার

ফলে সঙ্কট সৃষ্টি হল। সহসা জানা গেল যে ইংরেজ ভয়ে মীরকাশিম তার যে বালকপুত্রকে এতদিনে গোপনে রেখেছিলেন সে এই গুরুগৃহের সামনে উপস্থিত। তার ডাক শুনে সন্তান আকাঙ্খা হৃদয়ে জেগে ওঠায় জ্যেষ্ঠা গুরুকন্যা প্রমদা গৃহ ছাড়লেন। গুরু বাপুদেবও কন্যার অন্বেষণে বাহির হলেন। মীরকাশিমের পুত্রের নাম বাহার। প্রমদা তাকে সৈন্যদলের হাত থেকে রক্ষা করলেন। রেজা খাঁ স্বয়ং এই সিপাহী বাহিনীর পরিচালক। রেজা খাঁ জানালেন যে বালক রাজদ্রোহী। অবশেষে নন্দকুমার প্রবেশ করে নবাব পুত্র ও গুরুকন্যাকে রক্ষা করছেন। তারপর নিজ জীবনকাহিনী বিবৃত করে বলছেন যে তিনি গুরুগৃহেই লালিত পালিত এবং সেই সাধনাতেই ফৌজদারী লাভ হয় চৌদ্দবছর আগে। সেদিনের কুমারী প্রমদাকে বিধবা দেখে রাজা দুঃখিত হলেন। ইতিমধ্যে ভৃত্যসহ গুরু এলেন। বাহার প্রথম অঙ্কে ছেদ টানলে এই কথা বলে: 'মা! নাম আমার বজায় রাখ দেখবে বাংলার রাজত্ব এক ব্রাহ্মণ কন্যার হুকুমে চালিত হচ্ছে।'

আলোচনা ॥

সংলাপে নাটকের যে সময় দেওয়া হয়েছে সেটা মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানীর বিরোধের সময় অর্থাৎ কোন কারণেই ১৭৬১র আগে নয় অথবা ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের পরে নয়। অর্থাৎ নবাব মীরকাশিমের পূর্ণ রাজত্বকাল। তখন নবাবপুত্র পালিয়ে বেড়াবে কেন বা রেজা খাঁ তাকে বন্দী করতে চাইবে কেন বোঝা গেল না। নন্দকুমার রেজা খাঁকে ভৎর্সনা করছেন কেন তাও স্পষ্ট নয়: 'নবাব মীরকাশিমের ছেলেকে গ্রেপ্তার ক'রে আপনার ইংরেজ ভক্তি দেখাবার সময় এখন আসেনি।' মীরকাশিম বাংলা সুবার প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন সম্ভবত নাট্যকার ভুলে গেছেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমার কর্ণেল কুটের দেওয়ান ছিলেন সম্ভবত তা নাট্যকার জানতেন না। তিনি নন্দকুমারের পূর্বজীবন গুরুগৃহের অতি পবিত্র পরিবেশে রচনা করে তারপর তাকে ফৌজদারী দিয়েছেন চৌদ্দবছর আগে অর্থাৎ '১৭৪৭ থেকে ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে। বলাবাহুল্য এই হিসাব সম্পূর্ণ ভুল। হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ ইয়ারবেগ খানের পতন এবং তার দেওয়ান নন্দকুমারের সেই পদ লাভ পরবর্তীকালের ঘটনা। নন্দকুমার

পলাশীর পরাজয়ের পরে প্রথমে রাজা দুর্লভরামের নায়েব তারপর ক্লাইভ সাহেবের সহকারী এবং ১৭৫৯ এর জুলাই মাস আসতে না আসতে রাজা পদবী নিয়ে মীরজাফরের দেওয়ান। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাস থেকে নন্দকুমার ইংরেজ হাজতে। সেখান থেকে মুক্তি ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই, এবং আবার মীরজাফরের মন্ত্রীত্ব। ক্ষীরোদ প্রসাদ অবশ্য এসব জানবার চেষ্টা না করেই মনের আনন্দে কল্পনার ফানুস উড়িয়েছেন। রেজা খাঁ তখন চ কায় স মান্য কর্মচারী।

দ্বিতীয় অঙ্ক॥

দ্বিতীয় অঙ্কের সুরু মোহনপ্রসাদের সঙ্গে হেস্টিংসের সংলাপে। মহনপ্রসাদ জানাচ্ছেন যে মীরকাশিমের সঙ্গে কোম্পানীর যুদ্ধ বেধে গেছে। হেস্টিংস আশ্চর্য্য হচ্ছেন কারণ তিনি মাদ্রাজে বসে যুদ্ধের কোন খবর পান নাই। মোহনপ্রসাদ জানাচ্ছেন যে অমিয়েট সাহেবের জন্যেই যুদ্ধ লেগেছে। হেস্টিংস থাকলে অমিয়েটকে সামলাতে পারতেন কারণ সিরাজদ্দৌলা কাশিমবাজার লুঠ করার সময় তিনি এবং অমিয়েট একই সঙ্গে কান্তবাবুর ঢেঁকিশালে লুকিয়েছিলেন। হেস্টিংস অমিয়েটের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করলেন। মোহনপ্রসাদ জানালেন যে তিনি এখন কোম্পানীর চাকরী করছেন। তিনি মীরকাশিমের বালকপুত্র ও নন্দকুমারের খবরও দিলেন। হেস্টিংস জানালেন যে ভ্যান্সিট্টার্ট সাহেবের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় নন্দকুমার কোম্পানীর চাকরীতে ইস্তফা দিয়েছেন। জানালেন মুঙ্গের থেকে মীরকাশিম পলাতক কিন্তু তার বেগম বন্দী হয়েছেন। রেজা খাঁ এসে খবর দিলেন যে মুর্শিদাবাদের এক ছোট্ট গ্রামে নন্দকুমারকে দেখেছেন। হেস্টিংস মীরজাফরের সঙ্গে দেখা করতে কাটোয়া চললেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে নন্দকুমার তার জ্যেষ্ঠ জামাতা জগচ্চন্দ্রের সঙ্গে আলোচনারত। নবাবপুত্র এবং গুরুকন্যা নিরুদ্দেশ হওয়ায় নন্দকুমার চিন্তা করছেন যে তাঁরা আবার ইংরেজ সৈন্যের হাতে বন্দী হলেন নাকি। জগচ্চন্দ্র বিক্ষুব্ধ কারণ সম্পর্কে ও বয়সে বড় হওয়া সত্বেও নন্দকুমার তাঁর ছোট জামাতার ওপর বিষয় রক্ষার ভার দিয়েছেন। কিন্তু নন্দকুমারের ছেলে গুরুদাস জীবিত, সেজন্য জগচ্চন্দ্র জানাচ্ছেন তাঁর বিষয়ে লোভ নাই। তিনি কেবল রাধাচরণের অব্যবস্থায় পীড়িত। নন্দকুমার

দুই জামাতার মধ্যে বিষদৃশভাবে আশঙ্কিত হলেন। মোহনপ্রসাদ জানালেন যে বড জামাতা বাবাজী রেগে গিয়ে হেস্টিংস সাহেবের কাছে চাকরী করতে গেলেন। ইতিমধ্যে বুলাকীদাস এসে বলছেন যে নন্দকুমার যে সমস্ত গহনা গুরুকন্যাকে দেবার ইচ্ছায় তার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন তা ইংরেজ সৈন্য লুঠ করে নিয়েছে। সুতরাং বুলাকীদাস পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ স্বীকার করে এক খৎ লিখে দিতে স্বীকৃত হলেন। মোহনপ্রসাদ জানালেন এসব অতি সাধারণ কাজ ও নামমাত্র অর্থ কারণ নন্দকুমারের আয় বছরে আড়াই লক্ষ টাকা। পরের দৃশ্যে নন্দকুমার তার গুরুর দর্শন পাচ্ছেন। অলঙ্কার অপহরণের খবর পেয়ে গুরু বলছেন ওই অর্থ এখনি কোন সৎকাজে ব্যয় করা হোক। প্রথমেই যখন বাধা পড়েছে তখন গুরুকন্যাকে অলঙ্কার দেওয়া বা তার জন্য কোন খৎ গ্রহণ অশুভ হবে। এই কথা নন্দকুমার মেনে নিতে অস্বীকার করায় গুরু নন্দকুমারকে স্বকার্যে ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন। গুরুর ক্রোধের কারণ এবং তাঁকে 'মন্ত্র' দিতে অনিচ্ছা প্রকাশের হেতু জিজ্ঞাসা করে নন্দকুমার জানতে পারলেন যে ত্রিবেণীতে হিন্দুর তীর্থস্থানে বাধা দেবার জন্য ইংরেজ সৈন্য ছাউনী ফেলেছে। নন্দকুমার সেই বাধা সরিয়ে দেবার জন্য ত্রিবেণী যাত্রা করলেন। সংলাপে প্রকাশ যে ইংরেজের সঙ্গে মীরকাশিমের কাটোয়া ও গিরিয়াতে যুদ্ধ চলছে। নন্দকুমারের গুরু বাপুদেবের কনিষ্ঠা কন্যা মুসলমান ঠগী দলপতির হাতে লালিত পালিত। (ব্রাহ্মণ লালিত মুসলমান নবাব পুত্রের সঙ্গে মুসলমান লালিত কুমারী ব্রাহ্মণ কন্যার তুল্য মূল্য করা হল।) এই শ্রীমতী রাধিকার নেতৃত্বে ঠগীরা ত্রিবেণীতে ইংরেজের মোকাবিলা করতে চলল। পথে বাপুদেব জানালেন ত্রিবেণী হতে সরস্বতী অন্তর্হিতা। সপ্তগ্রামে আর গঙ্গার উল্লাস দেখা যায় না। মুর্শিদাবাদ ইংরেজ দখলে। তিনি জানালেন যে নন্দকুমার একাকী ত্রিবেণীতে ইংরেজ বাধাকে মুক্ত করতে গেছেন। রাধিকা জানালেন যে তাঁর দলবল নিয়ে তিনি এখনি নন্দকুমারের সাহায্যে চললেন। ত্রিবেণীতে পৌছে নন্দকুমার ম্যাগুয়ার সাহেবকে গঙ্গার বাধা মোচন করতে অনুরোধ করলেন। তিনি অপারগ হলে বারওয়েল সাহেব এসে হিন্দুদের 'ডাম নিগার' বলে গালি দিতে লাগলেন। জানালেন যে তীর্থযাত্রীরা স্নান করলে নদীর জল ময়লা হয়ে যাবে বলে তীর্থস্থান অবরোধ করা হয়েছে। এই সুযোগে জানালেন যে

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিধান দিয়েছেন যে তীর্থমৃত্তিকা স্পর্শ করলেই তীর্থ-স্থানের পূণ্য হয়। নাম বলা হয়েছে 'বোনো ষাঁড' (বাণেশ্বর)। বহু অনুনয় বিনয় করেও নন্দকুমার কৃতকার্য্য হলেন না। অবশেষে নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি জানালেন যে তিনি হুগলীর ফৌজদার। অবশেষে ঠগীরা খবর দিল যে নদীতে যে বজরায় হেস্টিংস আসছেন, সেটি এখন সম্পূর্ণভাবে তাদের দখলে। অবরোধ উন্মোচন না করলে নৌকাশুদ্ধ হেস্টিংসকে সলিল সমাধি দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে 'জনৈক ওমরাও' দৌড়ে এসে জানালেন যে স্বয়ং নবাব মীরজাফর বজরায় করে সেখানে উপস্থিত। তীর্থযাত্রীরা নবাবের বজরায় উঠে সাহেবদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। জানা গেল যে এই তীর্থযাত্রীরা ছদ্মবেশী ঠগী। ইংরেজ সৈন্যকে ঘিরে আরো দশহাজার ঠগী দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই অবরোধ না তুললে উপায় কি। বাধা উঠে গেল। নন্দকুমারের জয় হোল।

আলোচনা ॥

ক্ষীরোদপ্রসাদ এই অঙ্কে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নাম করেছেন কিন্তু ইতিহাস পাঠ করতে ভুলে গেছেন। পাঠ করলে জানতেন যে মীরজাফর নবাব হবার প্রথম ও প্রধান সর্ত দিয়েছিলেন যে নন্দকুমার তার মন্ত্রী হবেন। তদনুযায়ী ইংরেজ জেল থেকে নন্দকুমার মুক্ত হলেন। নাট্যকার জানতেন না যে কাটোয়ার ও গিরিয়ার যুদ্ধ মুঙ্গের যুদ্ধের আগে। তিনি জানতেন না যে বারওয়েল তখন কাউন্সিলার নয়। জেলার নিযুক্ত কর্মচারী মাত্র। ভ্যান্সিট্টার্ট তখনও গবর্ণর। বুলাকীদাসের খৎ লিখে দেবার সমস্ত ঘটনা কল্পিত। এমনকি মহামহোপাধ্যায় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য প্রণোদিত কারণ নন্দকুমার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারে আবদ্ধ হলে তিনি বিধান দেন যে আবদ্ধতায় জাতি যায় না, দোষ প্রমাণিত হলে জাতি যায়। অনেকে মনে করতেন যে এই বিধানের ফলে দোষী প্রমাণিত নন্দকুমারকে ফাঁসী দিতে ইংরেজ কোম্পানী দ্বিধা করে নাই। সিরাজদ্দৌলার ভয়ে হেস্টিংসের কান্তবাবুর কাছে আশ্রয় গ্রহণের বহুল প্রচারিত মিথ্যা ঘটনা বর্ণিত হয়েছে কিন্তু সে গল্পে অমিয়েট সাহেব তার সাথী ছিলেন না। ত্রিবেণীতে তীর্থযাত্রীদের স্নান বন্ধ করার ঘটনা সম্পূর্ণ নাট্যকারের

কল্পনা, এমন ঘটনার কোন বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না ইংরেজ ক্ষমতা সম্পর্কেও ভুল তথ্য প্রচারিত হয়েছে। বাদশাহর কাছ থেকে দেওয়ানী লাভ ১৭৬৫ সালের ঘটনা, তার আগে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফর সুবাদার এবং তাঁর প্রধান মন্ত্রণাদাতা হিসেবে মহারাজ নন্দকুমার বাংলার প্রধান শাসক। এই অঙ্কের সব কিছুই প্রক্ষিপ্ত ও অনৈতিহাসিক। মোহন প্রসাদ উত্তরপ্রদেশের ব্যবসায়ী ১৭৬৩-৬৫তে তার বাংলায় আসার কোন প্রমাণ নাই। সবই নাট্যকারের কষ্টকল্পনা এবং ব্রাহ্মণত্বের ধ্বজা উড্ডীন প্রচেষ্টা মাত্র। নন্দকুমার কখনও কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন না।

তৃতীয় অঙ্ক ॥

তৃতীয় অঙ্কে নবাবের কক্ষে মীরজাফর বসে অনুশোচনা করছেন। তিনি সিরাজবধের জন্য অনুশোচনা করছেন, বাংলাকে শ্মশান করার জন্য অনুশোচনা করছেন, ইংরেজদের বাংলায় আধিপত্য করতে দিয়েছেন বলে অনুশোচনা করছেন। এক কথায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রচলিত সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করছেন। আত্মধিক্কার তাঁর মনকে এমন বিধ্বস্ত করেছে যে তিনি ভৃত্যকে আলিঙ্গন দিতে বলছেন এবং মণিবেগমকে সাম্রাজ্য চালাতে বলছেন। বলছেন তিনি অন্তরে বাহিরে অন্ধ। মণিবেগম জানাচ্ছেন যে ত্রিবেণী সঙ্গমে মহারাজ নন্দকুমারের মর্য্যাদা রক্ষা করতে নবাব যা করেছেন তা অতি প্রশংসার যোগ্য। তাঁর এই কীর্তি নবাবকে প্রজাপীড়কের দুরপনেয় কলঙ্ক থেকে রক্ষা করেছে। মণিবেগম জানালেন যে একমাত্র নন্দকুমারকেই তিনি বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন। এমন সময় হেস্টিংসের পত্র নিয়ে নন্দকুমারের জামাতা জগচ্চন্দ্র নবাব সমীপে উপস্থিত। নবাব নন্দকুমারের জামাতাকে 'চাকরী' দিতে ইচ্ছুক কিন্তু হেস্টিংসের পত্রের জন্য নয়। তিনি তার পুত্র নাজমুদ্দৌলার সঙ্গীরূপে জগচ্চন্দ্রকে নিযুক্ত করলেন। মীরজাফর মণিবেগমকে জানাচ্ছেন যে নন্দকুমারকে বন্ধু পেলে তিনি সত্যিকারের শাসকের মতো নবাবী করতে পারেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে মুর্শিদাবাদের কক্ষে হেস্টিংস চিন্তিত। সঙ্গে রাজা রামচাঁদ ও রেজা খাঁ। উধুয়ানালায় জয় না হলে কিছুই করতে পারা যাচ্ছে না বলে হেস্টিংস ক্ষোভ করছেন। এমন সময় একজন সিপাহী খবর দিল যে

উধুয়ানালার যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হয়েছে। তাই শুনেই হেস্টিংস খুব 'হিপ হিপ হুররে' করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন যে সর্বকার্যে বাধা স্বরূপ নন্দকুমারকে এবার গ্রেপ্তার করতে হবে। এমন সময় মোহনপ্রসাদ এসে পড়ায় রামচাঁদ বলছেন নন্দকুমারকে এখনও সাজা দেওয়া গেল না। হেস্টিংস জানালেন যে ভ্যাজিস্ট্রার্টের সইএ তিনি নন্দকুমারের নামে পরোয়ানা বের করবার ব্যবস্থা করবেন। মোহন প্রসাদ জানালেন যে তিনি ব্যবস্থা করছেন যাতে বুলাকীদাস একখানা খৎ নন্দকুমারকে লিখে দেয়, সেই খৎ দিয়ে অনেক কাজ হবে। তবে সর্ত হল গোরা সৈন্যরা বুলাকীদাসের বাড়ী লুঠ করে চার লক্ষ টাকা নিয়ে গেছে। সেই অর্থ ফেরৎ দিতে হবে। হেস্টিংস এর সংলাপ : 'আসুন রাজা আমরা মীরজাফরকে মুঙ্গের পাঠাইবার ব্যবস্থা করি।··· সে দাম্ভিক রাজাকে নিজের মুখে যতক্ষণ শাস্তি শুনাইতে না পারিতেছি ততক্ষণ আমার স্ফূর্তি নাই।' নবাব মীরজাফর আসামাত্র উঁধুয়ানালা জয়ের জন্য ২৮ লক্ষ্য টাকা হেস্টিংস নবাবের কাছে দাবী করলেন এবং প্রায় জোর করে তাকে মুঙ্গেব যেতে বাধ্য করলেন। তৃতীয় দৃশ্যে বাপুদেব ও নন্দকুমার কিরীটেশ্বরীব মন্দিরে পূজা করছেন এবং যতবার ফুল দিচ্ছেন ততবারই পড়ে যাচ্ছে। অবশেষে রাধিকার সঙ্গে যখন নন্দকুমার এক সঙ্গে ফুল দিলেন, সেই ফুল দেবী গ্রহণ করলেন। বাপুদেব নন্দকুমারকে রাধিকাকে বিবাহ করতে বললেন। জানালেন তা হলে তাঁর জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মুসলমান পালিত বাপুদেব কন্যাকে নন্দকুমার বিবাহ করতে অস্বীকার করলেন। চতুর্থ দৃশ্যে নন্দকুমার তাঁর রাণী এবং জামাতা রাধাচরণকে সব খবর শুনিয়ে রাধিকাকে বিবাহ করার কথা বললেন। রাধিকা তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হয়ে জানালেন যে সমস্ত হিন্দুজাতির প্রতিনিধি হিসাবেই তিনি রাজাকে দেখেন। তাঁর আনুগত্যের সেইটাই কারণ। রাধাচরণ খবর দিলেন কোম্পানীর পল্টন নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করতে আসছে। তখুনি মোহনপ্রসাদ গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে নন্দকুমারকে বন্দী করল। পঞ্চম দৃশ্যে মুঙ্গেরে মীরজাফর ও মণিবেগম। মীরজাফর আশঙ্কা করছেন যে মীরকাশিমের পরাজয়ের পর তাঁর নবাবীকেও বাতিল করা হবে। মণিবেগম সায় দিলেন সেই ভাল কারণ বাংলা বিহার উড়িষ্যার বেগম হয়ে তিনি গোলামী করতে চান না। নবাব মৃত কন্যার জন্যে অশ্রুমোচন করলেন কারণ মনস্তাপে 'জীন্নত মহল' জহর খেয়ে জীবন

বিসর্জন দিয়েছে। এমন সময় বারওয়েল সাহেবের আসার খবর পাওয়া গেল। মীরজাফর মণিবেগমকে নবাবী করতে দিতে রাজী হলেন কারণ নূরজাহান তাই করেছিলেন। তদনুযায়ী মণিবেগম বারওয়েল সাহেবকে খুবই নাস্তানাবুদ করলেন। কথার মারপ্যাচে জানালেন মহারাজ নন্দকুমারকে না পেলে দেশ শাসন করা অসম্ভব। দেশ সুশাসিত না হলে কোম্পানীকে খাজনা দেওয়া সম্ভব হবে না। বারওয়েল এই কথা ভ্যান্সিটার্টকে জানাতে ছুটলেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য খুবই নাটকীয়। দুই প্রতিপক্ষ হেস্টিংস ও নন্দকুমার মুখোমুখী। এই দৃশ্যে নন্দকুমারের মুখে নাট্যকার সংযত ও ভদ্র ভাষা যেমন দিয়েছেন হেস্টিংস সাহেবকে তেমনি অশালীন রঙে আঁকা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ নন্দকুমার সর্বদা 'অনারেবল কোম্পানীর' সঙ্গে শত্রুতা করছেন। তিনি জানাচ্ছেন যে 'এই নিগারের দেশে' তাঁরা রাজা বাদশার বিচার কবতে সক্ষম। নন্দকুমার নিজেকে যতই বুদ্ধিমান মনে করুন তাকে শাস্তি পেতে হবে। কারণ তিনি মীরকাশিমের পুত্রকে আশ্রয় দিয়েছেন এবং ত্রিবেণীতে বারওয়েলের কাজে বাধা দিয়েছেন। রাজাকে সাবধান করে দিয়ে হেস্টিংস তাঁর সংলাপে বলছেন যে মীরকাশিম ইংরেজকে বাধা দিতে এসে ফুৎকারে উড়ে গেছে, নন্দকুমারেরও সেই দশা হবে। এমন সময় রাধিকার প্রবেশ। তিনি জানালেন যে হেস্টিংস যখন সিরাজদ্দৌলার ভয়ে পালিয়ে কান্তবাবুর আশ্রয়ে ছিলেন তখন তিনিই তাকে নিত্য দুগ্ধ সরবরাহ করে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সুতরাং তিনি তার জীবনদাত্রী। কিন্তু রাধিকা, মহারাজ নন্দকুমারের জীবনভিক্ষা চাইবার আগে নন্দকুমার তাকে বাধা দিয়ে বললেন যে রাধিকা তাঁর প্রার্থনা মতো জীবন ভিক্ষা পেলে নন্দকুমার সে জীবন রাখবেন না। ইতিমধ্যে হেস্টিংস বুঝে গেছেন যে ঠগীদের সর্দারণী রাধিকা এবং ঠগীরা তাঁর রক্ষীদের গলায় রুমাল বেঁধে হত্যা করেছে। তিনি তাই বন্দুক নিয়ে রাধিকাকে গুলি করতে এসে দেখেন তিনি নাই। নন্দকুমার তাই দেখে বললেন: 'গুপ্তশক্তি' দেশের হৃদয়ের কোন নিভৃত দেশে এ শক্তি নিহিত আছে জানি না। তাই শুনে ক্ষিপ্ত হেস্টিংস বলছেন: 'Traitor ! you shall have to answer all these.' এবং মহারাজ নন্দকুমারকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখছেন। অবশেষে নবাব মীরজাফর বারওয়েল সাহেবকে

সঙ্গে করে এবং গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্টের পত্র নিয়ে এসে নন্দকুমারকে মুক্ত করছেন। হেস্টিংস জানাচ্ছেন যে নন্দকুমার যেন তার এ আচরণ মনে না রাখেন। কারণ নন্দকুমার নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছেন। রাজা রামচাঁদ নন্দকুমারকে 'গৌড়পতি' ও 'সমাজের শিরোমণি' বলে আপ্যায়ন করলেন। মীরজাফর ঘোষণা করলেন যে 'আজ থেকে আপনি—বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান।'

আলোচনা ॥

সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত এই অঙ্ক। তবে যে ভাবে ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে তাতে সন্দেহ থাকে না যে নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি সম্পর্কে সজাগ এবং স্বেচ্ছায় সেগুলির ভুল ব্যবহার করে দর্শকের এবং পাঠকের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন, তাদের মনে সম্পূর্ণ বিপরীত মত সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছেন। আত্মতুষ্টির জন্য ঐতিহাসিক ঘটনার এই ব্যবহার যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ জেনেশুনে সেই পাপাচার করে কঠোরতম নিন্দার ভাগী হয়েছেন। লক্ষ্য করার বিষয় যে মীরকাশিমের নবাবীকালে ফরাসীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অপরাধে নন্দকুমার ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বন্দী হন এবং মীরজাফরের রাজত্ব সময় ৬ই জুলাই ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মুক্ত হযে মীরজাফরের দেওয়ান হলেন দ্বিতীয় বার। এই সব ঘটনার সঙ্গে হেস্টিংসের কখনই কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। ক্ষীরোদপ্রসাদ সকলের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করার জন্য কাটোয়া গিরিয়া ও উধুয়ানালায় পরাজয়ের পর এই দৃশ্যের অবতারণা করছেন যদিও এই ঘটনা মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বেকার ঘটনা (মীরকাশিম প্রবন্ধ দেখুন)। বস্তুত ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই থেকে ১৭৬৪-র অক্টোবরের মধ্যে নন্দকুমারের স্মরণীয় কাজের মধ্যে ১। নবাব মীরজাফরের বাদশাহী সনদ আদায়। ২। নিজের জন্য বাদশাহের কাছ হতে মহারাজা পদবী আদায়। ৩। মীরকাশিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও পত্রালাপ। ৪। নবাব মীরজাফরকে বিলাসে মগ্ন রাখা এবং তিনি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হলে তাকে কীরিটেশ্বরীর চরণামৃত খাবার জন্য সুপারিশ করা। এই জন্য মণিবেগম চিরকাল নন্দকুমারকে অপছন্দ ও সন্দেহ করেছেন। সুতরাং তাঁর কথায়

মীরজাফরের নন্দকুমারকে দেওয়ান করা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

অঙ্কের প্রথম থেকেই মিথ্যা কথার বেসাতি। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের মীরকাশিম নাটকের সার্থকতায় ক্ষীরোদ প্রসাদ ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমার নাটক রচনা করলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মনীষা ক্ষীরোদপ্রসাদ কোথায় পাবেন। তিনি বালুকাবেলায় কল্পনার যে দুর্গ রচনা করেছেন তা সত্যের একটি মাত্র ঢেউ ভস্মস্মাৎ করে দিয়েছে। মীরজাফরের সিরাজ বধের অনুশোচনা তাই গিরিশচন্দ্রের 'মীরকাশিম' নাটকের সঙ্গে যোগসূত্র গাঁথবার এক ব্যর্থ পরিকল্পনা। এই সময়ে সিরাজকন্যা এবং লুৎফউন্নিসার প্রতি ব্যবহার দেখলে সন্দেহ থাকে না যে মীরকাশিম অথবা তাঁর শ্বশুর মীরজাফর কেউই সিরাজদ্দৌলার হত্যায় অনুশোচনায় বিগলিত হয়ে যান নাই। ক্ষীরোদপ্রসাদ আর একটি জোচ্চুরী করেছেন। নন্দকুমারের ফাঁসীর সময় যারাই উচ্চপদস্থ কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন এবং নন্দকুমারের বিরোধিতা করেছেন তাদের সঙ্গে বিরোধের সূত্র ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্দেশ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে ব্যক্তিগত হিংসা নন্দকুমারের মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাই এসেছেন হেস্টিংস, বারওয়েল ও মোহনপ্রসাদ। প্রস্তাবনায় নন্দকুমারের ইতিহাস বলার সময় দেখান হয়েছে যে হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের বিরোধ আরো এগার বছর পরের ঘটনা। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আগে কোন প্রত্যক্ষ বিরোধের প্রমাণ নাই। বরঞ্চ নন্দকুমারের সুপারিশ অনুযায়ী ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমারের একমাত্র পুত্র রাজা গুরুদাস নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হলেন। ১৭৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের সখ্যতা ছিল বলা চলে। ক্ষীরোদপ্রসাদ ইচ্ছা করে প্রকাশ করেন নাই ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস কোম্পানীর কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে যান এবং নয় বছর পর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর হয়ে ফিরে আসেন। সুতরাং ১৭৬৩র কর্মকাণ্ডে হেস্টিংসকে প্রধান চরিত্ররূপে দেখান সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষ যখন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে নাট্যকার একটু একটু ইতিহাসের খবর রেখেছেন। বারওয়েল বা মোহনপ্রসাদের সম্পর্কেও ওই একই কথা। তাঁরা কেউই নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কোন কর্মে হোতা ছিলেন না। কলকাতা বা মুর্শিদাবাদে তাদের উপস্থিতির

কোন প্রমাণ নাই। আরো মজার ব্যাপার আছে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিম মুঙ্গেরে। সেখানেই তিনি সেপ্টেম্বর মাসে রাজা রামনারায়ণ (এই নাটকের রাজা রামচাঁদ) প্রভৃতিকে জলে ডুবিয়ে হত্যা করেন। কয়েকদিন পরে রাজা রাজবল্লভ তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাস এবং জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করেন। সুতরাং হেস্টিংস নবাব মীরজাফরকে কেন মুঙ্গেরে পাঠাবেন বোঝা গেল না। তাছাড়া গবর্ণর ভ্যান্সিট্টার্ট ও হেস্টিংস মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ করার অপক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু কাউন্সিলে তাঁরা সংখ্যালঘু হবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরে উভয়েই কোম্পানীর কর্মে ইস্তফা দিযে দেশে ফিরে যান। মীরকাশিম প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গোরাসৈন্যর বুলাকীদাসের বাড়ী লুঠ আর এক মিথ্যা কথা। বুলাকীদাস কলকাতার বা মুর্শিদাবাদের অধিবাসী ছিলেন না। বারওয়েল ও মণিবেগমের ঘটনা প্রক্ষিপ্ত। এ সময়ে দেশের আসল শাসক নন্দকুমার, মণিবেগম নয়। এই অঙ্কের অন্যান্য ঘটনা সম্পূর্ণভাবে কল্পিত। ঠগীদের ক্ষীরোদপ্রসাদ যে সম্মানের আসন দিতে চেয়েছেন তাতেই তার মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ঠগীরা দেশের বিষ স্ফোটকের মতো দেশব্যপী বিশৃঙ্খলায় জন্ম নিয়েছিল এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক প্রচণ্ড আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। ঠগী দমন ইংরেজ শাসনের এক অন্যতম প্রথম সুকার্য।

নন্দকুমারকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য তাঁকে 'গৌড়পতি' এবং 'সমাজের শিরোমণি' বলা হয়েছে। নন্দকুমার অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে নিজের বুদ্ধিবলে কিভাবে উন্নতি করেন এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনায় তার বিশদ উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কখনই 'গৌড়পতি' এই আখ্যা লাভ করেন নাই অথবা ওই আখ্যা লাভের যোগ্য হন নাই। সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নন্দকুমার নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এক পুত্রের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নদীয়ারাজ তাঁর কথা মতো কাজ করতে অস্বীকার করায় নানা ছুতোয় তাঁর সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে দ্বিধা করেন নাই। নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র এই সময়ে হিন্দুসমাজের নেতা বলে স্বীকৃত হতেন। তাঁর প্রতি এই দুর্ব্যবহারে সাধারণ হিন্দু নন্দকুমারকে নিন্দা করেছে যার ফলে তাঁর ফাঁসীর আদেশ খারিজ বা মকুব করার জন্য একজন হিন্দু বা

মুসলমানের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা যায় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মহাকবি গিরিশচন্দ্র ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিম নাটকে নন্দকুমারের যে ঐতিহাসিক চরিত্র প্রকাশ করেছেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ সে সব উপেক্ষা করে এক স্বকপোল কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করেছেন এবং দুঃখের বিষয় সেই অপকীর্তিতে কিছু পরিমাণ সার্থক হয়েছেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে মীরজাফরের মৃত্যু হল। মার্চ মাসে ক্লাইভ চলে এলেন বাংলার গবর্ণর হয়ে। ১৩ই এপ্রিল কাশীরাজ বলবন্ত সিংহের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করায় নন্দকুমারকে আবার কলকাতায় এনে বন্দী করা হল। এবার তার বন্দীদশা দীর্ঘদিন। সম্ভবত ১৭৬৮ কোন সময়ে তিনি মুক্তি পান।

চতুর্থ অঙ্ক ॥

চতুর্থ অঙ্কের সুরুতেই নন্দকুমার স্ত্রী ক্ষেমঙ্করীকে বাংলায় সুশাসনের পরিকল্পনা শোনাচ্ছেন। বলছেন ইংরেজের পৈশাচিক ব্যবসা তিনি বন্ধ করেছেন। নবাব মীরজাফরকে কেন্দ্র করে তিনি এমন ব্যবস্থা করবেন যাতে ইংরেজ বাংলা ছাড়তে বাধ্য হয়। তারপর তিনি জানালেন যে তিনি বৈষ্ণব গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। রাধিকা প্রসঙ্গে বলছেন যে রাধিকাকে বিবাহ করলে তাঁর জয় সর্বত্র বিরাজ করবে জেনেও তিনি জাতিনাশের ভয়ে তাঁকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে তাঁর কুলগুরুর আদেশ অমান্য করেছেন। রাধাচরণ জানাচ্ছেন যে হেস্টিংস তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। এখানে একমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা যে রেজা খাঁকে নবাব আদেশে বন্দী করা হয়েছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে নন্দকুমারের বাগানে এসে হেস্টিংস নন্দকুমারের দুই জামাতা জগচ্চন্দ্র ও রাধাচরণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করছেন। নন্দকুমার এলে হেস্টিংস তাঁকে জানাচ্ছেন যে স্পেনসার সাহেবের পর তিনি বাংলার গবর্ণর হচ্ছেন। তিনি রেজা খাঁর মুক্তির জন্য নন্দকুমারের কাছে সুপারিশ করছেন। নন্দকুমার জানাচ্ছেন যে নবকৃষ্ণের হেফাজতে তিনি ছয় লক্ষ টাকা কোম্পানীকে বহু কষ্টে দিয়েছেন। তিনি কোম্পানীর অপকীর্তির এক তালিকা প্রস্তুত করেছেন। হেস্টিংস প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তিনমাস পর গবর্ণর হয়ে তিনি সকল অপকীর্তির বিচার করবেন। সেই কথা শুনে নন্দকুমার রেজা খাঁকে

মুক্তি দিলেন। হেস্টিংসের মুখে এক সাংঘাতিক স্বগতে ৩ে বলান হয়েছে যে নন্দকুমারের নিধন ছাড়া হেস্টিংসের উন্নতি হ ন। তৃতীয় দৃশ্যে মীরজাফর মারা যাচ্ছেন। তিনি আগামী মন্বন্তরের পদধ্বনী শুনতে পেলেন। এমন সময় বাপুদের উপস্থিত হয়ে জানতে চাইলেন যে মীরজাফর যদি বেঁচে থেকে দেশের হাহাকার দেখতে চান, তিনি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবেন। রাধিকা এসে নবাবী ভিক্ষা চাইলেন। জানালেন তাকে ভিক্ষা দিলে গঙ্গাজলে শুদ্ধ করে তিনি নবাবীকে বাঁচাবেন। নবাব মীরজাফর অন্তিম-কালে পিতাপুত্রী উভয়কেই আশাহত করলেন। বাঁচতেও চাইলেন না আর নবাবীও দিলেন না। চতুর্থ দৃশ্যে হেস্টিংস সন্দেহ করছেন 'that wily woman Muni Begum is concealing the news of the Nawab's death মোহনপ্রসাদও সাগ্রহে নবাব মীরজাফরের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন এমন সময় নাজাম উ-দ্দৌলা এবং রেজা খাঁ সংবাদ দিলেন নবাব মৃত। তাই শুনে হেস্টিংস বললেন 'হুররে'। নাজাম-উ-দ্দৌলাকে জোর করে ধরে নবাব করা হল। মণিবেগম নন্দকুমারকে সেখান থেকে পালাতে বলছেন। নন্দকুমার জানাচ্ছেন যে মীরকাশিমের পুত্র জীবিত তাকে নবাব করা হলে বাংলা বাঁচবে। মণিবেগম তাতে স্বীকৃত হলেন। নন্দকুমার তখনই প্রমদার কাছে সংবাদ পাঠালেন। হেস্টিংস নন্দকুমারকে দেখে তাকে দরবারে যেতে অনুরোধ করেলেন। রাধাচরণ পলাতক শুনে তার পেছনে সৈন্য পাঠালেন। এক সাংঘাতিক স্বগতোক্তি করছেন ইংরেজিতে বক্তব্য মীরজাফর ঠিক সময় মারা গেছেন তা না হলে নন্দকুমার বাংলাকে ইংরেজের কুক্ষি থেকে বাহির করে নিতেন। পঞ্চম দৃশ্যে বীরভূমের জঙ্গলে প্রমদার আশ্রয়ে মীরকাশিমের পুত্র। তাকে বাঁচাতে রাধিকা তার ঠগাদল নিয়ে উপস্থিত। রাধাচরণ নূতন নবাবের খবর আনলেন। বললেন এমন সুযোগ আর আসবে না কারণ অযোধ্যার নবাব, বর্গীর সর্দার, কাশীর বলবন্ত সিংহ সকলেই রাজা নন্দকুমারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। এমন সময় ইংরেজ 'সৈন্যসহ কাপ্তেনের প্রবেশ' এবং তার এক অসতর্ক গুলিতে মীরকাশিমের পুত্র বাহারের মৃত্যু।

আলোচনা ॥

বলাবাহুল্য সকল ঘটনাই প্রক্ষিপ্ত ও মিথ্যা। হেস্টিংস স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের

পর মীরজাফরের মৃত্যু ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। ক্লাইভের সঙ্গে মণিবেগমের আলোচনা অনুযায়ী নাবালক নাজাম-উ-দ্দৌলা নবাব এবং মণিবেগম তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন। রেজা খাঁ হলেন নায়েব সুবা। রেজা খাঁর পদচ্যুতি অনেক পরের ঘটনা। নন্দকুমার ইংরেজ ব্যবসা বন্ধ করেন নাই। বরঞ্চ যে ব্যবসা মীরকাশিম বন্ধ করেন নন্দকুমার তা খুলে দেন। তাঁর জাত্যাভিমান প্রথম দৃশ্যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত সৃষ্টি। তিনি এতবার বন্দীত্ব ভোগ করেছেন দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। হেস্টিংস সম্পর্কীয় সব কথাই মিথ্যা কারণ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে। তাছাড়া নন্দকুমারের সঙ্গে তাঁর কখনও কোন চুক্তি হয়েছিল এমন প্রমাণ নাই। তারপর কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা কেন রাজা নবকৃষ্ণকে দেওয়া হবে তাও বোঝা গেল না। তিনি তখন কোম্পানীর কোন চাকরী করেন না। বরঞ্চ শোভাবাজারকে কেন্দ্র করে ক্রমে কলকাতা সমাজের নেতা হতে চলেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ সম্ভবত নবকৃষ্ণের ব্রাহ্মণী রমণী বলাৎকারের ঘটনা পরবর্তী কোন দৃশ্যে নাটকে যোগ করার ইচ্ছায় এই সংলাপ দিয়েছিলেন। পরে এই মিথ্যা ঘটনার নাট্যরূপ তাকে বিপদে ফেলতে পারে ভয়ে সেটিকে নাটকে প্রকাশ করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এ বিষয়ে প্রচুর সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা সত্বেও এবং এ বিষয়ে একাধিক পুস্তক রচিত হলেও আজও কলকাতার বহু ব্রাহ্মণ নবকৃষ্ণ সম্পর্কিত এই গল্পকে সত্য বলে মনে করেন। কল্পনালোকে বিচরণ করেই ক্ষীরোদপ্রসাদ বারওয়েলকে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দেই কাউন্সিলার করে দিয়েছেন। হেস্টিংসের মুখে জবর মিথ্যা সংলাপ জুড়েছেন। মীরকাশিমের পুত্র সম্পর্কীয় সব গল্পই অলীক। মীরকাশিমের দুই পুত্রই বেঁচেছিলেন এবং কখনও বাংলার সুবাদার হবার চেষ্টা করেন নাই। বংশানুক্রমে কখন কখন হলেও সুবাদারীটা যে মোগল বাদশাহের অধীনে একটা চাকরী এটা বোধ হয় ক্ষীরোদপ্রসাদের জানা ছিল না। আলিবাবার রচয়িতা তাই 'বাংলার সিংহাসন' নামক এক অসম্ভব বস্তুর মোহে বিভোর হয়ে গেছেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন যখন মীরকাশিমের মৃত্যু হয় তখন তার দুই পুত্রই গুলাম উরাইজ জাফারি ও মহম্মদ বাকির-উল-হুসাইনী উপস্থিত ছিলেন। কাজেই নন্দকুমারকে নিয়ে আর একটি 'আলিবাবা' রচনা করা ছাড়া নাট্যকার আর কিছু করেন নাই। তবে তাঁর এই অন্ধত্ব ইচ্ছাকৃত। সেটা আবার প্রমাণ হচ্ছে অযোধ্যার নবাব, বলবন্ত সিং ও বর্গীদের সম্পর্কে

সংলাপে। এই ষড়যন্ত্রগুলি নন্দকুমার বিভিন্ন সময়ে করেছেন। নাট্যকার নন্দকুমার চরিত্রে সংগতি দেবার চেষ্টায় এগুলি একসঙ্গে করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। এমনকি ক্ষীরোদপ্রসাদের ‘সাতকোটি বাঙ্গালীর’ সংলাপও ভুল। কেন না ১৭৬৫তে বাংলার জনসংখ্যা অনেক কম ছিল। এই নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর আগের নাটকের মতনই প্রমাণ করেছেন যে ইতিহাস না জানলে বা তাকে নিজের খুশী মতো ব্যবহার করলে ঐতিহাসিক নাটক লেখা যায় না। কিছু পাঠক বা দর্শকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা ছাড়া এই ধরনের নাটকের কোন মূল্য নাই। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তার অন্য নাটক ‘পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত’র মতনই ‘নন্দকুমার’ আষাঢ়ে গল্পের উপাদানে তৈরী। নাটক হিসাবে যেমন বৈশিষ্ট্য বিহীন, রচনা সৌকর্যেও তেমনি অপটু। এরই ফাঁকে ফাঁকে তিনি দর্শককে মিথ্যা বলেছেন। জানিয়েছেন স্পেন্সারের পরে হেস্টিংস গবর্নর হলেন। স্পেন্সারের পর গবর্ণর হন লর্ড ক্লাইভ এবং তাঁর অনেক পরে এসেছেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ক্লাইভই রেজা খাঁর দক্ষতায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ঢাকা থেকে নিয়ে আসেন।

পঞ্চম অঙ্ক ॥

পঞ্চম অঙ্কের সুরুতেই হেস্টিংস নন্দকুমারকে বন্দী করেছেন বলে উল্লসিত দেখান হয়েছে। তিনি ফ্রান্সিস ও মনসনের আসার খবর দিচ্ছেন এবং দর্শকদের শোনাচ্ছেন তাঁর কর্মে কেহই বাধা দিতে পারবে না একমাত্র নন্দকুমার ছাড়া তাই তিনি নন্দকুমাররূপী সিংহকে যতকাল তিনি জীবিত থাকবেন খাঁচায় বন্ধ করে রাখবেন। বারওয়েল এসে আরো সাফল্যের কথা জানাচ্ছেন। অযোধ্যার নবাব পলাতক। বর্গীরা দেশে ফিরে গেছে। ঠগী দমন হয়েছে এবং মীরকাশিম পুত্র নিহত। হেস্টিংস দুঃখ করে বলছেন যে ফ্রান্সিস তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করছেন তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে রেজা খাঁর গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে হয়েছে কারণ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি নিজে ব্যবসা করে প্রজার ওপর অত্যাচার করেছেন। রেজা খাঁ এলে সেই অভিযোগই তাকে শোনাচ্ছেন। বলছেন এই অপরাধে তার ফাঁসী হবে। রাজা রামচাঁদ বোঝাচ্ছেন যে হেস্টিংসকে মোটা রকমের ঘুস দিলেই ফাঁসী রদ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে নন্দকুমার ফ্রান্সিস সাহেবকে হেস্টিংসের অপকর্ম বোঝাতে গিয়ে বলছেন যে মন্বন্তরের জন্য হেস্টিংস দায়ী। রাণী এসে ভবিষ্যতের আশা প্রকাশ করছেন কারণ কাউন্সিলের নূতন সদস্যরা নন্দকুমারের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলেন। রাণীও নন্দকুমারকে 'গৌড়াধিকারী' বলে সম্মান দেখাচ্ছেন। নন্দকুমার জানাচ্ছেন যে হেস্টিংসকে অপদস্থ করতে পারলে তিনি বন্দী অবস্থাতেই বাংলার শাসনদণ্ড চালনা করতে পারেন। বুলাকীদাসের খতের কথাও নন্দকুমার বলছেন। জানাচ্ছেন যে জগৎশেঠের কাছে টাকা জমা রেখেছেন। তৃতীয় দৃশ্যে নন্দকুমার রাধাচরণকে বোঝাচ্ছেন যে ফ্রান্সিস একজন অত্যন্ত ক্ষমতাধারী লোক তাই হেস্টিংস পর্যন্ত তাকে খোসামোদ করছেন। কিন্তু নন্দকুমার তাতে ভুলবেন না। এ যাবৎ যেখান থেকে যত ঘুষ হেস্টিংস পেয়েছেন তার তালিকা তিনি প্রস্তুত করেছেন। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ আনবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। রাধাচরণ বলছেন 'এ রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়েও আপনার এই হীনাবস্থা' কেবল হেস্টিংসের জন্য। রাধাচরণ সাবধান করছেন যে এই কাজে সফল না হলে চরম দুর্গতির সম্ভাবনা। তারপরই প্রমদার প্রবেশ। বক্তব্য, ভিক্ষা করে তিনি মীরকাশিমের পুত্রের এক বিরাট সমাধি মন্দির তৈরী করবেন। এই সমাধি মন্দির তৈরীর জন্য বুলাকীদাসের গচ্ছিত টাকা নন্দকুমার গ্রহণ করলেন এবং রাধাচরণকে হুকুম করলেন যে মোহনপ্রসাদ এসে যেন খৎ ফিরিয়ে নিয়ে যায়। চতুর্থ দৃশ্যে হেস্টিংসের সঙ্গে মোহনপ্রসাদের ষড়যন্ত্র। ফেরৎ দেওয়া খৎকে নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করে নন্দকুমারকে যে কোন বিপদে ফেলা যাবে। উপরন্তু মোহন প্রসাদ নিজেকে একজন সইজাল করার ওস্তাদ হিসাবে প্রকাশ করছেন। প্রমাণ স্বরূপ মীরকাশিমের সই, হেস্টিংস গৃহিনীর সই জাল করে দেখালেন। স্থির হল যে জালিয়াতির দায়ে মহারাজ নন্দকুমারকে অভিযুক্ত করা হবে। কাগজপত্র সব মোহন প্রসাদ প্রস্তুত করবেন। হেস্টিংস তাড়াতাড়ি বারওয়েলকে পাঠাচ্ছেন ইম্পেকে (প্রধান বিচারপতি) খবর দিতে। পঞ্চম দৃশ্যে কাউন্সিল গৃহে নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন এবং তাই নিয়ে ফ্রান্সিস ও হেস্টিংসের মধ্যে বাকবিতণ্ডা চলছে। এমন সময় মোহন প্রসাদ কোর্টের বেলিফ ও প্রহরি নিয়ে প্রবেশ করে নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করলেন। সুপ্রীম কোর্টের হুকুম

দর্শনে কেউ কিছু করলেন না। নন্দকুমার নিজের ভাগ্যকে দোষী করলেন। রাধাচরণ ফ্রান্সিস সাহেবের শরণাপন্ন হলেন কিন্তু তিনিও কিছুই করতে পারবেন না জানালেন। ষষ্ঠ দৃশ্যে সাধারণ লোক আলোচনা করছে মহামহোপাধ্যায় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের বিধানের এবং জানাচ্ছে যে সে বিধান আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে নন্দকুমার জেলখানায় নিরম্বু উপবাসী। রাধাচরণ জানালেন যে উপবাসেই নন্দকুমারের দেহান্ত হবে। অবশেষে ছদ্মবেশে মণিবেগম আসছেন রাজা রামচাঁদের কাছে। রামচাঁদ তখন নন্দকুমারকে উদ্ধারের সংকল্প গ্রহণ করছেন। রামচাঁদের মা এসে জানাচ্ছেন যে ব্রাহ্মণের প্রতি এই অত্যাচারে জাহ্নবী উষ্ণ হয়েছেন। যেমন করেও হোক নন্দকুমারের উপবাস ভাঙতে হবে। সপ্তম দৃশ্যে নাগরিকগণ বিশ্বাস করতে পারছেন না যে ব্রাহ্মণের ফাঁসী হতে পারে। অবশেষে বিচার শেষে জানতে পারা গেল যে নন্দকুমারের ফাঁসীর আদেশ হয়েছে। একদল বললেন স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে আজই গঙ্গাপার হও। যদি ব্রাহ্মণ হও এ অভিশপ্ত ভূমে আর জলগ্রহণ কর না। অষ্টম দৃশ্য কারাগারে নন্দকুমার ও রাধাচরণ। নন্দকুমার ফাঁসী মাপ হবার দরখাস্ত করতে রাজী নন। বড় জামাতা জগচ্চন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছেন বলে নন্দকুমার মর্মাহত। তিনি পুত্র গুরুদাসকে জানাতে বলছেন যে সমস্ত পরিবার নিয়ে সে যেন ভদ্রপুরে চলে যায়। রাধাচরণ জানালেন যে রাজা রামচাঁদের চেষ্টায় জেলের ভেতর আলাদা ঘর তৈরী হয়েছে। সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে রাজাকে থাকতে হয় নাই। তাই নন্দকুমার জল ও আহার গ্রহণ করেছেন। নন্দকুমার রাজা রামচাঁদকে গুরুদাসকে দেখবার অনুরোধ করছেন। তারপর শেরিফ ম্যাকরাবির প্রবেশ এবং রাজাকে শান্ত অবস্থায় দেখে ভূয়সী প্রশংসা। নন্দকুমার তাকে বলছেন যে তিনি তাঁর কর্তব্য বিনাদ্বিধায় করতে পারেন। তারপর তাঁর মারফৎ কর্ণেল মনসন ও ফ্রান্সিস সাহেবের কাছে খবর পাঠাচ্ছেন তাঁরা যেন পুত্র গুরুদাসকে একটু দেখেন। কারণ তাঁর অবর্তমানে গুরুদাসই ব্রাহ্মণ সমাজের মুখ্য হবেন। অবশেষে সহজভাবে এবং নির্ভীকভাবে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য শেরিফ নন্দকুমারকে প্রশংসা করলেন। তারপর তাঁকে ফাঁসীর মঞ্চের দিকে নিয়ে প্রস্থান করলেন। নবম এবং শেষ দৃশ্য মাত্র একপাতা। ফাঁসী কাঠে নন্দকুমার। বক্তৃতা দিচ্ছেন বাপুদেব শাস্ত্রী

'তোমার শব হিন্দুকে স্মরণ করিয়ে দিক ব্রাহ্মণ শক্তির অবসানে সকলবর্ণের শক্তিলোপ।' সুতরাং বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হলে আর্যজাতির উত্থান হওয়া অসম্ভব। ইত্যাদি। নাটকের শেষ বাক্য— 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'। এই বক্তৃতার পরেই নাটক সমাপ্ত হচ্ছে।

আলোচনা॥

এই অঙ্কে ১৭৭২ ও ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে হেস্টিংস দেশে ফিরে গেছেন এবং পুনর্বার গবর্ণর হয়ে ফিরে এসেছেন। নন্দকুমারের ১৭৬৫র বন্দীত্ব ১৭৬৬তেই শেষ হয়েছে। সেই বন্দীত্বর জের ১৭৭৪ পর্য্যন্ত টানার একমাত্র কারণ ইতিহাসকে প্রাপ্তগুপ্ত করা। বলাবাহুল্য ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমার সম্পূর্ণ মুক্ত পুরুষ। এই সময়ে তাঁর কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় প্রস্তাবনায় দেওয়া হয়েছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য হেস্টিংস দায়ী নন। বস্তুত তিনি মন্বন্তরের চার বৎসর আগে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। গবর্ণর হয়ে আসার তখন তিন বছর বাকি। সুতরাং নাট্যকার সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞান রহিত না হলে এইরূপ রচনা করতেন না। হেস্টিংসের সঙ্গে ফ্রান্সিস, ক্লেভারিং ও মনসনের বিরোধ সম্পর্কেও তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না কাজেই আবছা কথা ছাড়া স্পষ্ট করে কিছুই বলতে পারেন নাই। এমনকি ফ্রান্সিসকে কেন হেস্টিংস সমীহ করতেন তাও ক্ষীরোদপ্রসাদ জানতেন বলে মনে হয় না। বুলাকীদাসের খত সম্পর্কেও অত্যন্ত অস্পষ্ট খবর দেওয়া হয়েছে। মনে হয় মোহনপ্রসাদই বুঝি সই জাল করেছে। কিন্তু যদি জানান হত যে মোহনপ্রসাদ নামে উত্তরপ্রদেশের এক ব্যবসায়ী অভিযোগ এনেছেন যে নন্দকুমার বুলাকীদাসের সই জাল করেছেন অথবা সেই দলিল জাল জেনেও ব্যবহার করেছেন, সেটাকে আসল দলিল বলে চালাবার চেষ্টা করেছেন তাহলে গল্পটা একটু ভিন্ন গতিতে চলে। সেইটাই প্রধান জ্ঞাতব্য হল বিচারালয়ে যে রাজা জেনেশুনে জাল দলিল ব্যবহার করেছেন কিনা। নন্দকুমার নিজের দোষে কি ভাবে প্রায় জেতা মামলাকে নষ্ট করলেন প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে। কৃষ্ণজীবন দাসের মধ্যরাত্রের সাক্ষ্যে প্রমাণ হয়ে গেল যে নন্দকুমার দোষী। এই সাক্ষী নন্দকুমারের পক্ষের লোক। তাকে

পুনরায় সাক্ষ্য দিতে নন্দকুমার অনুরোধ করেন তার পক্ষের প্রধান ব্যারিষ্টার ফারার, যিনি ছিলেন তৎকালীন কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী, বাড়ী চলে যাবার পর। দ্বিতীয়বার সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কৃষ্ণজীবন দাস যা বললেন তা প্রথমবারের সঙ্গে মিলল না। জেরার মুখে নিজের প্রাণ বাঁচাতে স্বীকার করে বসলেন রাজা জালিয়াৎ। গভীর ক্ষোভে নন্দকুমারের পক্ষের ছোট ব্যারিষ্টার ব্রিকস্ পত্র লিখলেন ফারারকে তার বাড়ীতে। স্পষ্ট লিখলেন, রাজা নিজের একগুয়েমীতে এই দুর্দশা নিজের মাথায় টেনে নিলেন দ্বিতীয়বার কৃষ্ণজীবন দাসের সাক্ষ্য দাবী করে।

বুলাকীদাসের ঘটনার সঙ্গে মীরকাশিমের পুত্রের সমাধি মন্দিরের গল্প জুড়ে দর্শকদের ভোলাবার প্রচেষ্টা হয়েছে। ভুলে যাওয়া চলবে না যে এ গল্প সম্পূর্ণ মিথ্যা কারণ মীরকাশিমের দুই পুত্রই তখন তাঁর কাছে। এই সময় মীরকাশিম উত্তরে ভাবতে জীবিত। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর পুরাতন বন্ধু হেস্টিংসকে পত্র দিয়ে জানান যে তার নাম দিয়ে দিল্লীতে নানারকম ষড়যন্ত্র হচ্ছে যদিও সে সবের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নাই। হেস্টিংস যেন তাকে ভুল না বোঝেন।

এই জন্য মোহনপ্রসাদের সই জালের গল্প হাসির উদ্রেক করে। ক্ষীরোদপ্রসাদ আর লোক পেলেন না—লিখলেন মীরকাশিমের কথা যিনি তখন রাজপুতানায় অথবা নেপালে আর তারপরেই লিখলেন হেস্টিংসের বিবির কথা। এইখানেই ক্ষীরোদপ্রসাদ সব থেকে আমোদ দিয়েছেন কারণ এইসময় হেস্টিংসের কোন বিবি ছিল না। তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন আরো দুবছর পর ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। এর সঙ্গে তুল্যমূল্য রাধিকার সঙ্গে নন্দকুমারের প্রেমের উপন্যাস। নাটকে উল্লেখিত ঘটনার সময় নন্দকুমারের বয়স ষাটের ওপর। মৃত্যুর সময় তার বয়স উত্তর ৭০ বৎসর।

পঞ্চম দৃশ্য নিঃসন্দেহে ১১ মার্চ ১৭৭৫ এর ঘটনা। নাট্যকার কেবল যদি সেইটুকু পাঠ করে নাটক লিখতে বসতেন তাহলেও এই দৃশ্য শ্রীমণ্ডিত হতে পারত। কিন্তু 'আলিবাবা' রচয়িতা পাঠক বা দর্শককে কেবলমাত্র পিটুলী গোলা জল দুগ্ধ বলে দিতে উৎসাহী। মিথ্যার বেসাতিতে সত্যের কোন স্থান নাই। তাই এমন নাটকীয় কার্য্যাবলীর বিবরণী এবং নন্দকুমারের সত্যকার অভিযোগগুলি সম্পর্কে দর্শক কিছুই জানলেন না। নন্দকুমার

কাউন্সিলে বন্দী হন নাই। বরঞ্চ কাউন্সিলের এই সভার প্রায় দুই মাস পর ৬ই মে ১৭৭৫ সালে বন্দী হন। আগেও বলা হয়েছে নন্দকুমারের এই বিচারে হেস্টিংস বা তাঁর কোন কর্মচারীর যোগাযোগ থাকার কোন প্রমাণ নাই। বেভারিজ সাহেব এই অসম্ভব প্রমাণ করতে গিয়ে এক হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব করেছেন। নন্দকুমারের বড় জামাতা জগচ্চন্দ্র বা জগৎচাঁদ শ্বশুরের বিপক্ষে সাক্ষী দেন। দীর্ঘদিন মনে করা হত সেই কারণেই ফাঁসী হয়।

মণিবেগমকে নন্দকুমার পছন্দ করতেন না। হেস্টিংসের আপত্তি সত্ত্বেও নন্দকুমারকে গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পরে মণিবেগমকে নবাবের অভিভাবকের পদ থেকে সরিয়ে নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসকে সেই পদ দেওয়া হল। সুতরাং মণিবেগমের নন্দকুমারের প্রাণ বাঁচানর চেষ্টা এক অলীক কল্পনা মাত্র। উপরন্তু মণিবেগম হেস্টিংসের কাছে অভিযোগ করেন যে নন্দকুমার তাঁর নামে যে পত্র কাউন্সিলের সামনে দিয়েছেন তাতে যে সই আছে সেটা জাল, মণিবেগমের নয়। নাট্যকার নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে নাটকেই আনেন নাই। গুরুদাস তাঁর পিতাকে রক্ষা করার জন্য কলকাতার শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার ও এ্যাটর্নী দিয়েছেন, এমনকি বিলাতেও নন্দকুমারের আমমোক্তার ছিল। কিন্তু দোষ প্রমাণ হয়ে গেলে ফাঁসী রদ করার জন্য বা জনসাধারণের পক্ষ থেকে কাউন্সিলের কাছে দরখাস্ত পাঠাবার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। নন্দকুমারের মৃত্যুর পর তার বাড়ী থেকে যখন প্রচুর জাল শীলমোহর প্রকাশ পেল তখন গুরুদাস নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেগুলিকে নষ্ট করে ফেলেন। সন্দেহ হয় পিতার অপরাধ সম্পর্কে পুত্রের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। নাট্যকার সেটা বুঝেছেন বলেই গুরুদাসকে নাটকে আনতে পারেন নাই। গুরুদাস হেস্টিংসের সঙ্গে সখ্য বজায় রেখেছেন এবং নন্দকুমারের পুত্র বলে হেস্টিংস তাঁর প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করেন নাই। মনে রাখা কর্তব্য গুরুদাস কখন ব্রাহ্মণ সমাজের মুখ্য ছিলেন না। এই সম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। নাট্যকার গুরুদাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'নিজামতের দেওয়ানী' কথাটা এমনভাবে বলেছেন যে ফারসী না জানা দর্শক মনে করবেন সম্ভবত এটা কোন হেড কেরানীর কাজ। জানবেন না যে ওই শব্দের অর্থ 'নবাবের প্রধানমন্ত্রী'। এইভাবে ক্ষীরোদপ্রসাদ ক্রমান্বয়ে দর্শকদের সঙ্গে তঞ্চকতা করেছেন। ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ, ব্রাহ্মণের মৃত্যুতে

আর্যজাতির শক্তিলোপ প্রভৃতি গালভরা কথায় তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যেহেতু নন্দকুমার ব্রাহ্মণ সেই হেতু তাঁর মৃত্যুদণ্ড অন্যায়। বলাবাহুল্য এমন আইন বহুদিন উঠে গেছে যদিও নন্দকুমার জীবনে এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণত্বের সুযোগ নিতে কম চেষ্টা করেন নাই। স্বেচ্ছায় মিথ্যাচার ব্রাহ্মণের সদগুণের অঙ্গ নয় তাও নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ ভুলে গেছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ব্রাহ্মণত্বে যদি আত্মহারা না হতেন তাহলে এ নাটক লিখতেন না। মীরকাশিমে গিরিশচন্দ্র ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের যে কুটিল কুৎসিত রূপ দেখিয়েছেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই এই নাটক উৎপত্তির মূল কারণ তা না হলে এই কল্পনাভিত্তিক বিভ্রম সৃষ্টিকারী অষ্টাদশ শতাব্দীর এক আলিবাবার গল্প দর্শক সমক্ষে উপস্থিত করার আর কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আরেকখানি নাটক 'মহারাজ নন্দকুমার' নামে রচিত হল। এই নাটকে আর এক প্রস্থ কল্পনা বিলাসের পরাকাষ্ঠা দেখান হল। মিথ্যার মোহমুদ্গরের চাপে কে কার বন্ধু আর কে কার শত্রু কোন বিবেচনা থাকল না। নন্দকুমার সহসা মীরকাশিমের পরম বন্ধু রূপে দেখা দিলেন। যে লুৎফউন্নিসা জীবনে কখনও মীরকাশিমের নামও সহ্য করতে পারতেন না তাঁকে মুর্শিদাবাদে পাওয়া গেল বালিকাকন্যা সহ। ভ্যান্সিটার্ট আর হেস্টিংস দুই দানবের মতো দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগলেন। বাংলার সব দুরবস্থার জন্য তাদের দায়ী করা হল। রাষ্ট্র বিবর্তনে যে তিন বাঙালী কীর্তি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তাদের হেস্টিংসের তিনটি পোষা হনুমানের মতো লম্ফঝম্ফ করান হল। দুঃখের বিষয় এই ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত, সাংস্কৃতিকে দূষিত করা অশ্লীল নাটক সম্পর্কে প্রতিবাদ হওয়া দূরে থাক তাকেই সত্য ইতিহাস মনে করে ভাবালুতার জোয়ার বয়ে গেল। একাধিক নাটক এই ছায়াতে রচিত হল। এমনকি নন্দকুমারের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি তৈরী করে জনগণের সম্মুখে স্থাপনার প্রস্তাব হল। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বহু ইতিহাসের বইএর নাম ছেপে যে নাটক লিখলেন তাতে জনসাধারণকে ধোঁকা দিলেও, ইতিহাসের পরীক্ষায় পাশ করা যায় না। প্রথম অভিনয় রজনী ষ্টার থিয়েটার ৪ঠা জুন ১৯৪৩।

মহেন্দ্র গুপ্ত : মহারাজ নন্দকুমার

মহেন্দনাথ গুপ্ত রচিত 'মহারাজ নন্দকুমার' তিন অঙ্কের নাটক। প্রথম অঙ্ক ১ থেকে ৩৩ পাতা, দ্বিতীয় অঙ্ক ৩৪ থেকে ৬১ পাতা ও তৃতীয় অঙ্ক ৬৩ থেকে ৮৬ পাতা। প্রতি অঙ্কে তিনটি করে দৃশ্য। মোট পাতা সংখ্যা ৮৬। পূর্বাভাষে নাট্যকার এক ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন বলে দাবী করেছেন এবং মেকলের প্রবন্ধ, কলিকাতার কথা, বার্কের বক্তৃতা, ইমপিচমেণ্ট অফ ওয়ারেন হেস্টিংস, বেভারিজের ও বোল্টের পুস্তক ৬টি এবং নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনী হতে তথ্য সংকলন করেছেন জানিয়েছেন। নাট্যকার 'ইমপিচমেণ্ট' সম্পর্কে কোন পুস্তক যে পাঠ করেন নাই নাটকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বেভারিজ ও বোল্টস নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন, বার্কের বক্তৃতা ও মেকলের প্রবন্ধ তাঁদের নিজস্ব মতামতের প্রকাশ, ঘটনা জানবার উপায় নয়। 'কলকাতার কথা' একটি নিকৃষ্ট সংকলন। নাট্যকারের ইতিহাস জ্ঞান প্রমাণিত হয় যখন তার 'পূর্বাভাষে' দেখা যায় লিখেছেন 'ইংলণ্ডেশ্বরের অভিমত না আশা পর্য্যন্ত মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসী স্থগিত রাখিবার আবেদন করা হইল, বিচারপতি সে আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন' এমন পরিপূর্ণ মিথ্যা লেখার যার সাহস তার পক্ষে কোন কর্মই বিচিত্র নয়।

বালকোচিত চাপল্যে তিনি প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে লিখলেন 'মনসুর গঞ্জ প্রাসাদের দরবার কক্ষ। নবাব সিরাজদ্দৌলার মর্মর মূর্তি। কণ্ঠে তার পুষ্পমাল্য পদতলে মহারাজ নন্দকুমার।' এই দুই লাইনের সবই মিথ্যা। মনসুরগঞ্জে কোন প্রাসাদ নাই তার দরবার কক্ষ দূরের কথা। সিরাজদ্দৌলার মর্মর মূর্তি ছিল না—কারণ এই বিদেশী শিল্প ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে আনেন। পুষ্পমাল্য অসম্ভব কারণ মীরকাশিমের আমলে সিরাজদ্দৌলাকে সম্মান জানাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না কেননা মীরকাশিম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বন্ধু হিসেবেই সুবাদারী পেয়েছিলেন। নন্দকুমারও মীরকাশিমের প্রাসাদে অসম্ভব। কারণ উভয়ের মধ্যে অহিনকুলের সম্পর্ক ছিল। তাছাড়া কোথায় তখন রাজা নন্দকুমার খোঁজ নেওয়া যাক। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ মীরজাফরের গদী যাবার অব্যবহিত পরে তিনি ইংরেজ কোম্পানীর হাতে বন্দী। তারপর কলকাতায় বসে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রে মগ্ন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল কুটের দেওয়ান হয়ে পাটনায়। সেখানকার

মীরকাশিমের লাঞ্ছনা নন্দকুমারের মস্তিষ্ক প্রসূত। তারপর করলেন নিজের চাকরীর উমেদারী। হুগলীর ফৌজদারী পেলে তিনি মীরকাশিমের বিরুদ্ধাচরণ আর করবেন না একথা স্বীকার করলেও মীরকাশিম কিছুতেই তাকে ওই পদ দিতে রাজী হন নাই। ১৭৬৩ র মার্চ মাসের মধ্যেই নন্দকুমার হাবুজখানায়। সেখান থেকে তাঁকে মুক্ত করলেন তাঁর প্রাণের বন্ধু মীরজাফর ৬ই জুলাই। সুতরাং এর মধ্যে মীরকাশিমের প্রাসাদে গিয়ে, সিরাজদ্দৌলার মর্মর মূর্তিতে (তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম 'ছেলো'।) মালা চড়িয়ে তার পদতলে কখন বসলেন তা যদি মাননীয় নাট্যকার বাতলে দিতে পারেন, তাহলে অন্য কারু কোন উপকার হোক কি না হোক নাট্যকার মহাশয়কে দেবার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইতিহাস নামক বস্তুটি নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে। এই প্রস্তাবনার পরই এই নাটক সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ করা যেত। কিন্তু যেহেতু তাতে মনে হতে পারে যে নাটক আলোচনায় ফাঁকি দেবার চেষ্টা হচ্ছে সেজন্য এই অতি অসভ্য শিল্পকর্মকে যথারীতি বিচার করা হবে।

সব থেকে আশ্চর্য্যের কথা যে এই নাট্যকার, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাঙ্গেয়াপ্ত' নাটকটি ভাল করে পাঠ করেছেন এবং সেখান থেকে নিজের সুবিধামতো বস্তুগুলি আহরণ করেছেন। যেমন বুলাকীদাসের দলিল। কোথাও সত্য ঘটনা না বলে দুইজন নাট্যকারই 'গুরু ভগ্নির গচ্ছিত অর্থ' বলে মিথ্যার চাষ করে গেছেন। নন্দকুমার, নবাব মীরজাফরের সঙ্গে দুই-বারই যে মন্ত্রীত্ব করেছেন এবং তাঁর সব থেকে অন্তরঙ্গ রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন একথা লিখতে দুজনার কলমই কাটকে গেছে।

প্রথম অঙ্ক ॥

এবারে নাটকের আলোচনা। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে নাট্যকার দেখাচ্ছেন যে সিরাজ মহিষী লুৎফা মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে সিরাজদ্দৌলার দুঃখজনক ইতিহাস দর্শককে শোনাচ্ছেন। তারপর নন্দকুমার প্রবেশ করে বলছেন যে তিনি তাঁর গোলাম নন্দকুমার। তারপর ইংরেজ বাদ্য শুনে লুৎফা হুকুম করলেন যে নন্দকুমার সিরাজের মর্মর মূর্তির সম্মান রক্ষার জন্য সেটিকে যেন স্থানান্তরে নিয়ে যান। নন্দকুমার তাই করলেন। ভ্যান্সিটার্ট

ও ওয়ারেন হেস্টিংস প্রবেশ করে জানালেন যে তাঁরা বেগম সাহেবার কন্যা উম্মৎ জহরৎকে নিয়ে এসেছেন। উম্মৎ জহরৎ ও লুৎফার মিলনে সাহেবরা 'Heavenly sight' দেখে তৃপ্ত হলেন। বেগম জানালেন যে তিনি ওয়াটস্ সাহেবের পত্নী পুত্র কন্যাদের ৩৭ দিন নবাব জননীর মহলে আশ্রয় দিয়েছিলেন। নূতন সাহেবদের পরিচয় পেয়ে তিনি হেস্টিংসকে জিজ্ঞাসা করছেন 'অবরুদ্ধ কাশিমবাজার কুঠী হতে পালিয়ে তুমিই নবাবের ভয়ে কান্তমুদীর কাছে আশ্রয় নিয়েছিলে না? তোমাকেই বুঝি কান্তমুদী পান্তা ভাত আর চিংড়ি মাছ খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল?' তার উত্তরে হেস্টিংস জানাচ্ছেন: 'সে সময় কাণ্ট হামার বহুট উপকার করিয়েছিল তাই কাশীমবাজারে জায়গীর পাইল।' তারপর হেস্টিংস জানাচ্ছেন যে লুৎফা প্রতি মাসে ৩০৫ তঙ্কা এবং তার কন্যা ১০০ তঙ্কা করে বৃত্তি পাবেন। নবাবের ধনাগার লুণ্ঠন করে পলাশীর পর কে কতো অর্থ লাভ করেছে তার হিসাব দিয়ে লুৎফা অতি অল্প অর্থ তাঁর মাসিক বরাদ্দ করার জন্য সাহেবদের শ্লেষ করলেন। এমন সময় উম্মৎ জহরৎ মসনদে বসতে চাইলেন। সাহেবদের হাত ধরে মসনদে উঠতে গিয়ে পড়ে গিয়ে কপাল কেটে রক্তপাত হল। তখন জগৎশেঠ, স্বরূপচাঁদ ও রায়দুর্লভ প্রবেশ করছেন। তাঁরা জানালেন যে সিরাজ চপলমতি ছিল সত্য কিন্তু মীরকাশিম দুরাত্মা কারণ তাদের হিরাঝিলে বন্দী করে রেখেছেন। তাঁরা জানালেন যে মীরকাশিমকে নবাবী দেওয়া ঠিক নয় নাই। এমন সময় 'অতর্কিতে মার্কার, গুর্গিণ, সমরু প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষসহ নবাব মীরকাশিমের প্রবেশ।' মীরকাশিম স্বকর্ণে শুনলেন যে জগৎশেঠ প্রভৃতি তাঁকে সরিয়ে মীরজাফরকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। তখন আর কালক্ষেপ না করে তাদের বন্দী করলেন। হেস্টিংস বাধা দেবার চেষ্টা করে অসফল হলেন। ভ্যান্সিটার্ট জানালেন 'মানী লোকেদের বন্দী করায় সন্ধি ভগ্ন হইল।' মীরকাশিম জানাচ্ছেন বিনা শুল্কে ব্যবসা চালিয়ে কোম্পানী আগেই সন্ধি ভঙ্গ করেছেন। তাই তিনি দেশের ব্যবসায়ীদেরও বিনাশুল্কে ব্যবসা করার অধিকার দিয়েছেন। হেস্টিংস চোখ গরম করে বলছেন যে এভাবে চললে তাকে মসনদচ্যুত করা হবে। মীরকাশিম তাতে গলাচড়িয়ে পলাশীর পর কি ভাবে প্রথমে মীরজাফর ও পরে তিনি চড়াদামে মসনদ নিলামে ডেকে নিয়েছেন তার হিসেব দিচ্ছেন। হেস্টিংস আবার শাসাচ্ছেন যে

তাহলে লড়াই হবে। মীরকাশিম বুক ফুলিয়ে শোনাচ্ছেন লড়াইকে তিনি ভয় করেন না। তিনি আরও জানালেন যে কোম্পানী যাতে বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্য না পায় তাই তিনি জগৎশেঠ, স্বরূপচাঁদ ও রায়দুর্লভ প্রভৃতিকে পূর্বাহ্নে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন মুঙ্গের দুর্গে। আরো জানালেন অমিয়েট ও হে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে মঙ্গেরে উপস্থিত, অন্যদিকে পাটনায় এলিস সাহেব কলকাতা থেকে নিয়মিত গোলাবারুদ পাচ্ছেন। নবাবের প্রস্থানের পর উত্তেজিত হেস্টিংস জানাচ্ছেন 'The Council must dethrone Mirkasim !' প্রবেশ করছেন মীরজাফর ও মণিবেগম। তাদের জানান হল যে 'মসনদ' আবার নিলাম হবে। মণিবেগম 'যত টাকা লাগে' তিনি দেবেন বলায় স্থির হল যে মীরকাশিমকে সরিয়ে পুনরায় মীরজাফরকে নবাবী দেওয়া হবে। ভ্যান্সিট্টার্ট অমনি ঝট করে শপথ করে ফেললেন যে মীরজাফর পুনরায় বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবী পাবেন।

দ্বিতীয় দৃশ্যে নন্দকুমারের গৃহে, কলকাতায় নন্দকুমার স্ত্রী ক্ষমাদেবীকে জানাচ্ছেন যে মীরকাশিম রাজ্যচ্যুত হয়েছেন এবং মীরজাফর মসনদে বসেছেন। মুর্শিদাবাদ ইংরেজ দখলে। কাটোয়ার যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হয়েছেন। নন্দকুমার, নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে দেখা করতে চলেছেন কারণ 'বুলাকী দাস শেঠ' তাঁর বাল্যবন্ধু তাকে বলে গেছেন যে তিনি যেন মীরকাশিমকে বেইমানদের হাত থেকে রক্ষা করেন। নন্দকুমার জানাচ্ছেন যে মুর্শিদাবাদ অধিকারের সময় ইংরেজ সৈন্যরা বুলাকীদাসের সমস্ত ধনসম্পত্তি লুঠ করেছে। সেই সঙ্গে লুঠ হয়েছে অর্থ ও অলঙ্কার যা নন্দকুমার তাঁর গুরুপত্নী ও গুরুকন্যাদের প্রণামী বাবদ তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। সর্বস্বহারা বুলাকীদাস তাই একটা দলিল লিখে দিয়ে গেছেন যে ক্ষতিপূরণ বাবদ ইংরেজ কোম্পানীর কাছে তার যে দুলক্ষ টাকা পাওনা আছে সেই টাকা নন্দকুমার যেন আদায় করে গুরুপত্নীর জন্য গচ্ছিত অর্থ শোধ করে নেন। গুরুকন্যার অকালবৈধব্যে গভীর শোক প্রকাশ করে নন্দকুমার এই দলিলখানি স্ত্রীর কাছে রাখতে দিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী অন্যমনস্কভাবে এই দলিলখানা দিয়ে তাঁর কপালের সিঁদুর মুছে ফেললেন। তারপর রেগে দলিল ছিঁড়তে চাইলেন। নন্দকুমার বাধা দিয়ে বললেন যে দলিল ছিঁড়লে ব্রহ্মস্ব অপহরণ করা হবে। নন্দকুমারের স্ত্রীর মনে হল ফাঁসীর দড়ি কে তার গলায়

আটকে দিয়েছে। গুরুদাস এসে জানালেন যে নবাব মীরজাফরের একান্ত ইচ্ছা যে তিনি তার দেওয়ানী গ্রহণ করুণ। তাব উত্তরে তিনি কিছু ইতিহাস শোন চ্ছেন। বলছেন যে বৰ্দ্ধমান নদীযা প্রভৃতি স্থানের রাজস্ব আদায় নিযে ওযারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁব তুমুল কলহ হয়েছে—তদবধি হেস্টিংস তাঁব শত্রু। তাছাড়া ফবাসী ল সাহেব ও শাহাজাদা আলী গওহবেব সঙ্গে ষডযন্ত্র করায় তাঁকে নজরবন্দী থাকতে হয়েছিল। নন্দকুমার অবশেষে মীরজাফরের দেওয়ানী করতে রাজী হলেন। কিন্তু তাব আগে মীরকাশেমের খোঁজ নিতে তিনি চললেন মুঙ্গেব।

তৃতীয দৃশ্যে মুঙ্গের দুর্গে জগৎশেঠ প্রমুখ, জনৈক বেতন ভোগী ইংরেজ সৈন্যকে উদয়নালাব গুপ্তপথ কোম্পানীকে জানাবার জন্য প্ররোচিত করছেন। জানাচ্ছেন যে এই গুপ্তপথ দিয়ে এসে রাত্রিকালে আক্রমণ করাই শ্রেয়। অবশেষে নিত্য গঙ্গাস্নানের জন্য নবাব তাঁদের যে পাঞ্জা দিযেছেন সেটি ইংরেজ সৈন্যকে দিয়ে তাকে দুর্গের বাইরে পলায়ন করার সুযোগ করে দিচ্ছেন। মীবকাশিম রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে আসছেন তাবপর বক্তৃতা কবে শোনাচ্ছেন যে কাটোযার পর গিরিযাতে তার পরাজয হযেছে কেবল সৈন্যাধ্যক্ষদের বেহমানীর জন্য। রায়দুর্লভ জানাচ্ছেন যে উদযনালায় কেউ বিশ্বাসঘাতকতা কববে না। জগৎশেঠ তাঁর বাজেয়াপ্ত ধনভাণ্ডারের কথা জানতে চাইলে নবাব দেখাচ্ছেন যে জগৎশেঠের শ্রেষ্ঠরত্নগুলি তিনি মালা করে গলায় পরেছেন। তারপর জানাচ্ছেন যে এই বহুমূল্য মণিমুক্তার থেকেও তাঁর কাছে অমূল্য হবে দেশের মাটি আর স্বাধীন বাংলার পথের ধুলো! বললেন উদযনালায জয হলে তবেই তাঁরা মুক্তি পাবেন। নন্দকুমার এসে জানালেন যে জগৎশেঠেব প্রদত্ত পাঞ্জায যে ইংরেজ গোলন্দাজ মুঙ্গের দুর্গ থেকে বাইবে পালিয়েছে সেই কোম্পানীর ফৌজকে উদয়নালা ঝিলের গুপ্ত পথে নিযে এসেছে। নন্দকুমার উদয়নালার পরাজয় সংবাদ দিলেন। জগৎশেঠরা মনে করলেন যে নন্দকুমার বুঝি মীরজাফরের পক্ষে মীরকাশিমকে বন্দী করতে এসেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সাহায্য করতে রাজী হলেন। তখন নন্দকুমার তাঁদের দেশদ্রোহী হলে তার ফল কি কুৎসিৎ হতে পারে সে বিষয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। কিন্তু তাতেও জগৎশেঠ প্রমুখ টললেন না। উপরন্তু তাঁরা নিজেরাই মীরকাশিমের সঙ্গে নন্দকুমারকে বন্দী করার জন্য

বদ্ধ পরিকর হলেন। এমন সময় মীরকাশিম পুনরায় প্রবেশ করলে নন্দকুমার তাঁকে অযোধ্যা পালিয়ে যাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। তারপর মীরকাশিম নন্দকুমারের দেশভক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তার গলায় অমূল্য মণিমাণিক্যের মালা পরিয়ে দিলেন। নানা বক্তৃতার পর জানালেন যে তাঁর আলো নিভে গেছে কিন্তু জ্বলে উঠেছে নন্দকুমারের আলো। দেশভক্তিতে নন্দকুমারই মীরকাশিমের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তারপর একান্ত নাটকীয়ভাবে উদয়নালায় কি ভাবে পরাজয় হল শুনলেন তারপর ঘূর্ণায়মান গঙ্গা প্রবাহের কাল গহ্বরে জগৎশেঠ প্রমুখদের নিক্ষেপ করতে আদেশ দিলেন। বিশ্বাসঘাতকরা বধ হলেন। শেষ হল প্রথম অঙ্কের নাটক।

আলোচনা॥

এই অঙ্কের প্রতিছত্র মিথ্যা এবং ভুল। নাট্যকার ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নাম দিয়ে এক আষাঢে গল্প রচনা করেছেন যার সঙ্গে ইতিহাসের মিল নাই। দর্শকের সঙ্গে পুরোপুরি প্রবঞ্চনা করেছেন বলে নাট্যকারকে দায়ী করা চলতে পারে। দুঃখের বিষয় ঐতিহাসিক সত্যকে ভঙ্গ করার কোন শাস্তি আমাদের দেশে রচিত হয় নাই বলেই এই নাটকের নাট্যকার বিনা দ্বিধায় তঞ্চকতা করার সুযোগ পেয়েছেন।

প্রথম থেকেই তিনি কিভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন দেখা যাক। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জগৎশেঠ প্রভৃতির গ্রেপ্তার এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে কাটোয়া ও শেষদৃশ্যে উধুয়ানালার যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সময়সীমা এই অঙ্কে পাটনায় এলিসের যুদ্ধ সজ্জা থেকে জগৎশেঠ প্রমখের হত্যার মধ্যেকার ঘটনায় বদ্ধ করা হলে দাঁড়াবে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। এই সময় সিরাজ-সঙ্গিনী লুৎফউন্নিসা (লুৎফা নয়) ঢাকায় কন্যাসহ অবস্থান করছেন। এখানেই তিনি কন্যার বিবাহ দিয়ে তাঁর সন্তানদের লালন পালন করেন (সিরাজদ্দৌলা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কন্যা উম্মৎ সায়রা বেগম সহ লুৎফউন্নিসা ১৭৫৮ থেকে ঢাকার অধিবাসী। তিনি বাংলায় ফিরে আসেন অনেক পরে। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে বা তার দুই এক বছর আগে। লুৎফউন্নিসা সম্পর্কীয় সব ঘটনাই কেবল বিভ্রম সৃষ্টির জন্য। মাসোহারা সম্পর্কেও ভুল খবর দেওয়া হয়েছে। ঢাকায় যাবার পর

থেকে কন্যাসহ লুৎফউন্নিসা মাসোহারা পেয়েছেন অনূ্যন একহাজার ছ'শো টাকা। এইখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে সিরাজ-মহিষী ওমদাৎ উন্নিসা মাসোহারা পেয়েছেন একহাজার টাকা।

ভ্যান্সিট্টার্ট এবং হেস্টিংস মীরকাশিমের সঙ্গে দেখা করতে মুঙ্গেরে উপনীত হন ৩০ নভেম্বর ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এঁরা উভয়েই মীরকাশিমের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু সন্ধির সর্ত যখন কাউন্সিল নাকচ করে দিল তখন ভ্যান্সিট্টার্ট ও হেস্টিংসকে 'নবাবের দালাল' আখ্যা পেতে হয়। হেংস্টিসের সঙ্গে ব্যাটসনের প্রকাশ্য কাউন্সিলেই বিতণ্ডা হয় এবং হেস্টিংসকে ব্যাটসন চপেটাঘাত করেন। নাট্যকার এইসব ঐতিহাসিক গোলমালের মধ্যে না থেকে সোজাসুজি হেস্টিংসকে দিয়েই নবাবকে শাসাতে শুরু করেছেন।

নন্দকুমার হলেন মীরজাফরের বন্ধু তাই সিরাজ পক্ষীয় বা মীরকাশিম পক্ষীয়দের তিনি ছিলেন শত্রু। মীরকাশিমকে গদীচ্যুত করবার জন্য নন্দকুমার সর্বদাই সক্রিয় ছিলেন। সুতরাং লুৎফউন্নিসার সঙ্গে নন্দকুমারের কথোপকথন প্রক্ষিপ্ত এবং অসম্ভব। নন্দকুমারের পক্ষে এই সময় মুর্শিদাবাদে উপস্থিতি অসম্ভব কারণ আগেই বলা হয়েছে।

হেস্টিংস ও ভ্যান্সিট্টার্টের পক্ষেও এই সময় লুৎফউন্নিসার সঙ্গে আলোচনা অসম্ভব কারণ তখন তাঁরা মুঙ্গেরে নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে আলোচনারত। এই আলোচনার পরই মীরকাশিম বিনাশুল্কে কোম্পানীর কর্মচারীদের বেআইনী ব্যবসা বন্ধ করার আশ্বাস পান ও ব্যবস্থা করেন।

মীরকাশিমের সময় জগৎশেঠদের বিশ্বাসঘাতকতার কোন পরিচয় নাই। ১৭৬৩র এপ্রিলে মহম্মদ তকি খাঁ তাঁদের গ্রেপ্তার করেন। কয়েক মাস পরে নবাবের আদেশে তাদের বধ করা হয়। অবশ্য এই দলে মহারাজা রায়দুর্লভ ছিলেন না। তাঁর মৃত্যু হয় রোগশয্যায় অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দশকে। মীরজাফর পুনরায় সুবাদারী পাবার জন্য কি করেছিলেন মীরকাশিম প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এখানে পুনরুল্লেখ নিঃপ্রয়োজন।

দ্বিতীয় দৃশ্যে নন্দকুমার কাটোয়া যুদ্ধের কথা শোনাচ্ছেন। তিনি তখন মীরজাফরের দেওয়ান। কারণ মীরজাফর নবাব হলেন ৩রা জুলাই, ১০ জুলাই চুক্তি স্বাক্ষর হল আর ১৯শে জুলাই কাটোয়ার যুদ্ধ। বুলাকীদাসকে নিয়ে মিথ্যার জাল বোনা হয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদকে অনুকরণ করে গুরুভক্তির

গাচ্ছত অর্থের গল্প শোনান হয়েছে। তারপর সেই দপ্তর দিয়ে সিঁদুর মোছা এবং ফাঁসীর কথা শোনান নেহাতই ছেলেমানুষী পরিকল্পনা। নন্দকুমারের মুঙ্গের যাত্রাও এই রকমের আর এক মিথ্যা। ক্ষীরোদপ্রসাদ অন্তত মীরকাশিমের সঙ্গে নন্দকুমারের শত্রুতা বজায় রেখেছেন কিন্তু এই নাটকে সত্যকে উপেক্ষা করে নন্দকুমার হয়েছেন মীরকাশিমের পরমমিত্র।

তৃতীয় দৃশ্য একান্ত হাস্যকর। কোথায় মুঙ্গের আর কোথায় উধুয়ানালা। দু'টি জায়গার মধ্যে কমপক্ষে ষাট মাইল ব্যবধান। নাটক দেখলে সন্দেহ হবে যে উধুয়ানালা বুঝি মুঙ্গেরের বৈঠকখানা। এই নাটকে খোজা পিত্রুর কোন ভূমিকা নাই। সবটাই জগৎশেঠদের কারসাজি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার তা না হলে বিনা কারণে জগৎশেঠ প্রমুখদের হত্যা করার কোন সঙ্গতি দেওয়া যায় না। দৃশ্যটিতে অতি নাটকীয় মিথ্যার বাহুল্য। নন্দকুমার কখনও এই সময় মুঙ্গেরে বা মীরকাশিমের সঙ্গে দেখা করতে যান নাই। রায়দুর্লভও মীরকাশিম কতৃক নিহত হন নাই। বলাবাহুল্য দৃশ্যে বর্ণিত ঘটনা প্রক্ষিপ্ত ও অনৈতিহাসিক। আবার মনে রাখতে হবে সিরাজদ্দৌলার মতো মীরকাশিমও বাঙালী ছিলেন না। ব্যক্তিগত স্বার্থছাড়া কোন স্বাদেশিকতার পরিচয় তার মধ্যে পাওয়া যায় না।

এই অঙ্কে নাট্যকার আরো অনেক মিথ্যা শুনিয়েছেন। সুবিখ্যাত কান্তবাবু তার লেখনীতে কেন যে 'কান্তমুদী' রূপে বর্ণিত হলেন তা বোঝা যায় না। আগেই বলা হয়েছে হেস্টিংসের কান্তবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ প্রচলিত গল্পমাত্র। তাঁকে আশ্রয় দেবার জন্য কান্তবাবু কোন জায়গীর পান নাই। বস্তুত এই সময় কান্তবাবু জায়গীর পাওয়া মিথ্যা কথা। যেমন মিথ্যা 'পান্তা ভাত ও চিংড়ি মাছ' খাবার গল্প। কান্তবাবু ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল হিন্দু বৈষ্ণব এবং তৎকালীন নিয়মানুসারে সম্পূর্ণ নিরামিষাশী। হেস্টিংস বন্দী হলে কান্তবাবু অর্থ দিয়ে তাঁকে জামিনে খালাস করেন। হেস্টিংস তারপর দীর্ঘদিন ইংরেজ কুঠিতেই ছিলেন। ফরাসীদের সঙ্গে এবং আলি গওহরের সঙ্গে নন্দকুমারের পত্রালাপকেও যেভাবে প্রকাশ করা হয়েছে তা মিথ্যা। মীরকাশিমের নামাঙ্কিত পাঞ্জা নিয়েও এক অদ্ভুত গল্প সৃষ্টি করা হয়েছে দর্শক-দের বিভ্রান্ত করবার জন্য। উধুয়ানালায় মীরকাশিমের পরাজয় নাটকীয় ঘটনা। কিন্তু কেন মীরকাশিমের আর্মানী ও ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষগণ বিনাযুদ্ধে পলায়ন

করলেন তা বোঝবার বা বোঝাবার ক্ষমতা নাট্যকারের আছে বলে মনে হয় না।

সুতরাং প্রথম অঙ্কের মিথ্যার হিসাব এই রকম হবে :—

১। লুৎফউন্নিসা সিরাজের মহিষী নন। তিনি নাটকের উল্লেখিত সময়ে মুর্শিদাবাদে ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে ভ্যান্সিট্টার্ট বা হেস্টিংসের কখন দেখা হয় নাই। নন্দকুমারের সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপের কোন প্রমাণ নাই। নন্দকুমার পরোক্ষে নবাব মীরজাফরের দেওয়ান হিসাবে তাঁর সঙ্গে শত্রুতাই করেছেন মীরণের সিরাজ সঙ্গিনীকে কেনবার ইচ্ছায় বাধা দেন নাই। বরঞ্চ কোষাগার থেকে অর্থ পাওয়া যাবে জানিয়েছেন। মীরণ অবশ্য সেই অর্থে লুৎফউন্নিসাকে লাভ করতে না পেরে 'একঝুড়ি' স্ত্রীলোক ক্রয় করে ভোগের নদীতে নিমজ্জমান হয়েছেন। ২। ভ্যান্সিট্টার্ট এবং হেস্টিংস মীরজাফরের রাজ্যচ্যুতির পর থেকেই মীরকাশিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন। তাঁরা ১৭৬৫ তে কোম্পানীর কাজে ইস্তফা দেওয়া পর্য্যন্ত সে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় নাই। ৩। মীরজাফর বা মণিবেগম চুক্তি করতে মুর্শিদাবাদে আসেন নাই। এই চুক্তি হয় কলকাতায় যার প্রথম ও প্রধান সর্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় বারের নবাবীতেও নন্দকুমার মীরজাফরের দেওয়ান হলেন। ৪। মীরকাশিম প্রবন্ধে মীরকাশিম সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। নন্দকুমার ছিলেন মীরকাশিমের শত্রু পক্ষীয় সুতরাং তাকে বিশ্বাস করার কোন প্রশ্ন নাই। সন্দেহ থাকে না যে হাতের মুঠোয় পেলে নন্দকুমারেরও সলিল সমাধি তৈরী করতে মীরকাশিম দ্বিধা করতেন না। মীরকাশিম বাঙালী ছিলেন না, ছিলেন পারশ্যবাসী। সুতরাং 'স্বাধীন বাংলার পথের ধূলো' সংলাপ একান্ত নাটকীয় এবং অবাস্তব।

দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

প্রথম দৃশ্যে সিরাজের কবরখোসবাগে নন্দকুমার ও মণিবেগম আলাপরত। মণিবেগম জানাচ্ছেন যে মীরজাফর, নাজামাদ্দৌলা, এবং সৈফুদ্দৌলা গত হয়েছেন। এখন নবাব মীরজাফরের আর এক নাবালকপুত্র মোবারেকউদ্দৌলা এবং তিনি তার অভিভাবক। নন্দকুমার শোনাচ্ছেন যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সমস্ত বাংলাকে শ্মশান করে দিয়ে গিয়েছে। মন্বন্তরের জন্য দায়ী দেওয়ান

রেজা খাঁ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে অনুপ্রাণিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী-গণ। মণিবেগম জানাচ্ছেন যে তিনি দেড় লক্ষ টাকা হেস্টিংসকে উৎকোচ দিয়েছেন অভিভাবিকা হবার জন্য। নন্দকুমার শোনাচ্ছেন যে তাঁর পুত্র গুরুদাসকেও মোবারেকউদ্দৌলার গৃহকার্য্যের দেওয়ানী পাবার জন্য প্রচুর উৎকোচ দিতে হয়েছে হেস্টিংসকে। বলছেন যে তিনি যদি হেস্টিংসকে রেজা খাঁর থেকেও বেশী অর্থ দিতে পারতেন তাহলে রেজা খাঁর বদলে দেওয়ানী তাঁরই হত। তারপর শোনাচ্ছেন যে যেমন করেই হোক কোম্পানীর দেওয়ানী তাকে পেতেই হবে। তিনি আরো জানাচ্ছেন যে বাংলার অনুকম্পা, ভিখারিনী লুৎফা এবং তার কন্যাকে ঘিরে রয়েছে। তাঁর ইচ্ছা যে মোবারেকউদ্দৌলার সঙ্গে সিরাজ দুহিতার বিবাহ দিয়ে তিনি স্বাধীন বাংলার গৌরব পতাকা আবার উড্ডীন করবেন। এমন সময় কবরে ফুল দিতে দিতে গান গাইতে গাইতে লুৎফার প্রবেশ। তিনি এসেই চিনলেন যে এই ব্রাহ্মণই সিরাজের মর্মরমূর্তি তৈরী করিয়েছেন। লুৎফা শোনালেন যে কবি রাম প্রসাদের সঙ্গে সিরাজের সাক্ষাতের কাহিনী। জানালেন যে সিরাজের মর্মর-মূর্তি তিনি 'মা-গঙ্গা'র কোলে ডুবিয়ে দিয়েছেন। তারপর তিনি মণিবেগমকেও চিনতে পারলেন। বললেন সে ছিল একদশ হাজার তঙ্কার বাঈজী, আদিবাস দিল্লী অথবা সেকেন্দ্রা। মণিবেগম বিবাহের প্রস্তাব করলেন। লুৎফা রেগে বললেন যে তাঁর এই বিবাহে মত নাই। তারপর সিরাজ কন্যা উম্মৎ জহরতের সঙ্গে নাবালক নবাবের খেলা এবং নাবালক নবাবকে তার প্রত্যাখান দেখান হয়েছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে কলকাতায় নন্দকুমারের বাড়ীতে নন্দকুমার স্ত্রীকে শোনাচ্ছেন যে রাণী ভবানীর বাহারবন্দ পরগণা হেস্টিংস তার মুন্সী কান্তমুদীর ছেলে লোকনাথ মুদীকে দিয়েছেন। জানাচ্ছেন যে জোর করে প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে। গুরুদাসকে বলান হয়েছে যে হেস্টিংস বলেছেন যে রাণী ভবানী স্ত্রীলোক বলে তাঁর হাত থেকে জমিদারী কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আরো বলছেন যে বিলাতের পরিচালক সমিতির হুকুম হয়েছে রেজা খাঁকে গ্রেপ্তার করবার। তাঁরা নাকি আরো বলেছেন যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে দেওয়ানী দিতে এবং নন্দকুমারের থেকে যোগ্যতম ব্যক্তি আর কে আছে। গুরুদাস আশা করছেন যে তাঁর পিতার দেওয়ানী পাবার

সঙ্গে সঙ্গে বাংলার দুঃখী প্রজাদের মুখে হাসি ফুটবে। তারপরই এসেছে বুলাকীদাস শেঠের দলিলের কাহিনী এবং আবার সেই গুরুকন্যার গল্প। তারপর গুরুদাস বলছেন 'কোম্পানী বুলাকীদাসের হয়ে আমাদের টাকা শোধ করে দিয়েছে এবং দলিল ফেরৎ নিয়েছে।'· তারপরই শেখ কামালুদ্দিন এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন গুরুদাসের কাছে। জানাচ্ছেন যে তিনি হিজলী নিমক মহলের একজন ইজারাদার। তার আর্জি হল যে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও আর্কাডকেন সাহেব তার সমূহ ক্ষতি করেছেন। ছাব্বিশ লক্ষটাকা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ উৎকোচ চেয়েছেন এবং পনের হাজার টাকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই অভিযোগ তিনি নন্দকুমার মারফৎ উত্থাপন করতে চান।

তৃতীয় দৃশ্য রেজা খাঁর প্রমোদ কক্ষ। নাচগান ও সরাব চলছে। এমন সময় ক্ষুধার্ত জনগণ বাইরে চালের জন্য হানা দিন। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের কথা শোনান হল। নন্দকুমার এসে জানালেন যে রেজা খাঁ পাহাড় পরিমাণ তণ্ডুল জমা করে রেখেছেন বলেই এই দুর্ভিক্ষ হয়েছে। মিলিত হিন্দুমুসলমানের চেষ্টায় বাংলাকে বাঁচাবার কথা বললেন। রেজা খাঁ রাজী হলেন না তখন নন্দকুমারের হুকুমে, কারণ তিনি নাকি তখন Dewan Suba, মিডিলটন সাহেব রেজা খাঁকে গ্রেপ্তার করল। জানাল ইহাই হেস্টিংসের আদেশ। তারপর গঙ্গাগোবিন্দ এলে তাকে উৎকোচের অর্থ কামালুদ্দিনকে ফিরিয়ে দিতে বলছেন। জানাচ্ছেন যে জোসেফ ফাউককে তিনি সেই দরখাস্ত সম্পর্কে ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

তখন গঙ্গাগোবিন্দ বললেন যে স্বয়ং কামালুদ্দিন দরখাস্ত ফেরৎ চাইতে এলে তিনি সেটা ফেরৎ দেবেন। অবিলম্বে কামালুদ্দিন নিজে এসে সেই কথা জানাল। নন্দকুমারকে দরখাস্ত ফেরৎ দিতে অস্বীকার করায় তিনি জানাচ্ছেন যে হেস্টিংসের সর্বকর্মের নিত্য সহচর হলেন গঙ্গাগোবিন্দ ও কান্তমুদী। শাসাচ্ছেন যে আগে রেজা খাঁর বিচার হোক তারপর কাউন্সিলে তিনি প্রত্যেকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করবেন। এমন সময় হেস্টিংস এসে জানাচ্ছেন যে রেজা খাঁকে তিনি মুক্তি দিয়েছেন। নন্দকুমার বলছেন যে দশ লক্ষ টাকা উৎকোচ নিয়ে হেস্টিংস রেজা খাঁকে মুক্তি দিয়েছেন। বিশলক্ষ টাকা পেলে এতক্ষণ তার বিচার শেষ হয়ে যেত। হেস্টিংস তখন নন্দকুমারকে সাবধান করে দিচ্ছেন। নন্দকুমার জানাচ্ছেন যে

বিচারের দিন এসেছে। তিনি হেস্টিংসের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী স্বৈরাচারের অভিযোগ আনবেন। সেই সঙ্গে আনবেন রাণী ভবানীর বাহারবন্দ পরগণা কেড়ে নেবার, এবং মণিবেগম ও মহম্মদ রেজা খাঁর কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ। অবশেষে তিনি জানিয়ে যাচ্ছেন যে মুন্সি নবকৃষ্ণ, মুন্সি গঙ্গাগোবিন্দ ও কান্তমুদীর মতো তার পারিষদদের মাথা নুইয়ে দিতে হেস্টিংস সক্ষম হবেন কিন্তু নন্দকুমারের উচ্চ শির ভেঙে দিতে পারলেও তাকে কখনও নুইয়ে দিতে পারবে না। এই কথা বলে চলে গেলে দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত হল। হেস্টিংস ঘোষণা করলেন যে তিনি মহারাজা নন্দকুমারের শত্রু।

আলোচনা ॥

পূর্ব অঙ্কের মতো এই অঙ্কেও মিথ্যার রোসনাই লেগেছে। একদিকে ১৯৪২এর দুর্ভিক্ষ অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনতা নাট্যকারের কলমের ডগা থেকে সব সঙ্কোচ সরিয়ে দিল। উনি ১৯৪২এর ঘটনাকে আরোপ করলেন ১৭৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিহাস কোথায় থাকল সে খোঁজে দরকার কি! হেস্টিংস এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ তাই হয়েছেন ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ইংরেজ শক্তির প্রতিভূ। রেজা খাঁ হয়েছেন বাংলার তৎকালীন মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ও সুরাবর্দীর প্রতিনিধি। মনের আনন্দে নাট্যকার যা ইচ্ছা হয়েছে তাই লিখেছেন। সময়ের কথা বিবেচনা করে প্রতিবাদ করতে কেউ সাহসী হন নাই। নাট্যকারের মিথ্যা কায়েমী আসন পেয়েছে। অলীক, অসম্ভব ও অদ্ভুত ঘটনা দর্শককে বিনা দ্বিধায় পরিবেশন করা হয়েছে।

সৈফুদ্দৌলার নাবালকত্ব এবং হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের বিরোধ নাটকের কালকে ১৭৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপনা করেছে। আগেই বলা হয়েছে যে এই সময় লুৎফউন্নিসা ঢাকায়। তাঁর কন্যা ঢাকাতেই বিবাহিতা হন এবং চারটি শিশুকন্যা রেখে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উম্মৎসায়রা বেগম পরলোকগমন করেন। সুতরাং বালিকা উম্মৎজহরৎ কল্পনার চরিত্র। প্রথম দৃশ্যের সমস্ত ঘটনাই অলীক। নন্দকুমার পুত্র গুরুদাসের দেওয়ানী লাভ নন্দকুমারের হেস্টিংসের কাছে উমেদারীর ফল। এই বিষয়ে পত্রাংশ প্রস্তাবনায় উদ্ধৃত করা হয়েছে। মণিবেগম অবশ্য গুরুদাসকে প্রথমে গ্রহণ করতে রাজী হন নাই, কারণ তাঁর

ভয় ছিল যে গুরুদাস তাঁর পিতার দ্বারা প্রভাবিত হবেন। হেস্টিংস মণি-বেগমকে বুঝিয়ে রাজী করান। সুতরাং নন্দকুমারের সঙ্গে মণিবেগমের যোগাযোগ অসম্ভব। পরবর্তীকালে যখন মণিবেগমের অভিযোগ নন্দকুমার কাউন্সিলে পেশ করলেন। মণিবেগম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জানালেন যে সে পত্র জাল। তিনি নন্দকুমারকে কোন পত্র দেন নাই। মণিবেগমের হেস্টিংসকে অর্থ উপঢৌকন দেবার ঘটনা সত্য। এই বিষয়টি হেস্টিংসের ইমাপীচমেণ্টের সময় আলোচিত হয়। তখন হেস্টিংস প্রমাণ করেন যে সমুদয় নজরাণা যথারীতি কোম্পানীর কোষাগারে তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী জমা দেওয়া হয়েছে। কোম্পানী নিয়ম করেন যে কোম্পানীর কর্মচারীগণ যদি কোন উচ্চমূল্য উপহার পান তাহলে কোম্পানীর ধনভাণ্ডারে সেই উপহার প্রত্যর্পণ করতে হবে। সেই নিয়মমতো কোম্পানীর ধনাগারে মণিবেগমের দেওয়া অর্থ জমা পড়েছিল। রাজা গুরুদাস বা মহম্মদ রেজা খাঁ হেস্টিংসকে কোন উপহার বা উৎকোচ দিয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। নন্দকুমার এগার পাতা জুড়ে যে অভিযোগ ১১ই মার্চ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিলের সভায় পেশ করেন তাতেও এই দুইটি অভিযোগ নাই। সুতরাং বিনা দ্বিধায় ধরে নেওয়া যেতে পারে এই দুটি অভিযোগই নাট্যকারের মস্তিষ্কপ্রসূত। হেস্টিংস ভারতের তথা বাংলার কত বড় বন্ধু ছিলেন নাট্যকার বোঝবার চেষ্টা করেন নাই বলে হেস্টিংসের হীনচরিত্র অঙ্কন করতে তার দ্বিধা হয় নাই। রামপ্রসাদ সম্পর্কীয় গল্প প্রচলিত কথিকা মাত্র। সিরাজদ্দৌলার পক্ষে রামপ্রসাদকে বোঝবার সময় ছিল না কারণ তিনি বাংলা বা বাঙালীর সম্পর্কে উৎসুক ছিলেন না।

দ্বিতীয় দৃশ্যে নাট্যকার ভুলের স্বর্গ তৈরী করছেন। বাহারবন্দ জেলা হেস্টিংসের বেনিয়ান কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথের পাওয়া সম্পর্কে বার্ক হেস্টিংসের ইমপীচমেণ্টের সময় অভিযোগ এনেছেন। কিন্তু এই অভিযোগ খণ্ডিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে রাজস্ব বৃদ্ধি করতে রাজী না হওয়ায় ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভবানীর হাত থেকে বাহারবন্দ নামে নবাবের জায়গীর পরগণা তুলে নেন নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ। তদবধি এটি নবাবী জায়গীর। উত্তরাধিকার সূত্রে এই জায়গীর পেয়ে নবাব সিরাজদ্দৌলা এটি দেন মহারাজা মোহনলালকে। পলাশীর যুদ্ধের শেষে দীর্ঘদিনের অজ্ঞাতবাসের পর মোহনলাল

কোম্পানীর কাছে অভিযোগ করেন যে তাঁর এই জায়গীরের আদায় কার্য্য তাঁর অনুপস্থিতিতে দিনাজপুরের রাজা গ্রহণ করেন। এখন তাঁর প্রাপ্য আদায়ী অর্থ দিনাজপুরের রাজা ফেরৎ দিচ্ছেন না।[৪৬] এই সময় জুড়ে কিন্তু খালসাবিভাগের খাতায় রাণী ভবানীর নাম খারিজ করা হয় নাই। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন বাহারবন্দ পরগণা লোকনাথকে দেওয়া হয় তখন এই নাম খারিজ হয় বলেই বিভ্রম সৃষ্টি হয়েছে।[৪৭] এ বিষয়ে রাণী ভবানী স্বয়ং সত্য অবস্থা মেনে নিয়েছেন।[৪৮] না মানলে বিপদ ছিল কারণ তাহলে ১৭৪৮ থেকে ১৭৭৪ পর্য্যন্ত এই ছাব্বিশ বছরের রাজস্ব তাঁর দেয় হত। তাছাড়া কোম্পানী ১৭৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে অন্যান্য খাস সম্পত্তির সঙ্গে বাহারবন্দ পরগণাও বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্ত হয় হেস্টিংস গবর্ণর হবার বা বাংলায় ফিরে আসবার আগে। সেই বন্দোবস্তে কেউ কোন বাধা দেন নাই। নাট্যকার বার্কের অভিযোগগুলিকে প্রায়ই ব্যবহার করেছেন। জানতেন না যে বার্কের কোন অভিযোগই প্রমাণিত হয় নাই বরঞ্চ রঙ্গিনকথার ফানুসে সভ্যদের বিভ্রান্ত করার জন্য হেস্টিংসের ইমপীচমেণ্টের পর বার্কের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে তাকে চিরদিনের মতো 'হাউস অফ কমনস্' থেকে বিদায় দেওয়া হয়।

রেজা খাঁর গ্রেপ্তার ও মুক্তির কাহিনী কেবল কল্পনা মাত্র। নাট্যকার অহেতুক বিভ্রম সৃষ্টি করেছেন নিজের অজ্ঞতা ঢাকা দেবার জন্য। তাই ইতিহাসের দুই এক ঘটনা শোনাতে হবে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ কোম্পানীকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী দিলেন। তদনুযায়ী দিল্লীর বাদশার অধীনে কোম্পানী হলেন বাংলাসুবার রাজস্ব আদায়ের অধিকারী এবং বাদশাহকে বাংলা সুবার প্রাপ্য বাদশাহীরাজস্ব দেবার জামিনদার। বাংলার নবাবের হাতে থাকল কেবল শাসন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিচার বিভাগের ভার। পারস্য জাতীয় মহম্মদ রেজা খাঁ হলেন কোম্পানীর অধীনস্থ দেওয়ান এবং রাজা গুরুদাস হলেন নবাবের অধীনস্থ দেওয়ান। একটু পরেই গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের কথা আসবে, তাই জানিয়ে রাখা ভাল যে তিনি ছিলেন এই সময় রাজস্ব বিভাগের দেওয়ান। তাঁর স্থান রেজা খাঁর অধীনে।

রেজা খাঁ পারস্যতে জন্মগ্রহণ করেন ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে। পরে নবাব আলিবর্দী তাঁর কর্মক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে দিল্লী থেকে সুবা বাংলায় নিয়ে আসেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের ফৌজদার হিসাবে তাঁর কর্মদক্ষতা মনে

রাখার মতো। এমনকি নবাব মীরকাশিমও তাঁর কর্মক্ষমতার তারিফ করতেন। সেখান থেকে তাঁর পদোন্নতি ঢাকায়। ঢাকা থেকে লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের দেওয়ানী পাবার পর তাঁকে কোম্পানীর প্রধান কর্মচারী বা দেওয়ান পদ দেন। ইংরেজ মন্ত্রণাদাতাসহ রেজা খাঁ প্রথমে মুর্শিদাবাদে ও পরবর্তীকালে কলকাতায় অফিস করেন। তাঁর সঙ্গে হেস্টিংসের বিরোধ শাসনকার্য্য সংক্রান্ত মতদ্বৈধতা।[৪৯] বরঞ্চ হেস্টিংস ভয় করতেন যে রেজা খাঁ তার বিপক্ষীয় দলে যুক্ত হলে তাদের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এই জন্যেই হেস্টিংস তাঁর নিজের দেওয়ান কান্তবাবুর সঙ্গে রেজা খাঁর বন্ধুত্বে কখনও বাধা দেন নাই। বয়সের তফাৎ প্রায় তের বছর হলেও রেজা খাঁ ও কান্তবাবুর বন্ধুত্ব আমৃত্যু অটুট। (মহম্মদ রেজা খাঁ সম্পর্কে অধুনা প্রচারিত গবেষণা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।[৫০]

নন্দকুমারের সঙ্গে হেস্টিংসের বিরোধের কারণগুলি প্রস্তাবনায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। দেখা যাচ্ছে নাট্যকারের সে সম্পর্কে ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। তৎকালীন রাজনৈতিক কারণগুলি না জেনেই তিনি কল্পনার পাখা মেলেছেন। তিনি জানতেন না যে ১১ই মার্চের অভিযোগের আগে নন্দকুমারের সঙ্গে হেস্টিংসের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয় নাই কেবলমাত্র পরোক্ষ সংঘর্ষ হয়েছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ বিরোধের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা অসম্ভব ও মিথ্যা। হেস্টিংস অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক লোক ছিলেন কাগজে-কলমে তাঁর কাজকর্মের প্রমাণ থাকত যে জন্য কাউন্সিলে অথবা ইমপীচমেণ্টের সময় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় নাই।

কামালুদ্দিন সম্পূর্ণভাবে নন্দকুমারের লোক ছিলেন। নুনের মহল ইজারা নেবার সময় স্বয়ং রাজা গুরুদাস ও নন্দকুমারের জামাতা রাধাচরণ তার সিকিউরিটি বা জামিনদার হয়েছিলেন বলেই কামালুদ্দিনের মতো একজন অজ্ঞাতকুলশীল কোম্পানীর কাছ থেকে হিজলীর ইজারাদারী লাভ করেন। অর্থের পরিমাণ দেখলেই বোঝা যায় যে কামালুদ্দিন কার জোরে হিজলীর নিমকমহলের ইজারাদারী গ্রহণ করতে সাহসী হয়। জামিনদারগণই অনেক সময় হতেন সত্যকার ইজারাদার—নাম যার দেওয়া হত তিনি হতেন নাম মাত্র। এখানে সকলের অবগতির জন্য রাজস্ব বিভাগের ১২ই অগাষ্ট ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের অনুলিপি ও অনুবাদ দেওয়া হচ্ছে।[৫১] স্মরণে রাখতে হবে যে

এই সময় হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের কোন বিরোধ ছিল না বরঞ্চ এই সময়েই হেস্টিংস নন্দকুমার পুত্র গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত করেন মণিবেগমের আপত্তি সত্বেও।

নিমকমহল	ইজারাদার	তস্য জামিনদাব	প্রতিবছর যে অর্থ ও লবণ	পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।
হিজলী	কামালুদ্দিন খাঁ	গুরুদাস ও রাধাচরণ	৩৫০০০ টাকা	৩৫০০০ মণ
তমলুক	আবদুল রহমান	রামতনু দত্ত	১৫০০০ „	২০০০০ „
জলামুথা	রাজা বীরনারায়ণ	বৈদ্যনাথ রায়	৭০০০ „	১৫০০০ „
সুজামুথা	রাজামহেন্দ্রনারায়ণ	রঘুনাথ রায়	৫০০০ „	৭০০০ „
মহিষাদল	কালী প্রসাদ	শান্তিরাম সিংহ	২১৫০০ „	২৭০০০ „

সুতরাং নাটকে গুরুদাস যে কামালুদ্দিনকে জিজ্ঞাসা করছেন তিনি কে তা যেমন মিথ্যা তেমনি মিথ্যা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সঙ্গে কামালুদ্দিনের বিরোধ। পরবর্তীকালে ঠিক মতো অর্থ না পাওয়ায় কামালুদ্দিন নন্দকুমারের বিরুদ্ধাচবণ করেন। কামালুদ্দিনকে ঘুঁটি করে নন্দকুমার যে জুয়াচুরির অভিযোগ এনেছিলেন তা বানচাল হয়ে যায় কারণ কামালুদ্দিন মিথ্যা অভিযোগেব শাস্তির খবর পেয়ে এবং আশা মতো অর্থ না পেয়ে পিছিয়ে যান।

তৃতীয় দৃশ্যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে নাটকের মধ্যে আনার কোন কারণ বোঝা যায় না। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশে পর্যাপ্ত শস্য এবং কোন খাদ্যাভাব ছিল না। নন্দকুমার এ সময় 'Dewan Suba' ছিলেন না সুতরাং মিডিলটন সাহেব তাঁর হুকুমে যে কিছু করবেন না তা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়টিও প্রস্তাবনায় স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে। গঙ্গাগোবিন্দ ও কামালুদ্দিন সম্পর্কে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সবশেষে দেখা যাচ্ছে যে নাট্যকার কয়েকজন তৎকালীন্ সার্থক ব্যক্তির সাফল্যে ইর্ষাতুর। তাই মহারাজা নবকৃষ্ণ তার কলমে মুন্সি আখ্যা পেয়েছেন, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তখন এক হাজার টাকা মাসিক মাহিনায় কোম্পানীর খালসা বা রাজস্ব বিভাগের পরিচালক— তাকেও মুন্সি আখ্যা পেতে হয়েছে। বস্তুত মুন্সি শব্দের অর্থ নাট্যকারের জানা নেই। মুন্সি হচ্ছেন শিক্ষক। নবকৃষ্ণ প্রথম জীবনে মুন্সি ছিলেন। তিনি কোম্পানীর কর্মচারীদের ফারসী ভাষা শিক্ষা দিতেন এবং সেই

সূত্রেই তিনি ক্লাইভের বেনিয়ান হন। বুলাকী দাস শেঠের ফারসী দলিল ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট নবকৃষ্ণকে নিযুক্ত করেন। তখন নন্দকুমারের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি হয় নাই। গঙ্গাগোবিন্দ কখনও মুন্সি ছিলেন না। প্রথম জীবনে তিনি নন্দকুমারের মতো আমিন ছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতার নজীর পাওয়া যায় তখনই যখন দেখা যায় যে তাঁর অবসর গ্রহণের পর খালসা বিভাগ চালাতে চারজন ইংরেজ কর্মচারীর প্রয়োজন হল। এই সব অত্যন্ত মেধাবী বাঙালীর প্রতি যোগ্য সম্মান না দেখিয়ে নাট্যকার তাঁদের অপযশ গাইবার চেষ্টা করে শুধু নিজের অজ্ঞতা ও হীনমন্যতা প্রমাণ করেছেন। নাট্যকারের সব থেকে বেশী রাগ হেস্টিংসের দেওয়ান কান্তবাবুর ওপর। তাঁকে তিনি ক্রমান্বয়ে 'কান্তমুদী' লিখেছেন এমনকি তার ছেলেকেও 'লোকনাথ মুদী' লিখতে তার কলমে বাধে নাই। কান্তবাবু সম্পর্কে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় দুই হাজার কাগজের কোথাও তার সম্পর্কে এই হীন মন্তব্য নাই। বস্তুত নাট্যকারের মনোবৃত্তির ব্যক্তি ছাড়া এই রকম হীন উক্তি কেউ কল্পনাও করেন নাই। তাঁর পুত্র প্রথমে লোকনাথ নন্দী ও পরে মহারাজা লোকনাথ নায়েব নাজিম বাহাদুর নামেই পরিচিত হয়েছেন। রাণী ভবানী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগসূত্র যে সব কাগজে পাওয়া যায় সেখানেও তাঁরা এই ভাবেই আখ্যাত। হেস্টিংসের সঙ্গে চরম বিরোধের সময়ও কান্তবাবু স্বনামেই আখ্যাত।[৫২] ভুলে গেলে চলবে না যে এই সময় তিনি caste catcherry-র পরিচালক। কিন্তু নন্দকুমার সম্পর্কে কাউন্সিলে তিনি কোন মতামত দেন নাই। সে ভার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। নাট্যকারের এই কর্ম ক্ষমার অযোগ্য।

নিজের অজ্ঞতা ঢাকতে গিয়ে নাট্যকার যে রূপকথা শুনিয়েছেন, তা যদি এমনি অহেতুক চরিত্র হননের দায়ে অশ্লীল না হত, তাহলে হয়তো তার এই বিভ্রম হাসির উদ্রেক করত। কিন্তু বর্তমান নাটকে তিনি নন্দকুমারকে 'শহীদ' করার নেশায় ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাচার করেছেন।

তৃতীয় অঙ্ক ॥

এই অঙ্কেও তিনটি দৃশ্য। প্রথম দৃশ্য নন্দকুমারের গৃহসংলগ্ন প্রাঙ্গন সেখানে

কাউন্সিলার ও কোম্পানীর প্রধান সেনাপতি ক্লেভারিং নন্দকুমারকে জানাচ্ছেন যে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের মামলা চাপা পড়ে গেল। কামালুদ্দিন তাঁর বিরুদ্ধে এনেছেন ষড়যন্ত্রের মামলা। দেশের কল্যাণ কামনায় হেস্টিংস ও তার স্বার্থলুব্ধ সহচরদের যাতে উচিত শাস্তি হয় এটাই জনগণের পক্ষে তাঁর প্রধান আবেদন। ক্লেভারিং জানাচ্ছেন যে তিনি মনসন ও ফ্রান্সিস সর্বদাই হেস্টিংসকে শাস্তি দিতে অভিলাষী কিন্তু তার জন্য দেশবাসীর সাহায্য প্রয়োজন। জানালেন 'কান্টমুডী' সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেছে। তখন তিনি কান্তকে চাবুকে মারতে চাইলে হেস্টিংস বাধা দিয়ে বলেন, 'যে কান্তবাবুকে চাবুক মারিতে চাহিবে আমি তাহাকে চাবুক মারিব।' জানালেন এই সবই তিনি ইংলণ্ডের সম্মান বাঁচাবার জন্য করছেন। সঙ্গে সঙ্গে সাবধান করে দিলেন যে গবর্ণর হেস্টিংসের সাঙ্গপাঙ্গরা 'মতলব ভাঁজিতেছে'। আরো জানালেন যে প্রধান বিচারপতি হেস্টিংসে বন্ধু। নন্দকুমারের স্ত্রী অসুস্থতার জন্য তিনি ডাক্তার পাঠাতে চাইলেন কিন্তু হিন্দুর স্ত্রী বিলাতি ডাক্তারের ওষুধ খাবেন না জানান হল। ক্লেভারিং চলে যাবার পরই বেসিফ এসে নন্দকুমারকে গ্রেপ্তার করল। অভিযোগ 'বুলাকীদাসের যে দলিল তিনি কোম্পানীতে পেশ করেছেন সেটা জাল।' বিয়োগান্ত দৃশ্য,ক্রন্দন-শীল স্ত্রী, বিহ্বল পুত্র তারই মাঝে নন্দকুমারকে কারাগারে নিয়ে চলে গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য ক্লেভারিং এর গৃহে ভোজসভায় আমন্ত্রিত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কান্তমুদী, নবকৃষ্ণ ও কামালুদ্দিন। নাট্যকার ক্লেভারিং মারফৎ নন্দকুমারের বিচারের কথা শোনাচ্ছেন। বলছেন এই বিচার প্রহসন কারণ নন্দকুমারের ইচ্ছামতো কোন দেশীয় ব্যক্তি জুরী নিযুক্ত হন নাই, দুই—জাল দলিলের তারিখ 20 August 1965, তখন নন্দকুমার মুর্শিদাবাদের অধিবাসী, কলকাতার নয় সুতরাং 'jurisdiction' এর প্রশ্ন আসছে অথবা নন্দকুমার তখন সুপ্রীম কোর্টের এলাকার বাইরে বাস করতেন। এবং তিন, জালিয়াতির অভিযোগে ফাঁসী স্কটল্যাণ্ডে চালু নাই সুতরাং ভারতবর্ষে কি করে চালু হতে পারে। কামালুদ্দিনকে দিয়ে নাট্যকার স্বীকার করিয়ে দিলেন যে সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। তারপর ক্লেভারিং সোনার বাংলা সম্পর্কে এক নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। পাপপুণ্য বিচার করলেন। অন্য দিকে ভারতীয়গণ অত্যন্ত হীন ব্যবহার করলেন। এমন সময় হেস্টিংস এসে

জানালেন যে নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁর ফাঁসীর হুকুম হয়েছে। ভারতীয়গণ আনন্দে লম্ফঝম্প করতে লাগলেন। ভোজের ব্যবস্থা করতে চললেন। ক্লেভারিং ও তাঁর কন্যা কেঁদে অস্থির হলেন।

তৃতীয় দৃশ্যে কারাগারে নন্দকুমার ও গুরুদাস। গুরুদাস জানালেন যে মাতা গত হয়েছেন তাকে দাহ করে তিনি আসছেন। আরো জানালেন ইংলণ্ডের রাজার মতামত না আসা পর্যন্ত ফাঁসী স্থগিত রাখার আবেদন নামঞ্জুর হয়েছে। সুতরাং ৫ই অগাষ্ট অর্থাৎ আগামী কাল ফাঁসী অবধারিত। নন্দকুমার সকলকে বিশেষ তাঁর পক্ষীয় ইংরেজদের আশীর্বাদ জানালেন। নন্দকুমার তখন দেশভক্তি সম্পর্কে একা ঘরে দর্শকদের শোনাবার জন্য বক্তৃতা করতে লাগলেন। হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল এডমণ্ড বার্কের প্রতিমূর্তি তিনি হেস্টিংসকে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে অভিযুক্ত করছেন। খানিকক্ষণ বার্কের ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতার পরে গিরিশচন্দ্র সৃষ্ট সাহেবরা যে বাংলা বলত বলে নাট্যকারগণ মনে করতেন, সেই বাংলায় বৃটিশ পার্লামেণ্টে বাগ্মী শ্রেষ্ঠ এডমণ্ড বার্ক বক্তৃতা করলেন। ক্লেভারিং সাহেব এসে নন্দকুমারকে শেষ বিদায় জানিয়ে গেলেন। নন্দকুমার হাস্যোজ্জ্বল মুখে বধ্যভূমির দিকে অগ্রসর হতে হতে ঘোষণা করলেন 'অত্যাচারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের চির অবসান। ভিক্টোরিয়া যুগে আবার ভারতের নবজাগরণ।'

আলোচনা ॥

এই অঙ্কের ঘটনা ৬ই মে থেকে ৫ই অগাষ্ট ১৭৭৫। এই অঙ্কে নন্দকুমারকে শহীদ করবার প্রচেষ্টায় নন্দকুমারের মুখে প্রচুর স্বদেশভক্তির বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে। ফলে এই অঙ্কটি ঐতিহাসিক বিচারে সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত ও কল্পিত বলে গণ্য করতে হবে। প্রথম থেকেই মিথ্যা কথা। নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কোন মামলা রুজু করেন নাই অথবা কামালুদ্দিন নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের মামলা করেন নাই। যদি নন্দকুমারের ১১ই মার্চের অভিযোগ এই 'মামলা' হয় তাহলে ৬ই মে তারিখে তা মোটেই চাপা পড়ে নাই বরঞ্চ ভীষণ ভাবেই জীবন্ত ছিল। ১৩ই মার্চ ১৭৭৫ নন্দকুমারকে কাউন্সিলে ডাকা হল তাঁর অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবার জন্য। হেস্টিংস এতে আপত্তি করলেন। কিন্তু ক্লেভারিং, মনসন ও

ফ্রান্সিস সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সে আপত্তি অগ্রাহ্য করলেন। ফলে হেস্টিংস ও বারওয়েল সভাত্যাগ করলেন। তখন নন্দকুমারের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা হল। তারপব কাউন্সিলে তুমুল সংঘর্ষ চলল ২০শে মার্চের সভায়, ১৭ই এপ্রিলের সভায় ও ২২শে এপ্রিলের সভায় হেস্টিংস ও বারওয়েলের সঙ্গে সংখ্যা গরিষ্ঠ সভ্যদের। কান্তবাবুকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইতে হেস্টিংস স্পষ্ট জানান যে কান্তবাবু তাঁর দেওয়ান হিসাবে কলকাতায় প্রথম নাগরিক সুতরাং মেয়রের আদালতের আওতায় তাকে আনা যাবে না।

সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমস্ত অন্যায় দাবী কেবল মাত্র আইনের সাহায্যেই কাটান সম্ভব ছিল। শেষ পর্য্যন্ত সংখ্যা গরিষ্ঠগণ জানালেন যে 'জাতি কাছারী'র পরিচালক হিসাবে কান্তবাবুর মতামত জানা দরকার। হেস্টিংস সঙ্গে সঙ্গে কান্তবাবুকে ডেকে পাঠান এবং কাউন্সিলে তাঁর জবাব লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

এইখানে নাট্যকার একটা বিরাট ভুলে দেশমাতৃকার বন্দনা নন্দকুমারের মুখে বসিয়েছেন। নন্দকুমার বা রেজা খাঁ ছিলেন মোগল শক্তির প্রতিভূ। বলতেন কইতেন ফারসী, সইও করতেন সেই ভাষায়। বাংলাভাষাকে গেঁয়ো ও সাধারণ বাঙালীকে মেঠো বা অসংস্কৃত বলে হেয় করতেন। নবকৃষ্ণ মাঝামাঝি যেতেন। কখনও ফারসীওলাদের সঙ্গে কখনও সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে। কিন্তু হেস্টিংসের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষাকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা কান্তবাবু ও গঙ্গাগোবিন্দ দেখেছেন। ফলে এই অতি সাধারণ বাঙালী দুজন সর্বদা বাংলায় অথবা সংস্কৃততে (কিন্তু বাংলা হরফে) নাম স্বাক্ষর করেছেন ফারসী ও ইংরেজী জানা সত্ত্বেও। বাংলার ভাষা সাহিত্যের উন্নতির জন্য হেস্টিংস যা করেছেন তা নন্দকুমার কখনও কল্পনা করেন নাই। সংস্কৃত শিক্ষা ও বাংলাভাষার পুনরুদ্ধারে হেস্টিংসের অপরিসীম দানের কথা জানা থাকলে নাট্যকার তাঁর অদ্ভুত মিথ্যাগুলি সংগত করতেন বলে আশা করা যায়। ক্লেভারিং কদাচ বলেন নাই যে তিনি কান্তবাবুকে চাবুক মারবেন অথবা হেস্টিংস তার উত্তরে একথা বলেন নাই যে তিনি ক্লেভারিংকে চাবুক মারবেন। ঘটনা এইরূপ। নানা উপায়ে কান্তবাবুকে কাউন্সিলের সামনে আনতে যখন অপারগ হলেন তখন ক্লেভারিং রেগে বলেছেন যে কান্তবাবু বার বার কাউন্সিলের আদেশ অমান্য করায় জন্য 'he should be put on

stocks'. এই stocks বস্তুটি কি নাট্যকারের বুদ্ধিতে আসে নাই। তিনি তার অতি উর্বর কল্পনায় তাকে 'চাবুক' বানিয়েছেন। উন্মুক্তস্থানে পা বেঁধে বন্দী করার কাঠের যন্ত্রটির নাম স্টকস্। এটিও ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত শাস্তি এবং ক্লেভারিং এর সুপারিশ সত্বেও এদেশে কখনও চালু হয় নাই। হেস্টিংস তার উত্তরে জানিয়ে ছিলেন যে কাউকে স্টকসে পুরতে হলে, সে সেখানে যাবার যোগ্য কিনা আইনসঙ্গত ভাবে প্রমাণ করতে হবে। সুতরাং নাট্যকার যেভাবে ক্লেভারিংএর সংলাপ সাজিয়েছেন তাতে তাকেও মিথ্যাবাদী করা হয়েছে। যিনি এক কাহন করে বিশকাহনের গল্প গাবান এমন লোক ক্লেভারিং ছিলেন না। নাট্যকারের অজ্ঞানতা তাঁর চরিত্রেও কলঙ্ক দিয়েছে। তাঁর মুখ দিয়ে আরো শোনান হয়েছে যে ইলাইজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হেস্টিংসের বন্ধু। এটি বেভারিজ সাহেবের অনুসৃত পথ। এই জন্য ঐতিহাসিক মহলে বেভারিজের বইএর সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বেভারিজ সর্বদা এমন ভাবে লিখেছেন যেন ইলাইজা ইম্পে একলা বিচারপতি। বলতে ভুলে গেছেন যে চারজন বিচারপতির এজলাসে বিচার হয় এবং সকলে একমত হয়ে দোষী সাব্যস্ত করেন। অনেকের মতে কোর্টে ইম্পের ব্যবহার নন্দকুমারের প্রতি পক্ষপাত পূর্ণ ছিল। এমন কি শেষ বিচারের আগের দিন পর্য্যন্ত ব্যরিস্টার ফারার বিশ্বাস করতেন যে নন্দকুমারকে তিনি মুক্ত করতে সক্ষম হবেন।

ক্লেভারিংকে যেভাবে নাট্যকার দেখিয়েছেন তা আইনের সীমা লঙ্ঘন করে। বিশেষ ক্লেভারিং নন্দকুমারের তাঁকে লিখিত শেষ পত্র না পড়ে যে ভাবে জল্লাদকে দিয়ে পুড়িয়েছিলেন তাতে তাঁর মুখে এই সব সংলাপ অতীব বিসদৃশ।

দ্বিতীয় দৃশ্যটিও পুরো বেভারিজ সাহেবের বক্তব্যের চর্বিত চর্বন। প্রথম থেকেই আজগুবি ও আবোল তাবোল ঘটনা। মহারাজা নবকৃষ্ণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ বা দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত তিনজনই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। নাট্যকারের এই দৃশ্য লেখার সময় সম্ভবত মাথায় রং চড়ে গিয়েছিল বুঝতে পারেন নাই এই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের খ্রীষ্টানের বাড়ী নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন দেখিয়ে তিনি তাদের মান ও মর্য্যাদাহানি করেছেন। কামালুদ্দিন তখন লক্ষাধিক টাকার অধিপতি। রাজস্ব বিভাগের পাতায় তার অপরূপ জীবন ইতিহাস

উপন্যাসের উপজীব্য। নাট্যকার তাকে দিয়ে যা করিয়েছেন সবই মিথ্যা। বেভারিজ সাহেব কামালুদ্দিনের ইতিহাস জানবার অবকাশ ও ধৈর্য্য দেখান নাই। নাট্যকার তো কেবল সেইটুকুতেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধি। ধরে নিয়েছেন সাহেবের লেখা কি মেকী হতে পারে। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি বেভারিজকেও অতিক্রম করেছেন। বেভারিজ কোথাও 'কান্তমুদী' শব্দ ব্যবহার করেন নাই, নাট্যকার করেছেন। ক্লেভারিং সাহেব রাগের মাথায় কান্তবাবুকে কাউন্সিলে অনেক গালাগালি করেছেন। সব থেকে খারাপ গালি দিয়েছেন 'কান্তবাবু ঘুড়ি ওড়ানেওয়ালার ছেলে।' এবং এর থেকে খারাপ গালি ক্লেভারিং এর জানা ছিল না। কিন্তু নাট্যকারের আছে তাই তিনি নাটক জুড়ে কান্তবাবুকে 'কান্তমুদী' লিখেছেন, এমন কি ক্লেভারিং এর মুখেও খুবই হাস্যকরভাবে 'কাণ্টমোডী' দিয়েছেন।

বেভারিজ সাহেবের বক্তব্যও বারে বারে খণ্ডিত হয়েছে। বৃটিশ পার্লামেণ্টের ভারত শাসন আইন অনুসারে এদেশে শাসন ও বিচার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রচলন করেন। যখন জুরীতে ভারতীয় নেবার কোন ব্যবস্থা ছিল না তখন ভারতীয় জুরী কোথা থেকে আসবে। অবশ্য এই জুরিদেরই একজন নন্দকুমারের ফাঁসী মকুবের দরখাস্ত দিয়েছেন। সেটাই নন্দকুমারের দণ্ড মকুবের একমাত্র দরখাস্ত। দ্বিতীয়ত নন্দকুমার দীর্ঘদিন যাবৎ কলকাতার বাসিন্দা যদিও তাঁর ছেলে রাজা গুরুদাস ও স্ত্রী মুর্শিদাবাদে থাকতেন। তারপর দলিলের তারিখের থেকেও সেই জাল দলিল কবে ও কোথায় ব্যবহার হয়েছিল জানা দরকার। প্রস্তাবনায় জানান হয়েছে সেই জাল দলিল শেরিফের আদালতে ব্যবহার করা হয়েছিল। মূল প্রশ্ন হল নন্দকুমার দলিলটি যে জাল জেনে ব্যবহার করেছিলেন কিনা। কৃষ্ণজীবন দাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হল যে নন্দকুমার দোষী। তাই ছোট কৌঁসলী ব্রিক্স, বড় কৌঁসলী ফারারকে দুঃখ করে লিখেছেন যে 'রাজা, জীবন দাসের পুনরায় সাক্ষ্য গ্রহণ করতে গিয়ে এই দুঃখজনক পরিস্থিতি স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় টেনে নিলেন। আগেকার সব সাক্ষ্য বানচাল হয়ে গেল।' তৃতীয়ত বেভারিজ অনুসরণ করে বলা হয়েছে এই দণ্ড ভারতে এই প্রথম। এ খবরও ভুল। স্বনামধন্য গোবিন্দ মিত্রের নাতি রাধাচরণ মিত্র দশবছর আগে এই একই অপরাধে একই দণ্ড পেয়েছিলেন কিন্তু কলকাতার নাগরিকগণ দণ্ড

মকুবের দরখাস্ত করায় সে দণ্ড মকুব হয়। নন্দকুমারের বেলায় দরখাস্ত দেবার কোন চেষ্টা হয় নাই অথবা ইংলণ্ডের রাজার কাছে প্রাণ ভিক্ষার আবেদন হয় নাই। ক্লেভারিংএর সংলাপ সবই অসংলগ্ন। কারণ তাঁর থেকে কেউ ভাল করে জানত না যা ঘটেছে তা আইনসঙ্গত। কাউন্সিলে তখন ক্লেভারিং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। তাঁরা মণিবেগমকে অপসারিত করে গুরুদাসকে সেই পদ দিয়েছেন নন্দকুমার গ্রেপ্তার হবার পর কিন্তু তার প্রাণ বাঁচাবার কোন চেষ্টা করেন নাই। নন্দকুমারের লেখা পত্র তিনি পাঠ না নষ্ট করে ফেলেছেন। নাট্যকার কিন্তু ক্লেভারিংএর কাউন্সিলে সংখ্যা গরিষ্ঠতার কথা দর্শকদের জানাতে ভুলে গেছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে নন্দকুমারের মৃত্যুতে হেস্টিংস কোন মতামত প্রচার করেন নাই। হেস্টিংস বা কান্তবাবু নন্দকুমারের বিচারের সময় এমন ভাবে দূরে সরে থেকেছেন যে তাঁদের কোন ভাবেই যুক্ত করা যায় না। কাজেই দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে যে সংলাপ নাট্যকার সৃষ্টি করেছেন তা অবাস্তর। সব শেষে বলার কথা যে মহারাজা নবকৃষ্ণ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ, দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত বা কামালুদ্দিন কেউই ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নাট্যকার যে ভাবে দেখিয়েছেন সেইরকম মোসাহেবী করার লোক ছিলেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্থক পুরুষ। নাট্যকার সেটা উপলব্ধি করেছেন এমন চিহ্ন কোথাও নাই। তিনি নিজের মনে যা ইচ্ছা হয়েছে তাই লিখেছেন। ইতিহাস জানবার বা সত্য ঘটনা প্রকাশ করার কোন ঔৎসুক্য তার রচনায় নাই। এটা একদিনের ঘটনা নয়। নাট্যকারগণের ইতিহাস সম্পর্কীয় অশালীনতা এই প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে দেখান হয়েছে।

শেষ দৃশ্যের পরিকল্পনা এই অসম্ভাব্যতার পরিণতি। গুরুদাস তার পিতাকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন বা শোকে অধীর হয়েছেন বলা চলে না। প্রস্তাবনায় এই মনোভাব আলোচিত হয়েছে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নন্দকুমারের স্ত্রীর এই সময় মৃত্যু হয় নাই। নাট্যকার সংলাপ দিয়েছেন নন্দকুমারের মুখে যে ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিস তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। সেই চেষ্টা কি রকম জানতে পারলে ভাল হত। কেনই বা ফ্রান্সিস তাঁর চিঠি পুড়িয়ে ফেললেন, কেনই বা ক্লেভারিং ও ফ্রান্সিসকে লেখা পত্রদ্বয় নষ্ট করা হল জানতে পারলে বোঝা যেত যে এই সব ক্লীবত্বের পেছনে নন্দকুমারকে বাঁচাবার কোন

চেষ্টা হয়েছিল। গুরুদাসই বা কেন নাগরিকদের দিয়ে দরখাস্ত করালেন না, কেন নন্দকুমারের বিলাতের এজেন্টের কাছে রাজার দরবারে আপীল করার নির্দেশ গেল না প্রভৃতি প্রশ্নের জবাব নাই। নাট্যকার ক্লেভারিংকে শেষ মুহূর্তে কারাগারে নিয়ে এসে আর একবার মিথ্যাচার করেছেন। জনসাধারণকে জানাতে দ্বিধা করেছেন যে নন্দকুমার গ্রেপ্তার হবার পর থেকে ক্লেভারিং, মনসন ও ফ্রান্সিস সাহেবগণ তাঁর বা তাঁর পুত্রের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখেন নাই।

নন্দকুমারের শেষ মুহূর্তের ছবি না এঁকে নাট্যকার এডমণ্ড বার্কের বক্তৃতা শুনিয়েছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নন্দকুমারের ফাঁসী বার্কের বহুল অভিযোগের মধ্যে ছিল না। দীর্ঘদিন বিচারের পর হেস্টিংস আর্থিক দুর্গতিতে পড়েছিলেন সত্য কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগও প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা চলে যে এই দৃশ্যের সবই অলীক। নন্দকুমার দেশহিতৈষী ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। বরঞ্চ হেস্টিংসের বিচারের দীর্ঘদিন পরে যখন লর্ড ময়রা (যিনি পরবর্তীকালে মারকুইস অফ হেস্টিংস) এদেশে গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হলেন তখন ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে পত্র লিখে জানালেন: 'Among the natives of India, there are men of as strong intellect, as sound integrity, and as honourable feelings as any of this Kingdom,......by your example make it the fashion among our countrymen to treat them with courtesy and as participators in the same equal rights of society with themselves.' ভারতবাসী সম্পর্কে ওয়ারেন হেস্টিংস লিখলেন 'They are gentle, benevolent, more suseptable of gratitude for kindness shewn them than prompt to vengence for wrongs sustained, abhorrent of bloodshed, faithful and affectionate in service and submissive to legal authority.' বলাবাহুল্য এ ভাষা ভারত বন্ধুর, কোন অত্যাচারী ইংরেজ দানবের নয়। দুঃখের বিষয় বিভ্রমের বাষ্প নাট্যকারকে অন্ধ করেছে, অসূয়া তার কলমকে ব্যাহত করেছে তাই নন্দকুমার সম্পর্কে নাটক লিখতে বসে না পারলেন নন্দকুমারের রাজনৈতিক চরিত্র বর্ণনা করতে, না পারলেন তৎকালীন পরিস্থিতিতে হেস্টিংস ও অন্যান্য সাহেবদের চরিত্র

প্রকাশ করতে। সার্থকনামা বাঙালীরা তার লেখনীতে কলঙ্কিত হলেন। তাঁদের কীর্তি বোঝার মতো মন বা ক্ষমতা নাট্যকার দেখাতে পারলেন না। তিনি এক কল্পনার জগৎ রচনা করে প্রাণের আনন্দে প্রাসাদ নির্মাণ করলেন। সমুদ্রের ঢেউ তা ভাসিয়ে দিয়ে গেল! তার নিজের ঈর্ষাতুর মানসীকতা উলঙ্গ হয়ে গেল। লুৎফউন্নিসার কন্যার মৃত্যুর বছর তিনি যেমন তাকে বালিকা সাজিয়েছেন তেমনি সমস্ত নাটক জুড়েই অসম্ভব কল্পনার প্রাবল্য নাটককে তুচ্ছ করে দিয়েছে। ইতিহাসের সিংহদরজার বাইরে নাট্যকার শিক নাড়িয়ে খেলা করেছেন কিন্তু ভেতরে ঢুকে তার বিরাট মহত্বকে আবিস্কার করতে পারেন নাই। বিভ্রম সৃষ্টি করে তিনি কিছু দর্শককে হয়তো কিছুদিন ঠকিয়েছেন কিন্তু তৎকালীন বাংলার ঐতিহাসিক গৌরবকে নাটকে প্রকাশ করতে অপারগ হয়েছেন। বারবার তাই একটা কথা মনে আসে তা হল ইতিহাস পাঠ না করে বা ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পূর্ণ ভাবে না বুঝে যাঁরাই নাটক রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন তারাই পণ্ডশ্রম করেছেন। দেশের ও দশের কাছে মিথ্যাবাদী সেজেছেন। এ অপকীর্তি বড়ই লজ্জার।

সূত্রনির্দেশ

১। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, পলাশীর পর বক্সার (১৩৭৩), ১৫০ পাতা।

২। নিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, 'নন্দকুমার' প্রবন্ধ।

৩। Sir J. F. Stephen, Nuncomar and Impey, Vol. I & II (1885).

৪। British Museum. Add. Mss. 29132, f. 59, Scrafton to Hastings, 1758.

৫। Ibid. (I) Add. Mss. 29131, f 1, Clive to Hastings, 5 Feb., 1758.

(II) Add. Mss. 29096, Hastings to Clive, 7 Sept. 1958.

(III) Add. Mss. 29131, f 8, Clive to Hastings, 10 Sept. 1758.

(IV) Add. Mss. 29132, f 68, Scrafton to Hastings, 12 January, 1759.

৬। Ibid. Add. Mss 29132, f 32-33, Scrafton to Hastings, 2 October, 1758.

৭। Ibid. (I) Add. Mss. 29131, f 5, Clive to Hastings, 20 August 1758.

(II) IOR. G 37, Hasting to Clive, 24 August, 1758.

(III) Brit. Mus. Add. Mss. 29131, f 7, Clive to Hastings, 22 August 1758.

(IV) Ibid. Add. Mss 29131, f 41, Clive to Hastings, 28 November, 1758.

৮। Brit. Mus. Add. Mss. 29131, f 4, Clive to Hastings, 28 November, 1758.

৯। Ibid. f 69, Clive to Hastings, 16 February 1759.

১০। Henry Vansittrat, The Narrative of the Transactions in Bengal, 1760-1764, p. 216—219, 243—247.

১১। Ibid.

১২। As quoted by N. N. Ghosh in the Memoirs of Maharaja Nubkishen Bahadur, (1901), p. 115. Wheeler, Memorandum of Records in the Foreign Department. Proceedings of the Secret and Separate, of 27th April 1761 to the 27th September 1762.

১৩। National Archives. Calender of Persian Records, Letters of 1st and 3rd April, 1765.

১৪। Proceedings of the Select Committee of 1765, Appendix No. 8.

১৫। Ibid. of 19th July, 1765.

১৬। Ibid. of 18th April, 1767.

১৭। Ibid. Also see, N. N. Ghosh, Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur (1901).

১৮। Brit. Mus. Add. Mss 29133, f 160—161.

১৯। Ibid. f 162—163.

২০। Prodeedings of the Committee of Circuit at Krisnagar and Kasimbazar of 11 July 1772.

২১। Brit. Mus. Add. Mss. 29125, f 138.

২২। Ibid. Add. Mss. 29133, f 518.

২৩। Ibid. Add. Mss. 29125, ff 219 & 228.

২৪। Ibid. Add. Mss. 29134, ff 8 & 362.

২৫। IOR. Mss EUR, C78, p. 477—479.

২৬। Proceedings of Foreign Department, Secret Proceedings of 11 March, 1775, p. 260—271.

২৭। Ibid. of 22nd April, 1775.

২৮। British Museum, Add. Mss. 29136, f 94.

২৯। Ibid. f 128—129.

৩০। Ibid. f 130—133.

৩১। Ibid f 138—139.

৩২। Ibid. Add. Mss. 48370, f 3— 11

৩৩। Proceedings of Foreign Department, Secret Proceedings of 8th May, 1775.

৩৪। Ibid. of 16th May, 1775.

৩৫। Ibid. (I) Selection Vol. II (Proceeding of the Secret Dept. of 16th May, 1775), p. 413.
(II) Trotter, Warren Hastings, p 117—118.

৩৬। A. D. Innes, Short History of British India, p 110—111

৩৭। বিদ্যাসাগর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (মণ্ডল বুক হাউস), ১৫৭ পাতা।

৩৮। Trotter, Warren Hastings, p. 119.

৩৯। Public Proceedings of 11th March, 1765.

and N. N. Ghosh, Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur (1901), p. 71—74.

৪০। British Museum, Add. Mss. 29136, ff 192—197.

৪১। Ibid. Add. Mss. 29137, ff 56—57.

৪২। Ibid. Add. Mss. 29137, f 142.

৪৩। Busteed, Echoes of Old Calcutta, Letter of Brix to Farrar, p. 83—84.

৪৪। Ibid Last letter of Nundocomar, p. 84—85.

৪৫। শ্রীসুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), ৩৩৭ ও ৩৪১ পাতা।

৪৬। Proceedings of Revenue Board consisting of the whole Council of 12th July, 1774, p. 5500—5503.

৪৭। Ibid. of 31st May 1774, p. 409—413.

৪৮। IOR. Mss. EUR E 51/D. Orme, Mss. O. V. 165 B, 31st May to 12th Sepember 1777.

৪৯। Abdul Majid Khan, Transition in Bengal 1756—1775 (Cambridge 1969).

৫০। Ibid.

৫১। Proceedings of the Controlling Committee of Revenue of 12th August 1772, p. 448.

৫২। Somendra Chandra Nandy, Life and Times of Cantoo Baboo, the Banian of Warren Hastings, Vol. I (1978).

রাণী ভবানী এবং অযোধ্যার বেগম

রাণী ভবানী সম্বন্ধে সংস্র কথিকা আছে। কমপক্ষে ছয় সাতখানি বই তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে। শত শত গল্পে, উপন্যাসে নাটকে তাঁর চরিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু এই পৌনে দুইশত বছরে তাঁকে নিয়ে ইতিহাস একখানিও রচিত হয় নাই। কলিকাতা হিস্টরিকাল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত মৎ প্রণীত 'রাণী ভবানী অফ্ নাটোর' এই বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে অবশ্য দু'জন গবেষকের সঙ্গে আলাপ হয়—তাঁরা দু'জনাই রাণী ভবানীকে নিয়ে গবেষণা করেছেন। এঁরা দু'জনাই বাংলাদেশের অধিবাসী। তাঁদের রচনা প্রকাশিত হলে নূতন অনেক তথ্য জানা যাবে। অদ্যাবধি প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৩১৭) মহাশয় যদি উপন্যাস রচনার লোভ সম্বরণ করতে পারতেন তাহলে যে ভাবে তিনি তথ্য চয়ন সুরু করেছিলেন তাতে রাণী ভবানীর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারা যেত। এই প্রবন্ধে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় কর্তৃক ব্যবহৃত কিছু তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে।

রানী ভবানী অষ্টাদশ শতাব্দীর এক সুবিখ্যাত চরিত্র। তাঁর জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে প্রায় কিছুই প্রামানিকভাবে প্রকাশিত হয় নাই। যদিও তাঁর কীর্তিকলাপ সম্পর্কে সমসাময়িক কাগজপত্র ও দলিল দস্তাবেজে সংবাদের অভাব নাই। প্রথমে তাই রাণী ভবানীর ইতিহাস অতি সংক্ষেপে আলোচনা করে তাঁকে নিয়ে যে নাটকগুলি রচিত হয়েছে বিচার করা হবে।

রঘুনন্দন রায় নবাব মুর্শিদকুলির অধীনে কাজ করার সময় নাটোর রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর মধ্যমভ্রাতা রামজীবন হন নাটোরের প্রথম রাজা।

মাত্র আটবছর বয়সে নাটোরের রাজা রামজীবনের পোষ্যপুত্র রাম্‌কান্তের সঙ্গে ভবানীর বিবাহ হয়।[১] সেটা ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সুতরাং ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দকে রাণীর জন্মের বছর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। রাজা রামজীবন সুবিখ্যাত লোক ছিলেন। অত্যন্ত অল্প বয়সে তিনি এবং তাঁর দাদা রঘুনন্দন, মোগল সরকারের কর্মচারী হন। কর্মদক্ষতায় তৎকালীন বাংলাসুবার সুবাদার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর নজরে পড়েন।[২] ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে সুবার রাজধানী যখন

ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হল তখন দুই ভাই মুর্শিদকুলি খাঁর সঙ্গে এলেন। রঘুনন্দন নায়েব কানুনগো[৩] ও রামজীবন আমলা[৪] নিযুক্ত হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রঘুনন্দন টাকশালের দারোগা হলেন এবং এই পদে ১৭২২ পর্য্যন্ত ছিলেন।[৫] এই সময় রামজীবন, দয়ারাম নামে এক যুবককে তাঁর কর্মে নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে এই দয়ারাম নাটোর রাজবংশের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ হয়েছিলেন।[৬] ইতিমধ্যে রঘুনন্দন আরো সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামজীবন ও দয়ারামের সাহায্যে ভূষণার বিদ্রোহী ভূস্বামী মহারাজ সীতারামের পতন ঘটালেন। মুর্শিদকুলি খাঁ এই ঘটনায় আনন্দিত হলেন, কেবল সম্পত্তি ও খেলাৎ দিযে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, এই দুই ভাইকে একান্ত বিশ্বাসের পাত্র করে নিয়ে তাঁদের সম্মানিত করলেন।[৭]

সীতারামের সম্পত্তি ভাগাভাগি হল। বেশীর ভাগটাই পেলেন রঘুনন্দন ও রামজীবন। যদিও তাঁদের সম্পত্তি আহরণ ১৭০৬-৭ থেকে সুরু হয়েছে তবু এবারকার প্রাপ্যই তাঁদের জমিদার হবার সম্মান দিল। তাই নাটোর জমিদারী ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সুরু হয়েছে বললে সত্যের অপলাপ করা হবে না। দয়ারামের সম্পত্তি সংগ্রহের সুরুও এই সময় হয়েছে বলা চলে। এইসব সম্পত্তি দেখাশোনা করার জন্য রঘুনন্দন ভাই রামজীবনকে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে নাটোরে বসালেন। ভাইএর কর্মক্ষমতায় সম্ভবত রঘুনন্দনের পূর্ণ আস্থা ছিল না তাই নূতন রাজা রামজীবনের সঙ্গে দিলেন দয়ারামকে। তিনি তাঁর দেওয়ান হলেন।[৮] রঘুনন্দন নিজে মুঘল সরকারের চাকরীতে মুর্শিদাবাদে থেকে গেলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে রায়রায়ান (সহকারী দেওয়ান) পদে সম্মানিত হলেন। রঘুনন্দন নাটোর জমিদারীর জন্য ক্রমান্বয়ে সম্পত্তি আহরণ করতেন এবং রাজা রামজীবন ও দেওয়ান দয়ারাম সুষ্ঠু পরিচালনায় আয়ের উন্নতি করতেন।[৯] ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ দেহরক্ষা করলেন তখন নাটোর বাংলাসুবার বৃহত্তম জমিদারী তাদের বার্ষিক আয় ৫২ লক্ষ টাকা।[১০]

রঘুনন্দন ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সরকারের চাকরী ত্যাগ করে নাটোরে ফিরে এলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হল। রঘুনন্দন যেমন ছিলেন একদিকে বিচক্ষণ, ধার্মিক ও শান্ত, তাঁর একমাত্র পুত্র

ভবানীপ্রসাদ ছিলেন তেমনি অবিবেচক ও অশ্লীল। বিশেষ তাঁর পিতার অর্জিত সম্পত্তিতে নিজের অধিকার স্থাপনা সম্পর্কে তাঁর মনে কোন দ্বিধা ছিল না। সকলেই বিশ্বাস করতেন যে রঘুনন্দনই নাটোরের প্রতিষ্ঠাতা। তাই ভবানীপ্রসাদের দাবী কেউ কেউ ন্যায়সঙ্গত মনে করতেন। তবে এ বিষয়ে অধিক উত্তেজনা সৃষ্টি হবার আগেই ভবানীপ্রসাদ পিতার অনুগমন করলেন। রামজীবন নাটোরের অধিকর্তারূপে বিনা দ্বিধায় স্বীকৃত হলেন। ইতিমধ্যে রামজীবনের একমাত্র পুত্র কালীপ্রসাদ ১৭২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে গত হয়েছেন! তাই বংশরক্ষার জন্য রামজীবন তাঁর নিজ কন্যার সন্তান রামকান্তকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করলেন। এই দত্তক গ্রহণে নাটোর বংশের বিষবৃক্ষ রোপিত হল। কারণ রঘুনন্দন ও রামজীবনের আর এক ভাই ছিলেন বিষ্ণুরাম। কুষ্ঠরোগগ্রস্থ হবার জন্য তিনি সর্বদা ঘরে বন্ধ থাকতেন। সম্পত্তিতে তার কোন স্পৃহা ছিল না। কিন্তু তার পুত্র দেবীপ্রসাদ পূর্ণস্বাস্থ্য যুবক। তিনি আশা করেছিলেন যে রামজীবন পুত্রহীন হওয়ায় সম্পত্তির উত্তরাধিকার তিনি পাবেন। রামজীবন দত্তক গ্রহণ করায় তিনি অত্যন্ত আশাহত ও ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে তাঁকে বঞ্চিত করার জন্যই রামজীবন দত্তক গ্রহণ করেছেন। হিন্দুধর্ম বা উত্তরাধিকার বিধি দুইই তাঁর স্বপক্ষে কারণ তিন ভাইএর তিনিই একমাত্র ঔরসজাত জীবিত পুত্র সন্তান।[১১]

সম্ভবত পিতা বিষ্ণুরাম স্বজনদ্রোহ থেকে দেবীপ্রসাদকে তখনকার মতো নিবৃত্ত করেন। যদিও দেবীপ্রসাদের মনের ভেতর যে আগুন থেকে গেল পরে তারই লেলিহান শিখায় রাণী ভবানী এবং তাঁর নাটোরকে দগ্ধ হতে হল।

ইতিমধ্যে রাজা রামজীবন দত্তকপুত্র রামকান্তের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দেওয়ান দয়ারাম নিজে পাত্রী নির্বাচন করে পণপত্রে স্বাক্ষর করলেন।[১২] ত্রয়োদশ বর্ষীয় রামকান্তের সঙ্গে ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টম বৎসরের ভবানীর বিবাহ মহাধুমধামে অনুষ্ঠিত হল। মাত্র চার বছর পরে ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামজীবন পরপারের ডাক শুনলেন। বিষ্ণুরাম ইতিমধ্যেই জীবনযন্ত্রণা থেকে অব্যাহিত পেয়েছেন।

রামকান্ত হলেন নাটোরের দ্বিতীয় রাজা আর তাঁর রাণী ভবানী। দেওয়ান দয়ারাম সভয়ে দেখলেন যে দেবীপ্রসাদরূপী মেঘ এবার ঘোর ঝঞ্ঝার

মতো আকাশ পরিব্যাপ্ত করেছে। দেবীপ্রসাদ স্পষ্টই বলতে লাগলেন যে রামকান্ত অনধিকারী। নাটোরের সম্পত্তিতে তার দাবী থাকবার কোন কারণ নাই। ভাইএর বংশ থাকতে, কন্যার পুত্রের কোন অধিকার জন্মায় না। স্থবির মাতামহের স্নেহের কারুণ্যে দত্তকরূপে গৃহীত হলেও হিন্দুধর্ম বা বিধিতে তা স্বীকৃত হয় না। দেবীপ্রসাদের অধিকার জনসাধারণও মেনে নিলেন। বংশের সন্তানকে ফেলে অন্য গোত্রীয়কে দত্তক নেওয়া অধর্মীয় এমন মন্তব্য করা হল! স্বভাবতই তিন ভাইএর একমাত্র জীবিত পুত্র সন্তান হিসাবে দেবীপ্রসাদ অনেকের সমর্থন পেতে লাগলেন। এই ভ্রাতৃবিরোধে আশঙ্কিত হয়ে দয়ারাম সন্ধির সূত্র খুঁজতে অধীর হলেন। দুই বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করতে করতে দেওয়ান কি ভাবতেন জানা যায় না তবে আড়াই বছর ধরে এই সন্ধির প্রস্তাবের দৌত্য তাঁকে করতে হয়েছিল। অবশেষে দয়ারামই সমাধানের প্রস্তাব করলেন। বললেন এ পরিকল্পনা তাঁর প্রভু রাজা রামজীবনের মৃত্যুর পূর্বের ইচ্ছা। রামকান্তর থাকবে নাটোর ও ষাট শতাংশ সম্পত্তি। দেবীপ্রসাদ পাবেন শতকরা চল্লিশভাগ সম্পত্তি, কিন্তু সম্পত্তি ভাগ করবেন রাজা রামকান্ত। দেবীপ্রসাদ তাঁকে তাঁর রাজা বলে মানবেন বিনিময়ে তাঁকে 'ছোট তরফের' সম্মান দেওয়া হবে। বলাবাহুল্য এই প্রস্তাব কাউকেই খুশী করল না। দেবীপ্রসাদ ভাবলেন তাঁকে ফাঁকি দেবার বন্দোবস্ত হচ্ছে আর রামকান্ত ভাবলেন যে বৃদ্ধ দেওয়ান দেবীপ্রসাদের দিক টেনে প্রস্তাব দিচ্ছেন। তখন দয়ারাম নাটোরের সর্বময়কর্তা। প্রকৃত ক্ষমতা তার হাতে। আদায় ও ব্যয়ও তাঁর আজ্ঞা মতো হয়। চাটু-কারদের এতে সুবিধা হয় না কারণ স্নেহপ্রবণ দয়ারাম রামকান্তকে দোষক্রটি দেখিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। এইবার সুযোগ পেয়ে চাটুকারদল দয়ারাম সম্পর্কে নানা সন্দেহে, অবিবেচক, অনভিজ্ঞ ও বিংশতি বর্ষীয় রামকান্তর মন ভরে দিল। বিশ্বাসঘাতক অপবাদে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামকান্ত বৃদ্ধ দেওয়ান দয়ারাম রায়কে বরখাস্ত করলেন।[১৩]

১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে যে জমিদারী, ক্ষমতার শিখরে, মাত্র ১৩ বছর পর ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দেই তার গৌরবের দিন অতীত হয়ে গেল। একদিকে রামকান্তর অনভিজ্ঞতা এবং তার চাটুকারদের স্বৈরাচারে জমিদারীর নিগ্রহ অন্যদিকে দেবীপ্রসাদ ছলে বলে কৌশলে নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এই

দুই বিপদের মাঝে নাটোর জমিদারীর চরম অব্যবস্থা দেখা গেল। বাংলার রাজনৈতিক আকাশেও তখন ঘনঘটা ঘনিয়ে এসেছে। নবাব সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে তাঁর কর্মচারীরা সমবেত হলেন। আলিবর্দী খাঁ এলেন বিদ্রোহীদের দলপতি হয়ে। রাজা রামকান্ত, নবাব সরফরাজ খাঁর অনুরোধে একদল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিলেন সরফরাজের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য। বীরভূমের বাঁশুলী নদীর তীরে গিরিয়ার রণক্ষেত্রে সরফরাজ খাঁ, নবাবী আর প্রাণ হারালেন। কোটি বৎসরের এক নিরুদ্ধ আগ্নেয়গিরি মূক বিস্ময়ে এই দৃশ্যান্তরের সাক্ষী হল।

নবাব আলিবর্দী খাঁ মুর্শিদাবাদে জমিয়ে বসা মাত্র দেবীপ্রসাদ তাঁর দরবারে আর্জী পেশ করলেন। জানিয়ে দিলেন রামকান্তর ভূতপূর্ব নবাব সরফরাজকে সাহায্য করার কাহিনী। আশ্বাস দিলেন যে পরস্বাপহারী, অনধিকারী বালক রামকান্তর জায়গায় রাজা হলে তিনি নাটোর জমিদারীর দেয় রাজস্বের ওপর আরো দুই লক্ষ টাকা বেশী দেবেন। চারিদিকের আর্থিক প্রয়োজনে নবাব আলিবর্দী তখন দিশাহারা। দেবীপ্রসাদের প্রস্তাব তাঁর কানে নূপুর নিক্কনের মতোই সুমধুর লেগেছিল সন্দেহ নাই। তাই তখনই এক খেলাত দিয়ে দেবীপ্রসাদকে 'রাজা' উপাধি দিলেন। তারপর তাঁকেই নাটোরের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করে নিলেন। একদল নবাবী সৈন্য দেবীপ্রসাদের সঙ্গে চলল নাটোর রাজপ্রাসাদে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আর সেই অনধিকারী রামকান্ত আর তার পরিবারকে বার করে দিতে।[১৪]

১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে হতভাগ্য রামকান্ত পত্নী ভবানীকে সঙ্গে নিয়ে মুর্শিদাবাদে এলেন। রাজধানীর কাছাকাছি থাকার জন্য গঙ্গার ওপর বড়নগরে বাড়ী করলেন। খোঁজ পড়ল দয়ারাম রায়ের। রামকান্ত পূর্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে দয়ারামকে ফিরিয়ে আনলেন। দয়ারামই মুর্শিদাবাদে যাতায়াত করতে লাগলেন। অতঃপর চারমাস দরবারী কূটকচালীর পর জগৎশেঠের আনুকূল্যে রাজা রামকান্ত নাটোরের জমিদার বলে স্বীকৃত হলেন। তাঁকে অবশ্য কথা দিতে হল যে দেবীপ্রসাদ যে খাজনা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি তদপেক্ষা আরো দুই লক্ষ টাকা বেশী রাজস্ব দেবেন।[১৫] ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষে রাজা রামকান্ত ও রানী ভবানী নাটোরে ফিরে গেলেন। দেওয়ান দয়ারাম রায়ের চেষ্টায় ও যত্নে অনেকগুলি সম্পত্তি দেবীপ্রসাদকে দেওয়া হল। দয়ারামের সনির্বন্ধ অনুরোধে অসুস্থ দেবীপ্রসাদ রাজা রামকান্তকে

স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু বিষবৃক্ষে তখন ফল ধরতে আরম্ভ করেছে। মাত্র দশবছরের মধ্যে নিজেদের মধ্যে বিসংবাদের ফলে নাটোর জমিদারীর রাজস্ব চার লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে গেল।

রাজা রামকান্ত ও রাণী ভবানীর দুই পুত্র এবং এক কন্যা জন্মায়। পুত্র দুটি শিশুকালেই কালের কবলে লুপ্ত হলেন। কন্যা তারাসুন্দরীর বিবাহ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প দিনের মধ্যেই বিধবা তারাসুন্দরী পিতৃগৃহে ফিরে এলেন। দেওয়ান দয়ারামের আপ্রাণ চেষ্টায় বর্দ্ধিত হারে রাজস্ব দিয়েও নাটোর জমিদারী ধীরে ধীরে অনুকূল আয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি করল। নূতন বন্দোবস্তের মাধ্যমে রাজস্ব সময়মতো দেবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু নবাব আলিবর্দী কখনই রামকান্তর সংগরাজকে সৈন্যদল পাঠাবার কথা ভুলতে পারলেন না। ক্রমাগত জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির নির্দেশ আসতে লাগল। শেষপর্য্যন্ত ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে একাধিক জায়গীর নবাবকে প্রত্যার্পণ করতে হল। রামকান্ত হঠাৎ ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃবিরোধ আবার শতগুণ বিস্তার করে প্রকটিত হল।

দেবীপ্রসাদ তখন মৃত কিন্তু তাঁর সুযোগ্য পুত্র গৌরীপ্রসাদ নাটোর জমিদারীর দাবীদার হলেন। জানালেন যে হিন্দুর দায়ভাগ নিয়ম অনুসারে যোগ্য উত্তরাধিকারী বর্তমান থাকলে স্ত্রীলোকের কোন অধিকার জন্মায় না। আবার দেওয়ান দয়ারাম ছুটলেন মুর্শিদাবাদে। দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টার ফলে রাণী ভবানী নাটোর জমিদারীর উত্তরাধিকারী ঘোষিত হলেন। বলা বাহুল্য স্বেচ্ছায় রাজস্ব বৃদ্ধিই হল এই প্রাপ্তিযোগের দক্ষিণা। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে শূণ্য রাজকোষ পূর্ণ করার জন্য নবাবের কাছে প্রধান যুক্তিই হল অর্থ। এইভাবে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে নাটোরের সর্বেসর্বা কর্ত্রী হলেন রাণী ভবানী। কিন্তু ভ্রাতৃ বিরোধের ফলে বিশেষ যুবক গৌরীপ্রসাদের সঙ্গে রাজস্বের নিলাম ডাকাডাকিতে দেয় রাজস্ব আকাশ ছোঁয়া হয়ে গেল। বৃদ্ধ দয়ারামের বয়স ষাটের ঘরে তাঁর পক্ষে আর আগের মতো পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। রাণীর পক্ষে একা জমিদারী সংগঠন সম্ভব নয়। নূতন কাউকে নেওয়া হলে গৌরী প্রসাদের পক্ষাবলম্বী হবে কিনা জানা সম্ভব নয়। দরকার ছিল একজন কর্মঠ শাসকের। রাণীর দুর্ভাগ্যক্রমে সেরকম লোক পাওয়া গেল না।

বিপদ এল আর একদিক থেকে। রাণী তাঁর বিধবা কন্যা তারাসুন্দরীকে

নিয়ে তখন বড়নগরে অবস্থান করছেন। একদিন নবাবের অপরিণামদর্শী দৌহিত্র মীর্জা মহম্মদ যিনি একবছর পরে সিরাজ-উদ্-দ্দৌলা নামে বিখ্যাত হন তারাসুন্দরীকে লাভ করার জন্য ব্যাগ্র হয়ে উঠলেন। কেবল অনুরোধে রানী কন্যাদান করবেন না বুঝতে পেরে সিরাজ সৈন্য পাঠালেন তারাসুন্দরীকে হরণ করার জন্য। সময় হল ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। সময়ে খবর পেয়ে রাণী রটিয়ে দিলেন যে তাঁর কন্যা আত্মঘাতী হয়েছেন। সৈন্যদল যখন এল তখন তারাসুন্দরীর নামে এক মৃতদেহ তাদের সম্মুখে যথাযোগ্য সম্মানে দাহ করা হল। ইতিমধ্যে রানী ভবানী ২৬ দাঁড়ী রঙ্গলাল নৌকায় কন্যাকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন। কাশী তখন বাংলার নবাবের আয়ত্তের ও ক্ষমতার বাইরে অযোধ্যা সুবার অন্তর্গত রাজ্য। তারাসুন্দরী কাশীতে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। রানী ভবানী নিয়মিত নাটোর ও কাশীর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন।

এইসব ঘটনায় নাটোর জমিদারীর অভাবনীয় ক্ষতি হয়ে গেল। প্রতি বছর রাজস্ব দেবার সময় হলেই রানী অর্থের প্রয়োজন বোধ করতেন। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই রানী নিয়মিত সম্পত্তি বিক্রি করতে সুরু করলেন। জমিই তখন প্রধান সম্পদ কাজেই ধীরে ধীরে বহু জমিদারীই রানী ভবানীকে বিক্রী করে দিতে হল। নূতন কর্মচারীরা রানীর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে পরিচালন ভার গ্রহণ করতেন তারপর সস্তায় একটা ভাল জমিদারী হয় বেনামীতে নিজে কিনে অথবা অন্যকে বিক্রি করে উৎকোচ গ্রহণ করতেন।

রাণীর দরখাস্ত নিয়মিত নবাবী দপ্তরে জমা হয়েছে। রাজস্ব সময়ে না দিতে পারার বহু নিদর্শন সেখানে জমে আছে। ১৭ই মে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মীরকাশিমকে রানী অনুরোধ করেছেন যে পুরো রাজস্ব না দেবার জন্য তাঁর যে সব কর্মচারীকে নবাব আটক রেখেছেন তাঁদের যেন দয়া করে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর একখানি পত্রে নবাবের রাজস্ব আদায়কারী তোরাব আলি খাঁকে লিখেছেন যে বাইশ হাজার টাকা রাজস্ব দেবার জন্যে মুর্শিদাবাদে পাঠান হয়েছিল কিন্তু পথে তেলেঙ্গা সিপাহীরা সেই অর্থ চুরি করে একটি ইংরেজ ফ্যাক্টরীতে আশ্রয় নিয়েছে। সেই ফ্যাক্টরীর অধ্যক্ষ ব্যাটসনসাহেবকে আর আর এক পত্রে জানালেন যে নবাবের রাজস্ব এক লক্ষ টাকা নিয়ে তাঁর কর্মচারীরা পৌছান মাত্র নবাবের কর্মচারীরা সেই অর্থ অপহরণ করে এবং তাঁর কর্মচারীদের আটক করে। ব্যাটসন সাহেবকে রানী জানিয়েছেন যে

কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা সেই জন্যে তাঁর দিতে দেরী হচ্ছে।[১৬] এই পত্রগুলির মধ্যেকার অসঙ্গতি রানীর আর্থিক অস্বচ্ছলতাকেই প্রকাশ করে। এই অবস্থা ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দেও চলেছে।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাসুবার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায় করার ক্ষমতা পেলেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর গবর্ণর ভেরেলষ্ট কোম্পানীর দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁকে জানাচ্ছেন যে রানী ভবানী তাঁর জমিদারীতে যথেচ্ছভাবে সুপারী প্রভৃতি কোম্পানীর প্রাপ্য রক্ষিত সামগ্রী বিক্রয় করে চলেছেন বলে তার কাছে অভিযোগ এসেছে। রেজা খাঁ যেন অভাবে অনুসন্ধান করেন এবং কোম্পানীর প্রাপ্য রক্ষিত বস্তুগুলি রানীকে অবহিত করেন।[১৭] ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দেও রানীর অবস্থার উন্নতি দেখা যায় না। রাজস্ব দেবার জন্য সময়ের আবেদন নিয়মিতভাবে কোম্পানীর অফিসে জমা পড়েছে। কখন অভিযোগ, কখন অনুযোগ, কখন নিজের দুরবস্থার কাহিনী বলে সময় চাওয়া হয়েছে। বাকী রাজস্ব বাড়তে বাড়তে পর্বতের রূপ নিয়েছে।[১৮]

রাণী ভবানী ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণকে দত্তক নিয়েছেন। রামকৃষ্ণ হলেন রাজা রামজীবনের একমাত্র পুত্র কালীপ্রসাদের দৌহিত্র। দত্তক নেবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ভ্রাতৃবিরোধ বৃদ্ধি পেল। গৌরীপ্রসাদ নবাব এবং ইংরেজ কোম্পানীর কাছে প্রার্থনা জানালেন যে তিনিই যোগ্য অধিকারী সুতরাং নাটোরের সম্পত্তি তাঁরই প্রাপ্য। ইংরেজ কোম্পানীর পক্ষে গবর্ণর হেস্টিংস তাঁর ৫০০ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন কিন্তু নাটোর সম্পত্তিতে তাঁর অধিকার স্বীকার করলেন না। মহারাজা গোরীপ্রসাদ নাম নিয়ে নাটোর বংশের এই ভাগ্যহীন বংশধর সমানে ভ্রাতৃবিরোধ চালিয়ে যেতে লাগলেন।[১৯]

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাণী ভবানীর বাকী রাজস্ব এমন আকার নিল যে কোম্পানী স্থির করলেন যে বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকার বিনিময়ে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব থেকে রাণীকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। প্রতিবছর দুই কিস্তিতে রাণী ২৫০০০০ টাকা পাবেন এবং কোম্পানীর কর্মচারীগণ রাণীর হয়ে রাজস্ব আদায় করবেন। এর জন্য প্রয়োজন মতো রাণীর দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণের সাহায্য নেওয়া হবে। রাণীকে বলা হল যে তিনি

মুর্শিদাবাদের বড়নগরে অথবা কাশীতে তাঁর সময় অতিবাহিত করতে পারেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কোম্পানী রাণীর নামে খাজনা আদায় করতে লাগলেন।[২০] ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হোসিয়া নাটোরে উপস্থিত। কিন্তু রাণী ভবানীও কখন বেশিদিনের জন্য নাটোর ছেড়ে থাকতেন না। রাণী লোকজনের উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে জানতে পারলেই তাদের খাজনা মকুব করে দিতেন, ফলে হোসিয়া সাহেব খুবই অসুবিধায় পড়তেন। এ বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ পত্রগুলি রাণী ভবানীর চরিত্র বোঝার সহায়ক। এই পত্রগুলি থেকে জানা যায় যে রাণী দরিদ্র প্রজাদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন অন্যদিকে ক্ষমতাশালী প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ে তাঁর দুর্বলতা প্রকাশ পেত। ফলে কোন প্রভাব কাছ থেকেই খাজনা আদায় হত না। এ বিষয়ে রাণীর দত্তকপুত্র রাণীকেও যেমন সাহায্য করতে পারেন নাই তেমনি কোম্পানীও তার কাছ থেকে কোন সাহায্যই পেল না।[২১] সম্পত্তি হারাতে হারাতে ১৭৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ১১৯২ সালে নাটোরের সম্পত্তির আয় বা জমা এসে দাঁড়াল মাত্র একুশ লক্ষ টাকায়।[২২] কোথায় অর্ধবঙ্গেশ্বরী আর কোথায় রাজস্ব পীড়িতা এক অসহায়া প্রৌঢ়া।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দেও ভ্রাতৃবিরোধের নিদর্শন বর্তমান। এবার গৌরীপ্রসাদের পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ গবর্ণর কর্নওয়ালিসের কাছে আবেদন করলেন যে রামকৃষ্ণকে যেন অনধিকারী ঘোষণা করা হয় কারণ দায়ভাগ আইনে রামকৃষ্ণ সম্পত্তি পেতে পারেন না বলেই দত্তকপুত্ররূপে রাণী তাকে গ্রহণ করে গঙ্গাপ্রসাদের অধিকারকে ক্ষুন্ন করেছেন। রামকৃষ্ণ সম্পর্কে সাহেব মহলে ধারণা ভাল ছিল না। তারই সুযোগ নিয়ে গঙ্গাপ্রসাদ লিখলেন যে রাণী ভবানী বৃদ্ধা হয়েছেন তাঁর পক্ষে রামকৃষ্ণকে নিবৃত্ত করা সহজ নয় সেই সুযোগে রামকৃষ্ণ নাটোর জমিদারীকে রসাতলে দিচ্ছেন।[২৩] হয়তো কথাটা খুব মিথ্যা নয়। কারণ নিয়মিত রাজস্ব দেবার প্রতিশ্রুতিতে রামকৃষ্ণ নাটোরের শাসনভার নিজে গ্রহণ করেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি হয় না রাজস্ব বাকী পড়তে থাকে এবং রামকৃষ্ণ নিয়মিত সম্পত্তি বিক্রি করেন অথবা সহজ কিস্তিতে ইজারা দিতে থাকেন।[২৪] অন্যদিকে 'মহারাজা' উপাধি পাবার জন্য কলকাতায় ধরাধরিও করতে থাকেন। অবশেষে রাণী ভবানীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। ৬ই জানুয়ারী ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীকে এক দরখাস্ত দিয়ে

জানালেন যে রামকৃষ্ণের অবিবেচনায় নাটোর জমিদারী বিপন্ন এবং তার প্রচুর রাজস্ব বাকী পড়েছে। সমুদয় বাকী রাজস্ব সম্পূর্ণ মিটিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত কোম্পানী যেন 'মহারাজা' খেলাৎ রামকৃষ্ণকে না অর্পণ করেন।[২৫]

কোম্পানী অবশ্য রাণী ভবানীর এই আর্জিতে কর্ণপাত করলেন না। পরের বছর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ রাজশাহীর কমিশনার হ্যারিংটন 'মহারাজা রামকৃষ্ণ'কে রাজস্ব অনাদায়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে 'যথাযোগ্য বাসস্থানে' বন্দী করে রাখলেন। সিপাহশাস্ত্রী পারবৃত থাকলেও রামকৃষ্ণের ভৃত্য ও কর্মচারীদের যাতায়াত অবাধ ছিল। তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অভাব হয় নাই।[২৬]

রাণী ভবানীর সম্পত্তি কেবল রাজস্ব অনাদায়ে বিক্রি হয়ে গেছে একথা ভাবলে ভুল হবে। নূতন জমিদারদের কাছে রাণী বহু সম্পত্তি হারিয়েছেন। বিশেষ সেইসব সম্পত্তি যেখানে তিনি নামে মাত্র জমিদার ছিলেন অথবা যে সম্পত্তিতে তাঁর পূর্ণ অধিকার ছিল না সবই ক্রমে হাত ছাড়া হয়ে গেল। যদি মনে করা হয় যে রাণী সহজে এই সব সম্পত্তিকে ছেড়ে দিয়েছেন তাহলেও ভুল করা হবে কারণ প্রত্যেক সম্পত্তি রাণী রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। বহু জায়গায় লেঠেল পাইক বরকন্দাজ নিয়ে রাণী মারামারি করতে নেমেছেন। ফলে সব দিকেই হেরেছেন। ইংরেজ কোম্পানীর যুগে মারামারি করাকে ভাল চোখে দেখা হোত না, তখন আবেদন নিবেদনের যুগ এসে গিয়েছে। রাণী কিছুকাল দয়ারামের চেষ্টায় জগৎশেঠকে মাতব্বর পেয়েছিলেন। নবাব দরবার উঠে গেলে রামকৃষ্ণ নন্দকুমারকে মাতব্বর ধরলেন। তাঁর ফাঁসী হয়ে গেলে গঙ্গাজলে হাত মুখ ধুয়ে পুনরায় আচমন করে হেস্টিংসের বন্ধু কাশীর বেনারাম পণ্ডিতকে মাতব্বর করলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কিছু অর্থদণ্ড লাগলেও মাতব্বররা প্রত্যেকেই রাণীর কিছু উপকার করেছেন। বিভিন্ন রকমের মাতব্বর দেখলেই বোঝা যায় যে রাণী ভবানী যে দিকে বাতাস বয়েছে সেই দিক থেকেই মাতব্বর ধরেছেন।[২৭] অবশেষে আবেদনও রাণী ভবানী অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। নানা বিষয়ে তাঁর অসংখ্য দরখাস্ত বিভিন্ন সেরেস্তায় পাওয়া যায়।

২৭শে এপ্রিল ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের হাউস অফ্ লর্ডসে রাণী এক দরখাস্ত দিয়ে জানালেন যে ওয়ারেন হেস্টিংস এদেশে সুশাসন প্রবর্তন করেছেন। তাঁর

ওপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল এবং আছে।[২৮] এই দরখাস্তের পরিপ্রেক্ষিতে বার্কসাহেবের বাগ্মীতা হাস্যকর হয়ে গেছে। বার্ক বলেছিলেন যে হেস্টিংসের অত্যাচারে একদা ঐশ্চর্য্যশালিনী রাণী ভবানী পথের ভিখারিনী হয়ে গিয়েছেন। রাণী ভবানী তাঁর প্রতিটি দরখাস্তের তলায় রামকৃষ্ণের স্বাক্ষর করাতেন। বিরাট ব্যাপারে যেমন ক্ষুদ্র ব্যাপারেও তেমনি। নদীয়ায় ভবানীগঞ্জের হাটের স্বত্ব স্বামীত্বের জন্য ১৭৯১ থেকে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমানে দরখাস্ত দিয়ে গেছেন। বলা বাহুল্য হাট তিনি রাখতে পারেন নাই। রাণী ভবানীর সহায়হীনতা সেই যুগে তাঁর কর্মে বাধা সৃষ্টি করেছে। তার কর্মদক্ষতার যে পরিচয় পাওয়া যায় সুষ্ঠু সহকারীর অভাবে তার পূর্ণবিকাশ হল না।

জমিদারীর পরিচালনার অসাফল্যের সঙ্গে রাণী ভবানীর নাম যুক্ত নয়। দেবদ্বিজের সেবা এবং দরিদ্রের উপকার রাণী ভবানীকে প্রাতঃস্মরনীয়া করেছে। হিন্দু ধর্মের উন্নতির জন্য তাঁর দান সুবিখ্যাত হয়ে আছে। আজও বাংলার বহু জায়গায় এবং কাশীখণ্ড জুড়ে রাণী ভবানীর দানের নিদর্শন প্রকটিত। বড়নগরের সুবিখ্যাত মন্দির থেকে কাশীর দুর্গাবাড়ী পর্য্যন্ত রাণীর কীর্তি সরবে প্রকাশিত। তাছাড়া হিন্দু জমিদারের অবশ্য করনীয় কাজগুলি তিনি নিয়মিত করেছেন। দেবালয় সংস্কার, পুষ্করিনী ও বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, কূপ খনন, পান্থশালা নির্মাণ, ব্রহ্মোত্তর দান প্রভৃতি কাজ করতে তিনি কখনও পরাম্মুখ ছিলেন না। রাণী ভবানী সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন টোল ও পণ্ডিত সমাজে নিয়মিত সাহায্য করেছেন। কাশীর পণ্ডিত সমাজে তিনি নিয়মিত ৪০০০০ টাকা করে প্রতি বছর ব্যয় করতেন। অবশ্য মৈমনসিংহের আট আনার জমিদার শ্যামচাঁদ চৌধুরী ১৭৭৮ ও ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর কাছে এক দরখাস্তে জানান যে এই নিয়মিত দান উদ্দেশ্যমূলক। বাংলার পণ্ডিতগণের মতে (নদীয়া ও ভাটপাড়া) স্বভ্রাতৃপুত্র বর্তমান থাকলে সেই সম্পত্তির অধিকারী হয়। এই মতে রাণী রামকৃষ্ণকে দত্তক নিতে পারেন না। সম্পত্তির অধিকার গঙ্গাপ্রসাদকে বর্তায়। তাই তিনি কাশীর পণ্ডিতদের কাছ থেকে মত আনিয়েছেন যে স্বভ্রাতৃপুত্র বর্তমান থাকলেও অন্যকে দত্তক গ্রহণ করা যাবে এবং পুত্রপ্রতিম দত্তক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করবে। বেনারাম পণ্ডিতের চেষ্টায় কাশীর পণ্ডিতদের মতই ইংরেজ কোম্পানী গ্রহণ করলেন এবং রামকৃষ্ণের উত্তরাধিকার মেনে নিলেন।[২৯]

রাণী ভবানীর শ্রেষ্ঠতম কীর্তি ছিয়াত্তরের মম্বন্তরের সময়। এই করাল' দুর্ভিক্ষের সময় রাণীর অপূর্ব কীর্তিকলাপ লোকের মুখে মুখে কথিকায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলার প্রতি ঘরে রাণী ভবানীর নাম ও দাক্ষিণ্যের ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মম্বন্তরের সময় রাণী কেবল যে হাজার হাজার দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ক্ষুধার্ত জনগণের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন তাই নয় নিজেও সেই খাদ্য বিতরণ করেছেন। কোষাগার শূণ্য হয়েছে, দিনের পর দিন রাণী নিজে অভুক্ত থেকেছেন কিন্তু কখনও দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত তাঁর কাছে এসে ফিরে যায় নাই। তখনই তাঁর নাম হল অন্নপূর্ণা এবং আদ্যাশক্তির এক অবতার ভাবা তখন থেকেই সুরু হল। ঔপন্যাসিকগণের মতে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা কবার জন্য স্বয়ং অন্নপূর্ণা রাণী ভবানীর রূপ ধরে মর্তে নেমে আসেন এবং তাঁর কর্তব্যকর্ম শেষ হলে মন্দিরের দুর্গা প্রতিমায় অথবা অন্নপূর্ণা অথবা ভবানী প্রতিমায় বিলীন হয়ে যান। রাণী ভবানী নিঃস্বার্থ সর্বাত্মক জনসেবা এবং দুর্ভিক্ষের সময় অন্নদানে জনগণকে রক্ষা করা তাঁর জীবনেব শ্রেষ্ঠ কীর্তি সন্দেহ নাই। যেখানেই অন্নের অভাব মিটেছে সেখানেই রাণী ভবানীর নাম উচ্চারিত হয়েছে। সত্যকার রাণীর সঙ্গে সম্পর্কহীন 'রাণী ভবানী' নামে এক গ্রামীন দেবতার উদ্ভব হয়েচে। পথে প্রান্তরে কুটিরে প্রাসাদে রাণী ভবানীর পূণ্য নাম সসম্মানে উচ্চারিত হয়েছে।

সত্যকার রাণীর জীবনের ইতিহাস অতীব দুঃখের। শুধুমাত্র সম্পত্তি হারান বা স্বজন বিরোধ নয় তাঁব জীবিতকালেই রাণী সমস্ত প্রিয়জনকে হারান। তারাসুন্দরী কাশীতে দেহ রাখলেন। তাঁর বৃদ্ধ দেওয়ান রাজা দয়ারাম রায় আগেই পরলোকগমন করেছেন। অবশেষে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মের দাবদাহে রামকৃষ্ণ মারা গেলেন। এই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যাঁদের নিয়ে রাণী ভবানী বেঁচেছিলেন সকলের দেহান্ত হয়ে গেল। রাণী এই শোক বেশীদিন সহ্য করতে পারলেন না ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ (২৮শে ভাদ্র ১২০৯ সাল) অল্পদিন রোগভোগের পর পরলোক গমন করলেন।[৩১]

হেইজ সাহেব রাণীর মৃত্যুর খবর কলকাতায় জানাতে গিয়ে তাঁর দান ও দয়াশীলতার কথা উল্লেখ করেছেন। খুব সম্ভবত রাণী ভবানী বড়নগরের বাড়ীতে দেহরক্ষা করেন। কারণ হেইজ তখন মুর্শিদাবাদের কালেকটর। হেইজ জানালেন যে রাণীর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর পুত্রবধূ রামকৃষ্ণের বিধবা

পত্নী মুখাগ্নি করেন। রামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বনাথ সম্ভবত তখন নাটোরে ছিলেন। ৭ই আশ্বিন ১২০৯ সাল রাণী ভবানীর শ্রাদ্ধকার্য নাটোরে সম্পন্ন করলেন বিশ্বনাথ। কয়েকমাস আগে তাঁর পিতার শ্রাদ্ধে ২২৯০০ টাকা ব্যয় হয়। সেই কথা স্মরণ করে ইংরেজ কোম্পানী রাণী ভবানীর শ্রাদ্ধে ১০০০০ টাকা মঞ্জুর করলেন। অতিরিক্ত ব্যয় রাণীর ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে করবার কথাও জানালেন।[৩২]

রাণীর জীবন কাহিনী অত্যন্ত দুঃখের সন্দেহ নাই। যাঁর দয়ার সৌগন্ধ আকাশে বাতাসে বিচরণ করে সমগ্র বাংলায় এক অপূর্ব মহত্ত্ব সৃষ্টি করেছে, যাঁর দানের পুণ্য সমস্ত দেশকে শুচিশুভ্র সুষমায় ভরিয়ে দিয়েছে, যাঁর পুণ্য নাম নিয়ে বাঙালী শুভকার্যে যাত্রা করেছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ব্যথার কাহিনী কজনাই বা জানতো। তিনি নাটোরের শ্রেষ্ঠদিনও যেমন দেখেছেন চরম অবনতিও তাঁকে তেমনি দেখতে হয়েছে। তাঁর সময়েই নাটোর জমিদারীর পতন হয়েছে অথচ তাঁরই কীর্তির সৌরভে নাটোরের নাম স্থায়িত্ব পেয়েছে। রাণী ভবানী বলার সঙ্গে সঙ্গে এক উজ্জ্বল অভয়া অন্নপূর্ণারূপী মাতৃমূর্তিই ভেসে ওঠে, ঐতিহাসিক ব্যক্তির দৈনন্দিন দুঃখ দুর্দশার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নাই। মহারাণী ভবানীর ইতিহাস তাই জনসমক্ষে অবলুপ্ত। তার স্থান জুড়েছে এক বিরাট রূপকথা। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে যার সুরু, তারপর সময়ের সব সীমা হারিয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। রাণী ভবানী রূপান্তরিত দেবী ভবানীতে।

নাটোর রাজবংশ

(১৭০৬ থেকে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ)
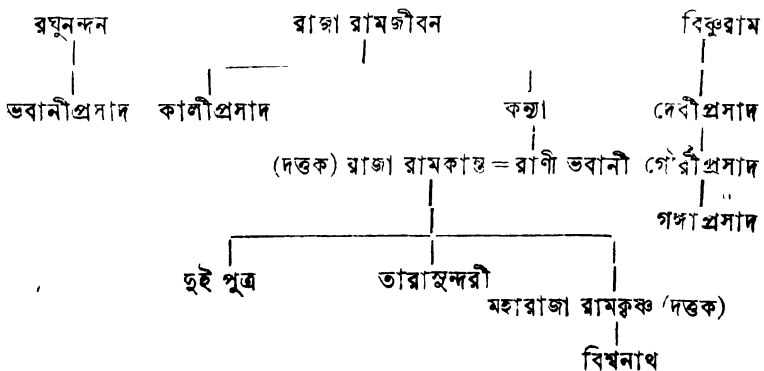
নাটক

রাণী ভবানীকে নিয়ে এ পর্য্যন্ত তিনটি নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে। সবগুলি নাটকেই কল্পিত রাণী ভবানীর চরিত্র নিয়েই আলোচনা নিবদ্ধ, ঐতিহাসিক রাণীকে সেখানে খুঁজে পাওয়া কঠিন। নাটকগুলি সাজান হল :—

১।	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত	(দুর্গাদাস লাহিড়ীর উপন্যাসের নাট্যরূপ)-	রাণী ভবানী
২।	জ্ঞানরঞ্জন ঘটক	(প্রকাশ ১৯১৬)	রাণী ভবানী
৩।	মহেন্দ্র গুপ্ত	(" ১৯৪২)	রাণী ভবানী

নাটকে একদিকে যেমন রাণীর চরিত্রকে নরম মাটির পুতুলের মতো দেখান হয়েছে তেমনি রাণীর দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণকে সাধক করা হয়েছে, নামের মিলে চরিত্রের মিল করা হয়েছে। উভয় চরিত্রই প্রক্ষিপ্ত। দান ও দয়ার খ্যাতি থাকলেই তাঁর সহজ ও করুণ হবার কোন কারণ নাই। অন্তত রাণী ভবানী তা ছিলেন না। তাঁর সাহস, তেজস্বিতা ও জ্ঞান ইংরেজ কোম্পানীর সাহেবরা বারে বারে উল্লেখ করেছেন। রাণীর অমতে, বিশেষ তিনি নাটোরে উপস্থিত থাকলে কিছু করতে পারা যে অসম্ভব একথা হেইজ ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দেই লিখেছেন। রামকৃষ্ণ ভক্ত ছিলেন না, ছিলেন অপটু। একাধিক ব্যক্তি তাঁর অপটুতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে দিয়ে বহু অন্যায় কাজ করিয়েছেন। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্বেও যতদিন রাণী জমিদারীর পরিচালনা করেছেন ততদিন ক্ষতির পরিমাণ কম ছিল। কিন্তু রামকৃষ্ণের হাতে এই ক্ষয় এমন প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেল যে রাণীও শঙ্কিত হলেন। রামকৃষ্ণের অনভিজ্ঞতার ফলেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় নাটোর জমিদারীর স্থান বহুজনের নিচে নেমে গেল। সেখান থেকে ধীরে ধীরে উত্থান ও বাংলার সমাজে নাটোরের সাংস্কৃতিক দান আরো একশত বছরের ঐতিহাসিক ঘটনার ফল।

নাট্যকারগণ বিংশশতাব্দীর নাটোরের কথা মনে রেখে দুইশত বছর আগেকার ইতিহাস ভুলে গেছেন। তাই তাদের নাটকগুলি বিনা আলোচনায় রূপকথার পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীর উপন্যাস থেকে নাটক করেছেন

স্বীকার করেছেন। এই নাটকটি এখন লুপ্ত। জ্ঞানরঞ্জন ঘটকের নাটকেরও কোন হদিশ মেলে না। একমাত্র মহেন্দ্র গুপ্তর 'রাণী ভবানী' পাওয়া যায়।

মহেন্দ্র গুপ্ত : রাণী ভবানী

মহেন্দ্র গুপ্ত দুর্গাদাস লাহিড়ীর উপন্যাস পড়েছেন স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু তিনি কল্পনা চালনা থেকে বিরত থাকতে পারেন নাই ফলে বঙ্কিমের দেবী চৌধুরানীর ভবানী পাঠক তাঁর নাটকের মধ্যে এসেছে। তারপরই হাতির প্রবন্ধ মুখস্ত করা ফাঁকিবাজ ছাত্রের মতো তিনি সিরাজদ্দৌলাকে নিয়ে নাটক রচনা চলেছেন। পলাশীতে সিরাজদ্দৌলার পতন তাঁর নাটকের মুখ্য ঘটনা হয়েছে। নাটক শেষ হয়েছে মহম্মদী বেগ কর্তৃক সিরাজ হত্যায়। কারাগৃহে রাণী ভবানী সিরাজ বধে লম্বা বক্তৃতা করেছেন। নাটক যেমন দুর্বল নাটকের ঘটনাও তেমনি প্রক্ষিপ্ত।

নবাবী ফৌজ কর্তৃক রাজা রামকান্ত ও রাণী ভবানীর রাজ্যচ্যুতিতে নাটক সুরু। দেবীপ্রসাদ, দেবকীপ্রসাদ নামে খলনায়ক হয়েছেন। পরে অবশ্য তিনি কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে যোগ দিয়ে পলাশীর প্রান্তরে জীবন উৎসর্গ করেছেন। পলাশীর যুদ্ধের সাত বছর আগে তিনি দেহরক্ষা করেছেন নাট্যকারের জানা ছিল না। রাজা রামকান্ত এক মূর্খ বালকের মতো রাণী ভবানীর কাছ থেকে কখন কি করতে হবে তার নির্দেশ পাচ্ছেন। চটে গিয়ে তরোয়াল খুলে দেবকীপ্রসাদকে বধ করতে যাচ্ছেন। ভবানীর দত্তকপুত্র রামকৃষ্ণকে আর এক রামকৃষ্ণের ছায়ায় সাধকরূপে দেখান হয়েছে। বলাবাহুল্য এটাও প্রক্ষিপ্ত। তিনি গৃহী ছিলেন এবং বিষয়ী লোক ছিলেন কিন্তু কর্মোক্ষম লোক ছিলেন না। বস্তুত তাঁর জন্যেই নাটোরের পতন অত দ্রুতগতিতে হয়েছে।

অন্যান্য চরিত্র যথা নিয়মে অনৈতিহাসিকতার জের টেনে চলেছে। দেশপ্রাণ সিরাজদ্দৌলা তাঁর স্বামীপ্রাণা স্ত্রী লুৎফা, খল মীরজাফর, নবাব ভৃত্য জগৎশেঠ ও রাজবল্লভ এবং নবাবের বন্ধু মোহনলাল প্রভৃতি চরিত্রগুলি অঙ্কন করতে নাট্যকার প্রচলিত মিথ্যার কোন ব্যতিক্রম করেন নাই।

রাণী ভবানী নাটক তিন অঙ্কে ৯৩ পাতায় সমাপ্ত। প্রথম অঙ্কে তিনটি

দৃশ্য ১ থেকে ৪১ পাতা পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য ৪১ থেকে ৬৯ পাতা পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় অঙ্কে চারটি দৃশ্য ৬৯ থেকে ৯৩ পাতা পর্য্যন্ত। প্রথম অভিনয় ২৪শে জানুয়ারী ১৯৪২ খ্রীঃ।

উপসংহারে এই কথাই মনে আসে যে রাণী ভবানীর পুণ্য চরিত্র নিয়ে নাটক রচনা হল না। তাঁর দেশের মানুষের প্রতি দরদ, তাঁর দয়া দাক্ষিণ্য, জনসাধারনের ধর্মের উন্নতির জন্য তাঁর বিরাট দান নাট্যকারদের টলাতে পারল না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় রাণী ভবানীর মহৎ ভূমিকা কেবল কথিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল। নাট্যকার কেবল সিরাজদ্দোলার সময়ে রাণী ভবানীর কীর্তিকলাপ আলোচনায় আগ্রহ দেখিয়েছেন। রাণীর সঙ্গে নবাবের এ সময় প্রায় কোন যোগই ছিল না, যেটুকু হয়েছিল তারাসুন্দরীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে ইতিহাসও মধুর নয়। কাজেই নাট্যকারকে বাধ্য হয়ে কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। বারে বারেই দেখা যাচ্ছে যে বাঙলার ইতিহাস বা বাঙালীর কীর্তিকাহিনী নাট্যকারদের মন টানতে পারে না। তাঁরা বাঙলা বা বাঙালীর গৌরব প্রকাশের থেকেও কল্পনা সাগরে নিমজ্জমান হয়ে রূপকথা রচনায় বেশী আমোদ পান। তা না হলে রাণী ভবানী নাটকে সিরাজদ্দোলার জীবনী ও চরিত্র প্রাধান্য পাবার কোন কারণ নাই। এই নাটকের এগারটি দৃশ্যের মধ্যে চারটি বৃহৎ দৃশ্য জুড়ে আছেন বাংলার নবাব। দুটি দৃশ্য ভবানী পাঠকের এবং মাত্র পাঁচটি দৃশ্য রাণী ভবানীর। ৯৩ পাতার মধ্যে ৩২ পাতা জুড়ে আছেন বাংলার নবাব।

নাটকীয় ঘটনার বাহুল্য না থাকা সত্ত্বেও রাণী ভবানী নাটকে ঐতিহাসিক রাণী ভবানীর কোন পরিচয় প্রায় পাওয়া যায় না। নাটকে রাণী ভবানীর ঐতিহাসিক জীবন প্রকাশ করতে নাট্যকার অসমর্থ হয়েছেন একথা কঠোর হলেও সত্য।

অযোধ্যার বেগম ॥

এবার অযোধ্যার বেগম সম্পর্কে দু'চার কথা বলা যাক। অযোধ্যার বহু বেগম বা ভাউবেগম রাণী ভবানীর সমসাময়িক। একমাত্র অর্থের প্রাচুর্য্য ছাড়া এই দুই মহান মহিলার মধ্যে কোন মিল নাই। ভবানী ছিলেন মহারাজা রামকান্তের একমাত্র কান্তা আর ভাউবেগম ছিলেন অযোধ্যার নবাব

সুজাউদ্দৌলার ধর্মবিবাহের চার পত্নীর একজন। সুজাউদ্দৌলার জেনানায় শত শত রমণী ছিল বলে প্রবাদ। কেউ বেগম বা অন্য নামে আখ্যাত হলেও স্ত্রীদেহবিলাসী সুজাউদ্দৌলার এই বিরাট বেগম মহল তাঁর নামকে বর্তমান কালেও জীবিত রেখেছে। সম্ভোগ রমণের যুগেও অযোধ্যার নবাবের খ্যাতি সুবিদিত ছিল।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৩২৮ সালের ১৭ই অগ্রাণ যখন 'অযোধ্যার বেগম' নাটক লিখে অভিনয় করলেন ষ্টার থিয়েটারে তখন অযোধ্যার নবাবের নামে নানা প্রচলিত কথিকা ছাড়া অন্য কোন খবর তিনি জানতেন না। জানতেন না যে মোগল রাজত্ব কতকগুলি সুবায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সুবায় একজন সুবাদার নিযুক্ত হতেন যাঁর উপাধি হত নবাব। বাংলা সুবার অন্তর্গত ছিল বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের কামরূপ জেলা প্রভৃতি যে জায়গাগুলি তখন বাংলার অংশ বলে গণ্য হোত। এই সুবাদার সাধারণত 'বাংলার নবাব' বলে উল্লিখিত হতেন। এই কথার মানে আজকে গবর্ণর অফ্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল বলতে যা বোঝায় তার থেকে এক ইঞ্চি বেশী নয় যদিও তখনকার বাংলার নবাব মানে বাংলার সুবাদার যার ভৌগলিক পরিধি আজকের বাংলা বিহার উড়িষ্যা। সব থকে বড় সুবা ছিল অযোধ্যা। এই সুবার অন্তর্গত ছিল সমগ্র মধ্যপ্রদেশ ও হিমাচলপ্রদেশ হিমালয় পর্য্যন্ত, দক্ষিণে নর্মদা ও পশ্চিমে দিল্লী। দিল্লীর বাদশার প্রধান আমির (বাঙালী নাট্যকারদের খুব পছন্দ ওমরাহ শব্দটি। এটি আমির শব্দের বহুবচন মাত্র।) সাধারণতঃ অযোধ্যর সুবাদারী পেতেন। প্রায়ই দেখা গেছে যে অযোধ্যার নবাব দিল্লীর বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী হয়েছেন। তার রাজনৈতিক কারণও ছিল। দিল্লীর বাদশাহরা ছিলেন সুন্নী আর অযোধ্যার নবাবরা ছিলেন সিয়া। প্রধান মন্ত্রণাদাতার পদে তাঁদের রেখে সুন্নী ও সিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। দুর্দ্ধর্ষ আফগান রোহিলা সম্প্রদায়কে অযোধ্যার নবাবই বশে রাখতে পারতেন।

বাদশাহ পুত্র আলি গৌহর দিল্লী থেকে বিতাড়িত হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলারই আশ্রয় গ্রহণ করেন। অযোধ্যার নবাবই তাকে বাদশাহ ঘোষণা করেন এবং তাঁদের সম্মিলিত বাহিনী বাংলার বিতাড়িত নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে মিলিত হয়ে বক্সারে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন। এই

পরাজয়ের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ বাংলা বিহার উড়িষ্যার বা বাংলা সুবার দেওয়ানী বা রাজস্ব মন্ত্রীত্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিতে বাধ্য হন। অযোধ্যার নবাবকেও বেনারস ও গাজীপুর পর্য্যন্ত ভূভাগ ছাড়তে হল। অর্থাৎ বাংলা সুবার পশ্চিম পরিধি বেনারস ও গাজীপুর জেলা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হল।

এই সময়কার ইতিহাসে অযোধ্যার নবাব একজন অত্যন্ত ক্ষমতাশীল ব্যক্তি। বাদশাহীর পুনঃপ্রতিষ্টার ক্ষমতা তাঁর ছিল। ক্রমবর্দ্ধমান ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো অর্থবল, জনবল এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাঁর ছিল। কিন্তু তৎকালীন নবাবী নিয়মের ব্যতিক্রম তিনি করতে পারলেন না তাই সুরা, সাকী, সম্ভোগ, বিলাস থেকে নিজেকে মুক্ত করার কোন চেষ্টাই করলেন না। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই অযোধ্যা সুবা ইংরেজ অধিকারে চলে গেল এবং সেই সঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

অপরেশচন্দ্র এই সব ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামান নাই। তাঁর নাটক পলায়নপর মীরকাশিমকে অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় দেওয়ায় সুরু হয়েছে। তারপর বক্সারে পরাজয় ও মীরকাশিমকে পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে নাটক নবাব সুজাউদ্দৌলার যুবতী স্ত্রীলোকের প্রতি আকর্ষণ এবং রোহিলা আফগানদের সঙ্গে বিরোধের এক রূপকথার গল্পে নিমজ্জিত হয়েছে। নাটক শেষ হবার আগে সুজাউদ্দৌলার এবং রোহিলা নায়কদের মৃত্যু দেখান হয়েছে। শেষ দৃশ্য দিল্লীর পথে ভিক্ষুকরূপে নবাব মীরকাশিম এবং তাঁর পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু এবং রোহিলা প্রেমিক প্রেমিকার পুনর্মিলন।

নাটকে বাদশাহ আলিগৌহারের কোন চিহ্ন নাই। অযোধ্যার ভাউ বেগম সর্বদা সকলের উপকার করে বেড়ালেন বলেই নাটকের নাম 'অযোধ্যার বেগম' রাখা হয়েছে। যেমন মীরকাশিমকে আশ্রয় দিতে ভাউবেগম তাঁর স্বামীকে অনুপ্রাণিত করলেন। কিন্তু বক্সারে যেতে তাঁর বাধা না শোনাই সুজাউদ্দৌলার পতনের কারণ হল। বক্সারে শত্রু পরিবেষ্টিত নবাবকে ভাউ বেগমই রক্ষা করলেন। মীরকাশিমকে পরিত্যাগ করতে বা রোহিলাদের সঙ্গে যুদ্ধে মাততে ভাউবেগমের নিষেধ মানলেন না নবাব সুজাউদ্দৌলা। বন্দিনী যুবতী সম্ভোগ করতে গিয়ে বিষাক্ত ছুরিতে প্রাণ হারালেন। ভাউ

বেগমের নিষেধ না শুনে নবাব তাঁর বিলাসী জ্যেষ্ঠ পুত্র আসফউদ্দৌলাকে নবাবী তক্ত দেওয়াতে অযোধ্যার পতন হল। মীরকাশিমকে রক্ষার শেষ চেষ্টা করে অসফল হলেন বেগম যদিও তাঁর চেষ্টাতে রোহিলা প্রেমিক প্রেমিকা পুনর্মিলিত হলেন। ভাউবেগমের সাফল্য হতাশায় নাটকের পরিসমাপ্তি হল।

নাটকে ১৭৬৪ থেকে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা দেখান হয়েছে কিন্তু ইতিহাস নাটকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বক্সারের যুদ্ধ ও মীরকাশিমের মৃত্যু ছাড়া সবই কল্পিত ঘটনা।

তবু যোগবিয়োগের নিয়ম মিলিয়ে নাটক জমাবার যথেষ্ট উপকরণ আছে। সুবিখ্যাত অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর ভাউবেগমের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় নাটকের সুনাম বর্দ্ধিত করেছে। মীরকাশিম হতেন চুনীলাল দেব, নবাবকে হত্যা করতেন কৃষ্ণভামিনী আর নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করতেন প্রফুল্ল সেনগুপ্ত ও নীহারবালা। পাঁচ অঙ্কের নাটক ১৮৩ পাতায় সমাপ্ত। প্রথম অঙ্ক ১ থেকে ৫২ পাতায়, আটটি দৃশ্য। দ্বিতীয় অঙ্ক ৫৩ থেকে ৮৮ পাতায় ছয়টি দৃশ্য, তৃতীয় অঙ্ক ৮৯ থেকে ১১৪ পাতায় পাঁচটি দৃশ্য, চতুর্থ অঙ্ক ১১৫ থেকে ১৪৫ পাতায় পাঁচটি দৃশ্য, ও পঞ্চম অঙ্ক ১৪৬ থেকে ১৮৩ পাতায় সাতটি দৃশ্য। নাটক পরিচালনা করেন স্বয়ং অপরেশচন্দ্র। নাটক প্রকাশিত হল শ্রাবণ ১৩৩৭ সালে বা ১৯৩০ খ্রীঃ।

উপসংহারে বলতে ইচ্ছা হয় রাণী ভবানীর সম্পর্কে এতো কথিকা থাকা সত্ত্বেও তাঁর নাটক অবহেলিত। ভাউবেগম সম্পর্কে কোন খবর না থাকাতেও কেবল রূপকথা দিয়েই ভাউবেগমকে এক মহান চরিত্ররূপে অঙ্কন করা হয়েছে। সামঞ্জস্যবিধান করে যদি রাণী ভবানীর নাটক অপরেশচন্দ্রকে দিয়ে লেখান যেত হয়তো একটি সুন্দর নাটক পড়বার সুযোগ পাওয়া যেত। দুঃখের বিষয় তা হয় নাই। তার ফলে দুটি নাটকের কোনটিতেই সন্তোষ আসে না। ঐতিহাসিক নাটক রচনার দিক থেকে দুইটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা। অষ্টাদশ শতাব্দীর দুটি মহান জীবনকে নাটকের মাধ্যমে প্রকাশে নাট্যকারদ্বয় অপারগ হয়েছেন এই কথা বলেই এ প্রবন্ধের ছেদ টানা যাক।

সূত্র নির্দেশ

১। দুর্গাদাস লাহিড়ী, রাণী ভবানী (১৩১৭)।

২। Sir Jadunath Sircar, ed. History of Bengal, Vol. II, p. 414.

৩। Calcutta Review, 1873, Vol. 56, Territorial Aristrocracy of Bengal, The Rajas of Rajshahi, pp. 1—20

৪। যদুনাথ সরকার, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সীতারামের ঐতিহাসিক ভূমিকা (সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ)।

৫। A. Karim, Murshid Quli Khan and his times, p. 218.

৬। Calcutta Review, Op. Cit.

৭। যদুনাথ সরকার, সীতারামের ঐতিহাসিক ভূমিকা।
এবং A. Karim, Op. Cit., p. 49—53.

৮। Calcutta Review, Op. Cit.

৯। A. Karim, Op. Cit, p. 82—83, 218, 250.

০। Calcutta Review, Op. Cit.

১। Ibid.

২। Ibid.

৩। দুর্গাদাস লাহিড়ী, রাণী ভবানী।

৪। তদেব।
এবং Proceedings of the Revenue Board consisting of the whole Council of 7 June 1774.

৫। Ibid.

৬। Persian Corrospondence as preserved in the National Archives, Vol. I, Letter Nos. 1164, 1165, 1179 & 1194.

৭। Ibid, Letter No. 2774.

৮। A. Controlling Council of Revenue at Murshidabad, Proceedings of 11 May 1771 ; 14 December, 1771 ; 23 December, 1771 and 8 August 1774.
B. Revenue Board consisting of the whole Council,

Proceedings of 11 January 1774, 16 March 1774, 5 April 1774 and 9 August 1774.

১৯। Proceedings of the Revenue Dept. (separate), Revenue Khalsa proceedings of 15 November 1778, Vol. 3 pp. 312—313 ; proceedings of 5 January 1779 Vol. 4, pp. 41—53.

২০। ১৮নং সূত্র দেখুন।

২১। IOR. MSS. EUR E 51/B, C, D. Orme Mss Journal 14 April 1777 to 12 September 1777.

২২। Proceedings of the Revenue Department of 3 April 1788, p. 23.

২৩। Ibid. of 18 April 1781, p. 1911—1929.

২৪। Calcutta Review, Op. Cit.

২৫। IOR. Bengal Revenue Consultations (Council), Proceedings of 6 January 1792 No. 4.

২৬। Calcutta Review, Op. Cit.

২৭। ১৯নং সূত্র দেখুন।

২৮। Debate of the House of Lords on evidence delivered in the Trial of Warren Hasting, Esquire, and Testimonials of the British and native inhabitants of India, (1797), pp. 673—674.

২৯। IOR. (A) Bengal Revenue Council Proceeding of 7 October 1791 p. 166—187.

(B) Bengal Revenue Consultations (Miscl), Sayer Consultation of 30 April 1801.

৩০। IOR. Proceedings of the Revenue Dept. (Separate) Revenue Khalsa of 15 November 1778, Vol. 3 p. 312—313 and of 5 January 1779, Vol. 4, p. 41—53.

৩১। Bengal Board of Revenue Consultations of 17 September, 1802, Nator, No. 50.

৩২। Ibid. of 21 September 1802, No. 11.

রাণী ভবানী ও অযোধ্যার বেগম রচনায় নিম্নলিখিত পুস্তকাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১। Debate of the House of Lords in the Trial of Warren Hastings Esq.

২। Zemindari papers of Dighapatia Raj and Cossimbazar Raj.

৩। History of the Trial of Warren Hastings Esq. (1796) Day to day reports.

৪। Right Hon. Edmund Burke : Impeachment of Warren Hastings.

৫। G. W. Forrest : The Administration of Warren Hastings.

৬। N. K. Sinha (Ed.) History of Bengal (1757—1905).

৭। P. J. Marshall : Impeachment of Warren Hastings.
—Economic and Political Expansion : A case of Oudh. (pamphlet).

৮। J. Long : Unpublished Records.

৯। IOR. The Orme Papers.

১০। Brit Mus. The Hastings Papers.

১১। IOR. The Fowke Papers.

১২। IOR. The Francis Papers.

১৩। IOR. Miscl. European MSS.

১৪। Warren Hastings : Memoirs Relative to the State of India.

১৫। Articles of Charge of High Crimes and Misdemeanors against Warren Hastings Esq. (1786).

মারাঠা শিখ ও মহিশূর তারপর সিপাহী বিদ্রোহ

বাংলার অঙ্গন থেকে আগিয়ে গিয়ে দেখা যায় যে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের প্রথম যুগে ভারতবর্ষের নানা নেতার সংগ্রাম নাটকের বিষয়বস্তু হয়েছে। ইংরেজের কাছে পরাভব বাঙালীর মনকে স্বাদেশীকতায় উদ্বুদ্ধ করেছে যার প্রকাশ হয়েছে নাটকে। দুঃখের বিষয় এই পর্য্যায়ের অধিকাংশ নাটক সংগ্রহ করা যায় নাই যার ফলে এই পরিচ্ছেদের আলোচনাকে অসম্পূর্ণ গণ্য করতে হবে।

মারাঠাদের নিয়ে মাত্র একখানা নাটক দেখা যায়:—মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত মাধবরাও। নাটক না পাওয়ায় ঐতিহাসিকতা আলোচনা সম্ভব হবে না।

শিখেদের নিয়ে তিনখানা নাটক আছে।

১। শিখ—বিপিনবিহারী নন্দী।

২। পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ—মহেন্দ্র গুপ্ত।

৩। রণজিতের জীবনযজ্ঞ—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়।

মাত্র পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ পাওয়া গেছে তাই এই নাটকটি আলোচিত হবে।

মহিশূর সম্পর্কে সব থেকে বেশী নাটক লেখা হয়েছে। সব সমেত পাঁচখানি নাটকের নাম পাওয়া যায়:—

১। হায়দর আলি—সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। (১৯২১)

২। হায়দর সাহেব বা হায়দর আলি—সরোজ রায়চৌধুরী। (১৯৪২)

৩। হায়দার আলি—মহেন্দ্র গুপ্ত। (১৯৪৮)

৪। টিপু সুলতান—মহেন্দ্র গুপ্ত। (১৯৪৪)

৫। সয়মা নাটক? (সম্ভবত মহিশূর নিয়ে রচিত) (১৮৮০)

বর্তমানে মাত্র একখানি নাটক পাওয়া গেছে সেখানি আলোচনা করা হবে। নাটকটি টিপু সুলতান।

ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব বৃদ্ধি পেতে সুরু করল বক্সার যুদ্ধের পর থেকেই। শাসনব্যবস্থাকে সুসংবদ্ধ করতে ইংরেজের দশবছর সময় লাগল তারপরেই

ভারতের বুকের ওপর দিয়ে সুরু হল তাদের বিজয় অভিযান। দিল্লীর বাদশাহ তখন দিল্লী থেকে পলাতক তাঁর আশ্রয়দাতা প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যার নবাব। ভূগোলের দিক থেকেও বাংলা সুবার গায়েই অযোধ্যা সুবা। তাই অযোধ্যার নবাবকে ইংরেজ বশে আনবার চেষ্টা সুরু হল। অন্যদিকে মারাঠা শক্তি তখন মহাপরক্রমশালী। আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর অথবা গুজরাট থেকে উড়িষ্যা তাদের দখলে। দিল্লীতে পর্য্যন্ত মারাঠা ক্ষমতা ও পরাক্রম স্বীকৃত। মারাঠা মহানায়ক মহাদাজী সিন্ধিয়ার পরাক্রমের খ্যাতি দিকে দিকে বিস্তারিত। মারাঠা কূটনৈতিক নানা ফাড়নীস বিচক্ষণতায় চাণক্য ও যুদ্ধবিদ্যায় দ্রোণাচার্য। দুজনেই অর্থাৎ মহাদাজী সিন্ধিয়া ও নানা ফাড়নীস দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের পলাতক সৈন্যাধ্যক্ষ। এই দুই মহানায়কের কাছে যে কোন ব্যক্তি পরাভূত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। অর্ধভারতের অধিশ্বর মারাঠাদের পতন তাই অবিশ্বাস্য। মহানায়কদ্বয় কেবল পরস্পরের ক্ষমতা নাশ করলেন। তাদের পক্ষাবলম্বীগণ গৃহযুদ্ধে ভ্রাতৃবধে এমন মেতে থাকলেন যে মারাঠার সম্মিলিতবাহিনী ইংরেজের সম্মুখীন হল না। ইংরেজ ধীরে ধীরে একে একে বিভিন্ন মারাঠা নায়কদের আলাদা আলাদা যুদ্ধে পরাজিত করলেন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লেক যখন দিল্লী দখল করলেন তখন ইংরেজের ভারত জয় সম্পূর্ণ হয়েছে বলে গণ্য করা হল।

মারাঠা পতিত হল। তাদের অভ্রংলিহ শৌর্য্য স্বার্থপরতার কূপে নিমজ্জিত হল। আপৎকালে মেদিনী রথচক্র গ্রাস করল, ব্রহ্মবিদ্যা বিস্মরণ হল। ভ্রাতৃহত্যা, অনাচার, অত্যাচার কিছুই বাদ গেল না। মারাঠা পতনে আনন্দিত রাজপুত কিছুদিনের মধ্যেই সন্ধির জালে ইংরেজ বশ্যতা স্বীকার করলেন।

এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে মহারাজ রণজিৎ সিংহ ক্ষমতা আহরণ করে ভারতীয় শৌর্য্যকে শেষবারের জন্য প্রজ্বলিত করলেন। পাঞ্জাব থেকে কাশ্মীর তার বশ্যতা স্বীকার করল। শেষ গান তখন সুরু হয়ে গেছে। মহাবীর রণজিৎ সিংহের বুঝতে সময় লাগে নাই যে ইংরেজ প্রভুত্বের লাল রংকে রোধ করা কতো কঠিন। তাই অকর্মণ্য ও বিলাসী পুত্র খড়্গ সিংহকে বাদ দিয়ে পৌত্র নওনিহাল সিংহকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করলেন। রণজিৎ সিংহের মৃতদেহ শীতল হবার আগেই, সুরু হল ভ্রাতৃবিরোধ। অপঘাত

না গুপ্তহত্যা বিচার কে করবে। শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা নওনিহাল সিংহের মৃতদেহের সঙ্গে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেল।

পাঞ্জাবের সর্বসম্মত নেতা নাকি নাবালক দলিপ সিংহ। তাঁর মাতা ঝিন্দন কাউরকে নাকি রণজিৎ কোনদিন সত্যই বিবাহ করেছিলেন। দলিপ সিংহ বিলেতে গিয়ে জনৈক মেমসাহেবের পাণিগ্রহণ করলেন। বোধহয় খ্রীস্টানও হয়েছিলেন। কাশ্মীরের শিখ রাজবংশ দাড়ী কেটে বিলেতে গিয়ে 'শ্রীযুক্ত এ' নামে কেচ্ছাকাহিনীর নায়ক হলেন। রণজিতের সঙ্গেই শিখ সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়ে গেল।

এইভাবে একে একে নিভিল দেউটি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিদেশীর পায়ের তলে পিষ্ট হল। এই ব্যর্থতা যেমন হৃদয় বিদারক তেমনী শিক্ষনীয়। নাটকের যোগ্যবস্তু বটে।

নাটকও রচিত হয়েছে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'সরমা নাটক' সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যদি বাদও দেওয়া যায় তাহলেও মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (সম্ভবত) ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত মাধবরাও বা স্বরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত নাটক থেকে মহেন্দ্র গুপ্তর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হায়দার আলি পর্য্যন্ত এক নিরবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা রক্ষা সংগ্রামের ক্ষেত্রে বাঙালী নাট্যকার সর্বভারতীয় ঐতিহাসিক নায়কদের সম্পর্কে সজাগ ছিলেন সেটাই প্রমাণ হয়।

নাটকগুলি নিয়ে আলোচনায় নামার আগে ইতিহাসের ঘটনাগুলি মনে করে নেওয়া যাক। একটু পেছন থেকেই স্বরু করা যাক। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দের তালিকোটের যুদ্ধে বিজয়নগর সাম্রাজ্য ধ্বংস হল। মহিশূরের রাজ্যপাল রাজ ওয়াদিয়ার (ওয়াদিয়ার শব্দের অর্থ সম্রাটের প্রতিনিধি) বিজয়নগরের বশ্যতা অস্বীকার করে নিজেকে স্বাধীন ঘোষণা করলেন। তাঁর বংশধর চিক্কা দেবরাজ বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন এবং দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে বাদশাহ পক্ষে থাকার জন্য উপাধি ও হস্তিদন্ত নির্মিত সিংহাসন উপহার পান ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। মহিশূরের কোলার জেলায় হায়দার আলি ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহীশূর রাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তাঁর নির্ভীক কর্মধারা এবং যুদ্ধ নিপুণতা তাকে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ সহজেই পাইয়ে দিল। তারপর নিজাম পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধে মহিশূর যখন মেতে উঠলেন সেই

সুযোগে হায়দার আলিও নিজাম পুত্র নাসিরজঙের শিবির লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্নের অধিকারী হলেন। নাসিরজঙ ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে গুপ্তঘাতক দ্বারা হত হলেন। ইংরেজ তখন যেমন পূর্ব ভারতে প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত ছিল ফরাসীরা তেমনি দক্ষিণ ভারতে নিজেদের প্রাধান্য কায়েমী করতে চেষ্টা করেছে। হায়দার আলির ক্ষমতার পূর্ণ সুযোগ নেবার জন্য মহিশূররাজ তাঁকে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিণ্ডিগুল জেলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। দক্ষিণ ভারতের রাজনীতি ঘোলাটে হয়ে এল। ফরাসী সাহায্যে নিজাম মহিশূরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। সেই প্রবল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ না করে মহিশূররাজ অর্থ দিয়ে সন্ধি ক্রয় করলেন। সে খবর প্রকাশ হওয়া মাত্র মারাঠা পেশোয়া বালাজী বাজীরাও স্বয়ং বিরাট এক বাহিনী নিয়ে মহিশূর আক্রমণ করতে এলেন। তাদেরকেও প্রচুর অর্থ দিয়ে সন্ধি ক্রয় করা হল। রাজকোষ হল অর্থশূন্য। মহিশূরের সৈন্যরা দীর্ঘদিন বেতন না পেয়ে শেষে বিদ্রোহ করল। হায়দার আলির ওপর বিদ্রোহ প্রশমনের ভার পড়ল। তিনি কাউকে যুদ্ধে হারিয়ে, কারু ধন সম্পদ লুণ্ঠন করে অন্যদের সন্তুষ্ট করলেন।

গৃহযুদ্ধের খবর পেয়ে মারাঠারা ফিরে এল। হায়দার আলির নেতৃত্বে এক মহিশূর বাহিনী গোপালরাও পট্টবর্দ্ধনকে পরাজিত করল। আনন্দিত মহিশূররাজ হায়দার আলিকে উপাধি দিলেন ফতে হায়দার বাহাদুর। তখন থেকে হায়দার আলিই হলেন মহিশূররাজের প্রধান সহায়। একদিকে প্রবল প্রতাপ মারাঠা অন্যদিকে পরাক্রান্ত নিজাম তাছাড়া ছোট ছোট প্রতিবেশী কালিকটের জামুরিন বা ত্রিবাঙ্কুরের নায়ক কেউ মহিশূরের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন নন। এরই মধ্যে আবার আরকটের নবাবের উত্তরাধিকার নিয়ে এসে গেল ইংরেজ। এই সংকট থেকে মুক্তি পাবার জন্য হায়দার আলি সব ছেড়ে মাদ্রাজ দখল করতে সৈন্য চালনা করলেন। ইংরেজ সংযত হল। হায়দার আলির সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হল। কিন্তু ওদিকে নূতন পেশোয়া মাধবরাও ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আক্রমণ করবার ভয় দেখিয়ে পয়ত্রিশ লক্ষ টাকা সন্ধিপণ আদায় করলেন। দুবছর যেতে না যেতেই পেশোয়া মাধবরাও, আবার যুদ্ধসাজে সজ্জিত এবারকার সন্ধিপণ এককোটি টাকা। দুইপক্ষ যুদ্ধসাজে সজ্জিত কিন্তু হটাৎ অসুস্থ হয়ে মাধবরাও ফিরে গেলেন পুণা। সেনাপতিত্ব

করতে এলেন ত্র্যম্বকরাও। প্রথম দিকের যুদ্ধে জিতলেও লুণ্ঠন করতে ব্যস্ত মারাঠা সৈন্যদের শেষ পর্য্যন্ত হায়দার আলি বাধা দিলেন। সেই সঙ্গে খবর পেলেন যে মহিশূররাজ স্বয়ং মারাঠাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছেন, মূল্য হায়দার আলি। অচিরাৎ গুপ্তঘাতক দিয়ে মহিশূররাজকে হত্যা করিয়ে হায়দার আলি রাজ-ভ্রাতা চামরাজ ওয়াদিয়ারকে রাজা ঘোষণা করলেন। মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করে হায়দার আলি কূর্গপ্রদেশ দখল করলেন।

মারাঠাদের তখন ঘোর দুর্দিন। পেশোয়া মাধব রাও ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলেন। তাঁর ছোট ভাই নারায়ণ রাও পেশোয়া হলেন বটে কিন্তু এক বছরের মধ্যে গুপ্তঘাতকের অস্ত্রে মৃত্যুবরণ করলেন। তার খুড়ো রঘুনাথ রাও বা রঘোবার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে নারায়ন রাও এর নাবালক পুত্র দ্বিতীয় মাধব রাও নামে পেশোয়া ঘোষিত হলেন।

মারাঠাদের এই বিপদে হায়দার আলির দ্রুত রাজ্য বিস্তার সহজ হল। রঘোবার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মারাঠাদেরকে দেয় চৌথ কমিয়ে একচতুর্থাংশ করে ফেললেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হায়দার আলি মহীশূরের একছত্র অধিপতি। রাজা চামরাজের মৃত্যুর পর তারই বংশের এক বালককে নামমাত্র অধিপতি ঘোষণা করে হায়দারের ক্ষমতা হল অপ্রতিহত। (১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপুর নিধনের পর এই বালককেই মহিশূর রাজ বলে স্বীকার করে ইংরেজ তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি ৬৮ বছর রাজা থেকে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান।) এই বছরেই নিজামের কাছ থেকে তিনি বেলরি জেলা কেড়ে নিলেন।

দ্বিতীয় মাধব রাও ক্ষমতায় বসতেই নানা ফাড়নীস মহিশূর আক্রমণ করলেন। রঘোবার সঙ্গে হায়দার আলির সখ্য সহজে ভুলে যাবার বিষয় নয়। তাই এবার মারাঠা-বাহিনী ভয়ানকভাবে পরাজিত হল। হায়দারের জয়ে আশান্বিত হয়ে মারাঠাদের অন্য পক্ষ তার সঙ্গে যোগ দিল। মারাঠা ক্ষমতা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। হায়দার ধীরে ধীরে কৃষ্ণা এবং তুঙ্গভদ্রার মাঝে একচ্ছত্র অধিপতি হলেন। মহাকূটচক্রী নানা ফাড়নীস সন্ধির সর্ত পাঠালেন। নব পেশোয়ার বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করলেন। মারাঠা, নিজাম ও মহিশূর একত্র হয়ে স্থির করলেন যে ইংরেজদের প্রথমে দাক্ষিণাত্য থেকে এবং পরে ভারত থেকে বিতাড়ন করতে হবে। সম্ভবত ইংরেজকে ভারত থেকে বিতাড়নের সম্মিলিত রাষ্ট্রবর্গের এইটাই প্রথম এবং শেষ সংকল্প। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে নানা

ফাড়নীসের চেষ্টায় একই সঙ্গে মারাঠা আক্রমণ করল আরকট আর হায়দার আলি মাদ্রাজ। কিন্তু নিজাম নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের চরম কৃতিত্বে মারাঠা মহিশূর আর নিজামের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল। ভারতে ইংরেজ আধিপত্য রক্ষা পেল।

তারপর শুরু হল ইংরেজের সঙ্গে হায়দার আলির সরাসরি লড়াই। ইংরেজ সহজেই বুঝে নিল হায়দারের পতন না হলে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপন করা যাবে না। হায়দারের বিরুদ্ধে তাই আয়ার কুট, হাম্বারস্টোন প্রভৃতি বড় বড় সেনাপতিকে নিয়ত যুদ্ধ সজ্জা করতে দেখা যায়। অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতের এক তাঁবুতে কর্কটরোগে হায়দার আলির মৃত্যু হল ২রা ডিসেম্বর ১৭৮২। কথিত আছে যে হায়দার আলি নাকি বলেছিলেন যে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ভুল ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের থেকে সন্ধির প্রয়োজনই যুক্তিসঙ্গত ছিল কারণ তাঁদের মধ্যে বিরোধের বিষয় বিশেষ কিছু ছিল না। ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে হায়দার আলি সমগ্র দাক্ষিণাত্যকে মহিশূর রাজ্যের বশে আনতে পারতেন।

হায়দার আলির মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশ বছর (জন্ম ১৭৫৩ খ্রীঃ) টিপু সুলতান অসমসাহসী যোদ্ধাএবং ব্যূহরচনা সম্পর্কে সহজাত জ্ঞানের অধিকারী হলেও জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারলেন না তার প্রধান কারণ তাঁর জীবন এবং অভিজ্ঞতা মধ্যযুগীয় কোটর থেকে বাইরে আসতে পারে নাই। পৃথিবী যে কতো বদলে গেছে টিপু বুঝতে পারেন নাই। ইংরেজদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং ফরাসীদের অকর্মণ্যতার কারণ তাঁর কাছে কখনও স্পষ্ট হয় নাই। হলে যে অশিক্ষিত মেধা তাঁকে চালনা করেছে তা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে প্রবাহিত হত। জীবনের শেষের দিকে এই মেধার তাড়নায় তিনি এক সাংঘাতিক কাজ করে ফেললেন যার জের সামলাতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নাস্তানাবুদ হতে হল। কিন্তু টিপু সুলতান নিজে কি করেছেন বুঝতে পারেন নাই। তাই জানতেন না কেন ইংরেজ তাঁর নিধনের জন্য এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জানলে তিনি আরো সাবধানে যুদ্ধ প্রণালী নির্ণয় করতেন। বেঁচে থাকার চেষ্টা করতেন।

এই সাংঘাতিক কাজ কি এবার বলা যাক। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে টিপু সুলতান

ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টের খবর এবং তাঁর দিগ্বিজয়ের কাহিনী শুনলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মরিশাশ দ্বীপের ফরাসী শাসনকর্তার মাধ্যমে নেপোলিয়ানের সাহায্য চাইলেন। টিপু জানতেন না বটে কিন্তু গবর্ণর জেনারেল ওয়েলেসলী জানতেন যে নেপোলিয়ান তখন মিশর পর্য্যন্ত এসে গেছেন। ইচ্ছা করলে সহজেই ভারতে আসতে পারেন। তিনি হিসাব করলেন যে কোনক্রমেই ফরাসী সৈন্য ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের আগে ভারতে পদার্পণ করতে পারবে না, হয়তো সময় আরো চার পাঁচ মাস বেশী লাগবে। সুতরাং যেমন করেই হোক ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শীতকাল আসবার আগে এবং সম্ভব হলে মে মাসের মধ্যে টিপুকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে। নেপোলিয়ান ভারতে আসবার কথা কখনও ভেবেছিলেন কি না ঠিক জানা নাই। কিন্তু ওয়েলেসলীর কার্য্যপ্রণালী নিধারণে কোন ত্রুটি ছিলনা। তাই সর্বশক্তি নিয়োজিত হল টিপুর নিধনে। তাঁর বিরাট বাহিনীর গোলাবর্ষণে শ্রীরঙ্গ-পত্তনের পতন হল। সেইদিনই টিপু সুলতানের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল। তারিখ ২রা মে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। নেপোলিয়ান ওই বছরের অক্টোবর মাসে মিশর থেকে ফিরে গেলে ইংরেজ কোম্পানী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

১৭৮২ থেকে ১৭৯৯ এই সাড়ে ষোল বছর টিপু সুলতান ভীম পরাক্রমে রাজত্ব করেছেন। মহিশূররাজকে বিদায় করে দিয়ে নিজেকে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'পাদশা' ঘোষণা করলেন এবং দিল্লীর বাদশাহকে অমান্য করে নিজের নামে মুদ্রা ছাপালেন ও মসজিদে খুতবা পাঠের হুকুম দিলেন।

এই ঘটনায় বাদশাহ পক্ষরা টিপুসুলতানকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলেন। এদিকে ওয়ারেন হেস্টিংস মারাঠা বীর মহাদাজী সিন্ধিয়ার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনা করে ইংরেজ-মারাঠা যুদ্ধে বিরতি আনলেন। নিজাম সহজেই সন্ধি করতে রাজী হলেন। কাজেই প্রথমবার যখন ইংরেজ বাহিনী টিপুর সৈন্যদের মুখোমুখী দাঁড়াল তখন টিপু একা, তাঁর সাহায্যে কেউ নাই। সম্ভবত এই একাকীত্বই তাঁর বীরত্বকে এমন করে জাগিয়ে দিল যে ইংরেজ সৈন্য পরাভূত হল। যার ফলে ইংরেজ সৈন্যদের মুখে মুখে গুজবে গুঞ্জনে টিপু সুলতান এক বৃহদাকার দানবে রূপান্তরিত হলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস বহু যুদ্ধের পর ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে টিপুর সঙ্গে সন্ধি করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু এই সন্ধির ফলে মহিশূর রাজ্যের যে সব জেলা বা প্রদেশ টিপু এবং তার

পিতা বাহুবলে জয় করেছিলেন সেগুলি টিপুকে ছেড়ে দিতে হল। এই সন্ধিকে টিপু পরাজয় মনে করে প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। আবার যুদ্ধ বাধল। অবশেষে ওয়েলেসলীর নেতৃত্বে ২রা মে ১৭৯৯ শ্রীরঙ্গপত্তনের পতন ও টিপুর মৃত্যু ইংরেজদের সামনে থেকে ভারতবর্ষ অধিকার করার শেষ বাধা সরিয়ে দিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর প্রাঙ্গনে যে বিজয় অভিযান সুরু হয়েছিল তা ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনের ভগ্নদুর্গে সমাপ্ত হল।

মহিশূরে টিপু সুলতান যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে জীবনমরণ সংগ্রামে নিয়ত শিখ রণজিৎ সিংহ তখন লাহোরে বিবাহিত হচ্ছেন (জন্ম ১৭৮০)। দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহের হত্যার পর (১৭০৮) শিখ সম্প্রদায় নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করছিল। রণজিৎ সিংহ এই শিখ সম্প্রদায়কে ধীরে ধীরে সংহত করলেন এবং টিপুর মৃত্যুর মাত্র দুই মাস পরে জুলাই ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর ও অমৃতসরকে নিজের দখলে আনলেন। পাঞ্জাবের অন্যান্য জেলায় ক্রমেই তার প্রভুত্ব বিস্তারিত হল। টিপু সুলতানের ভুল সংশোধন করে তিনি প্রথম থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা করলেন। সুবিখ্যাত চার্লস মেটকাফ তাঁর দরবারে ইংরেজদের প্রতিনিধি হয়ে এলেন। ইংরেজদের দেখে রণজিৎ সিংহ সৈন্যদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন বুঝেছিলেন তাই টিপুর মতো অনেক বিদেশী সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর দরবারে ছিল। জেনারেল ভেনটুরা ও জেনারেল অ্যালার্ড কেবল জাতে ফরাসী নন নেপোলিয়ানের নেতৃত্বে যুদ্ধ করবার সুযোগ তাদের হয়েছিল। গোলাগুলিতে আইরিশদের প্রাধান্য বুঝে তিনি রেখেছিলেন কর্ণেল কোর্ট ও কর্ণেল গার্ডনারকে। আধুনিক যুদ্ধে কামানই বড় সম্বল বুঝে ১৯২টি কামান তিনি প্রস্তুত রেখেছিলেন। সৈন্যবাহিনীর নাম দিয়েছিলেন 'খালসা সেনা'।

অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি রণজিৎ সিংহকে তার সমসাময়িকদের মধ্যে চিহ্নিত করেছে। তিনি সযত্নে ইংরেজ অধিকৃত বা অধিকৃত হতে পারে এমন এলাকা পরিহার করে পাঞ্জাবের পশ্চিমের দেশগুলি জয় করতে ব্যস্ত হলেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে আফগান নবাব মুজাফ্ফর খাঁর কাছ থেকে মুলতান কেড়ে নিলেন। বন্দুক ও কামানের পূর্ণ ব্যবহার করে রণজিৎ তাঁর প্রতিপক্ষকে তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাবার কোন সুযোগই দিলেন না। তারপরই কাশ্মীর অভিযান। সহজে কাশ্মীর বশ্যতা মানল না। দীর্ঘদিন যুদ্ধের পর ১৮২৩

খ্রীষ্টাব্দে আফগানদের পরাভূত করে কাশ্মীর দখল করা হল। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই খালসা সেনা পেশোয়ার দখল করল। বলা হয় 'লাইলী' নামে এক আরবী অশ্ব পাবার জন্য রণজিৎ সিংহ ষাট লক্ষ টাকা আর বার হাজার জীবন ব্যয় করেছেন।

ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ইংরেজদের মনোভাব বুঝতে রণজিৎ সিংহের ভুল হয় নাই। তিনি একথাও বুঝেছিলেন যে তাঁর সাধের লাহোর, তাঁর খালসা সাম্রাজ্য সবই একদিন ইংরেজ পদানত হবে। তাই তাঁর সেই বিখ্যাত বাক্য 'সব লাল হো জায়গা'।

এবার ইংরেজ উপযাচক হয়ে এল সন্ধি করতে কারণ দ্বারে রুশশক্তি। যদি রণজিতের সঙ্গে বন্ধুত্বের মাধ্যমে পাঞ্জাবের উপত্যকায় নেমে আসে রুশ ভল্লুক এই হল বৃটিশ সিংহের ভয়। রুশ জার আলেকজাণ্ডার, স্বয়ং নেপোলিয়ানকে ফিরে যেতে বাধ্য করেছেন। তাঁর রাজ্য বিস্তারের লিপ্সা কারু থেকে কম নয়। তাই আগেভাগেই সন্ধি ভিক্ষা করা হল রণজিতের কাছে। সর্ত একটা অবশ্য ছিল সেই সঙ্গে।

আফগানিস্থানের সাহসূজা তখন রণজিতের আশ্রয়প্রার্থী তাঁর কাছে থেকে আহরিত অমূল্য মণি কোহিনূর তখন রণজিতের কোষাগারে। ইংরেজদের সর্ত হল যে এই ত্রিপাক্ষিক সন্ধিতে সাহসূজা হবেন একপক্ষ। তাই হল। শ্রীমতী এমিলি ইডেন তাঁর দাদা গবর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড ও মহারাজা রণজিৎ সিংহের সাক্ষাৎকারের এক অপূর্ব বিবরণ রেখে গেছেন। বলেছেন রণজিৎ ছিলেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং কুৎসিৎ। আলিঙ্গনের সময় পাগড়ীসুদ্ধ শিখরাজা তার ভাই এর চিবুক পর্য্যন্ত পৌছতেন। তিনি রণজিতের অন্তঃপুরেরও বিবরণ দিয়েছেন।

এই সন্ধি রণজিতের জীবনে ভাল ফলই এনেছিল। ডাকাত মানেই শিখ এই শব্দ পরিবর্তিত করলেন রণজিৎ। তাঁর সুশাসনে শিখরা সুসংবদ্ধ জাতিতে রূপান্তরিত হল। পাঞ্জাবের মাঠে ফলল সোনা। কোমরে কৃপাণ বেধে শিখ চাষী শান্ত, সংহত গৃহস্থ হয়ে উঠল। রণজিতের বিচার ছিল জবরদস্ত। দোষীকে হয় তার গ্রামের সীমানায় ফাঁসী দেওয়া হত কিংবা তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হত। সব পাপই গুরু ধরে নিয়ে নিঃসঙ্কোচে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। ফলে অপকর্মের বোঝা অতিক্রুত কমে গেল।

রণজিতের শাসন পদ্ধতি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনীয় বস্তু। কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা একীভূত হবার ফল খারাপ হল। সুরা নারী অসৎ সঙ্গে প্রিয় পুত্র নষ্ট হয়ে গেল। অতি তরুণ পৌত্রকে শিক্ষিত করার তাগিদের পেছনে রণজিতের জীবনজোরা ভুলের খেসারত। শেষ সময়ে বাঁচবার অশালীন আকুতি। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিতের মৃত্যু হল। তাঁর মৃতদেহ নিয়ে যাবার সময়কার এক দুর্ঘটনায় বা গুপ্তহত্যায় তাঁর প্রিয়তম পৌত্র ও উত্তরাধিকারী নওনিহাল সিংহ হত হলেন। পিতামহ ও পৌত্রের সঙ্গে দাহ হল পাঞ্জাবে স্থায়ী শিখ সাম্রাজ্য স্থাপনার আশা।

রণজিতের মৃত্যুর ছয়বছর পর ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধির সর্ত অমান্য করে শিখরা ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলে অভিযান সুরু করল। কয়েকটি যুদ্ধেই সুসংযত বীর খালসা বাহিনী পরাজিত হল। আবার সন্ধি। আবার যুদ্ধ। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে শেষ পরাজয়ের পর বৃদ্ধ শিখ সেনানী মন্তব্য করলেন 'আজ রণজিৎ সিংহ মর গিয়া'। রণজিতের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের পরাধীনতা সম্পূর্ণ হল। বিশাল ভারতে এমন একজন নেতাও থাকলেন না যিনি স্বাধীনতার আলোকবর্তিকাকে জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম। ইংরেজ ভারতে তার কায়েমী অধিকার সম্প্রসারিত করতে পারল, তার প্রধান কারণ দেশ ছিল নেতাহীন। এই নেতৃহীনতা প্রকাশ পেল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহে। মারাঠা নানাসাহেব, বাদশাহ বাহাদুর শাহ বা গোয়ালিয়রে ঝান্সির রাণীর মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না, কোন কর্মপদ্ধতি স্থির হয়নি। কেউ কারু নেতৃত্ব মানেন নাই। তাই তান্তিয়া তোপীর বীরত্ব এক একক ঘটনা। সিপাহী বিদ্রোহ ভারতীয় ক্ষোভের এক নিতান্ত দুর্বল বিস্ফোরণ। অবশ্য তাতে ফল হল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হল। ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী নামে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন। একটা যুগান্ত হল।

এই পরিচ্ছদ প্রসঙ্গে প্রায় একশত বছরের যে সব ঘটনা বর্ণিত হল তাতে নাটকীয় ঘটনা কম নাই। বাংলার নাট্যকারগণ বুঝতে ভুল করেন নাই যে নাটক লেখার এমন প্রশস্ত বিষয়বস্তু পাওয়া দুর্লভ হবে। কিন্তু তারপর তাঁরা যা করেছেন তা আগেও বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে ঘটনা চয়ন না করে রূপকথা উপকথাকে নাটকের বিষয়বস্তু করেছেন যার ফলে একদিকে

ঐতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্র যেমন পালটে গেছে অন্যদিকে তার কীর্ত্তির মধ্যে যে বিশেষত্ব ছিল তাও নাট্যকার প্রকাশ করতে পারেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলতে পারে যে হায়দার আলী এবং তার ছেলে টিপু সুলতান উভয়েই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাঁদের যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য যেমন বিভিন্ন ছিল যুদ্ধ করবার ধরণেও তফাৎ ছিল। হায়দার আলীর মতো কুশলী সৈন্যাধ্যক্ষকে ইংরেজ ঐতিহাসিক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কিন্তু টিপু সুলতানের নৃশংসতার কাহিনী ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছে। তারা মনে করতেন টিপুর হাতে বন্দী হওয়া মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা কাজেই তার থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াও ভাল। এই মনোভাবের ফলে যুদ্ধের ধরণ পালটে যেত। টিপু সুলতান নেপোলিয়ানকে ভারতে ডেকে আনতে পারেন এই ভয়ে টিপুর ক্ষমতা রোধ ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক জরুরী কাজ হয়ে দাঁড়াল। কারণ নেপোলিয়ান ভারতবর্ষে এলে কি হবে সেটা তারা টিপুর থেকে ভাল জানতেন। হিন্দুদের প্রতি টিপু যে বিদ্বেষ পোষণ করতেন না বা তাদের ওপর অযথা অত্যাচার করতেন না তা পরলোকগত আচার্য্য ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন একাধিক প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেছেন যে কোন গর্হিত অপরাধে কোন হিন্দু শাস্তি পেলেই সমগ্র হিন্দু জনসাধারণ ত্রস্ত হতেন ভাবতেন এইবার বুঝি হিন্দু নিধন যজ্ঞ সুরু হবে। মহিশূরের নামে মাত্র হিন্দুরাজাকে বিতাড়নের ফলেই যে এই ধরণের আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সব থেকে বিপদের কথা হল মারাঠারা মহিশূর প্রবেশ করলে হিন্দুদের এক অংশ এবং নিজাম এলে মুসলমানদের একাংশ চিরকাল টিপুসুলতানের বিরোধীতা করেছে। সম্ভবত এইসব কারণেই টিপুকে কঠোর হতে হয়েছে—হয়তো সময়ে সময়ে আজকালকার সংজ্ঞা অনুযায়ী—নৃশংস হতে হয়েছে। তাঁর এই চরিত্র তার পতনকেই ত্বরান্বিত করেছে।

টিপু সুলতান॥

নাট্যকারগণ বলা বাহুল্য এত সব ভাবনা চিন্তার ধারে কাছেও যান নাই। টিপু সুলতান নাটকের নাট্যকার ১১২ পাতার তিন অঙ্কের নাটক রচনা করেছেন কেবল রূপকথা অবলম্বন করে। স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনয়

রজনী ১৯মে ১৯৪৪। নাটকের বিষয় হায়দার আলি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে টিপু যুদ্ধের পক্ষে কিন্তু অন্য পুত্র ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধের অবসান করতে ব্যগ্র। হায়দার চান ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়ন করতে। তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'মহিশূরের সুলতান'। এই কাজে মারাঠা মন্ত্রী নানা ফড়ণাবীশ তাকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। হিন্দুমুসলমান একত্রে মিলে ইংরেজকে ভারত থেকে বিতাড়নের সংকল্প, কংগ্রেসের ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের 'Quit India' আন্দোলনের পরবর্তী কালের নাটকে ধ্বনিত হচ্ছে আনুমানিক ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু নাট্যকারও এই মিথ্যা বজায় রাখতে পারলেন না। মারাঠা সভায় তাঁকে এই সন্ধি নাকচ করতে হল। টিপুর প্রতিনিধি হয়ে এলেন পণ্ডিচেরীর ফরাসী গবর্ণর লালী। তিনি ইংরেজদের মতো 'ট' 'ট' করে মারাঠা নায়কদের গালি দিলেন। নাট্যকার তাঁকে টিপু সুলতানের ফরাসী সেনাপতি বানিয়েছেন। হাহতোস্মি! ইতিহাস ভণ্ডুল করে পেশোয়া হায়দারের সঙ্গে সন্ধি করতে চললেন, যদিও হায়দারের সঙ্গে রঘোবার বন্ধুত্ব মারাঠা শক্তির পতনের এক কারণ। রঘোবা বা রঘুনাথ রাও নাটকে কোথাও নাই। শেষে নানা ফড়ণাবীশের কোলে হায়দারের মৃত্যু হল। তারপর টিপু হলেন সুলতান। নানা ফড়ণাবীশ আর টিপু, হায়দার বিহনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে শোকাশ্রু বিসর্জন করলেন। (পাতা ১৩৯)

নিজাম ও মারাঠা ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়ে হিংসায় ভুগছেন এবং ভাবছেন যে টিপু কেন এখনও অপরাজিত। এমন সময় জানা গেল টিপুর ভ্রাতা ইংরেজ পক্ষে যোগ দিয়েছেন। ওদিকে টিপু কেবল ইংরেজ নিধন করছেন না ইংরেজদের পরিচ্ছদ ও ভাষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন। আচ্ছা নাট্যকারের এ কি রকম অসুস্থ কল্পনা, টিপুর ছেলে শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গের মধ্যে বসে ইংরেজী পোষাকে সজ্জিত হল, ইংরেজী ভাষা শিখল কিন্তু টিপু কিছুই জানতে পারলেন না হঠাৎ একদিন দেখতে পেয়ে খুব চিৎকার করলেন। বদহজমেরও একটা সীমা আছে। তারপর আরো আছে। লালী জানাচ্ছেন তাঁর ফরাসী রাজা ষোড়শ লুই তাঁকে সাহায্য করতে পারবেন না জানিয়েছেন। কি সাংঘাতিক। মাত্র কয়েকমাস রাজত্বের পর যে ষোড়শ লুইকে জনসাধারণ শিরচ্ছেদ করল ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনিও নাট্যকারের কষ্টকল্পনার

শিকার হলেন। এদিকে নানা ফড়ণাবীশ কিন্তু ক্রমান্বয়ে মহিশূরের সাহায্যে মারাঠাকে আনবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়. কোন মারাঠা নায়কই তার কথা শুনছেন না। টিপুর ভাই কিন্তু বসে নাই। সে মহিশূরের জনসাধারণের পক্ষে টিপুর বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ করেছে লর্ড কর্ণওয়ালিসের দরবারে। যেন ইংরেজ তখন দেশের প্রভু হয়ে গেছে। ইংরেজের কাছ থেকে পুরস্কারের লোভে টিপুর ভাই, টিপু গৃহিনীকে দৈববাণী শুনিয়ে গেল। তদনুযায়ী টিপু গৃহিনী সেই দৈববানী নিজে শুনেছেন বলে টিপুকে জানালেন। টিপু বাংলা নাটকের নায়কের মতো সেই কথায় বিশ্বাস করে লালবাগ থেকে সৈন্য সরিয়ে নিলেন এবং সেই দিক থেকেই বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে ইংরেজসেনা প্রবেশ করল। এবং তখনই হল, 'টিপু সুলতানের ভীষণতম পরাজয়!' (পাতা ৪৮-৮৩)

না নাটক শেষ হয় নাই। এবার শেষ অঙ্ক। নিজামের সঙ্গে ওয়েলেসলীর সাক্ষাৎকার। উপস্থিত লালী। সাবসিডেয়ারী এলায়েন্স স্বাক্ষর পর্য্যন্ত আলোচিত হচ্ছে। এবং বলা হয়েছে ওই ভয়েই মারাঠারা টিপুকে সমর্থন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাজী হল। সিন্ধিয়া বলে যে চরিত্রটি নাট্যকার ছেড়েছেন তিনি নিশ্চয় মহাদাজী সিন্ধিয়া নন। পরন্তু ওই নামের কোন মহাবীরের অস্তিত্ব সম্পর্কে নাট্যকার জ্ঞাত একথা মনে হয়না। অবশেষে মারাঠা বাহিনী টিপুকে সাহায্য করতে এল কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে। টিপু পরাজিত। বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে আত্মাহুতি দিলেন। মারাঠা বাহিনী নিয়ে পেশোয়া মাধব রাও নারায়ণ ও নানা ফড়ণাবীশ এসে গেলেন। হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃত্বের বক্তৃতা সাঙ্গ হবার পর নানা ফড়ণাবীশের কোলে টিপু দেহ রাখলেন। (পাতা ৮৪-১২২)

প্রথমে দেওয়া ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে ইতিহাসের সঙ্গে নাটকের কোন সম্বন্ধ নাই। নাট্যকারের নিজের যেমন এই সংগ্রাম বোঝবার ক্ষমতা হয় নাই তার দর্শকদেরও তেমনি তা বোঝাতে পারেন নাই। সম্পূর্ণ ভেজাল এক নাট্য চরিত্র টিপুসুলতানের নামে দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। কোন তিরস্কারই এই নাট্যকারের পক্ষে যথেষ্ট কঠোর নয়।

পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ ॥

পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ নাটকে এই একই ধরণের কষ্টকল্পনার

বাহুল্য দেখা যাবে। ইতিহাসের পরিধির বাইরে বিচরণ বাঙালী নাট্যকারদের এক অদ্ভুত ব্যবহার। চার অঙ্কের নাটক ৯৬ পাতায় সম্পূর্ণ। প্রথম অভিনয় রজনী ১০ই জুলাই ১৯৪০। যদিও মাত্র সতের বছর বয়সে মাতা রাজকাউরের নিধনের পরই রণজিৎ সিংহ ক্ষমতাশীল হন কিন্তু নাটকে তিনি মাতৃভক্ত সন্তান। নাটকের শেষে মাতার হত্যার জন্য দায়ী করছেন নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র খড়্গ সিংহকে। ইতিহাস বলে রণজিৎ বারটি শিখ মিশলকে একতাবদ্ধ করে তারপর সাম্রাজ্য স্থাপনে তৎপর হন। নাটকে দেখান হয়েছে দ্বিধা বিভক্ত মিশলগুলির কতকগুলি রণজিতের পক্ষে অন্যগুলি বিপক্ষে, তাদের বিরুদ্ধে রণজিৎ যুদ্ধ করে চলেছেন। আর লাহোরের সিংহাসন যেন তার পৈত্রিক সম্পত্তি। ইতিহাস বলে প্রতিপত্তিশালী কানহাইয়া মিশলের গুরুবক্স সিংহের কন্যা মেহতাব কাউরকে ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহের পরে রণজিতের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হল। কিন্তু মাতা রাজকাউর তার নিজের সুখচরিয়া মিশলের নেতৃত্ব কিছুতেই দিতে চাইছিলেন না বলে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মাতৃহত্যার প্রয়োজন হয়। পণ্ডিতেরা গবেষণা করছেন যে এই দুষ্কার্য্য রণজিৎ সহস্তে করেন অর্থাৎ নিজের হাতে শ্বাসরোধ করে রাজকাউরকে হত্যা করেন না গুপ্তঘাতকের সাহায্য নেন। নাটক এই সব কঠিন বিষয় সম্পর্কে নীরব। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী মনোভাব পাঞ্জাবের উচ্চাকাঙ্খী কঠোর মনোভাবের নাগাল পাবে কি করে। রণজিৎ বিবাহবন্ধনের ভেতর দিয়ে ক্ষমতাবৃদ্ধি করেছেন। অত্যন্ত ক্ষমতাশালী নেক্কী মিশলের রাজকাউরকে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহ করে তাকেই প্রধানা-মহিষীর সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি, ফরাসী ও আইরিশ সৈন্যাধ্যক্ষ রাখা তার সুপরিকল্পিত কার্য্যধারার ফল। লাহোর ও অমৃতসর জয় করে সাম্রাজ্য স্থাপন যে কতো বড় কীর্ত্তি তা বোঝবার ক্ষমতা নাট্যকারের থাকলে তিনি কিছু ইতিহাস অধ্যয়ন করতেন। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত রোগীর কষ্ট কল্পনাগুলিকে নাটকে সন্নিবেশিত করে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করতেন না।

খড়্গ সিংহ রণজিতের জীবনে চরম বিফলতা। রাজ্য বিস্তারের মাঝে সুরা ও নারী প্রীতি রণজিতের প্রয়োজন ছিল। পুত্র পিতার মাত্র এই গুণটি শিক্ষা পেলেন অন্যগুলি নয়। রণজিতের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী পৌত্র নওনিহাল সিংহকে হত্যা করায় খড়্গ সিংহ এবং তার মাস ভ্রাতুদের

দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। এ হেন হীন নিকৃষ্ট চরিত্রকে নাট্যকার মহান রংএ সাজিয়েছেন। তার কীর্তিকলাপকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়েছেন। খড়্গ সিংহ চরিত্রচিত্রণে যে অশ্লিলতা নাট্যকার প্রকাশ করেছেন সমাজ সচেতন যে কোন দেশে তার জন্ত তাকে গঞ্জনা সহ্য করতে হত। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে একমাত্র অতি আধুনিক রাজনৈতিক বিষয়ে ছাড়া—অন্ত বিষয়ে যা খুশী লেখার অবাধ স্বাধীনতা সকলকে দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণকে ভারত ইতিহাসের ভুল শিক্ষা দিলে কোন অপরাধই হয় না এই কথাই বারে বারে প্রমাণ হবে।

টিলসিটে নেপোলিয়নের সঙ্গে রুশ-জার আলেকজাণ্ডার সন্ধি করলেন। এই দুই বৃহৎ শক্তির চুক্তিতে বহুলোক ভীত হল। ইংরেজ আশঙ্কিত হল যে আফগানিস্থানের ভেতর দিয়ে ভারতে রুশবাহিনী আসতে পারে এবং যদি রণজিত সিংহের সঙ্গে তাদের কোন বোঝাপড়া হয় তাহলে ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্যের দরজায় রুশ-শক্তি ঘা মারবে। ইংরেজদের এই ভীতির কারণ সর্বভারতীয় নেতাদের মধ্যে রণজিৎ সিংহের মতো একজন অশিক্ষিত নরপতি খবর রেখেছিলেন এটা কম শ্লাঘার কথা নয়। বস্তুত রণজিতের মতো আন্ত-র্জাতিক ঘটনা সম্পর্কে সজাগ আর কোন নেতাকেই দেখা যায় না। রণজিতের ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তির মূল কথা হল মুলতান, কাশ্মীর ও পেশোয়ার জয়ে ইংরেজ তাকে বাধা দেবে না। ইংরেজরা তাতেই রাজী যদি আফগানিস্থানের পলাতক দুররাণী নৃপতি শাহসুজা এই ত্রিপাক্ষীক চুক্তির এক পক্ষ হন। অর্থাৎ আফগানিস্থানে রুশ শক্তি এলে ইংরেজ সেখানে গিয়ে তাদের বাধা দেবার অধিকার চাইল। শাহসুজা কিন্তু তার আগেই রণজিতের আশ্রয়ে এসেছেন এবং ইতিমধ্যে তার কোহিনুর মণিটি রণজিৎ হস্তগত করেছেন। তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তার রাজত্ব রণজিৎ বাহুবলে পুনরুদ্ধার করে দেবেন। কাজেই এই ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে স্বাক্ষর না করার সাধ্য শাহসুজার ছিল না। নাট্যকার অবশ্য অতশত বোঝেন নাই। তিনি মহান ভ্রাতৃপ্রেম, বন্ধুত্ব, উপকার, আশ্রয়দাতা প্রভৃতি ভাল ভাল কথার পর উষ্ণীষ বিনিময় করিয়েছেন। শিখের উষ্ণীষ যে তার ধর্মের অঙ্গ এই কাণ্ডজ্ঞানটুকুও নাট্যকারের নাই বুদ্ধিবৃত্তির কথা বাদ দিলাম।

গবর্ণর জেনারেল অকল্যাণ্ডের চিফ্ সেক্রেটারি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রণজিতের

বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন মহারাজার চরিত্রের বিস্তার অসম্ভবের সীমানা ছাড়ায়। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদ্যপানের আসরে যেতে বা বিদ্যা আহরণের সভা থেকে শিকার করতে যেতে তাঁর মাত্র একমুহূর্ত সময় লাগে। সাধারণের একটা কাজ করবার কথা ভাবতে যা সময় লাগে মহারাজার লাগে তার সিকির সিকি এমনই বিস্ময়কর মানুষ।

নাট্যকার অবশ্য অত জানবার সুযোগ পান নাই। তিনি ঝিন্দন কাউরকে রণজিতের প্রধানা মহিষীর সম্মান দিয়েছেন। এটাও ভুল। রূপসী ঝিন্দন কাউর রণজিতের সম্ভুক্ত স্ত্রীলোকদের একজন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রণজিৎ হয়তো তাকে বিবাহ করে সম্মানের আসন দিয়েছিলেন কিন্তু সে বিবাহ গোপনেই হয়। যেজন্য ঝিন্দনের সন্তান দলিপ সিংহকে শিখদের এক অংশ রণজিতের পুত্র বলে স্বীকার করতে চায় নাই। তারপর রণজিৎ সিংহ ছিলেন অত্যন্ত কুৎসিৎ দলিপ সিংহ অত্যন্ত সুপুরুষ। পিতার কোন চিহ্নই তার দেহ মনে দেখা যায়নি। নাট্যকার অঙ্ক করতেও ভুলে গেছেন। যদি রণজিৎ সিংহের মাতা রাজ কাউরকে মৃত্যুর সময় অর্থাৎ ১৭৯৭ অথবা কাশ্মীর জয়ের সময় অর্থাৎ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে দলিপ সিংহ পাঁচবছর বয়স্ক এবং নওনিহাল সিংহ যুবক অর্থাৎ ২০ বছর বয়স্ক ধরা যায় তাহলে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর সময় অর্থাৎ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দলিপ সিংহের বয়স হবে হয় ৪৭ অথবা ২১ বছর আর নওনিহাল সিংহের বয়স হবে হয় ৬২ অথবা ৩৬ বছর। যা একেবারেই অসম্ভব কল্পনা।

নাট্যকারের কাণ্ডজ্ঞানের এই পরিচয়ের পর সম্ভবত আর কোন আলোচনার অবকাশ নাই।

শিখ জাতির অভ্যুত্থান নিয়ে লেখা অন্য নাটক রক্তের লেখা এই আলোচনার, সীমানার বাইরে কারণ সেটি নবম শিখগুরু তেগবাহাদুর ও দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের সঙ্গে বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের দ্বন্দ্বের কাহিনী। কষ্টকল্পিত অনৈতিহাসিক এক অসুস্থ মস্তিষ্কের প্রলাপ।

পরবর্তীকালের অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে লেখা নাটকগুলির মধ্যেও এই একই ঘটনা দেখা যায়। শুধু যে সেগুলি অনৈতিহাসিক তা নয় চিন্তায় ভাবনায় অতি ক্ষুদ্র। যেমন রণজিৎ সিংহ নাটকে দেখা যায় খড়্গা সিংহ পানাসক্ত তাকে রক্ষা করতে মাতা রাজকাউর হত। হত্যার শাস্তি পাবে

খড়্গ সিংহ বুকে গুলি করতে আসবে তার পুত্র নওনিহাল সিংহ। তখন এলেন ঝিন্দন কাউর দিলেন দলিপ সিংহকে আগিয়ে বললেন এর বুকে গুলি কর। মহত্বে বিহ্বল রণজিৎ নাটক শেষ করলেন। প্রতি নাটকেই এই মহত্বের আর বিশ্বাসঘাতকতার ছড়াছড়ি। একটা বাঁধা পথ ছাড়া যেন নাট্য-কারদের চিন্তাধারা অন্য পথ নেয় নাই। সেই পথটাও হল পালা নাটকের পথ। একান্ত ভাবেই ভাবপ্রবণ এবং চিন্তায় ও বুদ্ধিতে দুর্বল।

সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে রচিত নাটকগুলির নাম ও রচয়িতাদের লিপিবদ্ধ করা যায়।

নির্বাপিত দীপ	—	অতুলকৃষ্ণ মিত্র	১২৮৩ সাল
শতবর্ষ আগে	—	মহেন্দ্র গুপ্ত	১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ ?
ঝান্সীর রাণী	—	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৪৯
ঝাঁসীর রাণী	—	বিধায়ক ভট্টাচার্য	?
ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ	—	রেবতীকান্ত মৈত্র	?
তান্তিয়া ভীল	—		

কোন কোন মহলে সিপাহী বিদ্রোহ স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা পেয়েছে। কিন্তু সে সম্পর্কে নাটক লেখার জন্য যে চিন্তা বুদ্ধি বা ক্ষমতা প্রয়োজন ছিল দুঃখের বিষয় তার কোন পরিচয় দেখা যায় নাই। তাই অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকগুলির মতোই উপকথাকে উপজীব্য করে রচনা। ইতিহাস হিসাবে যেমন অসংযত, নাটক হিসাবেও তেমনি অপ্রয়োজনীয়।

মারাঠা শিখ ও মহিশূর তারপর সিপাহী বিদ্রোহ রচনাতে নিম্নলিখিত পুস্তকাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

১। Elphinstone : History of India (1911).

২। N. K. Sinha & A. C. Banerji : History of India (1944).

৩। Jadunath Sarkar : Fall of the Mughal Empire Vol. I to IV (1950)

৪। Indubhushan Banerjee : Evolution of the Khalsa, Vol. I & II (1947).

৫। N. K. Sinha — Ranjit Singh (1943)
৬। Do — Haidar Ali
৭। Do — Rise of the Sikh Power.
৮। A. C. Banerji — Peshwa Madhav Rao I.
৯। G. S. Sardesai — New History of the Marathas, Vol. I, II & III (1946)
১০। Cunnighan — History of the Sikhs (1848).
১১। Murray — Runjeet Singh
১২। M. A. Macauliffe — The Sikh Religion, Vol. I to VI (1909).
১৩। R. C. Majumdar — The Sepoy Mutiny & Revolt of 1857 (1957).
১৪। Surendra Nath Sen — Eighteen Fifty Seven (1957).
১৫। L. F. Rushbrook Williams (Ed.) Great Men of India.
১৬। R. C. Majumdar — History of the Freedom Movement Vol. I to III.
১৭। Brian Gardner : East India Company.
১৮। S. N. Sen : Off the Main Track.
১৯। P. C. Gupta : Baji Rao II.
২০। G. Bruce : Anglo-Sikh war 1845-6 & 1848-9.
২১। B. J. Hasrat : Anglo-Sikh Relations 1799-1849.
২২। S. N. Sen : Anglo-Maratha Relations during the administration of Warren Hastings.
২৩। L. S. Sutherlend : East India Company in 18th Century Politics.
২৪। Meer Hussain Ali Khan Kirmani translated by W. Miles : Tipu Sultan (1782—98).
২৫। D. Forrest : Tiger of Mysore.

উপসংহার

উপসংহারে কেবল দুঃখের কথা, বেদনার কথাই লিপিবদ্ধ করতে হবে। নাট্যরচনার বিষয়বস্তু থাকা সত্ত্বেও ইতিহাস অজ্ঞতা সব প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত করে দিয়েছে। কয়েকজন নাট্যকার জেনে শুনে শঠতাও করতে ভোলেন নাই, অনৈতিহাসিক রূপকথাকে ইতিহাস বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে যে কথা বলা হয়েছে শেষেও তারই পুনরুক্তি করতে হবে। বরঞ্চ পরাধীন ভারতের নাটকের মধ্যে তবু একটা তেজ ও বক্তব্য দেখতে পাওয়া গেছে কিন্তু যত স্বাধীনতার কাছাকছি আসা গেছে ততই রং হয়েছে ফিকে। স্বাধীনতার সময় এবং তার পরবর্তীকালে রচিত নাটকগুলি প্রায় আলোচনার অযোগ্য।

এই দীর্ঘ আলোচনার পর লজ্জার সঙ্গে স্বীকার না করে উপায় নাই যে এ একজন নাট্যকার সার্থক ঐতিহাসিক নাটক লিখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি নাট্যজগতের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি ছাড়া এই পুস্তকে আলোচিত আর একজন নাট্যকারেরও নাম করা যায় না যাঁর নাটক ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞা পেতে পারে। কোন কোন নাটক নানা কারণে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দীর্ঘদিন অভিনীত হলেও পদে পদে প্রমাণিত হয়েছে নাট্যকারগণ সত্যকার ঐতিহাসিক নাটক লিখতে কতো পরিশ্রমকাতর। কেউ কেউ দুই চারটা বই-এর নাম লিখে দিয়ে ইতিকর্তব্য সম্পাদন করেন কিন্তু আপৎকালে দেখা যায় যে হয় তিনি সেগুলি পাঠ করেন নাই অথবা পাঠ করে তার বক্তব্য বুঝতে পারেন নাই। অনেক সময় এমন বইএর নাম দেওয়া আছে যা ওই নাটক লিখতে সম্পূর্ণভাবে অপ্রয়োজনীয়।

বাঙালী যে আত্মবিস্মৃত জাতি একথা বিংশ শতাব্দীর নাট্যকারগণ পুনরায় প্রমাণ করেছেন। কেবল হৃদয়াবেগ সম্বল করে নাটক লেখায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তাই তাদের লেখা প্রায় কোন নাটকই ঐতিহাসিক নাটকের মর্য্যাদা পেতে পারল না। প্রথম খণ্ডের কথাই দ্বিতীয় খণ্ডে পুনরাবৃত্তি করতে হয়। ১৭৫৭

---

*বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কোন নাটক এই আলোচনাকালের মধ্যে পড়ে না।

থেকে ১৮৫৭ পর্য্যন্ত একশ বছরের ইতিহাস নিয়ে যে সব নাটক লেখা হয়েছে তাতে ঐতিহাসিক স্থান কাল পাত্র কিছুই প্রতিফলিত হয় নাই শুধু সমসাময়িক মনের দীনতা প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে নাট্যকারদের অজ্ঞতা অবাক করে দেয়। এমন কি রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা করতেও তাঁরা সক্ষম হন নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাবাবেগপ্রধান কল্পিত ঘটনা নাটকে মুখ্য রূপ নিয়েছে।

বাংলার সামাজিক চিত্র আঁকতে তাঁরা যেমন অক্ষম হয়েছেন সর্বভারতীয় চরিত্রগুলির মধ্যে তেমনি বাঙ্গালীত্ব আরোপিত হয়েছে। ইংরেজ শাসনের পরবর্তীকালের মনোভাব অধিকাংশ নাট্যকারের মনকে আচ্ছন্ন করায় ইংরেজ শাসনের পূর্বেকার মহানায়কগণের মানসিকতা তাঁরা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের রচনাকাল সম্পর্কে বহু ইতিহাস পুস্তক থাকা সত্বেও তাঁদের এই অপারগতা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনীষা এবং বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে ভাবপ্রবণতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। জ্ঞানের সাধনায় হৃদয়াবেগ পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের নাটকগুলি আলোচনার পর তাই একটা ব্যর্থতার গ্লানি মনকে আচ্ছন্ন করে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নাটক রচনা সফলতা লাভ করতে পারে নাই একথা ক্ষোভের সঙ্গেই স্বীকার করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে হয় যে তার ফলে এই রকম কল্পনা ভিত্তিক ইতিহাসের চরিত্র নিয়ে রচিত নাটক প্রচণ্ড দাবদাহের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক যুগে নানা স্থানে ও আসরে ঐতিহাসিক নাটক নাম দিয়ে যা পরিবেশিত হচ্ছে সেগুলি পরীক্ষা করলেই এই প্রবণতা কতো তীব্র বিচার করা যাবে।

দ্বিতীয় খণ্ডের নাটকের মধ্যে ভারতবর্ষের একশত বছরের ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস যেমন ঘটনাবহুল তেমনি তাৎপর্য্যপূর্ব। এই একশত বছরের ইতিহাসে ভারতীয় মহানায়কগণের পরাজয় এবং ধীরে ধীরে ইংরেজের ক্ষমতায় অধিষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। নাটকে এমন অপূর্ব যুগসন্ধির পরিচয় লিপিবদ্ধ করার সুযোগ যে ব্যর্থ হয়ে গেল তার জন্য নাট্যকারদের দায়িত্ব কম নয়। মীরকাশিমের যুগই তো এক অনন্ত সাধারণ সময়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ছাড়া তার সুযোগ কে নিয়েছে! মহারাজ নন্দকুমার বা রানী ভবানী সত্যই

নাটকে প্রচারের চরিত্র। কেবলমাত্র আয়াসী নাট্যকারগণের ভুলেই তো সে সুযোগ ব্যর্থ হয়ে গেল। অযোধ্যার বেগমকে নিয়ে যে অপূর্ব নাটকীয় মুহূর্ত রচিত হতে পারত কেবল অজ্ঞানতার জন্তই তো সে সুযোগ হারিয়ে গেল। সব থেকে আশ্চর্য্যের বিষয় হল, যে মারাঠা শক্তি আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করল, যাদের হাতে দিল্লীর নৃপতি পুতুল হলেন তারা নাটকে প্রায় অদৃশ্য রয়ে গেলেন। এই বিরাট কীর্তিকে উপলব্ধির কোন চেষ্টা হল না। হায়দার আলির দূরদৃষ্টি, টিপুসুলতানের বিক্রম, রণজিৎ সিংহের কূটনীতি, অনুধাবন করে নাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হল না, বাংলা সাহিত্যের দরবারে নাট্যকারদের এই ব্যর্থতা, চিরকালের জন্ত তাদের আসনকে দূরে ঠেলে দিল।

কারণ অনুসন্ধান করতে বেশী দূরে যেতে হবে না। বাঙালী থিয়েটার পছন্দ করেন, ভালবাসেন অভিনয়ের আসরে শ্রোতা হতে। ইতিহাস সম্পর্কে তাদের বিশেষ জিজ্ঞাসা নাই। তাই নাটক অভিনয় হয়েছে আর বাঙালী দর্শক প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ করেছেন। যখন ঐতিহাসিক ব্যক্তির নামে নাটক হয়েছে তখন যদি পৌরাণিক ব্যক্তির নামে হোত তাতে আপত্তি ছিল না। ঐতিহাসিক নাটকের নামে যে একটু ইংরেজ বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে তাতেই তারা অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। লক্ষ্য রাখতে হবে যে সব নাটকগুলির মধ্যেই ইংরেজ বিদ্বেষ কমবেশী প্রচারিত। পরাধীন ভারতের দর্শক তাই পেয়েই খুশী হয়েছেন। স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা তাদের মনের ইচ্ছার সঙ্গে ওই ইংরেজ বিদ্বেষকে একাত্ম করেছে। তার বেশী তাঁরা কিছু চান নাই তাই তার বেশী তাঁরা কিছু পান নাই। নাটকে ইতিহাস থাকল কিনা তা নিয়ে তারা একটুও চিন্তিত হন নাই। নাটকে ইংরেজ বিদ্বেষ থাকলেই হৃষ্টচিত্তে তাকে ঐতিহাসিক নাটক বলে গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ নাট্যকারগণও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কল্পনার স্রোতে নাটক চড়িয়ে দর্শকদের তাদের অভিপ্রেত বস্তু দিয়েছেন।

চূড়ান্তভাবে তাই স্বচ্ছন্দে বলা চলে ঐতিহাসিক নাটকের চাহিদা ছিল না বলেই তা রচিত হয় নাই। চাহিদা ছিল সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের। নাট্যকারগণ ঐতিহাসিক নাটকের নামাবলী চাপিয়ে বিভিন্ন রঙে বিভিন্ন ছন্দে নিজ নিজ সাহস জ্ঞান ও বুদ্ধি মতো সেই বিক্ষোভের নাটক রচনা করেছেন। একটা মোটামুটি কাঠামো রাখতে যেটুকু ইতিহাস

প্রয়োজন তার বেশী ইতিহাস অধিকাংশ নাট্যকারের প্রয়োজন ছিল না এবং সম্ভবত জানাও ছিল না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইতিহাস বা ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রের প্রকাশে কোন নাট্যকারই উৎসুক ছিলেন না। যারাই ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে নাটক লিখেছেন তাদের মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষাকে কমবেশী প্রকাশ করা এবং অধিকাংশই তা করবার জন্ত কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। যখন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে ইতিহাস না থাকলেও দর্শক সাজসজ্জার লোভে নাটক দেখা থেকে বিরত হয়না তখন তাঁরা নিজেদের কল্পনাকে ইতিহাস বলতে দ্বিধা করলেন না। এই অবস্থার ব্যতিক্রম তো হয়ই নাই বরঞ্চ দুরারোগ্য কালব্যাধির মতো ক্রমেই বিস্তারিত হয়েছে। একথা বারে বারেই মনে এসেছে যে এই রোগ প্রশমিত হবে না বরঞ্চ দ্বিগুণ বেজে প্রজ্বলিত হবে। ইতিহাস কল্পনার তলে নিমজ্জিত হবে এবং জাতির উত্থান পতনের কথা জ্ঞানের অগোচরে রয়ে যাবে। মিথ্যায় মিথ্যার প্রচার বর্দ্ধন করবে এবং সত্য সীতার মতো ধরণীর অন্তরে প্রবেশ করবে। তিনটি পশুরাজের পদতলে আমরাই তো 'সত্যমেব জয়তে'কে বসিয়েছি।

পরিশিষ্ট

নাট্যকারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার

প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সহিত সাক্ষাৎকার ॥

গত ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৭০ (বাংলা ৭ই পৌষ ১৩৭৭) টালা-পার্কের বাড়িতে খ্যাতনামা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ঐতিহাসিক নাটক বিষয়ে সাক্ষাৎকার হয়। সময় তখন সন্ধ্যা ৭টা। আমার সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ আর তারাশঙ্করবাবুর পাশে বসেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় "যুগবিপ্লব" নামে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। মারাঠা নায়ক বালাজী বাজীরাও তার প্রধান চরিত্র।

সাক্ষাৎকারে তারাশঙ্করবাবু তাঁর "যুগবিপ্লব" নাটক লেখার পরিস্থিতি সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে ১৯২৩-২৪ সালে তাঁকে কিছুদিন কানপুরে থাকতে হয়েছিল। কানপুর যাবার সময়ে তিনি গ্রাণ্ট ডাফ্ (Grant Duff)-এর মারাঠা ইতিহাস (History of the Marathas) বইখানি সঙ্গে করে নিয়ে যান। এই বইটি পড়ে তিনি তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধ সম্পর্কে নাটক লেখবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন। তারই ফলস্বরূপ "মারাঠাতর্পণ" নামে নাটকটি লেখা কানপুরে শুরু হয় এবং শেষ হয় বীরভূমের লাভপুরে। তারাশঙ্করবাবুর স্বদেশে নাটকটি সাফল্যজনকভাবে অভিনীত হয় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। নাটকের প্রধান চরিত্র—বালাজী বাজীরাও, ২য় আলমগীর ও আহমেদ্ শা আবদালী।

কথাপ্রসঙ্গে তারাশঙ্করবাবু কৌতুক করে বলেন যে এই নাটকে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "আলমগীর" নাটকের প্রভাব স্পষ্টভাবেই ছিল। নাটকীয়তাই ছিল মুখ্য, তাই এতে ইতিহাসের বিশেষ ঠাঁই ছিল না। নানা-রকম লোক সর্বদা মোগল হারেমের ভিতর যাতায়াত করছে দেখাতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। বস্তুতঃ নাটক হিসাবে "মারাঠা তর্পণ"কে তারাশঙ্করবাবু সাফল্যজনক মনে করেন, যদিও ইতিহাসকে এই নাটকে লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই নাটকে হিন্দুপৎ-পাদশাহীর আগ্রহ ও চিন্তাকে অত্যন্ত সচেতনভাবেই প্রধান আসন দেওয়া হয়েছে।

কথাপ্রসঙ্গে নাট্যকার আরও জানালেন যে সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তাধারা বা শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে তিনি কখনই এই নাটকের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে চাননি।

এই নাটকটি "ষ্টার" থিয়েটারে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর কাছে অভিনয়-এর জন্য দেওয়া হয়েছিল। অপরেশবাবু এই নাটকটিকে অভিনয়ের অযোগ্য বিবেচনা করে ফেরৎ পাঠালে তারাশঙ্করবাবু নাটকের মূল পাণ্ডুলিপিটি আগুনে পুড়িয়ে দেন।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এই নাটকটি সম্বন্ধে খোঁজ খবর শুরু করেন। তখন তারাশঙ্কর বাবুর মনে হল যে এই নাটকটিকে নূতন করে লেখা প্রয়োজন এবং সেইজন্য এই সময়কার ইতিহাসকে অধ্যয়ন করা দরকার। আচার্য্য যদুনাথ সরকার লিখিত "দি ফল্ অফ্ মুঘল এম্পায়ার" (The Fall of Mughal Empire) বইটি তিনি বিশেষ ভাবে পাঠ করেন এবং 'মারাঠাতর্পণ'-এর বিষয় অবলম্বন করেই সম্পূর্ণ নূতন এক নাটক রচনা করেন। সেই নাটকই "যুগবিপ্লব"। এই নাটকটিও সাধারণ রঙ্গমঞ্চ গ্রহণ করে নি। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে লিখিত এই নাটকের প্রধান চরিত্র বালাজী বাজীরাও, আহ্‌মেদ শা আবদালী ও দ্বিতীয় শাজাহান।

তারাশঙ্করবাবু জানান যে সমসাময়িক রাজনীতির প্রভাব থেকে এই নাটককে মুক্ত রাখা হয়েছে। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের কোন জাতীয় নেতার চরিত্র বা ঘটনাকেও তিনি নাটকের মধ্যে পরোক্ষভাবে দেখান নি। তবে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় রাজনীতির জন্য ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মারাঠা ও জাঠ জাতির মধ্যে হিংসাকে হাল্কা রঙে আঁকা হয়েছে। এই নাটকে তিনি পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের সাফল্য ও পরাজয়কে নাটকীয়ভাবে দেখাতে চেষ্টা করেন। বাজীরাও-এর চরিত্র ও পরিকল্পনা তাঁকে অনুপ্রাণীত করে তাই তিনি বাজীরাও চরিত্রকে তাঁর পুত্র বালাজী বাজীরাও-এ আরোপ করে 'যুগ বিপ্লব' নাটক রচনা করেন।

কথাপ্রসঙ্গে আরও জানতে পারা গেল যে নাটক এবং অভিনয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই তারাশঙ্করবাবুর মধ্যে আছে। ১৭।১৮ বছর বয়সে তিনি ক্ষীরোদপ্রসাদ-এর "চাঁদবিবি" নাটকে 'মরিয়ম বেগম'-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর প্রথম নাটক "দায়ুদ খাঁ" প্রাচীন বাংলাদেশের

ইতিহাস নিয়ে রচিত। জীবনের সায়াহ্নে (জন্ম ১৩০৫/১৮৯৮ খ্রীঃ) তাঁর ইচ্ছা, আরও কতকগুলি নাটক রচনা করবেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ॥

গত ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৭৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে খ্যাতনামা কবি শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর রচিত 'পলাশী' নাটক বিষয়ে আলোচনা হয়। আমার সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ।

সাক্ষাৎকারে হীরেন্দ্রবাবু তাঁর 'পলাশী' নাটক লেখার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে নাটক লেখার সময় তাঁর বয়স ৩৭/৩৮ বৎসর। বলেন, তাঁর উপন্যাস মৌসুমী was a very great sucess. প্রমথেশ বড়ুয়া, সতু সেন ইত্যাদি মৌসুমীকে সিনেমার মতো develop করার জন্য বহুবার অনুরোধ করেন। হীরেন্দ্রবাবু পারেন নি। তখন অল্প বয়স। সে সময়ে স্বাস্থ্যহানি হল—Particularly, মৌসুমী লিখতে ফিয়ার্স লেন, আমহার্স্ট স্ট্রীট ইত্যাদি অঞ্চলে তথ্য ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করতে গিয়ে হল স্নায়বিক দৌর্বল্য। সে সময়ে যুদ্ধ হচ্ছে। তার ফলে Partial claustrophobia. সেই অবস্থার উপশম করতে ১৫ মাস ছুটি নিয়ে বহরমপুরে গমন করেন। ফেরার পরে রঙমহল থিয়েটারে গিয়ে অহীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সতু সেন তাঁর আলাপ করিয়ে দেন। অহীন্দ্রবাবু নাটক লিখে দিতে অনুরোধ করেন। ঐতিহাসিক অথচ modern নাটক লেখার অনুরোধ করায় হীরেন্দ্রবাবুর মনে মোহনলাল সম্বন্ধে লেখার আগ্রহ জন্মে। সে সময়ে মোহনলাল সম্বন্ধে তিনি একটি বইও পড়েছিলেন। হীরেন্দ্রবাবু সে কথা বলতেই অহীন্দ্রবাবু উৎসাহ দেখান। হীরেন্দ্রবাবু 'পলাশী' নাটকটি তারপরে লেখেন, কিন্তু নাটক লেখার technigue সম্বন্ধে অবহিত না থাকায় হোঁচট খেতে থাকেন। শচীনবাবু বারকয়েক নাটকটি লেখার সময়ে দেখেন এবং এখানে ওখানে পরিবর্তন করতে উপদেশ দেন। ঘসেটির মেহেরুন্নিসা নাম, এক্রামউদ্দৌলার নাম, ঘসেটির চরিত্রাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে ইতিহাসের নানা বই পড়ে জেনেছিলেন, যেমন মুর্শিদাবাদ কাহিনী, বাংলার মসনদ (ইংরেজিতে), মোহনলাল প্রভৃতি। তিনি যে মোহনলালকে বাঙালী ব্রাহ্মণ বলে দেখিয়েছেন, তার কোন basis নেই বলে স্বীকার করেন।

তবে তার বোন যে একসময়ে চরিত্র হারিয়েছিল এবং পরে সিরাজের অঙ্কশায়িনী হয়েছিল, তা প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে লিখেছেন। শচীনবাবু তাকেই 'আলেয়া' বলে দেখিয়েছেন। ভাস্কর পণ্ডিতের কন্যা লক্ষ্মীর গল্প কল্পিত। ভাস্কর পণ্ডিতের murder-এর date কোন বই থেকে নেওয়া—কল্পিত নয়। সম্পূর্ণ ইতিহাস-ভিত্তিক না করায় হীরেন্দ্রবাবু নাটকটিকে ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যভিত্তিক নয় বলে ঘোষণা করেছেন। অহীন্দ্রবাবু নাটকটি পছন্দ করেন।

নাটকের বক্তব্য ছিল না, কারণ এটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, মুক্তি সংগ্রামে সহায়তা এবং হিন্দু মুসলমান মৈত্রী—এই তিনটিকে লক্ষ্য বলা চলে। ২-১ রাত্রি ভাল অভিনয় হয়। ভূমেন রায় মোহনলালের ভূমিকায় wrong selection ছিল বলে মতপ্রকাশ করেন। পরিচালকদের মধ্যে কেউ কেউ নাটকটি অভিনয়ের বিরোধী ছিলেন। হীরেন্দ্রবাবু মোহনলালের ভূমিকায় ভূমেনের selection-এ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তখন মহেন্দ্র সত্য পাঠককে সেই ভূমিকা দিলেন। সত্য পাঠক ভূমেনের চেয়ে ভাল অভিনয় করেছিলেন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

সে যুগে নাটক লেখা বা অভিনয় থেকে অর্থ বিশেষ পাওয়া যেত না। হীরেন্দ্রবাবুও সে সুখে বঞ্চিত ছিলেন। এই অভিনয়ে ১০ টাকা শো প্রতি হারে ৫০০ টাকার মতো পেয়েছিলেন।

শুদ্ধিপত্র

পাতা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৮	সে দিক	সে দিকে
৫	১১/১২/১৩	৪১, ৩৮, ৩২	৫১, ৪৮, ৪২
৫	২৬	রমনীর	রমণীর
৬	৮	"	"
৯	১৩	লালকুয়ার	লালকুঁয়ার
১২	১৮	উষ্মীষহীন	উষ্ণীষহীন
"	২৩	অনষ্টানের	অনুষ্ঠানের
"	২৪	উষ্মীষহীন	উষ্ণীষহীন
১৪	৬	প্রমান	প্রমাণ
১৫	১০	কর্দমস্রোতে	কর্দমস্রোত
১৫	১১	অবশেগে	অবশেষে
২৩	১৩	দাসগন	দাসগণ
২৫	১৮	বাহাদুর	বাহাদুর
৩১	১	একদিন	একদিক
৩৬	২৪	ব্যায়	ব্যয়
৪১	৫	কি	এক
৪২	১০	সম্ভত	সম্ভব
৪৩	৮	সম্মিলিত	সম্মিলিত
৫১	১২	পদাতিত	পদাতিক
৫১	২১	ভীববেগে	ভীমবেগে
৫২	২৭	দুরিভূত	দূরীভূত
৫৩	১৭	উস্ট্রারোহী	উষ্ট্রারোহী
৫৮	৮	ঘোষনা	ঘোষণা
৬১	৯	তত্বকথাকে	তত্ত্বকথাকে
৬২	২	হারেম বিবক্ত	হারেম বিবাক্ত

পাতা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৩	২০	বলতো	বলতে
৬৫	পত্রাঙ্ক	৬১	৬৫
৬৫	১	পবিমানে	পরিমাণে
৬৭	২৭	০	২০
৬৯	১৫	রমনীকে	রমণীকে
৭২	২৭	সন্নাসী	সন্ন্যাসী
৭৩	১৯	বিব্রাট	বিরাট
৭৩	২৪	সার্থসিদ্ধি	স্বার্থসিদ্ধি
৭৬	২	স্বসম্মানে	সসম্মানে
৭৬		ভগিনীশতি	ভগিনীপতি
৭৭	১৬	আয়ুস্কাল	আয়ুষ্কাল
৭৭	১৬	গুরূদেবকে	গুরুদেবকে
৮৩	১	তরূণ	তরুণ
৮৫	২৮	গোঁয়ারতু মি	গোঁয়ারতুমি
৯৩	১৬	ভারতবব্যাপী	ভারতব্যাপী
৯৬	২৬	কাণপুর	কানপুর
৯৮	১৭	প্রাণিধান	প্রণিধান
৯৮	১৯	মুখ্য	মুখ্য
১০১	২৬	দুর্বব্যহারের	দুর্ব্যবহারের
১০২	৩	আসি	অসি
১০২	৩	নিষ্কাসন	নিষ্কাশন
১০২	২৫	জীবনধারনের	জীবনধারণের
১০৪	১১	করেণ	করেন
১০৪	২৩	হরে	হয়ে
১০৬	২৩	সন্নাসীদের	সন্ন্যাসীদের
১১২	৬	নাস	নাশ
১১২	১৩	পরবর্ত্তি	পরবর্তী
১১৩	৩	পরবর্ত্তিকালে	পরবর্তীকালে

পাতা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৪	২০	অবতারনা	অবতারণা
১১৮	১৭	বাঈজী	বাঈজীকে
১১৮	১৭	বিবাহকে	বিবাহ
১১৮	১৯	অগ্রনী	অগ্রণী
১১৮	২৩	তার	তাঁর
১১৮	২৪	তার	তাঁর
১২০	১৪	রমনী	রমণী
১২২	১	রক্ষনা	রক্ষণা
১২২	১৭	জেগানীয়	জেনানার
১২২	২২	গন্নাবেগর	গন্নাবেগমের
১২৫	১৩	বিবরনীতে	বিবরণীতে
১২৬	৩	বসে	বশে
১৩০	২৭	পরিস্থিতেতে	পরিস্থিতিতে
১৩৪	২২	আবদালী	আবদালীকে
১৩৮	১৫	অন্তস্বত্তা	অন্তঃসত্ত্বা
১৩৮	২৭	বিধ্বংশী	বিধ্বংসী
১৩৯	৯	মুহুর্তে	মুহূর্তে
১৪৩	১৭	স্পটই	স্পষ্টই
১৪৩	২১	একিভূত	একীভূত
১৪৪	১৫	ব্যাথা	ব্যথা
১৪৭	৪	আভ্যন্তরিণ	আভ্যন্তরীণ
১৪৯	৩	বিচরন	বিচরণ
১৫০	২৭	নিমর্জ্জিত	নিমজ্জিত
১৫৮	৫	বঙ্কিকচন্দ্রের	বঙ্কিমচন্দ্রের
১৫৮	৬	অবতারনা	অবতারণা
১৫৮	১৩	উপর্য্যপরি	উপর্যুপরি
১৫৮	২১	Characaters	Characters
১৬১	৯	বাণ	বান

পাতা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬১	২৭	প্রমান	প্রমাণ
১৬২	২৯	জগাখিচুড়ী	জগাখিচুড়ি
১৬৩	৮	বীনাকে	বীণাকে
১৬৭	২৭	পঙ্কপল্ললে	পঙ্কপল্বলে
১৬৯	১৫	কারনে	কারণে
১৭৪	১৮, ১৯	উপক্রমনিকা	উপক্রমণিকা
১৭৮	১৯	শ্রোতে	স্রোতে
১৮১	২৫	রমনী	রমণী
১৮১	২৮	তাহইলে	তা হলে
১৮২	২১	মুহুর্তের	মুহূর্তের
১৮৩	৪	ষড়যন্ত্রকারিনী	ষড়যন্ত্রকারিণী
১৮৬	৭	ঐশর্য্য	ঐশ্বর্য
১৮৬	১৬	মীরনের	মীরণের
১৯১	১১	রণহস্তি	রণহস্তী
১৯৪	১৩	কাল্পনীক	কাল্পনিক
১৯৫	১	রেছেন	করেছেন
১৯৭	২৭	বৈচিত্রপূর্ণ	বৈচিত্র্যপূর্ণ
১৯৭	২৯	আরোহন	আরোহণ
১৯৮	৫	কালুনুক্রমিক	কালানুক্রমিক
১৯৮	৫	হবে	হয়ে
১৯৮	২৭	আবিমৃষ্যকারিতায়	অবিমৃষ্যকারিতায়
১৯৯	১০	ককুধ	ককুদ
২০০	৩	নীতি	নাতি
২০০	২৮	বিপনীতে	বিপণীতে
২০২	৯	উপর্য্যপরিতার	উপর্যুপরিতার
২০৩	২০	স্বীক্ষার	স্বীকার
২০৪	১৫	সাক্ষর	স্বাক্ষর
২০৪	২৯	চলাকালিন	চলাকালীন

পাতা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৫	৬	পলায়ণ	পলায়ন
২১২	৮	রমনী	রমণী
২১৫	৮	ভূম্যধীকারীদের	ভূম্যধিকারীদের
২১৬	১০	পলাশীয়	পলাশীর
২২১	২২, ২৩	মীরন	মীরণ
২২২	১৯	আশাঙ্কিত	আশঙ্কিত
২২৩	১৩	গর্ভিনীরমনী	গর্ভিণীরমণী
২২৪	২	পরবর্ত্তী	পরবর্তী
২২৪	১৪	গোলাবর্ষন	গোলাবর্ষণ
২২৪	২২	ত্র্যস্ত	ত্রস্ত
২২৫	১৪	কাণ্ডজ্ঞানহীণ	কাণ্ডজ্ঞানহীন
২২৬	২৮	নিজেরমনমতো	নিজের মনোমত
২২৮	১৬	মিরণকে	মীরণকে
২৩০	১	ঘূর্ণাবর্ত্ত	ঘূর্ণাবর্ত
২৩০	৫	দেশাত্ববোধের	দেশাত্মবোধের
২৩০	২৫	তরুনের	তরুণের
২৩১	২৯	কারন	কারণ
২৩২	১৬	পরিনতিকে	পরিণতিকে
২৩৪	১০	বনিকদের	বণিকদের
২৩৫	২	সাহার্য্যার্থে	সাহায্যার্থে
২৩৫	৯	সেনের	রায়ের
২৩৬	২৩	পলাইত	পলায়িত
২৩৮	২৬, ২৮	পলায়ণ	পলায়ন
২৩৮	২৮	হলওয়েবের	হলওয়েলের
২৪১	৩	মুহুর্ত্তে	মুহূর্তে
২৪৩	২৯	গোলাবর্ষনে	গোলাবর্ষণে
২৪৮	২৯	সাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
২৪৯	২৩	নববের	নবাবের

পাতা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫০	৮	হীণ	হীন
২৫৩	২২	ভীজে	ভিজে
২৫৪	১৭	করুন	করুণ
২৫৪	২৪	পলায়ণ	পলায়ন
২৫৫	১৬	নেহরিল	নেহারিল
২৫৫	২৯	ত্বেজ	তেজ
২৫৮	২	পঞ্চমাংশে যুদ্ধ	পঞ্চমাংশ যুদ্ধে
২৫৮	২২	পলায়ণ	পলায়ন
২৫৮	২৭	ত্র্যস্ত	ত্রস্ত
২৫৯	১২	বানী	বাণী
২৬২	১৬	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
২৬৫	৬	সন্ত্রাশবাদীরা	সন্ত্রাসবাদীরা
২৬৫	১৭	প্রতিধ্বনী	প্রতিধ্বনি
২৬৬	৪	রমনীর	রমণীর
২৭৩	২৫	রমনীগমন, রক্ষন	রমণীগমন, রক্ষণ
২৭৮	১৯	সাবধান বানী	সাবধান বাণী
২৮৬	২৬, ২৮	নিদারুন	নিদারুণ
২৮৮	১৫	বিষন্ন	বিষণ্ণ
২৯৩	৩	উপঢৌকন	উপঢৌকন
২৯৫	২৮	চৌদ	চৌদ্দ
২৯৭	৮	১৭৭৮	১৩৭৮
২৯৭	২৩	লক্ষনীয়	লক্ষণীয়
৩০০	৩	বংধরগণকে	বংশধরগণকে
৩০০	৪	জাকিয়ে	জাঁকিয়ে
৩০১	৬	২৯	৩৯
৩০১	২৬	বিতাড়িক	বিতাড়িত
৩০২	১৯	লক্ষ্য	লক্ষ
৩০২	২৩	অভিহীত	অভিহিত

পাতা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০২	২৮	নির্বুদ্ধিতা	নির্বুদ্ধিতা
৩০৬	১৯	উদ্দিপীত	উদ্দীপিত
৩০৬	২৩	মহিয়সী	মহীয়সী
৩০৭	১৭	ইয়ারলতিক	ইয়ারলতিফ
৩০৮	৬	দিরে	দিয়ে
৩১০	১২	ধ্বনী	ধ্বনি
৩১১	১৫	লক্ষনীয়	লক্ষণীয়
৩১৭	৭	কামাশক্ত	কামাসক্ত
৩১৯	৭	অপরিনামদর্শী	অপরিণামদর্শী
৩১৯	১৬	যতপরোনাস্তি	যৎপরোনাস্তি
৩২৪	১৭	রামায়ন	রামায়ণ
৩২৫	৫	লক্ষনীয়	লক্ষণীয়
৩২৭	২৫	উদাহারণেই	উদাহরণেই
৩২৮	৬	প্রভূ	প্রভু
৩২৮	৬	উৎসর্গিকৃত	উৎসর্গীকৃত
৩২৯	২৪	এক	এই
৩৩৮	৭	ধারনা	ধারণা
৩৩৯	২৪	সহযোগীতায়	সহযোগিতায়
৩৪০	৭	মন্ত্রণাদাত	মন্ত্রণাদাতা
৩৪১	২১	। হল	হল ।
৩৪৭	২	সাক্ষ্যাত	সাক্ষাৎ
৩৪৮	১৬	সম্মত্তি	সম্পত্তি
৩৫২	১	সাক্ষ্যাত	সাক্ষাৎ
৩৫৩	১	সাক্ষ্যাতকার	সাক্ষাৎকার
৩৬২	২৭	ব্যক্তিগন	ব্যক্তিগণ
৩৬৫	২৭	শ্রীতিকর	প্রীতিকর
৩৬৫	২৯	অক্ষুন্ন	অক্ষুণ্ণ
৩৬৮	২২	অতিষ্ট	অতিষ্ঠ

পাতা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৬৯	৪	দৌরাত্মে	দৌরাত্ম্যে
৩৬৯	১১	ঘৃনিত	ঘৃণিত
৩৬৮	২৯	ফকিরিণির	ফকিরণী
৩৭৮	২২	মিরণ	মীরণ
৩৭৯	২৯	কথোপকথণ	কথোপকথন
৩৮০	১০, ১১	ন্যায়পরায়ন	ন্যায়পরায়ণ
৩৮২	১৬	মর্মপীড়	মর্মপীড়া
৩৮২	২১	সুরূপ	সুরূপা
৩৮২	২৫	বাদাশাই	বাদশাই
৩৮৬	১০	সহযোগীতায়	সহযোগিতায়
৩৮৭	১২	মনোমালিন্সে	মনোমালিন্য
		মতাবিরোধের	মতবিরোধের
৩৯১	১১	সাক্ষ্যাতকার	সাক্ষাৎকার
		লক্ষনীয়	লক্ষণীয়
৩৯৬	২৪	ধারণ্য	ধারণা
৩৯৭	১৫	সাক্ষ্যাতকার	সাক্ষাৎকার
৩৯৭	২৭	লক্ষনীয়	লক্ষণীয়
৩৯৯	১৯	ঘুসোঘুসি	ঘুষোঘুষি
৪০১	১৭	স্বত্বেও	সত্বেও
৪০৩	৯	রমনী	রমণী
৪০৯	৪	বঙ্গরমনী	বঙ্গরমণী
৪০৯	১৯	শাত্তিস্থাপনের	শান্তিস্থাপনের
৪১৭	৪	শুস্ক	শুষ্ক
৪২০	১৮	দৃশ্যেরে	দৃশ্যের
৪২১	৬	মুহর্তে	মুহূর্তে
৪২১	১৮	মণিষা	মনীষা
৪২৩	১৭	ইব্রাহীন	ইব্রাহীম
৪২৫	৫	স্বান্বনা	সান্ত্বনা

পাতা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪২৬	১৪	সম্মিলিত	সম্মিলিত
৪২৯	১৫	সম্মুখীন	সম্মুখীন
৪৩২	২১	সাহসীকতার	সাহসিকতার
৪৩৫	১	প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
৪৩৭	১০	প্রসাদ	প্রাসাদ
৪৩৮	১৮	বিপদাসঙ্কায়	বিপদাশঙ্কায়
৪৪০	২৪	জ্বাকল্যমান	জাজ্বল্যমান
৪৪২	১৮	উচ্চৈশ্বরে	উচ্চৈস্বরে
৪৪২	২৩	হটাৎ	হঠাৎ
৪৪৩	৭	সাক্ষ্যাত	সাক্ষাৎ
৪৪৭	১	সেপাইএ	সেপাইয়ে
৪৫১	৫	ধ্বনী	ধ্বনি
৪৫২	১৩	সমস্তই	সমস্ত
৪৫৫	১৭	ব্যাধিতারিত	ব্যাধিতাড়িত
৪৭০	৬	খ্রীস্টাব্দের	খ্রীষ্টাব্দের
৪৭১	৩	অঞ্জলী	অঞ্জলি
৪৭২	১৭	হয়	হয়ে
৪৭৬	১	গুপ্তচরবৃত্তিতে	গুপ্তচরবৃত্তি
৪৭৬	৭	ভূজঙ্গ	ভুজঙ্গ
৪৭৭	২	সহযোগীতায়	সহযোগিতায়
৪৭৭	৫	কোমপানী	কোম্পানি
৪৭৯	১	সংলপে	সংলাপে
৪৮১	৭	মীরকাশের	মীরকাশেম
৪৮২	২	করলে	করতে
৪৯১	২২	স্বার্থক	সার্থক
৪৯৪	২৫	আর	?
৪৯৬	১৫	চন্দনগরে	চন্দননগরে
৪৯৭	১৩	কুষ্ঠব্যধিগ্রস্ত	কুষ্টব্যাধিগ্রস্ত

পাতা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫১১	২১	বিবরনী	বিবরণী
৫১৩	১৯	সংখ্যাগরিষ্টতার	সংখ্যাগরিষ্ঠতার
৫১৪	১৩	সংখ্যাগরিষ্ট্য	সংখ্যাগরিষ্ঠ
৫২৫	২৭	লক্ষনীয়	লক্ষণীয়
৫৩০	১	বিষদৃশভাবে	বিসদৃশভাবে
৫৩৩	২	সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে	সঙ্গে সঙ্গে
৫৩৫	২৭	কীরিটেশ্বরীর	কিরীটেশ্বরীর
৫৩৬	৭	ভস্মস্মাৎ	ভূমিসাৎ
৫৩৭	১৬	দেশব্যপী	দেশব্যাপী
৫৩৮	৩	।	,
৫৩৯	১৮	করেলেন	করলেন
৫৪৩	৫	আস্তাকুঁড়ে	আঁস্তাকুড়
৫৪৩	১১, ১২, ১৫	ফাঁসী	ফাঁসি
৫৪৩	১৬	সাক্ষী	সাক্ষি
৫৪৪	৪	কর্ম্মণ্যে	কর্মণ্যে
৫৪৫	১২	উত্তরে	উত্তর
৫৪৬	৬	সাক্ষী, ফাঁসী	সাক্ষি, ফাঁসি
৫৪৯	২১	কাটকে	আটকে
৫৫০	১৮	নয়	হয়
৫৫২	২	করুণ	করুন
৫৫৬	১৫	অনুযারী	অনুযায়ী
৫৫৮	১১	দিন	দিল
৫৬০	৪	।	,
৫৬৩	২৪	ইর্ষাতুর	ঈর্ষাতুর
৫৬৫	১২	হেস্টিংসে	হেস্টিংসের
৫৬৮	২৩	চবর্তি	চর্বিত
৫৭০	৭	পাঠ না	পাঠ না করে
৫৭২	৪	মানসীকতা	মানসিকতা

পাতা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৭২	৮	আবিস্কার	আবিষ্কার
৫৮৬	১২	প্রাতঃস্মরনীয়া	প্রাতঃস্মরণীয়া
৫৮৬	১৬	করনীয়	করণীয়
৫৮৬	১৯	পরাম্মুখ	পরাঙ্মুখ
৫৯০	২১	কর্মোক্ষম	কর্মক্ষম
৬০৪	১১	নিধারণে	নির্ধারণে
৬০৭	১৭	নেতাহীন	নেতৃহীন
৬০৭	২৩	রানী	রাণী
৬০৮	১৭	ত্র্যস্ত	ত্রস্ত
৬১০	৭	গৃহিনী	গৃহিণী
৬১০	৭	দৈববানী	দৈববাণী
৬১১	২৪	রোগগ্রস্থ	রোগগ্রস্ত
৬১২	৩	অশ্লিলতা	অশ্লীলতা
৬১২	১৯	ত্রিপাক্ষীক	ত্রিপাক্ষিক
৬১৬	৬	ত্বেজ	তেজ
৬১৬	৭	কাছাকছি	কাছাকাছি
৬১৬	১১	ত্র	মাত্র
৬১৭	১২	বিষয়ে	বিষয়
৬১৭	২৯	রানী	রাণী
৬১৯	১১	ত্বেজে	তেজে
৬২০	২০	মূখ্য	মুখ্য
৬২১	২৪	অনুপ্রাণীত	অনুপ্রাণিত

নির্দেশিকা

অ

আ

ই

ঈ

উ

ক

খ

গ

ছ

ধ

ন

প

ম

র

শ

স

হ